রহস্য সমগ্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

1. রহস্য সমগ্র
2. আলোয় ছায়ায়
    1. ১. একেই বলে লোনলিনেস
    2. ২. ঘরের দরজা খুলে সর্বজিৎ
    3. ৩. সিংঘানিয়া রোজ সকাল চারটেয় ওঠে
    4. ৪. ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্টটা
    5. ৫. ডোরবেল শুনে
    6. ৬. দরজা খুলে সর্বজিৎ দেখল
3. ঈগলের চোখ (উপন্যাস) – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
    1. ১. বিষাণ
    2. ২. জাহ্নবী
    3. ৩. শিবাঙ্গী
    4. ৪. শবর দাশগুপ্ত
4. ঋণ
    1. ০১. আপনার নাম
    2. ০২. পাপী! পাপী! ঘোর পাপী!
    3. ০৩. তোমাকে যা বলতে চাই
    4. ০৪. একজন লোক সকালবেলায়
    5. ০৫. মিতালিদেবীর খুনের কেসে
    6. ০৬. আমাকে কেন টানাহ্যাঁচড়া করছেন
    7. ০৭. মিঠু খুব ধীরে তার বিষণ্ণ মুখখানা তুলল
    8. ০৮. সে পালাতে পারবে না
5. কাপুরুষ
    1. ০১. ওই চলেছে দুঃখী দেবীলাল
    2. ০২. দিল্লি থেকেই ট্রেনটা ছেড়েছিল
    3. ০৩. মস্ত নিমগাছের ছায়ায়
    4. ০৪. বিশু চমকে উঠল
    5. ০৫. কলকাতার খবরের কাগজ
    6. ০৬. গাঁধীবাদ দিয়ে শুরু

আলোয় ছায়ায়

---

১. একেই বলে লোনলিনেস

একেই বলে লোনলিনেস। বুঝলে! অ্যাবসোলিউট লোনলিনেস!

একা থাকতে আপনার ভাল লাগে কি?

কখনও লাগে। কখনও লাগে না। এনিওয়েে, আই হ্যাভ টু বিয়ার ইট।

কেন, আপনার তো সবাই আছে?

আছে নাকি?

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এমনকী মা অবধি।

সেটা আছে। তবু কেউ নেই।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

বুঝবার দরকারই বা কী? একজনের ব্যক্তিগত প্রবলেম অন্যে সবসময়ে বুঝতে পারেও না।

প্রবলেমটা কি সর্ট আউট করা যায় না?

যায়। পৃথিবীর সব প্রবলেমেরই সলিউশন আছে হয়তো।

তা হলে?

সলিউশনটা খুঁজে পেলে প্রবলেমটা মিটে যাবে।

মনে হচ্ছে, সলিউশনটা আপনি জানেন।

না, জানলে নির্বাসন নিয়েছি কেন?

এখানে কীভাবে সময় কাটে আপনার? বোরড হন না?

বোরডমও আছে, তবে সকালবেলাটা চমৎকার।

তখন বোর লাগে না বুঝি?

না। সকালে বেড়াতে যাই। ফাঁকা জায়গা। বেড়ানোর পক্ষে চমৎকার।

তারপর?

ফিরে এসে ছবি আঁকি। তখন জ্ঞান থাকে না।

রোজ?

রোজ। ছবিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আগে বছরে আট-দশটা আঁকতেন। এখনও তাই?

না। এখন সংখ্যাটা অনেক বেড়েছে।

বায়াররা কি এখানে আসে?

খুব কম। আমার ছবি এজেন্টের মারফতই বেশি বিক্রি হয়।

আজকাল এগজিবিশন করেন না, না?

না। ছবি বেশিরভাগই বিক্রি হয়ে যায়। এগজিবিশনটন প্রাইমারি স্টেজে হত। এখন ছবি জমে থাকে না তো।

আপনার তো এখন প্রচণ্ড ডিম্যান্ড।

হুজুগই ধরতে পারো। যারা কেনে তারা কি ছবি বোঝে?

তা বটে। যা

রা আঁকে তারাও বোঝে না।

সকালে তা হলে শুধু ছবি আঁকা?

হ্যাঁ। সকালে আলোটা ভাল পাওয়া যায়। মেজাজটাও থাকে ভাল।

দুপুরে ঘুমোন?

না, ঘুমোনোর অভ্যাসটা কম। দুপুরে বই পড়ি।

গল্পের বই?

তাও। তবে ইতিহাস আর বিজ্ঞানই বেশি।

এখানকার লোকজন দেখা করতে আসে না?

আমি তো আনসোশ্যাল। বেশি মিশি না কারও সঙ্গে। তবে দু-চারজনকে চিনি।

কথা বলতে, আড্ডা মারতে আপনার ভাল লাগে না?

না। আগে খুব আড্ডা দিতাম, যখন বয়স কম ছিল।

কফি হাউসে?

কফি হাউস ছিল, বন্ধুদের মেসবাড়ি ছিল, বসন্ত কেবিন ছিল।

সেসব দিনের কথা মনে হয় না?

হয়। তবে খুব সুখস্মৃতি নয়।

তখনকার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই?

ইচ্ছে করেই যোগাযোগ রাখি না। কী হবে?

আড্ডায় তো অনেক ভাব বিনিময় হয়।

হয়তো হয়। তবে আড্ডায় বেশিরভাগই হয় লাইট কথাবার্তা। আমি ওটা আজকাল এনজয় করি না।

বিকেলের দিকটায় বিষণ্ন লাগে না?

না। ভালই লাগে।

রাতে ছবি আঁকেন?

না না। কোনওদিনই আঁকতাম না। এখানে ভীষণ লোডশেডিং। কারেন্ট থাকলেও ভোল্টেজ খুব কম। রাতে কোনও কাজই করা যায় না। এখানে বাধ্যতামূলক হল আর্লি টু বেড।

এত বড় বাড়ি নিয়ে থাকেন, গা ছমছম করে না?

কেন করবে? আমার তো ভূতের ভয় নেই।

চোর-ডাকাতের ভয়?

তাও নেই। কী নেবে? ভ্যালুয়েব তত কিছু থাকে না।

ছবি তো নিতে পারে।

এখানকার চোর-ডাকাতেরা ততদূর শিক্ষিত নয় যে, ছবি চুরি করবে। ছবির বাজারদরও তারা জানে না।

তবু তারা আছে তো!

তা আছে শুনেছি। এ বাড়িতে এখনও হানা দেয়নি।

ছবি এঁকে যে আপনি প্রভূত টাকা উপার্জন করেন এটা কি তারা জানে না?

তা আমি বলতে পারব না। ছবি এঁকে টাকা রোজগার করার ব্যাপারটা শিক্ষিত সমাজের লোকে জানে। এরা ততটা ওয়াকিবহাল নয় বোধহয়। নগদ টাকা আমি অবশ্য বাড়িতে রাখি না।

সে তো বটেই। কলকাতায় যখন ছিলেন তখন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আপনার কাছে আঁকা শিখতে আসত।

হ্যাঁ। শেখাতে আমার ভালও লাগে।

এখানে কি কেউ শেখে?

তেমন নয়। ছবি নিয়ে কে মাথা ঘামায় বলো? এক-আধজন আসে।

আপনি শেখান?

এখানে যারা শিখতে আসে তাদের হাত খুব কাঁচা। শুধু ড্রইং শেখাই। কিন্তু সেটাও খুব ভাল নিতে পারে না।

আপনি এখানে আর কী করেন?

সন্ধের পর মদ খাই। ওটা নিয়মিত। আর বিশেষ কিছু করি বলে তো মনে পড়ছে না।

এবার আপনাকে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করব। রাগ করবেন না তো!

আরে না। রাগের কী আছে?

আপনার বয়স বোধহয় সাতচল্লিশ।

ওটা সার্টিফিকেট এজ। আসলে উনপঞ্চাশ।

যাই হোক। আপনার একটা সেক্স লাইফ থাকার কথা।

ওঃ!

রাগ করলেন?

আরে না। কথাটা হল, প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী।

তার মানে?

মাঝে মাঝে মেয়েছেলে চলে আসে।

চলে আসে?

আই ডোন্ট ফোর্স দেম। টাকা অফার করি।

চলে আসে কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

আমার একজন হেলপার আছে। অড জব ম্যান। এ ব্যাপারে সে-ই সাহায্য করেছিল।

অনেক মেয়ে আসে নাকি?

না না। একজনই। স্থানীয় একজন গরিব মেয়ে। স্বামী নেয় না।

একজনই?

হ্যাঁ। কিন্তু বেশি নয়। সপ্তাহে একদিন বা বড়জোর দু'দিন।

আপনি কি আবার বিয়ে করার কথা ভাবেন?

পাগল নাকি?

এরকমই তা হলে কাটিয়ে দেবেন?

দেখা যাক। কোথা থেকে কবে কী হবে তা নিয়ে ভেবে কী করব?

কলকাতায় একটা গুজব রটেছে যে আপনি এখানে এসে একটা স্পিরিচুয়াল লাইফ কাটাচ্ছেন। ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে আছেন।

মানুষের অনুপস্থিতিতে কত কথাই তো রটে।

আপনি বরাবর নাস্তিক ছিলেন। এখনও তাই?

নয় কেন? আমার নাস্তিক্য ভাঙার মতো কিছু তো ঘটেনি।

অনেক সুময়ে নির্জনে একা বাস করতে করতে ঈশ্বরচিন্তাও আসতে পারে তো!

না। আমার মনে হয় না, ঈশ্বরচিন্তা ওরকম অকারণে আসে। আমার ঈশ্বরকে দরকার হয়। রং, রেখা আর পৃথিবীর রূপ এসবই আমার ঈশ্বর।

সে তো বটেই। আপনার এত যে দেশজোড়া খ্যাতি, এত টাকা এগুলো তো আপনি ভোগও করেন না। এখানে তো দেখছি স্পার্টান লাইফ লিড করছেন। ফ্রিজ বা টিভি আছে কি?

পাগল! ওসব দিয়ে কী হবে? একা মানুষ, ফ্রিজ দিয়ে কী করব? মদ খাওয়ার বরফ আমার চাকর বান্টা এনে দেয়। অবশ্য কিউব নয়, চাঙড়। ওতেই হয়ে যায়।

সিনেমাটিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না?

কোনওদিনই করত না। সিনেমা আমি খুব কমই দেখেছি। এখন তো আরও ইচ্ছে করে না।

আপনার বাগান করার শখ নেই? সামনের বাগানটা তো দেখছি আগাছায় ভরতি।

ওটাই তো আমার ভাল লাগে। তোমাদের কাছে আগাছা হতে পারে, আমার কাছে নয়। সাজানো বাগানের চেয়ে এই ওয়াইল্ডনেস এবং এই হ্যাপাজার্ড গাছগাছালি আমার বেশি প্রিয়। ওটা অ্যাটিচুডের ওপর নির্ভর করে।

তাই দেখছি। আপনার রং, তুলি, ক্যানভাস সব কলকাতা থেকেই আসে?

হ্যাঁ। আমার এজেন্ট দিয়ে যায়। আমি অবশ্য আজকাল বিদেশ থেকেই রং আনাই। এখানকার রঙের কোয়ালিটি আমার পছন্দ নয়।

হ্যাঁ, অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট। বাড়িরখবর টবর পান?

বিশেষ নয়। মা বোধহয় তাড়না করে, তাই মাঝে মাঝে আমার মেয়েরা চিঠি লেখে। পোস্টকার্ডে।

আপনি জবাব দেন?

এক লাইন-দু' লাইনে দিই। আমি ভাল আছি এ খবরটা না পেলে মা হয়তো চলেই আসবে খবর নিতে। মায়েদের তো জানো।

আপনি কি মাকে একটু মিস করেন?

না, মিস করি বলাটা বাড়াবাড়ি। তবে একটু মায়ের কথাই যা মনে হয়।

আপনি নিশ্চয়ই পরিবারকে টাকা পাঠান?

তা পাঠাব না? পাঠাতেও হয় না। আমার স্ত্রীর আর আমার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়। ছবির টাকা ছাড়াও আমার স্ত্রীর চাকরির রোজগার আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ–

হ্যাঁ, আমি জানি দে আর ভেরি ওয়েল অফ।

ওদের বড়লোকই বলতে পারো তুমি। বেহালায় অত বড় বাড়ি, গাড়ি, অল সর্টস অব স্ট্যাটাস সিমবলস!

মেয়েদের বা ছেলেকে মিস করেন না?

নাঃ। সবাই তো বড়ই হয়ে গেছে। দে আর বিজি উইথ দেয়ার স্টাডিজ অ্যান্ড ক্যারিয়ারস।

বউদির কী অ্যাটিচুড আপনার প্রতি?

ভেরি কোল্ড, ভেরি প্যাসিভ। যেমনটা ছিল।

উনি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি?

হ্যাঁ, দু’বছর আগে আমার এক শালাকে পাঠিয়েছিল। সে মিনমিন করে কী যেন বলছিল। সব সংসারেই অশান্তি হয়েই থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি হতেই পারে…

আপনি তাকে পাত্তা দিলেন না তো!

পাত্তা দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ববান সে নয়।

কী বললেন তাকে?

বললাম, বাড়ি যাও। দুনিয়াটা গোলগাপ্পা নয়। সবকিছু বুঝবার মতো মাথাও তোমার নেই। ভাগিয়ে দিলাম।

বউদি কি চিঠিপত্র কিছু দেননি কখনও?

না। শি ইজ অলসো এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক।

আপনি কি তাকে আর পছন্দ করেন না?

কোনওদিনই করিনি।

অথচ সবাই জানে আপনাদের লাভ ম্যারেজ।

লাভ ম্যারেজ ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পা।

কেন?

প্রেম করে যেসব বিয়ে হয় সেই প্রেমগুলো বেশিরভাগই স্কিন ডিপ। আই' নেভার লাভড হার। সাময়িক একটা মোহ আর জেদ থেকে বিয়েটা হয়েছিল। এনিওয়ে শি হ্যাজ নাথিং টু ল্যামেন্ট ফর। বেশ কয়েক বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছি। নাউ আই ওয়ান্ট মাই ফ্রিডম।

এটাই কি সেই ফ্রিডম?

একরকম ফ্রিডমই। অন্তত বন্ডেড তো নই।

এমন তো হতে পারে যে আপনি একদিন অনুতপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন।

তা যাব না। যেতাম, যদি মান-অভিমান থেকে চলে আসতাম। এটা অমন হালকাপলকা ব্যাপার নয়। আমি স্ত্রীর সঙ্গ কখনওই উপভোগ করিনি। কোনও টানও নেই তার প্রতি। ছেলেমেয়েদের প্রতিও নেই। আই নেভার ওয়াজ এ গুড ফাদার। তবে ছেলেমেয়েরা ভাল থাকুক সেটা অবশ্য চাই।

আপনি কি তা হলে এখানে বেশ ভাল আছেন?

দেখতেই তো পাচ্ছ। কিছু খারাপ নেই। ভাল থাকাটা নির্ভর করে কতগুলো ফ্যাক্টরের ওপর। ভাল স্বাস্থ্য, ভাল অ্যাটিচুড, স্যাটিসফ্যাক্টরি কাজ…

অ্যান্ড সেক্স?

অলসো সেক্স।

আর কিছু নয়? ধরুন গুড কম্পানি?

কম্পানি ছাড়াও চলে। ওটা অ্যাটিচুডের ওপর নির্ভর করে।

তা হলে কি বলব আপনি এখনই প্রকৃতপক্ষে জীবনকে উপভোগ করছেন?

না, তা বললে মিথ্যে বলা হবে। জীবনকে আমি কি আগেও উপভোগ করিনি কখনও কখনও? ভাল একটা ছবি আঁকলে, ভাল একটা গান শুনলে, সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমি বেঁচে থাকাটাকে সার্থক বলেই তো ভেবেছি বহুবার। মনে আছে প্যারিসে আমি প্রথম গিয়ে টানা পনেরো দিন ল্যুভ মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়িয়েছি। কেমন যেন স্টানড অ্যান্ড হিপনোটাইজড। সেটাও তো উপভোগ!

আর এখন?

এখনও তাই। মাঝে মাঝে উপভোগ করি।

আপনি গানের কথা বললেন। আপনার কি টেপ রেকর্ডার আছে?

না। ক্যাসেট বাজিয়ে গান শুনতে ইচ্ছে করে না।

তা হলে গানটা আর উপভোগ করেন না?

তোমাকে একটা আশ্চর্য কথা বলব?

বলুন না। শুনতেই আসা।

তুমি হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

বলুন শুনি। বিশ্বাস করব না এমন গ্যারান্টি কে দিতে পারে?

এ জায়গাটা তো দেখছ ভীষণ নির্জন।

হ্যাঁ।

এখানে দিনেদুপুরে ঝিঁঝির শব্দ শোনা যায়। সারাদিনে হয়তো একটাও মানুষের গলার স্বর কানে আসে না। এই যে নির্জনতা, মাঝে মাঝে এর শব্দহীনতা আমাকে অভিভূত করে ফেলে।

বুঝতে পারছি।

মাঝে মাঝে কী হয় জানো? গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হয় এই নিস্তব্ধতার ভিতরে যেন একটা সুর লয় খেলা করছে। খুব গভীরে যেন একটা অশ্রুত সংগীত। এ ঠিক বোঝানো যায় না। কানে শোনার জিনিস নয়। কিন্তু অনুভূতিতে যেন ধরা দেয়।

এরকম কি প্রায়ই হয়?

না, খুব কম হয়। অনেকদিন বাদে বাদে।

এরকমটা কিন্তু হতেই পারে। বড় বড় ওস্তাদের নাকি হয়।

আমি ওস্তাদ নই। গান তো আমার সাধনা নয়।

তা হোক। আপনি তো সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। ধ্যানস্থ মানুষ।

ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ওরকম কমপ্লিমেন্ট আমার পাওনা নয় কিন্তু।

এটা কমপ্লিমেন্ট নয়। একটা এক্সপ্ল্যানেশন মাত্র।

থ্যাঙ্ক ইউ।

এখন আপনি কী বিষয় নিয়ে ছবি আঁকছেন?

প্রধানত এই জায়গাটা নিয়ে। পাখি, ফুল, কীটপতঙ্গ নিয়েও আঁকি। আবার ভিশন থেকেও আঁকি। একদিন স্বপ্নে একটা জাহাজ দেখলাম। কালো সমুদ্রের ওপর

ভাসছে। অদ্ভুত জাহাজ। বিশাল উঁচু, বিরাট বড়। সেই জাহাজটা বড় ক্যানভাসে প্রায় এক মাস ধরে আঁকলাম। কিন্তু মনের মতো হল না।

ছবিটা কি আছে?

না, বিক্রি হয়ে গেছে।

আপনি আগে আপনার ছবিগুলোর ফটো তুলে রাখতেন। আজকাল রাখেন না?

নাঃ। কী হবে রেখে? মনে হয় আমার এজেন্ট রাখে।

একটা রেকর্ড থাকা ভাল।

কম বয়সে আমারও তাই মনে হত। এখন আর মায়া নেই যে। আঁকি, বিক্রি করি, তারপর ভুলে যাই।

আপনি একসময়ে ক্রিটিকদের ওপর খুব খাপ্পা ছিলেন। একবার একজন আর্ট ক্রিটিককে মারধরও করেছিলেন। তার নাম নব দাস, মনে আছে?

খুব আছে। তখন খুব রিঅ্যাকশন হত।

আজকাল হয় না?

হবে কী করে? আমার এখানে পত্র-পত্রিকা আসে না। এলেও পড়ি না। যার যা খুশি লিখুক।

পড়েন না বলেই কি রিঅ্যাক্ট করেন না? পড়লে করতেন?

না, না, পড়লেও করতাম না। আসলে কী জানো, আমি আজ বুঝেছি, আর্ট ক্রিটিকরা ছবি কিস্যু বোঝে না। তার চেয়েও মারাত্মক কথা আর্টিস্ট নিজেও বোঝে না। এই সাংঘাতিক সত্যটা বুঝতে পারার পর আমি সংযত হয়ে গেছি।

সমঝদাররা কি একথা মানবেন? আপনি সর্বজিৎ সরকার–কত নাম-ডাক আপনার!

ওসবও খুব ফুঁকো ব্যাপার। আর্টের জগতে একটা মস্ত ফাঁকিবাজি আছে।

আপনি সেটা জেনেও তা হলে আঁকেন কেন?

আঁকার নেশায়। কিছু তো করছি। ড্রয়িং জানি, তুলি চালাতে পারি, রং বুঝি, প্যাটার্ন বুঝি। এগুলো নিয়ে একটা খেলা।

ছবির কোনও ফিলজফি নেই বলছেন?

সচেতনভাবে নেই। তবে কেউ কোনও অর্থ বার করে নিতে পারলে ভালই।

এটা তো সাংঘাতিক কথা!

খুব সাংঘাতিক কথা। তবু অনেকটাই সত্যি। তবে একটা কথা আছে।

কী কথা?

একজন জাত আর্টিস্ট যাই আঁকুক ছবিটার মধ্যে কিন্তু একটা সৌন্দর্য থাকবেই। থাকবে সূক্ষ্ম সিমেট্রিকাল নকশা। থাকবে কিছু অনুভূতিও। সবটা ফেলে দেওয়া যাবে না। পিকাসো অনেক অর্থহীন, আবোল তাবোল ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তার মধ্যেও দেখবে কিছু একটা আছে। যেটা আছে সেটাকে সেই আর্টিস্টও বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

বাঃ, এই তো অ্যাপ্রিসিয়েটও করছেন দেখছি।

স্ববিরোধী কথা বললাম নাকি শবর?

একটু কনফ্লিকটিং। কিন্তু আর্ট জিনিসটা বোধহয় ওরকমই। কিছু নেই, না থেকেও আছে।

চা খাবে?

না, আমি চা খাই না।

তাও তো বটে, তোমার তো কোনও নেশাই নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।

আপনি ইচ্ছে করলে খেতে পারেন।

না। এখন বেলা এগারোটা বাজে। এ সময়ে চা খাই না।

আমি আপনার আঁকার বাধা সৃষ্টি করছি না তো!

না। আজ রবিবার। রবিবার আমি ছুটি নিই।

আপনার তো রোজই ছুটি।

হ্যাঁ, সেইজন্যই একটা দিন একটু আলাদা ছুটির মেজাজ তৈরি করে নিতে হয়। এবার আসল কথাটা কি বলবে?

আসল কথা! আবার আসল কথা কী?

সর্বজিৎ হাসল। বলল, শবর, তুমি একজন অতি ধূর্ত পুলিশ অফিসার। শুধু আর্ট নিয়ে আলোচনা করতে কলকাতা থেকে এতদূর আসোনি। আমি জানি।

শবর মৃদু হেসে বলল, আমি সমঝদার না হলেও আর্ট নিয়ে আমার কিছু নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আছে।

জানি। তোমার আর্ট নিয়ে নাড়াচাড়াও বোধহয় ক্রাইম ডিটেকশনের জন্যই।

তাই নাকি?

তুমি একবার বলেছিলে, একটা কার যেন ছবি দেখে তুমি একটা মার্ডার কেস সলভ করেছিলে।

ঠিক তা নয়। তবে সামটাইমস ইট হেল্পস।

তুমি আমাকে কোনও ক্রাইমের জন্য ধরতে আসোনি তো শবর?

আরে না। কী যে বলেন।

স্ত্রী আর পরিবার ছেড়ে চলে আসা ছাড়া আমার আর তেমন কোনও অপরাধ নেইও। তবে হ্যাঁ, নব দাসকে মেরেছিলাম। সেটাও একটা ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট বটে। তবে নব পুলিশে যায়নি। আমি ওর কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলাম।

সবই জানি।

তা হলে এবার আসল কথাটা বলে ফেলো।

আচ্ছা আপনি কি আজকাল ন্যুড আঁকেন?

ন্যুড? তা আঁকি বোধহয় মাঝে মাঝে। কেন?

ইদানীং কি আপনি পরপর বেশ কয়েকটা ন্যুড এঁকেছেন?

উঁহু। ন্যুড খুব কম আঁকি। ভীষণ রেয়ার। হঠাৎ ন্যুড নিয়ে কথা উঠছে কেন?

আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবং প্রশ্নটার জন্য আমার নির্লজ্জতাকে ক্ষমা করেন তা হলে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

আরে, ফর্মালিটি ছেড়ে প্রশ্নটা করেই ফেলল। আমি ভোলামেলা মানুষ। নাথিং টু হাইড। একটু আগে তো আমার সেক্স লাইফ নিয়েও প্রশ্ন করেছ, কিছু মনে করেছি কি?

এটা একটু পারসোনাল।

গো অ্যাহেড।

আপনি কখনও আপনার স্ত্রীর ন্যুড এঁকেছেন কি?

এই কথা! হাঃ হাঃ, হ্যাঁ, বিয়ের পর একবার এঁকেছিলাম। খুব ছোট করে।

আপনার স্ত্রী আপত্তি করেননি?

আরে না। ওর কয়েকটা পোট্রেট এঁকেছিলাম। তারপর উনি নিজেই একদিন বললেন, উনি আমার ন্যুড মডেল হতে চান। ব্যাপারটা কী জানো? তখন ইলা নামে একটি মেয়ে আমার মডেল হত। শি ওয়াজ কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ। সম্ভবত আমার স্ত্রী ওঁর সম্পর্কে একটু জেলাস ছিলেন। তাই ওঁকে সরিয়ে নিজে মডেল হতে চেয়েছিলেন।

তার ফল কী হয়েছিল?

খুব খারাপ। যখন আমার স্ত্রীকে মডেল করে ন্যুড ছবিটা আঁকলাম তখন উনি বেঁকে বসলেন। ও ছবি বিক্রি করা চলবে না। এগজিবিট হিসেবেও দেওয়া যাবে না। দি সেন্টিমেন্ট ওয়াজ কোয়াইট লজিক্যাল।

সেই ছবিটার শেষ অবধি কী হল?

ফেসটা বদলে দিতে হল।

এরকম ঘটনা আর কখনও ঘটেনি?

না। ইন ফ্যাক্ট বিয়ের এক বছর পর থেকে আমি আমার স্ত্রীর কোনও ছবিই আঁকিনি। নডের প্রশ্ন তো ওঠেই না। কিন্তু কেন এই প্রশ্ন করছ জানতে পারি কি শবর?

আপনার দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। মেয়েরা এখন একজন যুবতী এবং একজন কিশোরী। ঠিক তো!

হ্যাঁ।

কোনও বাপের পক্ষে তার নিজের যুবতী বা কিশোরী মেয়ের ন্যুড আঁকা কি সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?

এ প্রশ্ন কেন করছ জানি না। তবে অনেক আর্টিস্টের ওসব সংস্কার থাকে না। কিন্তু আমার কথা যদি বলো তা হলে বলব আমার ওরকম রুচি কখনও হয়নি, হবেও না।

আপনার মুখ থেকে এ কথাটা শুনবার জন্যই আসা। আপনাকে নিয়ে কলকাতায় এখন একটা বিচ্ছিরি কন্ট্রোভার্সি চলছে।

কী ব্যাপার খুলে বলতে পারো?

রামপ্রসাদ সিংঘানিয়া নামে একজন বড় আর্ট কালেক্টার আছে, জানেন?

চিনি না। আজকাল আর্ট কালেক্টারের অভাব কী?

রামপ্রসাদ সিংঘানিয়া তার কালেকশন অব আর্টসের একটা এগজিবিশন দিয়েছেন।

ও। তা হবে।

সিংঘানিয়ার এই এগজিবিশনে প্রায় আশিটা ছবি ডিসপ্লে করা হয়েছে। তার মধ্যে ত্রিশখানাই আপনার।

বলো কী? একজনের কাছে আমার এত ছবি?

লোকটা শুধু কালেক্টরই নয়, ছবির ব্যাবসাও তার আছে।

হ্যাঁ, ছবি তো এখন ব্যাবসারই জিনিস।

আপনার এই ত্রিশখানা ছবির মধ্যে অন্তত দশটা ছবি নিয়ে একটা সিরিজ রয়েছে। সিরিজটার নাম মেনি ফেসেস অব ইভ।

যদূর মনে পড়ে এরকম কোনও সিরিজ আমি আঁকিনি।

ভাল করে ভেবে দেখুন।

ফটোর রেকর্ড না রাখলেও আমার মেমরি খুব ভাল। আর ছবির টাইটেলের একটা বাঁধা লিস্ট আমার ডায়েরিতে লেখা থাকে। ফর রেফারেন্স। কারণ, বুঝতেই পারছ, ছবি একটা হাইলি কমার্শিয়াল কমোডিটি।

বুঝতে পারছি। তা হলে মেনিফেসেস অব ইভ নামে কোনও সিরিজ আপনি আঁকেননি?

না। এই সিরিজেই কি ন্যুড ছবিগুলো রয়েছে?

হ্যাঁ। শুধু ন্যুড ছবিই নয়। ছবিগুলো আপনার স্ত্রী এবং মেয়েদের নিয়ে আঁকা।

মাই গড! এ তো সাংঘাতিক কথা।

কতটা সাংঘাতিক তা আপনি এখানে বসে ঠিক অনুমান করতে পারবেন না।

তাই নাকি? ছবিগুলো কি খুব অবসিন?

খুব। যাকে রগরগে বলা যায় তাই।

সিংঘানিয়াকে তোমরা অ্যারেস্ট করছ না কেন?

সেটা পরে হবে, আপনি ছবিগুলো আইডেন্টিফাই করার পর। কিন্তু দি ড্যামেজ ইজ অলরেডি ডান।

লোকটা তো ক্রিমিন্যাল দেখছি।

সেটা তো হতেই পারে। কিন্তু এর ফলে আপনার স্ত্রী এবং মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আপনার স্ত্রী একটা কো-এডুকেশন কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি কলেজে যেতে পারছেন না। আপনার বড় মেয়ে কলেজে পড়ে, ছোটটি স্কুলে। তারা স্কুল কলেজ তো দুরের কথা, রাস্তাতেই বেরোতে পারছে না।

ছবিগুলো অতটা পাবলিসিটি পেল কীভাবে?

সিংঘানিয়া ছবিগুলো ডিসপ্লে করার পরই পত্র-পত্রিকায় ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। অনেক কাগজেই ওই সিরিজটার ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। ক্রিটিকদের অনেকেই আপনার স্ত্রী ও মেয়েদের চেনে। তারাই প্রথম পয়েন্ট আউট করে যে সর্বজিতের ইভ আসলে তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে।

নাউ আই অ্যাম ভেরি অ্যাংরি শবর। সিংঘানিয়াকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।

উত্তেজিত হবেন না। আগে শুনুন। আপনার স্ত্রী প্রথমে ছবিগুলো কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সিংঘানিয়া বিক্রি করেনি। কারণ এই এগজিবিশনের কোনও ছবিই বিক্রির জন্য ছিল না। সিংঘানিয়া ক্রিমিন্যাল কি না সেটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি খুব জটিল। ক্রিটিকরা আপনার সম্পর্কে কাগজে বিষোদগার করেছে, আপনার রুচি, বিকৃত যৌনতা, প্রতিহিংসাপ্রবণতা এবং অপ্রকৃতিস্থতার কথা তারা তীক্ষ্ণ ভাষায় লিখেছে।

আমি তো তা জানি না। জানতে পারলে এগজিবিশনটা ইনজাংশন দিয়ে বন্ধ করে দিতাম।

সেটা করা হয়েছে। আপনার স্ত্রী লিগ্যাল অ্যাকশন নিয়েছেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। আপনার স্ত্রী মনে করেন নিজের পরিবারের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই আপনি এ কাজ করেছেন। আপনার মেয়েরা এই ঘটনার পর প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেছে। আপনার স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনছেন। সেইসঙ্গে হয়তো ডিভোর্সের মামলাও।

ছবিগুলো যে আমার আঁকা নয় এটা তাদের বোঝা উচিত ছিল। আমার আঁকার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে।

আমরা সেই অ্যাঙ্গেলটাও দেখেছি।

কী দেখলে? কলকাতায় কোনও ছবি বিশেষজ্ঞ–অর্থাৎ পেশাদার বিশেষজ্ঞ নেই। আমরা তাই ক্রিটিক এবং অন্যান্য আর্টিস্টের মতামত নিই। তারা প্রত্যেকেই বলেছেন, ছবিগুলো সর্বজিৎ সরকারেরই আঁকা। অর্থাৎ আপনি যে ক্যারেক্টারিস্টিকসের কথা বলছিলেন তা সবগুলোতেই আছে। নব দাস একটি বিখ্যাত ইংরিজি কাগজে লিখেছে, সর্বজিৎ সরকার চিরকালই যৌনবিকারের শিকার। সে তার বউ আর মেয়েদের বাজারে নামিয়ে দূষিত আনন্দ পাচ্ছে, এটা তার মতো নিম্নরুচির মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

হুম, ব্যাপারটা তা হলে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ, বেশ জটিল। নইলে আমাকে এতদূর আসতে হত না।

এটা কি তোমার অফিশিয়াল ভিজিট, না ব্যক্তিগত?

ব্যক্তিগত। এটা সেই অর্থে পুলিশ কেস নয়। আমার একটা সন্দেহ ছিল ছবিগুলো নকল।

কেন সন্দেহ হল?

আমি আপনাকে দীর্ঘদিন চিনি বলে।

তুমি কি বিশ্বাস করো যে এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়?

মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। তবু আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। এখন বলুন তো এ কাজ কে করতে পারে এবং কেন?

কী করে বলব বলল তো। আমার কেমন শত্রু থাকতে পারে? আমি রগচটা মানুষ ছিলাম ঠিকই, কিন্তু কারও কোনও গর্হিত ক্ষতি করেছি বলে তো মনে পড়ে না।

আরও একটা কথা।

বলো।

অন্তত চারটি ছবিতে ইভের সঙ্গে আদমকেও দেখা গেছে। কে জানেন?

না, বলো।

একজন আপনার বন্ধু সুধাময় ঘোষ।

সে কী?

দুটো ছবিতে সুধাময় ঘোষ এবং আপনার স্ত্রীকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আঁকা হয়েছে।

আর?

আপনার দুই মেয়ের সঙ্গে আরও দুটি আদমকে আমরা পাচ্ছি। একজন আপনার বড় মেয়ের বন্ধু বান্টু সিং। অন্যজন ছোট মেয়ের বন্ধু ডেভিড।

এদের তো আমি চিনিই না!

আপনি না চিনলেও যে এঁকেছে সে চেনে।

এটা কি একটা ষড়যন্ত্র বলে তোমার মনে হয় শবর?

সে তো বটেই।

সিংঘানিয়াকে তোমরা ক্রস করোনি?

করেছি। সে পরিষ্কার বলেছে আপনার এজেন্টের মাধ্যমে সে ছবি কিনেছে। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে সে চেনে না।

আমার এজেন্ট কী বলে?

আপনার এজেন্ট রতন শেঠ হার্টের ট্রিটমেন্ট করতে আমেরিকায় গেছে। তার ছেলেরা বলছে, ছবিগুলি ওরিজিন্যাল।

বলল?

হ্যাঁ, তারা বলছে এখান থেকেই তারা প্যাক করে ছবিগুলো প্রায় ছয় মাস আগে নিয়ে যায়।

ব্যাপারটা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুশকিল হল, শুধু ওই ইভ সিরিজের ছবিগুলির জন্য আপনার পাওনা দশ লাখ টাকা তারা ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্টে জমাও দিয়েছে।

টাকা জমা দেওয়াটা বড় কথা নয়, প্রমাণও নয়। ওরা সবসময়েই আমার ছবি নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে।

সেটা ঠিক কথা। আমি জানতে চাই ওরা কি মিথ্যে কথা বলছে?

হ্যাঁ শবর! এটা একটা চক্রান্ত। তা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি সোনার ডিম-পাড়া হাঁস। অন্তত ওদের কাছে। আপনাকে ফাঁসিয়ে ওদের লাভ কী?

ওরা আর কারও কাছে টাকা খেয়ে এটা করেছে।

না, আমার তা মনে হয় না।

তোমার কী মনে হয়?

আপনার ছবি ট্রান্সপোর্ট করার সময় বা এজেন্টের গোডাউনে বা কোথাও ছবিগুলো সুইচ করা হয়েছে।

মাই গড!

কারণ আপনার এজেন্ট বা সিংঘানিয়া কেউ খুব একটা মিথ্যে কথা বলছে বলে মনে হয় না। আপনি চক্রান্ত বলে সন্দেহ করছেন। আমিও তাই করি। আপনি কবে কলকাতা যেতে পারবেন?

যাওয়া তো ইমিডিয়েটলি দরকার শবর।

মেক ইট টুডে অর টুমরো।

গিয়ে কী করতে হবে বলো তো!

একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকুন। ছবিগুলো যে আপনার নয় তা স্ট্রংলি বলুন।

ছবিগুলো আমি দেখতে চাই।

সেটা অ্যারেঞ্জ করা যাবে। আমি আপনার জন্য ছবিগুলোর ফটোপ্রিন্ট নিয়ে এসেছি। দেখুন।

সর্বজিৎ দেখল। বারো বাই আট ইঞ্চির পরিষ্কার রঙিন প্রিন্ট। কোনও সন্দেহ নেই যে ছবিগুলি যে এঁকেছে সে সর্বজিতের আঁকার শৈলী জানে। অতিশয় নিপুণ এই চাতুরী সে নিজে ছাড়া আর কারও ক্ষেই ধরা সম্ভব নয়। দুটো ছবিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সুধাময়

এবং তার স্ত্রী ইরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে।

নিজের দুই মেয়ে নিনা আর টিনার ছবিগুলোর দিকে চেয়ে লজ্জায় ঘেন্নায় গা রিরি করছিল সর্বজিতের। এক-আধবার চোখ বুলিয়েই সে ছবিগুলি শবর দাশগুপ্তকে ফেরত দিল।

ছবিগুলো কেমন দেখলেন?

কেমন আর দেখব? নকল।

কলকাতার কিছু কাগজ কিন্তু ব্যক্তিগত অ্যাঙ্গেলটা অ্যাভয়েড করে ছবিগুলোর খুব প্রশংসাও করেছে।

তাই নাকি?

কিছু মনে করবেন না, আপনার স্ত্রীর এখন বয়স কত?

হিসেবমতো আটত্রিশ।

শি লু ইয়ং।

হ্যাঁ। শি হ্যাজ গুড লুকস।

সুধাময় ঘোষের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক রিলেশন কেমন?

সর্বজিৎ একটু চিন্তিত হল। ভেবে বলল, ইরার সঙ্গে প্রেম আছে কি না জানতে চাইছ?

যদি বলি চাইছি?

আই ক্যান্ট হেল্প ইউ। কারণ আমি জানি না। বিয়ের চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ইরার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন খারাপ হয়ে যায় যে, আমি ওর কোনও কিছুই লক্ষ করতাম না। বেশিরভাগ সময়েই তো পড়ে থাকতাম বন্ডেল রোডের স্টুডিয়োতে। প্রেম হলেও আমার কিছু করার ছিল না।

ছবিগুলোতে আপনার স্ত্রীর কন্টেম্পোরারি চেহারা রয়েছে, নাকি অল্প বয়সের?

কন্টেম্পোরারি। ছবিগুলো রিয়ালিস্টিক ধরনে আঁকা। মুখ এবং অবয়ব খুব প্রমিনেন্ট। ইরার বাঁদিকের বুকে একটা জড়ুল আছে। সেটাও এঁকেছে। ইট মিনস দি বাস্টার্ড নোজ হার ওয়েল।

সুধাময় ঘোষ সম্পর্কে একটু বলুন।

কী বলব? সুধাময় ইজ এ নাইস ফেলল। বিগ শট ইন দি ইলেকট্রনিক বিজনেস। কোটিপতি।

আপনার স্ত্রীর প্রতি তার কোনও ক্রাশ ছিল কি?

কী করে বলব বলল তো! সুধাময় আমার বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও ছিল গভীর। আমার দুঃখের দিনে, ইন মাই আর্লি ডেজ হি হেল্পড এ লট। বিয়ের

পর তো আমার মাথা গোঁজবার জায়গা ছিল না। সুধাময় আমাকে তার একটা বাড়িতে সস্ত্রীক থাকতে দেয়। নাইস ম্যান, নাইস ফ্রেন্ড। ওর রি-অ্যাকশন কী?

উনি টোকিওতে রয়েছেন। বিজনেস টুর। তারপর যাবেন রাশিয়া এবং ইউরোপ। হয়তো চিন এবং তাইওয়ানও। ফিরতে দেরি হবে। ওঁর বয়স কত?

হার্ডলি ফর্টি ফাইভ।

তা হলে কোয়াইট ইয়ং।

হ্যাঁ, আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট।

উনি তো বিয়ে করেছেন?

আলবাত। ওর বউ সোনালি খুব ভাল মেয়ে। এই ঘটনাটা মেয়েটাকে দুঃখ দেবে।

উনি আপাতত স্বামীর সঙ্গে বাইরে।

বাঁচা গেল।

আপনি রিলিফ ফিল করছেন, কিন্তু আমি তা করছি না। ওঁরা থাকলে আমার কাজের সুবিধে হত।

তুমি কি ভাবছ যে, ইরার সঙ্গে যদি সুধাময়ের অ্যাডাল্টারির সম্পর্ক থেকেও থাকে তা হলে তা জেরা করে বের করতে পারতে?

কনফেশন আদায় করা সহজ নয়। কিন্তু রিঅ্যাকশন দেখে অনুমান করা সম্ভব।

সেক্ষেত্রে ইরাকেই তো প্রশ্ন করতে পারতে। তার রিঅ্যাকশন দেখে অনুমান করো।

ইরাদেবীর মানসিক অবস্থা এখন ভারসাম্যহীন। তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন আপনার ওপর। এ অবস্থায় ওঁকে ওসব সেনসিটিভ ব্যাপারে প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়।

তুমি এই তদন্তের কাজ কি প্রাইভেটলি করছ? নিজের গরজে? নাকি অফিশিয়ালি?

অফিশিয়ালি। ইরাদেবী আপনার নামে এফআইআর করেছেন। পুলিশের বড় কর্তারা তদন্তের ভার আমাকে দিয়েছেন।

কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলেছ যে, এটা তোমার ব্যক্তিগত সফর।

সেটাও সত্য। আমি ঠিক পুলিশ হিসেবে আপনার কাছে আসিনি। এসেছি ব্যক্তিগত উদ্যোগে। পুলিশ কেসটা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। তাই তাদের এ ব্যাপারে একটা গয়ংগচ্ছ ভাব আছে। সিরিয়াস ক্রাইম সামাল দিতে তাদের হিমশিম খেতে হয়, পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে তদন্তে সময় দেওয়ার উপায় নেই।

তুমি একজন অত্যন্ত নামকরা গোয়েন্দা। লালবাজারের প্রায় মাথার মণি। এরকম একটা কেসে তোমার মতো উঁদে অফিসারকে লাগানোর মানে কী?

শবর একটু হাসল, আপনিও গোয়েন্দাগিরিতে কম যান না দেখছি। কথাটা ঠিকই। আপনাদের কাছে ব্যাপারটা সিরিয়াস হলেও পুলিশের চোখে এটা মাইনর পেটি কেস। আপনার অনুমানও যথার্থ। পুলিশ আমাকে নিয়োগ করেনি। আমি স্বেচ্ছায় তদন্তটা করতে চেয়েছিলাম। কর্তারা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

নাউ ইউ আর টকিং সেন্স।

সিংঘানিয়ার এগজিবিশন এখানে বন্ধ করা গেলেও দিল্লি বোম্বাই বা বিদেশে বন্ধ করা যাবে না। ছবিগুলি যে নকল এটা প্রমাণ করাটা খুবই জরুরি। আপনি কি সেটা পারবেন?

কেন পারব না? ছবির ক্যারেক্টারই বলে দেবে যে ওগুলো আমার আঁকা নয়।

তা হলে আপনি কবে কলকাতা যাচ্ছেন?

আজ হবে না। কাল যাব।

গিয়ে কোথায় উঠবেন?

আমি তো বন্ডেল রোডের স্টুডিয়োতেই থাকি কলকাতায় গেলে। অনেকদিন অবশ্য যাওয়া যায়নি।

ওটা কি ভাড়ার ফ্ল্যাট?

ভাড়াই ছিল। পরে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।

আপনার বাড়ির লোক কি স্টুডিয়োটা চেনে?

বোধহয়। তবে কেউ কখনও যায়নি।

২. ঘরের দরজা খুলে সর্বজিৎ

ঘরের দরজা খুলে সর্বজিৎ ভিতরে ঢুকে প্রায়ান্ধকার স্টুডিয়োটাকে একটু অনুভব করার চেষ্টা করল। এ ঘর কেউ ব্যবহার করে না। ধুলো ময়লা এবং বদ্ধ বাতাসের অস্বাস্থ্যকর গন্ধ জমে আছে।

সর্বজিৎ পর্দা সরিয়ে বড় বড় জানালাগুলো খুলে দিল। বাইরের আকাশে বর্ষার মেঘ থম ধরে আছে। দ্রুত ঘনিয়ে আসছে অকাল-সন্ধ্যা।

সর্বজিৎ ঝাড়ন দিয়ে একটা চেয়ার ঝেড়ে নিয়ে একটু বসল পাখার নীচে। ক্লান্ত লাগছে। যশিডি থেকে মাত্র ছয় ঘণ্টার ট্রেন জার্নি। পরিশ্রম যে খুব বেশি হয়েছে তা নয়। তবু ক্লান্ত লাগছে বোধহয় মানসিক অবসাদে, তিক্ততায়।

খানিকটা বিশ্রাম করে সে উঠল। তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল।

ফ্ল্যাটে মাত্র দুটোই ঘর। ভিতরের ঘরটা বড়। এটাই তার স্টুডিয়ো কাম বেডরুম। বেড বলতে অবশ্য বেতের তৈরি একটা সরু ডিভান গোছের। তার ওপর তোষক। ঘরময় তার আঁকার সরঞ্জাম, ক্যানভাস ইত্যাদি রয়েছে। আধখাচড়া কিছু ছবিও জমে আছে এখানে।

কলকাতা তার আজকাল ভাল লাগে না। রিখিয়া কি বেশি ভাল লাগে? তাও না। তবু ওখানে অন্তত শব্দহীনতা আছে। লোকহীনতা আছে। অনবরত মানসিক সংঘর্ষহীনতা আছে। অপেক্ষাকৃত ভাল।

ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় সে ঘরদোর বাসযোগ্য করে তুলল তারপর চা বানিয়ে খেল। স্নান করল। একটু শুয়ে রইল চুপচাপ। আর শুয়েই বুঝতে পারল তার মাথাটা গরম হয়ে আছে। মনটা অস্থির।

একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ টেলিফোনের অচেনা শব্দে চমকে চটকা ভেঙে উঠে বসল সে। বুকটা ধড়ফড় করছে। বহুকাল যন্ত্রটার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই।

বলুন।

মিস্টার সরকার বলছেন কি?

হ্যাঁ।

আমি জয়কুমার শেঠ। চিনতে পারছেন তো?

হ্যাঁ, বলো।

উই আর বিয়িং হাউন্ডেড অ্যারাউন্ড বাই সাম পিপল। কিন্তু সাহাব, আমাদের তো কোনও কসুর নেই।

কসুর নেই?

না সাহাব। আমরা আপনার প্যাকেজিং-এর মধ্যেই আন-মাউন্টেড ছবিগুলো পেয়ে যাই। আমরা আপনার সঙ্গে কখনও এরকম করতে পারি কি? পুলিশ বলছে ছবিগুলো একদম জালি। সাবস্টিটিউশন।

আমি যে আজ কলকাতায় আসব কে বলল?

মিস্টার দাশগুপ্ত বলেছিলেন। আপনি না এলে আমি দু-একদিনের মধ্যে রিখিয়ায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। পিতাজি আমেরিকায়, উই আর ইন ট্রাবল।

ছবিগুলো আমার আঁকা নয়, জয়। তোমরা ছবিগুলো কোথায় রেখেছিলে?

ছবি কস্টলি জিনিস সাহাব। আমরা সব ছবি রাখি আমাদের বাড়ির স্টোরে। এসি ঘর আছে।

সিকিউরিটির ব্যবস্থা কী?

স্টোর রুমের জন্য সেপারেট সিকিউরিটি নেই। তবে আমাদের বাড়িতে চারজন রিলায়েবল দারোয়ান আছে। সুইচ অর সাবস্টিটিউশন ইজ ইমপসিবল স্যার।

নাথিং ইজ ইমপসিবল। ইমপসিবল হলে ঘটনাটা ঘটল কীভাবে?

উই আর অ্যাট এ লস।

সিংঘানিয়াকে তোমরা এই ছবিগুলিই বিক্রি করেছিলে?

হ্যাঁ সাহাব। উই হ্যাভ আওয়ার রেকর্ড। সিংঘানিয়া আপনার ছবিই বেশি কেনে। এ সাউন্ড বায়ার। পেমেন্টও প্রোন্টো।

ছবিগুলো নিয়ে সিংঘানিয়া কী করেন?

উনি ফরেনে বিক্রি করেন। হি হ্যাজ গুড কানেকশনস।

তোমরা ছবিগুলো ফেরত নিতে পারবে না?

উনি নারাজ আছেন। হি ইজ এ রেসপেক্টেবল ম্যান। ওঁর দাদা এমপি।

সেটা জেনে কোনও লাভ নেই। উনি যদি আমার ছবি বলে ওগুলো বেচেন তা হলে আমি ওঁর বিরুদ্ধে কেস করব।

স্যার, প্লিজ অ্যাডভাইস আস। আমরা কী করব? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। আপনি কেস করলে আমরাও ফেঁসে যাব।

আমি আগে ছবিগুলো দেখতে চাই। ফটোগ্রাফ দেখেছি। কিন্তু ছবিগুলোও দেখা দরকার।

সেটা অ্যারেঞ্জ করা যাবে। তবে সিংঘানিয়া পুলিশের সামনে ছাড়া দেখাবে না।

ওর কি ধারণা আমি ছবিগুলো নষ্ট করার চেষ্টা করব?

মে বি। হি ইজ এ স্টাবোর্ন ম্যান। আপনি কবে প্রেস কনফারেন্স ডাকছেন স্যার?

কাল।

উই উইল বি দেয়ার। মিস্টার সিংঘানিয়াও যাবেন।

আমি আজই ছবিগুলো দেখতে চাই যদি?

মিস্টার সিংঘানিয়া হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে আছেন। আপনি চাইলে ফোন করতে পারেন। ফোন নম্বর আর স্যুইট নম্বরটা নোট করে নিন স্যার।

সর্বজিৎ নোট করে নিয়ে বলল, তোমরা আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছ?

হ্যাঁ স্যার। ম্যাডাম তো আমাদের ওপর ভীষণ রেগে আছেন।

থাকারই কথা। তোমরা যে কী কাণ্ড করলে?

অন গড স্যার, দিস ইজ নো ফল্ট অব আওয়ারস। ডোন্ট প্লিজ বি ক্রসড উইথ আস।

সর্বজিৎ ফোন রাখল। তারপর সিংঘানিয়াকে রিং করল।

মিস্টার সিংঘানিয়া?

স্পিকিং।

দিস ইজ সর্বজিৎ সরকার।

গুড ইভনিং স্যার। আপনি আসবেন খবর ছিল। আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং টু সি ইউ।

আপনি কি জানেন যে আপনি নকল ছবি কিনেছেন?

ইন দ্যাট কেস স্যু ইয়োর এজেন্ট।

তার চেয়ে আপনি একটি কাজ করুন। ছবিগুলো ফেরত দিন। টাকা আমরা দিয়ে দিচ্ছি।

স্যার, ছবিগুলো এখন দারুণ কন্ট্রোভারসিয়াল। কলকাতার পেপার্স যা লিখেছে তা লিখেছে। এখন দিল্লি, বোম্বে আর মাদ্রাজের কাগজেও ইট হ্যাজ বিকাম এ হট ইস্যু। অ্যান্ড বিকজ অফ দি কন্ট্রোভার্সি দি প্রাইস হ্যাজ শট আপ আনইউজুয়ালি।

আপনি কী বলতে চাইছেন মিস্টার সিংঘানিয়া?

আই অ্যাম এ বিজনেসম্যান।

ইউ ওয়ান্ট হাই প্রাইস? কত?

ফাইভ লাকস পার পেইন্টিং।

মাই গড!

আমি অলরেডি চার লাখের অফার পেয়ে গেছি। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর এ হায়ার প্রাইস।

সিংঘানিয়া, আপনি সাবস্টিটিউট ছবির কারবার করলে যে মুশকিলে পড়বেন।

স্যার, আমার ওদিকটা কভার করা আছে। আই অ্যাম নট অ্যাফ্রেড অফ ল। আই অ্যাম ডুয়িং নাথিং ইল্লিগ্যাল।

আপনি কি জানেন যে, এর ফলে আমার পরিবারের মুখ দেখানোর উপায় নেই।

জানি স্যার। রিগ্রেট ফর দ্যাট। কিন্তু আমার কী করার আছে বলুন?

কিছু করার নেই? অ্যাজ এ হিউম্যান বিয়িং?

সেন্টিমেন্ট ইজ অ্যানাদার থিং স্যার। বাট দি ড্যামেজ ডান ওয়াজ নট ইন্টেনশনাল। ছবিগুলো আপনি কিনতে চান, ভাল। আপনার সেন্টিমেন্টকে অনার দিতে আই শ্যাল সেল। বাট প্রাইস উইল বি ফাইভ।

ঠিক আছে, এরপর যা করার পুলিশ করবে।

রাগ করলেন মিস্টার সরকার? আমি আপনার সবচেয়ে বড় বায়ার। আমার স্টকে এখনও আপনার ত্রিশটা ছবি আছে। ইট ইজ এ বিগ নাম্বার।

আপনার মতো বায়ার আমার দরকার নেই।

রাগ করছেন কেন স্যার? ভাল করে কুল ব্রেনে ভেবে দেখুন। আই অ্যাম নট রেসপনসিবল। সাবস্টিটিউশন তো আমি করিনি। আপনি আজকের পেপার দেখেছেন?

না।

দেখুন। দুটো পেপারে ইন্টারেস্টিং ইন্টারভিউ আছে।

কার ইন্টারভিউ?

বান্টু সিং; আর ডেভিড।

তারা কারা?

পড়ে দেখুন স্যার। কাল আপনার প্রেস কনফারেন্সে আমি যাব। দেয়ার উইল বি হিটেড এক্সচেঞ্জেস।

আপনি কী করে জানলেন?

ক্রিটিকরা মানছেন না যে ছবিগুলো সাবস্টিটিউশন। ইউ হ্যাভ টু ফেস সাম ভেরি আনকমফোর্টেবল কোশ্চেনস।

ঠিক আছে। সেটা আমি বুঝব।

বাই দেন স্যার।

সর্বজিৎ ঠাস করে ফোন নামিয়ে রাখল।

সর্বজিৎ বেরিয়ে গড়িয়াহাট থেকে বেছে বেছে কাগজ দুটো কিনে আনল।

বাড়িতে এসে কাগজ দুটো খুলে যা পড়ল এবং দেখল তাতে তার মাথা আরও গরম হল। বান্টু সিং একজন শিখ। দাড়ি গোঁফ পাগড়ি আছে। ডেভিড দেখতে বেশ সুন্দর। দু'জনেই খুবই কম বয়সি।

বান্টুকে একজন আর্ট ক্রিটিক নিনার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করেছে। অত্যন্ত অশ্লীলতা ঘেঁষা প্রশ্ন। বান্টু তার জবাবে বলেছে, ইয়েস। ইট হ্যাপেনস

সামটাইমস।

বিয়ে করবে কিনা প্রশ্ন করা হলে বান্টু বলেছে, বিয়ে ইজ এ মিউঁচুয়াল ডিসিশন। নিনা অ্যান্ড আই আর নট ইন লাভ। বাট উই এনজয় লাইফ টুগেদার।

ডেভিডের জবাবও তাই। একটু হেরফের আছে মাত্র।

একটা পরিবারকে কতখানি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এমন বে-আবরু করে দেওয়া যায় তা দেখে অবাক হল সর্বজিৎ। মনটা বিরক্তি ও রাগে ভরে গেল।

ছবিগুলো দেখতে যাওয়ার আর প্রবৃত্তি রইল না তার। সে শুয়ে রইল।

শবর ফোন করল রাতে।

এসে গেছেন তা হলে?

হ্যাঁ শবর।

কাল প্রেস ক্লাবে আপনার প্রেস কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। খুব ভিড় হবে কিন্তু।

জানি। তুমি কাগজ দুটো দেখেছ?

ওঃ হ্যাঁ। বান্টু আর ডেভিড তো?

হ্যাঁ।

সমাজটা কোথায় যাচ্ছে শবর?

আস্ক ইয়োর ডটার্স। শুধু ছেলে দুটোকে দোষ দিয়ে কী লাভ?

একটা থাপ্পড় খেয়ে যেন কুঁকড়ে গেল সর্বজিৎ। তারপর অনুতপ্ত গলায় বলল, তাই তো শবর।

মাথা ঠান্ডা রাখুন। অনেক চোখা প্রশ্ন উঠবে। এখন থেকে তৈরি থাকুন।

আই শ্যাল টেল দি ট্রুথ।

ঠিক আছে।

আমার বাড়ির খবর কী?

কাল ফিরেই আমি ইরাদেবীর সঙ্গে দেখা করি।

আমি যে আসছি বলেছ নাকি?

না। তবে উনি জেনে গেছেন।

কিছু বলল?

না। খুব গম্ভীর।

ঠিক আছে শবর।

একটা কথা দাদা।

বলো।

আপনার ছেলেটা ছোট। বোধহয় ন’-দশ বছর বয়স।

হ্যাঁ।

আপনি বলেছেন গত দশ বছরে আপনার সঙ্গে ইরাদেবীর সম্পর্ক হয়নি। এটা কেমন করে হয়?

এ প্রশ্নের জবাব কি জরুরি?

না। তবে জানতে চাইছি বছর দশেক আগে আপনারা হঠাৎ রিকনসাইল করেছিলেন কিনা।

না, করিনি।

আপনার কাকে সন্দেহ?

এনিবডি।

সুধাময় ঘোষ?

হতেই পারে।

ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড টু নো?

না। আমার ইন্টারেস্ট নেই।

আপনি ছেলেটার পিতৃত্ব স্বীকার করেছেন কি? মানে কাগজে কলমে? ইস্কুলের খাতায় ওর বাবার নাম কিন্তু সর্বজিৎ সরকার।

হ্যাঁ। ওটা নিয়ে গণ্ডগোল করিনি। কমপ্লিকেশন বাড়িয়ে কী লাভ?

ঠিক কথা। ও কে দাদা।

শোনো শবর, এসব নিয়েও প্রশ্ন উঠবে নাকি?

উঠতে পারে। আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন?

ঠিক তা নয়। আবার এসব প্রশ্নের টুথফুল জবাব দিলে ফের একটা হইচই হবে। আমার স্ত্রী বা পরিবারের আর হেনস্থা আমি চাইছি না। আই অ্যাম নট এনজয়িং ইট এনিমোর।

তার মানে কি আগে এনজয় করতেন?

তোমাকে সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, করতাম। আজ থেকে পাঁচ-সাত বছর আগে আমার স্ত্রী অপমানিত হলে আমি বোধহয় খুশিই হতাম। কিন্তু ওই মনোভাব এখন আমার নেই। রিখিয়ায় চলে যাওয়ার পর থেকে আমার একটা বৈরাগ্যই এসেছে বোধহয়।

আপনি আজ কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

না। দরকার কী? উনি রেগে আছেন, হয়তো অপমান করবেন।

তা ঠিক।

শবর, আমার মেয়েরা এরকম ছিল না। দেওয়ার কোয়াইট গুড ইন দেয়ার আর্লি ইয়ারস।

হুঁ।

এত তাড়াতাড়ি ওরা এরকম হয়ে গেল কেন?

কীরকম?

মর‍্যাল করাপশনের কথা বলছি।

কিছু মনে করবেন না, ওদের তো ওভাবে শেখানো হয়নি, তৈরিও করা হয়নি।

ইটস এ বিট শকিং। আমি নিজে খুব ফ্রি জীবন যাপন করি না ঠিকই, কিন্তু আমি তো অতটা ভেসেও যাইনি।

হয়তো ইরাদেবী ওদের সেই শিক্ষাটা দিয়েছেন। যাকগে, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

মাথা ঘামাচ্ছি না। বড্ড শন্ড লাগছে।

মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

চেষ্টা করব।

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর সর্বজিৎ টের পেল তার বেশ খিদে পেয়েছে। হুইস্কি তার স্টকে আছে বটে, কিন্তু সেটা তার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং কিছু খেলে হয়।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে, ঘরে খাদ্যবস্তু কিছুই নেই। রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য আছে। ইলেকট্রিক হিটার, হটপ্লেট ইত্যাদি এবং কিছু বাসনপত্রও। খুঁজলে চাল ডাল কি পাওয়া যাবে?

সর্বজিৎ উঠে রান্নাঘরটা দেখল। চাল পাওয়া গেল একটা বড় স্টেনলেস স্টিলের কৌটোয়। ডালও দেখা গেল আছে। তবে আর কিছুই তেমন নেই। সবচেয়ে ভাল হত বাইরে গিয়ে কোনও রেস্তোরাঁয় খেয়ে এলে। কিন্তু বৃষ্টি না ধরলে সেটা সম্ভব নয়। আর রান্না করতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। তার বেশ ঘুমও পাচ্ছে।

অগত্যা সে জল খেল এবং হুইস্কির বোতল খুলে বসল। আর কিছু না হোক, হুইস্কিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অস্বাস্থ্যকরভাবে ডুবিয়ে দেওয়া যায়।

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ফোনটা বাজল।

একটা পুরুষ গলা গমগম করে উঠল, সর্বজিৎ সরকার আছে?

বলছি।

শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে, তোকে কী করব জানিস? তোর ডান হাত কেটে নিয়ে কুত্তাকে খাওয়াব, তারপর তোর...

সর্বজিতের সামান্য নেশা হয়েছিল। সেটা অশ্লীল গালাগালের তোড়ে কেটে যাওয়ার জোগাড়। সে টেলিফোনটা রেখে দিল। অভিজ্ঞতাটা কিছু নতুন। তবে এরকম হতেই পারে। লোকটা হয়তো ইরার পক্ষের।

হুইস্কিটা তাকে খুব একটা হেল্প করছে না। খিদেটা মারার চেষ্টা ব্যর্থই হয়েছে। ভেসে উঠতে চাইছে অম্বল আর গ্যাস।

সর্বজিৎ হঠাৎ খেয়াল করল, বৃষ্টি থেমেছে। সে দুর্বল শরীরে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে কাছেই একটা ধাবায় গিয়ে হাজির হল। বহুকাল সে রেস্টুরেন্টে খায়নি। কেমন লাগবে কে জানে?

কিন্তু রুটি, তরকা এবং মাংসের চাপ শেষ অবধি তার খারাপ লাগল না। বরং পেট ভরে বেশ তৃপ্তি করেই খেল সে। ফিরে এসে ঘুমোল।

সকালবেলাটা বেশ লাগল তার। মেঘ ভেঙে চমৎকার রোদ উঠেছে। চারদিকটা ঝলমল করছে। এসব সকালে ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে।

কলকাতায় খুব বেশিদিন থাকবে না সে। আজ প্রেস কনফারেন্সটা হলে কাল বা পরশুই রিখিয়ায় ফিরে যাবে। ঘটনাটা যা ঘটেছে তার সমাধান সহজ নয় বলেই তার মনে হচ্ছিল। সবাইকে বিশ্বাস করানো যাবে না যে, ছবিগুলো সে আঁকেনি।

সর্বজিৎ ফাঁড়ি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে একটা দোকানে চা খেল। গরম শিঙাড়া আর টাটকা জিলিপি খেল বহুদিন বাদে। দুপুরে ফের রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবে। ফিরে এসে সে একটা ক্যানভাস বিছিয়ে ছবি আঁকতে বসে গেল। অন্তত এই একটা ব্যাপারে ডুবে যেতে বেশি সময় লাগে না।

সর্বজিৎ একটা সময়ে টের পেল, সে একটা অদ্ভুত কিছু আঁকছে। প্যাটার্নটা এলোমেলো এবং হরেক রকমের চড়া রঙের ডট আর ড্যাশ। কিন্তু ছবির মাঝখান থেকে চারদিকে একটা বিকেন্দ্রিক প্রচণ্ড গতিময় শক্তির প্রকাশ ঘটছে। এটা কি তার এখনকার মনের অবস্থারই প্রতিফলন? নাকি শুধুই একটা খেয়ালখুশি? দরকার কি অত ভেবে? ছবিটা আঁকতে তো তার ভালই লাগছে।

মাঝে মাঝে এরকম আবোল তাবোল আঁকতে আঁকতে ছবিটা যেন হঠাৎ জীয়ন্ত হয়ে ওঠে এবং নিজেই নিজের সম্পূর্ণতার দিকে এগোয়। ছবিটা তখন আঁকিয়ের ওপর প্রভুত্ব করতে থাকে। আজ সর্বজিতের সেরকমই ভূতগ্রস্তের মতো অবস্থা। সে পাগলের মতো এঁকে যাচ্ছে। ডট-ড্যাশ, ডট-ড্যাশ…

ফোনটা এল বেলা বারোটা নাগাদ। চমকে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সর্বজিৎ। বিরক্তির সীমাপরিসীমা থাকে না এ সময়ে কেউ বিরক্ত করলে।

তবু উঠে ফোনটা ধরল সে।

আমি শবর বলছি। কী করছেন?

আঁকছিলাম।

বিকেল পাঁচটায় প্রেস কনফারেন্স, মনে আছে?

আছে। যাব।

জয় শেঠ আপনার জন্য গাড়ি পাঠাবে।

ওকে।

কী আঁকছেন?

আবোল তাবোল।

আঁকুন।

ফোন ছেড়ে দিল শবর।

দ্বিতীয় ফোনটা এল আধ ঘণ্টা বাদে। সর্বজিৎ কয়েকটা জায়গা একটু পরিবর্তন করছিল ছবিটার।

কে?

শুনলাম তুমি নাকি বিলুর বাবা নও?

সর্বজিৎ কিছুক্ষণ কে বিলু তা বুঝতেই পারল না, এমনকী নিজের স্ত্রীর কণ্ঠস্বরটাও নয়। একটু সময় লাগল বুঝতে। তারপর বলল, এসব কথা উঠছে কেন?

উঠছে তুমি বলে বেড়াচ্ছ বলেই।

বলে বেড়াচ্ছি না। তদন্তের জেরায় পুলিশকে বলেছি।

কী বলেছ? বিল্টু জারজ?

তা ছাড়া আর কী?

ইরার গলা হঠাৎ ফেটে পড়ল ফোনে, তোমার মুখ কেন খসে পড়ছে না বলো তো? কেন তুমি গলায় দড়ি দাও না? নিজের বউ মেয়েদের ন্যাংটো ছবি এঁকে বাজারে ছেড়েছ, নিজের ছেলের পিতৃত্ব অস্বীকার করে আমাকে চরিত্রহীন প্রমাণ করেছ, তোমার মতো নরকের কীট পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমি মিথ্যে কথা বলিনি।

বলোনি? বলোনি? আজ থেকে দশ বছর আগে কী হয়েছিল তা তোমার মনে না থাকলেও আমার আছে।

কী মনে আছে?

সে কথা আজ উচ্চারণ করতে ঘেন্না করে। আই ওয়ান্ট ইউ ডেড।

সেটা আমি জানি।

হয় তুমি মরবে, নয়তো আমি। তুমি যে বাতাসে শ্বাস নাও সে বাতাসে শ্বাস নেওয়াও আমার পক্ষে পাপ বলে মনে হয়। বাস্টার্ড! ইউ বাস্টার্ড!

ওসব ছবি আমি আঁকিনি, কে এঁকেছে জানি না। সেই কথাটা পাবলিককে জানাতেই আমার কলকাতায় আসা।

সারাটা জীবন তোমার অনেক ন্যাকামি দেখেছি। তোমার মতো জঘন্য মিথ্যেবাদীও দুটি নেই। এখন নিজের চামড়া বাঁচাতে মিথ্যে কথা তো তুমি বলবেই। কিন্তু তাতে আমাদের আর কী লাভ? আমাদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেছে।

ক্ষতি হয়েছে স্বীকার করছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারো ক্ষতিটা আমি করিনি। আরও একটা কথা, এসব ছবি কি আমার গৌরব বাড়িয়েছে? বরং লোকে তো ছিঃ ছিঃ করছে।

তুমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেছ। তোমার মতো নীচ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঠিক আছে, তুমি যা খুশি কল্পনা করে নিতে পারো।

কল্পনা? তোমার মতো বেজন্মাই ওকথা বলতে পারে। যারা ছবি বোঝে, জানে, তারাই বলেছে এসব ছবি তোমারই আঁকা, এত পাপ আর বিকৃতি সর্বজিৎ সরকার ছাড়া আর কার চরিত্রে থাকবে?

ঠিক আছে। আর কিছু বলবে?

তোমার লেটেস্ট জঘন্য কাজ হল শবরের কাছে বিন্দুর পিতৃত্ব অস্বীকার করা। জিজ্ঞেস করি তোমার কি মানুষের চামড়া নেই শরীরে?

জিজ্ঞেস করাটা বাহুল্য, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি তাতে পালটাবে?

না, পালটাবে না। কিন্তু বিন্দু বড় হচ্ছে। তার কানে যখন একথা যাবে যে, তুমি তার বাবা নও বলে প্রচার করছ তখন তার কী ধারণা হবে এবং সে কীভাবে সুস্থ জীবন যাপন করবে?

তা বলে যা সত্যি তা কি ঢেকে রাখতে পারি?

কোনটা সত্যি? তোমার পক্ষে কোনও গালাগালই যথেষ্ট নয়। কাজেই তোমাকে আর গালাগাল দিয়ে লাভ নেই। শুধু বলি, তোমার সত্যের চেহারাটা কীরকম তা কি তুমি নিজেও জানো না? দুনিয়াকে যা খুশি বোঝাও, কিন্তু তোমার নিজের কাছেও কি তুমি মিথ্যে? কীসের ওপর ভর দিয়ে বেঁচে আছ তুমি?

তুমি এখন উত্তেজিত, আমার কথা বুঝতে বা শুনতে চাইবে না। কিন্তু যদি শুনতে তা হলে আমারও কিছু বলার মতো কথা ছিল।

সে তো মিথ্যে কথা। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা।

একটা মানুষ সব কথাই মিথ্যে বলতে পারে কি? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যেবাদীও পারে না।

ঠিক আছে, তোমার অজুহাত আমি শুনব, বলো।

মাথা ঠান্ডা করে শোনো। প্রথম কথা সুধাময়ের সঙ্গে তোমার কোনও রিলেশন আছে। কি না তা আমার জানা নেই। যদি তোমাকে কলঙ্কিতই করতে চাই তা হলেও তোমার সঙ্গে সুধাময়কে জড়াব এমন নির্বোধ আমি নই। কারণ, সুধাময় এখনও আমার খুব ভাল বন্ধু এবং সে আমার সাহায্যকারী। তোমাকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু সুধাময়কে নয়। সুধাময়কে পাবলিকলি অপমান করলে আমি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারাব।

সেটা জেনে বুঝেই তো তুমি কাদায় নেমেছ।

না, নামিনি। তোমাকে বে-আবরু করার ইচ্ছে থাকলে অন্য কারও সঙ্গে তোমাকে জড়াতে পারতাম। কিন্তু এসব আমার মাথায় আসেনি। এ কাজ আমার নয়, আরও প্রমাণ আছে।

কী প্রমাণ?

গত দু' বছরের মধ্যে আমি একবারও রিখিয়ার বাইরে কোথাও যাইনি। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো, গত দু' বছর আমি একবারও কলকাতায় আসিনি।

তাতে কী প্রমাণ হয়?

তাতে প্রমাণ নয়, অপ্রমাণ হয়।

তার মানে কী?

আমি বান্টু সিং বা ডেভিডকে চিনি না। তাদের কখনও দেখিনি। তাদের নামও জানতাম না। অচেনা, অজানা দুটো ছেলের রিয়ালিস্টিক পোট্রেট তো কল্পনা থেকে আঁকা যায় না।

তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি মেয়েদের পিছনে কাউকে লাগিয়েছ।

না ইরা, ইচ্ছে করলে তুমি শবরকে দিয়ে খোঁজ করাও। সে পুলিশের গোয়েন্দা। গত দু'বছর আমার গতিবিধি সম্পর্কে তদন্ত করে সে তোমাকে সঠিক তথ্য দেবে। আমার কিছুই লুকোনোর নেই।

আমি বিশ্বাস করছি না।

তুমি যে আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করবে না তা জানি। বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করবেই বা কেন? রিখিয়ার স্থানীয় মানুষজন আমাকে রোজই দেখে। আমার কাজের লোক, দুধওয়ালা, প্রতিবেশী সকলেই সাক্ষী দেবে। গত দু'বছর আমি তোমাদের কোনও খবরই রাখিনি। কী করে জানব মেয়েরা কার সঙ্গে মিশছে?

ঠিক আছে, খবর নেব। কিন্তু তাতেও যে তোমার ষড়যন্ত্র ধরতে পারব তা মনে হয় না। তুমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলে। তুমি সব করতে পারো।

তবু খবর নাও। ঘটনাটা কী তা বুঝতে সময় লাগবে। চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেয়ো না।

ইরা ফোন ছাড়ল।

রিখিয়ার জলে গ্যাস বা অম্বল বিশেষ হয় না। কিন্তু কলকাতার জলে হয়। সকালের জিলিপি আর শিঙাড়ায় এখন বেশ অম্বল টের পাচ্ছে সর্বজিৎ। অস্বস্তি হচ্ছে। সে দুটো অ্যান্টাসিড খেয়ে নিল।

ছবিটা নিয়ে ফের বসল সে এবং টের পেল, ছবিটা শেষ করার তাগিদ আর ভিতরে নেই। সে নিবে গেছে। কিন্তু ছবিটা হচ্ছিল খুব ভাল।

সে ছবিটার সামনে চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ।

আবার ফোন এল।

শুয়োরের বাচ্চা, খানকির বাচ্চা, তোর…

ফোনটা নামিয়ে রাখল সে। উত্তেজিত হল না। লাভ কী?

এসব গালাগাল তার জন্য প্রেস ক্লাবেও অপেক্ষা করছিল। বিকেল পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে জয় শেঠের সঙ্গে সে যখন পৌঁছোল তখন ভিড়ে ভিড়াক্কার প্রেস ক্লাবের পিছনের হলঘরটায় ঢোকাই যাচ্ছিল না। ঠেলেঠুলে যখন শবর তাকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে তখনই ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন গালাগালগুলো দিতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একজন মারমুখো চেহারার কর্মকর্তা মাইক টেনে নিয়ে গর্জন করে উঠলেন, খবরদার! কোনও খারাপ কথা বললে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। অ্যাই রথীন, দেখো তো কে কথাগুলো বলল। ধরে নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল চুপ করে গেল। গালাগালকারীকে অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেল না।

আজকের কনফারেন্সে মধ্যস্থ হিসেবে প্রবীণ শিল্পী মনুজেন্দ্র সেনকেও হাজির করা হয়েছে। সর্বজিতের পাশেই বসা। বললেন, কেমন আছ সর্বজিৎ?

ভাল থাকার কি কথা দাদা?

হ্যাঁ, কী যে সব হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

আমিও পারছি না।

প্রেস কনফারেন্সের শুরুতে সেই মারমুখো কর্মকর্তা একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে বললেন, সর্বজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে তিনি তার জবাব দিতে এসেছেন। মনে রাখবেন এটা প্রেস কনফারেন্স। কোনওরকম চেঁচামেচি বা গালাগাল বরদাস্ত করা হবে না। পরিবেশের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় আশাকরি আপনারা তার দিকে লক্ষ রাখবেন।

কর্মকর্তাটি কে তা বুঝতে পারল না সর্বজিৎ। তার সন্দেহ হল, লোকটি পুলিশের কেউ হতে পারে।

প্রথমেই সর্বজিৎকে কিছু বলতে বলা হল। তারপর প্রশ্ন। সর্বজিৎ শরীরটা ভাল বোধ করছে না। অম্বলটা তীব্রতর হয়েছে। মানসিক ভারসাম্যও যেন থাকছে না। অস্বাভাবিক একটা ঝিমঝিম ভাব মাথাটা দখল করে আছে।

সর্বজিৎ খুব শান্ত গলায় বলল, যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমাকে দায়ী করা হচ্ছে। আমি কলকাতা থেকে অনেক দুরে থাকি। খবরটবর বিশেষ পাই না। অনেক দেরিতে আমি জানতে পেরেছি যে, আমার পরিবারকে হেয় এবং আমাকে অপদস্থ করার জন্য কেউ কতগুলো বিচ্ছিরি ছবি এঁকেছে এবং তা কলকাতায় দেখানোও হয়েছে। আমি সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই এগুলো কোনও অসৎ ও পাজি লোকের কাজ। ছবিগুলো আমার আঁকা নয়, আঁকার প্রশ্নই ওঠে না। আশাকরি পুলিশ এ বিষয়ে সঠিক তদন্ত করে কালপ্রিটকে খুঁজে বের করবে।

বিখ্যাত এক ইংরিজি দৈনিকের সাংবাদিক প্রশ্ন করল, আপনার আঁকা নয় সে তো বুঝলাম, কিন্তু দি পেইন্টার মাস্ট বি এ ক্লোজ পারসন অফ ইয়োর ফ্যামিলি। সো ইউ মাস্ট নো হিম।

না, আমি জানি না।

একজন তরুণ সাংবাদিক বলে উঠল, বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ ছবির স্টাইল অবিকল আপনার মতো।

তা হতেই পারে। লোকটা হয়তো ভাল নকলনবিশ।

আপনার কি নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে ফিউড আছে?

না। থাকলেও সেটা পারিবারিক ব্যাপার।

আর একজন সাংবাদিক বলল, পারিবারিক ব্যাপারকে তা হলে পাবলিক করলেন কেন?

আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? ছবিগুলো আমার আঁকা নয়। আমি গত দু'বছর কলকাতায় আসিনি।

তাতে কী প্রমাণ হয়?

ছবিতে যে দুটি ছেলের চেহারা আপনারা দেখছেন তাদের আমি কখনও দেখিনি।

ওটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হল না।

পরে একজন বলল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ঝগড়া আছে বলে শোনা যাচ্ছে। ঝগড়াটা পুরননা। আপনার স্ত্রীর ধারণা আপনি তাকে পাবলিকলি অপমান করার জন্যই ছবিগুলো এঁকেছেন।

না। আমি এত নীচ নই।

এবার হঠাৎ কর্মকর্তাদের একজন বলে উঠল, নববাবু, আপনি কিছু বলবেন?

নব দাস উঠে দাঁড়াল। সেই নব দাস, যাকে একবার রেগে গিয়ে মেরেছিল সর্বজিৎ। নবর চুলে একটু পাক ধরেছে, শরীরে জমেছে একটু চর্বি। আর সব ঠিকই আছে।

নব দাস অনুত্তেজিত গলায় বলল, সর্বজিৎ সরকার বলছেন যে, ছবিগুলো ওঁর আঁকা নয়। এটা প্রমাণ করার খুব সহজ উপায় আছে। পুলিশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা যদি সাহায্য করে তবে সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। আর্টিস্টকে

তার পেইন্টিং হ্যান্ডেল করতেই হয়। আমার ধারণা অয়েলে আঁকা ছবির জমিতে কোনও না কোনওভাবে আর্টিস্টের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবেই। ওইসব জঘন্য ছবিতে সর্বজিৎ সরকারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজে দেখা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সমবেত গুঞ্জনধ্বনি উঠল ঘরের মধ্যে।

নব দাস বলল, সর্বজিৎ সরকার কি রাজি?

হ্যাঁ, রাজি।

তা হলে আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে তারা ছবিগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করান।

নব দাস বসে পড়ল।

একজন অবাঙালি সাংবাদিক ভাঙা বাংলায় বলল, আই অ্যাম হিয়ার টু কনগ্র্যাচুলেট ইউ মিস্টার সরকার। আই থট ইউ হ্যাভ শোন গ্রেট কারেজ ইন দোজ পেইন্টিংস। বাট ইফ দোজ

আর সাবস্টিটিউটস দেন দ্যাট ইজ অ্যানাদার ম্যাটার।

সর্বজিৎ মৃদু হেসে বলল, আই অ্যাম নট দ্যাট কারেজিয়াস।

ওকে স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।

আরও একজন হিন্দি সাংবাদিক উঠে ভাঙা বাংলায় বলল, স্যার, আপনার কি মনে হয় নিজের ফ্যামিলির ন্যুড আঁকা খারাপ কাজ?

আমি ওসব জানি না।

আর ইউ এ মর্যালিস্ট?

তাও বলতে পারি না।

আর্টিস্টদের কি মর‌্যাল থাকা উচিত?

কেন নয়?

আমরা তো মনে করি আর্টিস্টদের কোনও সংস্কার থাকবে না।

এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।

আপনি সমর্থন করেন না?

হয়তো সব সংস্কার মানি না। কিন্তু কিছু ভ্যালুজ তো মানতে হয়।

আর্টের ভ্যালুজ কি আলাদা নয়?

আমি অত কথা বলতে পারব না।

আমি তো মনে করি ইউ হ্যাভ ডান এ কারেজিয়াস থিং। ইন ফ্যাক্ট আই কেম হিয়ার ফ্রম দিল্লি জাস্ট টু শেক ইয়োর হ্যান্ডস।

এবার একজন বাঙালি সাংবাদিক পিছন থেকে বলল, আপনি ভয় পেয়ে সবকিছু অস্বীকার করছেন না তো?

না। ভয় কীসের?

মিস্টার সিংঘানিয়া কিন্তু আপনার এজেন্টের কাছ থেকেই ছবিগুলো কিনেছেন। আপনার এজেন্টও বলছে, ছবিগুলো তারা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের একটা কথা উঠেছে বটে, কিন্তু সেটা খুব নির্ভরযোগ্য অজুহাত নয়। একজন আর্টিস্ট দূরদর্শী হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাতে ছবিতে না ওঠে তার ব্যবস্থা করে রাখবে।

সর্বজিৎ অসহায়ভাবে বলল, এর চেয়ে বেশি আমার আর কিছু করার নেই।

আপনার স্ত্রী বা মেয়েরা প্রেস কনফারেন্সে এলেন না কেন?

তারা কেন আসবে?

আমরা তাদের বক্তব্য শুনতে চাই।

আপনারা তাদের অ্যাপ্রোচ করে দেখতে পারেন।

ওকে। আমরা মিস্টার সিংঘানিয়া আর জয় শেঠকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

রিপোর্টারদের ভিড়ের মধ্যেই মোটাসোটা, ফরসা, আহ্লাদি চেহারার সিংঘানিয়া বসে ছিল। উঠে এল মাইকের সামনে। হাতজোড় করে বলল, আমি কোনও ভিআইপি নই। সামান্য ব্যবসায়ী। আমার কয়েকটা কারবার আছে। আর্টও একটা। গুড মার্কেট, গুড মানি। কোনও দু'নম্বরি ব্যাপার নেই। ক্লিন পারচেজ।

সেই বাঙালি ঠান্ডা-মাথার রিপোর্টার প্রশ্ন করল, মেনি ফেসেস অফ ইভ সিরিজের ছবিগুলি আপনি কবে কিনেছেন এবং কার কাছ থেকে?

এভরিবডি নোজ। দেড় বছর আগে মিস্টার শেঠের কাছ থেকে কিনি।

আপনি সর্বজিৎ সরকারের অনেক ছবি কিনেছেন কি?

হ্যাঁ। মিস্টার সরকারের বাজার ভাল।

আপনি তার ছবি দেখেই বলে দিতে পারবেন যে সেটা মিস্টার সরকারের আঁকা?

নিশ্চয়ই পারব।

ইভ সিরিজ সম্পর্কে বলতে পারবেন?

পারব। ছবি মিস্টার সরকারের আঁকা বলেই জানি। আর আমি ছবিগুলো তার নাম করেই বিক্রি করব, যতক্ষণ না প্রমণ হচ্ছে যে এসব ওঁর আঁকা নয়। আমার আর কিছু বলার নেই। আই অ্যাম এ হার্ট পেশেন্ট। প্লিজ স্পেয়ার মি।

জয় শেঠ বলল, আমরা মিস্টার সরকারকে সম্মান করি। হি ইজ নাইস টু আস।

এই ছবিগুলো কীভাবে আপনাদের হাতে আসে?

পিতাজি রিখিয়ায় গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

প্যাক করে আনা হয়েছিল কি?

হ্যাঁ। পিতাজি প্যাকার নিয়েই যান।

আপনি তো শুনলেন সর্বজিৎ সরকার বলছেন উনি এসব আঁকেননি।

শুনলাম। বাট উই আর অ্যাট এ লস।

ছবির ব্যাপারে আপনাদের সিকিউরিটি কেমন?

খুব ভাল। পেইন্টিংস আর কস্টলি থিং। সো উই টেক কেয়ার।

নকল ছবি ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলছেন?

নো স্যার।

পুলিশ কি আপনাদের গোডাউন বা স্টোর দেখেছে?

হ্যাঁ স্যার।

তারা কী বলছে আমরা জানতে চাই।

সেই মারমুখো কর্মকর্তা উঠে বলল, পুলিশের বক্তব্য এখন নয়। তদন্ত চলছে। এখনও সব অ্যাঙ্গেল দেখা হয়নি।

সাংবাদিকটি জয় শেঠকে বলল, মিস্টার শেঠ, আপনি কি বলতে চান সর্বজিৎ সরকার মিথ্যে কথা বলছেন?

নো স্যার। নট দ্যাট।

তা হলে কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।

আমরা মিস্টার সরকার এবং আরও অনেকের পেইন্টিংসকিনি। উই হ্যাভ আদার এজেন্টস। সো দেয়ার মে বি এ মিক্স আপ অ্যান্ড মে বি এ সাবস্টিটিউশন মেড বাই সাম ওয়ান।

সেটা কী করে সম্ভব?

জয় শেঠ মাথা চুলকে বলল, এরকম হতে পারে কেউ এইসব ছবি এঁকে আমাদের স্টোরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

তা হলে তো বলতে হবে আপনাদের স্টোর ফুলফ নয়।

ফুলপ্রুফ নয় সে কথা ঠিক। এই ঘটনার পর আমরা আরও সাবধান হয়েছি।

আপনারা কি সর্বজিৎ সরকারের ফ্যামিলি মেম্বারদের চেনেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আপনারা যখন দেখলেন ছবিগুলো ওঁর ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে আঁকা তখন আপনারা সেটা ওঁকে বা ওঁর পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন?

আমরা তো ভেবেছি যে মিস্টার সরকারেরই আঁকা। উই ডোন্ট আস্ক এনি আর্টিস্ট অ্যাবাউট দেয়ার পেইন্টিংস।

মিস্টার সরকারের যেসব ছবি আপনারা কেনেন তার হিসেব আপনাদের নিশ্চয়ই আছে?

শিয়োর।

গত দু' বছরে আপনারা সর্বজিতের ক'টা ছবি কিনেছেন?

তেরোটা।

তার মধ্যে দশটা ইভ সিরিজ?

হ্যাঁ।

তেরোটাই বিক্রি হয়ে গেছে?

না। তিনটে আছে।

এবার মিস্টার সরকারকে প্রশ্ন করব, আপনার হিসেবও কি তাই বলে? দেড় বছরে শেঠদের আপনি তেরোটা ছবি দিয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনার কথায় তেরোটার মধ্যে দশটা ছবি নিশ্চয়ই ইভ সিরিজ নয়?

না।

তা হলে আপনার হিসেব অনুযায়ী আপনার দশটা ছবি মিসিং।

তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

সেই দশটা ছবি কী নিয়ে আঁকা মিস্টার সরকার?

প্রকৃতি, ল্যান্ডস্কেপ, গাছপালা, দেহাতি মানুষ এইসব।

স্পেসিফিক বলতে পারবেন না?

তাও পারব। আমার নোট করা থাকে।

শেঠরা কতদিন পরপর আপনার ছবি আনতে যায়?

বছরে একবার বা দু'বার।

বছরে আপনি ক'টা ছবি আঁকেন?

দশ বারোটা তো বটেই। বেশিও আঁকি।

সেটা কি খুব বেশি?

না। কারণ ওখানে আমার অখণ্ড অবসর। কাজেই একটু বেশিই আঁকতে পারি।

আপনি কি শুধু তেলরঙে আঁকেন?

তেল বা অ্যাক্রিলিক।

ছবি আঁকার আগে স্কেচ বা আউটলাইন করে নেন?

সব সময়ে নয়।

আপনি কখনও অর্ডারি ছবি আঁকেন? ধরুন কারও পোট্রেট আঁকার অফার পেলে? ফি যদি ভাল হয়?

আঁকি। তবে রিখিয়ায় যাওয়ার পর আর হয় না।

অফার পাননি?

পেয়েছি। কিন্তু রিফিউজ করেছি।

আপনি এই স্ক্যান্ডালটা নিয়ে আর কিছু বলবেন?

না।

সভা ভেঙে গেল।

বেরিয়ে এসে যখন গাড়িতে উঠে বসল সর্বজিৎ তখন কোথা থেকে এসে তার পাশে বসে পড়ল শবর। জয় গেল সামনে, ড্রাইভারের পাশে।

শবর, কেমন হল আজকের কনফারেন্স?

সো সো। উত্তেজিত হননি বলে ধন্যবাদ।

তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি। টেলিফোনে কে যেন মাঝে মাঝে আমাকে গালাগাল করছে।

তাই? তবে এরকম তো এখন হতেই পারে।

ইরা আজ ফোন করেছিল।

কী কথা হল?

আমি বললাম যা বলার। বিশ্বাস করল না।

না করারই কথা।

শবর, আমার মনে হয় কলকাতায় থাকার কোনও মানে হয় না। এখানে এসেই আমি টায়ার্ড আর অসুস্থ ফিল করছি! কাল যদি ফিরে যাই কেমন হয়?

আপনার আর কয়েকটা দিন থাকার দরকার।

কেন বলো তো?

ফর সাম রেফারেন্সেস অ্যান্ড সাম হেল্প।

তাতে কিছু হবে?

দেখাই যাক না।

আর একটা কথা। বিল্ট আমার ছেলে নয়, এ কথাটা তোমাকে বলেছিলাম। তুমি সেটা কেন যে ইরাকে বললে?

কথাটা পাশ কাটিয়ে শবর বলল, কাল ছবিগুলো দেখতে যেতে হবে।

.

পেইন্টিংগুলো হোটেলের ঘরে চারদিকে সাজিয়ে রেখেছিল সিংঘানিয়া। সকালের আলোয় বেশ ঝলমল করছিল ছবিগুলো।

শবর বলল, দেখুন বাট ডোন্ট টাচ এনিথিং।

সিংঘানিয়া হেসে বলল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ইয়েস ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল।

সর্বজিৎ ছবিগুলো একাগ্র চোখে দেখে যাচ্ছিল। খুবই ভাল জাতের পোট্রেট। বিদেশি রঙে এবং তুলিতে আঁকা, যে এঁকেছে সে পাকা শিল্পী। নকল বলে চেনাই যায় না। হ্যাঁ, সর্বজিতের কিছু বৈশিষ্ট্য এইসব ছবিতেও আছে।

আর ইউ প্লিজড মিস্টার সরকার?

আমার প্লিজড হওয়ার কারণ কী?

দিজ আর গুড পেইন্টিংস স্যার।

হতে পারে। বাট আই অ্যাম ওরিড।

কেন স্যার?

দি ইম্পস্টার ইজ এ গুড পেইন্টার।

ইম্পস্টার তোক কি না হোক, রিসেন্ট কন্ট্রোভার্সি হাজ মেড দি পেইন্টিংস এক্সট্রিমলি ভ্যালুয়েবল। গতকাল রাতে ওভার টেলিফোন আমি বোম্বে থেকে বিগ অফার পেয়েছি।

কত বিগ?

দ্যাট ইজ ট্রেড সিক্রেট স্যার।

তার মানে ছবিগুলো আপনি হাতছাড়া করছেন না?

নো স্যার। আই অ্যাম এ বিজনেসম্যান। তবে চিন্তা করবেন না। বোম্বাই দিল্লিতে আপনার ফ্যামিলিকে তো কেউ চেনে না।

কিন্তু পাবলিসিটি হ্যাজ রিচড দোজ সিটিজ। নইলে আপনি বিগ অফার পেতেন কি?

ঠিক কথা। কিন্তু পাবলিক স্ক্যান্ডাল হবে না। কালেক্টর জানবে তো জানুক। চা, কফি কিছু খাবেন স্যার?

না, থ্যাঙ্ক ইউ।

সিংঘানিয়া শবরকে বলল, আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা কখন আসবে স্যার?

বেলা এগারোটায়।

আফটার দ্যাট মে আই প্যাক মাই পেইন্টিংস?

হ্যাঁ।

আমি কাল বোম্বে চলে যাব। বুঝতেই পারছেন আমার সময় নেই।

ঠিক আছে মিস্টার সিংঘানিয়া।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে শেঠদের দেওয়া গাড়িতে চেপে সর্বজিৎ বলল, তা হলে তুমি সিংঘানিয়াকে ছেড়ে দিচ্ছ?।

শবর একটা শ্বাস ফেলে বলল, উপায় কী?

আমার নামেই ছবিগুলো চালু থাকবে?

আপাতত। যদি প্রমাণ হয় যে আপনার আঁকা নয় তা হলে অন্য কথা। সে ক্ষেত্রে সিংঘানিয়া হয়তো আপনার নামের স্বাক্ষর ছবি থেকে মুছে দেবে।

হুঁ। ঠেকাতে পারো না?

না, কোন আইনে ঠেকাব?

আইন আমি জানি না, তোমারই জানবার কথা।

হয়তো তাই। এই কেস তো আগে পাইনি। এই প্রথম।

শবর, আমি জানি তুমি একজন দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার।

যতটা শোনেন ততটা নয়।

তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার আমি জানি। তুমি কিছু আঁচ করতে পারছ না?

না।

কেন পারছ না শবর?

ব্যাপারটা জটিল।

কাউকে সন্দেহ হচ্ছে না?

এখনও নয়।

আমিও কেমন ধাঁধায় পড়ে গেছি।

ভাববেন না। কয়েকটা দিন দেখা যাক।

আমাকে কতদিন থাকতে হবে এখানে?

থাকুন না কয়েকদিন।

আমি এখানে হাপিয়ে উঠছি।

জানি। ছবি আঁকছেন?

আঁকছি। ছবিই তো বাঁচিয়ে রাখে।

একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

আপনি কলকাতায় যাদের ছবি আঁকা শেখাতেন তাদের মধ্যে কেউ কি শত্রুতা করতে পারে?

কী করে বলব?

এনি হান্চ?

না শবর। নো হানচ।

শবরের ভ্রু কুঁচকে রইল।

.

নিশুত রাত। হঠাৎ দরজায় বিশাল খট খট শব্দ হল। তারপর তীব্র ধাক্কা।

সর্বজিৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও।

কেন চেঁচাল তা সে জানে না। বড্ড ভয়। দরজাটা ভীষণভাবে ধাক্কা দিচ্ছে কেউ।

মটাৎ করে ছিটকিনি ভেঙে দরজা খুলে গেল।

সভয়ে চেয়ে সর্বজিৎ বলল, তুমি।

হ্যাঁ আমি।

কেন এসেছ?

হাতে এটা কী দেখছ?

ওঃ ওটা তো—

কী মনে হচ্ছে তোমার?

সর্বজিৎ আতঙ্কের গলায় বলল, এরকম কোরো না প্লিজ—

কেন, আমার ফাঁসি হবে?

হ্যাঁ।

হবে না। সবাই তোমার মৃত্যু চায়, তা জানো?

মারবে কেন? মেরো না।

মাঝে মাঝে মরতে হয়। মরো।

তারপরই উপর্যুপরি কয়েকবার ঝলসে উঠল চপারটা। সর্বজিৎ অবাক হয়ে দেখল তার শরীরের অনেকগুলি ক্ষতস্থান থেকে নানা বর্ণের রং বেরিয়ে আসছে। নীল, হলুদ, সাদা, সবুজ, কালো, লাল। রক্তের রং কি এরকমই?

সর্বজিৎ কি মরে যাচ্ছে? সর্বনাশ! মরে যাচ্ছে নাকি?

ঘুম ভেঙে মধ্যরাতে ধড়মড় করে উঠে বসে সর্বজিৎ।

৩. সিংঘানিয়া রোজ সকাল চারটেয় ওঠে

সিংঘানিয়া রোজ সকাল চারটেয় ওঠে। তার অ্যালার্মের দরকার হয় না। ছেলেবেলার অভ্যাস। ঠিক চারটেয় তার ঘুম ভাঙবেই। উঠে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পুজোয় বসে। নিরেট সোনার তৈরি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা গণপতি মূর্তিটি তার সঙ্গেই থাকে।

পুজো সেরে একটু ফলের রস খেয়ে সে বেড়াতে বেরোয়। ডাক্তার বলেই দিয়েছে দু'বেলা খানিকটা হাঁটতেই হবে। সিংঘানিয়ার দু'জন সহকারী এবং দু'জন দেহরক্ষী দু'পাশের ঘরে থাকে। সিংঘানিয়া কোথাও গেলে তারা ঘর পাহারা দেয়। চারজনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রক্ষী। চারজনই স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমানও। গণপতি কখনও যোগ্য লোক ছাড়া নেয় না। পাহারা দেওয়ার মতো তার অনেক কিছু আছে।

সিংঘানিয়ার একজন পঞ্চম পাহারাদারও আছে। সে হল বিশাল ডোবারম্যান কুকুর ডোরা। সেও হোটেলেরই ঘরে থাকে, সহকারী দু'জনের সঙ্গে।

ডোরা প্রভুভক্ত কুকুর। সকালে সিংঘানিয়ার সঙ্গে সেও বেড়াতে যায়। সরু কিন্তু শক্ত চেন দিয়ে বেঁধে তবেই তাকে নিয়ে বেরোয় সিংঘানিয়া। ডোরা কিলার ডগ।

সকালে কলকাতার রাস্তায় তেমন গাড়ি-ঘোড়া নেই।

হোটেল থেকে ময়দানের দূরত্ব বেশি নয়। গাড়ি নেওয়ার দরকার হয় না। সিংঘানিয়া নাতিদ্রুত হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে পৌঁছে গেল। ডোরা একটা গাছের তলায় প্রাতঃকৃত্য সেরে নেওয়ার পর সিংঘানিয়া কুকুরটার সঙ্গে একটা রবারের বল নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করল। একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের জোরকদমে হাঁটা।

গুড মর্নিং মিস্টার সিংঘানিয়া।

মর্নিং।

কেমন আছেন?

গুড। ভেরি গুড।

সঙ্গে কুকুর কেন?

বেড়াতে নিয়ে এসেছি।

বাঃ বেশ ভাল।

হ্যাঁ ভাল।

তা হলে ভালই আছেন?

ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড।

সামনে শর্টস আর কামিজ-পরা একজন হঠাৎ খুব ঠান্ডা হাতে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল।

সিংঘানিয়া অবাক হয়ে বলল, এ কী? মাগিং নাকি?

না মাগিং নয় সিংঘানিয়া।

তা হলে পিস্তল দিয়ে কী করবেন?

আই শ্যাল কিল ইউ।

কেন, আমি কী করেছি? আমি তো—

কথাটা শেষ হল না সিংঘানিয়ার। উপর্যুপরি এবং দ্রুত দুটি গুলি তাকে ছাদা করে দিল বুকে।

সিংঘানিয়া পড়ে যাচ্ছিল। কুকুরটা দুটি চিৎকার দিতেই তার মাথা ভেঙে গেল শক্তিশালী বুলেটে।

তারপর ময়দানের ঘাসে দুটি মৃতদেহ পড়ে রইল। একজন মানুষ ও একটি কুকুরের।

সকাল সাড়ে আটটায় ফোনটা পেল সর্বজিৎ।

আমি শবর বলছি।

বলো।

কী করছিলেন?

ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এলাম দোকান থেকে। এবার চা খাব।

বেশ বেশ। কখন উঠলেন ঘুম থেকে?

এই তো, সাড়ে ছ'টা-সাতটা হবে।

রিখিয়াতে তো আরও সকালে ওঠেন।

হ্যাঁ। মর্নিং ওয়াক করতে যাই।

কলকাতায় সেটা হচ্ছে না বুঝি?

নাঃ। কলকাতায় হাঁটব কোথায়? তার ওপর বৃষ্টি বাদলায় পথঘাট তো যাচ্ছেতাই।

আচ্ছা, বছর পাঁচেক কি তারও আগে আপনি একটা স্মল আর্মসের লাইসেন্স পেয়েছিলেন কি?

কেন বলো তো?

জাস্ট কৌতূহল।

হ্যাঁ। রিখিয়াতে থাকাটা কতখানি বিপজ্জনক সেটা আন্দাজ করতে না পেরে লাইসেন্স নিয়েছিলাম। পিস্তলও একটা কিনি।

পিস্তল না রিভলভার?

পিস্তল। ওয়েম্বলে।

কত বোর?

পয়েন্ট বত্রিশ।

সেটা কোথায়?

আমার সুটকেসেই থাকে।

সুটকেসটা কোথায়?

আমার কাছে।

আর একটা কথা।

বলো।

আপনার স্ত্রীরও একটা রিভলভার থাকার কথা।

হ্যাঁ। আছে। ওটার জন্য তুমিই লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলে।

সেইজন্যেই জিজ্ঞেস করছি, রিভলভার কি উনি কিনেছিলেন?

অফ কোর্স। বাড়িতে ক্যাশ টাকা থাকে বলে কিনেছিল।

সেটা কি লুগার?

তা হবে। হ্যাঁ, লুগারই। পয়েন্ট বত্রিশ বোর।

বেশ, এবার কাজের কথা।

বলো।

আমি টেলিফোনটা ধরে আছি, আপনি উঠে গিয়ে সুটকেসটা খুলে দেখুন পিস্তলটা আছে কিনা।

কেন বলো তো!

দেখুন না।

সর্বজিৎ উঠে গিয়ে সুটকেস খুলল। কেনার পর জিনিসটা পড়েই আছে। দু’-তিনবার ফাঁকা মাঠে গুলি চালিয়েছিল সে। সেটাকে উদ্বোধন বলা যায়। তারপর কাজে লাগেনি। সুটকেস হাঁটকাতে হল কম নয়। একেবারে তলার দিকে প্লাস্টিকে মোড়া জিনিসটা পাওয়া গেল।

ফিরে এসে ফোন তুলে সে বলল, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কী হয়েছে শবর? আমি কাউকে খুনটুন করলাম নাকি?

কেউ কাউকে করেছে। ব্যাড নিউজ।

কে কাকে খুন করল শবর?

কে তা জানি না। তবে কাকে তা জানি।

প্লিজ কাম আউট। আমার ফ্যামিলির কেউ কি?

আরে না।

তা হলে?

সিংঘানিয়া।

বলল কী? কখন?

আজ সকালে। ময়দানে। ডিউরিং হিজ মর্নিং ওয়াক।

সর্বনাশ!

সঙ্গে একটা ডোবারম্যান কুকুর ছিল, সেটাও মরেছে।

গুলি নাকি?

হ্যাঁ। খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে। সিংঘানিয়ার হিরের আংটিটাও নেই।

তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?

না। তবে আপনার অ্যালিবাইটা পোক্ত হওয়া দরকার।

অ্যালিবাই?

হ্যাঁ, সকালে ঠিক কখন উঠেছেন ভেবে বলুন।

ভেবেই বলছি। ভাবতে দাও। ...ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিট হবে।

আপনি আর্লি রাইজার, আজ এত দেরি হল কেন?

রিখিয়ায় তো প্রায় ভর সন্ধেবেলাই শুয়ে পড়তে হয়। রাত নটায়। এখানে তা হয় না। এসব কাণ্ডের ফলে মাথা গরম হয়ে ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল।

ঘুম থেকে উঠে কী কী করেছেন?

নাথিং টু টেল অ্যাবাউট। টয়লেটে গেছি, স্নান করেছি। একটু জানালার ধারে বসে থেকেছি। তারপর চা আনতে বেরোলাম।

ব্যস? আর কিছু নয় তো?

না।

কোনও সাক্ষী আছে?

সাক্ষী? সাক্ষী কে থাকবে? ফ্ল্যাটে তো আর কেউ নেই।

দারোয়ান গোছের কেউ?

একজন দারোয়ান আছে ঠিকই। কিন্তু সে আমাকে কতদূর চেনে কে জানে। চিনতেও পারে।

ঠিক আছে। দরকার হলে তাকে জেরা করা যাবে।

শোনো শবর, সিংঘানিয়া আমার একজন পোটেনশনয়াল বায়ার। তাকে মারলে আমার প্রভূত ক্ষতি।

একদিকে ক্ষতি হলে অন্যদিকে লাভ।

কীসের লাভ?

ছবিগুলো এবার হয়তো কিনে নিতে পারবেন।

কিনে আর কী লাভ? বাজারে চাউর হয়ে গেছে।

তবু তো কিনতে চেয়েছিলেন।

হ্যাঁ। তখন বিবেচনাটা কাজ করেনি।

এখন করছে?

করছে।

আরও একটা খবর আছে।

কী খবর?

ছবিগুলো সিংঘানিয়ার ঘর থেকে চুরি গেছে।

বলো কী?

ঠিকই বলছি।

ছবির জন্যই মার্ডার।

তাই তো মনে হচ্ছে। আপনার দ্বিতীয় পিস্তল নেই তো!

না না। একটাই কাজে লাগে না।

সিংঘানিয়া খুন হয়েছে বত্রিশ বোরের বুলেটে?

তার মানে সন্দেহের আঙুল এখন আমার দিকে?

যা ভাববার ভাবতে পারেন।

আর যে-কেউ সন্দেহ করুক, তুমি কোরো না।

সন্দেহের অভ্যাসটা ছাড়তে চায় না সহজে।

আমাকে কী করতে বলো তুমি?

কিছু না। চুপচাপ থাকুন। সিংঘানিয়ার ছবি পাহারা দেওয়ার জন্য চারজন লোক ছিল।

তবু চুরি?

হ্যাঁ। একজন বেয়ারাগোছের লোক এসে খবর দেয় যে সাহেব ময়দানে খুন হয়েছে। ওরা চারজন দৌড়োয়। সেই ফাঁকে–

ওঃ।

মজা কী শুনবেন?

বলো।

যখন খবরটা দেওয়া হয় খুনটা তখনও হয়নি।

যাঃ, তা হলে বেয়ারা জানল কী করে?

বেয়ারার মতো পোশাক হলেই বেয়ারা হতে হবে তা তো নয়। ওরা যখন যায় তখনও সিংঘানিয়া পুরোপুরি মরেনি।

কিছু বলে গেছে?

হ্যাঁ। বলে গেছে সে মারা গেলে ছবিগুলো যেন বোম্বেতে মিস্টার কুমারকে দেওয়া হয়।

বড্ড খারাপ লাগছে এসব শুনতে।

আপনার অ্যালিবাই পোক্ত থাকলেই হল।

সেটা পোক্তই আছে। তোমরা মানবে কিনা দেখো।

মানব। প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই মানব। আপনি দারোয়ানটার সঙ্গে কথা বলুন।

কী বলতে হবে?

সে আপনাকে চেনে কি না।

ধরো চেনে। তার পর?

জিজ্ঞেস করবেন, সকালে বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়েছে কি না।

তার পর?

এইটুকুই আপাতত। ছাড়ছি।

দাঁড়াও। ইরা কী বলছে?

কী বলবে?

তার অ্যালিবাইও দেখছ তো!

অফ কোর্স।

ছবিগুলোর কী হবে শবর?

কী করে বলি? ছাড়ছি।

.

ইরাদেবী, আপনার রিভলভারটা কোথায়?

কেন?

দরকার আছে।

কেন দরকার বলুন।

জিনিসটা আছে তো!

আছে।

লাইসেন্সটা আমিই করিয়ে দিয়েছিলাম। মনে আছে?

হ্যাঁ।

জিনিসটা আপনি কখনও ব্যবহার করেছেন?

করেছি।

কীভাবে?

যখন লাইসেন্স করি তখন একজন অফিসার আমাকে বলেছিলেন রিভলভার কেনার পর যেন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কয়েকবার ফায়ার করি।

তাই করেছিলেন?

হ্যাঁ।

আর কখনও ব্যবহার করেননি?

ইরা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তেমন কিছু নয়।

ভেবে দেখুন। ব্যাপারটা ইম্পর্ট্যান্ট।

করেছি।

কীভাবে?

আমাদের বাড়িতে একবার চোর আসে।

কবে?

পাঁচ-ছয় মাস আগে।

তারপর?

জানালার গ্রিল খুলে ঢুকবার চেষ্টা করে। তখন আমি গুলি চালাই।

বটে! তার গায়ে গুলি লেগেছিল?

হ্যাঁ। তবে সিরিয়াস কিছু হয়নি। কারণ গুলি খেয়ে সে পালিয়ে যায়।

পুলিশে রিপোর্ট করেছিলেন?

না।

সে কী? রিপোর্ট করেননি কেন?

কিছু চুরি যায়নি, লোকটাও মরেনি। রিপোর্ট করে কী হবে?

লোকটা উন্ডেড হয়েছিল কি?

বোধহয় হয়েছিল। জানালার নীচে রক্তের দাগ ছিল। রাস্তা অবধি রক্তের ফোঁটা দেখা গেছে। তারপর আর ছিল না।

রিপোর্ট করলে ভাল করতেন।

আমার ভয় হয়েছিল, পুলিশ জানলে আমার রিভলভারটা বাজেয়াপ্ত করবে।

তা করার কথা নয়। লোকে এসব অকেশনে সেলফ ডিফেন্সের জন্যই আগ্নেয়াস্ত্র রাখে। রিভলভারটা কোথায় থাকে?

দিনের বেলা আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখি। রাতে বালিশের পাশে নিয়ে শুই।

কেন বলুন তো! ও পাড়ায় কি খুব চোর-ডাকাত?

তা আছে। তা ছাড়া আমরা তো একতলায় থাকি। একতলাটা সবসময়েই একটু ইনসিকিয়োর্ড। দোতলা হচ্ছে। ওপর তলায় ততটা ভয় নেই।

আপনি রিভলভারের ইউজ তা হলে জানেন?

জানি। না জানলে কি লাইসেন্স পাই?

আজ সকালে কখন ঘুম থেকে উঠেছেন?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

দরকার আছে।

আমার ইনসোমনিয়া আছে। ঘুম হয় না।

একদমই হয় না?

মাঝে মধ্যে একটু আধটু। কোনও ঠিক নেই।

আপনি কি ঘুমের ওষুধ খান?

না। ভয় পাই।

কেন?

আমার মা ঘুমের ওষুধের ওভারডোজে মারা যান।

তারও কি ইনসোমনিয়া ছিল?

না। অন্তত ক্রনিক নয়। একটু বেশি বয়সে হাইপারটেনশন থেকেই ঘুম ভাল হত না।

রাতে না ঘুমিয়ে কী করেন?

লিখি, পড়ি। আগে বেহালা বাজাতাম। এখন বাজাই না।

কী লেখেন আর পড়েন?

ডায়েরি লিখি। রোজনামচা। আর আবোল তাবোল যা খুশি। গল্পের বই পড়ি।

তা হলে তো আপনার ঘরে সারা রাতই আলো জ্বলে?

যতক্ষণ লেখাপড়া করি ততক্ষণ জ্বলে। তারপর আলো নিবিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি। সাধারণত রাত দুটো নাগাদ শুই।

কাল রাতের কথা বলুন।

কী বলব?

কাল রাতে আপনি ক'টায় শুতে গিয়েছিলেন?

কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

কারণ আছে। জরুরি কারণ।

কাল রাতে দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে শুয়ে পড়েছিলাম।

ক'টায় ঘুম থেকে উঠেছেন?

ঘুমই নেই তো ঘুম থেকে ওঠা।

মানে বিছানা ছেড়েছেন কখন?

খুব ভোরে। রোজই চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়ি।

তারপর কী করলেন?

আজ? আজও রোজকার মতো ভোরবেলা উঠে চান করলাম। তারপর চা খেলাম।

বেরোননি?

না তো!

আপনি মর্নিং ওয়াক করেন না?

না।

আপনার তো একটা গাড়ি আছে!

হ্যাঁ।

কে চালায়?

ড্রাইভার।

আপনি চালান না?

চালাই। মাঝে মাঝে।

আজ সকালে বাই চান্স বেরোননি তো গাড়ি নিয়ে?

না।

ড্রাইভার কি চব্বিশ ঘণ্টার?

হ্যাঁ। সে গ্যারেজের ওপরে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকে।

ঠিক আছে।

কী হয়েছে বলুন তো।

মিস্টার সিংঘানিয়া খুন হয়েছেন।

ইরা একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ হয়েছে। নোংরা লোক।

ছবিগুলো তো ওঁর আঁকা নয়।

তা হোক না। সব জেনেশুনেই তো এগজিবিশন করেছিল। সর্বজিৎ আরও নোংরা। কবে কখন হল?

আজ সকাল পাঁচটায়। ময়দানে।

ওঃ।

ওঁর ছবিগুলোও হোটেলের ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে।

খুব ভাল হয়েছে।

শবর একটু হাসল, তারপর বলল, আপনার মেয়েরা কি বাড়িতে আছে?

কেন থাকবে না?

তারা কোথায়?

দু'জনেই অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। এই তো উঠল একটু আগে। এখন বোধহয় টয়লেটে। ডাকব নাকি?

না থাক।

টেলিফোন রেখে দিল শবর।

ইরা রাখল একটু দেরিতে। তার ভ্রু কোঁচকাল। মুখে দুশ্চিন্তা। খবরটা একদিক দিয়ে ভাল। অন্যদিক দিয়ে ভাল কি?

টেলিফোনের সামনে কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে সে উঠে শোওয়ার ঘরে এল। এখনও তার বিছানাটা ভোলা হয়নি। তার বাড়িতে তিন-চারজন কাজের লোক। কিন্তু এ ঘরে কারও প্রবেশাধিকার সে দেয় না। তার কারণ তার শোওয়ার ঘরে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা থাকে। ছবি বিক্রিরই টাকা। আগে সর্বজিৎ ছবি বিক্রি করত নগদ টাকায়। কোনও ব্যাঙ্ক রেকর্ড থাকত না। সেইসব টাকা ঘরেই জমে আছে। আজকাল সর্বজিৎ নিয়মটা পালটেছে। টাকা আজকাল ব্যাঙ্কে জমা হয় এবং মোটা টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়। এই ব্যবস্থাটা ইরার একদম পছন্দ নয়। এই নিয়ে সর্বজিতের সঙ্গে তার একসময়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু সর্বজিৎ বলেছে, আর নয়। যথেষ্ট রোজগার করেছি। দিনের পর দিন এই ট্যাক্স ফাঁকি একদিন ধরা পড়বেই।

কিন্তু আগের টাকাটা আর ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া যায় না। যক্ষি বুড়ির মতো টাকাটা আগলে থাকে ইরা। টাকা ছাড়াও তার ইন্দিরা বিকাশ, কিষান বিকাশ

এবং অনেক শেয়ার কেনা আছে। আছে বিস্তর সোনাদানাও। সে ঘরের বার হলে ঘর লক করে যায়। এ ঘরে বাড়ির আর কেউই বড় একটা ঢোকে না। তিনটে মজবুত স্টিলের আলমারি, একটা সেলফ, একটা খাট, একটা রাইটিং ডেস্ক আর ঘরের কোণে একটা টিভি মোটামুটি এই তার জিনিস। ওয়ার্ডরোব এবং ড্রেসিং টেবিল অবশ্য আছে।

ঘরে এসে বালিশের পাশ থেকে প্রথমেই রিভলভারটা সরাতে গেল ইরা।

আর তারপরই মাথায় বজ্রাঘাত। বত্রিশ বোরের লুগার রিভলভারটা নেই।

নেই তো নেই-ই। কোথাও নেই। ইরা পাগলের মতো সর্বত্র খুঁজে দেখল। কোথাও নেই।

এ ঘরে সে ছাড়া আর কেউ থাকে না। বাড়িটা বেশ বড়। টিনা, নিনা আর বিল্টুর আলাদা ঘর আছে। এ ঘরটাকে যতদূর সম্ভব জেলখানা বানিয়ে রেখেছে সে।

ইরা টাকা ভালবাসে। কেন ভালবাসে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সুখের বিষয় টাকা তার অনেক আছে। সর্বজিৎ আজকাল টাকাপয়সার ব্যাপারে খুব উদাসীন। রিখিয়াতে সে সাদামাটাভাবে থাকে, শুনেছে ইরা। মদের খরচ আর যৎসামান্য হলেই তার চলে যায়। এজেন্টের মারফত টাকাটা সে পেয়ে যায়, কলকাতায় এসে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলে না। সুতরাং ব্যাঙ্কে যা জমা হয় তার সবটার ওপরেই ইরার প্রভুত্ব। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ইচ্ছে করলেই সে টাকা তুলে নিতে পারে। সাবধানের মার নেই তাই ইরা ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকার সিংহভাগ সরিয়ে ফেলে তার নিজের আলাদা অ্যাকাউন্টে। এর ওপর কলেজের মাইনে যথেই পায় সে। না, টাকার দিক থেকে ইরা বেশ সুখে আছে।

সুখের অভাব তার অন্য জায়গায়।

তার বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। ছিপছিপে এবং সুগঠন শরীরে এখনও ভরা যৌবন। সর্বজিতের কাছ থেকে সে কোনওকালেই তেমন মনোযোগ পায়নি, পায়নি শরীরের ডাকে তেমন সাড়াও। তাদের বনিবনা হয়নি কখনও। বছরের পর বছর দুঃসহ এই অবনিবনা নিয়ে কেটেছে তাদের। বছরের মধ্যে হয়তো সাত-আট মাসই কথা বন্ধ থাকত। মাঝেমধ্যে লাগত তুমুল ঝগড়া।

ইরা সেক্স নিয়ে অভিযোগ তুললে সর্বজিৎ বলত, সেক্সটা শতকরা আশি ভাগ মানসিক ব্যাপার, কুড়ি ভাগ শরীর। কোনও পুরুষ কোনও নারীর কাছে দিনের পর দিন অপমানিত হতে থাকলে তার প্রতি সেজুয়াল আর্জ থাকে না। তোমার প্রতিও আমার নেই।

তা হলে আমি কী করব?

সর্বজিৎ নির্বিকারভাবে বলেছে, অন্য পুরুষ খুঁজে নাও। তোমাকে বলেই দিচ্ছি, আমার দিক থেকে বাধা আসবে না। চাইলে ডিভোর্স করে বিয়েও করতে পারো। যা তোমার খুশি।

ডিভোর্সের কথা তাদের মধ্যে বারবার উঠলেও কে জানে কেন শেষ অবধি আইন আদালত করার আগ্রহ তারা কেউই দেখায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, সর্বজিৎ বা ইরার কোনও দ্বিতীয় মহিলা বা পুরুষ থাকলে হয়তো আগ্রহটা হত। সেরকম ঘটনাও কিছু ছিল না। সুধাময় ঘোষ আর তাকে জড়িয়ে যে রটনাটা আছে সেটা যে একদম বাজে কথা সেটা অন্তত ইরা তো জানে। সুধাময় সর্বজিতের বন্ধু। খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু ইরার সঙ্গে তার সেই সম্পর্ক নেই যার সুবাদে তাকে আর সুধাময়কে আদম আর ইভ বানানো যায়।

ইরার যৌবনকালটা মরুভূমির মতো। হাতে প্রচুর টাকা, বাড়ি, গাড়ি, সম্পন্নতার ছড়াছড়ি। তবু ওই একটা জায়গায় সে এক বিশুদ্ধ নারী।

খুবই উষর ছিল তার জীবন যতদিন না চোরটা এল।

না, শবরকে সে মোটেই মিথ্যে বলেনি। এক রাতে চোর এসেছিল ঠিকই। এবং সেদিন ইরা তার ক্রনিক ইনসোমনিয়ার মধ্যেও বিরল যে দু’-এক রাত ঘুমোয় সেইরকমই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে জানালার বাইরে লোকটাকে দেখে সে গুলিও করেছিল ঠিকই। এবং আহত চোর পড়ে গিয়েছিল জানালার নীচে।

বাকিটুকু শবরকে বানিয়ে বলেছে ইরা। চোরটা পালায়নি। সে জখম হাত নিয়ে পড়ে গেলেও কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়ায়। ইরা ততক্ষণে ঘরের বড় লাইট জ্বেলেছে এবং লোজন ডাকবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

চোরটা বলল, প্লিজ! আমার কথা শুনুন।

ইরা ফিরে জানালার দিকে চেয়ে হতবাক। ঘরের স্টিক লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চোরকে। খুবই চেনা চোর।

ইরা অবাক হয়ে বলে, তুমি! এত রাতে তুমি এখানে কেন? আর এভাবে কেন?

প্লিজ। আমার কিছু কথা আছে।

কথা! মাঝরাতে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ? তাও জানালার গ্রিল ভেঙে? আমি তোমাকে পুলিশে দেব।

দেখুন, আমি তো পালাইনি। পুলিশে খবর দিন, আমি কিন্তু পালাব না।

তা হলে এরকম করলে কেন? তুমি কি পাগল?

তাই হবে। প্লিজ লেট মি ইন।

না। এত রাতে তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে পারি না। আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই। আমি তোমাকে পুলিশেও দিতে চাই না। বাড়ি যাও ডেভিড।

আমি ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি। আমি এসেছি আপনার কাছে।

তুমি বোধহয় ড্রাগ অ্যাডিক্ট। নাকি মদ খেয়েছ?

ওসব নয়। আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আই অ্যাম ব্লিডিং লাইক হেল। দেখছেন তো। তবু দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমার দরকারটা জরুরি।

তোমার মতলব ভাল নয়।

ভয় পাবেন না। আমি শত অপরাধ করলেও আপনার কোনও ক্ষতি কখনও করব না। সে সাধ্যই আমার নেই।

আচ্ছা, একটা কথা বলো। তুমি কি টিনাকে সিডিউস করতে এসেছিলে? ঘর ভুল করে আমার ঘরে হানা দিয়েছ?

না ম্যাডাম, টিনার ঘর আমি চিনি। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

ডেভিডের বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। রোগা, লম্বা এবং দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন এক ভাবুক চেহারা। মাথায় অবিন্যস্ত চুলের ঝাপি। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক টানা এবং মাদকতাময়। কিশোরী টিনা তার অনেক বন্ধুদের মধ্যে এই বয়স্ক বন্ধুটিকে একটু বেশিই পছন্দ করে। শোনা যায়, ডেভিড বাউন্ডুলে, কিন্তু কেরলে তার বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল। তার বাবা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

একটু দোনোমোনো করছিল ইরা। তবে সে সাহসী মেয়ে। বলল, তোমাকে ঢুকতে দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। আমার হাতে রিভলভার থাকবে। কোনওরকম বেচাল দেখলেই কিন্তু গুলি করব।

অ্যাগ্রিড ম্যাডাম।

এ ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার পথ একটু ঘোরানো। প্যাসেজে গিয়ে তবে সদরে যেতে হবে। কিন্তু বাথরুমে একটা জমাদার আসার সরু দরজা আছে। সেইটে খুলে দিল ইরা।

ডেভিড ঘরে এল।

রক্তাক্ত বাঁ হাতটা ডান হাতে চেপে ধরে রেখেছিল ডেভিড।

ইরার একটু মায়া হল। সে ড্রয়ার খুলে ব্যান্ড এইড আর তুলো বের করে বলল, লাগিয়ে নাও।

ডেভিড মাথা নেড়ে বলল, লাগবে না। দি উন্ড ইজ নট ভেরি সিরিয়াস।

তুমি তো মারা যেতে পারতে ডেভিড।

আপনার রিভলভার আছে জানলে সাবধান হতাম।

এভাবে কেউ আসে? কী এমন কথা যা মাঝরাতে বলতে হবে?

হাসলে ডেভিডকে যে কী সুন্দর দেখায় তা লক্ষ করে অবাক হল ইরা। ডেভিড কালো, কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম। বলল, আমি আপনাকে একটু চমকে দিতেই চেয়েছিলাম।

কেন ডেভিড?

আমি যা বলতে এসেছি তা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় বলা যায় না। ইট রিকোয়ারস সাম ম্যাডনেস।

বলো কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রিভলভার তো আপনার হাতেই আছে। চাইলে গুলি করে দেবেন। কিন্তু আমাকে কথাটা বলতেই হবে।

বলে ফেলো ডেভিড।

আমি আপনাকে ভীষণ ভালবাসি।

এত অবাক ইরা কখনও হয়নি। দু’বছর আগে তার বয়স ছিল আর একটু কম। তবু হিসেব মতো ডেভিড তার চেয়ে ছয়-সাত বছরের ছোট, টিনার বন্ধু। এরকমও হয় নাকি?

রেগে যাবেন না। এসব ব্যাপারে কিছু করার থাকে না। লাভ কামস লাইক এ ফ্লাড।

পাগল হয়েছ?

ডেভিড মাথা নেড়ে বলল, সর্ট অফ ম্যাডনেস, ইয়েস। কিন্তু আমি আপনার জন্য এত আকর্ষণ বোধ করি, এত আপনার কথা ভাবি যে আমার কিছু করার থাকে না।

তুমি টিনার বন্ধু, মনে রেখো।

ডেভিড তেমনি সুন্দর হেসে বলল, কখনও ওর বয়ফ্রেন্ড ছিলাম না। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। ওর বন্ধুত্বের সূত্রেই তো আপনাকে দেখলাম।

ইরা মুখে প্রতিবাদ করলেও ভিতরে ভিতরে কি খুশি হয়নি? মধ্য তিরিশে সে এখনও যুবকদের মুগ্ধ করতে পারে?

ইরা রিভলভারটা ড্রয়ারে রেখে খুব যত্ন করে ডেভিডের হাতে অ্যান্টিসেপটিক লাগাল। ক্ষতস্থান সিল করে দিল। তারপর বলল, অনেক পাগলামি হয়েছে। এবার বাড়ি যাও।

আমি শুনেছিলাম, আপনার ইনসোমনিয়া আছে।

আছেই তো।

আমাকে একটা অনুমতি দেবেন?

কীসের অনুমতি?

আমি রাত বারোটা-একটায় চলে আসব। তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করব বা বসে থাকব। যদি আপনি পছন্দ না করেন তা হলে অন্য কথা।

সেটা হয় না।

কেন হয় না? আপনি ইচ্ছে করলেই হয়।

রাতে একজন পুরুষকে... না, না। ছিঃ!

আপনি তো সংস্কার থেকে বলছেন। কিন্তু ভালবাসা কি ওসব মানে?

আমি তো আর তোমার প্রেমে পড়িনি ডেভিড!

ঠিক কথা। কিন্তু আপনি একজন একা নিদ্রাহীন সঙ্গীহীন মানুষ। আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে আসব। এইমাত্র।

আমার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তারা টের পাবে।

না। আমরা সতর্ক হলে কেউ টের পাবে না।

কেন পাগলামি করছ ডেভিড?

পাগল তো পাগলামিই করবে, নাকি?

তুমি বাড়ি যাও।

দেখুন ইরাদেবী, আমি ভাল ঘরের ছেলে। আমার বাবা বিগ ম্যান। আমি একজন কোয়ালিফায়েড ডাক্তার, যদিও কখনও প্র্যাকটিস করিনি। আমি নেশা করি না।

বাউন্ডুলে, ইয়েস। আমার ভেসে বেড়াতে ভাল লাগে। আপনার আগে আমি কোনও মহিলার প্রেমে পড়িনি। আই অ্যাম নট এ উওম্যানাইজার। দয়া করে আমাকে লম্পট ভাববেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যা চাইছ তাও হয় না।

আমি আজ যাচ্ছি। আপনি ভাবুন।

কী ভাবব?

জাস্ট থিঙ্ক ইট ওভার।

তুমি আমাকে চাইছ তো? সেটা হয় না।

ওভাবে চাইছি না। জাস্ট কম্পানি। অনেক সময় বিশুদ্ধ প্রেম শরীর-নির্ভর হয় না। মেয়েদের শরীর নিয়ে সংস্কার থাকে। আমি সেটা চাই না। আমি শুধু আসব, বসে থাকব, চলে যাব।

শুধু এইটুকু?

শুধু এইটুকু।

আজ যাও। আমাকে খুব নার্ভাস করে দিয়েছ।

কথাটা ভেবে দেখবেন?

দেখব।

কথা দিচ্ছেন?

হ্যাঁ।

তা হলে আমি কাল আসব। আফটার মিডনাইট।

ঠিক আছে।

ইরাকে জানালার বাইরে একটা আড়াল দাঁড় করানোর জন্য একটা দেয়াল তুলতে হল। তাতে আলাদা দরজা ইত্যাদি। জানালায় লাগাতে হল ভারী পরদা। হ্যাঁ, সে ডেভিডকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। যা ডেভিড চেয়েছিল তার চেয়ে আরও একটু বেশিই।

এই একটা ঘটনার কথা কেউ জানে না। জানলেও কেউ তাকে কিছু বলেনি।

গত দু'বছর ধরে প্রায় টানা মধ্যরাতে ডেভিড এসেছে। বসেই থেকেছে বেশিরভাগ। ঘরের ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে তারা গল্প করেছে। কখনও সখনও শরীরের মিলনও। কিন্তু ব্যাপারটা ইরার কখনও ভাল লাগেনি। শরীরের মিলনে বরাবর তার ভিতরে একটা প্রতিরোধ যেন মাথা তুলত। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই সুপুরুষ ও শক্তিমান যুবকটির প্রেমে সে আজও পড়েনি। ভাল লাগে না, তা নয়। কিন্তু তার মধ্যে আবেগ কাজ করে না। কখনও। উথালপাথাল হয় না বুক।

কাল রাতেও ডেভিড এসেছিল। কিছুটা উদ্ভ্রান্ত ছিল সে।

তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন?

আমি একটু রেস্টলেস।

কেন ডেভিড?

আই কান্ট হেল্প ইউ। আপনি ওই স্ক্যান্ডালটার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন।

তা তো পাচ্ছিই। কে যে এ কাজ করতে পারে।

আপনার হাজব্যান্ড নয় বলছেন?

সর্বজিৎ সব পারে। তবে ওর পক্ষে তোমার বা বান্টুর ছবি আঁকা তো সম্ভব নয়।

তা হলে কে হতে পারে বলে আন্দাজ করেন?

বুঝতে পারছি না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

নিশ্চয়ই।

আপনি একজন পেইন্টারকে বিয়ে করলেন কেন?

বাঃ রে, তাতে দোষ কী?

দোষের কথা নয়। আপনি একজন পেইন্টারকেই কেন পছন্দ করলেন?

এমনি।

আপনি নিজে আঁকতেন?

কেন বলো তো?

আপনার কথাবার্তায় মনে হয়, আপনি ছবি সম্পর্কে জানেন।

তা জানি। জানব না কেন? পেইন্টারের ঘর করেছি যে!

নিজে কখনও আঁকেননি?

একটু আধটু চেষ্টা কি আর করিনি? তবে হয়নি।

আপনার কাছে তো কাগজ কলম আছে। আমার একটা স্কেচ করবেন?

দূর! ওসব পারি না।

জাস্ট ট্রাই। দেখাই যাক না।

ইরা কাগজ কলম নিয়ে বসল। একটা স্কেচ করেও ফেলল সে।

দেখে ডেভিড বলল, মাই গড!

কী হল?

আপনার হাত তো খুব সেট।

যাঃ, পাগল!

আচ্ছা, আমি এটা রেখে দিচ্ছি।

রাখো। তবে ওটা কিছু হয়নি।

ডেভিড রাত তিনটের সময়ে গেছে। তারপর শুয়েছে ইরা। তার ঘুম আসেনি।

আর এখন রিভলভারটা পাচ্ছে না সে।

বিবশ হয়ে সে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল। তার খুব স্পষ্ট মনে আছে রিভলভার রোজকার মতোই বালিশের পাশে পাতা একটা ছোট প্লাস্টিক শিটের ওপর রাখা ছিল। বিছানায় পাছে রিভলভারের তেলটেল লাগে তাই ওই প্লাস্টিকের ব্যবস্থা। সেটা আছে, কিন্তু জিনিসটা নেই।

মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল তার।

৪. ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্টটা

অফিসে বসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্টটা গম্ভীর মুখে দেখছিল শবর। কোচকানো অ্যাসিস্ট্যান্ট লালু পাশে দাঁড়ানো।

আর ইউ শিয়োর লালু?

অ্যাবলোলিউটলি।

ক্রস চেক করেছ?

হ্যাঁ স্যার।

শবর পিছনে হেলান দিয়ে বসে বলল, দেন দি কমপ্লিকেশন ডিপেন্স।

হ্যাঁ স্যার।

শোনো, মিস্টার সরকারকে আমাদের ফাইন্ডিংসটা এখনই জানানোর দরকার নেই।

ঠিক আছে স্যার।

আমি আজই একবার দেওঘর যাচ্ছি। কাল ফিরব। ট্রেনের একটা টিকিট অ্যারেঞ্জ করো। যে-কোনও ট্রেন।

নো প্রবলেম স্যার।

লালু চলে যাওয়ার পর শবর অনেকক্ষণ সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠল। দেওঘর।

ভোরবেলা জশিডিতে নেমে একটা অটো রিকশা ধরে সোজা রিখিয়ায় হাজির হয়ে গেল শবর।

তোমার নাম বান্টা?

জি হুজুর।

কতদিন এখানে কাজ করছ?

চার-পাঁচ বরিষ হবে।

বান্টা, তোমার কাছে কয়েকটা জিনিস জানতে চাই।

বলুন।

এই ফটোটা দেখো, চিনতে পারো?

জি।

এ লোকটা কে?

নাম তো মালুম নেই।

কতদিন হল আসছে এখানে?

করিব দো-তিন সাল হবে।

এসে কী করে?

কুছ মালুম নেহি বাবু। আসে, চলে যায়।

কতদিন থাকে?

রহতা নেহি। আকে চলা যাতা। দো তিন চার ঘণ্টা রহতা হ্যায়।

ওদের কী কথা হয় জানো?

নেহি হুজুর।

কখনও কিছু কানে আসেনি?

মালুম হোতা বাবুসে পয়সা লতা হ্যায়।

দেখেছ কখনও?

নেহি হুজুর। ব্যাঙ্ক কা যো কাগজ হ্যায় না, চেক?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেক।

ওহি লেতা হ্যায়।

কত টাকার চেক জানো?

নেহি হুজুর। এক দো দফে দেখা।

লোকটা ঘনঘন আসে?

দো-তিন মাহিনা বাদ বাদ।

আমি যে পুলিশের লোক তা তুমি জানো?

নেহি হুজুর।

আমি বাড়িটা একটু সার্চ করতে চাই।

বান্টা মাথা নেড়ে রলে, হুকুম নেহি হুজুর।

শবর মায়াভরা চোখে বান্টার দিকে একটু তাকাল। বান্টা বেশ বলবান, লম্বা চওড়া মানুষ। আড়ে দিঘে শবরের ডবল।

শবর ঘড়ি দেখল। তাকে আজকের তুফান বা ডিলাক্স এক্সপ্রেস ধরে ফিরে যেতে হবে। থানায় গিয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট বা সেপাই আনার সময় নেই। অগত্যা–

শবর এক পা বান্টার দিকে এগোল। তার ডান হাতটা বিদ্যুদ্বেগে একটা চপারের মতো নেমে এল বান্টার মাথায়। একটা শব্দও না করে বান্টা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সংজ্ঞাহীন।

বিশাল বাড়ির পিছন দিকটায় একটা বড় ঘর হল সর্বজিতের স্টুডিয়ো। একটু অগোছালো। একদিকে ডাই করা নতুন ক্যানভাস। অনেক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ছবি চারদিকে ছড়ানো। একধারে একটা টেবিল। তার ড্রয়ারগুলো খুঁজে দেখল শবর। অজস্র স্কেচ আঁকা কাগজ পাওয়া গেল। বেশিরভাগই মানুষের মুখ।

একদম তলার ড্রয়ারে একটা ম্যানিলা এনভেলপের মধ্যে একটা স্কেচ পাওয়া গেল অজস্র কাগজের মধ্যে। সেটা পকেটস্থ করল সে। তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে এল।

বাইরে তার ভাড়া-করা অটোরিকশা অপেক্ষা করছিল। সে উঠে পড়ল।

.

আপনি ডেভিড?

হ্যাঁ।

আপনার বাবার নাম জন ডালি?

হ্যাঁ।

উনি কী করেন?

একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

কীসের ইন্ডাস্ট্রি?

মেশিন পার্টস।

বিগ ম্যান?

হ্যাঁ।

আপনি কতদিন কলকাতায় আছেন?

পাঁচ-ছ বছর।

এখানে কী করেন?

ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট।

মাসে কত রোজগার হয়?

কিছু ঠিক নেই। দু’-তিন হাজার হবে।

এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত?

দু’ হাজার।

কীভাবে এত টাকা ভাড়া দেন?

দিই।

বাট হাউ?

ম্যানেজ করি।

টিনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?

উই আর ফ্রেন্ডস।

ইন্টিমেট?

সর্ট অফ।

আর ইউ ইন লাভ?

মে বি।

ডেভিড, প্রেমে পড়া অপরাধ নয়। বলুন।

সত্যি কথা বলতে কী, আমরা বন্ধু। তার বেশি কিছু নয়।

ডেভিড, আপনি টিনার বাবাকে চেনেন?

না। নেভার মেট হিম।

নেভার?

হ্যাঁ।

কথাটা বিশ্বাস করতে বলেন?

নয় কেন?

কথাটা সত্যি নয় বলে।

ডেভিড চুপ করে থাকে।

আপনি কতদিনের ড্রাগ অ্যাডিক্ট?

ড্রাগ! আই নেভার—

আই নো এ ড্রাগ অ্যাডিক্ট হোয়েন আই সি ওয়ান।

ডেভিড কাঁধ ঝাঁকাল। কিছু বলল না।

কতদিনের নেশা?

চার-পাঁচ বছর হবে।

ব্রাউন সুগার?

আই ওয়াজ অন হ্যাশ। রিসেন্টলি ব্রাউন সুগার। ইয়েস।

টাকা কে দেয়? সর্বজিৎ সরকার?

হি হ্যাজ মানি।

সেটা কথা নয়। টাকাটা উনি এমনি দেন না।

আমি কিছু সার্ভিস দিই।

সেটা জানি। হাউ ডিড ইউ মেক এ কন্ট্যাক্ট উইথ হিম?

টিনার কাছে শুনেছিলাম ওর বাবা ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড আনহ্যাপি। রিখিয়ায় থাকেন।

একদিন ওখানে গিয়ে হাজির হলেন?

হ্যাঁ।

তারপর?

আমাদের অনেক কথা হল।

কী কথা?

অ্যাবাউট হিজ ফ্যামিলি। হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড চিল্ড্রেন।

কী কথা?

সব ডিটেলসে মনে নেই। তবে—

তবে—

উনি ওঁর ওয়াইফকে খুব ঘৃণা করেন।

তাতে কী?

উনি আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। টু সিডিউস হিজ ওয়াইফ।

কিন্তু কেন?

টু টেস্ট হার চেস্টিটি পারহ্যাপস।

আপনি তাই করলেন?

হ্যাঁ, ইট ওয়াজ এ বিট ড্রামাটিক।

ওয়াজ ইট ইজি?

মোর অর লেস। মেয়েরা মধ্যবয়সে একটু অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা সেক্স স্টার্ভড।

সত্যি কথা বলছেন?

আই হ্যাভ নাথিং টু লুজ।

ছবিগুলো উনি কবে আঁকতে শুরু করেন?

তা জানি না।

এই স্কেচটা দেখুন। এটা কার মুখ?

বান্টু সিং-এর।

বান্টুর ছবি তো উনি কল্পনা থেকে আঁকেননি?

না। আই সাপ্লায়েড দা ফটোগ্রাফ।

আপনিই ওর ইনফর্মার তা হলে?

ইট ওয়াজ এ জব টু মি। জাস্ট এ জব।

এখন বলুন, ইরাদেবীর সঙ্গে আপনার কতটা ঘনিষ্ঠতা?

অনেকটাই।

তিনি কি আপনার প্রেমে পড়েছেন?

ঠিক তা বলা যায় না।

আপনি?

আই লাইক হার।

সেক্স?

ইয়েস। অকেশনালি। শি হ্যাজ প্রেজুডিস।

মা-মেয়ে দু’জনের সঙ্গেই?

না। টিনাকে আমি টাচ করিনি।

কেন, আপনার কি সংস্কার আছে?

তা নয়। তবে সর্বজিৎ সরকার ওটা সহ্য করতেন না।

ছবিগুলো আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ।

একটা পরিবারকে ওরকম এক্সপোজ করা কি ঠিক?

ডেভিড ফের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, স্যার, আমি কারও মরাল গার্জিয়ান নই। আমার টাকার দরকার। আমি কাজ করেছি।

আপনার বাবা জন ডালি আসলে কী করেন?

বললাম তো—

ওটা মিথ্যে কথা।

বাবা প্রফেসর। নাউ রিটায়ার্ড।

আপনি ডাক্তার?

পাশ করিনি। তবে ফোর্থ ইয়ার অবধি পড়েছি।

সর্বজিৎ সরকার কত টাকা এ পর্যন্ত দিয়েছেন আপনাকে?

হিসেব নেই। থার্টি-ফর্টি থাউজ্যান্ড হবে।

হাউ দা পেমেন্ট ওয়াজ মেড?

উনি চেক দিতেন, আমি কলকাতায় এসে ভাঙিয়ে নিতাম।

এবার একটা গুরুতর প্রশ্ন।

জানি। ইউ আর হোমিং ইন।

মার্ডারের দিন সকালে কোথায় ছিলেন?

নট অন দি স্পট।

দেন ইউ আর স্টেটিং দ্যাট ইউ আর নট গিল্টি?

ইফ ইট স্যুটস ইউ স্যার।

কখনও রিভলভার ব্যবহার করেছেন?

না। চোখেই দেখিনি।

ঠিক তো?

ডেভিড হাসল। কিছু বলল না।

ছবিগুলো হোটেল রুম থেকে কীভাবে চুরি যায়?

আপনি তো জানেন।

তবু শুনি।

আমি একজন বেয়ারাকে কিছু বকশিশ দিয়ে বলি সিংঘানিয়া ময়দানে বিপদে পড়েছেন। খবরটা যেন ওর লোকদের দেওয়া হয়।

তারপর?

ওরা তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি হোটেলে ঢুকি।

ঢুকতে দিল?

কেন দেবে না? আমি দু'দিন ওই হোটেলে ছিলাম যে।

মাই গড। তারপর?

ছবিগুলো আমার ঘরে ট্রান্সফার করে দিই।

তারপর?

পরদিন সর্বজিৎ সরকার এসে প্যাক করে নিয়ে যান।

ছবিগুলো এখন কোথায়?

জানি না। উনি বলেননি। অ্যাম আই আন্ডার অ্যারেস্ট?

এখনও নয়। কিন্তু আর একটা কথা।

বলুন।

রিগার্ডিং দা মার্ডার উইপন।

ইজি। আই স্টোল হার রিভলভার দ্যাট মর্নিং।

আবার জায়গামতো রিপ্লেস করেছেন কি?

ডেভিড মাথা নাড়ল, না। ওটা আর দেখিনি।

বলতে চান ওটা সর্বজিতের কাছেই আছে?

থাকতে পারে।

এই অপারেশনটার জন্য কত টাকা পেলেন?

টেন থাউজ্যান্ড অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচারস।

শুনুন ডেভিড, খুন করার মতো এলিমেন্ট সর্বজিতের মধ্যে নেই। হু ডিড ইট?

আমি জানি না স্যার। আই অ্যাম জাস্ট এ স্টুল।

ইউ আর অ্যাকসেসরি টু এ মার্ডার।

ডেভিড কাঁধ ঝাঁকাল, আই অ্যাম ইন মাই লাস্ট স্টেজ অফ অ্যাডিকশন। আই শ্যাল নট লিভ ভেরি লং। গো অ্যাহেড অ্যান্ড হ্যাং মি।

৫. ডোরবেল শুনে

ডোরবেল শুনে দুপুরে যখন দরজা খুলল কাজের লোক মাধবী, তখন সে যাকে দেখল তাকে চিনতে পারল না।

কাকে চাই?

ইরা নেই?

ওঃ, বউদি। না, উনি মার্কেটিং-এ গেছেন।

ও।

আপনি কে?

আমার নাম বরুণ দাস। আমি ইরার জেঠতুতো দাদা।

ও। বসুন তা হলে। বউদি এসে যাবেন।

অনেক দুর থেকে আসছি। একটু কফি খাওয়াবে?

হ্যাঁ, বসুন।

দাড়ি গোঁফ ও কালো চশমা পরা লোকটা বসল। মাধবী রান্নাঘরের দিকে চলে যাওয়ামাত্র লোকটা বেড়ালের মতো উঠে পড়ল। দ্রুত পায়ে ইরার ঘরের সামনে হাজির হয়ে একটা চাবি বের করে দরজাটা খুলে ফেলল। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল সে। দরজার অটোমেটিক লক বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটা লম্বা পায়ে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

একটু বাদে চা নিয়ে এসে মাধবী দেখল, লোকটা হাওয়া।

ইরা ফিরল আরও ঘন্টাখানেক বাদে।

ও বউদি, চোরাচোড় কিনা জানি না। একটা লোক এসেছিল। তোমার নাকি দাদা হয়। বরুণ দাস, চেনো?

ইরা ভ্রু কুঁচকে বলল, বরুণ দাস! যাঃ, জন্মে ও নাম শুনিনি। কীরকম চেহারা?

বেশ লম্বা, দাড়ি গোঁফ আছে, কালো চশমা।

ইরা শঙ্কিত হয়ে বলল, কী চাইছিল?

কফি খেতে চাইল। কফি এনে দেখি লোকটা নেই।

সর্বনাশ! কিছু নিয়ে যায়নি তো।

না। সন্দেহ হওয়ায় সব ভাল করে দেখেছি। কিছু নিয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ফট করে কেন যে লোকের কথা বিশ্বাস করিস! যাকে চিনিস না, তাকে কখনও বসতে দিবি না আমি না থাকলে।

ইরা নিজের ঘরের দরজা খুলল। কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই হঠাৎ চোখটা গিয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশের পাশে প্লাস্টিক শিটের ওপর রিভলভারটা শান্তভাবে শুয়ে আছে।

ইরা হিম হয়ে গেল। কে এসেছিল ঘরে? কীভাবে এল?

শবর এল আরও দু ঘণ্টা বাদে।

আপনার রিভলভারটা কোথায়?

আমার কাছেই আছে।

লেট মি সি ইট।

কেন বলুন তো!

ইরাদেবী, আপনার রিভলভারটা সিংঘানিয়াকে খুন করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং বাধা দেবেন না।

ঠিক আছে, দিচ্ছি। কিন্তু ওটা বাজেয়াপ্ত করবেন না।

আমার পক্ষে কথা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রিভলভারটা যে কিছুক্ষণের জন্য আপনার কাছে ছিল না সেটা আপনি আমাকে জানাতে পারতেন।

ইরা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বলল, ভয়ে জানাইনি।

শুনুন, ওটা হাত দিয়ে ধরবেন না। একটা রুমাল বা ঝাড়ন দিয়ে ধরে নিয়ে আসুন। যদিও জানি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না।

ইরা নিয়ে এল রুমালে করেই।

শবর সেটা একটা প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে ভরে বলল, কখন কে এটা দিয়ে গেল?

আমার কাজের লোক বলছে বরুণ দাস নামে কে একজন এসে আমার দাদা বলে পরিচয় দিয়ে কফি খেতে চায়।

কীরকম চেহারা?

লম্বা। দাড়ি গোঁফ আর কালো চশমা ছিল।

বাঃ, একেবারে রহস্য উপন্যাস। সে রিভলভারটা কীভাবে রেখে যায়?

আমার ঘরে।

ঘরে? ঘর তো তালা দেওয়া থাকে শুনেছি।

হ্যাঁ। বুঝতে পারছি না। সে ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই।

একটা কথা।

বলুন।

রিগার্ডিং ডেভিড। আপনার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

কী আবার! কিছু নয়।

লুকিয়ে লাভ নেই।

সুন্দরী ইরা হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে গেল লজ্জায়। মাথা নিচু করে বলল, ডেভিড ওয়াজ পারসিসেন্ট।

অ্যান্ড ইউ জাস্ট সারেন্ডারড?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানেন ও ড্রাগ অ্যাডিক্ট?

প্রথম প্রথম সন্দেহ হয়েছিল।

রিভলভারটা চুরি যাওয়ার পর পুলিশকে জানাননি কেন?

ভয় পেয়েছিলাম।

কীসের ভয়?

জানি না।

জানেন। রিভলভারটা যে ডেভিড চুরি করেছিল এটা বুঝতে পেরেই রিপোর্ট করেননি। পাছে পুলিশ ডেভিডকে ধরে এবং স্ক্যান্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঠিক কিনা!

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। আপনি ডেভিডকে কতখানি ভালবাসেন?

এটা ঠিক ওরকম ব্যাপার নয়। ডেভিড জোর করেই রিলেশানটা তৈরি করেছে।

আর আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন?

আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, আপনাকে বলেছি তো। ডেভিড ওই সময়ে আমাকে সঙ্গ দিত।

রোজ?

প্রায়ই। সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন।

ডেভিডকে সন্দেহ হত না?

সন্দেহ! কীসের সন্দেহ?

ওর কোনও আলটেরিয়র মোটিভ আছে কিনা।

ওর কোনও মোটিভ বুঝতাম না। ও পাগলের মতো আমাকে ভালবাসত।

চমৎকার।

ডেভিড কি কিছু করেছে? প্লিজ, বলুন।

জানি না। ইনভেস্টিগেশন চলছে। দেখা যাক।

৬. দরজা খুলে সর্বজিৎ দেখল

দরজা খুলে সর্বজিৎ দেখল, ডেভিড।

কী চাও ডেভিড?

ডেভিড হাসল, জাস্ট টু সি ইউ।

এখানে এসে ভুল করেছ। কখনও এসো না। চলে যাও।

মিস্টার সরকার, আমি বাঁচতে চাই।

তার মানে?

আমি ড্রাগ ছাড়তে চাই। একটা ক্লিনিকে ভরতি হব। আই নিড মানি।

তোমার তো টাকার অভাব হওয়ার কথা নয় ডেভিড। যথেষ্ট দিয়েছি।

ঠিক কথা। আর হয়তো বিজনেস টার্ম-এ আসব না আপনার সঙ্গে। প্লিজ, হেল্প মি।

কত চাও?

পঞ্চাশ হাজার।

মাই গড। এ তো অনেক টাকা।

না মিস্টার সরকার, এটা অনেক টাকা নয়। ক্লিনিকের খরচ অনেক। একজন মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করুন।

তুমি ভাবিয়ে তুললে। তোমার চাহিদার শেষ নেই।

আর আসব না। কথা দিচ্ছি।

ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কথার দামও থাকে না।

এবার দেখুন। শেষ বার।

আমি জানি টাকাটা তুমি ড্রাগের পিছনেই ওড়াবে। তারপর আবার চাইতে আসবে। তুমি কি ব্ল্যাকমেল করছ আমাকে?

না। ব্ল্যাকমেল কেন হবে?

ডেভিড, আমার মন ভাল নেই। সিংঘানিয়া খুন হওয়ায় আমার ঝামেলা বেড়েছে। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে। কে যে কাণ্ডটা করল কে জানে।

কোনও মাগার হবে।

মাগার হলে তো হতই। কিন্তু সব এমন কাকতালীয়ভাবে হবে কেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমার মাথা এখন খুব গরম। লিভ মি অ্যালোন।

জাস্ট একটা চেকে একটা সই। তার বেশি তো কিছু না।

ওঃ ডেভিড।

প্লিজ স্যার।

ঠিক আছে, তুমি ক্লিনিকের ঠিকানা দাও, আই উইল মেক দি পেমেন্ট দেয়ার।

কেন, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?

না ডেভিড, তোমাকে বিশ্বাস করার কারণ নেই।

এতদিন তো বিশ্বাস করেছিলেন।

না, করিনি। ইউ ডিড এ জব ফর মি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট।

ডেভিড একটু হাসল। সেই সুন্দর হাসি। তারপর জামার তলা থেকে একটা চপার বের করে বলল, রাইট দি চেক ইউ বাস্টার্ড।

ওটা কী হচ্ছে ডেভিড?

ইটস এ শো-ডাউন। রাইট ইট।

সর্বজিৎ এক পা পিছিয়ে গেল। তারপর বলল, ডেভিড, আমার সন্দেহ হয়, সিংঘানিয়াকে মেরেছ তুমিই। কেন মেরেছ? হিরের আংটির জন্য?

সেটা আমার ব্যাপার। আই ওয়ান্টেড হিম ডেড। নাউ আই ওয়ান্ট ইউ ডেড।

কেন ডেভিড?

ইউ আর রাসক্যালস। ডাউনরাইট রাসক্যালস। দি হোল সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ রাসক্যালস। রাইট দি চেক।

ডেভিড, বাড়াবাড়ি কোরো না। তুমি জানো, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি। এত টাকা কেউ তোমাকে কখনও দেয়নি।

ইয়েস, আপনার নোংরা ঘাঁটার কাজের জন্য টাকা দিয়েছেন। আমি নেশা করি বলে টাকা নিতে বাধ্য হয়েছি। তাতে কী? নাউ আই ওয়ান্ট টু এন্ড দি রিলেশন। রাইট দি চেক, ইট উইল বি দি ফাইনাল পেমেন্ট। দেয়ার উইল বি নো মোর ডেভিড অ্যান্ড নো মোর নাথিং।

বেশ, দিচ্ছি, কিন্তু গ্যারান্টি কী?

নো গ্যারান্টি। শুধু মুখের কথা।

সর্বজিৎ গিয়ে সুটকেসটা খুলল। এবং রিভলভারটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, নাউ গেট আউট।

ডেভিড রিভলভারটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখল। একটু হেসে বলল, ট্রায়িং টু স্কেয়ার মি? ইউ বাস্টার্ড–

সর্বজিৎ কোনও সময় পেল না। ট্রিগার টিপতে পারত। কিন্তু আঙুল বড় অবশ। চিতাবাঘের গতিতে ডেভিড এসে তার ওপর পড়ল। পরপর দু'বার চপারটা চালাল ডেভিড।

দুটো হেঁচকি তোলার শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল সর্বজিৎ। তারপর তার শরীর চমকাতে লাগল আহত সাপের মতো।

ডেভিড ভ্রুক্ষেপ করল না। সে সুটকেস খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল কাপড়চোপড়। তলা থেকে এক বান্ডিল নোট পেয়ে পকেটে পুরে ফেলল সে। টেবিলের ওপর থেকে মানিব্যাগটাও নিল।

তারপর দরজা খুলল।

গুড মর্নিং ডেভিড।

ডেভিড একটু পিছিয়ে গেল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দু'জন সিপাই ঘরে ঢুকে পড়ল। আহত সর্বজিতের দেহটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল তারা।

ডেভিড চেঁচাল, ইউ রাসক্যাল! বাস্টার্ড! কী করতে পারো তোমরা আমার কিছুই করতে পারো না। হ্যাং মি, শুট মি, কিপ মি ইন জেল, কিছুই যায় আসে না। আই অ্যাম বিয়ন্ড এভরিথিং। বিয়ন্ড এভরিথিং...

শবর করুণ চোখে চেয়ে রইল।

ডেভিড চিৎকার করতে লাগল, আই হেট ইউ! আই হেট ইউ অল। গো টু হেল বাস্টার্ডস। দুনিয়া গোল্লায় যাক। আমি তোমাদের সিভিলাইজেশনের মুখে পেচ্ছাপ করি...

চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন ডেভিড ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর দু হাত মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

শবর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকল শুধু।

ঈগলের চোখ (উপন্যাস) – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

---

১. বিষাণ

স্যার, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা আমার ধাতেই নেই। কিছুদিন দিব্যি রুটিন ফলো করতে পারি। সকালে ওঠা, দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান, বাটার টেস্ট আর ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট, পোশাক পরে তৈরি হয়ে ব্রিফকেস নিয়ে বউকে একটা আলতো চুমু খেয়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়া–এসব মাসখানেক দিব্যি পারি। তারপরই আমার অস্থিরতা আসে। সাংঘাতিক অস্থিরতা। মনে হয়। এইসব রুটিন আমার গলা কেটে ফেলছে, হাত-পায়ে দড়ি পরাচ্ছে, একটা নিরেট দেয়ালে ঠেসে ধরছে আমাকে। আমার তখন ভীষণ কষ্ট হয়। পাগল পাগল। লাগে। আর তখনই আমি আমার কয়েকজন মার্কামারা পুরনো বন্ধুকে খবর পাঠাই। তারা ভাল লোক নয় ঠিকই, তবে বন্ধু হিসেবে খুব, খুব বিশ্বস্ত। খবর পেলেই তারা এসে হাজির হয়ে যায়। আর আমি তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। উধাও হয়ে যাই। কাঁহা কাঁহা মুল্লুক চলে যাই। বেশিরভাগই হয় আদিবাসী ভিলেজ, নয়তো কোনও খনি এলাকা, ডক অঞ্চল। অর্থাৎ যেখানে ভদ্রলোকরা থাকে না। চোলাই খাই, জুয়া খেলি, ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে শুই। হয়তো এসব খুব খারাপ কাজ স্যার, কিন্তু ওইরকম বেপরোয়া বেহিসেবি পাগলাটে মর‍্যালিটিহীন কিছুটা সময় কাটালেই আমার অস্থিরতাটা চলে যায়।

তখন কি ফিরে আসেন?

হ্যাঁ স্যার। হয়তো এক সপ্তাহ কিংবা দিন দশ-পনেরো ওইরকম বাঁধনছাড়া জীবন কাটাতে না পারলে আমাকে সুইসাইড করতে হত।

আমাদের কাছে যা খবর আছে তাতে আপনার পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে রাজু শেঠ আর নিমু। কর্মকার ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। তা কি জানেন?

ওরা আমার আজকের বন্ধু নয় স্যার। ছেলেবেলা থেকে আমরা প্রায় একসঙ্গে বড় হয়েছি। ওদের সব জানি স্যার। রাজু খুব অ্যাগ্রেসিভ টাইপের। নিমু একটু চুপচাপ কিন্তু একরোখা। হ্যাঁ স্যার, আপনার ইনফর্মেশনে কোনও ভুল নেই।

প্রবাল, শতরূপ আর নন্দনও খুব ভাল লোক নয়।

স্যার, আমরা কেউ ভাল লোক বলে দাবি করছি না। আর ওই বন্ধুদের সঙ্গে বছরে দু'–তিনবারই আমার দেখা হয়। যখন আমরা উইকেন্ড অ্যাডভেঞ্চারে যাই। নইলে কে কী করে তা নিয়ে আর কেউ তেমন মাথা ঘামায় না।

আপনার এইসব অ্যাডভেঞ্চার আপনার স্ত্রী কী চোখে দেখতেন?

সে কি আর বলতে হবে স্যার? উনি আমাকে আপাদমস্তক ঘেন্না করতেন। যখন ফিরে আসতাম। তখন ওঁর চোখ যেন আমার সর্বাঙ্গে ছ্যাক দিত। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হত তখন।

রিকনসিলিয়েশন কীভাবে হত?

সময় লাগত স্যার। উনি আমাকে খুব অপমান করতেন, গালাগাল দিতেন।

ডিভোর্সের ভয় দেখাননি?

বহুবার। যতদূর জানি, ইদানীং ল-ইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন।

বিয়ে কতদিনের?

সাত বছর।

প্রেম করে, না নেগোশিয়েটেড?

আপনি কি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন স্যার?

জানি। তবু আপনি বলুন।

আমি প্রসাদ ফুড প্রোডাক্টের মালিকের ছেলে। সুতরাং আমাকে বড়লোকের ছেলে বলাই যায়। আমরা তিন ভাই, আমি মেজো এবং ফ্যামিলির ব্ল্যাক শিপ।

আমার মিসঅ্যাডভেঞ্চারের জন্য আমি বাবার চক্ষুশূল। তিনি হয়তো আমাকে ত্যাজ্যপুত্রই করতেন। কিন্তু একটা কারণেই করেননি। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই একমাত্র ফুড টেকনোলজি নিয়ে পড়েছি এবং পাশ করেছি। আমার আর দুই ভাই ম্যানেজমেন্ট পাশ করেছে এবং ব্যাবসাও বোঝে।। কিন্তু আমি প্রোডাকশনটা বুঝি। আপনি জানেন না যে আমি কিছু ইনোভেশন করার ফলে আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অনেক ভাল হয়েছে এবং বিদেশেও মার্কেট পাচ্ছে। শুধু এই কারণেই বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেননি। যাতে আমি শুধরে যাই সেইজন্যই শিবাঙ্গীর মতো সুন্দরী মেয়ে খুঁজে আমার বিয়ে দেন। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ স্যার।

বুঝলাম। আপনার স্ত্রী যে সুন্দরী তা আমরা জানি। কিন্তু শিবাঙ্গীও আপনাকে শোধরাতে পারেনি, তাই তো?

হ্যাঁ স্যার।

বেলঘরিয়ায় আপনাদের বিশাল বাড়ি থাকতেও আপনি এই সাউথ ক্যালকাটায় ফ্ল্যাট কিনে বাস করছেন কেন? বিশেষ কারণ আছে কি?

আইডিয়া আমার বাবার। কেন তা বলতে পারব না। বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। যা করেন ভেবেচিন্তেই করেন। আমার মা আপত্তি করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবা বলেছিলেন, শিবাঙ্গীর সঙ্গে আলাদা থাকলেই নাকি আমার ভাল হবে। এই ফ্ল্যাট বাবাই কিনে দিয়েছেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় আপনার ভাল হয়েছে কি?

না স্যার। আমি ইনকরিজিবল।।

স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

লুকওয়ার্ম। অলমোস্ট কোল্ড।

তার জন্য আপনি কাকে দায়ী করতে চান?

আমাকে। শিবাঙ্গী ভাল মেলে।

আপনার ওই মার্কামারা পাঁচজন বন্ধুকে কি আপনার স্ত্রী চেনেন?

ওরা আমার বাড়িতে বড় একটা আসে না। আমাদের বন্ধুত্বটা বাইরে। তবে শিবাঙ্গী ওদের দু-চারবার দেখেছে। বিয়ের সময়ে ওরা ইনভাইটেড ছিল। দু-তিনবার বিভিন্ন অকেশনে এসেছে। শিবাঙ্গী ওদের খুব ফর্ম্যালি চেনে। ঘনিষ্ঠভাবে নয়। সত্যি কথা বলতে কী, ওদের সঙ্গে আমারও বিশেষ যোগাযোগ থাকে না। যখন আমার ঘাড়ে অস্থিরতার ভূতটা চাপে তখনই ওদের ফোন করি, আর ওরা চলে আসে।

সবাই একসঙ্গেই চলে আসে?

না স্যার। তা কি হয়! সকলেই নানা ধান্ধায় ব্যস্ত। কখনও দু'জন বা তিনজন জুটে যায়। আজকাল পাঁচজন জোটে খুব কম।

এই বন্ধুরা কি সবাই ওয়েল অফ?

হ্যাঁ স্যার। কারও মানিটারি কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু স্যার, আপনি আমার বন্ধুদের সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন?

এ ম্যান ইজ নোন। বাই দি কম্পপ্যানি হি কিপস।

সে তো ঠিকই। আমরা সবাই ক্যালকাটা বয়েজ-এ পড়তাম। অ্যাকাডেমিক রেকর্ড কারওরই খুব খারাপ নয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের সবাই বদমাশ বলে জানত। অ্যান্ড দ্যাটস প্র6।।

এবার বলুন, জুন মাসের পাঁচ তারিখে আপনি এবং আপনার বন্ধুরা রাত বারোটার সময় কোথায় ছিলেন?

বন্ধুরা বলতে সবাই নয়। আমি, রাজু আর শতরূপ জুনের এক তারিখে গাড়ি নিয়ে বেরেই।

গাড়িটা কার?

রাজুর। রাজুর গাড়িরই ব্যাবসা। অন্তত তিনটে বড় বড় কোম্পানিকে ও বছরওয়ারি চুক্তিতে গাড়ি দেয়। সব কোয়ালিটি কার। তাই আমরা যখনই বাইরে

যাই তখনই রাজুর কাছ থেকে গাড়ি নিই।

বুঝলাম। এবার বলুন, কোথায় গিয়েছিলেন?

লোধাশুলি।

সেখানে কেন?

শতরূপের ওখানে একটা ফার্মহাউস মতো আছে। হাঁস, মুরগি, শুয়োরের খামার। সেইখানে।

তারপর?

পাঁচ তারিখ রাতেও আমরা শতরূপের ফার্ম হাউসেই ছিলাম স্যার।

ফার্ম হাউসের কর্মচারীরা সাক্ষী দেবে তো?

কেন দেবে না স্যার? তবে রাজু ছিল না। ওর জরুরি কাজ থাকায় দুই তারিখেই ফিরে এসেছিল। আমরা ফিরি ছয় তারিখের সকালে। ফার্ম হাউসের ডেলিভারি ভ্যান-এ।

কলকাতায় কখন পৌছন?

ভোর সাড়ে পাঁচটায়।

তারপর?

শত আমাকে এসপ্ল্যানেডে গ্র্যান্ডের সামনে নামিয়ে দেয়। আমি ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে আসি। এসব কথা আমি লোকাল পুলিশকে বলেছি স্যার। একাধিকবার বলতে হয়েছে।

জানি। হয়তো আরও কয়েকবার বলতে হবে।

ঠিক আছে। যতবার বলতে বলবেন, বলব। বাড়িতে ফিরে আমি বেল দিই। কেউ দরজা খুলল না। হঠাৎ মনে হল, দরজাটা লক করা নেই, শুধু আধভেজানো

আছে। আমি দরজা খুলে ঢুকি। সামনের হলঘরেই নন্দিনী উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। লট অফ ব্লাড। ক্লট হয়ে ছিল।

আপনার ফাস্ট রি-অ্যাকশন?

খুব নার্ভাস হয়ে, হাত-পা কেঁপে মেঝেতেই বসে পড়ি। কাউকে ডাকাডাকি করার মতো অবস্থা ছিল না। বোধহয় আরও আধঘণ্টা পর আমি শিবাঙ্গীকে ডাকতে ডাকতে হামাগুড়ি দিয়ে বেডরুমে যাই। অ্যান্ড শি। ওয়াজ লায়িং…

শিবাঙ্গীর সঙ্গে আপনি বাইরে গেলে ফোনে কথাটথা বলতেন না?

না স্যার। আমার হোয়ার আবাউটস সম্পর্কে ওর কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না।

আপনার কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে?

না স্যার।

কখনও ছিল?

না। আমার অনেক দোষ আছে, কিন্তু উওম্যানাইজার নই।

নারী-পুরুষের আকর্ষণ কোনও দোষের ব্যাপার কি?

আমি তা জানি না স্যার। আমি মরালিস্ট নই। কিন্তু আমার কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

নন্দিনী এ বাড়িতে কী করত? হাউস মেইড? মানে কাজের লোক?

ঠিক তা নয়। নন্দিনীকে এ বাড়িতে এনেছিল শিবাঙ্গী। এ বাড়িতে অনেক কাজের লোক আছে। কুক, ডাস্টিং-এর লোক, ডোমেস্টিক হেল্প মিলিয়ে অন্তত জনা চার-পাঁচ তো হবেই। নন্দিনী হাউসমাদারের মতো ছিল। ওভার অল সুপারভিশন করত। কিন্তু ওর আসল কাজ ছিল শিবাঙ্গীকে সঙ্গ দেওয়া। শিবাঙ্গীর একটা ছোট ব্যাবসা আছে। বিদেশ থেকে নানারকমের সুগন্ধের কনসেনট্রেট আনিয়ে তা দিয়ে পারফিউম তৈরি করা। ওর একটা ল্যাবও আছে। লার্জ স্কেলে করত না। লিমিটেড কিছু ক্লায়েন্টের জন্য করত। কিন্তু ব্যাবসাটা খুব ভালই চলত। নন্দিনী ওকে ব্যাবসার কাজেও হেল্প করত।

নন্দিনীকে কি স্যালারি দেওয়া হত?

হ্যাঁ স্যার। আমার ধারণা, মোর দ্যান ফিফটিন থাউস্যান্ড।

নন্দিনীর বয়স পঁচিশ-ছাবিবশের বেশি ছিল না, কোয়াইট গুড লুকিং। ম্যারেড?

জানি না স্যার। নন্দিনীর সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্তা হত না। শি ওয়াজ এ প্রাইভেট পারসন, ফোর্থ বেডরুমটায় থাকত। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখাও হত না।

তার মানে আপনার সঙ্গে নন্দিনীর কোনও অ্যাফেয়ার ছিল না?

না স্যার। কী বলছেন? নন্দিনীর সঙ্গে অ্যাফেয়ার? আমার তো মনে হয় নন্দিনী আমাকে শিবাঙ্গীর মতোই ঘেন্না করত। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

কী করে বুঝতেন যে নন্দিনী আপনাকে ঘেন্না করত?

আমার তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই। তবু দেখা হলে নন্দিনীর মুখে-চোখে রিপালশনের ভাব লক্ষ করেছি।

রেকর্ডে দেখছি আপনি এক সময়ে খেলাধুলো করতেন।

হ্যাঁ স্যার। আই ওয়াজ এ গুড অ্যাথলিট। স্প্রিন্টার ছিলাম। পরে আই টুক আপ টেনিস।

নেশাভা কবে থেকে শুরু করেন?

পাটিফাটিতে যেতে হত। সেই থেকেই শুরু।

আর বোহেমিয়্যানিজম?

ওটা আগে থেকেই ছিল। স্কুলে পড়ার সময় দু'বার পালিয়ে দেরাদুন আর লাদাখ চলে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কেমন যেন পাগলাটে ইচ্ছে হয় পালানোর।

আপনি একজন বিচিত্র মানুষ।

হ্যাঁ স্যার। অনেকে বলে, আমি পাগল।

আপনার স্ত্রীকে সেদিন সকালে আপনি কী অবস্থায় দেখেছিলেন?

বিছানায় উপুড় হয়ে শোওয়া। হাফ নেকেড। মাথা থেকে রক্ত পড়ে বিছানা ভেসে যাচ্ছিল। ঘ্যাস্টলি সিন। ভেবেছিলাম মরে গেছে।

আপনার কাজের লোকেরা কোথায় ছিল?

ওরা ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকে না। সারভেন্টস কোয়ার্টারে থাকে। কুক। আর একজন সবসময়ের লোক। বাকিরা ঠিকে। অত সকালে কেউ তো আসে না। আটটার আগে কারও আসবার হুকুম নেই।

তখন ক'টা বাজে?

হার্ডলি ছটা বা সোয়া ছ'টা।

কী করলেন?

প্রথমে সিকিউরিটিকে ডাকি। তারপর অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশ। কিন্তু সবটাই করেছি একটা ঘোরের মধ্যে। এরকম সাংঘাতিক ঘটনা তো কখনও দেখিনি।

আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

না স্যার। তবে শুনছি, পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করছে। এখনও কেন অ্যারেস্ট করেনি জানি না।

তার কারণ আপনার অ্যালিবাই। ঘটনাটা ঘটে পাঁচ তারিখে রাত বারোটার কাছাকাছি।

হ্যাঁ স্যার জানি। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ আমি সুপার কিলার লাগিয়ে কাণ্ডটা করেছি।

সেটা খুবই সম্ভব।

হ্যাঁ স্যার, এরকম ঘটনা আকছার ঘটছে। আর আমার তো মোটিভও আছে, কী বলেন?

হ্যাঁ। তা হলে কি আপনি স্বীকার করছেন যে কাণ্ডটা আপনারই?

না স্যার। আমি শিবাঙ্গী বা নন্দিনীকে খুন করার কথা কখনও ভাবিনি। কারণ, খুন করার পিছনে কোনও একটা উদ্দেশ্য তো থাকবে! আমার তো কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। শিবাঙ্গীর জ্ঞান ফিরলে এবং কথা বলার মতো অবস্থা হলে ওর কাছ থেকেই জানতে পারবেন। যে, আমি স্বামী হিসেবে অযোগ্য হলেও ভিনডিকটিভ নই। আমাকে ও কিছুদিন আগে মিউচুয়াল ডিভোর্সের কথা বলেছিল। আমি খুব অপরাধবোধের সঙ্গেই বলেছিলাম, আমি তো অপদার্থ, আমার সঙ্গে কোনও মহিলারই বসবাস করা সম্ভব নয়।

ডিভোর্সে আপনার মত ছিল?

ছিল। না থাকলেও ডিভোর্স ও পেয়ে যেত। দেড় কোটি টাকার একটা সেটলমেন্টের কথাও হয়েছিল।

বাঃ! এটাই তো মোটিভ! শিবাঙ্গী মারা গেলে আপনার দেড় কোটি টাকা বেঁচে যেত। তাই না?

হ্যাঁ স্যার। আমি তো বলেইছি আমার মোটিভের অভাব নেই। পুলিশ আমাকে অনায়াসে ঝুলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নন্দিনীকে খুন করার পিছনে আমার কী মোটিভ থাকতে পারে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।

মোটিভ আছে বিষাণবাবু।

আছে তা হলে তো হয়েই গেল। কিন্তু নন্দিনীর সঙ্গে আমার তো সম্পর্কই ছিল না স্যার।

আপনি কখনও নন্দিনীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চেক করেছেন কি?

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট! না স্যার, ফেসবুকের কথা লোকের মুখে শুনি বটে, কিন্তু আমি কখনও ফেসবুক চেক করি না। কখনও ইন্টারেস্টই হয়নি। কেন স্যার, ফেসবুকে কি নন্দিনী আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে?

ক্যাটেগরিক্যালি নয়, তবে কিছু হিন্ট আছে। নন্দিনী একজন রহস্যময় পুরুষের কথা লিখেছে। তার পুরো নাম বা ছবি লোড করেনি। শুধু ইনিশিয়াল দেওয়া আছে, আর ইনিশিয়াল হল বি পি। আপনার নামের আদ্যক্ষর। আপনি কি জানেন নন্দিনী ছবি আঁকতে জানত কিনা?

না। স্যার, নন্দিনী সম্পর্কে আমি বেশি কিছুই জানি না। শুধু জানি সে ছিল শিবাঙ্গীর ডান হাত। তাকে ছাড়া শিবাজীর এক মুহূর্তও চলত না। দু'জনের খুব ভাব ছিল, বন্ধুর মতো। এমপ্লয়ার-এমপ্লয়ির মতো নয়।

এতে কি আপনি বিরক্ত হতেন?

না। স্যার, বিরক্ত হব কেন? বরং শিবাঙ্গী যে মনের মতো একজন সঙ্গিনী পেয়েছে তাতে আমি খুশিই হতাম।

নন্দিনী কখনও আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইন্টারফিয়ার করত?

না স্যার। কারণ শিবাঙ্গীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হত না। বরং দু'জনের মধ্যে একটা নীরবতাই ছিল। কোলান্ড ডিসট্যান্স। তবে কখনও সখনও শিবাঙ্গী গায়ের ঝাল। ঝাড়ত। একতরফা। আমি কখনও জবাব দিতাম না। কারণ আমি সর্বদাই পাপবোধে ভুগতম। আমি যে অন্যায় করছি তা তো আমি জানি।

সেয়ানা পাপী?

হ্যাঁ স্যার, আমাকে ওটা বলাই যায়। কিন্তু নন্দিনীর ছবি আঁকা নিয়ে আপনি কিছু জানতে চাইছিলেন।

হ্যাঁ। তার কারণ, নন্দিনীর মোবাইলে আমরা আপনার কয়েকটা ছবি পেয়েছি।

মাই গড! আমার ছবি। নন্দিনীর মোবাইলে? অসভ্য ছবি নয় তো স্যার?

কেন, সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি?

আজকাল মডার্ন টেকনোলজি দিয়ে কত কী করা যায়।

না, অসভ্য ছবি নয়। আর ছবিগুলো কোনও অ্যালবাম থেকে তোলা হয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, নন্দিনীর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে

আপনার ছবি থেকে করা একটা স্কেচ আপলোড করা আছে। পাশে লেখা ‘মিস্টিরিয়াস বি পি ইজ মিরাজ টু মি’।

তার মানে কী স্যার?

আমার ডিডাকশন হল, নন্দিনী আপনার প্রেমে পড়েছিল।

এতে কি আমার খুশি হওয়া উচিত? কিন্তু স্যার, আমার তো শুনে কোনও খুশি হচ্ছে না।

খুশি না হওয়াই ভাল। কারণ এই মেসেজটা আপনাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

ও গড!

নন্দিনীর দিক থেকে আপনি কখনও কোনও ইশারা-ইঙ্গিত পাননি? কখনও না? ভাল করে ভেবে দেখুন।

ইশারা-ইঙ্গিত! বিশ্বাস করুন স্যার, নন্দিনী ওয়াজ এ ভেরি সিরিয়াস টাইপ অফ উওম্যান। সবসময়ে গভীর, সবসময়ে এনগেজড ইন সাম ওয়ার্ক। ওর গলার স্বরও আমি বিশেষ শুনতে পেতাম না। আর আমি বাড়িতে থাকতামই বা কতক্ষণ বলুন। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ন’টার মধ্যে বেরিয়ে যেতাম। ফিরতে রাত। বেশিরভাগ সময়েই ডিনার বাইরে খেয়ে আসতাম। আর শিবাঙ্গী বা নন্দিনীও তো বাড়িতে বসে থাকার লোক নয়। শিবাঙ্গীর ব্যাবসা ছাড়াও নানা সোশ্যাল এনগেজমেন্ট আছে। সুতরাং, নন্দিনী কী করে ইশারা-ইঙ্গিত করতে পারে? বরং আমার মনে হয় শি হেটেড মি।

আমি আপনাকে আর একটু কনসেনট্রেট করতে বলছি। আর একটু ভাবুন। কোনওদিন কোনও ছোটখাটো ইনসিগনিফিক্যান্ট কিছু মনে পড়ে কি?

স্যার, শিবাঙ্গী আমাকে ঘেন্না করে ঠিকই, কিন্তু কোনও মহিলা আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড হলে শি। উইল নো ইট ইমিডিয়েটলি। এবং সে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়।

আর ইউ শিয়োর?

হ্যাঁ স্যার। আমাদের বিয়ের পরই ওর এক বান্ধবী আমার সঙ্গে একটু ঢলাঢলি করার চেষ্টা করেছিল। শিবাঙ্গী তাকে এমন অপমান করে যে সে আর কখনও মুখ দেখায়নি।

শুনুন মশাই, নন্দিনী সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। আপনার ই-মেলের পাসওয়ার্ড নন্দিনী কী করে জানল?

আমার পাসওয়ার্ড! ইম্পসিবল।

নন্দিনীর ঘরের ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে পুলিশ অন্তত ছয়-সাতটা ই-মেল-এর প্রিন্ট আউট পেয়েছে যেগুলো আপনার অ্যাড্রেসে এসেছিল।

মাই গড। এটা কীভাবে সম্ভব?

আপনি খুব ভাল অভিনেতা নন বিষাণবাবু।

না। স্যার, আমি অ্যাকটিংটা পারি না। নেভার ইন মাই লাইফ। এখনও অ্যাকটিং করছি না। আমি সত্যিই বিস্মিত।

যদি প্রমাণ হয় যে নন্দিনীর সঙ্গে আপনার একটা গোপন সম্পর্ক ছিল তা হলে কিন্তু আপনি অগাধ জলে পড়বেন।

বুঝতে পারছি স্যার। আমার ভবিষ্যৎ খুব ভাল দিকে টার্ন করছে না। ই-মেল-এ কি কিছু ক্লু পাওয়া গেছে স্যার?

অবশ্যই।

দেন আই অ্যাম ডুমড্।

আপনি কি রেগুলার আপনার ই-মেল চেক করেন?

না। স্যার, আমার ই-মেলের যোগাযোগ বেশি মানুষের সঙ্গে নেই। মাঝে মাঝে খুলে দেখি। জাঙ্ক মেল-ই বেশি থাকে। আমাকে কম্পিউটারে অনেক কাজ করতে হয় বটে, কিন্তু ই-মেল বড় একটা দেখা হয় না। কী আছে স্যার আমার ই-মেল-এ?

একটা মেসেজ ছিল, ডু ইউ নো হু ওয়াজ হোল্ডিং ইয়োর হেড হোয়েন ইউ ওয়্যার ভমিটিং লাস্ট নাইট? ডিড ইউ হিয়ার মাইহাট বিট হোয়েন আই ওয়াজ হোল্ডিং ইউ ক্লোজ টু মাই ব্রেস্ট? ইউ পুয়োর রেচেড ম্যান!

এই মেসেজের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।

আপনি বাড়িতে মাতাল অবস্থায় ফিরলে কেউ কি আপনাকে অ্যাটেন্ড করে রেগুলার?

আগে মাঝে মাঝে শিবাঙ্গী এসে ধরত। বমিটমি করলে সব পরিষ্কার করত। সিমপ্যাথি ছিল স্যার। কিন্তু সেটা আমিই নষ্ট করে দিয়েছি।

মনে করে দেখুন, ইদানীং–

স্যার, মাতাল অবস্থায় যা ঘটে তা পরে আর মনে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আবছা মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে মাতাল অবস্থায় আমাকে কেউ দু-চারবার অ্যাটেন্ড করেছে। আমি ভেবেছিলাম, কাজের লোকজনই হয়তো হবে।

মহিলা না পুরুষ?

মনে হয় মহিলা।

ভাল করে ভেবে দেখুন, মহিলাটি নন্দিনী কিনা।

হলেও হতে পারে স্যার। মাতালের অবজার্ভেশন খুব একটা নির্ভরযোগ্য তো নয়। কিন্তু ব্যাপারটা একটা ধাঁধার মতো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আপনার ল্যাপটপ আছে?

আছে।

নিয়ে আসুন।

এক মিনিট স্যার।

বলে বিষাণ উঠে তার স্টাডি থেকে ল্যাপটপটা নিয়ে এল। তারপর ল্যাপটপ খুলে মন দিয়ে তার ই-মেল খুলে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, দেখুন স্যার, ওরকম কোনও মেল আমার অ্যাকাউন্টে নেই।

এখন নেই, কিন্তু ছিল। কোনও কারণে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা করার আগে নন্দিনী একটি প্রিন্ট আউট বের করে নিয়েছে। মোট চারটি মেল। এবং মেলগুলো বেশ প্যাশনেট অ্যান্ড রোম্যান্টিক। ব্যাপারটা খুলে বললে ভাল হয় না?

জানা থাকলে বলতাম স্যার। কিন্তু রোম্যান্টিক সম্পর্কই যদি হবে তা হলে নন্দিনীকে খুন করব কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, সেটা একটা চিন্তার বিষয়।

স্যার, শুধু নন্দিনী কেন, আমার মতো একজন রুইনড ম্যানের সঙ্গে দুনিয়ার কোনও মেয়েই কি রিলেশন তৈরি করতে চাইবে?

দুনিয়াটা বড় অদ্ভুত জায়গা, কত কী যে হয় বা হতে পারে তার কোনও লজিক বা মাথামুন্ডু নেই।

স্যার, আমি আইনকানুন জানি না। আমাকেই কি খুনি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে?

না, এখনও নয়। আমরা শিবাঙ্গীর ওপর নির্ভর করছি। উনি এখনও কোমায়। ডাক্তাররা কোনও ভরসার কথা বলছেন না। তবে এখুনি ফ্যাটাল কিছু হয়তো হবে না। উনি চেতনায় ফিরলে ভাইটাল উইটনেস হয়ে দাড়াবেন। এখন আপনার ভাগ্য।

আমার ভাগ্য ভাল নয় স্যার। আমাদের বাড়িতে প্রচুর জ্যোতিষীর চর্চা হয়। আমার মা আর বাবা দু'জনেই খুব জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। আমাদের বাড়িতে বড় বড় জ্যোতিষীর যাতায়াত আছে। তারাই বলেছে, আমার কুষ্ঠিতে নাকি অনেক খারাপ ব্যাপার আছে।

কীরকম?

তা আমি জানি না। স্যার, আমার মা জানে। এক সময়ে আমাকে মায়ের চাপাচাপিতে অনেক আংটি আর তাবিচ-কবজ পরতে হয়েছিল। বড় হয়ে সেগুলো ত্যাগ করেছি।

আপনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন?

না স্যার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জ্যোতিষীরা আমার ভাগ্য নিয়ে মিথ্যে হয়তো বলেনি।

আপনার কি মনে হয়। শিবাঙ্গী আপনার ফেবারে সাক্ষী দেবে?

না স্যার। তা কী করে সম্ভব? পুলিশ বলছে খুন করতে এসেছিল ভাড়াটে খুনিরা।

শিবাঙ্গী বড়জোর বলবে আততায়ীদের সে চেনে না। সেক্ষেত্রে তো আমার রেহাই পাওয়ার কথা নয়।

একজ্যাক্টলি। শিবাঙ্গীর সংজ্ঞা ফিরলেও আপনার লাভ নেই।

না স্যার। গত পাঁচদিন ধরে আমিও নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ভেবেছি। মনে হচ্ছে আমার রেহাই পাওয়ার কোনও রাস্তা নেই।

বাই দি বাই, আমি শুনলাম, আপনি গত সাতদিন একফোঁটাও মদ্যপান করেননি। সত্যি নাকি?

সত্যি স্যার। ইন ফ্যাক্ট আমার মদ খাওয়ার কথা মনেই হয়নি। এতটা শকড যে, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো সব হাওয়া হয়ে গেছে। সেই জায়গায় আমার মনের মধ্যে গুহার মতো একটা ভয়।

ভয় জিনিসটা কি গুহার মতো?

আমার যেন ওরকমই মনে হল।

গত পাঁচদিন কি আপনি বাড়িতেই বসে আছেন?

হ্যাঁ স্যার। প্রথম তিন-চারদিন তো সারাদিন ধরে পুলিশের জেরা চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই থানায় টেনে নিয়ে গেছে। স্নান-খাওয়ার সময়ও পাইনি। আমি এত

টায়ার্ড যে মনে হচ্ছে, বুড়ো হয়ে গেছি। স্যার, আমি তো পুলিশকে বলেছি যে, আমি ফেঁসে গেছি। আমার আর বেশি কিছু বলার নেই।

বলার অনেক কিছু আছে। আপনি ঠিকমতো চেষ্টা করলে হয়তো ভাইটালি কোনও কু পাওয়া যেত। বিশেষ করে নন্দিনী সম্পর্কে।

নন্দিনী সম্পর্কে আমি তো প্রায় কিছুই জানি না স্যার। যেটুকু জানা ছিল বলেছি।

আপনার পাসওয়ার্ড কি আপনি কাউকে জানিয়েছেন, বা কোথাও লিখে রেখেছিলেন?

না স্যার। আমি সজ্ঞানে অন্তত করিনি।

কিন্তু পাসওয়ার্ড নন্দিনী জানত। সেটা কীভাবে সম্ভব?

আমার কথা যে কেউ বিশ্বাস করছে না তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার তো কিছুই করার নেই।

আপনার বেডরুম আর শিবাঙ্গীর বেডরুম কি আলাদা?

হ্যাঁ স্যার। পাশাপাশি।

বরাবর কি এরকমই বন্দোবস্ত ছিল? দু'জন দুই ঘরে?

না। আগে আমরা একই বেডরুম আর বেড শেয়ার করতাম। পরে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকায় এই সিস্টেম চালু হয়।

দুই ঘরের মধ্যে একটা লিংকিং দরজা আছে। সেটা কি বন্ধ থাকত?

হ্যাঁ স্যার। শিবাঙ্গীর দিক থেকে বন্ধ থাকত।

আর হলঘরের দিকের দরজাটা?

শিবাঙ্গীর কথা জানি না। তবে আমার বেডরুমের হলঘরের দরজাটা লক করা থাকত না। কারণ, আমার ঘরে তেমন কোনও ভ্যালুয়েবলস নেই। আমার হাতঘড়িটা বেশ দামি, আর মোবাইল ফোনটাও। আর হ্যাঁ, ল্যাপটপ। এগুলোর

জন্য দরজা লক করার দরকার ছিল না। বাইরে সিকিউরিটি আছে, ফ্ল্যাটের দরজাও রাতে বন্ধ থাকে।

আমি চুরির কথা ভাবছি না। একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন করছি। জবাবটা এড়িয়ে যাবেন না।

আমার লুকোনোর কিছু নেই।

শিবাঙ্গীর সঙ্গে আপনার সেক্সুয়াল রিলেশন কি একদম ছিল না?

সেই অর্থে ছিল না বললেই হয়।

তার মানে কখনও সখনও আপনারা মিলিত হতেন কি?

সত্যি কথা বলতে কী, আমার দিক থেকে কোনও উদ্যোগ ছিল না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি শিবাঙ্গীকে খুব ভয় পেতাম। ওর সামনে খুব পাপবোধে ভুগতাম। নিজেকে ছোট মনে হত। কিন্তু শিবাঙ্গী কখনও সখনও চলে আসত গভীর রাতে। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্যাট।

কিন্তু আপনি তো রোজই মদ্যপান করে ঘুমোতেন?

কম বা বেশি এবং প্রায় রোজই। কিন্তু কখনও সখনও বাদও গেছে। আমার দাদুগত বছর অনেক বয়সে মারা যান। হি ওয়াজ মাইমেন্টর। দাদুর মৃত্যুর পর আমি দিন পনেরো এক ফোঁটাও মদ খাইনি। আমি খুব একটা রিলিজিয়াস লোক নই, তবু পুজোটুজোর দিনে আমি মদ খাই না।

আপনার কাজের লোকেরা অবশ্য তাই বলেছে। কিন্তু এবার আমি আপনাকে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে চাই।

করুন স্যার।

শিবাঙ্গীর সঙ্গে লাস্ট কবে আপনার ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে?

একটু ভেবে বলতে হবে স্যার। দু’মিনিট।

ভাবুন।

মে মাসের শেষ দিকে বোধহয় চব্বিশ বা পঁচিশ তারিখে।

ভেবে বলছেন তো!

খুব অ্যাকুরেট না হলেও দুটোর মধ্যে যে কোনও একটা দিন। আর তার আগে, মে মাসের ষোলো তারিখে।

শিয়োর?

মোটামুটি শিয়োর।

আপনি কি ড্রাংকেন অবস্থায় এনগেজড হয়েছিলেন?

অন্তত খুব একটা সচেতনও ছিলাম না।

আপনি আপনার স্ত্রীর হোয়ার অ্যাবাউটস সম্পর্কে কতটা খবর রাখেন?

খুব একটা নয়। উই লেড সেপারেট লাইভস।

উনি কি এসে আপনাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলতেন?

না। কখন আসত আমি টের পেতাম না। এমব্রেস করত, চুমু খেত। অ্যান্ড…

বুঝেছি। আপনার কখনও সন্দেহ হয়নি যে মহিলাটি শিবাজী নাও হতে পারে?

কী বলছেন স্যার? ইমপসিবল! শিবাঙ্গী ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

উত্তেজিত হবেন না বিষাণবাবু। এই ফ্ল্যাটে আপনি, শিবাঙ্গী আর নন্দিনী ছাড়া আর কেউ কি রাত্রিবাস করে?

জাহ্নবী। ও মেয়েটা শিবাঙ্গীর খুব ন্যাওটা। অল্পবয়স থেকে আছে। শুনছিলাম, শিবাঙ্গী তার বিয়ের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এসবই তো পুলিশ জানে স্যার।

হ্যাঁ। তবু জানার তো শেষ নেই বিষাণবাবু। ফর ইয়োর ইনফর্মেশন মে মাসের চব্বিশ আর পঁচিশ তারিখে শিবাঙ্গী কলকাতায় ছিল না। ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিল।

২. জাহ্নবী

জাহ্নবী গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিল মাত্র পনেরো বছর বয়সে। রঘুবীর সিং শিখিয়েছিল। ম্যাডামের হুকুমে। সবে যখন ষোলোয় পা তখন একদিন ম্যাডাম নিয়ে গেল তার ড্রাইভিং লাইসেন্স করাতে। বয়সের গড়বড় তো ছিলই, কিন্তু ম্যাডাম কলকাঠি নেড়ে বয়স বাড়িয়ে লাইসেন্স বের করে দিয়ে বললেন, এখন থেকে তুই আমার গাড়ি চালাবি।

জাহ্নবীর বুক ধড়ফড়, ওরে বাবা! কলকাতার রাস্তায় আমি চালাব?

ভয় পেলে থাক। কিন্তু সাহস করলে পেরে যাবি। আমি তোর চেয়েও অল্প বয়সে গাড়ি চালিয়েছি।

জাহ্নবীর সাহসের অভাব ছিল না। প্রথম কয়েকদিন ম্যাডাম সামনের সিটে তার পাশে বসে একটু-আধটু গাইড করত। মাসখানেকের মধ্যে হাত-পা সব সেট হয়ে গেল। সেই থেকে সে ম্যাডামের ড্রাইভার।

ওখানেই থেমে থাকতে দেয়নি ম্যাডাম। বাড়িতে ম্যাডামের যে সব বিউটিশিয়ান আসত তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে ক্র প্লাক, ম্যানিকিয়োর, পেডিকিয়োর, মাস্ক তৈরি করা এবং কয়েক রকমের চুলের ছাঁট দিতেও শিখেছে সে। ম্যাডামের একটাই কথা ছিল, ট্রেনিং থাকলে ঝি খেটে মরতে হবে না, বুঝলি?

জাহ্নবীর এখন সতেরো বছর বয়স। ছিপছিপে জোরালো চেহারা। ম্যাডাম নিজের সঙ্গে তাকে জিম করাত, ওয়েট ট্রেনিং আর যোগা। জাহ্নবী বুঝতে পারছিল, ম্যাডাম তাকে তৈরি করে দিচ্ছেন। ম্যাডামের পারফিউম ল্যাবেও সে কাজ করে। ভারী মজার কাজ। কনসেনট্রেটেড নির্যাস থেকে ব্যবহারযোগ্য পারফিউম তৈরি করা, খুব বড় ব্যাবসা নয়। মাত্র কয়েকজন বাঁধা খদের। তৈরি হতে না হতে বিক্রি হয়ে যায়। দাম খুব চড়া।

সতেরোতে এসে সব উলটেপালটে গেল। ম্যাডাম হাসপাতালে আইসিইউ-তে। বাঁচেন কিনা সন্দেহ। নন্দিনী ম্যাডাম খুন। পুলিশের জেরায় জেরায় বাঁঝরা হয়ে সে এখন বাধ্য হয়ে তাদের হাজরার বস্তিতে নিজের সংসারে এসে উঠেছে। ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্টে টাকা কম নেই। মাসের বেতন ব্যাঙ্কে জমা হয়ে যেত। কিন্তু এখন তার ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত। কী হবে কে জানে! তবে জাহ্নবীর ভয়ডর বিশেষ নেই।

তার মোটামুটি ভয়হীন জীবনে অনেকদিন বাদে হঠাৎ একটু যেন ভয়ের ব্যাপার ঘটল। খুন-জখম হয়ে যাওয়ার পর পুলিশের হুজতে হয়রান হয়েও ভয়টয় বিশেষ হয়নি তার। কিন্তু সোমবার সকালে জিনস-এর প্যান্ট আর সাদা হাওয়াই শার্ট পরা যে লোকটা তার সঙ্গে কথা বলতে এল তার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুকটা ধড়ধড় করে উঠল। তার। অথচ লোকটা তেমন লম্বাচওড়া নয়। বরং একটু ছোটখাটো চেহারাই। পালোয়ানি শরীরও নয়। তবে গড়নটা মজবুত। কিন্তু চোখ দুটোই হাড় হিম করা। কাল রাতে মোবাইলে বড়বাবু তাকে ফোন করে বলে দিয়েছিলেন, সকালে সে যেন কোথাও না যায়, একজন গোয়েন্দা তাকে প্রশ্ন করতে আসবে।

যে এল তার নাম শবর দাশগুপ্ত। জিপ থেকে নেমে গলির রাস্তায় পা দিতেই বাচ্চু ছুটে এসে খবর দিল জাহ্নবীকে, কে এসেছে জানিস? শবর দাশগুপ্ত। সুপার কপ।

শবর দাশগুপ্তকে একটা চেয়ার দেওয়া হল। গোমরামুখো নয়। আবার বোকা বোকা হাসিও নেই মুখে। চারদিকে চেয়ে তাদের ঘরদোর একটু দেখল, তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, এখানে কবে এসেছ?

ছয় তারিখে।

শিবাঙ্গীর বাড়িতে কতদিন আছ?

তেরো বছর বয়স থেকে।

তেরো বছর।

হ্যাঁ।

তেরো বছর বয়সের কাউকে কাজে রাখা বে-আইনি তা জানো?

বাঃ রে! আমি যখন আমার মায়ের কাছে থাকতাম তখনও তো ঘরের কাজ করতে হত। সাত-আট বছর বয়স থেকেই জল আনা, বাসন মাজা, ঘর ব্যাটানো, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা, সব। সেটা বে-আইনি নয়?

শবর এবার হাসল। ঝকঝকে সাদা দাঁত। তাকে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, শুনেছি। তুমি ষোলো বছর বয়স থেকেই গাড়ি চালাও।

হ্যাঁ। ম্যাডাম আমাকে সব কাজে পাকা করতে চেয়েছিলেন। আমি এক বছর যাবৎ গাড়ি চালাচ্ছি। কখনও কোনও অ্যাক্সিডেন্ট করিনি। কোনও কেস খাইনি।

হ্যাঁ। আমি তোমার রেকর্ড চেক করেছি।

আপনি কি আমার লাইসেন্স ক্যানসেল করে দেবেন?

না। ওটা মোটর ভেহিকলস ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আর তুমি যখন গাড়ি ভালই চালাও তখন আমার গরজ কীসের?

থ্যাঙ্ক ইউ।

তুমি পুলিশের জেরায় বলেছ, ঘটনার সময়ে তুমি বাড়িতে ছিলে না।

না। পুলিশকে আমি তো বলেইছি যে সেই রাতে আমি ম্যাডামের বোন শ্যামাঙ্গীকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম বড় গাড়িটা নিয়ে। রাত বারোটায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ল্যান্ড করার কথা ছিল।

রাতের ফ্লাইটে রিসিভ করতে তোমাকে পাঠানো হয়েছিল কেন?

ওটা ইমার্জেন্সি ছিল। রঘুবীর সিং-এর মায়ের দয়া হয়েছিল সেদিনই। সকালে। তাই ম্যাডাম আমাকে পাঠান।

তুমি একা?

না। সঙ্গে বুম্বা ছিল।

বুম্বা মানে ইস্তিরিওয়ালা? নীচে যার গুমটি আছে?

হ্যাঁ। শ্যামাঙ্গী ম্যাডামের ফ্লাইট আধঘণ্টা লেট ছিল। রাত একটায় আমি ওঁকে পিক আপ করি। তারপর সোজা বারুইপুর। ফেরার সময় অবশ্য বুম্বা বাইপাসে সায়েন্স সিটির কাছে নেমে ফিরে আসে।

তুমি রাতে বারুইপুরে শ্যামাঙ্গীদের বাড়িতেই ছিলে?

হ্যাঁ। অত রাতে ওঁরা ফিরতে দিলেন না।

তুমি কখন খবর পাও?

খবর পাইনি। শ্যামাঙ্গী ম্যাডাম অনেকবার আমাদের ম্যাডামকে ফোন করেন। নন্দিনী ম্যাডামের নম্বরেও ফোন করা হয়। নো রিপ্লাই। আমরা ভাবলাম ম্যাডামরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। শোওয়ার সময় ম্যাডাম ফোন সাইলেন্ট মোডে রেখে শুতেন। ওঁর ঘুমের প্রবলেম ছিল।

ওখান থেকে কখন ফিরে এসেছিলে?

সকালে ব্রেকফাস্টের পর। রাতেই আমি ম্যাডামকে একটি মেসেজ করে রেখেছিলাম যে, সকালে ফিরব। আমি সাড়ে আটটায় পৌছাই এসে। তখন পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। বাইরেও খুব ভিড়।

তুমি কি শিবাঙ্গীর সঙ্গে ফ্ল্যাটের মধ্যেই থাকো?

সবসময়ে নয়। সারভেন্টস কোয়াটারে আমার ঘর আছে। তবে অনেক সময়েই ম্যাডাম রেখে দিতেন।

নন্দিনী ম্যাডাম সম্পর্কে কিছু বলবে?

সব বলা হয়ে গেছে। তিন-চারবার করে। আর কী শুনবেন?

যা বলা হয়নি। ধরে যদি জিজ্ঞেস করি বিষাণ রায়ের সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্কটা কেমন ছিল। বা তুমি ওই দু’জনের মধ্যে কিছু লক্ষ করেছ কিনা।

না, কিছু ছিল না। দাদা ভীষণ ভাল লোক। ভীষণ ভাল।

বিষাণ রায়কে কি তুমি দাদা বলে ডাকো?

হ্যাঁ।

তা হলে শিবাঙ্গীকে বউদি নয় কেন?

উনি বউদি ডাক পছন্দ করেন না।

তুমি বিষাণ রায়কে পছন্দ করো?

কেন করব না? দাদা খুব ভাল।

বিষাণ মদ খায়, জানো তো!

ধুস। আজকাল কে না খাচ্ছে! ম্যাডাম খেতেন, নন্দিনী ম্যাডাম খেতেন, আমিও কতদিন খেয়েছি।

বুঝলাম। বিষাণের কী কী গুণ আছে বলতে পারো?

আমি তো অতি জানি না। তবে দাদা কখনও মিথ্যে কথা বলে না, কখনও চেঁচামেচি করে না, কখনও কাউকে অপমান করে না, ম্যাডাম দাদাকে যা খুশি বললেও দাদা কখনও উলটে কিছু বলে না। মদ খাওয়া ছাড়া দাদার মধ্যে আমি কখনও কোনও বেচাল দেখিনি। আর ম্যাডাম ইচ্ছে করলেই দাদাকে মদ ছাড়াতে পারতেন।

কীরকম?

দাদা তো ম্যাডামকে ভীষণ ভয় পায়।

ভয় পায় কেন?

ম্যাডামের সব ভাল, কিন্তু বড্ড রিগচটা। খুব সামান্য কারণেই ভীষণ রেগে যান। দাদা ওই রাগকেই বোধহয় ভয় পায়।

শিবাজীর সঙ্গে নন্দিনীর কীরকম ভাব ছিল?

দু’জন তো বন্ধু। ভোব তো ভালই ছিল।

দু’জনের কখনও ঝগড়া হত না?

ম্যাডামের সঙ্গে ঝগড়া। পাগল নাকি? ম্যাডামের চোখে চোখ রেখে কেউই কথা বলতে পারত না।

তুমিও কি ম্যাডামকে ভয় পাও?

ও বাবা। সাংঘাতিক। তবে হ্যাঁ, ম্যাডাম আমাকে খুবই ভালবাসেন।

অথচ ম্যাডামের চেয়ে বিষাণ রায়ের প্রতিই তোমার পক্ষপাত বেশি। তাই না?

জাহ্নবী হেসে ফেলল। তারপর বলল, কী করব, দাদা যে বড্ড বেচারা মানুষ। দেখলেই মায়া হয়।

যদি প্রমাণ হয় যে বিষাণ রায়ই নন্দিনী আর শিবাঙ্গীকে খুন করার পিছনে রয়েছে?

মরে গেলেও বিশ্বাস করি না। আপনি তো দাদাকে চেনেন না। একদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় একটা বড় নীল মাছি চলে এসেছিল টেবিলের ওপর। রাঁধুনি নিতাইদা সেটাকে একটা ফ্লাই স্নাটার দিয়ে মারে। দাদা তো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল, কেন মারলি? কেন মারলি? বলে চোখ ছলছল। ভাল করে খেলই না সেদিন।

তুমি তো দেখছি বিষাণ রায়ের ডাই হার্ড ফ্যান!

হ্যাঁ তো। দাদাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।

দাদাও কি তোমাকে ইকোয়ালি ভালবাসে?

দাদা। নাঃ, দাদা তো বাড়িতে কারও সঙ্গে কথাই বলে না। কারও দিকে তাকিয়েও দেখে না। খুব চুপচাপ থাকে। আমার তো মনে হয় রাস্তায়-ঘাটে আমাকে মুখোমুখি দেখলে দাদা চিনতেও পারবে না।

বিষাণ রায় কি এতটাই অন্যমনস্ক?

ভীষণ। কিন্তু গভীর মানুষ নয়। রাশভারী মানুষকে দেখলে যেমন ভয় ভয় করে, দাদাকে দেখলে তেমনটা হয় না।

তোমার সঙ্গে কখনও কথাটথা বলে না?

খুব কম। দাদা ফাইফরমাশ করতে পছন্দ করে না। তবে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ঘরটা একটু গুছিয়ে দিতাম।

ড্রাঙ্ক অবস্থায় বমি করলে তুমি কি কখনও ওঁকে অ্যাটেন্ড করেছ?

বমিটমি খুব একটা করে না তো! একবার বা দু’বার গিয়ে ধরেছিলাম। অনেকদিন আগে। আর একবার জ্বর হয়েছিল, তখন জোর করেই মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলাম।

জোর করে কেন?

তখন ওঁর একশো চার ডিগ্রি জ্বর। বিছানা থেকে ওঠার শক্তি নেই। আমি মাথা ধোয়াতে চাইলে খুব আপত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু আমি দেখলাম, মাথা না ধোয়ালে জ্বর হয়তো আরও বাড়বে। তাই নিতাইদাকে ডেকে এনে অয়েল ক্লথ বিছিয়ে একরকম জোর করে। অনেকক্ষণ ধরে মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলাম। তাতে খুব খুশি ছিলেন। জ্বর ছাড়বার পর একদিন আমাকে ডেকে দুশো টাকা দিয়ে বললেন, শাড়িটাড়ি কিছু কিনে নিয়ো। আমি টাকা নিলাম না। বললাম, বাড়ির লোক সেবা করলে কি বখশিশ দিতে হয়? কথাটা ওঁর ভাল লেগেছিল।

বিষাণের সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

রোজই তো হয়। কালও গিয়েছিলাম। আজও যাব। নার্সিংহোমে ম্যাডামকে দেখতেও যাই দু’বেলা।

তোমার তো ও বাড়িতেই থাকার কথা।

সেটা তো ভাল দেখাবে না। শত হলেও আমি তো বয়সের মেয়ে, দাদার সঙ্গে একা বাড়িতে থাকি কী করে? সকালে গিয়ে গাড়িটার স্টার্ট দিই। ডাস্টিং করি। দাদার ঘর, ম্যাডামের ঘরাও ডাস্টিং করতে হয়।

বিষাণবাবুর সঙ্গে মার্ডার নিয়ে কোনও কথা হয়েছে?

মার্ডার নিয়ে এত কথা হচ্ছে যে আর ওসব নিয়ে কথা কইতে ইচ্ছে করে না। দেখছি দাদা আজকাল ড্রিঙ্ক করছেন না, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও করছেন না। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকেন, না হলে কম্পিউটারে কাজ করেন। দাড়ি বড় হয়ে গেছে। ওঁর খেয়াল রাখার তো কেউ নেই। আমার খুব কষ্ট হয়, কিন্তু কিছু বলতে সাহস হয় না। শুনছি পুলিশ নাকি ওঁকে অ্যারেস্ট করবে?

হ্যাঁ, তা পারে।

কিন্তু সেটা খুব ভুল হবে। দাদা ওরকম লোক নয়।

তা হলে খুনটা কে করেছে বলে তোমার মনে হয়?

আমি জানি না তো!

নন্দিনীর সঙ্গে বা তোমার ম্যাডামের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল জানো?

না। নন্দিনী ম্যাডাম তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর কাজের লোকদের দিয়ে কাজ-করিয়ে নেওয়াটাও ওঁর কাজ ছিল। ফ্ল্যাটটা ছয় হাজার স্কোয়ার ফুটের। টুইন ফ্ল্যাট। অন্য ফ্ল্যাটটা তো ফাকাই পড়ে থাকে। তবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়।

তোমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই?

বয়ফ্রেন্ড। নাঃ, আমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই।

কেন নেই?

কেন থাকবে? আজিকালিকার ছেলেগুলোকে দেখেছেন? সারাদিন ছোঁক ছোঁক করে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন একা গাড়ি চালাই প্রায় সময়েই কিছু পয়সাওলা ছেলেছোকরা গাড়ি করে পিছু নেয়। পাশাপাশি এসে জানালা দিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলে। আপনিই বলুন, এদের কাউকে বয়ফ্রেন্ড বলে ভাবা যায়?

তুমি তো খুব চুজি দেখছি।

একটু আছি।

বলতে পারো নন্দিনী ম্যাডামের কোনও অ্যাফেয়ার ছিল কিনা।

ঠিক জানি না, উনি তো খুব আপনমনে থাকতেন।

ওঁর বয়স সাতাশ-আঠাশ, চেহারা ভাল। ওঁর তো কোনও বয়ফ্রেন্ড থাকারই কথা। কখনও কারও সঙ্গে ওঁকে দেখেছ?

না।

নন্দিনী ম্যান্ডামের সঙ্গে তোমার কেমন ভাব ছিল?

ছিল না স্যার। উনি আমাকে পছন্দ করতেন বলে আমার মনে হয় না।

কেন, তুমি কী করেছ?

কিছুই তো করিনি।

অপছন্দটা কীভাবে বুঝতে পারতে?

ওসব বোঝা যায়। আমাকে দেখলেই মুখটা আঁশটে হয়ে যেত।

ব্যস? ওটুকুই?

না। আরও অনেক ব্যাপার ছিল। ছোটখাটো ব্যাপার। তবে আমাকে ম্যাডাম তো বাইরের কাজেই বেশি পাঠাতেন, তাই আমাকে নন্দিনী ম্যাডামের মুখোমুখি বেশি হতে হত না।

তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। শুনে হয়তো তোমার ভাল লাগবে না।

কী কথা?

আমার সন্দেহ নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে বিষাণ রায়ের একটা অ্যাফেয়ার চলছিল।

অসম্ভব!

অসম্ভব কেন? বিষাণবাবুর সঙ্গে শিবাঙ্গীর সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিষাণবাবু একজন অ্যাট্রাকটিভ মানুষ এবং প্রচুর টাকার মালিক। নন্দিনী যথেষ্ট সুন্দরী, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী। অ্যাফেয়ার তো হওয়াই স্বাভাবিক।

দাদা নন্দিনী ম্যাডামকে পাত্তাই দিত না।

কী করে বুঝলে?

বুঝব না কেন? আমার কি ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ নেই?

আছেই তো! এবং চোখ দুটো খুব সুন্দর। কথাটা নিশ্চয়ই তোমাকে অনেকেই বলেছে।

জাহ্নবী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে একটু হাসল। তারপর বলল, ছাই সুন্দর।

জানতে চাইছি, ওই দুটো সুন্দর চোখ দিয়ে তুমি ঠিক কী কী দেখেছ, যাতে মনে হতে পারে যে বিষাণ রায় নন্দিনী ম্যাডামকে পাত্তা দিতেন না।

ইদানীং দেখছিলাম নন্দিনী ম্যাডাম সকালের দিকে প্রায়ই দাদার ব্রেকফাস্টের সময় এসে উলটো দিকে বসতেন। বেশ সেজোগুজে।

সেজোগুজে?

মানে ঠিক খুব বেশি সাজ নয়। হয়তো একটা বেশ চটকদার কিমোনো পরলেন, চুলটা একটু কায়দা করলেন, অল্প মেক-আপ, হালকা লিপস্টিক। ওসব আপনি বুঝবেন না। মেয়েরা বুঝতে পারে।

তা তো ঠিকই। কিন্তু উনি হয়তো ওই সময়ে ব্রেকফাস্ট করতেই এসে বসতেন।

মোটেই না। ম্যাডাম বা নন্দিনী ম্যাডাম তো ব্রেকফাস্ট করেনই না। শশা, দই আর কয়েক টুকরো ফল।

তবে এসে বসতেন কেন?

বুঝে নিন।

দু’জনে কথাবার্তা হত না?

নন্দিনী ম্যাডাম বা দাদা কেউই খুব একটা বলিয়ে-কইয়ে মানুষ নয়। নন্দিনী ম্যাডামকে দেখেছি। টোস্টে বাটার লাগিয়ে দিতে। দরদ দেখানো আর কী। দাদা তো তাকিয়েও দেখত না।

তার মানে নন্দিনীর বিষাণের ওপর দুর্বলতা ছিল?

ছিল।

কখনও বাড়াবাড়ি কিছু দেখোনি?

বললাম তো দাদা পাত্তা দিত না।

ব্যাপারটা তোমার ম্যাডামকে জানিয়েছিলে?

বাপ রে। ম্যাডামকে কে বলতে যাবে?

তুমি কি জানতে যে তোমার ম্যাডামের একটা পিস্তল ছিল?

না। তবে ওই ঘটনার পর পুলিশের কাছে শুনেছি।

তুমি তো শিবাঙ্গীর ঘর গোছগাছ করতে, কখনও দেখোনি?

না। আমার তো ক্যাবিনেট বা লকার খোলার হুকুম নেই।

শিবাঙ্গী তো মাঝেমাঝে কলকাতার বাইরে যেত, তাই না?

হ্যাঁ। ওঁর ব্যাবসার কাজে যেতে হত। দিল্লি, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক।

ঘটনার আগে কবে শেষবার বাইরে গেছে বলতে পারো?

পারি। ম্যাডামের টুর আমায় মনে রাখতে হয়। মে মাসের ষোলো আর সতেরো তারিখে উনি বোম্বে গিয়েছিলেন। চকিবশ আর পঁচিশ তারিখে দিল্লি।

সেই সময়ে কি নন্দিনী আর বিষাণ এক ফ্ল্যাটে ছিল?

না। ম্যাডাম বাইরে গেলে আমাকে ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকতে হত। ম্যাডামের ঘরে। অনেক দামি জিনিস আছে তো, তাই।

অর্থাৎ তোমাকে পাহারা দিতে হয়?

হ্যাঁ।

ম্যাডামের বিছানাতেই কি শোও?

বাপ রে। ম্যাডামের বিছানায় কে শোবে? ম্যাডাম কেটে ফেলবে তা হলে আমার একটা ফোল্ডিং খাট আছে, সেটা পেতে শুই।

তার মানে মে মাসের ষোলো, সতেরো, চব্বিশ আর পাঁচশ তুমি ম্যাডামের ঘরেই রাতে শুয়েছিলে?

হ্যাঁ। কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? পুলিশ তো জিজ্ঞেস করেনি।

আমিও তো পুলিশ।

হুঁ। কিন্তু আপনি একটু অন্যরকম। ঠিক পুলিশ পুলিশ মনে হয় না। বাচ্চু বলছিল। আপনি নাকি সুপার কপ।

তা তো আমার জানা নেই। শুধু এটুকু জানি যে, আমি একজন পুলিশ কর্মচারী। তুমি বোধহয় জানো সেদিন রাতে শিবাঙ্গী নিজেকে বাঁচাতে তার পিস্তল থেকে এক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। গুলিটা খুনিদের একজনের গায়েও লাগে। ঘরের মেঝেতে তার রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।

জানি। সব শুনেছি। ম্যাডামের হেভি সাহস।

আমি শুনেছি। তুমিও খুব সাহসী মেয়ে!

জাহ্নবী কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে একটা বখাটে হাসি হাসল। তারপর বলল, এ বাজারে সাহসী না হলে আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কি চলে?

মারপিট করো নাকি?

না, শুধু শুধুমারপিট করব কেন? তবে দরকার হলে হাত-পা চালিয়ে দিই।

এরকম কোনও ঘটনা কি ঘটেছে?

জাহ্নবী আবার হাসল, কেস দেবেন না তো স্যার?

আরে না। মেয়েরা মারপিট করলে আমি খুশিই হই।

তিন-চারবার মারপিট হয়েছে। বদমাশ ছেলেদের সঙ্গে।

বদমাশ ছেলেদের সঙ্গে! তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে। মেরেছি, না মার খেয়েছ?

মারপিট করলে মার খেতেও হয়। কোনও হিরো তো আর আমাদের বাঁচাতে আসে না, সিনেমার মতো।

ঠিক কথা। মেয়েরা হিরোর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবেই বা কেন? প্রত্যেকটা মেয়ের নিজেরই হিরো হয়ে ওঠা উচিত।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করো।

দাদাকে কি আপনারা অ্যারেস্ট করবেন?

সেটা তদন্তের ওপর নির্ভর করছে। খুনিরা ধরা পড়ে গেলে এবং তোমার দাদার নাম বললে অ্যারেস্ট তো হবেই।

না। স্যার, দাদার নাম বলবে কেন?

বলবে না, তুমি কী করে জানো?

দাদা ও কাজ করতেই পারে না।

বাইরে থেকে দেখে মানুষকে আর কতটুকু চেনা যায়! তবে এখনই অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না, এটুকু বলতে পারি। কিন্তু তোমার দাদার চেয়েও তোমার ম্যাডামের

বিপদ বেশি। তাঁর হেড ইনজুরি, কোমায় আছেন। বাঁচার সম্ভাবনা মাত্র ত্রিশ পারসেন্ট। তাঁর জন্য তোমার টেনশন হচ্ছে না?

হচ্ছে। খুব হচ্ছে। কিন্তু কাল ডাক্তার সেন দাদাকে বলেছেন, ম্যাডামের প্রাণের ভয় নেই। আমি নিজে শুনেছি।

তাই বুঝি?

হ্যা স্যার। কাল দাদাকে আমিই তো গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছি।

তুমি কেন? বিষাণের তো আলাদা গাড়ি আছে।

আছে। কিন্তু ওঁর মনের যা অবস্থা গাড়ি চালাতে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবেন।

হুঁ। সে-কথা ঠিক। উনি খুব নার্ভাসনেসে ভুগছেন।

খেতে চাইছেন না, ঘুমোচ্ছেন না ভাল করে। ওজন কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। গালে বড় বড় দাড়ি। আমি গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে খাওয়াই।

তুমি বললে খান?

খুব বিরক্ত হন। তবে সামান্য একটু মুখে তোলেন।

কতক্ষণ থাকো ওঁর কাছে রোজ?

কাছে থাকা তো সম্ভব নয়। উনি কম্পিউটারে কাজ করেন, কাগজ বা বই পড়েন, টেলিফোনে কথা বলেন। আজ তো পুলিশের পারমিশন নিয়ে অফিসেও যাবেন শুনেছি।

হ্যাঁ, ওঁকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে।

ওঁকে ছেড়ে দিন স্যার। উনি কিছু করেননি।

কিন্তু কেউ তো করেছে। সেটা না জানা অবধি ওঁকে তো সন্দেহের বাইরে রাখতে পারি না।

ওরকম ভাল একটা লোককে সন্দেহ করা কি ঠিক?

৩. শিবাঙ্গী

কেমন আছেন ম্যাডাম?

আপনি কে বলুন তো? আপনাকে কি আমি চিনি?

না, আমাদের পূর্বপরিচয় নেই। আমার নাম শবর দাশগুপ্ত। আমি পুলিশের গোয়েন্দা।

ওঃ। হ্যাঁ, এরা বলে রেখেছিল যে, পুলিশ থেকে কেউ আমাকে জেরা করতে আসবে।

না ম্যাডাম, জেরা নয়। জাস্ট একটু কনভারসেশন। কিন্তু আপনি এখন কেমন আছেন?

ভাল নেই। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তাকাতে কষ্ট হয়। তার চেয়েও বেশি কষ্ট মনের মধ্যে। আচ্ছা, আমি কি একটা লোককে খুন করেছি? সবাই বলছে আমি খুন করিনি। কিন্তু ওরা বোধহয় সত্যি কথাটা আমাকে বলতে চায় না। আপনি তো পুলিশ। আপনি তো জানেন আমি গুলি চালিয়ে একটা লোককে মেরে ফেলেছি।

না। আপনার গুলিতে সামান্য জখম হলেও কেউ মরেনি।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি বড্ড পাপবোধে ভুগছি। অনুশোচনায় বুক পুড়ে যাচ্ছে।

অনুশোচনার কী আছে? আপনার ঘরে একজন ইনট্রিউডার ঢুকলে তার বিরুদ্ধে আপনি অ্যাকশন নিতেই পারেন। আমার মতে আপনি ঠিক কাজই করেছেন এবং সাহসের সঙ্গে।

পিস্তলটিা জীবনে কখনও ব্যবহার করতে হবে বলে ভাবিনি। তা ছাড়া কাউকে লক্ষ করেও গুলি চালাইনি। ভেবেছিলাম দেয়ালের দিকে তাক করে ফায়ার করব, আর ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।

ওরা অত সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র নয়।

ওরা কারা বলুন তো!

সুপারি কিলার বললে বুঝতে পারবেন?

ওসব আজকাল সবাই বোঝে। আমি যাকে গুলি করেছি। সে তা হলে বেঁচে আছে তো!

আছে বলেই মনে হয়। তবে সে ধরা পড়েনি, পালিয়ে গেছে।

লুটপাট করতে এসেছিল তো।

মনে হয় না। আপনার ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়ে থাকলে আপনি ছাড়া আর কেউ ভাল করে বুঝতে পারবে না। তবে চুরি বা ডাকাতিটা উদ্দেশ্য ছিল না।

সুপারি কিলার বললেন না? তার মানে কন্ট্রাক্ট কিলার তো?

হ্যাঁ।

আমাকে মারতে এসেছিল?

তাই তো মনে হয়।

কিন্তু কেন?

সেটাই তো এখন লাখ টাকার প্রশ্ন, কেন?

ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমাকে কেন খুন করবে। কেউ? আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি। ভাবতেই যে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

উত্তেজিত হবেন না। আমি তো শুনেছি আপনি একজন তেজস্বিনী মহিলা।

কে বলেছে?

সবাই তো বলছে।

তেজস্বিনীটিনি নই। তবে সাহসী বলতে পারেন। কিন্তু এই ঘটনার পর সব উলটেপালটে গেছে। খুব ভয় ভয় করছে এখন।

মাত্র গতকাল বিকেলে আপনার জ্ঞান ফিরেছে। এখনও আপনি খুব দুর্বল। আর শরীর দুর্বল থাকলে মনটাও ওরকমই হয়ে যায়।

বোধহয় তাই।

সংক্ষেপে ঘটনাটা একটু বলতে পারেন?

ঘটনা। ঘটনাটার তো মাথামুণ্ডুই নেই।

সেইটেই বলুন।

আমরা একটু আর্লি শুতে যাই রাতে। ধরুন দশটা নাগাদ। খুব প্রয়োজন ছাড়া কখনও লেট নাইট করি না। টিভি সিরিয়াল দেখার নেশা আমার নেই। তবে নন্দিনী বেশ রাত অবধি জেগে থাকে। ওয়ার্কহোলিক। কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। আচ্ছা একটা কথা বলবেন?

কী কথা।

গতকাল থেকে আজ অবধি নন্দিনী তো আমাকে দেখতে এল না? এরা এই হাসপাতালে পেশেন্টদের মোবাইল ফোন অ্যালাউ করে না। তবু আজ সকালে এক সিস্টারকে ধরেকরে ফোন করিয়েছিলাম। কিন্তু নন্দিনীর ফোন সুইচ অফ আসছে। কী ব্যাপার বলুন তো!

কিছু না ম্যাডাম। আসলে ঘটনার ফলে উনি ভীষণ শর্কড। ওঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। এখন নার্সিংহোমে ভরতি।

ওঃ গড! নন্দিনীও হাসপাতালে?

হ্যাঁ। আপনি কি ওঁকে খুব মিস করছেন?

ভীষণ। ও তো আমার মেন্টর। আমার গ্রুমিং তো ও-ই করে।

হ্যাঁ, যা বলছিলেন–

সেদিন রাত দশটায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমার ঘুমের প্রবলেম আছে বলে সেডেটিভ খেতে হয়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভেঙে ডিম লাইটে দেখি ঘরের মধ্যে দুটো লোক। তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু হাতে কিছু ছিল।

কী ছিল?

পিস্তল বা ওরকম কিছু।

কথা বলেছিল?

আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম 'কে?' বলে। তখন সামনের লোকটার হাতে একটা ছোরাও দেখতে পাই। আমার বালিশের পাশেই আমার পিস্তলটা থাকে। কোনওদিন কাজে লাগবে বলে ভাবিনি। ওই বিপদের মুখে পিস্তলটার কথা মনেও পড়েনি। কিন্তু হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে হঠাৎ ডান হাতে পিস্তলটা পেয়ে যাই। একটুও ভাবনা চিন্তা না করে গুলি চালিয়ে দিতেই লোকটা 'যাঃ শালা!' বলে একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

তারপর?

তার পরের ব্যাপারটা ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্ড ব্ল্যাক আউট। পরে শুনেছি। আমার মাথায় গুলি করা হয়েছে। কিন্তু মাথায় গুলি লাগলে তো আমার বেঁচে থাকার কথা নয়।

আবার বলছি, আপনি তেজস্বিনী মহিলা। আর হ্যাঁ, গুলিটল মাথায় লাগলেও ভাইটাল পার্টে লাগেনি। ফ্যাটাল ইনজুরি নয়। তবে সিরিয়াস ইনজুরি। আপনি প্রায় পনেরো দিন কনশাস ছিলেন না।

আমার গুলিতে সত্যিই কেউ মরেনি তো!

না। আর মরলেও ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তাতে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হন না। আত্মরক্ষার জন্য খুন করা অপরাধ নয়।

সংবিধান নিয়ে কি আমাদের জীবন চলে? আমার হাতে কেউ খুন হয়ে থাকলে– সে গুন্ডা-বদমাশ যা-ই হোক, আমার নিজেকে বরাবর অপরাধী মনে হবে।

আপনি ওদের কারও মুখ দেখতে পেয়েছিলেন?

আমার ঘরে জোরালো আলো থাকে না। আর ঘুমের সময় আমি আলো সহ্য করতে পারি না বলে খুব কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বালানো থাকে। ফলে ঘরটা একরকম আবছা অন্ধকার ছিল। দুটো লোককে দেখেছিলাম, আবছা ভাবে। তবে তারা পুরুষ, আর মনে হয় বয়স খুব বেশি নয়।

লম্বা না বেঁটে?

লম্বাও না, বেঁটেও না। গড়পড়তা হাইট।

পোশাক?

এই তো, আপনি তো আমাকে শেষ অবধি জেরাই করছেন। তাই না? অথচ বললেন কনভার্স করতে চান!

শবর হেসে ফেলল। তারপর বলল, মাপ করবেন। কেসটা এমন ঘাড়ে চেপে আছে যে, বে-খেয়ালে আপনার ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করে ফেলেছি হয়তো।

আপনার হাসিটা কিন্তু ভারী সুন্দর! আচ্ছা। আপনি কি একটু শক্ত ধাতুর লোক?

ওকথা বলছেন কেন?

আপনার চোখ দুটো কিন্তু ভীষণ পেনিট্রেটিং ! তাকালে যে কেউ একটু ভয় পাবে।

দয়া করে আপনি যেন ভয় পাবেন না। কারণ আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে সাহসী বলে মনে করতে শুরু করেছি।

আপনাকে দেখে মনে হয় না যে, আপনি মহিলাদের কমপ্লিমেন্ট দিতে পারেন।

ফাঁকা কমপ্লিমেন্ট নয় ম্যাডাম। যাক গে, আর কিছু যদি মনে পড়ে তা হলে বলুন। খুব বেশি স্ট্রেস-এর দরকার নেই। জাস্ট চোখ বুজে একটু ভেবে দেখুন। সেই রাতের আর কোনও ডিটেলস মনে পড়ে কিনা।

নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কিন্তু আমি যখন মারা যাইনি আর ডাকাতরাও তেমন কিছু নিতে পারেনি তখন তদন্তের কি আর খুব একটা দরকার আছে? এখন থেকে একটু অ্যালার্ট থাকলেই তো হবে।

কিন্তু পুলিশকে তো শেষ পর্যন্ত তদন্ত করে দেখতেই হবে। আমরা তো এইজন্যই বেতন পাই।

তা অবিশ্যি ঠিক। আপনি যখন বলছেন তখন আমি নিশ্চয়ই সেই রাতের ডিটেলস মনে করার চেষ্টা করব। এখানে আমার একটুও ভাল লাগছে না। কবে যে এরা ছাড়বে।

আপনার কামব্যাকটা খুব অ্যামেজিং। ডাক্তাররা আশাই করেনি যে আপনার এত কুইক রিকভারি হবে। মনে হয়। আর দু-চারদিনের মধ্যেই আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন। বাই দি বাই, আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শিবাঙ্গী। তারপর সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, হয়েছে। বেশ রোগ হয়ে গেছে, মুখভরতি দাড়ি-গোঁফ। চিনতেই পারিনি প্রথমে।

কখন দেখা হল?

আমার কনশাসনেস ফিরেছে শুনে কাল রাতেই এসেছিল। সঙ্গে জাহ্নবী।

তখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।

আপনি জাহ্নবীকে চেনেন না, একটা বিচ্ছু। ও কয়েকদিন এসেই হাসপাতালের সকলকে পটিয়ে নিয়েছে। ও তো যখন—তখন আসে-যায় বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতী। আপনার খুব প্রিয় পাত্রী বুঝি?

আমার তো ছেলেপুলে নেই। ওর ওপর একটু মায়া পড়ে গেছে।

আপনি ওকে অল্পবয়সেই গাড়ি চালানো শিখিয়ে লাইসেন্স বার দিয়েছেন, শুনলাম।

মাই গড! কী বোকা। পুলিশের কাছে ওসব বলতে হয়?

ভয় নেই। আমরা আইনের পথ ধরে আর ক'জন চলি? তবে মাইনরের গাড়ি চালানো তার নিজের এবং অন্যদের পক্ষে বিপজ্জনক।

সরি শবরবাবু, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু ওকে আমি একটু তাড়াতাড়ি পাকিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। পড়াশোনাটা হয়নি, আর সব কাজে পাকা।

ওর বোধহয় নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে একটু ইগো প্রবলেম আছে!

কী করে বুঝলেন? কিছু বলেছে বুঝি?

ভেবে বলেনি। তবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ওই তো প্রবলেম। অথচ নন্দিনীকে যে ও কেন পছন্দ করে না তাও বুঝি না বাবা।

নন্দিনীও কি ওকে অপছন্দ করে?

না না! নন্দিনী সেরকম মেয়েই নয়। ভীষণ বুদ্ধিমতী। আপনি নিশ্চয়ই নন্দিনীকে মিট করেছেন?

করেছি।

চার্মিং না?

উনি সুস্থ নন বলে আমার সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি। নন্দিনীর সঙ্গে আপনার কবে, কোথায় পরিচয়?

পরিচয় তো অনেক দিনের। আমার যখন ষোলো-সতেরো, ওর তখন চোঁদ-পনেরো। ওই সময়েই ওরা আমাদের পণ্ডিতিয়া টেরাসে ফ্ল্যাট ভাড়া করে এল।

অর্থাৎ যখন আপনার বয়স ষোলো-সতেরো আর নন্দিনীর চৌদ-পনেরো?

একজ্যাক্টলি।

ওঁর ব্যাকগ্রাউন্ড?

খুব সাদামাটা। বাবা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। ওরা দুই ভাই-বোন। ভাই ছোট। আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল।

নন্দিনী বিয়ে করেননি কেন?

বিয়ে করেনি মানে করবে না তো নয়। মাত্র তো পাঁচিশ বছর বয়সী।

কোনও বয়ফ্রেন্ড?

না। একটু চুজি। আচ্ছা নন্দিনীকে নিয়ে আমরা কথা বলছি কেন?

কৌতুহল। যাক গে। আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।

এ জায়গাটা বড্ড বিচ্ছিরি। ঘরে টিভি নেই, খবরের কাগজ দেওয়া হয় না, মোবাইল বা ল্যাপটপ কিছুই অ্যালাউ করে না। এরা। শুনছি। নাকি বাইরে পুলিশও চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়। সত্যি নাকি?

হ্যাঁ। সাবধানের মার নেই। আর আপনি আছেন আইসিইউ-তে। এখানে খবরের কাগজ, টিভি, মোবাইল সব নিষিদ্ধ।

সারাদিন কথা না বলে বা কাজ না করে কি থাকা যায়?

এখন বিশ্রাম নিন। কাজের জন্য সামনে লম্বা সময় পড়ে আছে। আজ তো কথাও অনেক বলেছেন। আমিই বকিয়েছি আপনাকে। এবার আসি?

চলে যাচ্ছেন? আবার আসবেন কিন্তু।

হাসালেন ম্যাডাম। পুলিশকে কেউ আবার আসতে বলে না। পুলিশ মানেই বিপদ।।

তা হতে পারে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার তো বেশ লাগল। আমি বাড়ি ফিরে গেলে একদিন চা খেতে আসবেন।

আপনি এখন বোর হচ্ছেন বলে আমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। নইলে আই অ্যাম অ্যান আনকমফিটেবল কম্পানি।

একদম নয়। আবার এসে দেখুন না। আমি আনকমফর্টেবল ফিল করি কি না।

ঠিক আছে ম্যাডাম। বাই।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

কী কথা?

একটা নাম।

কার নাম?

তা জানি না। তবে ব্ল্যাক আউট হওয়ার সময় কে যেন বলল, বাচ্চু, আর চালাস না…

বাচ্চু?

হ্যাঁ।

আর কিছু মনে পড়ছে?

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি লিড।

ফের বলছি। আবার আসবেন।

৪. শবর দাশগুপ্ত

দু'দিন পর এক ভোরবেলা পুলিশ বাদু মণ্ডলকে তুলে নিল তিলজলা থেকে। তার দু'দিন পর ভিক্টর ধরা পড়ল পার্ক সার্কাসে। দু'জনেরই প্রাথমিক স্টেটমেন্ট, তারা ডাকাতি করতে ঢুকেছিল। খুন করার উদ্দেশ্য ছিল না। কেউ সুপারি দেয়নি। বাধা পড়ায় গুলি চালিয়ে দিতে হয়। এই বিবরণ বার চারেক চার পুলিশ অফিসারকে দেওয়ার পর অবশেষে একদিন শবর দাশগুপ্তের মুখোমুখি হতে হল তাদের। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারল, বিপদ।।

এই সাদা পোশাকের, সাদামাটা চেহারার লোকটা উঁচু গলায় কথা অবধি বলে না। ভারী মোলায়েম ভাষায় কথা কয়। গালাগাল দেয় না। ফালতু গরমও খায় না। একবার দুটো বাঘা চোখে দু'জনের দিকে চেয়ে নিয়ে চোখ নামিয়ে টেবিলের ওপর একটা পেপারওয়েট এক হাত থেকে অন্য হাতে এবং অন্য হাত থেকে ফের আগের হাতে গড়াতে গড়াতে বলল, টার্গেট একজন না দু'জন?

মাইরি স্যার, খুনখারাপি আমাদের লাইন নয়। ধরা পড়ার ভয়ে মেরে দিতে হল স্যার। শবর প্রশ্ন না করে অনেকক্ষণ দু'জনের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে রইল। যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। মিনিট দুয়েক পর একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, একটা প্রশ্নের জবাব না পেলে আমার অঙ্কটা মিলছে না। তোদের টার্গেট ক'জন ছিল, একজন না দু'জন?

দু'জনেই মুখ তাকাতাকি করে চুপ করে রইল অধোবদন হয়ে।

ভিক্টর! তুই বলবি? আমার যতদূর মনে হয় সেই রাতে তুই অপারেশনটা লিড করেছিল। বাদু নয়।

কাউকে মারার ইচ্ছে ছিল না। স্যার, বিশ্বাস করুন। গোলেমালে হয়ে গেল। আমাদের আপশোস হচ্ছে স্যার।

তুই যাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিস সে একজন মাইনর। যদি ধরা পড়ে তা হলে জুভেনাইল কোর্টে ট্রায়াল হবে। বড়জোর দু-তিন বছর কারেকশনাল হোমে সাজা কেটে বেরিয়ে আসবে। তাকে বাঁচানোর চেয়ে তোর নিজের গর্দান বাঁচানো অনেক ইম্পট্যান্ট।

ভিক্টর শুকনো মুখে বলে, আমাদের গর্দান তো যাবেই স্যার। আপনি কেস নিলে কি আমরা বাঁচব?

কেস নেওয়ার আমার কী দায়? চার্জশিট দেবে লোকাল পুলিশ। কেস স্ট্রং হলে ঘষে যাবি। আর যদি দাদাফাদা থাকে তো চার্জাশিটে জল ঢুকে যাবে। কোর্টে কত ক্রিমিনাল কেস ঝুলে আছে জানিস? শুনলাম, তোদের হয়ে একজন ঝানু উকিল মাঠে নেমেছে।

দু'জনেই একটু অধোবদন। তারপর ভিক্টর মুখ তুলে বলল, কথাটা কি কোর্টেও বলতে হবে?

জিজ্ঞেস করলে বলবি, তোর যদি ইচ্ছে হয়।

আমাদের টার্গেট একজন ছিল স্যার। নন্দিনী।

তা হলে শিবাঙ্গীর ঘরে ঢুকেছিলি কেন?

কাজটা তো গ্র্যাটিসের ছিল স্যার। আমরা কন্ডিশন করেই নিয়েছিলাম। ল্যান্ডলেডির ঘর থেকে কিছু মালু কামিয়ে নেব। কিন্তু ঘুমপাড়ানি রুমাল বের করারই সময় পাইনি, উনি গুলি চালিয়ে দিলেন। মরেও যেতে পারতাম স্যার!

তারপর?

বাদু ভয় পেয়ে পালটা ফায়ার করে। আমি বারণ না করলে আবার গুলি চালিয়ে দিত। কাজটা অন্যায় হয়েছে স্যার। ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। শিবাঙ্গীকে আমাদের মারার কথা নয়।

শবর চিন্তিত মুখে বলে, আমার অঙ্কটা তবু মিলছে না।

কীসের অঙ্ক স্যার?

তোদের হয়ে যে উকিল মাঠে নেমেছে তার নাম জানিস?

না স্যার। একজন সেপাই বলছিল। আমাদের জামিনের জন্য নাকি একজন উকিল চেষ্টা করছে। কথাটা বিশ্বাস হয়নি। আমাদের মা-বাবারাও চায় যে, আমরা জেলে বন্ধ থাকি।

হুঁ। কিন্তু ওখানেই তো গণ্ডগোল। তোদের উকিলের নাম ব্রজবাসী দত্ত। কখনও নাম শুনেছিস?

দু’জনেই একসঙ্গে বলে, না স্যার।

কলকাতার টপ ক্রিমিনাল ল-ইয়ারদের মধ্যে একজন। অনেক টাকা ফি। টাকাটা কে দিয়েছে জানিস?

না স্যার।

আর ওখানেই অঙ্কটা মিলছে না।

শবর আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত। দরকার হলে আবার আসব।

***

সকালে আজ অনেকদিন বাদে আয়নায় মুখ দেখল বিষাণ। নিজের দাড়িগোঁফওলা এই মুখটা তার চেনা নয়। যেন একটা অচেনা লোক তার সামনে।

অনভ্যস্ত দাড়িতে গাল কুটকুট করছে। একবার ভাবল কেটে ফেলবে কিনা। তারপর ভাবল, থাক। তার বেশ কিছু দাড়ি পেকে গেছে, এটা সে এতদিন টের পায়নি। তাকে বোধহয় এখন একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে।

বয়স্কই। সে অনেকদিন জগিং করেনি। কোনওরকম ব্যায়াম করেনি। ফলে এখন তার শরীরের গাটে গাটে ব্যথা। বেশি পরিশ্রম করেত পারে না। সে যে একসময়ে দারুণ স্প্রিন্টার ছিল, এ তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না। গত পঁচিশ দিন সে মদ খায়নি। অসম্ভব টেনশনে মদ ভাল কাজ করে। কিন্তু তার তেমন ইচ্ছে হয়নি।

প্রথম চার-পাঁচদিন মদ পেটে না থাকায় ঘুম হচ্ছিল না। এখন হচ্ছে। খুব গাঢ় ঘুম নয়, তবু হচ্ছে তো।

আজ রবিবার। একা একটা ছুটির দিন কীভাবে কাটাবে সেটাই চিন্তার বিষয়। দিনটাও ভাল নয়। রাত থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। কে যেন বলছিল, নিম্নচাপ। তবে এটা বর্ষাকাল, বৃষ্টি তো হওয়ারই কথা।

লিভিং রুমে এসে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসতেই চমকে উঠল সে। মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। শবর দাশগুপ্ত।

আরে আপনি! কখন এসেছেন?

মিনিট পাঁচেক।

খবর দেননি তো!

দরজায় নক করেছিলাম, আপনার কাজের লোকদের মধ্যে একজন দরজা খুলে দিয়েছে। আমার তাড়া নেই বলে আপনাকে খবর দিতে বারণ করেছিলাম।

বাঃ! আমার তো বোধহয় সময় হয়ে এল, তাই না?

কীসের সময়?

শুনেছি খুনিরা ধরা পড়েছে এবং তদন্তও শেষের মুখে। আমার স্ত্রীও নিশ্চয়ই তাঁর ভার্সান পুলিশকে বলেছেন!! আমি তো এখন দিন গুনছি।

কেন? খুনটা কি আপনি করিয়েছেন?

না। কিন্তু সে-কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন?

পুলিশ যে আপনাকেই সাসপেক্ট ভাবছে তা কী করে বুঝলেন?

গাট ফিলিং।

আপনার ফিলিং নির্ভুল নয়।

আপনি কি কিছু বলতে এসেছেন শবরবাবু? সিরিয়াস কিছু? আপনাকে খুব গভীর দেখাচ্ছে!

আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। বিরক্ত হবেন না তো!

আরে না। আমার লুকোনোর কিছু নেই। আমি চাই তদন্তটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

আপনি কি কখনওই টের পাননি যে, নন্দিনী আপনার প্রতি আসক্ত?

এ প্রশ্নের জবাব তো দিয়েছি।

না দেননি। আপনি এড়িয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তিত মুখে রইল বিষাণ। তারপর বলল, আমার তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই।

তার মানে কী? একটু এক্সপ্যান্ড করবেন?

শুনলে আমার ওপর আপনার হয়তো ঘেন্না হবে।

আমি ক্রিমিনাল ঘেঁটে বুড়ো হলাম, আমার রি-অ্যাকশন অত সহজে হয় না।

এটাও হয়তো ক্রাইম। পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই আই ওয়াজ সিডিউসড বাই এ উওম্যান। আমার দূরসম্পর্কের এক বউদি, বয়সে সাত-আট বছরের বড়। সিডাকশনটা চার-পাঁচ বছর ধরে চলেছিল। প্রেম নয়, জাস্ট সেক্স। সেক্স অ্যান্ড সেক্স। কোনও অদ্ভুত কারণে আমি মেয়েদের ইজি টার্গেট। ওই শুরু। তারপর আরও ঘটনা। কী বলব, আই ওয়াজ অলমোস্ট ড্রেইন্ড আউট বাই উইমেন ইন দ্যাট আর্লি এজ। কাউকেই রিফিউজ করতাম না, একটা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দও তো ছিল।

তারপর? গো অ্যাহেড।

এর ফলে আমার রোমান্টিক সেন্সটাই ভোঁতা হয়ে গেল। আপনাকে তো বলেইছি আমরা বন্ধুরা অনেক সময়েই পয়সা দিয়ে মহিলা জুটিয়ে নিতাম। এখন বোধহয় আমার তেত্রিশ বছর বয়স। এখন টের পাই মহিলাদের প্রতি আমার কোনও

লাগামছাড়া আকর্ষণ নেই। বড্ড বেশি ব্যবহৃত হলে বোধহয় এরকমই হয়। আপনার নিশ্চয়ই আমাকে লম্পট

বলে মনে হচ্ছো!

লম্পট নন, তা বলছি না। তবে লাম্পট্য থাকলেও আপনি বোধহয় কোনও মহিলাকে কখনও সিডিউস করেননি!

না। তার দরকার হয়নি। বরাবর আমিই সিডিউসড হয়েছি।

তার কারণ আপনার ভাল চেহারা এবং সুইট পারসোন্যালিটি।

কে জানে কী! তবে মেয়েদের কাছে অ্যাট্রাকটিভ হওয়ার জন্য আমি কোনওদিনই কোনও চেষ্টা করিনি। যা হয়েছে এমনিতেই হয়েছে। তবে ইদানীং আমি মাঝে মাঝে রিমোর্সও ফিল করি। আমার ভীষণ প্রিয় এক বন্ধু আছে, ইন্দ্রনীল। সে সন্তুর বাজায় এবং নানা জায়গায় প্রোগ্রাম করে। সে বিয়ে করার পর তার নতুন বিউটি যখন আমাকে ইশারা-ইঙ্গিত করতে শুরু করল এবং টেলিফোনে নানা সাংকেতিক কথা বলতে এবং মেসেজ পাঠাতে শুরু করল, তখন হঠাৎ খুব আত্মগ্লানি হল আমার। মনে হল ইন্দ্রনীলের স্ত্রীকে ভোগ করলে আমি আর আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকাতে পারব না। জোর করে সব কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিলাম। মেয়েটা মরিয়া হয়ে অনেক পাগলামি করেছিল। ফলে শিবাঙ্গীর সঙ্গেও আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়।

তার মানে, আপনি কখনও তেমন করে কারও প্রেমে পড়ার সময় পাননি।

প্রবলেমটা অ্যাটিচুডের। সময়ের নয়। কিন্তু আপনি আমাকে বোধহয় নন্দিনীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

যদি আপত্তি না থাকে তা হলে বলুন।

প্রথমেই ক্ষমা চাইছি যে, আমি আপনাকে একটু মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে মেয়েটি মারা গেছে, তার সম্পর্কে তাই কথাটা বলতে ইচ্ছে করেনি। আমার। এখন ভাবছি সত্য গোপন করলে হয়তো পুলিশের কাজের অসুবিধে হবে। তাই বলছি যে, হ্যাঁ, নন্দিনীও আমাকে সিডিউস করেছে। কয়েকবার।

শিবাঙ্গী পাশের ঘরেই আছে, জেনেও?

হ্যাঁ। বোধহয় মেয়েদের এসব ব্যাপারে সাহস একটু বেশিই। আর নন্দিনী বোধহয় চাইত ধরা পড়তেই। তাতে শিবাঙ্গীর সঙ্গে আমার দূরত্ব আরও বাড়বে।

শিবাঙ্গী কি টের পেয়েছিলেন?

না। ও ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়।

আপনার ধারণাটা বোধহয় ভুল।

কেন ও কথা বলছেন?

সেটা পরে বলছি। এবার আরও একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন।

বলুন।

নন্দিনী ছাড়া আর কেউ কি আপনার সঙ্গে উপগত হতে চেয়েছে। এ বাড়িতে?

না না! আর কে?

একটু ভেবে বলুন।

এসব কি আর ভেবে বলতে হয়?

আপনি বলতে চাইছেন না, কিন্তু আমি যে জানি।

হঠাৎ বিষাণের মুখটা লাল হয়ে উঠল। টেবিলের ওপর রাখা একটা জলের বোতল থেকে খানিকটা জল খেল। তারপর কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়ে দুহাতে মুখটা ঢেকে চাপা গলায় বলল, প্লিজ, প্লিজ মিস্টার দাশগুপ্ত, লিভ হার অ্যালেন। শিইজ এ কিড ওনলি। এ মাইনর।

শুনুন বিষাণবাবু, ভারতের সংবিধান মতে একটি মেয়ে আঠারো বছরের আগে অ্যাডাল্ট বলে গণ্য হয় না। কিন্তু মানুষের যৌবন তো সংবিধান মেনে আসে না! তেরো-চোদ্দো বছর। বয়সে একটা মেয়ের ঋতুচক্র শুরু হয়, দেহবোধ আসে।

সংবিধানের নিয়মে আঠেরো বছর। বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কিন্তু সংবিধান তো বলেনি। আঠারোর আগে প্রেমে পড়া চলবে না।

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে চোখ বুজে বসে রইল বিষাণ। তারপর বলল, আপনি জানেন না, আমার মেয়ের বয়সও এখন সতেরো।

আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ। আমার যে বউদির কথা আপনাকে বলেছিলাম, মাই ফাস্ট অ্যাডভেঞ্চার, তার ফলেই মেয়ের জন্ম। যদিও অবৈধ।

কী করে শিয়োর হলেন যে, আপনারই মেয়ে। ডিএনএ টেস্ট করিয়েছেন?

তার দরকার হয়নি। সেই মেয়েকে দেখলেই আপনিও বুঝতে পারবেন। তার মুখে হুবহু আমার মুখের ছাপ। পাছে কেউ মিলটা ধরে ফেলে সেই ভয়ে আমি ওদের বাড়ির ত্রিসীমানাতেও যাই না। আরও একটা ভয়। মেয়ে তো জানে না যে, আমি ওর বাবা। তাই যদি বাবা হিসেবে না দেখে পুরুষ হিসেবে দেখতে শুরু করে তা হলেই সর্বনাশ!

শবর একটু হাসল, আপনার ট্রাজেডিটা আমি বুঝতে পারছি।

লম্পট হলেও বর্বর তো নই। তাই এই মেয়েটা যেদিন আমার বিছানায় ঢুকেছিল সেদিন আমার নিজের ওপরেই খুব ঘেন্না হল। ওকে ঘর থেকে বের করে দিলাম। খুব রাগারাগিও করেছিলাম, মনে আছে। পরদিন এসে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। বলল, আর ওরকম করব। না। আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমি শুধু আপনার দেখাশোনা করব। মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?

পারছি। কিন্তু একটা মুশকিল কী জানেন?

কী?

এই পুরো ক্রাইমটার পিছনেই আপনি রয়েছেন। অথচ আপনি কিছুই করেননি। কিন্তু রয়েছেন অনুঘটকের মতো। গোটা ব্যাপারটাই ঘটেছে আপনাকে কেন্দ্র করে এবং আপনার জন্যই। কিন্তু আপনি ক্যাটালিস্ট মাত্র।

আমি বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা একটু জটিল। তবে একটু কনসেনট্রেট করলে বুঝতে পারবেন। আপনি যে চেহারা এবং স্বভাব নিয়ে জন্মেছেন তাতেই আপনার চারদিকে কিছু সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। তাতে আপনার কিছু করারও নেই। শক্ত মানুষ হলে আত্মরক্ষার কিছু পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু আপনি তেমন শক্ত মানুষ নন, তাই ভেসে গেছেন। এই বাড়িতেই দুখ-দুটি অসমবয়সি মহিলা আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে। একজন নন্দিনী। নন্দিনীর সঙ্গে আপনার গোপন অভিসার প্রথম টের পায় জাহ্নবী। কারণ জাহ্নবীও আপনার অনুরাগিনী। তার বয়স অল্প, তাই হিংসের জ্বালাপোড়াও বেশি। সে ব্যাপারটা শিবাঙ্গীকে বলে দেয়। লক্ষ করলে দেখতে পেতেন, আপনার আর শিবাঙ্গীর ঘরের বন্ধ দরজায় খুব সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক আই বসানোর জন্য একটা ছ্যাদা করা আছে। চালাকি করে সেটা মোম দিয়ে আটকানো। দরকার মতো যন্ত্রটা বসিয়ে নিয়ে আপনার ঘরের সব দৃশ্যই দেখা সম্ভব। পুলিশ যন্ত্রটা শিবাঙ্গীর ক্যাবিনেটে খুঁজেও পেয়েছে।

মাই গড!

সুতরাং আপনার আর নন্দিনীর ব্যাপারটা শিবাঙ্গীর কাছে গোপন ছিল না। নন্দিনী শিবাঙ্গীর বন্ধু হয়েও ওকে অ্যাসেসমেন্ট করতে ভুল করেছিল। ভেবেছিল, ধরা পড়লেও শিবাঙ্গী বড়জোর রাগারগি করবে, তাড়াতাড়ি ডিভোর্সের মামলা করবে। আর বড়জোর নন্দিনীকে তাড়িয়ে দেবে। শিবাঙ্গী তা করেনি। নন্দিনী যে তার বিশ্বাসের মর্যাদা দিল না। এটাতেই শিবাজী বোধহয় ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে। আমি শুনেছি শিবাঙ্গী খুবই রাগী।

ঠিকই শুনেছেন। রাগলে ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

শিবাঙ্গী আর জাহ্নবী মিলে ঠিক করে নন্দিনীকে সবক শেখাতে হবে। জাহ্নবী ভিক্টরকে ঠিক করে দেয়। ভিক্টর ছোটখাটো উঠতি মস্তান। বোধহয় দু’লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট্রে রাজি হয়ে যায়। পুলিশ শিবাঙ্গীর ব্যাঙ্কে ক্যাশ উইথড্রয়াল চেক করে দেখেছে, জুন মাসের এক তারিখে এক লাখ টাকা ক্যাশ তোলা হয়।

তারপর?

কাহিনিটা একটু জটিল। কথা ছিল খুনটা করবে একা ভিক্টর। সিকিউরিটিকে এড়িয়ে বাড়ি ঢোকার পথ সম্ভবত ছক করে দিয়েছিল জাহ্নবী। ভিক্টর পেছনের দেওয়াল টপকে ঢোকে, গ্যারেজের গাড়ির আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ওপরে ওঠে। ওর ফ্ল্যাটে ঢোকার ব্যবস্থা শিরাঙ্গাই করে দেয়। কিন্তু একটা মস্ত গণ্ডগোল হয়েছিল।

কীসের গণ্ডগোল?

শিবাজী শত্রুর শেষ রাখতে চায়নি। ভিক্টরকে বলা ছিল সে একা আসবে, নন্দিনীকে খুন করবে, তারপর শিবাঙ্গীর কাছ থেকে বাকি এক লাখ টাকা নিয়ে সরে পড়বে। শিবাঙ্গীর প্ল্যান ছিল, ভিক্টর টাকা নিতে ঢুকলেই আগে থেকে প্রস্তুত শিবাঙ্গী তাকে গুলি করে মেরে দেবে।

সর্বনাশ! শিবাঙ্গী কি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে?

পারে। এবং তার পিছনে আপনি এবং শিবাঙ্গীর ইগো। তার প্ল্যান মতো ঘটনাটা ঘটলে শিবাঙ্গী হয়তো উতরেও যেত। কিন্তু গণ্ডগোল হল ভিক্টর একা খুন করতে আসেনি। সঙ্গে বাদুকেও এনেছিল। হয়তো একা আসতে সাহস পায়নি। আর ওই জন্যই প্ল্যানটা ভেস্তে গিয়েছিল। নন্দিনী অনেক রাত অবধি জেগে তার ঘরে কাজ করে। সম্ভবত বাইরের দরজা খুলে কেউ ঢুকেছে টের পেয়ে সে ব্যাপারটা দেখতে আসে এবং খুন হয়ে যায়। তারপর বাকি টাকা নিতে ভিক্টর শিবাঙ্গীর ঘরে যায়। শিবাঙ্গী তৈরি হয়েই ছিল। ভিক্টর কাছাকাছি হতেই সে গুলি চালায়। কিন্তু প্রবলেম হল, ম্যাডামের শুটিং প্র্যাকটিস ছিল না। আর হ্যান্ডগানগুলোর ব্যারেল ছোট বলে বেশিরভাগ সময়েই তা হয়ে যায়। এরাটিক। গুলি লাগে। ভিক্টরের বা কঁধে। সে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। ম্যাডাম হয়তো তাকে ফিনিশ করতে পারত, কিন্তু বাদ সাধল বাদু। সে গুলির আওয়াজ পেয়েই ছুটে এসে ম্যাডামের হাতে পিস্তল। দেখেই ফায়ার করে।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি কি একটু জল খেতে পারি?

অবশ্যই।

এবার জল খেতে গিয়ে কাঁপা হাতে জল চলকে পড়ল বিষাণের বুকে। জল খেয়ে দম ধরে বসে রইল একটু। তারপর ধরা গলায় বলল, এবার বাকিটা বলুন মিস্টার

দাশগুপ্ত।

ম্যাডাম আগুন নিয়ে খেলছিলেন, বুঝতে পারেননি। বাদুর গুলিতে ওঁর মারা যাওয়ার কথা। কপালজোরে বেঁচে গেছেন।

হ্যাঁ, ডাক্তাররাও বলছিলেন, উনি খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। স্কালে ঢুকলেও গুলি ভাইটাল জায়গাগুলোকে টাচ করেনি।

জ্ঞান ফেরার পর শিবাঙ্গীর নতুন প্রবলেম দেখা দিয়েছে উনি জানেন না, নন্দিনী সত্যিই মারা গিয়েছে কিনা বা খুনিরা ধরা পড়েছে কিনা। ওঁর কাছে খবরের কাগজ, মোবাইল বা টিভি নেই। ডাক্তাররা সবাইকে বলে দিয়েছে ওঁকে কোনও খবর দেওয়া চলবে না। আমাকে উনি বারবার নন্দিনীর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

আমাকেও করেছে। জাহ্নবীকেও।

তবে মনে হয় তিন-চারদিন আগে উনি সত্যটা জানতে পেরেছেন যে, নন্দিনী মারা গেছে। এবং খুনিরা ধরা পড়েছে।

কী করে বোঝা গেল?

উনি এখন ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

কীভাবে?

তিনদিন আগে উনি জাহ্নবীকে দিয়ে ওঁর অ্যাকাউন্ট থেকে এক লাখ টাকা ক্যাশ তুলে ভিক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর ভিক্টরের পক্ষে ব্রজবাসী দত্তকে দাড় করিয়েছেন। ব্রজবাসী একজন ধুরন্ধর ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। যাতে ভিক্টর কিছু কবুল না করে। আমার কাছে ও যা বলেছে তার রেকর্ড নেই। সুতরাং আদালতে ও বয়ান পালটাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষাণ বলল, অ্যাডভোকেট ব্রজবাসী দত্তকে কন্ট্যাক্ট করার জন্য শিবাঙ্গই আমাকে বলেছিল। ওঁকে আমিই কন্ট্যাক্ট করি। আমি কি কোনও অন্যায় করেছি মিস্টার দাশগুপ্ত?

না। উনি এখনও আপনার স্ত্রী। আর স্ত্রী অন্যায় করে থাকলেও আপনার কাজ হল যতদূর সম্ভব তাকে প্রোটেকশন দেওয়া।

শিবাঙ্গী সম্পর্কে যা বললেন তাতে মনে হয় ওর বিরুদ্ধে কেন্সটা খুবই স্ট্রং। ওকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তবে আমাদের ফেস লস হবে। দুটো পরিবারই মর্যাদা হারাবে।

দেখুন, আপনাকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে চাই। এই কেন্সটা অফিসিয়ালি সিআইডি-কে দেওয়া হয়নি। আপনাদের থানার ওসি দিবাকর গুপ্ত আমার দাদার মতো। উনি কেন্সটায় একটু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছিলেন। ডাকাতি এবং ডাকাতি করতে গিয়ে খুন বলে ওঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। আপনার ওপর ওঁর সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল, অথচ আপনার সঙ্গে কথা বলে ওঁর দ্বিধাও হছিল। ফলে উনি আমাকে বলেন সাহায্য করতে। আমি আমার হানচ। এবং ইনফর্মেশন ওঁকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন উনি কী অ্যাকশন নেবেন তা আমি জানি না। তবে সম্ভবত শিবাঙ্গী আর জাহ্নবীর গ্রেফতার এড়ানো যাবে না।

হতাশা মাখা মুখে করুণ গলায় বিষাণ বলল, এর চেয়ে খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপলেই বোধহয় ভাল ছিল। আমি তো একজন রুইনড ম্যান, বাজে লোক, মাতাল, লম্পট! প্রতি মুহুর্তেই তো পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

শবর হেসে বলল, এ যাত্রায় সেটা বোধহয় হচ্ছে না। তবে আপনি যতই দাড়ি-গোঁফ রেখে বিষণ্ণ মুখে থাকুন না কেন আমার মনে হচ্ছে আপনার চেহারা একটু বেটার হয়েছে। মদটা আর খাবেন না।

খাচ্ছি না। কিন্তু বড্ড একা হয়ে গেলাম মিস্টার দাশগুপ্ত। একাই তো ছিলেন। কিন্তু আপনি তো নাকি মায়ের আদুরে ছেলে। কয়েকদিন মায়ের কাছ থেকে গিয়ে ঘুরে আসুন।

কোন মুখে যাব? একমাত্র মায়ের কাছেই সব মুখ নিয়ে যাওয়া যায়।

ঋণ

০১. আপনার নাম

আপনার নাম?

মিঠু মিত্র।

বাবার নাম?

স্বর্গত পিনাকী মিত্র।

আপনার কোনও পোশাকি নাম আছে?

না, আমার একটাই নাম।

বয়স?

তেত্রিশ বছর।

ঠিকানা?

এই ফ্ল্যাটই আমার ঠিকানা।

এই ফ্ল্যাট ছাড়া আপনার আর কোনও বাড়ি নেই?

আছে।

কৃষ্ণনগরে। আমার বাবা করেছিলেন। কিন্তু সেটা ভাড়াটেদের দখলে। তারা ভাড়াও দেয় না।

বাড়ির ট্যাক্স কে দেয়?

আমিই দিই।

আপনি কোথায় চাকরি করেন?

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে।

ব্রাঞ্চ?

রসা রোড।

কী চাকরি করেন?

অ্যাকাউন্স অফিসার।

কতদিন চাকরি করছেন?

প্রায় দশ বছর।

একই ব্রাঞ্চে?

না। তিনটে ব্রাঞ্চে ঘুরে ফিরে।

আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস?

সিঙ্গল।

কখনও বিয়ে হয়েছিল?

হয়েছিল।

কার সঙ্গে?

মিতালি ঘোষ। ডিভোর্স হয়ে গেছে।

বিয়েটা ভেঙে গেল কেন?

মিতালি আমাকে পছন্দ করত না।

কেন করতেন না?

সেটা তারই জানার কথা।

অপছন্দের কথাটা তিনি কবে প্রকাশ করেন?

বিয়ের রাতেই।

অপছন্দ হলে তিনি আপনাকে বিয়ে করলেন কেন?

আমাদের বিয়ে কিছুটা অ্যাক্সিডেন্টাল।

কীরকম?

ওর বাবা বরুণ ঘোষের লাং ক্যান্সার হয়েছে বলে একজন বড় ডাক্তার সন্দেহ প্রকাশ করেন। মিতালি তার একমাত্র সন্তান, তিনি বিপত্নীক ছিলেন। সুতরাং তিনি খুব তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে আমার সঙ্গেই বিয়ে দেন।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে আপনার বিয়ের আগে পরিচয় ছিল?

সামান্য ছিল। আমার ব্রাঞ্চে ওঁর অ্যাকাউন্ট ছিল। প্রায়ই আসতেন। আমি তখন ক্যাশে বসতাম। সেই সূত্রেই পরিচয়।

মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পক্ষে পরিচয়টা যথেষ্ট নয় কিন্তু।

সেটা আমি অস্বীকার করছি না।

বরুণ ঘোষ কি নিজেই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান?

না। আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। উনি ওঁর অসুখের কথা বলে আমাকে রাজি করান।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি বরুণ ঘোষের ক্যান্সার হয়নি।

না। সেটা পরে ধরা পড়ে। কিন্তু তখন ক্যান্সার হয়েছে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

দেখুন, আমরা পুলিশের লোক। সহজ সরলভাবে কোনও কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে খবর আছে, বিয়ের ব্যাপারে আপনারই আগ্রহ ছিল বেশি। কারণ বরুণ ঘোষের টাকা এবং বিষয়সম্পত্তি। তার মেয়ে মিতালিও ছিল সুন্দরী এবং মেধাবী। আপনার যা স্ট্যাটাস তাতে বরুণ ঘোষের মতো একজন ধনী লোক তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে আপনার সঙ্গে দিতে চাইবেন এবং তার জন্য চাপাচাপি করবেন এটা কি স্বাভাবিক ঘটনা?

না, স্বাভাবিক ঘটনা নয়, আমিও জানি। কিন্তু তখন সিচুয়েশনটা স্বাভাবিক ছিল না। উনি নাচার হয়েই বিয়েটা দেন।

আমি যদি বলি, আপনি ওঁর মেধাবী ও সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করে ওঁর বিরাট সম্পত্তি গাপ করার জন্য ওঁকে ব্ল্যাকমেল করেছিলেন?

ব্ল্যাকমেল। কীভাবে ব্ল্যাকমেল করব?

সেটা আস্তে আস্তে জানা যাবে। তদন্তের তো মোটে শুরু।

আগেই বলেছি বরুণবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় গভীর ছিল না। ব্যাঙ্কের সূত্রে পরিচয়। তাকে ব্ল্যাকমেল করার প্রশ্নই ওঠে না।

এই বিয়েতে যে মিতালির আপত্তি ছিল, তা কি আপনি বিয়ের আগে জানতে পেরেছিলেন?

না।

মিথ্যে কথা। বিয়ের আগে মিতালিই আপনাকে টেলিফোন করে জানান যে, এই বিয়েতে তিনি রাজি নন।

না তো, এরকম ঘটনা ঘটেনি।

শুধু তাই নয়, মিতালি আপনাকে একটা চিঠিও লিখেছিলেন।

আমি কোনও চিঠি পাইনি।

মিতালি ঘোষের বন্ধুরা কিন্তু সাক্ষী দেবে। তারা জানে।

আমি সত্যি কথাই বলছি।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার। এই ফ্ল্যাটটা কার?

আমার।

এটা কি বিয়ের আগেই কিনেছিলেন?

হ্যাঁ।

ফ্ল্যাট কেনার টাকা কে দিয়েছিল?

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কিনেছিলাম। ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি ছিল।

মিথ্যে কথা। আমরা জানি, ফ্ল্যাট কেনার জন্য টাকা আপনি আদায় করেছিলেন বরুণ ঘোষের কাছ থেকে।

কিন্তু আমার লোনের রেকর্ড ব্যাঙ্কে আছে।

সে টাকা তুলে আপনি হয়তো ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছেন বা শেয়ারে খাটিয়েছেন। আমরা সবই জানতে পারব।

বরুণ ঘোষের কাছ থেকে আমি টাকা নিইনি।

বিয়ের রাতে মিতালি আপনাকে কী বলেছিলেন?

বলেছিল আমাকে তার পছন্দ নয়।

আপনি তখন কী করলেন?

আমি খুবই অসহায় ফিল করলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে, পছন্দ না হয়ে থাকলে আমার দিক থেকে তার কোনও ক্ষতি হবে না।

মিথ্যে কথা। আপনি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে উপগত হয়েছিলেন।

না। কখনওই নয়। তার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্কই হয়নি।

আপনারা এই ফ্ল্যাটে কতদিন একসঙ্গে বসবাস করেছেন?

একসঙ্গে বসবাস করিনি। ফুলশয্যার রাত থেকেই মিতালি আর আমি আলাদা ঘরে শুতাম। মাসখানেক বাদে মিতালি স্থায়ীভাবে চলে যায়।

আপনার হাইট কত?

পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি।

ওজন?

আটাত্তর কেজি।

মিতালিদেবীর গয়নাগুলি আপনি তার কাছ থেকে কেড়ে রেখে দিয়েছিলেন কেন?

গয়না! তার গয়নার খবরই আমি রাখি না।

আপনারা দু'জন যুবক-যুবতী একসঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতেন, তবু আপনাদের মধ্যে সেক্স রিলেশন হয়নি এটা কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

বলি। কারণ ঘটনাটা সত্যি।

আপনার রান্নাবান্না কে করে?

আমি নিজেই করি।

সবকিছু করেন?

আমার কোনও কাজের লোক নেই। নিজেই সব করি।

তরকারি বা মাছ কুটতে পারেন?

পারি।

তরকারি কী দিয়ে কাটেন? বঁটি?

না। ছুরি দিয়ে।

কীরকম ছুরি?

কিচেন নাইফ।

দেখুন তো, এরকম ছুরি?

না, অত বড় নয়।

এর চেয়ে কতটা ছোট হবে?

আরও দু'ইঞ্চি ছোট।

আপনি কি জানেন মিতালিদেবী ঠিক এরকমই একটা কিচেন নাইফে খুন হয়েছেন?

জানি।

কীভাবে জানলেন?

কাগজে পড়েছি। আপনি কী মিন করতে চাইছেন?

আচ্ছা, মিতালিদেবী কি কখনও আপনাকে বলেছিলেন যে, তিনি অন্য কাউকে ভালবাসেন?

না তো!

ভাল করে ভেবে দেখুন।

এরকম কথা বললে আমার মনে থাকত।

বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল?

পঁচিশ-ছাব্বিশ।

আর মিতালিদেবীর?

আঠারো-উনিশ। তখন ও ডাক্তারি পড়ছিল।

আপনার কি কোনও প্রেমিকা আছে?

না।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স, নামমাত্র বিয়ে, তবু কেউ জোটেনি?

না।

না? অথচ এর আগে পুলিশের জেরার উত্তরে আপনি বলেছেন যে, আপনার দুজন বান্ধবী আছেন।

বান্ধবী আর প্রেমিকা এক নয়।

তফাতটা কী?

অনেক তফাত।

তাদের মধ্যে একজনের নাম কি শিখা বরুয়া?

হ্যাঁ।

আর একজনের নাম মন্দিরা সেন?

হ্যাঁ।

এদের সঙ্গে আপনার কোনও অ্যাফেয়ার নেই?

না।

বিশ্বাস করতে বলছেন?

বলছি।

ঠিক আছে। ডিভোর্সের পরই আপনার স্ত্রী বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। ফর হায়ার স্টাডিজ। কোথায় গিয়েছিলেন আপনি জানেন?

শুনেছি আমেরিকায়।

আপনি বিদেশে তার ঠিকানা জানতেন?

ন্‌না।

জানতেন না। তা হলে তাকে যে আপনি গাদা গাদা চিঠি লিখতেন সেগুলো তার কাছে কীভাবে পৌঁছোত?

আমি তাকে চিঠি লিখতাম না।

হাসালেন মশাই। তার সুটকেসে আপনার একাধিক চিঠি পাওয়া গেছে।

আমি তাকে চিঠি লিখিনি।

কখনও নয়?

না।

আচ্ছা আপনার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

প্রথম দিকে ভালই ছিল। মিতালি আমাকে ছেড়ে ওঁর কাছে চলে যাওয়ায় উনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। মিটমাটের চেষ্টাও করেছিলেন। তখন আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন, দুঃখ প্রকাশ করতেন। মিতালি শেষ অবধি ডিভভার্সের মামলা করায় উনি ভেঙে পড়েন। শুনেছি তখন থেকেই ওঁর হার্টের দোষ দেখা দেয়। তখন থেকেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কমে যেতে থাকে।

আপনি কি বরুণ ঘোষকে সেসময়ে ব্রেট করেছিলেন?

না তো! থ্রেট করব কেন?

আপনি কি কুংফু ক্যারাটে জানেন?

খানিকটা শিখেছিলাম।

কেন শিখেছিলেন?

এমনি, শখ করে।

নাকি মস্তান হওয়ার জন্য!

মস্তান!

অবাক হচ্ছেন? বাসব হালদার নামে একজন লোককে তার দু'জন বন্ধুসহ আপনি একডালিয়ায় মারধর করেছিলেন। তারা আপনার বিরুদ্ধে পুলিশে ডায়েরি করেছিল। পুলিশ আপনাকে গ্রেফতারও করে। ঠিক কি না?

হ্যাঁ। বাসব হালদার নিজেই একজন গুন্ডা। একডালিয়ায় আমার একজন বন্ধু ভাড়াবাড়িতে থাকত। তাকে তুলে দেওয়ার জন্য বাড়িওলা বাসবকে লাগায়। বাসব তাকে প্রায়ই হ্যারাস করত, এমনকী তার বোনকে পর্যন্ত রাস্তা-ঘাটে টিজ করা শুরু করে। তখন বাধ্য হয়ে

বাসব হালদার গুন্ডা ছিল, এ কথা আপনিই বলছেন। তা হলে বলুন, গুন্ডাকে পেটাতে পারে আরও একজন গুন্ডাই, তাই না?

আমি গুন্ডামি করিনি, অন্যায়ের প্রতিকার করেছিলাম মাত্র।

রবিন হুড? অ্যাঁ! আপনি নিজেকে হিরো বলে প্রমাণ করতে চাইছেন নাকি? তা হলে বলি, আপনার বিরুদ্ধে আরও একটা পুলিশ কেস ছিল। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে ন্যাটা দাসকে আপনি মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। বেচারা মারাও যেতে পারত। এফআইআর-এ আছে আপনি তাকে গুলিও করেছিলেন।

আমি! আমি কী করে গুলি করব? আমার কোনও বন্দুক পিস্তল নেই।

ধীরে, মশাই, ধীরে। গুলি আপনি করেছিলেন ঠিকই, তবে শেষ অবধি সেটা প্রমাণ হয়নি। প্রমাণ হয়নি বলেই ধরে নেবেন না যে আপনি নিরপরাধ। অনেক ক্রাইমই প্রমাণ হয় না। ন্যাটা দাসকে আপনি কেন মেরেছিলেন?

আমার জ্যাঠামশাই তাকে বিশ্বাস করে কিছু ডলার ভাঙাতে দিয়েছিলেন। টাকাটা সে মেরে দেয়।

কীরকম জ্যাঠামশাই?

গ্রাম সম্পর্কের। ওঁকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। জাহাজে চাকরি করতেন।

ন্যাটা দাসও কি গুন্ডা ছিল?

নিশ্চয়ই। পুলিশের রেকর্ডে তার বিরুদ্ধে অনেক কেস।

আপনি কি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন?

না। শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

খুনের একটা টেন্ডেন্সি আপনার কি বরাবর ছিল?

না।

তা হলে আপনি আসলে একজন হিরো? দুঃখের বিষয় এরকম একজন হিরোর মূল্য মিতালিদেবীই টের পেলেন না। যাকগে, বরুণ ঘোষের কথায় আসা যাক। আপনি তাকে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করতেন বলুন তো!

ব্ল্যাকমেলের প্রশ্নই ওঠে না।

ওঠে। তার আগে জিজ্ঞেস করি, ব্ল্যাকমেল কথাটার অর্থ আপনি জানেন তো! গুপ্ত কথা ফাস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধা আদায়। আপনি বরুণ ঘোষের অন্তত একটা গুপ্ত খবর জানতেন।

কী?

ওঁর বেনামা অ্যাকাউন্ট। রুদ্র সেন, পিনাকী শর্মা আর হরিপদ হাজরা–এই তিনটে ফিকটিশাস নামে ওঁর আরও তিনটে অ্যাকাউন্ট ওই ব্রাঞ্চে ছিল। আপনি কি তা জানতেন না?

জানতাম।

এটা কি গুপ্ত খবর নয়?

এটা ম্যালপ্র্যাকটিস। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেউ কেউ করে। কিন্তু তেমন মারাত্মক অপরাধ নয় বলে গুরুত্ব না দিলেও চলে।

তা হলে কি বলতে চান, আপনি বরুণ ঘোষ সম্পর্কে আরও গুরুতর কোনও গুপ্ত কথা জানতেন?

না। তার সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য।

আপনি কি জানেন আমরা তার কিছু ডায়েরি পেয়েছি, যাতে তিনি লিখে গেছেন যে, তাকে কেউ নিয়মিত ব্ল্যাকমেল করত?

না। আমার এসব জানার কথা নয়।

যদি বলি ব্ল্যাকমেলার হিসেবে তিনি আপনার কথা ডায়েরিতে লিখে গেছেন?

হতেই পারে না। তিনি তেমন মিথ্যেবাদী ছিলেন না।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার। জানেন তো, বড় ক্রিমিনালরা খুব কুল হেডেড হয়? যাকগে, ডায়েরি তো কোর্টেই প্রোডিউস করা হবে। বরুণবাবুর কাছ থেকে পণ হিসেবে আপনি কত টাকা নিয়েছিলেন?

এক পয়সাও নয়।

আচ্ছা, এবার বেশ ভেবে বলুন তো, বিয়ের রাতে মিতালিদেবী ঠিক কী ভাষায় বলেছিলেন যে তিনি আপনাকে পছন্দ করেন না। ভেবে বলুন।

খুব সাধারণভাবে বলেছিল।

বিয়ের রাতে না ফুলশয্যার রাতে?

ফুলশয্যার রাতে।

কী বলেছিলেন?

বলেছিল, আমি এ বিয়ে মানি না।

বেশ রাগ করে বলেছিলেন কি?

খুব ঠান্ডা গলায় বলেছিল।

তখন আপনার কীরকম রি-অ্যাকশন হয়েছিল? আপনি কি ইনসাল্টেড ফিল করেছিলেন?

হ্যাঁ।

আর তাই আপনার ভিতর জিঘাংসা জেগে উঠেছিল?

ও কথা কেন বলছেন?

কারণ তারপরই আপনি তাকে অ্যাটাক করেন এবং রেপ করেন। আপনি কি জানেন যে স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে জোর করে মিলিত হলে সেটা রেপ-এর পর্যায়ে পড়ে। যদিও এদেশে সেটা বেআইনি নয়।

তখন জানতাম না, কিন্তু এখন জানি। কিন্তু আমি সেই অপরাধটা করিনি।

আপনার ভিতরে অপরাধপ্রবণতা আছে, আপনি কুংফু ক্যারাটে জানেন, আপনার ইগো প্রবল। এসব কন্ডিশনগুলো আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মিতালিদেবী তার এক বন্ধুকে ঘটনাটা পরদিনই জানিয়েছিলেন।

তা হলে মিতালি বা তার বন্ধু কেউ একজন মিথ্যে কথা বলেছে।

বরুণ ঘোষ কবে মারা গেছেন আপনি জানেন?

মাসখানেক আগে।

কীভাবে জানলেন? বরুণ ঘোষের খবর কি কাগজে বেরিয়েছিল?

লোকের মুখে শুনেছি।

সেই লোক কে, মনে আছে?

ভাবলে মনে পড়বে হয়তো।

একজ্যাক্ট ডেটটা জানেন?

মনে নেই। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি বোধহয়।

কীভাবে মারা যান?

থ্রম্বসিস বোধহয়। ওরকমই শুনেছিলাম।

আপনার সঙ্গে তার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

মনে নেই, বোধহয় উনি আমেরিকা যাওয়ার আগে।

আমার নাম শবর দাশগুপ্ত। খুবই বিচ্ছিরি নাম। তবে মা বাবা নামটা শখ করে রেখেছিলেন, কী আর করা যাবে বলুন!

ঠিকই তো।

এমনকী নামটার অর্থও আমি ভাল করে জানি না। বাংলায় আমার বিদ্যের দৌড় খুবই কম। তবে যতদূর জানি শবর মানে ব্যাধ। তাই কি?

বোধহয়।

হাঃ হাঃ। একদিক দিয়ে আমার নামটা খুবই সার্থক। ব্যাধ মানে শিকারি তো? আমিও একজন ভাল শিকারি। আমার শিকার অবশ্য ক্রিমিনালরা। আই ক্যান অলওয়েজ স্মেল এ রটন র‍্যাট। হাঃ হাঃ।

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

আরে না। গলা শুকিয়ে গিয়ে থাকলে আপনি একটু ঠান্ডা জল খেয়ে নিন বরং। আচ্ছা, মিতালিদেবী কবে খুন হন সে তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

হ্যাঁ, গত শনিবার।

শনিবার মিতালি ঘোষ একটা পার্টি দিয়েছিলেন। জানেন?

জানি।

জানবেনই তো। আপনি তো সেই পার্টির একজন ইনভাইটিও ছিলেন।

না।

ছিলেন না? যাকগে, তবে আপনি সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তো?

আমি পার্টি জেনে যাইনি।

এমনিই গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কার্টসি ভিজিট?

না। মিতালির সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার ছিল।

সে তো বটেই। তাকে আপনি খুন করতে গিয়েছিলেন?

মিতালিকে খুন করে আমার কী লাভ?

মোটিভের কথা বলছেন? মোটিভ সবসময়ে তো আর মেটেরিয়ালিস্টিক হয় না। পুরনো অপমান, আহত অহং, সূক্ষ্ম জেলাসি, পরশ্রীকাতরতা, হেল্পললস লাভ, হোপলেস রিলেশন–কত কারণ থাকতে পারে। আপনিই বলুন না আপনার মোটিভ কী ছিল?

আমি খুনটা করিনি মিস্টার দাশগুপ্ত।

সে কথা থাক। বলুন, পার্টিটা কোথায় হচ্ছিল?

নীচের তলায়। হলঘরে।

চমৎকার সিচুয়েশন, তাই না! নীচের তলায় পার্টি চলছিল, গোলমালে আপনি ওপরে উঠে গিয়ে ঘাপটি মেরে মিতালিদেবীর শোয়ার ঘরে লুকিয়ে রইলেন।

তারপর পার্টি শেষ করে একটু ড্রাঙ্ক এবং হাই অবস্থায় মিতালিদেবী যখন ওপরে উঠে এলেন, তখন–না মশাই, এরকম গোল্ডেন সিচুয়েশন ভাবা যায় না।

কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে নীচের তলায় কয়েকজনের দেখা হয়েছিল। তারা আমার চেনা। পার্টি হচ্ছে দেখে আমি যে ফিরে আসি তা তারা জানে।

হ্যাঁ। আমরা তাদের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। কিন্তু কথাটা হল, স্পট অব ক্রাইমে আপনাকে দেখা গিয়েছিল। ইউ ওয়্যার দেয়ার। তাই না?

তা তো বটেই।

মিতালিদেবীর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল?

হয়েছিল।

মানে মার্ডারের সময়ে তো? আহা মশাই, ঝেড়েই কাশুন না।

মিতালিকে আমি খুন করিনি।

করেছেন, করেছেন। যাকগে, সব তথ্যই বেরিয়ে আসবে।

০২. পাপী! পাপী! ঘোর পাপী!

পাপী! পাপী! ঘোর পাপী! বিড়বিড় করতে করতে চোখ মেলল সে। চোখ মেলে যা দেখল তাতে শিউরে উঠে ফের চোখ বন্ধ করে ফেলল। নরক। নরক।

টেবিলের ওপর গত রাতের ভুক্তাবশেষ মাংসের হাড়, রুটির টুকরো, এঁটো প্লেট, একটা খালি আর-একটা অর্ধেক খালি ব্ল্যাক নাইটের বোতল। মেঝের ওপর খানিকটা বমিও কি? নরক! নরক।

বিছানাটা মস্ত বড়। ও পাশে যে শুয়ে আছে তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না সমীরণের। জুলেখা শর্মাদের কখনওই সকালের দিকে অবলোকন করা উচিত নয়। সকালটা কখনওই নয় নষ্ট মেয়েছেলেদের জন্য। কাতর একটা অর্থহীন শব্দ করে নিজের ভারী মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল সমীরণ। প্রতিদিন সকালে এটাই তার প্রথম ব্যায়াম–নিজেকে ভোলা।

এত পাপ ভগবান সইছেন কী করে? এতদিনে তার বজ্র নেমে আসার কথা। তবে কি তিনি আদতে নেই? নাকি পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, তার তত বজ্রের স্টক নেই?

বালিশের পাশে কর্ডলেস টেলিফোনটা পড়ে আছে। লো ব্যাটারির ইন্ডিকেটর জ্বলে আছে। দু'দিন বোধহয় চার্জ দেওয়া হয়নি। কত কী বকেয়া পড়ে আছে তার। এই যে জুলেখা, এ হল পরিবর্ত ব্যবস্থা, স্টপ গ্যাপ। তার একজন স্থায়ী মেয়েমানুষ আছে। ক্ষণিকা। না, বউ নয়। ক্ষণিকা দু'বার বিয়ে করেছিল। দু'বার ডিভভার্সের পর তৃতীয়বার আর বিয়ের মতো ভুল করেনি। সমীরণের সঙ্গে তার শর্ত ছিল, আসা-যাওয়া দু'দিকেই ভোলা রবে দ্বার। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না। এবং সমীরণকে ভাল করে বুঝতে হবে যে, ক্ষণিকা যেমন তার বউ নয়, তেমনি নয় রান্নার লোক বা ঝি। কেউ কারও বন্ধু বা বান্ধবী নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। হ্যাঁ, আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ কারও ওপর

নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না। তুমুল নারীবাদী ক্ষণিকা গত দু'বছর ধরে তার লিভ ইন গার্ল ফ্রেন্ড। এই দুটো বছর এই ফ্ল্যাটের ভিতরে বিস্তর মেজাজের বিস্ফোরণ, ইগোর সঙ্গে ইগোর যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন, ভালবাসা ও ঘৃণা এবং লাভ হেট রিলেশন ও উদাসীনতা–এই সবকিছুই ঘটে গেছে। সে এক ভদ্রমহিলার চেহারা ও স্মার্টনেসের কিছু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করে ফেলায় ক্ষণিকা–ঘোরর নারীবাদী ক্ষণিকা–কে বিশ্বাস করবে যে, রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে গত পনেরো দিন! মুক্ত নারীকে কি মানায় এই ঈর্ষা? কিন্তু তর্ক করবে কার সঙ্গে সমীরণ? তর্কে বহুদুর। এখন গিয়ে ক্ষণিকার কাছে তার ক্ষমা চাওয়া ও সেধে ফেরত আনার বকেয়া কাজটাও পড়ে আছে। জুলেখা অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু জুলেখার কথা জানতে পারলে কপালে সমীরণের আরও কষ্ট আছে।

সে পাপী–এই সার সত্য সে জানে। পঞ্চ ম-কারের কোনওটাই তার বাকি নেই। কিন্তু পাঁচটা ম-এর মধ্যে সে মেয়েমানুষ আর মদের কথা জানে। বাকি তিনটে ম কী কী? সে অন্তত জানে না।

সমীরণ নিজেকে দাঁড় করাল। এক হাতে একটা বালিশ, অন্য হাতে কর্ডলেস টেলিফোন। জিভটা এত শুকনো যে, মুখে যেন কেউ একটা পাপোশ ঢুকিয়ে দিয়েছে। বালিশটা ফের বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে সে গিয়ে টেলিফোনটা চার্জে বসাল। এ কাজটা জরুরি। কল আসতে পারে।

এইরকম বিচ্ছিরি সকালে বাথরুমটা তার কাছে মরূদ্যানের মতো লাগে। জলের আর এক নাম জীবন না? বেসিনের কল থেকে হাতের কোষে জল নিয়ে সে কয়েক ঢোক খেল। তারপর চোখেমুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে সে তাকাল আয়নায়, নিজের দিকে।

পাপী! পাপী। এত পাপ কি তোর সইবে রে? আকণ্ঠ ডুবে আছি পাপে।

শাওয়ার খুলে দিল সমীরণ। কলকাতার শীত তীব্র নয় ঠিকই, কিন্তু তবু তো শীতকাল। ঠান্ডা জলের শতধারার সূচিভেদ্য আক্রমণে প্রথমটায় শিউরে শিউরে উঠল সে। তারপর ভাল লাগতে লাগল। আঃ! কী আরাম।

জলে পাপ ধুয়ে যায় না, সে জানে। তবু জল যেন তার গা থেকে বাসি, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত একটা আস্তরণকে অপসারিত করছিল। স্নান করতে করতেই সে

হাতঘড়িটা দেখল, যেটা প্রায় সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতো প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই পরে থাকে সে। আটটা দশ। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য! কী করে এটা হয় তা আজও বুঝতে পারেনি সমীরণ। প্রতিদিন সকালে ঠিক একই সময়ে কেন ঘুম ভাঙে তার? কেন প্রতিদিন সকালে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায়, ঘড়িতে আটটা দশ? অলৌকিক ছাড়া একে আর কী বলা যায়?

স্নান করতে করতেই সে দাঁত ব্রাশ করল। তারপর শাওয়ার খোলা রেখেই বসল কমোডে। জল পড়ে যেতে লাগল বিনা কারণে। কিন্তু এ সময়ে এই জলের শব্দটা তাকে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর করে। বয়ে যাচ্ছে জল, বয়ে যাচ্ছে আয়ু, বয়ে যাচ্ছে মহার্ঘ সময়। জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়... নাই নাই নাই যে সময়... সাড়ে ন'টায় তার অফিস...

কমোড থেকে উঠে সে ফের শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল এবং দাড়ি কামিয়ে নিল। অনেকদিন আগে নন্দিতা বলেছিল, আপনার মুখে এক জোড়া গোঁফ থাকলে ভাল হত। এক-একটা মুখ আছে, গোঁফ না থাকলে মানায় না।

তা হবে। কিন্তু গোঁফের অনেক ল্যাঠা। কেয়ার করতে হয়, ছাঁটতে হয়, দু'দিক সমান করতে হয়। তার সময় কোথায়? আজও তাই গোঁফ রাখা হয়নি তার। কোথায় ভেসে গেছে নন্দিতা। গোঁফ ছাড়াও তার তো দিব্যি চলে গেল এতগুলো বছর।

কত বছর? সে কি চল্লিশের কাছাকাছি? না, সে বয়স নিয়ে মোটে ভাববে না, ভাবতে চায় না। বয়স মানেই একটা ভয়। একটা জ্বালা। একটা উদ্বেগ।

যখন সে বাথরুম থেকে বেরোল তখনও বিছানার দিকে তাকানোর ইচ্ছে হল না তার। লন্ডভন্ড বিছানার একপ্রান্তে এখনও জুলেখা শুয়ে থাকগে। ঘুম ভাঙলে আপনি চলে যাবে। এগারোটায় ওর স্কুল।

স্নান করে আসার পর নিজের শোয়ার ঘরের দুর্গন্ধ ও নারকীয় পরিবেশ তাকে যেন আরও তাড়া দিচ্ছিল বেরিয়ে পড়ার জন্য। ঘরের বাইরেও একটা নোংরা, গান্ধা শহর। তবু আলো আর হাওয়ার প্রবহমানতা আছে।

নরক! নরক!বলতে বলতে সে পোশাক পরল। চায়ের জল গরম করে টি ব্যাগ ডোবাল। বাইরের ঘরটা এখনও তত সংক্রামিত নয়। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। তবে

ফ্লাওয়ার ভাসে বাসি ফুল তার সহ্য হয় না। গত পনেরো দিন ধরে বা তারও বেশি এক গোছ হরেকরকম ফুল পচছে, শুকোচ্ছে, নেতিয়ে পড়ছে। কেউ ফেলার নেই। ফুলগুলোর দিকে অনিচ্ছের চোখে চেয়ে সে চা খেল।

পাপ কখনও গোপন থাকে না। ফুটে বেরোবেই। আর সেই কারণেই সমীরণ কখনও কিছু লুকোছাপা করে না। তার জীবন হল খোলা বই। এই যে শোয়ার ঘরে জুলেখা শুয়ে আছে, একটু বাদেই ঠিকে ঝি নবর মা এসে ওকে দেখবে। গত দশবারো দিন ধরে দেখছেও। এখন যদি হুট করে ক্ষণিকা চলে আসে, তা হলে সে-ও দেখবে। না দেখলেও ক্ষণিকা জানতে পারবে ঠিকই, তারপর অনেক অশান্তি হবে। সব জানে সমীরণ, তবু কিছুই লুকোয় না।

হাই।

সমীরণ একটু চমকে গিয়েছিল। হাতের কাপ থেকে চলকে একটু চা পড়ল হাঁটুতে। ছ্যাক।

হাই। ঘুম ভাঙল?

ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে মস্ত একটা হাই তুলল জুলেখা। ছোটখাটো শ্যামলা, ছিপছিপে মেয়েটি চোখে পড়ার মতো নয়। তবে চলাফেরায় একটা বেড়ালের মতো চকিত তৎপরতা আছে। একটা ফিরিঙ্গি স্কুলে ও ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। ইউপির মেয়ে, কলকাতায় জন্ম-কর্ম। আর বিশেষ কিছুই জানা নেই সমীরণের। জানার অনেক ল্যাঠা।

জুলেখা আর-একটা হাই তুলে বলল, ইটস বোরিং।

হোয়াট ইজ বোরিং?

এভরিথিং।

সমীরণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, ঠিক কথা। জীবনটাই ভারী একঘেয়ে। নাথিং হ্যাপেনস। সোমবার ঠিক মঙ্গলবারের মতো, মঙ্গলবার ঠিক বুধবারের মতো, অ্যান্ড সো

অন।

চা খাব।

খাও। জল গরম করা আছে।

তোমার ফোন বাজছে। ধরো।

জ্বালালে।

চলে গিয়ে ফোনটা ধরল সমীরণ। কানে লাগিয়ে হ্যালো বলেই চমকে উঠে কান থেকে ফোনটাকে একটু তফাতে ধরল সে। তার বাবা মধু বাগচী যাত্রাদলে ঢুকলে নাম করতে পারতেন। গলার রেঞ্জ সাংঘাতিক। রেগে গেলে আরও মারাত্মক। এখন সেই মারাত্মক মাত্রায় গলাটা তাকে ধমকাচ্ছে, কী ভেবেছ তুমি। সারারাত ফুর্তি করে সকালে হ্যাংওভার নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে? তোমাকে কতবার বলেছি, আজ শুক্রবার অফিসের আগে মিস্টার ভার্মার বাড়ি থেকে একটা জরুরি ফাইল নিয়ে আসবে। উনি অপেক্ষা করছেন। আর-একটু বাদেই উনি একটা ফ্লাইট ধরতে বেরিয়ে যাবেন।

যাচ্ছি বাবা, এখনই যাচ্ছি।

রিচ হিম উইদিন ফিফটিন মিনিটস। ফিফটিন! হার্ড মি?

ইয়েস। ফিফটিন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ডোরবেল বাজল। এ সময়ে বাবার কথা নয়। এ বাড়িতে খবরের কাগজ বা গয়লা আসে না। নবর মা আসে এগারোটার পর। সে ডোরবেল বাজায় না, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। সাধাসাধি না করলে ক্ষণিকা নিজে থেকে ফিরে আসার মেয়ে নয়।

একটু চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন সমীরণ গিয়ে দরজাটার দিকে হাত বাড়িয়ে জুলেখাকে বলল, টু বি অন দি সেফ সাইড, তুমি বরং শোয়ার ঘরে যাও।

যাচ্ছি। বলে জুলেখা একটা হাই তুলল। তারপর সে বেশ ধীরেসুস্থে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

দরজা খুলে সমীরণ যাকে দেখল সে বেশ ছোটখাটো মানুষ। গোঁফ আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। চেহারা রোগা। পরনে কালো ট্রাউজার্স আর-একটা কটসউলের সবুজ চেকওলা হাওয়াই শার্ট, বিনা হাস্যে বলল, আসতে পারি?

সমীরণ দরজা না ছেড়ে বলল, কী চাই?

আপনাকেই।

কী দরকার?

লোকটা বুকপকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে দেখিয়েই পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তদন্ত। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।

সমীরণ একটু ক্যাবলা হয়ে গিয়ে বলল, তদন্ত মানে সেই ইয়ের কেসটা কি? একবার তো এনকোয়ারি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেই ইয়ের কেসটাই। এনকোয়ারি বারবার হবে। এবারেরটা গুরুতর। পরশু দিনও এসেছিলাম। আপনি বেশ সকালেই অফিসে বেরোন দেখছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে পরশু আপনার কাজের মেয়েটির সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে। রিগাড়ি ইউ। আমি ভিতরে এলে কি আপনার অসুবিধে হবে? ভিতরে গার্ল ফ্রেন্ডট্রেন্ড কেউ আছে নাকি মশাই?

না না। আসুন।

থাকলেও আমি মাইন্ড করব না। তাকেও হয়তো প্রয়োজন হবে। মার্ডার কেস যে কোথা থেকে কোথায় গড়ায়।

সমীরণ লোকটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, বসুন। কিন্তু আমি একটা জরুরি কাজে বেরোচ্ছিলাম।

আমার কাজটা কি কম জরুরি? এখন যদি আপনি কাজ দেখান তা হলে আপনাকে আমার অফিসিয়ালি থানায় টেনে নিয়ে যেতে হবে।

আতঙ্কিত সমীরণ বলল, প্লিজ। তা হলে আমি বাবাকে একটা টেলিফোন করে নিই? উনিই আমার বস।

জানি। কর্ডলেস টেলিফোনটা এই ঘরে নিয়ে এসে কথা বলুন। আর গার্ল ফ্রেন্ডটিও এখানে স্বচ্ছন্দে এসে বসতে পারেন।

সমীরণ টেলিফোনটা নিয়ে এল। খানিকটা চার্জ নিয়েছে। চলবে। সে লাইনটা অন করে ডায়ালের বোম টিপতে টিপতে বলল, জুলেখা টয়লেটে গেছে। এসে যাবে।

বেফাঁস বলা। টেলিফোনে তার বাবার গলা হঠাৎ ফেটে পড়ল, জুলেখা টয়লেটে গেছে? হোয়াট ডু ইউ মিন? কে জুলেখা? আর তার টয়লেটে যাওয়ার খবর তুমি এই সাতসকালে আমাকে শোনাচ্ছ কেন?

আপনাকে নয়।

আমি জানতে চাই তুমি এখনও বেরিয়ে পড়োনি কেন? তোমাকে বলেছিলাম কি না ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে ভার্মাকে রিচ করতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কী সমস্যা? জুলেখা কে? তার টয়লেটে যাওয়াটাই তোমার সমস্যা নাকি?

না বাবা। আই অ্যাম আন্ডার অ্যারেস্ট।

অ্যারেস্ট! বলে বাবা এমন চেঁচাল যে, মানুষ অত জোরে সচরাচর চেঁচাতে পারলে টেলিফোন যন্ত্রটারই দরকার হত না।

অ্যারেস্ট! আমি ঠিক শুনেছি তো।

ঠিকই শুনেছেন। তবু আমি ভেরিফাই করে নিচ্ছি। বলে মাউথপিসটায় হাত চাপা দিয়ে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাম আই আন্ডার অ্যারেস্ট?

না না। বরং ইউ আর আন্ডার স্ক্রুটিনি।

মাউথপিসটা থেকে হাত সরিয়ে সমীরণ বলল, ইনি বলছেন, ঠিক অ্যারেস্ট নয়, আই অ্যাম আন্ডার স্ক্রুটিনি। ব্যাপারটা কী তা আমি জানি না।

কেন, তোমাকে স্ক্রুটিনিই বা করা হচ্ছে কেন? তুমি কী করেছ!

মনে হচ্ছে সেই ইয়ের কেসটা—

কোন কেসটা? কীসের কেস?

একটা মার্ডার কেস।

মাই গড! মার্ডার কেস! মার্ডার কেস! ঠিক শুনছি?

ঠিকই শুনেছেন। ইনি বোধহয় আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন। ভার্মার ফাইলটা তাই আমার পক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

হ্যাং ভার্মা। পুলিশ অফিসারকে ফোনটা দে, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লোকটাকে কিছু বলতে হল না, নিজেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে তার বাবাকে বলল, ঘাবড়াবেন না, আপনার ছেলেকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

বাবার গলা টেলিফোন থেকে দু'হাত দূরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল সমীরণ। বাবা বলল, কার মার্ডার? কীসের মার্ডার?

মিতালি ঘোষ নামে একটি মেয়ের।

তার সঙ্গে আমার ছেলের কী সম্পর্ক?

সম্পর্কটা গোলমেলে। তবে ক্রমশ সব জানা যাবে।

আমার যে প্যালপিটিশন হচ্ছে।

একটা সর্বিট্রেট খেয়ে নিন।

শুনুন অফিসার, আমার এই সেজো ছেলেটা অত্যন্ত ইররেগুলার। বোধহয় লম্পটও এবং একটি মিটমিটে বদমাশ।

আজকাল কে নয়? দি ইয়ং জেনারেশন ইজ টোটালি স্পয়েন্ট। তার জন্য আপনারা অর্থাৎ পেরেন্টসরাই বেশি রেসপনসিল।

ও কে, ও কে। কিন্তু আমার কথাটা শেষ হয়নি। আমি বলছিলাম কী, হি হ্যাজ হিজ ভাইসেস। কিন্তু হি ইজ কমপ্লিটলি ইনক্যাপেবল টু কমিট মার্ডার, হি ইজ নট ব্রট আপ দ্যাট ওয়ে।

হু নোজ? তবে আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট উনি এখনও নন। ওঁর কাজটা আজ আপনি চালিয়ে নিন।

কিন্তু আপনাদের প্রশ্নোত্তরগুলো। যে আমার জানা দরকার। আই অ্যাম ওরিড।

উপায় কী বলুন? ইন্টেরোগেশনের রানিং কমেন্টরি তো আপনাকে শোনানো যাবে না।

আমি কি আসব?

না। আপাতত ওকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। আপনি পরে ওঁর কাছ থেকে শুনে নেবেন। ছাড়ছি।

আচ্ছা, আচ্ছা।

ফোনটা অফ করে লোকটা সমীরণের হাতে সেটা দিয়ে বলল, হ্যাপলেস পেরেন্টস। যান, ওটা চার্জে বসিয়ে আসুন।

পাপ। পাপ! পাপ ছাড়া কি তার জীবনে কিছু নেই? তার জীবন পঞ্চ ম-কারে আকীর্ণ। কিন্তু মার্ডার ম দিয়ে শুরু হলেও বোধহয় পঞ্চ মকারের মধ্যে পড়ে না।

ভিতরের ঘরে এসে কর্ডলেসটা চার্জে বসিয়ে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করল। সকালবেলায় তার মাথা এমনিতেই ভাল কাজ করে না। তার ওপর এইসব উলটোপালটা ঘটনায় সে বিভ্রান্ত। এখন দরকার মেডিটেশন। আজকাল স্ট্রেস কালনোর জন্য অনেকেই মেডিটেশন ধরেছে। ব্যাপারটা কেমন তা অবশ্য সে ভাল করে জানে না। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ইত্যাদির কথা সে খুব শুনতে পায় আজকাল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে সে নিজেকে জড়ো করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল মাত্র। তারপর গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে চাপা জরুরি গলায় ডাকল, জুলেখা! জুলেখা!

ভিতরে শাওয়ার চলছে। জুলেখা শুনতে পেল না।

টেবিল থেকে চাবিটা তুলে এনে সেইটে দিয়ে দরজায় নক করল সে।

শাওয়ার বন্ধ হল, জুলেখা বলল, কে?

আমি। একটু তাড়াতাড়ি করো।

কেন? উইল ইউ গো টু দি পি? আর-একটা বাথরুম তো রয়েছে।

নো, আই ওন্ট গো টু দি পি। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার পি হিয়ার। পুলিশ।

পুলিশ? যাঃ, তুমি ইয়ারকি করছ।

মাইরি না।

পুলিশ কী চায়?

ইন্টেরোগেট করতে এসেছে।

আমাকে? আমাকে কেন?

তোমাকেও। আমার সম্পর্কে হয়তো জানতে চাইবে।

ডোন্ট ওরি। আই শ্যাল পেইন্ট ইউ ইন পিঙ্ক।

ইয়ারকি নয়। সিরিয়াস ব্যাপার। আই মে বি আন্ডার অ্যারেস্ট।

কেন, তুমি কী করেছ?

পাপ! বিস্তর পাপ করেছি। কিন্তু পুলিশ যে পাপটার কথা বলছে সেটা আমি করিনি।

ভেবো না। আমি পুলিশের মেয়ে, পুলিশের নাতনি। আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন এ পুলিশ কোয়ার্টার। পুলিশের কোলে চড়েই বড় হয়েছি।

চমৎকৃত হয়ে সমীরণ বলল, এসব আগে বলতে হয়। আই অ্যাম ইমপ্রেস্ট, ইউ আর অ্যান অ্যাসেট।

পুলিশ কেন এসেছে বলো তো! হ্যাভ ইউ কমিটেড এনি ক্রাইম?

আমার এক বান্ধবী সম্প্রতি খুন হয়েছে।

বান্ধবী?

ইট ওয়াজ অল ইন দি নিউজপেপার্স। মিতালি ঘোষ।

আমি খবরের কাগজ পড়িই না। ঠিক আছে, তুমি গিয়ে কথা বলো। আমি আসছি।

এই শীতেও কি একটু ঘাম হচ্ছে তার? কে জানে কেন, ছোটখাটো, আনইমপ্রেসিভ চেহারার পুলিশ অফিসারটির সামনে তার কিছু অস্বস্তি হচ্ছে। সে ঘরে ঢুকতেই অফিসারটি কান থেকে একটা ছোট্ট যন্ত্র খুলে তার গুটিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, ওয়েল ডান।

তার মানে?

আমি এতক্ষণ আপনাদের ডায়ালগ শুনছিলাম।

কীভাবে শুনছিলেন? এনি ইলেকট্রনিক ডিভাইস? আজকাল যে কত কিম্ভুত যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে, একটুও শান্তি বা সেলুশন থাকছে না।

এটা একটা ইমপ্রোভাইজড হিয়ারিং এইড। খুব সফিস্টিকেটেড কিছু নয়, তবু ভাল কাজ দেয়। বসুন।

সমীরণ বসল।

মিতালিদেবী কি আপনার বাল্যবান্ধবী?

আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম।

তিনি কেমন মেয়ে ছিলেন?

ব্রাইট। মেরিটোরিয়াস।

সেটা আমরা জানি। আদার সাইডস?

খুব মিশুকে ছিল। একটু রোমান্টিক।

ডাক্তারি পড়ার সময়ে ওঁর বিয়ে হয়ে যায়, তাই না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

এত আরলি এজে বিয়ে হয়েছিল কেন, জানেন?

সমীরণ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, ওর মা নেই। বাবা আর ও। বোধহয় ওর বাবা ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। সেইজন্যই

ওঁর বাবা বরুণ ঘোষের ক্যান্সার হয়েছিল বলে ডাক্তার একটা ভুল ডায়াগনসিস করে। ঘটনাটা আপনি জানেন?

না। আসলে স্কুলের পর আমাদের বিশেষ মেলামেশা ছিল না। টেলিফোনে কথা হত। বিয়ের নেমন্তন্নেও গিয়েছিলাম।

এত আরলি এজে কেন বিয়ে হচ্ছে তা জানতে চাননি।

হ্যাঁ। কিন্তু ও ভেঙে কিছু বলেনি।

বিয়েতে কি ওঁর আপত্তি ছিল?

ছিল। বলেছিল বাবা ওকে প্রেশার দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে।

প্রেশারের কারণ কি সাসপেক্টেড ক্যান্সার?

আমি ঠিক জানি না। হতে পারে।

আপনি হয়তো আরও কিছু জানেন। বলতে চাইছেন না।

না, ঠিক না নয়।

মিতালিদেবীর হাজব্যান্ড মিঠু মিত্রকে আপনি চেনেন?

চিনি।

কীভাবে চেনেন?

ওদের বিয়ের সময়ে পরিচয় হয়েছিল। পরে বন্ধুত্বের মতোই হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ে তো ভেঙে যায়। এক মাস পরই মিতালিদেবী চলে আসেন!

হ্যাঁ। কিন্তু মিঠুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তাতে কেটে যায়নি।

সম্পর্কটা কীরকমভাবে হল?

ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং। বলব? আপনার কি অত সময় আছে?

আছে। বলুন।

বউবাজারে আমাদের একটা জুয়েলারির দোকান আছে। তখন আমরা দুই ভাই ওখানে বসতাম। একবার দোকানে একটা ডাকাতি হয়। ডাকাতির পর বাবা ডিসিশন নেন আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস দরকার এবং মার্শাল আর্টও রপ্ত করা প্রয়োজন। আমি জীবনে ব্যায়ামট্যায়াম কখনও করিনি।

সেটা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

যায়?

যায়। তবে আপনি তো হ্যাপি লাইফ কাটান। হ্যাপিনেশের হ্যাপা হল হেলথ হ্যাজার্ডস।

বাঃ, আপনি বেশ অ্যালিটেরেশন করতে পারেন।

তারপর বলুন।

হ্যাঁ। মিতালির বর যে একজন মার্শাল আর্টিস্ট তা আমার জানা ছিল। মিঠুর কাছে আমরা দুই ভাই ওসব শিখতে যেতাম। সেই থেকেই বেশ ভাব হয়ে যায়।

মিঠু মিত্র কেমন লোক?

ভাল। খুব ভাল।

তা হলে আপনার বান্ধবী মিতালি তাকে পছন্দ করেননি কেন?

কে কাকে পছন্দ করবে বলা মুশকিল।

আমি জানতে চাই মিঠু মিত্রকে অপছন্দ করার বিশেষ কোনও কারণ মিতালিদেবীর ছিল কি না।

আমি জানি না। ঠিক আছে। অন্তত এটা তো জানেন, বিয়ের আগে মিতালিদেবী আর-কোনও ছেলেকে পছন্দ করতেন কি না।

আপনি কি পান্টুর কথা জানতে চাইছেন। দেখুন, ও কেসটা স্যাড। মিতালি একটা মারাত্মক ভুল করেছিল। ভুল বুঝতে পেরে সে ফিরেও আসে।

একটু ডিটেলসে বলবেন কি?

ব্যাপারটা হল, মিতালি একটু রোমান্টিক টাইপের। পান্টু ছিল ওর পাড়ার মস্তান। এ ব্যাড টাইপ। কিন্তু বেশ রোখা-চোখা, সাহসী। মিতালি ইনভলভড হয়ে গিয়েছিল। ওর বাবা ভয়ংকর রেগে যাবেন বলে মিতালি ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে যায়। বিগ ব্লান্ডার। ছেলেটার রোজগারপাতি ছিল না, যোগ্যতাও নয়। মিতালি ছ'মাস বাদে বাবার কাছে ফিরে আসে। এ রেক অফ এ গার্ল। মেয়ে চলে যাওয়ার পর ওর বাবা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শরীরও ভেঙে যায়। মিতালি ফিরে এলেও ওর বাবা সেই শকটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমি মনে করি, এরকম ভুল যে কেউ করতেই পারে। অল ইন দি লাইফস গেম।

ঘটনাটা কি মিঠু মিত্র জানতেন?

বোধহয়, মিতালির বাবাই হয়তো ওকে বলেছিলেন।

আপনি শিয়োর নন?

আমি প্রসঙ্গটা কখনও তুলিনি। মনেও হয়নি।

পান্টু এখন কোথায়?

জানি না। ওকে আমি এক-আধবার দেখেছি।

বিয়েটা যে ভেঙে গেল তা পান্টুর ব্যাপারটার জন্য নয় তো।

আরে না। মিতালি তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। পান্টুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল মন থেকে।

ওদের কোনও ইস্যু হয়েছিল কি? মানে পান্টু আর মিতালির?

না না।

মিঠু মিত্র পান্টুর কথা জেনে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল–এমন কি হতে পারে?

না, কখনওই নয়। বিয়েটা ভেঙেছিল মিতালিই।

ঠিক জানেন?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

এবার বলুন, পার্টির দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

পার্টিতেই ছিলাম। আই ওয়াজ অ্যান ইনভাইটি।

পার্টিতে কী হয়েছিল?

মিতালি অনেককে নেমন্তন্ন করেছিল।

অকেশনটা কী?

গেট টুগেদার।

কীরকম পার্টি?

ককটেল ডিনার।

মিঠু মিত্রকে কি নেমন্তন্ন করা হয়েছিল?

মাই গড! না।

তবু মিঠু মিত্র সেইদিন মিতালিদেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়।

কখন এবং ঠিক কোথায়?

আমি তখন গাড়ি থেকে নামছি। দেখি মিঠু কম্পাউন্ডের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। মিঠুর প্রেস্টিজবোধ প্রবল।

তিনি কেন এসেছিলেন সে-বিষয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

না। হি ইজ এ রিজার্ভড ম্যান। আগ বাড়িয়ে বলে না।

আপনাদের মধ্যে কি কিছু কথাবার্তা হয়েছিল?

সামান্য। মিঠু খুব অন্যমনস্ক ছিল। আমি বললাম, কী খবর? ও বলল, ভাল।

উনি কি গাড়িতে এসেছিলেন?

না। মিঠুর একটা বুলেট মোটরবাইক আছে। সেইটেতে চড়ে চলে গেল। খুব স্পিড দিয়েছিল মনে আছে?

আপনি কি মিতালিদেবীকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?

করেছিলাম।

তিনি কী বললেন?

ওকে খুব ডিস্টার্বড দেখলাম।

কীরকম? খুলে বলুন।

আনইজি লাগছিল। একটু যেন রেস্টলেস। আমাকে হঠাৎ বলল, আমি জীবনে বারবার ভুল করি কেন বলো তো?

ব্যস, এইটুকু?

না। আরও একটু বলেছিল।

কীরকম?

বলল, আই মাস্ট রিকনসাইল।

কার সঙ্গে?

সেটা স্পষ্ট করে বলেনি। আন্দাজ করছি, মিঠুকেই মিন করছিল।

হাউ ডু ইউ নো?

আমি তো বলেইছি, ওটা আমার আন্দাজ।

সেদিন কি মিতালিদেবী খুব ড্রিঙ্ক করেছিলেন?

হ্যাঁ। মিতালি মদ খেত না কখনও। আমেরিকাতেও না। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। তাতেই প্রায় থাকত ও আমেরিকায় নেশার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করতে চায়।

তবু সেদিন উনি ড্রিঙ্ক করেছিলেন?

হ্যাঁ, উলটোপালটা খাচ্ছিল। কখনও হুইস্কি, কখনও শেরি, কখনও বিয়ার বা রাম। বোঝা যায় ও ড্রিঙ্ক করতে জানেই না।

তারপর কী হল?

মশাই, মুশকিলে ফেললেন।

কেন?

আমি পাপী-তাপী লোক। মদ আমিও খাই। পার্টি কিছুক্ষণ চলার পর আমি কি আর চৈতন্যে ছিলাম?

আউট হয়ে গিয়েছিলাম?

ঠিক তা না হলেও আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি হাই। ডিনার টেবিলে বসেও আমি নাকি কিছু খেতে পারিনি।

তারপর?

ক্ষণিকা আমাকে ফিরিয়ে আনে।

ক্ষণিকা কে? যিনি বাথরুমে আছেন?

না। এ জুলেখা।

আপনার ক’জন?

একজনই। ক্ষণিকা। এ হল স্টপ গ্যাপ।

একে কোথায় পেলেন?

জুটে যায়।

আপনি ভাগ্যবান লোক। আচ্ছা, মিঠু মিত্র আপনাকে কোথায় ক্যারাটে শেখাতেন?

সাদার্ন ক্লাবে। লেক-এর কাছে।

আপনি কতদিন শেখেন?

বেশি নয়। মাস খানেক। ক্যারাটে ইজ এ বোরিং থিং। সিনেমাটিনেমায় দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু শেখা ভীষণ একঘেয়ে। এক জিনিস হাজারবার করতে হয়।

ক্ষণিকাদেবী এখন কোথায়?

ক্ষণিকা! ওঃ! সে বাপের বাড়িতে।

উনি কি আপনাকে ছেড়ে গেছেন?

বোধহয় না। টেম্পোরারি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং।

সেটা কীরকম? জুলেখাদেবীই কি কারণ?

না না। জুলেখা ইজ নো ম্যাচ ফর হার। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

বলুন।

ওয়ানস আই ওয়াজ ইন লাভ উইথ মিতালি।

তাই নাকি?

ইট ওয়াজ ন্যাচারাল। মিতালির ডান গালে একটা আঁচিল আছে। আপনি দেখেননি, তাতে ওকে কী সুন্দর দেখাত! ইন ফ্যাক্ট সেভেন্টি পারসেন্ট অফ হার মেল ক্লাসমেটস ওয়্যার ইন লাভ উইথ হার।

তারপর বলুন।

অবশ্য কাফ লাভ। ওসব ভুলে যেতে দেরি হয় না। তারপর মিতালি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে এল আই ওয়াজ সেকেন্ড টাইম ইন লাভ উইথ হার। আমেরিকায় গিয়ে ও আরও সুন্দর এবং স্মার্ট হয়েছে। অনেক ম্যাচিয়োর্ডও এইসব কথা আমি ক্ষণিকাকে বলেছিলাম।

বটে?

হ্যাঁ। অ্যান্ড ক্ষণিকা ওয়াজ ক্রস। পার্টি থেকে আমাকে নিয়ে এসে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সে সোজা বাপের বাড়ি চলে যায়।

কেন, পার্টিতে কিছু হয়েছিল?

আমি নাকি মাতাল অবস্থায় মিতালির প্রতি প্রেম নিবেদন করে ফেলেছিলাম। কিন্তু মাতালের কথা কি ধরতে আছে, বলুন? শি ইজ সো জেলাস!

বেশি জেলাসি থেকে মানুষ খুনও করতে পারে!

আতঙ্কিত সমীরণ বলল, না না! কী যে বলেন! ক্ষণিকা ওরকম মেয়ে নয়।

কীরকম মেয়ে?

কোয়াইট রেসপনসিবল। সোশ্যাল ওয়ার্কও করে।

আপনি কি বলতে পারেন মিতালিদেবীর আমেরিকায় কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কি না!

নেই।

কীভাবে জানলেন যে নেই?

থাকলে আমাকে জানাত।

উজ্জ্বল সেন বলে কারও নাম শুনেছেন?

শুনেছি। উজ্জ্বল ওর বন্ধু ঠিকই, কিন্তু যাকে বয়ফ্রেন্ড বলে তা নয়।

উজ্জ্বল কী করেন?

আমেরিকায় ওর ব্যাবসা আছে।

কীসের ব্যাবসা?

বোধহয় সফটওয়্যার।

বোধহয় বলছেন কেন?

সেইরকমই শুনেছিলাম যেন।

ওঁদের মধ্যে কোনও অ্যাফেয়ার ছিল না বলছেন!

না না থাকলে মিতালি আমাকে জানাত।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

সামান্য।

কীরকম লোক ছিলেন?

লোনলি। আপনমনে থাকতেন।

আপনার ব্লাডপ্রেশার কত?

প্রেশার? তা তো জানি না। কেন বলুন তো?

মাঝে মাঝে চেক করানো ভাল। আপনার ফোন বাজছে। বোধহয় আপনার বাবা। গিয়ে ফোনটা ধরুন।

বাবাই। ফোন ধরেই কানের কাছ থেকে যন্ত্রটাকে তফাত করতে হল। বাবা চেঁচাচ্ছিল, কী হল? কী হয়েছে? বলবি তো।

কিছু হয়নি। আমরা অ্যামিকেবলি কথা বলছি।

অ্যারেস্ট করেনি তো!

না বাবা।

তেমন বুঝলে আমাদের বিরজা উকিলকে খবর দিতে পারি।

এখনই দরকার নেই।

কে খুন হয়েছে বলছিলি?

আমার এক বান্ধবী।

কুলাঙ্গার কোথাকার!

বাবা ফোন রেখে দেওয়ায় হাফ ছেড়ে বাঁচল সমীরণ।

সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখল, লোকটা আবার তার হিয়ারিং এইডটা কান থেকে খুলে পকেটে রাখল। তারপর বলল, আপনার বান্ধবী বাথরুমে একটু বেশি সময় নিচ্ছেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাথরুম ওর খুবই প্রিয় জায়গা, ডাকব কি?

ডাকুন।

সমীরণ গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, হয়েছে জুলেখা? যাচ্ছি।

আরও মিনিট পাঁচেক পর জুলেখা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে সামনের ঘরে এল। হেসে বলল, হাই। আমি জুলেখা।

অফিসার বলল, আমি শবর দাশগুপ্ত। গোয়েন্দা।

হাউ থ্রিলিং!

আপনি একজন পুলিশ অফিসারের মেয়ে?

হ্যাঁ। আমার বাবার নাম বিজয় শর্মা। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। রিটায়ার্ড।

সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

জাস্ট বারো দিন।

কীভাবে?

উই ওয়্যার টু লোনলি পিপল। উই মেট সামহোয়ার। অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট।

আপনি চাকরি করেন?

হ্যাঁ, মেরিজ স্কুলে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর।

ম্যারিটাল স্ট্যাটাস?

সিঙ্গল।

একা থাকেন না বাবা-মা’র সঙ্গে?

একা। বাবা-মা আমার লাইফ স্টাইল পছন্দ করেন না।

সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াটা কি অ্যাক্সিডেন্টাল?

হ্যাঁ।

কোথায় দেখা হল?

একটা বার-এ।

বার-এ? আপনি কি ড্রিঙ্ক করেন?

অকেশনালি। যখন বোরিং বা লোনলি ফিল করি।

আর ইউ ইন লাভ?

হিঃ হিঃ। ডোন্ট নো।

আপনি কি জানেন যে, ওঁর আর একজন গার্ল ফ্রেন্ড আছেন?

জানব না কেন?

আপনি মিতালি ঘোষের কথা শুনেছেন?

না।

হাউ ডিড ইউ ফল ফর হিম?

জুলেখা মুচকি হাসল, উইল ইউ বিলিভ?

হোয়াই নট?

হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ স্কেয়ারড অফ গোস্টস।

ভূতের ভয়?

ঠিক তাই।

শবর সমীরণের দিকে চেয়ে বলে, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

সমীরণ ভারী লজ্জিত হয়ে বলে, বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভয় পাই। বিশেষ করে মিতালি খুন হওয়ার পর থেকে।

সত্যি?

আজ্ঞে।

মিস শর্মা, তারপর বলুন।

আই অ্যাম ন্যাচারালি অ্যাট্রাক্টেড টু লোনলি পিপল। সমীরণকে আমার ভাল লেগেছিল।

এর আগে অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে এভাবে বাস করেছেন?

মাত্র একবার। তবে পল্লবের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ারই কথা ছিল। একটা অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা যায়। এক বছর আগে। আই লিড এ লোনলি লাইফ।

আপনার ঠিকানা?

থ্রি এ বাই ওয়ান লিটন স্ট্রিট। রুম নম্বর টুয়েন্টি থ্রি।

এটা কি বোর্ডিং হাউস?

হ্যাঁ। কিন্তু এই মার্ডার কেসটার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার সম্পর্ক নেই? আমি কি যেতে পারি? আমার স্কুলে আজ ফেট আছে।

পারেন।

বাই দেন।

বাই।

জুলেখা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শবর। দরজা বন্ধ হওয়ার পর বলল, ইজ শি টেলিং দি টুথ?

মোর অর লেস।

হোয়াই লেস?

ওটা কথার কথা। ও ঠিকই বলেছে।

কোন বার-এ আপনাদের দেখা হয়েছিল?

মদিরা।

আপনি সেখানে রেগুলার যান?

যাই। বেশ সেলুডেড জায়গা। গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে।

জুলেখাও কি যায়?

না। সেদিনই ওকে প্রথম দেখলাম।

কীভাবে পরিচয় হল?

ও একটু হাই ছিল। এসে আমার টেবিলে বসল। অ্যান্ড উই টকড।

তারপর?

তারপর তো দেখছেন।

ক্ষণিকাদেবী রাগ করবেন না?

করবে। এখনও হয়তো জানে না। জুলেখা অবশ্য জানে যে, এটা কোনও পার্মানেন্ট ব্যবস্থা নয়। খুব কনসিডারেট মেয়ে।

শুধু ভূতের ভয়ের জন্য আপনি বান্ধবী জোগাড় করেছেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? বিশ্বাস করুন। বাস্তবিকই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। পাপী তো, আমার কেবলই মনে হয় মৃতদের আত্মারা আমার কাণ্ড দেখে রেগে যাচ্ছে। বাগে পেলেই এসে গলা টিপে ধরবে।

০৩. তোমাকে যা বলতে চাই

(এক) শোনো,

আমি আজ তোমাকে যা বলতে চাই তা তোমার বিশ্বাসই হবে না যদি না একটা গল্প তোমাকে বলি। এখানে মখমলের মতো ঘাস হয়, নিবিড় গাছপালা আর কত ছড়ানো এখানকার নির্জনতা। আমার বাড়ির কাছেই একটা বন। এখানে সবই অভয় অরণ্য। এরা গাছপালা এত ভালবাসে। রোজ সকালে আমি একা একা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে যাই। একটা নদী আছে, কেউ সেখানে কখনও স্নান করে না। একটা মল আছে। মল মানে জানোই তো, বাঁধানো চাতাল আর বসবার জায়গা। এরা যা করে নিখুঁত। মলটাও এত সুন্দর। রোজ গিয়ে নদীর ধারে ওই মল-এ বসে থাকি। কেউ থাকে না। মাঝে মাঝে ঘোড়া চালায় ছেলেমেয়েরা। আর জগাররা দৌড়োয়। এদের খুব স্বাস্থ্যের বাতিক। বহুদিন বাঁচতে চায়, খুব ভোগ করতে চায়। একদিন কী হল জানো, খুব সকালে বেরিয়েছি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। সেপ্টেম্বর মাস। ফল-এর আর দেরি নেই। গাছের পাতার রং বদলে যাচ্ছে। কদিন পর সারা বনভূমি একদম রাঙা হয়ে যাবে। ফল যদি তুমি দেখতে ইচ্ছে করছে আমার দু'খানা চোখ তোমাকে পাঠিয়ে দিই। আমি চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। হঠাৎ পায়ে কী একটা ঠেকল। শক্ত। তাকিয়ে যা দেখলাম বুক হিম হয়ে গেল। একটা পিস্তল পড়ে আছে। কোথা থেকে এল? কে ফেলে গেল? সর্বনাশ! ধারেকাছে ষণ্ডাগুড়া রেপিস্ট নেই তো! না বাবা, ফিরে যাওয়াই ভাল। শরীর কেঁপেটেপে আমার কী অবস্থা! ফিরব বলে যে-ই ঘুরে দাঁড়িয়েছি কী দেখলাম জানো? ভাবতেও পারবে না। রাস্তার ধারে একটা পুরনো গাছ গত ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। কেউ সরায়নি। সেই শুকনো গাছের ওপর একটা হাত নেতিয়ে পড়ে আছে। সাদা হাত। আমার কী অবস্থা ভাবতে পারো? বুক ধড়ফড় করে যাই আর কী! তবু কী জানো, খুব ভয়ের মধ্যেও একটু সাহস ছিল। সকালবেলা, দিনের আলো, কাছাকাছি জগার আর রাইডাররা তো আছেই। আমি পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে উঁকি দিয়ে বললাম, হু ইজ দ্যাট?

কেউ জবাব দিল না। দেখলাম একটা লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। কপালের পাশটায় একটা ফুটো। অনেক রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তারপর জমে গেছে। ভয় পেলেও আমি তো ডাক্তার। গাছের ওপর নেতিয়ে পড়া হাতটা ধরে বুঝলাম মারা গেছে অনেকক্ষণ। রিগর মর্টিস শুরু হয়ে গেছে। বেশি বয়স নয়। সাতাশ-আঠাশ। একমাথা সোনালি চুল। সাদা। একটা শার্ট আর ট্রাউজার্স পরা। আর মুখখানা এত কচি, এত সুন্দর কী বলব। কী হল জানো, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। কেন মনে পড়ল বলো তো! ছেলেটার মুখখানায় তোমার আদল আছে। আর সেই যে মনে পড়ল, হঠাৎ যেন হু হু করে তুমি সাত সমুদুর ডিঙিয়ে এসে আমার ভিতরে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ছিলে। ভিতরটা তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এত কান্না পাচ্ছিল কেন বলো তো।

আমি মলের দিকে দৌড়োতে লাগলাম। চিৎকার করলাম। লোকজন জড়ো হল। পুলিশ এসে ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এলাম কেমন যেন ভূতে-পাওয়ার মতো। বসে বসে ভাবলাম আর ভাবলাম। একটা বহুঁকালের বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যেন এক আশ্চর্য বাগানে পা দিয়েছি। চারদিক ফুলে ফুলে রঙে গন্ধে একাকার। কিন্তু কেন?

তুমি বিশ্বাসই করবে না তিন দিন আমার মাথা এলোমেলো রইল। কাজে মন দিতে পারিনি। বারবার কী মনে পড়ছিল বলে তো! ফুলশয্যার রাতে তুমি কোনও কথা বলার আগেই আমাকে একটা অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেয়েছিলে। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতেই দাওনি। এমনভাবে ধরেছিলে আমায় যে, নড়তেও পারিনি। আমার খুব রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। তোমাকে ভাল তো বাসিই না, বরং ঘেন্না করি। ভীষণ। কী ভয়ংকর রাগ হচ্ছিল আমার। তুমি যখন ছাড়লে তখন আমি কী না বলেছি! যা খুশি। তোমার মুখটা কেমন নিভে গেল। কেমন ঠান্ডা আর পাথরের মতো হয়ে গেলে তুমি!

এবার গল্পটা আর-একটু বলে নিই। জঙ্গলের মধ্যে যে-ছেলেটা সুইসাইড করেছিল তার নাম জর্জ। এখানে, হাজার হাজার জর্জ। যা হোক, এই জর্জ কেন সুইসাইড করল বলো তোর বললে তোমার বিশ্বাস হবে না।

আমি জর্জকে চিনতাম না বটে, কিন্তু তার বাড়ি আমার খুব কাছাকাছি। পুলিশের কাছে শুনলাম, জর্জের নতুন বউ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়াতেই নাকি সে আত্মহত্যা করে বসেছে। শোনো কথা, এ দেশেও এরকম হয় নাকি? এখানে তো বর-বউ সম্পর্কই অন্যরকম। ছাড়ছে, ধরছে। বিয়েও করছে না সবসময়ে। এত

নিরাবেগ জাত, তবুও তো মাঝে মাঝে এরকম হয়! শুনে মনটা আরও আরও খারাপ হল। আর কী জানো, যত মন-খারাপ ততই যেন সেই মন-খারাপটা আমি এনজয় করছিলাম। এটা একটা বিশ্বাস করার মতো কথাই নয়। মন-খারাপ কি কেউ এনজয় করে? কিন্তু আমি যে করছিলাম!

সেই মন-খারাপের মধ্যে কী হল বলো তো! আমার ভিতরে যেন বাইরের মতোই পাতা ঝরার সময় হল। কী যে ছাই হল মাথামুন্ডু বুঝতেও পারি না, বোঝাতেও পারি না। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন কী-ই বা বয়স বলো! আর বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছিল বলে সেই বয়সে কী রাগ হয়েছিল আমার! রাগ ছিল পাটুর জন্যও। ওই বদমাশটার জন্য কেন বলল তো চিরকালের একটা দাগ পড়ল জীবনে! সব মিলিয়েমিশিয়ে বিয়ের সময়ে আমার মধ্যে আমি তো ছিলাম না। বাবার ক্যান্সার হয়েছে বলে শুনছি তখন, মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড়। সব রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা তোমার ওপর! সেসব আমার পুরনো পাতা। এই পাতা ঝরার দিনে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এলে ঝোড়ো বাতাসের মতো তুমি আমার পাতা খসে পড়ল সব। একে সন্ধেবেলা ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাইরে নির্জন রাস্তা। তার ওপাশে ছবির মতো বাড়ি। তার পিছনে অন্ধকার বনভূমি। চেয়ে আছি। আকাশে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কী মনে হল বলব? হঠাৎ মনে পড়ল, সেই যে অনেকক্ষণ ধরে তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে, তখন বুঝতে পারিনি, রাগ হচ্ছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব গভীর কোথাও সেই চুমুর স্মৃতি সুখের মতো শিহরন নিয়ে আজও আছে। খুব রাগ করেছিলাম তোমার ওপর। আলাদা ঘরে থাকতাম। তুমি কি জানো, মাঝে মাঝে দরজাটা চুলের মতো ফাঁক করে লক্ষ করতাম তোমাকে? তুমি আমাকে আক্রমণ করতে চাও কি না, তুমি জোর জবরদস্তি করবে কি না, তা বুঝতে চেষ্টা করতাম। ভয় পেতাম, তুমি হয়তো ধর্ষণ করবে আমায়। আজ মনে হয়, আমি বোধহয় তাই চাইতাম। কেন জোর করলে না বলল তো! আজ খুব বুঝতে পারছি, সে সময়ে আমার মধ্যে দুটো উলটো জিনিস কাজ করছিল। একই সঙ্গে একটা টান আর একটা প্রত্যাখ্যান। তখনকার বয়সটার কথা ভাবো, আমার জীবনটার কথা ভাবো, বুঝতে পারবে।

কিন্তু এখন এই দূর দেশে বসে এই নতুন নিজেকে আবিষ্কার করে কী হবে বলো তো! সব তো চুকেবুকে গেছে। সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলেছি। একটা কথা বললে বিশ্বাস করবে? তোমাকে প্রথম দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল, তুমি একটা ভাল লোক। কেন বলো তো! তুমি কি সত্যিই ভাল? কে জানে! কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, সেই

জঙ্গলের মধ্যে ঘটনাটার পর থেকে আমার সব উলটোপালটা হয়ে গেল। কতবার ভুল করব বললো তো জীবনে? আমার কিছু ভাল লাগছে না।

.

(দুই) তোমাকে আমার খুব লম্বা একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। তাতে অনেক আবোল তাবোল থাকবে। যা খুশি লিখব। পাগলামিতে ভরা। জানো গো, আমার কিন্তু একটু একটু করে পাগলামিই দেখা দিচ্ছে বোধহয়। হঠাৎ হঠাৎ আমার আজকাল এত আনন্দ হয় যেন আমি বর্ষার নদী, দু'কুল ছাপিয়ে কোথা থেকে কোথায় ছড়িয়ে পড়ছি। আবার অকারণেই বুক ভার, চোখে জল, মন মেঘলা। পড়াশুনোর এত চাপ, এত ভীষণ সময়ের অভাব, তবু তার মধ্যেও এসব হয়। জানো না তো, এখানে কাজের চাপে মনের সব আবেগ শুকিয়ে যায়। ছিলাম এক বাঙালি দম্পতির বাড়িতে। তারা বেশ লোক। বুড়োবুড়ি। দুই মেয়ের এদেশেই বিয়ে হয়েছে। বুড়োবুড়ির সময় কাটে আপনমনে, ঘোর নিঃসঙ্গতায়। আমি তাদের মাসিমা মেলোমশাই ডাকতাম। তারা তাতে খুব খুশি। ওবাড়িতে বেশ ছিলাম। কিন্তু এখন হস্টেলে থাকতে হচ্ছে। বড্ড কেজো জায়গা। যে যার নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

আমারও ইগো, তোমারও ইগো। তাই তোমাকে চিঠিটা লিখতে গিয়েও লিখতে পারিনি। তিনবার কিন্তু শুরু করেছি। তিনটে এয়ারোগ্রাম নষ্ট। না, ফেলিনি, রেখে দিয়েছি। কী জানি, তুমি বিয়ে করেছ কি না। মাঝে মাঝে তোমার খবর খুব জানতে ইচ্ছে করে। করেছ? সমীরণ প্রায়ই চিঠি লেখে, আমিও লিখি। কিন্তু তার কাছে জানতে চাইতে লজ্জা করে। কী ভাববে? আচ্ছা, টেলিপ্যাথি বলে কিছু নেই? নেই কেন? এই তো আমি টেলিপ্যাথিতে তোমার কাছে কত কথা বলছি! শুনতে পাচ্ছ?

প্রফেসর এজেফিয়েল সেদিন বলছিলেন, যাদের ইগো খুব প্রবল তাদের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ থাকে। এই ইগো বড় জ্বালাচ্ছে আমাকে, জানো? তাই তোমাকে চিঠি লিখতে পারছি না। এটা আমার পাগলামি নম্বর এক। দু'নম্বর পাগলামি হল, এখন তোমাকেই ভাবি আর তোমার সঙ্গেই কথা বলি মনে মনে। এটাকে কি ভাবমূর্তি বলে? না বোধহয়। অন্য কিছু বলে হয়তো। কিন্তু ভাবমূর্তি কথাটা বেশ, না? তোমাকে ভেঙে ফেললাম, তারপর তোমার একটা মানসমূর্তি গড়ে নিলাম, বেশ মজা।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। সুসান আমার খুব বন্ধু। দু'জনে গাড়ি নিয়ে একটা ঝরনা দেখতে গেছি। বড় সুন্দর জায়গা। সাফোকেটিংলি বিউটিফুল। ফেরার সময় একটা পিছল জায়গায় আছাড় খেলাম। না, তেমন লাগেনি। কিন্তু কে জানে কেন, আমার চোখ ভরে জল এল। ভাবলাম, তুমি থাকলে আমি কি পড়ে যেতাম? কক্ষনও না। সুসান আমাকে ধরে তুলছিল। চোখে জল দেখে অবাক হয়ে বলল, আর ইউ ক্রায়িং? মাই গড, ইউ আর নট দ্যাট হার্ট।

আমি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম, আমার তো কেউ নেই!

কী কথার কী উত্তর। শুনে সুসান আরও অবাক। বলল, আরে তোমার আবার কে থাকবে? আমারই বা কে আছে? উই ডোন্ট নিড এনিবডি।

সত্যিই তাই। এদের কেউ নেই। মা বাবা ভাই বোন কারও তোয়াক্কা করে না। একা থাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণ। দরকার মতো বিছানায় বয়ফ্রেন্ড ডেকে নেয়। তারপর তাকে ভুলেও যায়। জলভাত। আর বিয়ে করতে হলে এত হিসেবনিকেশ করতে বসে যে, ওটা বিয়ে না বিজনেস কন্ট্রাক্ট তা বুঝতে কষ্ট হয়।

আমি এদের কাছে পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করছি। পারছি না। কিছুতেই পারছি না। আমার কেবলই মনে পড়ে সেই তোমার অনেকক্ষণ ধরে চুমু খাওয়ার কথা। তখন ঘেন্না করেছিল। আজ আমার সমস্ত শরীর আর মন সেই চুমুটার কথা ভেবে সম্মোহিত হয়ে যায়। অন্য কোনও পুরুষ কাছে এলে কুঁকড়ে যাই, স্পর্শ তো বটেই, কাছাকাছি হওয়াটাও সহ্য করতে পারি না। এ আমার পাগলামি নম্বর তিন।

.

(তিন) আজ বাবা এল। এয়ারপোর্টে বাবাকে আনতে গিয়েছিলাম। দেখলাম অল্প কিছুদিনেই বাবা বড্ড বুড়িয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছি, টুকটাক কথা হচ্ছে। কী করলাম জানো? হঠাৎ বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, মিঠুবাবুর কী খবর?

বাবা অবাক হয়ে বলল, মিঠুবাবু কে?

আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম, মিঠু মিত্র।

কী হবে খবর দিয়ে?

এমনি।

আমার বুক কাঁপছিল। লজ্জা করছিল।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ক'দিন আগে দেখা হয়েছিল। ভাল আছে।

আমি আরও কিছু শুনতে চেয়েছিলাম। বাবা বলল না।

কিন্তু দু'দিন পর এক রাতে ডিনারের পর বাবা আমাকে ডেকে বলল, হারে, তুই সেদিন মিঠুর খবর জানতে চাইলি কেন?

এমনি।

তোর কি মিঠুর কথা মনে হয়?

আমার চোখে ফের জল এল' বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এলাম।

পাশ করে চাকরি পেয়ে হস্টেল ছেড়ে বাসা করেছি। ভাড়া অবশ্য। শিগগিরই একটা বাড়ি কিনব। একা থাব। চাকরি করব। আর এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেব, প্রবাসে–আমার নিয়তি তো এই।

কয়েকদিন পর বাবাকে নিউ ইয়র্ক দেখাতে নিয়ে গেছি। কিন্তু বাবার তেমন বিস্ময় নেই। কী যেন ভাবছে। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে বাবা হঠাৎ বলল, এসব দেশে একটা মেয়ের পক্ষে একা থাকা বিপজ্জনক।

কত মেয়েই তো আছে। এদেশে একা থাকাই রেওয়াজ।

সেটা কেমনতরো কথা! একা থাকার রেওয়াজ তাদের কাছে, যারা নিরুপায়।

আমিও তো তাই।

তুই কেন নিরুপায়?

এ কথার কি জবাব হয়? চুপ করে রইলাম।

.

(চার) বাবাকে আজ প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। প্রায় এক বছর আমার কাছে রইল বাবা। কী যে ভাল লাগত। আর কিছু নয়, বাড়ি ফিরে একজন আপন মানুষকে তো দেখতে পেতাম! এ দেশের একাকিত্ব তুমি ভাবতেও পারবে না। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাখামাখি করা যায় না, আড্ডা নেই, হুটহাট কারও বাড়ি যাওয়া যায় না। চেনাজানা লোকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বলে আর কত সময় কাটে? সময়ও হাতে কম। উদয়াস্ত হাসপাতাল, রুগি, রিসার্চ।

গতকাল বাবা বলছিল, একটু ভেবে বল, দেশে কাউকে তোর কোনও মেসেজ দেওয়ার আছে?

মাথা নেড়ে বললাম, না বাবা।

মিঠু বোধহয় এখনও তোকে ফেলবে না।

আমি তো তার দয়া চাই না।

তোর যে কেউ নেই।

তুমি তো আছ।

আমি আর ক'দিন? আমার ইচ্ছে মিঠুর সঙ্গে বিয়েটা মেনে নে। সে বরং এখানে চলে আসুক।

থাক বাবা। সে নিশ্চয়ই আমাকে ঘেন্না করে।

রাগ তত থাকতেই পারে। কিন্তু সে বুদ্ধিমান, বিবেচক ছেলে।

থাক বাবা।

মুখে যাই বলি, বুকটা কেমন করছিল, এমন কি হয়? এমন কি হতে পারে? হলে হয়তো ভালও হবে না। কল্পনা এক, বাস্তব আর এক। মিলবে না হয়তো।

উজ্জ্বল অ্যাপ্রোচ করছে। বারবার। জানি, এটা সম্ভব নয়। তবু উজ্জ্বল যে আসছে তা মেনেও নিই। আর কিছু নয়। এই সাংঘাতিক একাকিত্ব থেকে তো খানিকটা মুক্তি। একজন কথা বলার লোক।

মোট বারোটা এয়ারোগ্রাম জমা হয়েছে। ওপরে তোমার নাম আর ঠিকানা। ভিতরে তিন বা চার লাইন লেখা। সবচেয়ে বড়টায় লিখতে পেরেছি তেরো লাইন। পছন্দ হচ্ছে না।

বাবা চলে যাওয়ার পর খুব কাঁদলাম। অনেকক্ষণ ধরে। আমার যে কী হবে।

.

তিনটে জেরক্স কপির দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে ছিল শবর দাশগুপ্ত। মিতালির ডায়েরিতে এই তিনটে পাতাই পাওয়া গেছে। বাদবাকি পৃষ্ঠা সাদা। লেখাগুলোর ওপরে বা নীচে কোনও তারিখ নেই। অনুমান করা যায় প্রথমটা আর শেষটার মধ্যে সময়ের তফাত দুই বা তিন বছরের। এর মধ্যে আরও অনেক পৃষ্ঠা লেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেগুলো কোথায় গেল বোঝা যাচ্ছে না।

কেসটা খুব মাখোমাখো হয়ে উঠছে স্যার। এ তো রীতিমতো লাভ অ্যাফেয়ার!

শবর তার বিচ্ছু টাইপের সহকারী নন্দলালের দিকে চেয়ে বলল, হাতের লেখা চেক করেছ?

হ্যাঁ। ওসব ঠিক আছে। মিতালিরই হাতের লেখা। শেষ টুকরোটায় উজ্জ্বল সেনের রেফারেন্সটা দেখেছেন স্যার?

দেখেছি। পান্টুর কী খবর?

বাড়ি নেই। ধানবাদ না কোথায় কোন ধান্দায় গেছে। আজ বা কাল ফিরবে। ফিরলেই তুলে নেব।

ক্ষণিকাদেবীকে চেক করো।

ও কে।

আর কোনও ডায়েরি খুঁজে পাওনি?

না স্যার। এই একটাই। মোট তিনটে এন্ট্রি। কোনও পাতা ছেঁড়া ছিল না।

কিন্তু বোঝা যাচ্ছে মিতালিদেবী সিস্টেমেটিক ছিলেন না। উনি এক-এক সময়ে এক একটা ডায়েরিতে লিখতেন। বাকি ডায়েরিগুলো হয় উনি আমেরিকা থেকে আনেননি, নয়তো চুরি গেছে।

মিঠু মিত্রকে কি ভোলা হবে স্যার?

এখন নয়। তুমি বাড়িটা আর একবার সার্চ করো। দেখো, যদি সিগনিফিক্যান্ট কিছু পাও।

নন্দলাল চলে গেল। শবর চিন্তিত মুখে চেয়ার টেনে বসল। এইটেই মিতালির শোয়ার ঘর। দক্ষিণ পশ্চিম এবং পুব ভোলা। দেয়ালে হালকা ক্রিম রং। আসবাব সবই খুব উঁচু জাতের। বার্মা সেগুনের ডবল খাট, বড় ওয়ার্ডরোব, হাফ সেক্রেটারিয়েট এবং রিভলভিং চেয়ার, কাশ্মীরি কাজ করা ছোট টেবিল, ওয়াল ক্যাবিনেটে নানা দামি জিনিস সাজানো। হাতির দাঁতের মূর্তি, রুপোর ওপর মিনার কাজ করা রেকাবি, পুতুল, দুটো মজবুত স্টিলের আলমারি। সবই খুলে দেখা হয়েছে।

খাটের কাছ বরাবর মেঝেতে পড়ে ছিল মিতালি। মোট দু'বার তাকে ছুরি মারা হয়েছিল। পিঠের দিক থেকে, হৃৎপিণ্ড বরাবর। মিতালি পড়ে ছিল কাত হয়ে, বাঁ দিকে। চারদিকে অন্তত বারো-তেরোটা সেন্টের শিশি ভাঙা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিল। ঘর সুগন্ধে এত ভরা ছিল যে পুলিশ কুকুর সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। স্নিফার ডগকে বিভ্রান্ত করার জন্যই যে সেন্টের শিশিগুলো ভাঙা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। একজন কেয়ারটেকার, একজন রান্নার লোক এবং একটি কাজের মেয়ে কোনও নতুন কথা বলতে পারেনি। ককটেল ডিনারে ডিনার সার্ভ করেছিল এক নামী ক্যাটারার। তাদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়নি তেমন কোনও সূত্র। মোটামুটি যা জানা গেছে তা হল, রাত এগারোটা নাগাদ মিতালি সামান্য মাতাল অবস্থায় ওপরে উঠে আসে। দোতলায় সে একা থাকত। সে শোয়ার ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর মধ্য রাতে রান্নার লোক হরেন আর মালি ভজুয়া অনেক শিশি বোতল ভাঙার আওয়াজ পায়। মিতালি মাতাল অবস্থায় ওসব করছে ভেবে ওপরে ওঠেনি ভয়ে।

শবর উঠল। খানিকক্ষণ পায়চারি করল। তারপর পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। খুন করে পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই বারান্দাটি প্রশস্ত। পিছনে একটু

বাগান এবং ঝোঁপঝাড় আছে। বারান্দা থেকে অনায়াসে নীচের ঘরের জানালার ওপরকার রেন শেড-এ নামা যায়। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়লেই হল।

না, শবর দাশগুপ্ত খুশি হচ্ছে না। মোটিভ অ্যাঙ্গেলটা পালটে যাচ্ছে। কোথাও একটা নট রয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে সে আবার নতুন করে পূর্বাপর ভাবতে লাগল।

.

নমস্কার মিত্তিরমশাই। আপনাকে আবার জ্বালাতে এলাম।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারার মিঠু দরজাটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র গলায় বলল, আসুন।

আপনি তো বেশ ভেঙে পড়েছেন দেখছি।

ও কিছু নয়। বসুন।

আমাদের আরও কিছু জানার আছে মিত্তিরমশাই। উই ওয়ান্ট ইয়োর হেল্প।

বলুন।

আপনি সেদিন মিতালিদেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনাদের মধ্যে কথাও হয়েছিল। আমি সেই কথাগুলো জানতে চাই।

প্রথম স্টেটমেন্টেই বলেছি।

জানি। তবু আর একবার বলুন।

মিঠু মাথা নেড়ে বলল, ওর বেশি আমার কিছুই বলার নেই।

মিতালিদেবীই কি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

মিঠু ক্লান্ত চোখে চেয়ে বলল, একটা যোগাযোগ হয়েছিল।

কীরকম যোগাযোগ? আপনার তো টেলিফোন নেই। তা হলে?

আমার অফিসে টেলিফোন আছে।

ওঃ হ্যাঁ, ও কথাটা মনে ছিল না। তা হলে মিতালিদেবী আপনাকে অফিসেই টেলিফোন করেছিলেন?

আমি সে কথা বলিনি।

যোগাযোগটা কবে হয়েছিল?

ঠিক মনে নেই।

মারা যাওয়ার দিন কি?

না।

না? তার মানে আপনার মনে আছে। ব্যাপারটা আপনি চেপে যেতে চাইছেন কেন?

কিছু কথা না বলার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু তাতে একটা মার্ডার কেস ক্ষতিগ্রস্ত হলে নয়।

আমি যে কথা বলতে চাইছি না তার সঙ্গে ওর খুনের সম্পর্ক নেই।

আপনি কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে মিতালিদেবীর বাড়িতে যান?

না। হঠাৎ গিয়েছিলাম।

কিন্তু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনাদের মধ্যে হয়েছিল?

সেভাবে নয়।

মিতালিদেবী দেশে এসেছেন তার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে। প্রায় এক মাস আগে। এর মধ্যে তার সঙ্গে আপনার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল কি?

হ্যাঁ।

ইউ আর নট এ গুড লায়ার। প্লিজ, সত্যি কথা বলুন। তাতে আমাদের তদন্তের সুবিধে হবে।

কিছু কথা আমি বলতে বাধ্য নই।

আপনি কি জানেন পৃথিবীতে যেখানে যত বিবাহিতা মহিলা খুন হন তাদের অধিকাংশের খুনের পিছনেই থাকেন তাদের হাজব্যান্ডরা। শতকরা নব্বইটা কেসেই।

জানি।

জানেন কি যে, এই কেসেও আপনি প্রাইম সাসপেক্ট?

অনুমান করছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার।

মিঠু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিছু বলল না।

মিঠুবাবু, আপনার পাসপোর্টটা একটু দেখাতে পারেন?

পাসপোর্ট! আমার পাসপোর্ট নেই।

সে কী! পাসপোর্ট করেননি?

না। আমার দরকার পড়েনি।

এই জেরক্স কপিগুলোর হাতের লেখা চিনতে পারেন?

পারি। মিতালির লেখা।

মিতালির লেখা বলে চিনলেন কী করে?

বলতে পারব না। চিনি।

এ হাতের লেখা কোথায় দেখেছেন? চিঠি বা ডায়েরিতে?

মনে নেই।

তিনি আপনাকে চিঠি লিখতেন?

না।

আপনি ডায়েরির এই তিনটে কপি একটু পড়ে দেখুন।

মিঠু কপিগুলো হাতে নিল। পড়তে লাগল। তার মুখের দিকে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দুটি চোখ নিষ্পলক নিবদ্ধ রইল সারাক্ষণ। মিঠুর মুখে তেমন কোনও ভাবান্তর হল না। পড়া শেষ করে সে একটা শ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বসে রইল।

মিঠুবাবু, আমি ক্রাইমের লোক, হৃদয়ের ব্যাপারটা ভাল বুঝি না। এ ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অবাক ঠেকছে। আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন?

না।

আপনার কি মনে হয় এগুলো ফল এবং ফ্রড? কেউ মিতালির হাতের লেখা নকল করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে?

হতে পারে।

আর যদি তা না হয়, যদি সত্যিই মিতালিদেবীরই লেখা হয় তা হলে বুঝতে হবে তিনি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।

মিঠু জবাব দিল না।

হাবুডুবুই যখন খাচ্ছিলেন তখন তার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হল, দেশে ফিরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাই না?

নাও হতে পারে।

সেটা কীরকম?

অনেকে আছে, মনে মনে অনেক কিছু বানিয়ে নেয়, বাস্তবকে এড়িয়ে চলে।

মিতালি কি সাইকিয়াট্রিক কেস?

আমি জানি না।

আপনি এম সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের নাম কখনও শুনেছেন?

খুব সূক্ষ্মভাবে একটু শক্ত হয়ে গেল কিনা মিঠু, তা ভাল বুঝতে পারল না শবর। একবার চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মাথা নিচু করল। বলল, কেন?

আহা, শুনেছেন কি না বলুন না।

শুনতেও পারি।

শুনেছেন মশাই, শুনেছেন। কলকাতার পুরনো অ্যাটর্নি। আপনার শ্বশুর এঁদের মক্কেল ছিলেন।

ও।

আপনি কি জানেন এঁদের কাছে মিতালিদেবীর একটা ডিড আছে?

থাকতে পারে।

অত নির্বিকার থাকবেন না। ডিডটা আপনার নামে করা। মিতালিদেবী তার সব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাকে দিয়ে গেছেন। আপনি এখন এক বিশাল সম্পত্তির মালিক। তাই না?

কাস্টোডিয়ান আর মালিক তো এক কথা নয়।

ডিডটা কি আপনি দেখেছেন? মিতালিদেবীর কলকাতার যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশুনো, প্রয়োজনে বিক্রি করা বা যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি একটা সাধারণ জিনিস।

খুব সাধারণ কি? তা ছাড়া মিতালিদেবীর সিঙ্গল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে সম্প্রতি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। আপনার সঙ্গে। এটাও স্বাভাবিক?

মিঠু একটা শ্বাস ফেলে বলল, কলকাতায় ওদের বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনো করার কেউ নেই। ফলে–

ফলে উনি ওঁর ডিভোর্স করা স্বামীকে পরম বিশ্বাসে সব কিছুর ভার দিয়ে ফেললেন?

মিঠু চুপ।

মোটিভটা উনিই তৈরি করেছিলেন। মিতালিদেবীর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল আপনাকে এতটা বিশ্বাস করা। সবকিছু যেই হাতের মুঠোয় এল অমনি নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য আপনি তাকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিলেন!

কাজটা আমি করিনি।

নিজের হাতে করেননি বলছেন? তা হলে কি ভাড়াটে খুনি অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন?

মিতালিকে খুন করার কোনও কারণ আমার ছিল না।

এগুলো কি কারণ নয়?

আমার কাছে নয়।

তা হলে আপনার সুবিধের জন্য আমি ঘটনাগুলো একটু সাজিয়ে দিই? শ্রীমতী মিতালি ঘোষ একদিন আমেরিকায় একটি ঘটনা থেকে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি আপনাকে আকণ্ঠ ভালবাসেন। সেই হদ্দমুদ্দ ভালবাসায় এই রোমান্টিক ও একটু ইমপ্র্যাকটিক্যাল মহিলা ডায়েরিতে পাতার পর পাতা নিজের হৃদয়াবেগে ভরে ফেলতে লাগলেন। অথচ ইগো এবং লোকলজ্জায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারলেন না। দেশে ফিরে এসে বরুণ ঘোষ কিছুদিন পর মারা গেলেন। মিতালিদেবী সেই মৃত্যু উপলক্ষে দেশে ফিরলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ একা! এই অবস্থায় তিনি আকুল হয়ে লজ্জা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে প্রথমেই ছুটে এলেন আপনার কাছে। হয়তো আত্মসমর্পণও করলেন। এই গ্যাপগুলো যদি আপনি ভরাট করতে পারতেন তা হলে আমাদের পক্ষে সুবিধে হত। যাকগে, যা বলছিলাম। উনি তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি তো খাচ্ছিলেন না। আপনার বুকে দীর্ঘকালের একটি অপমান বিষধর সাপের মতো অপেক্ষা করছিল। আপনার জন্মমাস নভেম্বর, আপনি একজন স্কোর্পিও। স্কোর্পিওর জাতকদের প্রতিশোধস্পৃহা হয় সাংঘাতিক। তার ওপর আপনি লোভী, সম্পত্তির লোভেই না আপনি মিতালি ঘোষের অতীতের কলঙ্কের কথা এবং

বিয়েতে তার অনিচ্ছা জেনেও তাকে বিয়ে করেন। হয়তো বিয়ের পর তার সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু থ্যাঙ্ক গড, মিতালিদেবী সময় থাকতেই আপনাকে ডিভোর্স করে আমেরিকায় চলে যান। আপনার কপালটা কিন্তু দারুণ ভাল। মিতালিদেবী সম্মোহিতের মতো ফিরে এসে আপনার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলেন। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী হতে পারে বলুন! তার ওপর আপনি একজন গুন্ডা প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুর ও আবেগহীন। এ কুল কাস্টমার। আপনি মিতালির তালে তালে একটু নাচলেন। তার সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান হলেন, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের কয়েক লাখ টাকা আপনার নাগালের মধ্যে এসে গেল। এরপর মিতালিদেবীর মতো একজন আবেগসর্বস্ব, ছিটিয়াল মহিলাকে জিইয়ে রাখার কোনও কারণ আপনার ছিল না। তাই না? নিজেই হোক বা ভাড়াটে লোক দিয়েই তোক আপনি তাকে সরিয়ে দিলেন। বাই দি বাই, খুনের দিন রাতে একটা থেকে দুটোর মুধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন বলুন তো!

০৪. একজন লোক সকালবেলায়

একজন লোক সকালবেলায় একরকম, দুপুরে অন্যরকম, বিকেলে একেবারে আরও অন্যরকম। ধরা যাক লোকটার নাম রমেন বা শ্যামলী। সকালের রমেন বা শ্যামলী বেশ নরম সরম, উদারচেতা, হাস্যমুখ। দুপুরের রমেন বা শ্যামলী নানা উদ্বেগ ও চাপে তিরিক্ষি, রগচটা, মারমুখী এবং কঞ্জুষ। বিকেলের রমেন বা শ্যামলী ক্লান্ত, উদ্দেশ্যহীন, হতাশ, পর্যদস্ত। এই যে একজনেরই নানা প্রকাশ বা স্ফুরণ এটা ধরতে পারাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচক্ষণতা। রমেন বা শ্যামলীর মধ্যেও তফাত আছে। রমেন হয়তো সকালে তিরিক্ষি বিকেলে নরম, শ্যামলী তার উলটো। একজন মানুষ নানা অবস্থা, নানা পরিস্থিতি, নানা চাপ, নানা উদ্বেগ ও ব্যস্ততায় অন্য অন্য সব মানুষ হয়ে যায়। সকালের রমেনকে দুপুরে দেখলে রমেন বলে মনেই হবে না। দুপুরের শ্যামলীকে যদি মনে হয় বনলতা সেন, রাতে তাকেই মনে হতে পারে বান্ধবগড় জঙ্গলের ভালুক বলে। জীবন তো এরকমই। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন, তার জীবনটা হল নানা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গাঁথা একখানা মালা। হোয়াট অ্যান এক্সপ্রেশন! লা জবাব।

এই যে সমীরণের মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সুগভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান, আজ সেই জ্ঞানটাকেই হাতিয়ার করে এগোতে হবে। শ্রীরাধিকার অভিসারে যাওয়ার মতোই। পথ দুর্গম, ক্ষুরস্য ধারা, ফণী ফোঁস ফোঁস করছে, পিছলে পড়ে আলুর দম হওয়ার চান্স আছে। তবু রাধা যেমন রোজই কুঞ্জে পৌঁছে যেত, সেও পৌঁছে যাবে।

রিস্কটা নেওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু গতকাল জুলেখা বলেছে আজ রাত থেকে থাকতে পারবে না। তার হাজব্যান্ড বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসছে। এই নতুন খবরে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে সমীরণ বলল, তুমি তো বিয়েই করোনি!

মৃদু হেসে জুলেখা বলল, ওরকম বলতে হয়।

কোনটা সত্যি বলো তো? আগে যেটা বলেছিলে, না এখন যেটা বলছ!

যে-কোনও একটা। বাট আই অ্যাম লিভিং।

এ খবরে মাথায় বজ্রাঘাত হল তার। সে পাপী। আর কে না জানে, পাপীদের জন্যই পৃথিবীতে যত ভয়-ভীতির আয়োজন। নেশা করলে সে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়। একা ফ্ল্যাটে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব। ক্ষণিকাকে ফিরিয়ে না এনে আর উপায় নেই।

তবে হিউম্যান নেচার সম্পর্কে তার জ্ঞান গভীর বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস। সকালের দিকে ক্ষণিকার মেজাজ ভাল থাকে। এ সময়টায় সে হাসে, ঠাট্টা ইয়ারকি বুঝতে পারে, বেশ দয়ালু হয়ে ওঠে তার চোখের দৃষ্টি। ফুল অফ হিউম্যান কাইন্ডনেস। তার হৃদয়ের বালতি তখন উপচে পড়ে দয়া-দুগ্ধে।

তাই আজ সকালে অর্থাৎ বেলা সাড়ে আটটায়–সে অত্যন্ত মলিন মুখে এসে বসে আছে ক্ষণিকার বাপের বাড়ির বাইরের ঘরে। সে দাড়ি কামায়নি, পরিষ্কার জামাকাপড় পরেনি এবং মুখে হাসি নেই। ডোরবেল বাজানোর পর ঝি এসে দরজা খুলে বসিয়ে রেখে গেছে। ফঁকা ঘর। সোফাসেট, বুক কেস, কাশ্মীরি কাঠের পার্টিশন দিয়ে বেশ সাজানো ঘর। একটা বছর চারেকের বাচ্চা মেয়ে ঘরের কোণে বসে ডল নিয়ে খেলছে। খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ করে হঠাৎ বলল, তুমি কে গো?

আমি! আমি একজন পাপী।

পাপী কী?

এ ম্যান ফুল অফ ভাইসেস। এ সিনফুল ম্যান।

তুমি আমার মায়ের বয়ফ্রেন্ড?

ওঃ, তা হলে এই মেয়েটিই ক্ষণিকার মেয়ে। ক্ষণিকা খুব তার মেয়ের গল্প করে। বাপের বাড়িতে তার নিঃসঙ্গ দিদির জিম্মায় থাকে। তাতে ক্ষণিকা মুক্ত থাকতে পারে। উড়ে উড়ে বেড়াতে পারে।

সে বলল, আমি একজন পাপী খুকি।

ঝি চা নিয়ে এল। ক্ষণিকা এল না। তবে চা আসাটা ভাল লক্ষণ। বরফ গলতে চাইছে। ইগোর চৌকাঠটা ডিঙোতে পারছে না। লজ্জার লতা যেন জড়িয়ে ধরছে অভিসারে গমনোদ্যোগী শ্রীরাধিকার দুখানি পা। একটু গলা খাঁকারি দিল সমীরণ।

বাচ্চা মেয়েটা হাম্পটি ডাম্পটি গানটা গাইছে। আজকাল কত বাচ্চাই গায়। সমীরণ চায়ে চুমুক দিল। এই সময়টায় ক্ষণিকার হৃদয়-বালতি ভরে আছে ফেনশীর্ষ দয়ার দুধে। এ সময়ে সে ভিখিরিকেও ফেরায় না। বাচ্চা মেয়েটার গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমীরণ একটু গুনগুন করল, ফেরাবে কি শূন্য হাতে?

ঘুমঘুম চোখে সামান্য একটু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শ্লথ পায়ে ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল ক্ষণিকা। চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি। ঢিলা একটা ড্রাগনের ছবিওলা কিমোনো পরনে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। চোখে অপার বিস্ময়।

এর সবটাই যে অভিনয় তা জানে সমীরণ। ওই চাহনি, ওই শ্লথ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমা, ওই উপেক্ষার ভাব ওর আড়ালেই রয়েছে সেই অমোঘ বালতিটা। টলটল করছে ভরভরন্ত দুধে।

উদ্বেল হতে নেই। চায়ের কাপটা ধীরে নামিয়ে রেখে মাথা নত করে অপরাধীর মতো বসে রইল সে। এও অভিনয়। কমল হাসান বা নাসিরুদ্দিন শা-র সঙ্গে সে এখন পাঞ্জা কষতে পারে।

তুমি?

প্রশ্নটার জবাব দিল না সমীরণ। দিতে নেই। খুব ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। মাথা

নিচু।

বাচ্চা মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল, ও লোকটা পাপী জানো মা?

ক্ষণিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি। ওরকম বলতে নেই। ছিঃ।

বাঃ রে, ও-ই তো বলল।

বেশিক্ষণ ঘাড় নিচু করে থাকার ফলে সমীরণের ঘাড় টনটন করছিল। তবু থাকতে হচ্ছে।

ক্ষণিকা মুখোমুখি সোফায় এসে আলতোভাবে বসল। বলল, বোসো।

গলার স্বরটা নরম। সমীরণ খুব সাবধানে ধীরে ধীরে বসল।

জুলেখা চলে গেল বুঝি? রাখতে পারলে না?

সমীরণ একটু জিভ কেটে ফেলল। ভুলে। সামান্য খসখসে গলায় বলল, জানতে?

ওমা! জানব না কেন? তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রায়ই তো গিয়ে সব দেখে আসতাম। নবর মার সঙ্গে কথা হত।

সমীরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পাপ কখনও গোপন থাকে না।

তা জানি না। তবে যাকে তাকে ডেকে আনছ, আজকাল কী ভীষণ এইডস হচ্ছে তা জানো?

পাপের বেতন মৃত্যু। জানি। কেন আমাকে একা ফেলে চলে আসো বলল তো। তুমি কি জানো না আমি একা থাকতে পারি না? বিশেষ করে তোমাকে ছাড়া? সেইজন্যই জুলেখাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। হয় তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, নইলে বাবা পার্মানেন্টলি বাঙ্গালোর পাঠাতে চাইছে, সেখানেই চলে যাব।

জুলেখাকে তুমি মোটেই তাড়াওনি।

আলবত তাড়িয়েছি। চলো, দেখবে।

দেখার দরকার নেই। জুলেখাকে তাড়িয়েছি আমি।

তুমি?

হ্যাঁ। কাল আমি টেলিফোনে ওকে বিকেলবেলায় ধরেছিলাম।

ওঃ, তুমি মহীয়সী। তুমি কি জানো তোমার মতো—

থাক।

ক্ষণিকা, ক্ষমা—

আর হয় না সমীরণ। আর কিছুতেই—

আর কক্ষনও—

তোমার কথার কোনও দাম—

প্রমিজ। এই একবারটা–

না, প্লিজ। ফিরে যাও—

দয়া করো–

ওঃ সমীরণ—

তোমাকে ছাড়া—

মা, ও লোকটা কি পাপী?

ছিঃ তোটন—

আমি পাপী। পঞ্চ ম-কার—

উঃ ওরকম কোরো না তো—

এবারকার মতো—

কী জ্বালা বাবা—

লক্ষ্মী সোনা—

বাঙ্গালোরেই যাও না–

না, না, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও—

মিথ্যুক–মিথ্যুক–ভূতের ভয়ে—

পায়ে পড়ি—

আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে–

চল্লিশ মিনিট বাদে গাড়িতে পাশাপাশি বসে তারা ফিরে আসছিল। ক্ষণিকার গোল মুখশ্রীতে এখনও সকালের সেই অপারগ ক্ষমাশীলতা। ঘুমঘুম চোখ। অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মিঠু মিত্রের লাভারটি কে বলো তো?

মিঠুর লাভার? যাঃ। কেউ নেই।

আছে।

কী করে বুঝলে?

জানি। হি হ্যাজ এ লাভার। তোমার বান্ধবী বলেছে।

কে বান্ধবী?

দ্যাট পুয়োর রেচে গার্ল। মিতালি।

কী বলেছে?

বেশ মাতাল মাতাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আমার কাঁধে মাথা রেখে কাদছিল একটা সময়ে। তখন বলল, ডু ইউ নো হি হ্যাজ এ লাভার? শি লাভস হিম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাল সমীরণ। তারপর সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, মেয়েটার নাম কী?

সেটা বলেনি। সেজন্যই তো জানতে চাইছি।

সমীরণ মাথা নেড়ে বলল, আমিও জানি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি, মাতালদের কথায় কখনও বিশ্বাস কোরো না।

করি না। কিন্তু মিতালিকে সেদিন লক্ষ করেছ? শি ওয়াজ এক্সট্রিমলি ডিস্টার্বড। আর সেইজন্যই ওরকম আনাড়ির মতো মদ খাচ্ছিল। ডিস্টার্বড থাকার একটা কারণ তো আছে।

ব্যাপারটা লজিক্যাল নয়, কিন্তু শি ওয়াজ ইন লাভ উইথ মিঠু।

লজিক্যাল নয় কেন?

ডিভোর্সের এতদিন পর এবং এত দূরের দেশে থেকে হঠাৎ প্রেমে পড়ে যাওয়াটা কি স্বাভাবিক?

খুব স্বাভাবিক। মিতালির বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। তখন ওর ম্যাচিয়োরিটি ছিল না। পরে যখন ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটা শান্তভাবে ভেবেছে তখন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, কাজটা ঠিক হয়নি। মিঠু মিত্র তো চমৎকার মানুষ। টল, হ্যান্ডসাম, কারেজিয়াস অ্যান্ড কাম। কোয়াইট লাভেবল।

সমীরণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, এনিওয়ে সেই রিডিসকভারি অফ লাভ থেকেই হয়তো ও ওরকম রেস্টলেস হয়ে পড়েছিল।

মোটেই নয়। শি ওয়াজ ডিস্টার্বড বিকজ শি কেম টু নো দ্যাট দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার উওম্যান।

তুমি শিয়োর?

শিয়োর।

কে হতে পারে?

লেট আস থিঙ্ক।

ইয়েস লেট আস থিঙ্ক।

ক্ষণিকা চোখ বুজে ধ্যানস্থ হল। সমীরণ ধ্যানস্থ হতে সাহস করল না, কারণ সে গাড়ি চালাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ক্ষণিকা চোখ খুলে বলল, একটা ব্যাপার মনে পড়েছে।

কী সেটা?

একটা মেয়ে টেবিলে বিরিয়ানি সার্ভ করছিল। বছর কুড়ি-একুশ বয়স। পরনে একটা সবুজ রঙের গাদোয়াল ছিল। মুখখানা ভারী মিষ্টি। একটু ড্রিমি মুখ। চোখ দুখানা খুব নরম। মনে আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে সমীরণ বলে, তোমার মনে থাকা উচিত, ডিনারের সময় আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

ডিনারের অনেক আগেই তাকে দেখতে পেয়েছ নিশ্চয়ই। মনে পড়ছে?

আমি মেয়েদের দিকে তাকাই না।

শুধু তাকাও না, চোখ দিয়ে গিলে খাও।

আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে মেডিটেট করতে দাও। তার আগে বলো এই মেয়েটি সম্পর্কে কী বলেছিল মিতালি?

কিছু বলেনি। মেয়েটা যখন বিরিয়ানির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকছিল তখনই মিতালি একটু শিউরে উঠে যেন হিসিং সাউন্ড করে বলল, শি, শি ইজ ইন লাভ উইথ হিম!

ওই মেয়েটাকেই মিন করছিল?

অফকোর্স! মেয়েটাকে দেখেই যেন রিঅ্যাক্ট করল। আমি জানতে চাই মেয়েটা কে?

সবুজ শাড়ি আর অবুঝ মুখ তো!

অবুঝ মুখ মোটেই বলিনি।

এনিওয়ে, মনে পড়ছে না। শোনো, ছেলেরা কখনও মেয়েদের পোশাক মনে রাখতে পারে না।

তা হলে কী মনে রাখে?

বেশি মনে রাখে চোখ। দু’নম্বর, মুখশ্রী।

মুখশ্রীর কথা তো বললাম।

ডেসক্রিপশন ইনকমপ্লিট। আমি ভিসুয়ালাইজ করতে পারছি না।

চুলগুলো স্টেপকাট করা।

আর কিছু?

দু’দিকে দুটো মিষ্টি গজাত আছে। হাসলে বেশ দেখায়।

যাঃ, ও তো জয়িতা!

সে কে?

জয়িতা হল মিতালির খুড়তুতো বোন।

যাঃ বলছ কেন?

ও সেরকম মেয়েই নয়।

কীরকম মেয়ে?

ভীষণ ভাল টাইপের। ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। খুব লাজুক।

ক্ষণিকা একটু হেসে বলল, লাজুকরা বুঝি প্রেমে পড়ে না?

তা নয়। কিন্তু মিঠুর সঙ্গে ওর কোনও কানেকশনই নেই যে।

খোঁজ নাও।

নিয়ে লাভ?

জাস্ট কৌতূহল।

সমীরণ মিটিমিটি হাসছিল। বলল, জয়িতা যদি কারও প্রেমে পড়ে তা হলে সে বেচারি ইহজীবনেও জানতে পারবে না যে একটা মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল।

তা হলে মিতালি জানল কী করে?

ইউ ক্যান্ট বি শিয়োর।

আই অ্যাম শিয়োর।

ওকে ওকে। মেনে নিচ্ছি। তবু মনে রেখো, মিতালি ও কথা বলার সময় মাতাল হয়ে গিয়েছিল।

জানি। আমি মিতালিকে সামলাচ্ছিলাম। ন্যাপকিন দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঠান্ডা জল খাইয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়ে আসি। সোফায় বসেই হড়হড় করে বমি করে দিল। ভাগ্যিস উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, নইলে ডিনারটাই নষ্ট হত।

সমীরণ ভ্রূ কুঁচকে বলল, সামথিং ইজ টিকিং।

হোয়াইট টিকিং?

ইউ মে বি রাইট।

আই অ্যাম রাইট।

ক্ষণিকা, শবর দাশগুপ্তের কানে কথাটা গেলে হি উইল মেক দি গার্ল আপ সাইড ডাউন।

কেন?

লোকটা ভীষণ পাজি। তোমাকেও জ্বালাবে।

মেয়েটাকে জ্বালালে তোমার ক্ষতি কী? হ্যাভ ইউ গট এ সফট কর্নার ফর হার?

আরে না। শি ইজ জাস্ট এ কিড।

মোটেই নয়। কুড়ি-একুশ যথেষ্ট বয়স। কীরকম বোন বললে?

আপন খুড়তুতো বোন। ওর বাবা অরুণ ঘোষ আমাদের প্রফেসর ছিলেন। মাই গড!

কী হল?

একটা কথা মনে পড়ল। জয়িতা হল ওনলি চাইল্ড। দুই ভাইয়ের ওই একটিই সারভাইভিং সন্তান। মিতালির নেক্সট অফ কিনা জয়িতা উইল ইনহেরিট

এভরিথিং অফ মিতালি।

*

তখন কি তার তেরো বছর বয়স? নাকি চৌদ্দ? বোধহয় মাঝামাঝি। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের একটা বিশেষ ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তার বড় ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল হঠাৎ। বিশেষ একটা কাউন্টারে ছোট্ট মুখখানা বাড়িয়ে সে করুণ গলায় বলেছিল, আমি কি একটা

অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি?

মিঠু কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে চিনতে পারল। বাসরঘরে মেয়েটি অনেক রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল। মিঠুর কানে লেগে আছে একটা কলি, সখি ভালবাসা কারে কয়, সে কি সকলি যাতনাময়…

একটু হেসে মিঠু বলেছিল, কেন পারবে না?

মেয়েটি হাস্যহীন মুখে করুণ দৃষ্টিতে মিঠুর দিকে চেয়ে ছিল। ওই বয়সেও সে বুঝত, তার দিদি মিতালি এই লোকটাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে। নাকচ করেছে। অথচ মিঠুদাকে তার কী ভালই লেগেছিল বিয়ের রাতে। কেমন ভদ্র, কেমন গম্ভীর, কী পারসোনালিটি, আর কী দারুণ ম্যানলি চেহারা! মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল সে। ওই বয়সে ওই তার প্রথম উথালপাথাল বুক। মিঠু যদি জামাইবাবু হয়ে থাকত তবে ঠিক সামলে নিত নিজেকে সে। কিন্তু বিয়ের পরই মিতালিদি এমন করতে লাগল। তারপর ছেড়েই দিল। বড্ড কষ্ট হয়েছিল তার। আবার সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দও।

অ্যাকাউন্ট খোলার পর একদিন, মাত্র একদিনই একটা ভুল করে ফেলেছিল, যার জন্য আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না সে। একদিন টাকা তুলবার অছিলায় চেক-এর সঙ্গে জেমস ক্লিপে আঁটা একটা চিরকুট দিয়েছিল মিঠুকে। তাতে ইংরেজিতে লেখা ছিল, হাউ ডিপলি আই লাভ ইউ।

মিঠু চেকটা নিল, চিরকুটটা দেখল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। ভীষণ গম্ভীর। আর একটাও কথা বলেনি সেদিন।

ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে সেদিন চলে এসেছিল জয়িতা। পনেরো দিন বাদে আবার গিয়েছিল। না, আর কখনও ভুল করেনি সে। শুধু কাউন্টারের এক পাশ থেকে অন্য পাশে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড এত জোরে শব্দ করেছিল সেদিন, মিঠু কি শুনতে পায়নি?

পেয়েছিল নিশ্চয়ই। তবু শুধু ভদ্র গলায় একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন আছ?

তারপর তিন বছর ধরে যতবার ব্যাঙ্কে গেছে ততবারই ওই ভদ্র গলায় একটি প্রশ্ন, কেমন আছ? তার বেশি একটি কথাও নয়। কখনও নয়।

জয়িতা মৃদু স্বরে বলত, ভাল। আর তার বুকের ভিতরে উত্তাল হয়ে উঠত হৃৎপিণ্ড।

তিন বছর বাদে অন্য ব্রাঞ্চে প্রমোশন পেয়ে চলে গেল মিঠু। একবার বলেও গেল না। জয়িতা অ্যাকউন্ট তুলে নিল না। অপেক্ষা করল।

রসা রোডের দিকে তার যাওয়ার কথাই নয়। তবু স্কুলের পর তার মাঝে মাঝে লেকের দিকে যাওয়ার খুব দরকার পড়তে লাগল, প্রথম প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে। তারপর এক-একদিন একা। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক তখন তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ব্যাঙ্কের দরজা থেকে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত। দেখা হত না। একদিন সাহস করে ঢুকেছিল। অনেককে দেখল, যাদের দেখার দরকার ছিল না।

তারপর একদিন দেখল। মিঠু বেরিয়ে এল। কোনওদিকে না তাকিয়ে তার বিশাল মোটরবাইকে উঠে ভোঁ করে কোথায় চলে গেল।

যথেষ্ট। ওটুকুও তখন কম নয়। তিন দিন ধরে সেই দেখার রেশ রইল।

একদিন মাকে বলেছিল, আচ্ছা, মিঠুদা তো ইচ্ছে করলেই এখন বিয়ে করতে পারে, না মা?

পারেই তো! অত ভাল ছেলে!

তবে করছে না কেন?

করবে করবে। হয়তো কথা চলছে। কে খবর রাখে বাবা?

কেউ খবর রাখেও না। সে রাখত। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি মাত্র দু’স্টপ দূর। সে হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হত। এ কথা সে কথা। তারপর মিঠুদার কথা।

জ্যাঠামশাই নিজের মেয়ের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, আমি কিছু ভুল করিনি। মিতালি একদিন বুঝবে।

জ্যাঠামশাই, মিঠুদা কি বিয়ে করবে?

তা কি জানি মা? মাঝে মাঝে আসে, খোঁজখবর নিয়ে যায়। লজ্জায় সংকোচে তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারি না। বিয়ে তো করাই উচিত।

বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র এক-দেড় বছর আগে একদিন জ্যাঠামশাই বললেন, সামনের শনিবার মিঠুকে খেতে বলেছি। ভারী সংকোচ। কিছুতেই রাজি হয় না। আমি বেশ লম্বা ছুটিতে আমেরিকা চলে যাচ্ছি বলে রাজি করিয়েছি। তুইও একটু আসিস তো মা। হরেনই রাঁধবে, কিন্তু সে পুরনো মানুষ, এখনকার রান্না জানে না। তুই একটু ওই চাইনিজটাইনিজ কিছু একটা রান্না করিস তো। ছেলেটা নিজে বেঁধে খায়, সেদ্ধপোড়া খেয়েই থাকে হয়তো।

তখন তার উনিশ বছর বয়স। তখন তার কী উদ্বেল হৃদয়! মারাত্মক শনিবারটা যেন ডবল ডেকারের মতো ধেয়ে আসছিল।

সেদিন তার মা-বাবারও ছিল নিমন্ত্রণ। রেসিপির বই দেখে খুব যত্ন করে সে বেঁধেছিল চিলি চিকেন আর প্রন ককটেল। জ্যাঠামশাইয়ের ছোট খাওয়ার টেবিলে চারজন খেতে বসেছে। জ্যাঠামশাই, মা, বাবা আর মিঠু। মুখ তুলে মিঠুই হঠাৎ বলল, এ কী, তুমি বসবে না?

সবেগে মাথা নেড়ে সে বলেছিল, না। আমি সার্ভ করব।

তাই কি হয়? বসে যাও, সবাই একসঙ্গে খাই।

শুনে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও বসে যা। হরেন সার্ভ করবে।

কেমন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হল, তাকে বসতে হল মিঠুর বাঁ পাশে, কাছ ঘেঁষে। চোখমুখ লজ্জায় ঝা ঝা করছিল তার। মুখ তুলতে পারে না, খাবে কী? আর তখন মিঠুর গা থেকে একটা মিষ্টি পুরুষালি উত্তাপ আসছিল। আর মাদক একটা গন্ধও। কথাবার্তা হচ্ছিল, সে একটুও বুঝতে পারছিল না কারও কথা।

মিঠু হঠাৎ বলল, এসব তুমি বেঁধেছ? বাঃ, খুব ভাল রাঁধতে পারো তো তুমি! আর কী কী পায়রা বলল তো। গান গাইতে পারো, জানি। আর কিছু?

কিছু না।

মা বলল, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়ছে।

সে আমি জানি।

জানে! কী করে জানে মিঠু?

ডিনারের পর অনেক রাত অবধি গল্প হয়েছিল। না, জয়িতা কথাই বলেনি। শুধু কাছাকাছি একটা দূরত্বে বসে অনুভব করেছে মিঠুকে। সে এক অতলান্ত অনুভূতি। কী যে হচ্ছিল তার বুকের ভিতরে!

মিঠু কি তাকাচ্ছিল তার দিকে? সে দেখেনি। কিন্তু সে জানে, চোর-চোখে মিঠু বহুবার দেখেছিল তাকে। বহুবার।

মা বাবার সঙ্গে সে যখন বেরিয়ে আসছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে মিঠুও। বিদায় নেওয়ার একটু আগে হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে তার সঙ্গ ধরে বলল, তোমার চিরকুটটার জবাব দেওয়া হয়নি। একদিন দেব।

লজ্জায় মরে যাচ্ছিল সে। নার্ভাস। মিঠুর মোটরবাইকের শব্দ যতক্ষণ শোনা গিয়েছিল ততক্ষণ তার শরীরে ঝংকার।

চিরকুটের জবাব দেবে বলেছিল মিঠু। জবাবটা এল মাসখানেক পর। এবং অভিনব উপায়ে। ডাকে তার কাছে এল সাদার্ন ক্লাবে ভরতি হওয়ার একটা ফর্ম। সেই ফর্মের এক কোণে ছোট্ট করে লেখা "প্লিজ। মিঠু।" হাসবে না কাদবে ভেবেই পেল না জয়িতা। এটা কি রসিকতা? নাকি অন্য কিছু?

অনেক ভেবে সে বুঝতে পারল, মিঠু হয়তো তার সঙ্গ চায়। কিন্তু সঙ্গ পাওয়ার অন্য কোনও উপায় হয়তো ভেবে পায়নি। অল্পবয়সিদের মতো মাঠে ময়দানে বা হোটেলে রেস্টুরেন্টে বসে প্রেম করা হয়তো মিঠুর পছন্দ নয়। হয়তো সাদার্ন ক্লাবে ব্যায়াম বা মার্শাল আর্টের ক্লাসে তারা অনেক কাছাকাছি হতে পারবে।

অনেক লজ্জা সংকোচ, অনেক দ্বিধা জয় করতে হয়েছিল জয়িতাকে। একদিন কুণ্ঠিত পায়ে হাজিরও হল সাদার্ন ক্লাবে। তাকে দেখে মিঠুর মুখে ভারী চমৎকার একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিটাই তার প্রথম উপহার।

জয়িতা জীবনে কখনও কোনও খেলাধুলো বা ব্যায়াম করেনি। প্রথম প্রথম তার শরীরে কী ব্যথাই না হয়েছিল। তবু করত। মিঠু বলত, ক'দিন পরেই দেখবে শরীর কেমন হালকা আর ফিট লাগবে।

কখনও তাদের মধ্যে স্পষ্ট করে কোনও ভালবাসার কথা হয়নি। সব সময়ে তার দরকারও হয় না। ভালবাসার মধ্যে একটা নীরবতাও কি নেই? সে নিজে প্রগলভ নয়। মিঠুও কম কথার মানুষ। তারা খুব কাছাকছি হত, যখন ক্যারাটে ক্লাসের পর মিঠু তাকে মোটরবাইকের পিছনে চড়িয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিত। কখনও পাড়ায় ঢুকত না বা বাড়িতেও আসত না। বলত, মেলামেশাটা একটু গোপন থাকাই ভাল, নইলে তোমাকে লোকে বদনাম দিতে চেষ্টা করবে। বাড়ির লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু গোপন করলেও খুব গোপন থাকেনি তাদের সম্পর্ক। মাস কয়েক বাদে একদিন মা তাকে ধরল, হারে, কী ব্যাপার বল তো?

কী ব্যাপার মা?

তোর কি মিঠুকে পছন্দ?

কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। জবাব এলই না মুখে।

মা বলল, মিতালির সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়েছিল, সেইটেই একটা খারাপ ব্যাপার, নইলে মিঠু তো চমৎকার ছেলে। ভাল করে ভেবে দেখ।

ভেবে দেখবে? ভেবে দেখার কী আছে! তার তো মিঠুময় জগৎ। মিঠু ছাড়া সে আর কিছু ভাবতেই পারে না।

মা তার নীরবতারও অর্থ ধরতে পারল। বলল, বেশ, তোর বাবাকে বলি। মনে হয়, অমত করবেন না। কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে।

এক অপার্থিব আলোয় যেন ভরে গেল জয়িতার জগৎ। এত আনন্দও যে জীবনে আছে তার জানাই ছিল না।

সেদিন সন্ধেবেলা সে খুব লাজুক গলায় মিঠুকে বলল, মা জানতে পেরেছে।

মিঠু সামান্য অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলেন?

তা তো জানি না। তবে অমত করেনি।

মিঠু একটু চুপ করে থেকে খুব ধীর কণ্ঠে বলল, মিতালি আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি তা ফিরিয়ে দিয়েছ। আমার জন্য আর কেউ এতটা করেনি, তোমার মতো।

জয়িতা খুব ফিসফিস করে বলেছিল, এখন কী হবে?

মিঠু একটু হেসে বলল, কী হবে জানো না বুঝি?

মাথা নেড়ে জয়িতা বলল, না তো?

এই প্রথম তাদের মধ্যে ভালবাসার সংলাপ। এইটুকুই মাত্র কথা, কিন্তু উত্তাপ আর আবেগে যেন মাখামাখি। মিঠুর মোটরবাইক সেদিন যেন মাটিতে নয়, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

কথাটা বাবার কানেও তুলল মা। তার বাবা মাত্র এক মিনিট চিন্তা করে বলল, হোয়াই নট? বয়সের তফাতটা একটু বেশি, তা হোক। তাতে ভালই হবে। মিঠুর প্রতি যে অন্যায়টা হয়েছে এতে তারও খানিকটা শোধবোধ হবে।

কোথাও কোনও আপত্তি উঠল না। মসৃণ একটা পরিণতির দিকেই যাচ্ছিল তারা।

কিন্তু আপত্তি উঠল অপ্রত্যাশিত একটা জায়গা থেকে। জ্যাঠামশাই আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর বাবা একদিন গিয়ে তাঁকে বললেন ব্যাপারটা। জ্যাঠামশাই যেন ভীষণ চমকে উঠে বললেন, না না, তা হয় না। তা কিছুতেই হয় না।

জয়িতার বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন হয় না? কোথাও তো বাধক দেখছি না।

জ্যাঠামশাই বারবার বললেন, বাধা আছে। সে তুই বুঝবি না।

জ্যাঠামশাই আর ব্যাখ্যা করেননি। ব্যাখ্যা করার সময়ও আর পাননি। পরদিনই গভীর রাতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। সেরিব্রাল।

খুব কেঁদেছিল জয়িতা। একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। মিঠু তার ভূতপূর্ব শ্বশুরের শ্মশানবন্ধু হয়েছিল।

দু'দিন বাদে এয়ারপোর্টে মা-বাবার সঙ্গে জয়িতা গিয়েছিল মিতালিকে নিয়ে আসতে। কী উদভ্রান্ত, শোকাহত চেহারা মিতালির! এক ঝটকায় যেন বয়স বেড়ে গেছে অনেক। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল মিতালিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। মিতালি বলল, না কাকু, তার দরকার নেই। ও বাড়িতে বাবার কত স্মৃতি আছে বলো তো! বরং জয়িতা কয়েকদিন আমার সঙ্গে থাক। নইলে আমার একা লাগবে।

প্রথম দু'-চারটে দিন শোকের ভাবটা কাটিয়ে ওঠার পরই তাদের দুই বোনের মধ্যে কথার ফোয়ারা খুলে গেল। দিনের বেলায় জয়িতার কলেজ, মিতালিরও উকিল অ্যাটর্নির কাছে বা ব্যাঙ্কে যাওয়া। গল্প হত রাতে। দোতলায় শোওয়ার ঘরে মস্ত খাটে পাশাপাশি শুয়ে।

শ্রাদ্ধ বা নিয়মভঙ্গ কোনও অনুষ্ঠানেই মিঠু আসেনি। কিন্তু এক সন্ধেবেলা সাদার্ন ক্লাব থেকে বেরিয়ে মাঠের ওপর খানিকটা একসঙ্গে হেঁটেছিল দু'জন। মিঠু একটু চিন্তিত। বলল, জয়িতা, মিতালি আমাকে কিছু বলতে চায়।

কী?

তা জানি না। কিন্তু তোমাকে একটা অনুরোধ করব।

বলুন না।

তুমি আমাদের কথা, তোমার আমার কথা মিতালিকে জানিয়ে দিয়ো।

কেন? আমার যে ভীষণ লজ্জা করবে।

তোমার লজ্জা নিয়েই তো হয়েছে আমার বিপদ।

মিতালিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

হ্যাঁ, মিতালি আমার ব্রাঞ্চে গিয়েছিল।

ও মা!

শি ইজ এ বিট অফ রিপেন্টেন্ট।

জয়িতার বুক অজানা ভয়ে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, তা হলে কী হবে?

মিঠু একটু হাসল, কী হবে তুমি জানো না?

বলুন না!

মিতালি অনেক দূরে সরে গেছে জয়িতা।

জয়িতার বুকে সে যে কাঁপুনি উঠল সে বোঝাতে পারবে না। মিতালি মস্ত পার্টির আয়োজন করল। ককটেল ডিনার। জয়িতার ইচ্ছে ছিল পার্টির পর মিতালিকে ফঁক বুঝে বলবে কথাটা। কিন্তু কী হল, আগের রাতে যখন দু’বোনে কথা হচ্ছিল তখন মিতালি বলল, তুই কি প্রেমে পড়েছিস?

জয়িতা অবাক হয়ে বলল, কেন বলো তো!

তোর মুখচোখ বলছে, তোর গলার স্বর বলছে, তোর আনমনা ভাব বলছে, তুই প্রেমে পড়েছিস।

জয়িতা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল।

লজ্জার কী আছে? বল না।

জানি না।

তার মানে সত্যিই প্রেমে পড়েছিস। কে রে?

জয়িতা একটা বুদ্ধির কাজ করল। বলল, আজ নয় মিতালিদি। কাল বলব।

কেন? কাল কেন?

জয়িতা বলেনি। সেই রাতটা সে ভাল করে ঘুমোতেও পারেনি।

পরদিন সকাল থেকেই ঘরদোর সাজানো, পরিষ্কার করা এসব নিয়ে ব্যস্ত রইল তারা। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে যখন দু'জনে মুখোমুখি তখন মিতালি জিজ্ঞেস করল, কাল বলিসনি। আজ বলবি?

বলব। খেয়ে নাও। তারপর বলব।

খেতে খেতেই মিতালি বলল, ছেলেটা ভাল?

জানি না।

ভাল করে বলছিস না কেন?

বলব মিতালিদি? বললে তুমি রাগ করবে না?

রাগ করব? তুই কাউকে ভালবাসলে আমার রাগ করার কী?

খাওয়া তখন শেষের মুখে। জয়িতা শুধু মিঠুর আদেশ পালন করার জন্যই তার সব লজ্জা সংকোচ আর ভয় মুঠোয় ধরে রেখেই বলল, মিঠুদা।

কে বললি? বলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মিতালি।

জয়িতা মাথা নিচু করে টেবিল ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সে কী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সেটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল তার। মিতালি বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল খাওয়ার টেবিলে। তারপর একতলার লিভিং রুমের সোফায় অনেকক্ষণ পড়ে ছিল চুপচাপ। তারপর ডেকোরেটরের লোকেরা এল ডাইনিং হলে টেবিল চেয়ার সাজাতে। এল ক্যাটারার। তাকে উঠতে হল। আড়াল থেকেই তাকে লক্ষ করছিল জয়িতা। সামনে যায়নি।

মিঠু এল বিকেলের দিকে। হঠাৎ।

দৃশ্যটা এ জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না জয়িতা। দোতলায় সাজছিল মিতালি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে মিঠুর দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ একটা অস্ফুট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিঠুর বুকে। ভগ্নস্তূপের মতো। শুধু বলছিল প্রবল কান্না

ভেদ করে বলছিল, বিশ্বাস করি না–বিশ্বাস করি না

মিঠু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। জয়িতা চলে গেল পিছনের বাগানে। এ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

তাকে গিয়ে পিছনের বাগানে ধরল মিতালিই। চোখের জল মুছে ফেলেছে, মুখে একটা হাসি ফুটিয়েছে অনেক কষ্টে। তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, বেশ করেছিস। বেশ করেছিস। আমি খুশি হয়েছি। বিশ্বাস কর।

জয়িতা বিশ্বাস করেনি। তবু বলেছিল, আমি তো জানতাম না মিতালিদি—

মিতালি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, এ কি জানার মতো কথা? কিছু নয় রে। আমি তো একটা পাগল, কত ভুল করেছি জীবনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখে বলল, কিন্তু কিছুই ঠিক ছিল না সেদিন মিতালির। জন্মে মদ ছোঁয়নি। সেদিন জলের মতো খেল। কত কী উলটোপালটা বলতে লাগল লোকজনকে। কেঁদে ফেলল, হাসতে লাগল। কিছু ঠিক ছিল না।

পার্টি শেষ হওয়ার একটু বাদেই চলে এসেছিল জয়িতা। বুক ভার, মনে ভয়, অনিশ্চয়তা, এই অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে কীভাবে মুক্তি ঘটবে।

০৫. মিতালিদেবীর খুনের কেসে

জয়িতাদেবী, মিতালিদেবীর খুনের কেসে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।

কিন্তু পুলিশকে আমি তো যা বলার বলেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা আমি জানি। কিন্তু তদন্ত যত এগোয় ততই নতুন নতুন তথ্য বেরোতে থাকে, নতুন নতুন সত্য উদঘাটিত হতে থাকে–একটু শক্ত বাংলা বলে ফেললাম, মাফ করবেন–আর যত এসব হতে থাকে ততই মামলার প্যাটার্নটা পালটে যেতে থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে জেরা করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না।

বলুন।

মিঠু মিত্র নামে কাউকে কি আপনি চেনেন?

চিনব না কেন? উনি আমার জামাইবাবু।

বাঃ, বেশ বেশ। কতদিন চেনেন?

মিতালিদির বিয়ের সময় থেকে।

চমৎকার। আপনি নিজেই বলেছেন যে, উনি আপনার জামাইবাবু। তার মানে কি যে, উনি এখনও আপনার জামাইবাবু এবং আপনি ওঁর শালি?

তার মানে?

মানে বিয়ের ইমিডিয়েট পরেই যে ওঁদের ডিভোর্স হয়ে যায় এটা কি আপনার জানা নেই?

কেন থাকবে না?

আফটার ডিভোর্স যখন আইনত স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে না তখন সেই বিয়ের সুত্রে গড়ে ওঠা আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোও কি থাকে? না, থাকা উচিত?

ওঃ হ্যাঁ। সেই অর্থে আমাদের সম্পর্ক নেই।

অন্য কোনও অর্থে আছে কি?

তার মানে?

মিঠু মিত্র আর আপনার জামাইবাবু নন, আপনিও ওঁর শালি নন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আত্মীয়তা ছাড়াও তো কতরকমের সম্পর্ক হয়। আমি জানতে চাই, মিঠু মিত্রের সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ ছিল কি?

ছিল।

সেটা কীরকম?

চেনাজানা ছিল।

আর কিছু?

আমি সাদার্ন ক্লাবে ক্যারাটে শিখতাম। উনি ওখানকার ইনস্ট্রাক্টর।

বাঃ, চমৎকার। ক্যারাটে শিখতেন? হঠাৎ ক্যারাটে কেন?

ইচ্ছে হল।

আপনি কি স্পোর্টিং টাইপ? খেলাধুলো ভালবাসেন?

বাসি।

স্কুল-কলেজের স্পোর্টসে নেমেছেন কখনও?

না।

ফুটবল ক্রিকেট বোঝেন?

না। একটু একটু।

কখনও দৌড়ঝাপ করেছেন?

না।

তবু হঠাৎ ক্যারাটে শেখার ইচ্ছে হল?

হ্যাঁ।

বেশ বেশ। আপনার বাড়ি থেকে সাদার্ন ক্লাব বেশ খানিকটা দূর। আপনি কীসে করে যাতায়াত করতেন?

বাসে।

বাসে যেতেন এবং আসতেন?

হ্যাঁ।

ভাল করে ভেবে বলুন। বাসে যেতেন এবং আসতেনও?

কখনও কখনও মিঠুদা মোটরবাইকে পৌঁছে দিতেন।

বাঃ, বেশ বেশ। ওঁদের বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল?

বারো-তেরো।

এখন কত?

কুড়ি চলছে।

গুড। আপনি কি জানেন যে, আপনারা অর্থাৎ আপনার বাবা, মা এবং আপনি বিশেষ করে আপনি মৃতা মিতালি ঘোষের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী?

জানি না।

শুধু কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের নয়, মিতালিদেবীর আমেরিকার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি এবং টাকাপয়সারও আপনারাই ওয়ারিশান। জানেন?

সেরকম কথা কিছু শুনিনি।

শুনবেন। কারণ আপনারাই মিতালিদেবীর নেক্সট অফ কিন।

হতে পারে।

আপনি না জানলেও অন্য অনেকেই কিন্তু খবর রাখত যে, বরুণ ঘোষ ও তার মেয়ে মিতালি ঘোষের নিকটাত্মীয় আপনারাই। আপনারাই তাদের ওয়ারিশান।

জয়িতা চুপ করে রইল।

সাদার্ন ক্লাবে আপনি কবে ভরতি হয়েছেন?

দু'বছর হবে।

নিজে থেকেই গিয়ে ভরতি হলেন?

হ্যাঁ।

মানে হঠাৎ আপনার ক্যারাটে শেখার ইচ্ছে হল আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সাদার্ন ক্লাবে ভরতি হলেন–ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছিল কি?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানতেন মিঠু মিত্র ওখানে ক্যারাটে শেখান?

জানতাম।

তার মানে কি ওঁর কাছেই ক্যারাটে শেখার আগ্রহ ছিল আপনার?

ঠিক তা নয়। মিঠুদা থাকলে সুবিধে হবে, তাই–

সুবিধে নানারকমই আছে। বাই দি বাই, মিঠুবাবুকে আপনি কি বরাবরই মিঠুদা বলে ডাকেন, নাকি জামাইবাবু?

মিঠুদা।

কেন, বাঙালি মেয়েরা তো বড় ভগ্নীপতিকে সাধারণত জামাইবাবু বলেই ডাকে।

অনেকে দাদাও ডাকে।

হ্যাঁ, তা বটে। আপনি দাদাটাই প্রেফার করেন তা হলে?

হ্যাঁ।

বাঃ বেশ। মিঠু মিত্র মাঝে মাঝে আপনাকে মোটরবাইকে লিফট দিতেন?

হ্যাঁ।

মাঝে মাঝে? না রোজ?

রোজ নয়। প্রায়ই।

একটু ভেবে বলুন। ক্যারাটে ক্লাবের অন্য মেম্বাররা যদি বলে রোজ?

রোজ পৌঁছে দিলেই বা ক্ষতি কী?

ক্ষতি? ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না। আমরা সত্যি কথাটা জানতে চাইছি মাত্র।

রোজ।

বাঃ এই তো চাই। কবে থেকে আপনাদের মধ্যে শালি আর ভগ্নীপতির সম্পর্কটা ঘুচে গিয়েছিল বলতে পারেন?

না। জানি না।

আপনাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি কেবল প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর?

হ্যাঁ।

একটু ভেবে বলুন। কারণ আমাদের সংগৃহীত তথ্য অন্য কথা বলছে।

কী বলছে?

আপনাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা পরস্পরকে ভালবাসেন। শুধু তাই-ই নয়, আপনাদের বিয়ের কথাবার্তাও চলছে। ঠিক বলছি?

জয়িতা খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

দয়া করে বলবেন কি যে এই প্রেম এবং বিয়ের ব্যাপারে আসল ইনিশিয়েটিভ কার বেশি? আপনার না মিঠুবাবুর?

আমার।

আপনার?

হ্যাঁ। মিতালিদি ওঁকে ডিভোর্স করার পর থেকেই আমি ওঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি।

ডিভোর্স না করলে?

তা জানি না। হয়তো মেনে নিতাম।

বাঃ। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে।

কীসের খটকা?

মিতালিদেবী হঠাৎ মারা গেলে আপনিই যে ওঁর বিপুল সম্পত্তি পাবেন এটা মিঠুবাবুর মতো বুদ্ধিমান লোকের না জানা থাকার কথা নয়।

তাতে কী হল?

আপনার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে ওঁরই বেশি আগ্রহ থাকার কথা। তাই না?

আমি বুঝতে পারছি না।

যাকগে। এখন বলুন, মিতালিদেবী ফিরে আসার পর থেকেই কি আপনি ওঁর সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে থাকতেন?

হ্যাঁ। মিতালিদি লোনলি ফিল করছিলেন, তাই আমাকে থাকতে বলেন।

একটানা ছিলেন?

হ্যাঁ। তবে রাতটা। দিনের বেলায় আমার কলেজ থাকত, মিতালিদিরও কাজ থাকত।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। কিন্তু খুনের রাতে আপনি ছিলেন না?

না।

কেন জানতে পারি?

সেদিন মিতালিদি হঠাৎ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যান। মাতলামিকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

ঠিকই তো। মাতলামি মোটেই পছন্দ করার জিনিস নয়। আচ্ছা, মিতালিদেবী কি প্রায়ই ড্রিঙ্ক করতেন?

না। কক্ষনও নয়।

তা হলে সেদিন ড্রিঙ্ক করলেন কেন বলতে পারেন?

না।

না? আপনি তার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন একটানা বাস করেছেন, তবু জানেন না তিনি হঠাৎ সেদিন কেন ড্রিঙ্ক করলেন?

না।

আপনাকে তিনি কিছু বলেননি?

না।

আপনি কিছু দেখেননি?

না।

কিছু অনুমানও করেননি?

না।

সেদিন মিঠুবাবুর সঙ্গে মিতালিদেবীর দেখা হয়েছিল, তা তো জানেন?

জানি।

তাদের মধ্যে কী কথা হয়?

আমি শুনিনি।

আপনি কি জানেন যে, মিতালিদেবীর মিঠুবাবুর প্রতি মনোভাব বদলে গিয়েছিল?

না, আমি জানতাম না।

জানতাম না মানে তখন জানতেন না, কিন্তু এখন জানেন?

এখনও জানি না।

এই জেরক্স কপিগুলো দেখুন তো। এ কি মিতালিদেবীর হাতের লেখা?

হ্যাঁ।

কষ্ট করে একটু পড়বেন কি? সবটা পড়ুন।

জয়িতা পড়ল। শবর দাশগুপ্ত ঈগলের চোখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। পড়ার পর জয়িতার হাত থেকে কাগজগুলো ফেরত নিয়ে শবর তার ব্রিফকেসে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কিছু বুঝতে পারলেন?

হ্যাঁ। মিতালিদি মিঠুদার প্রতি সট হয়ে পড়েছিল।

এগজ্যাক্টলি। আপনি কি জানেন যে ওঁর সেই সফটনেস এতটাই ছিল যে উনি মিঠু মিত্রকে ওঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান করে দিয়েছেন?

জানি। মিঠুদা বলেছে।

জয়িতাদেবী, মিতালিদেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

জানি না।

জানতে বলছি না। লজিক্যাল অনুমান বলে তো একটা ব্যাপার আছে।

আমি জানি না।

তা হলে ঘটনাগুলো একটু সাজিয়ে দিই। আপনার সুবিধে হবে। মিঠু মিত্র একজন বড়লোকের একমাত্র সন্তান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে যাকে বিয়ে করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তার ছিল না। বরুণ ঘোষের বেনামা অ্যাকাউন্ট এবং সম্ভবত আরও দু-চারটি গুপ্ত খবর তিনি জানতেন। মে বি দেয়ার ওয়াজ এ টাচ অফ ব্ল্যাকমেল ইন দা ম্যারেজ। কিন্তু বিয়ে টিকল না। মিতালিদেবী ডিভোর্স করে আমেরিকায় চলে গেলেন। সুতরাং মিঠু মিত্রের তেমন লাভ হল না। কিন্তু কপালটা ভাল, তিনি আপনার সন্ধান পেয়ে গেলেন এবং একটা চমৎকার প্ল্যান করে রাখলেন। প্ল্যানটা অবশ্য একটু ফার ফেচেড, এটা আমি স্বীকার করছি। হয়তো প্ল্যান ওঁর ছিল না। কিন্তু সুযোগ এসে গেল। বরুণ ঘোষ মারা গেলেন এবং মিতালিদেবী দেশে ফিরলেন। দেখুন কীরকম গোল্ডেন অপরচুনিটি। মিতালিকে সরিয়ে দেওয়া গেলে দুটো কাজই হয়। এক, বহুঁকালের হারানো অপমানের শোধ নেওয়া এবং আপনাকে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেওয়া। শুধু তাই-ই নয়, আমেরিকাতেও বেশ ভাল সম্পত্তি থাকায় তার ইনহেরিটর হিসেবে আপনার এবং আপনার হাজব্যান্ড হিসেবে ওঁরও ভবিষ্যতে আমেরিকায় যাওয়া এবং গ্রিন কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা খুলে দেওয়া। সুতরাং মিঠু মিত্র এই সুযোগ ছাড়লেন না। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল মিঠুর প্রতি হঠাৎ মিতালির প্রেম। মিতালিকে খুন না করে, শুধু আবার বিয়ে করে ফেললেই মিঠু মিত্রের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। কিন্তু আমার অনুমান, তিনি সত্যিই আপনাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই মিতালিকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যানেই স্টিক করে থাকতে হল। ওঁর কপাল সত্যিই তুলনাহীন। কারণ মিতালিদেবী মারা গেলেই যে আপনি ওঁর সম্পত্তি বা টাকাপয়সা হাতে পেতেন তা নয়। উত্তরাধিকার আইন

কমপ্লিকেটেড এবং সাকসেশন সার্টিফিকেট পাওয়া সময়সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রেও মিঠু কেল্লা মেরে দিলেন মিতালি ওঁকে কাস্টোডিয়ান করে দেওয়ায়। সুতরাং লজিক্যাল কনক্লুশনে যাওয়া কি খুব শক্ত বলে মনে হচ্ছে আপনার? আপনি কাঁদছেন? গুড। আশা করি মূল্যবান চোখের জলটা আপনি সমাজের একজন জঘন্য অপরাধী, একজন ঠান্ডা মাথার খুনির জন্য অপব্যয় করছেন না। এই কান্নাটা যদি অসহায় হতভাগিনী মিতালিদেবীর জন্য হয়ে থাকে তবে ইট ইজ মোস্ট ওয়েলকাম।

আমি আর পারছি না। আমাকে আজ ছেড়ে দিন।

জয়িতাদেবী, আর একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ আছে। খুব অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু জরুরি। আপনি বরং টয়লেট থেকে ঘুরে আসুন। চোখেমুখে ভাল করে জলের ঝাঁপটা দেবেন, ইউ উইল ফিল গুড। যান।

জয়িতা গেল। অনেকটা সময় নিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাঁপটা দিল। তারপর আয়নায় নিজের মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মাত্র কুড়ি বছরের জীবন তাকে কত কিছু শেখাচ্ছে।

বাইরের ঘরে এসে বসতেই শবর হাসল, এই তো বেশ নরম্যাল লাগছে আপনাকে। গুড। এবার সেই কথাটা।

বলুন।

আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে মিতালিদেবীকে খুনের পিছনে আপনারও একটা মোটিভ আছে?

আমার?

আরে না না, ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না। কিন্তু কথাটা খুব সংগত কারণেই উঠতে পারে।

আমি কেন খুন করব?

করেনওনি। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর মে রেইজ এ কোশ্চেন। প্রশ্ন তুলতে পারে মিঠু মিত্রের উকিলও। সব দিক ভেবে রাখা ভাল।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি মিঠুকে ভালবাসেন। ঠিক তো?

হ্যাঁ।

ভালবাসার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে, স্বীকার করেন?

হ্যাঁ।

আপনি যখন মিতালিদেবীর বাড়িতে ছিলেন তখন নিশ্চয়ই আপনারা দুই বোন অনেক বিষয়ে কথা বলতেন।

হ্যাঁ। আমরা রাত দুটো-তিনটে পর্যন্তও আড্ডা মারতাম।

গুড। কী বিষয়ে কথা হত আপনাদের?

মোস্টলি আমেরিকা। ওখানকার লাইফ স্টাইল, লোনলিনেস, ঐশ্বর্য–এইসব নিয়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমেরিকা তো থার্ড ওয়ার্ল্ড পিপলের কাছে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় হবেই। খুব স্বাভাবিক। ধরুন প্রশ্ন উঠল যে, এইসব গল্পের ফাঁকে ফাঁকে মিতালিদেবী আপনাকে তার হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাও জানিয়েছিলেন। তিনি যে আসলে মিঠুকে ভুলতে পারেননি এবং নতুন করে তার প্রেমে পড়েছেন এবং রিকনসিলিয়েশনের চেষ্টা করছেন সেসব কথাও বলেছেন।

না, মিতালিদি বলেননি।

আহা, সে তো বটেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠলে কী করবেন? বিশেষ করে প্রশ্নটা যদি হয় ভীষণ লজিক্যাল অ্যান্ড ডাউন টু আর্থ? তাই বলছিলাম, এগুলোও ভেবে রাখা ভাল।

কী ভাবব?

ধরুন উকিল আপনাকে বলল যে, মিতালিদেবীর হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে আপনি আপসেট হয়ে পড়েছিলেন অ্যান্ড ভেরি জেলাস। কারণ,

আপনার বয়স মাত্র কুড়ি, আপনি অনভিজ্ঞ। হৃদয় জয়ের লড়াইতে আপনি মিতালিদেবীর সঙ্গে নাও পেরে উঠতে পারেন। জেলাসি ইজ এ ডেনজারাস থিং। তাই না? তা ছাড়া ইনহেরিটেনসের প্রশ্ন তো আছেই। মিতালি মারা গেলে আপনি প্রচুর লাভবান হবেন। সুতরাং আপনি যদি মিতালিদেবীকে মেরে ফেলতে চান সেটাও অস্বাভাবিক বলে মনে করার কিছু নেই।

কী বলছেন আপনি?

আহা, উত্তেজিত হবেন না। আমি শুধু আদালতের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনাকে অ্যালার্ট করছি। আচ্ছা, মিতালিদেবী তার সেন্টের শিশিগুলো কোথায় রাখতেন আপনি জানেন?

কেন জানব না? ও অনেক পারফিউম এনেছিল। কিছু সুটকেসে ছিল, কয়েকটা বের করে ড্রেসিং টেবিলে রেখেছিল।

আপনি কি জানেন যে খুনি পালানোর সময় অনেকগুলো সেন্টের শিশি ভেঙে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যাতে পুলিশ কুকুর গন্ধ না পায়?

শুনেছি।

দ্যাটস গুড। ও বাড়ি থেকে আপনি ক'টার সময়ে চলে আসেন?

রাত দশটা।

একাই ফিরেছিলেন?

হ্যাঁ।

তখনও পার্টি চলছিল?

হ্যাঁ।

আপনাকে চলে আসতে কে কে দেখেছে?

জানি না। আমি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে চলে আসি। পিছনের বাগানের রাস্তা দিয়ে।

সেদিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?

আমার ঘরে। আর কোথায় থাকব?

হুঁ। বেশ গণ্ডগোলে ফেলে দিলেন।

কেন?

আপনার কেসটা ফুলফ নয়। এনিওয়ে, ফর দি টাইম বিয়িং আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরুন খুনটা আপনি করেননি।

আমি করিনি। ছিঃ ছিঃ, এসব কী কথা বলুন তো!

ফের উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। মাথা ঠান্ডা রাখুন। আপনার যাতে বিপদ না হয় তা আমি দেখব। কিন্তু আমার কিছু তথ্য চাই।

কী তথ্য?

মিঠু মিত্র কেমন লোক?

ভীষণ ভাল।

ভেবে বলুন।

ওকে নিয়ে আমি সব সময়েই ভাবি।

আপনি ওঁর জন্য সবকিছু করতে পারেন?

পারি।

ইভন এ মার্ডার?

আমি খুন করিনি।

সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। কথাটার জবাব দিন।

আমি ওকে ভালবাসি, ওর জন্য সব ত্যাগ করতে পারি। এর বেশি জানি না।

কথাটা লজিক্যাল হল না। অথচ আপনি লজিক ভালই জানেন। আপনি ফিলজফির ছাত্রী।

আমার লজিক ওরকম নয়। মিঠুদা খুব ভাল জেনেই আমি ওকে ভালবাসি।

সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছেন। কারও সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে ধারণা করাটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো। দুনিয়ায় এমন অনেক খুনি আছে যাদের পরম সাধুপুরুষ বলে মনে হয়। অ্যাপারেন্টলি।

আমি অত জানি না।

না জানাটা কাজের কথা নয়। শুনুন, আপনি যদি খুনটা নাও করে থাকেন তা হলেও আপনি খুনির সাহায্যকারী হিসেবে সন্দেহের পাত্রী হতে পারেন। কারণ আপনার অ্যালিবাই নড়বড়ে। কেউ আপনাকে ও বাড়ি থেকে চলে আসতে দেখেনি। আপনি লুকিয়ে ছিলেন। রাত গভীর হলে মিঠু ফিরে আসে এবং আপনি তাকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেন। তারপর মিঠু মিতালিদেবীকে খুন করে। আপনি তাকে সেন্টের শিশি দেন। বারান্দা থেকে আপনারা শিশিগুলো ভিতরে ছুঁড়ে ভেঙেছিলেন। তাতে আপনাদের গায়ে সুগন্ধ লাগতে পারেনি। আপনারা নিরাপদে পিছনের বাগানে নেমে পালিয়ে যান।

আমার মাথা ঘুরছে। প্লিজ, আর নয়।

আহা, এটা শুধু অনুমান। এটা একটা রিকনস্ট্রাকশন মাত্র। এরকম নাও হতে পারে।

তা হলে?

আমার ধারণা খুনের সময় মিঠু একাই ছিল। ঠিক কি না?

০৬. আমাকে কেন টানাহ্যাঁচড়া করছেন

আমাকে কেন টানাহ্যাঁচড়া করছেন? যা হয়েছিল হয়েছিল। পাস্ট ইজ পাস্ট। মিতালির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

লেখাপড়া কতদূর?

মাধ্যমিক।

তা হলে তো তোমাকে শিক্ষিতই বলতে হয়। পাশ করেছিলে?

জি।

কোন ডিভিশনে?

বললে বিশ্বাস করবেন? বলে কী লাভ?

শুনিই না।

ফার্স্ট ডিভিশনে।

বলো কী।

অঙ্কে আর ইতিহাসে লেটার ছিল।

উরেব্বাস।

জানতাম বিশ্বাস করবেন না। তবে সার্টিফিকেট আর মার্কশিট দুটোই আমার মায়ের কাছে আছে। মা ঠাকুরের আসনে তোশকের তলায় রেখে দিয়েছে।

পড়াশুনো আর এগোয়নি?

না। পড়ে কী হবে?

কলেজে ভরতি হয়েছিলে?

তাও হয়েছিলাম। তবে কন্টিনিউ করিনি।

কেন?

পড়াশুনো ফালতু জিনিস। পড়ে উন্নতি করতে গেলে লোকে বুড়ো হয়ে যায়। অত সময় কি হাতে আছে?

বটে! তা তুমি কীসে উন্নতি করতে চেয়েছিলে?

মালটাল বেচতাম।

কী মাল?

সেসব স্যার, পুরনো কাসুন্দি। ও ঘেঁটে লাভ নেই। এই কেসটায় কুটমুট আমাকে ধরেছেন।

সেটা দেখা যাবে। মিতালিকে চিনতে?

চিনব না কেন? সে আমার বউ ছিল।

বিয়ে হয়েছিল?

কালীঘাটে।

রেজিস্ট্রি হয়নি?

না। ও তখন মাইনর ছিল।

তাও তো বটে। কতদিন একসঙ্গে ছিলে?

পাঁচ-ছয় মাস হবে।

তুমি ওকে মারধর করতে?

না। মারব কেন? তখন আশনাই চলছিল।

আশনাই কেটে গেল কেন?

মিতালিই বিগড়ে গেল। ওয়ান ফাইন মর্নিং ঘুম থেকে উঠে বলল, আমি ফিরে যাচ্ছি।

তুমি কী করলে?

কী করব! হাই তুলে পাশ ফিরে শুলাম।

আটকাবার চেষ্টা করলে না?

কী লাভ! ভদ্রলোকের মেয়ে, একটু টক-ঝালের খোঁজে এসেছিল। টেকার বিয়ে নয়, জানতাম।

তোমার জন্য ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে গিয়েছিল, জানো?

কেন স্যার, আমি কী করলাম? আশনাই তো আমি একা করিনি। ওরও ভূমিকা ছিল।

কোথায় বাসা করে ছিলে?

গোবিন্দপুর বস্তিতে।

পরে মিতালিদেবীর খোঁজখবর করোনি?

খোঁজার কী আছে স্যার? পাড়ারই মেয়ে। সব খবরই পেতাম।

বটে! মিতালিদেবীর যে বিয়ে হয়েছিল, উনি যে আমেরিকায় ছিলেন সব জানতে?

ঘ্যাম মেয়ে। সব জানতাম।

তোমার হিংসে হত না?

না স্যার। হিংসেফিংসে হয়নি। ওসব মেয়ে কি আমার মতো লোকের জন্য? শখ হয়েছিল, তাই কেটে এসেছিল। তারপর শখ মিটে গেলে কেটে গেল।

মিতালি যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছিল তা জানতে?

কেন জানব না? বরুণবাবু মারা গেলেন তাও জানি।

তুমি কী করো? চাকরি?

কিছুদিন করেছিলাম। ব্যাঙ্কে ধোয়ামোছার কাজ। ক্যাজুয়াল স্টাফ। পোষাল না। ধূপকাঠি, লজেন্স, গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার এসবও বেচেছি। কিন্তু সৎপথে কিছু হল না। এখন টুকটাক করি আর কী।

অসৎ পথে?

পুলিশ সব জানে স্যার। নতুন কিছু নয়।

মিতালিদেবীর সঙ্গে এবার তোমার দেখা হয়েছিল?

হাসালেন স্যার। মিতালি আমাকে পাত্তা দেবে কেন? পাস্ট ইজ পাস্ট।

মিঠু মিত্রকে চেনো?

মিতালির হাজব্যান্ড তো! চিনি স্যার।

কীরকম চেনো?

খুব ভাল লোক স্যার। ট্যাক্সির জন্য লোনটা তো উনিই বের করে দিয়েছিলেন?

তোমার ট্যাক্সিও আছে নাকি?

ছিল স্যার। গত মাসে বেচে দিয়েছি।

মিঠু মিত্র তোমাকে চিনত? মানে তোমার সঙ্গেই যে মিতালি পালিয়ে গিয়েছিল তা জানত?

কেন জানবেন না?

জেনেও তোমাকে হেল্প করেছেন?

হ্যাঁ, জেনেই করেছেন। মিতালি তো দু’জনের কাছ থেকেই ভেগেছে স্যার। আমরা লড়ে কী করব?

মিঠু মিত্র তা হলে তোমার মতে ভাল লোক?

জি।

তুমি জি বলছ কেন?

হিন্দি ছবিতে বলে, তাই এসে যায়।

ধরো যদি তোমাকে বলি, মিঠু মিত্র কোনও কাজ করতে বললে তুমি করবে?

করব স্যার।

যদি একটা খারাপ কাজ করতে বলে?

খারাপ নানারকমের হয়। ভদ্রলোকের চোখে খারাপ, পুলিশের চোখে খারাপ, কেরানির চোখে খারাপ। সব খারাপই তো একরকম নয় স্যার। ওজন করে দেখতে হবে।

তুমি তো ফিলজভার দেখছি।

জি।

পড়াশুনো করলে উন্নতি করতে পারতে।

পাস্ট ইজ পাস্ট। ছেড়ে দিন।

ছাড়লাম। নিশ্চয়ই জানো যে, মিতালিদেবী খুন হয়েছে।

জানি। স্যাড কেস।

কীভাবে জানলে?

সবাই জানে। আমার না জানার কী?

ঠিক কথা। কীভাবে খুন হয়?

স্ট্যাবিং।

আচ্ছা, তুমি যখন মিতালিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে তখন বরুণ ঘোষ কি পুলিশে রিপোর্ট করেছিলেন?

হ্যাঁ স্যার।

পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করেছিল?

করেছিল। মিতালি চলে আসার পর।

তোমার কি জেল হয়েছিল?

না। জামিন পেয়েছিলাম। পুলিশ কেসটা পার করেনি।

কেন করেনি?

বরুণবাবু বোধহয় পাবলিসিটির ভয়ে পিছিয়ে যান।

পুলিশ তোমাকে মারধর করেছিল?

জি।

তোমার রাগ হয়নি?

না স্যার। কার ওপর রাগ করব? আমাদের লাইফটাই এরকম।

মিঠু মিত্রের সঙ্গে তোমার দোস্তি কীভাবে হয়েছিল?

ঠিক মনে নেই।

একটু ভেবে বলল। ব্যাপারটা জরুরি।

যতদুর মনে আছে উনি আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন।

সেটা কি ওঁদের বিয়ের আগে, না পরে?

বিয়ের পর।

কতদিন পর?

মিতালি ওঁকে ছেড়ে চলে আসার পর।

মিঠু মিত্র তোমাকে খুঁজে বের করেছিলেন কেন?

ওঁর একটা রং আইডিয়া ছিল।

কীরকম?

উনি ভেবেছিলেন আমি মিতালিকে পিছন থেকে ফুসলাচ্ছি, তাই মিতালি ওঁর সঙ্গে থাকতে চায় না।

উনি কি তোমাকে থ্রেট করেছিলেন?

না স্যার।

তা হলে?

উনি আমাকে খুব ঠেঙিয়েছিলেন।

বলো কী? তোমার গায়ে হাত! তুমি তো মস্তান।

জি। তবে বাবারও বাবা থাকে কিনা। উনি তখন রেগে বয়লার হয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি উলটে মারোনি?

ক্যারাটে কুংফুর সঙ্গে কি পারা যায়?

তোমার দলবল?

দু-চারজন দোস্ত একটু হাত-পা চালিয়েছিল। সুবিধে হয়নি।

তারপর?

তারপর উনি ভুল বুঝতে পারেন।

তারপরই দোস্তিটা হয়ে গেল?

অনেকটা সেরকমই। একটু সময় লেগেছিল।

দোস্তিটা কি এখনও আছে?

একটু আছে। দেখা হলে উইশ করি।

মিঠুর সঙ্গে লাস্ট কবে তোমার দেখা হয়েছে?

ঠিক মনে নেই।

ভেবে বলল।

ওইরকম সময়েই হবে।

কোনরকম সময়ে?

মিতালির মার্ডারের দিনের কাছাকাছি।

নাকি ওই দিনই?

তাও হতে পারে।

কখন দেখা হয়েছিল?

বিকেলের দিকে। কীভাবে?

আমি মন্টুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি মোটরবাইকে করে চলে যাচ্ছিলেন।

তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল কি সেদিন?

না। উনি দেখতে পাননি আমাকে।

তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে, মার্ডারটা হয়েছিল দোতলায়, মিতালিদেবীর শোয়ার ঘরে। রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে।

জি। সব জানি। খবরের কাগজে পড়েছি।

এ পাড়ায় নাইট গার্ডরা রাতে পাহারা দেয়?

জি। আমিও দিই। বহুত চোরছ্যাঁচড় চারদিকে।

সেই রাতে তোমারও কি ডিউটি ছিল?

না স্যার। আমাদের মাসে দু'দিন টার্ম আসে। তবে নাইট গার্ডরা সেদিন রাতে কোনও কিছু সন্দেহজনক দেখেনি।

তুমি সেদিন কোথায় ছিলে?

ঘরেই ছিলাম।

তোমার কোনও গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে?

ওরকমই ধরে নিন।

তদন্তে কিন্তু তাকেও দরকার হতে পারে। তার নাম-ঠিকানা বলো।

ঠিকানাফিকানা জানি না স্যার। নাম বলেছিল রীতা দাস।

কীরকম মেয়ে? প্রস্টিটিউট না কল গার্ল?

একটু অন্যরকম।

কীরকম?

একটু হায়ার ক্লাসের।

তোমরা কোথায় ছিলে?

পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ির পিছন দিকে আমার ঠেক। সেখানেই ছিলাম।

মেয়েটা কোথায়?

নেই। পরদিন সকালে উঠে দেখি, হাওয়া।

হাওয়া? তোমাকে বলে যায়নি?

না স্যার। রাত্তিরে আমার ঘুমটা একটু গাঢ় হয়। টের পাইনি।

তার সঙ্গে কবে তোমার প্রথম দেখা হয়?

দু'দিন আগে।

কীরকম ভাবে দেখা হয়েছিল?

আমি একটু আধটু ড্রিঙ্ক করি। একটা দিশি মদের আস্তানায়। সেখানেই।

কে আলাপ করেছিল? তুমি না ও?

মেয়েটাই।

বারটা কোথায়?

বার নয় স্যার, ঠেক। কাছেই, ভবানীপুরে।

তাকে আগে কখনও দেখেছ?

না।

একটু ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারা কি?

হ্যাঁ। আপনি চেনেন স্যার?

চিনি বলেই মনে হচ্ছে। এবার খুব ভাল করে ভেবে জবাব দাও। সেদিন–মিতালিদেবীর খুনের দিন তুমি কখন ড্রিঙ্ক করতে শুরু করেছিলে?

রাত আটটার পরই সাধারণত আমি খাই।

ঘরে বসে খাচ্ছিলে?

হ্যাঁ।

মেয়েটাও খাচ্ছিল কি?

একটু আধটু।

কখন শুতে গিয়েছিলে?

ঘড়ি দেখিনি। তবে সেদিন মালটা বেশি টেনে ফেলেছিলাম স্যার।

সময়টা বলতে পারবে না?

বোধহয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রীতা একটা পাঞ্চ তৈরি করেছিল। দারুণ জিনিস।

পাঞ্চ?

হ্যাঁ। দু-তিনরকম মদ মিশিয়ে।

.

যে লোকটা দরজা খুলল সে একজন চিনেম্যান চেহারার লোক। বেশ স্বাস্থ্যবান। শবর তার দিকে দু’সেকেন্ড চেয়ে রইল।

হু ডু ইয়া ওয়ান্ট?

এটা কি তোমার ঘর?

অফ কোর্স!

এখানে রীতা দাস বলে কেউ থাকে?

নো। আই লিভ অ্যালোন।

জুলেখা শর্মা বলে কেউ?

নো। হু দি হেল আর ইউ?

পুলিশ ইন্টেলিজেন্স।

মাই গড! কাম ইন।

ঘরে ঢুকে শবর চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। বোর্ডিং হাউসের ঘর যেমন হয় তেমনই। দশ বাই বারো মাপেরই হবে। দেয়ালে খুব চড়া রঙের ওয়ালপেপার লাগানো। একটা সরু খাট, টেবিলের ওপর একটা স্টিরিয়োতে মাইকেল জ্যাকসনের ক্যাসেট বাজছে, একটা ওয়ার্ডরোব এবং নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিস। একটা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, প্লিজ সিট ডাউন। তোমার বয়স কত?

থার্টি সিক্স।

ম্যারেড?

নট ইয়েট। নো মানি টু ম্যারি।

কী করো?

এলিট সিনেমার গলিতে আমার ব্যাগ তৈরির কারখানা আছে। এ ভেরি স্মল এন্টারপ্রাইজ।

তুমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন?

অফ কোর্স!

এ ঘরে কত দিন আছ?

লাস্ট টেন ইয়ার্স।

রীতা দাস বা জুলেখা শর্মা নামের কোনও মেয়েকে চেনো?

না।

এ ঘরে কোনও মেয়ে আসে?

না। ওসব এখানে হয় না।

তা হলে কোথায় হয়?

ইফ আই নিড এ গার্ল আই গো টু হার।

থ্যাঙ্ক ইউ।

.

আপনার নাম?

সুনীতা রায়।

আপনি এই স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর?

হ্যাঁ।

কতদিন এখানে কাজ করছেন?

এগারো বছরেরও বেশি।

জুলেখা শর্মা বলে কেউ এখানে কাজ করে না বলছেন?

না। কোনওদিন নয়।

ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারা, পুলিশ অফিসারের নাতনি।

না। এরকম কেউ এখানে কাজ করে না।

আপনাদের সব স্টাফ আজ উপস্থিত আছেন কি?

হ্যাঁ। ফুল স্টাফ।

আমি তাদের দেখতে পারি কি?

পারেন। তবে অনেকে এখন ক্লাসে আছেন।

আমি অপেক্ষা করব।

ওকে।

***

নমস্কার জয়িতাদেবী।

নমস্কার।

আমাকে দেখে আপনি বোধহয় খুশি হননি। পুলিশের দুর্ভাগ্য, তাদের দেখে কেউ খুশি হয় না।

না না, আপনি তো আপনার কাজ করছেন। বসুন।

আজ খুব বেশি জেরা করার নেই। শুধু দু'-একটা প্রশ্ন।

বলুন।

মিতালিদেবীর ঘর থেকে খুনের রাতে কিছু জিনিস খোয়া যায়।

জানি। শুনেছি।

অনেক সময়ে খুনি তার মোটিভ ঢাকতে চুরিটা সাজিয়ে নেয়। আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ এনকোয়ারিতে তাই আমরা চুরিটাকে গুরুত্ব দিইনি। উনি কলকাতা কাস্টমসে যে ডিক্লেয়ারেশন দিয়েছিলেন তাতে দেখছি উনি সঙ্গে মাত্র দুশো ডলার এনেছিলেন। একটা হার আর বালা ছাড়া সোনাদানাও বিশেষ ছিল না।

ওঁর সব গয়না আমেরিকায় এবং কলকাতায় ব্যাঙ্কের লকারে আছে। সুতরাং চুরির পরিমাণ বেশি নয়। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?

পারি। মিতালিদির হ্যান্ডব্যাগে দশ হাজার ডলার ছিল।

দশ হাজার? বলেন কী?

টাকাটা উনি আমাকে দেখিয়েছিলেন।

সেই হ্যান্ডব্যাগটায় আর কী ছিল?

কয়েকটা গয়না।

অত ডলার উনি এনেছিলেন কেন জানেন? বিশেষ করে যখন এখানেও ব্যাঙ্কে ওঁর প্রচুর টাকা রয়েছে?

জানি। মিতালিদি একটু অগোছালো টাইপের। একটু আনমনাও। ভারতবর্ষে আসার সময়ে, প্লেন ধরার আগে বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে ও দেখতে পায়, বিছানায় বালিশের তলায় ডলারের গোছাটা পড়ে আছে। টাকাটা ফেলে এলে চুরি যাওয়ার ভয় ছিল। তাই তাড়াতাড়িতে হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। হ্যান্ডব্যাগটা কি চুরি গেছে?

না। তবে ডলার আর গয়না চুরি হয়েছে।

ইস, অনেক টাকা, না?

হ্যাঁ। চুরির অ্যাঙ্গলটাকে আমরা এখন একটু গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনার কি মনে পড়ে, মিতালিদেবী দেশে আসার পর কোনও মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না?

অনেক মেয়ে এসেছিল। ওর বান্ধবীরা। রোজই তো আসত।

তাদের কথা বলছি না। বান্ধবী নয় এমন কেউ?

আমি তো সবসময়ে বাড়িতে থাকতাম না।

ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে? মাজা রং?

মনে পড়ছে না।

ভাল করে ভাবুন।

জয়িতা ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না। তবে—

তবে?

একদিন একটা ফোন এসেছিল।

হ্যাঁ বলুন।

ফোনটা করেছিল একটা মেয়ে। আমিই ফোন ধরেছিলাম। মিতালিদিকে চাইছিল বলে আমি ওকেই ফোনটা দিই। অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। মিতালিদি ফোনটার পর খুব রেগে গিয়েছিল। আমাকে বলল, কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার বল তো! এ তো ব্ল্যাকমেল।

বটে? আপনি জানতে চাননি কে ফোনটা করেছিল?

চেয়েছিলাম। মিতালিদি বলল, একটা বাজে মেয়ে। চিনি না। খারাপ খারাপ কথা বলছিল।

ব্যস! আর কিছু নয়?

না। ব্যাপারটা মিতালিদি তেমন পাত্তা দিল না। তবে খুব রেগে গিয়েছিল, এটা মনে আছে।

০৭. মিঠু খুব ধীরে তার বিষণ্ণ মুখখানা তুলল

নমস্কার।

মিঠু খুব ধীরে তার বিষণ্ণ মুখখানা তুলল। ব্যাঙ্ক এখন ফাঁকা। বেলা তিনটে বেজে গেছে। টেবিলের ওপাশে শবর দাঁড়িয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঠু বলল, বসুন।

শবর বসল।

কেমন আছেন?

মিঠু মৃদু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আছি।

আজ ঠিক জেরা করতে আসিনি।

তা হলে কি অ্যারেস্ট করতে?

এখনই নয়। আমি আর্লি অ্যারেস্টে বিশ্বাসী নই। বরং সন্দেহভাজনকে নড়াচড়া করতে দিলে এবং নজর রাখলে ভাল কাজ হয়।

তাই বুঝি। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য?

আমার জন্য নয়, দেশ ও দশের জন্য। আমার একটা ইনফর্মেশন চাই।

কীসের ইনফর্মেশন?

রিগার্ডিং বরুণ ঘোষ।

অনেক কথাই তো হয়েছে।

শবর মাথা নেড়ে বলল, তা হলেও অনেক কিছু জানা যায়নি।

কী জানতে চান?

গত দু-তিন বছর ধরে ওঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উইথড্রয়ালের পরিমাণ হঠাৎ অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল কি না।

ওঁর অ্যাকাউন্ট চেক না করে তো বলা যাবে না।

চেক করুন। করছি। আর কিছু?

হ্যাঁ। উনি কেমন লোক ছিলেন?

সে কথা তো বলেইছি।

লোনলি, উইডোয়ার, মিডল এজেড?

হ্যাঁ।

শবর একটু হাসল। তারপর বলল, যতদুর জানি মিতালিদেবীর দু'বছর বয়সের সময় বরুণবাবুর স্ত্রী মারা যান।

হ্যাঁ।

তখন ওঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে করার বয়স ছিল।

হ্যাঁ।

উনি মারা গেছেন চুয়ান্ন বছর বয়সে।

তা হবে।

বয়সটা খুব বেশি নয়, কী বলেন?

আপনি একটা কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছেন।

হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন কি?

না। আন্দাজ করছি।

তা হলে স্পষ্ট করেই বলি। ওয়াজ দেয়ার এ উওম্যান সামহোয়ার?

আমি ঠিক জানি না।

একটু ভাবুন। আপনার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। আপনি তার অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডেল করেছেন।

মিঠু ভ্রু কুঁচকে খানিকটা চুপ করে রইল।

শবর বলল, বলতে আপনার রুচিতে বাধছে কি?

তা নয়।

তা হলে?

এটুকু বলতে পারি যে, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আচ্ছা, উনি কি সবসময়ে নিজেই টাকা তুলতে আসতেন?

না। মাঝে মাঝে ওঁর রান্নার লোক হরেন বা ড্রাইভারও আসত।

আর কেউ?

ন্‌না।

দেখুন, কেসটা সিরিয়াস একটা টার্ন নিচ্ছে। এ সময়ে দ্বিধা করলে আমরা মুশকিলে পড়ব। ভাল করে ভেবে দেখুন।

দেখুন, বেয়ারার চেক তো যে কাউকেই দেওয়া যায়। উনি অনেককেই হয়তো চেক পেমেন্ট করতেন। সব মনে রাখা কি সম্ভব?

না। তবু কোনও অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে সেটা মনে থাকতে পারে।

কিছু মনে পড়ছে না।

আচ্ছা, উনি কি অনেককেই চেক পেমেন্ট করতেন?

যতদূর মনে আছে, না।

ওঁর আরও তিনটে ফিকটিশাস অ্যাকাউন্ট আছে।

সে তো আপনি জানেন।

এই তিনটে অ্যাকাউন্ট থেকে উনি টাকা তুলতেন কি?

খুব কম।

মনে করে দেখুন তো, কখনও এ তিনটের কোনও একটা থেকে এমন কেউ টাকা তুলতে এসেছেন কি না, যে একটি মেয়ে, যার বয়স এখন বত্রিশ-তেত্রিশ, ছিপছিপে, ছোটখাটো, আনইমপ্রেসিভ চেহারা?

মিঠু একটু হাসল।

হাসলেন যে!

এই বিবরণটা আপনি আর একজনকেও দিয়েছেন।

হ্যাঁ। জয়িতাদেবীকে।

মনে পড়ছে না।

শুনুন মিঠুবাবু, মানুষের ব্রেন একটা অনন্ত স্টোরহাউস। তাতে সব জমা থাকে। ব্রেনটা একটু ট্যাপ করুন। চোখ বুজে মেডিটেট করুন।

মিঠু অসহায়ভাবে বলল, তার চেয়ে কম্পিউটারের শরণাপন্ন হওয়াই বোধহয় ভাল।

গুড আইডিয়া। কম্পিউটার অবশ্য কোনও মুখশ্রী দেখাবে না। তবু ইট মে হেলপ টু রিমেমবার।

টেবিলের একধারে রাখা মনিটরটা চালু করে কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে দেখল মিঠু। তারপর বলল, পিনাকী শর্মার অ্যাকাউন্ট থেকে রেগুলার উইথড্রয়াল হয়েছে।

অ্যামাউন্টটা?

প্রতি মাসে তিন হাজার।

সেলফ চেক?

হ্যাঁ, উনি আমেরিকায় যাওয়ার আগে একটা বড় উইথড্রয়াল দেখছি।

কত?

ছত্রিশ হাজার।

কী মনে হয়?

বুঝতে পারছি না।

টাকাটা উনি কাকে দিতেন?

আপনি যা সাজেস্ট করছেন তা মেনে নিতে পারলে ভাল হত হয়তো। কিন্তু—

মনে পড়ছে না তো?

না।

তা হলে আমি একটু সাজিয়ে দিই। বিয়িং এ উইডোয়ার উনি একটা শুকনো জীবন কাটাতেন। মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে বলে এবং সৎ মায়ের ভয়ে বিয়েও করেননি। কিন্তু লাইফ হ্যাজ ইটস ডিম্যান্ড। সুতরাং একটু বেশি বয়সে, ধরুন লেট ফর্টিজ-এ উনি একজন কাউকে পিক আপ করেন। তাকে কখনও নিজের বাড়িতে জায়গা দেননি। কিন্তু রেগুলার তাকে ভিজিট করতেন। মাসে মাসে তাকে মাসোহারা দিতে হত। পিনাকী শর্মা নামটাই হয়তো মেয়েটাকে বলেছেন। মেয়েটাও এক জায়গায় নিজেকে জুলেখা শর্মা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

এরকম হতেই পারে।

খুব নির্দোষ ব্যাপার বলছেন?

তা বলিনি। তবে সারকামস্ট্যান্সেস মে কমপেল এ ম্যান—

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক কথা। চেকগুলো কি সবই সেলফ চেক?

দেখতে হবে।

দেখুন। তবে তাড়া নেই। মেয়েটাকে খুঁজে বের করাই এখন প্রথম কাজ।

**

হরেনবাবু, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

যে আজ্ঞে। বলুন।

আপনি কতদিন বরুণবাবুর বাড়িতে কাজ করছেন?

তা পনেরো-ষোলো বছর হবে।

যখন আপনি কাজে ঢোকেন তখন তো বরুণবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই।

আজ্ঞে না। তার কয়েক বছর আগেই মারা যান।

একটা কথার জবাব ভেবেচিন্তে দিন। বরুণবাবুর চরিত্র কেমন ছিল?

আজ্ঞে, ভালই। চমৎকার মানুষ ছিলেন।

কিন্তু আমরা জানি গত কয়েক বছর হল বরুণবাবুর সঙ্গে একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। মেয়েটিকে আপনি কখনও দেখেছেন?

আজ্ঞে না।

আরও স্পষ্ট করে বলি, মেয়েটিকে বরুণবাবু এ বাড়িতে কখনও আনতেন না। হয়তো নিজের আসল পরিচয়ও দেননি। কিন্তু তিনি মেয়েটির কাছে যেতেন। আপনার কি মনে পড়ে গত কয়েক বছর যাবৎ বরুণবাবু মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটাতেন কি না।

তা কাটাতেন।

গত ক’বছর ধরে?

হিসেব করিনি। সাত-আট বছর ধরে হবে।

এবার খুব হিসেব করে জবাব দেবেন। মেয়েটি ছোটখাটো চেহারার, মাজা রং, ছিপছিপে, কিন্তু রুগণ নয়। মেয়েটি কখনও রীতা দাস, কখনও জুলেখা শর্মা নামে পরিচয় দেয়।

নাম জানি না, তবে আপনি যেমন বলছেন তেমন একটা মেয়ে বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিল।

কবে?

বাবু আমেরিকা যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। দিদিমণি চলে যাওয়ার পর এ বাড়িতে মেয়েছেলে বড় একটা আসে না। তাই এ মেয়েটিকে দেখে একটু ধন্দ লেগেছিল।

কেন এসেছিল?

তা জানি না। বাবুর খোঁজ করাতে আমি তাকে ঘরে বসিয়ে বাবুকে খবর দিই।

ওঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল জানেন?

না। তবে বাবু যে মেয়েটিকে দেখে রেগে গিয়েছিলেন তা দূর থেকেও চেঁচামেচি শুনে বুঝেছি। বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটার সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলেও ছিল।

ছেলে! কত বড় ছেলে?

চার-পাঁচ বছর হবে।

বরুণবাবু চেঁচিয়ে কী বলেছিলেন মেয়েটাকে?

একটা-দুটো কথা শুনেছি। একবার বললেন, এখানে আসার দরকার ছিল না। আর একবার যেন বললেন, টাকা কি গাছে ধরে?

আর কিছু শোনেননি?

না।

মেয়েটাকে আর কখনও দেখেছেন?

হ্যাঁ।

কবে এবং কোথায়?

দিদিমণি যেদিন খুন হন তার দুদিন আগে।

কোথায়?

ফটকের বাইরে।

কী করছিল?

চেয়ে ছিল। আমি বাজারে বেরোনোর সময়ে মুখোমুখি পড়ে যাই। কী চায় জিজ্ঞেস করায় বলল, কাজ খুঁজছে। আগে একবার দেখেছিলাম, তাই চেনা চেনা ঠেকছিল।

সঙ্গে ছেলেটা ছিল?

না।

কীরকম কাজ খুঁজছে বলল?

সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল গভর্নেন্স বা আয়া। আমি বললাম এখানে হবে না। তখন চলে গেল। চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল যে এই মেয়েটাই বাবুর কাছে একবার এসেছিল।

এ বাড়িতে সে ঢোকেনি, ঠিক জানেন?

না।

মিতালিদেবীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি?

আমার তো চোখে পড়েনি। তবে আমাকে তো বাজারহাট রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। নয়নের মা বলতে পারবে হয়তো।

সে কে?

কাজের মেয়ে। ডেকে দিচ্ছি।

নয়নের মা রোগা, কালো, মধ্যবয়স্কা। খুব পান খায়। সব শুনেটুনে বলল, এসেছিল।

কবে?

ওই সব্বোনেশে ব্যাপার যেদিন হয় তার আগের দিন দুপুরে। দিদিমণি তাকে দুর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

কোনও ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

না। মেয়েটা নীচের ঘরে বসেছিল। দিদিমণি নেমে এসে দেখা করলেন। দু'-চারটে কথার পরই ওপর থেকে শুনলাম দিদিমণি চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও!

আপনি চেঁচামেচি শুনে নেমে এলেন না।

না। ঝাড়পোঁছ করছিলাম। ভাবলাম সাহায্যটাহায্য চাইতে এসেছে। কত লোকই তো আসে।

দিদিমণি কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

না। একটু থমথমে মুখ করে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গেল।

আর কিছু মনে পড়ছে?

না।

মেয়েটা ধমক খেয়ে উলটে কিছু বলেছিল?

না। আমি দোতলা থেকে দেখলাম গটগট করে বেরিয়ে গেল।

পোশাকটা মনে আছে?

সাদা চুড়িদার।

**

আই অ্যাম ডিস্টার্লিং ইউ। কিন্তু কেসটা সিরিয়াস। কাজেই–

ইটস ওকে অফিসার। হাউ ক্যান উই হেলপ ইউ?

আমি একটি ছেলের সন্ধান করছি। এখন তার বয়স হবে ছয়-সাত। নাম জানি না। কিন্তু পদবিটা শর্মা হলেও হতে পারে। বাবার নামও জানি না। তবে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যে, বাবার নাম পিনাকী শর্মা। আপনাদের রেকর্ডটা কনসাল্ট করবেন?

নো প্রবলেম। আপনি বসুন, আমি আসছি।

হেড মিস্ট্রেস উঠে গেলেন। শবর বসে রইল। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। তবু লেগেও যায় অনেক সময়ে। মেরিজ স্কুল নামটা যখন জুলেখার মুখে এসেছে তখন হলেও হতে পারে, ওর ছেলে এই স্কুলে পড়ে।

হেড মিস্ট্রেস পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। মুখে একটু উদ্বেগ।

ইয়েস অফিসার, ক্লাস টু-তে দু’জন শর্মা আছে। টুইন ব্রাদার্স। কিন্তু ওদের বাবার নাম সুজিত শর্মা, এ মার্চেন্ট। মিস্টার শর্মা পেরেন্টস মিটিং-এ আসেন, আমরা তাঁকে চিনি।

শবর মাথা নেড়ে বলল, না, এরা নয়।

দেন উই আর সরি।

শবর উঠতে যাচ্ছিল। তারপর মাথায় বজ্রাঘাতের মতো একটা কিছু চমকে গেল তার। কী বোকা সে!

ম্যাডাম।

ইয়েস অফিসার।

আই অ্যাম মেকিং এ মেস অফ থিংস। কিন্তু দয়া করে আমাকে আর একটা ইনফর্মেশন দিন।

বলুন।

ছেলেটার পদবি সম্ভবত ঘোষ। বাবার নাম বরুণ ঘোষ।

নিশ্চয়ই। বসুন, আমি চেক করে আসছি।

পনেরো মিনিট যেন পনেরো ঘণ্টার মতো কাটল। হেড মিস্ট্রেস ফিরে এলেন।

ইয়েস অফিসার। হি ইজ ইন ক্লাস টু। প্রীতীশ ঘোষ। বাবা বরুণ ঘোষ, মা দোয়েল ঘোষ। ঠিকানা টুয়েন্টি এ বাই সিক্স হরিশ চ্যাটার্জি বাই লেন।

শবর চিরকুটটা পকেটে রেখে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।

ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

**

দরজা খুলল সেই মেয়েটাই। তাকে দেখে একটুও চমকাল না। চোখে চোখ রেখে একটু চেয়ে রইল। তারপর দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, আসুন।

চিনতে পারছেন?

পারছি। জানতাম আপনি আসবেন।

গলির মধ্যে একটা পুরনো বাড়ির একতলার ছোট্ট বাসা। ভিতরটা অপরিচ্ছন্ন নয়। বরং বেশ তকতকে ঝকঝকে। একটা ডিভান আছে, দুটো বেতের চেয়ার,

কারে শোকেসের ওপর একটা রঙিন টিভিও পাশে ভিসিআর। এটা স্পষ্টতই বাইরের ঘর। ভিতরে একখানা শোয়ার ঘরও আছে। শবর বেতের চেয়ারটায় বসল।

জুলেখা পরদা সরিয়ে ভিতরে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

বসুন। কথা আছে।

জুলেখা ওরফে রীতা ওরফে দোয়েল ডিভানটায় বসল। একটু জড়সড়।

আপনার আসল নামটা কী?

দোয়েল।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় কবে হয়েছিল?

প্রায় নয় বছর আগে। উনি নার্সিং হোমে ভরতি হয়েছিলেন একটা চেক আপের জন্য। ব্রঙ্কিয়াল কারসিনোমা সাসপেক্টেড। খুব অসুস্থ ছিলেন। আমি তখন ওখানে আয়া ছিলাম।

তখনই ঘনিষ্ঠতা হয়?

হ্যাঁ। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আমিও ওকে।

অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট?

তখন আমার বয়স চব্বিশটব্বিশ। ওঁর মিড ফর্টিজ। উইডোয়ার। উই ফেল্ট ফর ইচ আদার।

তারপর?

উনি ভাল হয়ে গেলেন। ক্যান্সার হয়নি।

তখন ওঁর মেয়ের বিয়ে কি হয়ে গেছে?

অসুখের পরই মেয়ের বিয়ে হয়, ডিভোর্স হয়, মেয়ে চলে যায় আমেরিকায়। তখন ভীষণ লোনলি। আমাকে ওঁর খুব দরকার হত।

বন্দোবস্তটা কীরকম ছিল?

উনি এ বাড়ির এই অংশটা লিজ নিয়েছিলেন আমার নামে। দশ বছরের লিজ। মাসে মাসে দু'হাজার টাকা মাসোহারা দিতেন।

এখানেই আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ হত?

হ্যাঁ।

এর আগে আপনি কোথায় থাকতেন?

আমার মায়ের সঙ্গে, মোমিনপুরে।

আপনার মা এখনও সেখানে আছেন?

না। মারা গেছেন।

সেই বাড়িটা?

ওটা ভাড়া বাড়ি। আমার দাদা থাকে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

আপনি ইংরিজি বলা কোথায় শিখলেন?

স্কুলে। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল। বাবা চাকরি করতেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। তিনি মারা যাওয়ার পর আমরা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়ি। পড়াশুনো ছাড়তে হয়, চাকরি নিতে হয়। তাও আয়ার চাকরি এবং ক্যাজুয়াল। দাদা বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। তারও অবশ্য অবস্থা খারাপ ছিল।

বরুণবাবুকে আপনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

বহুবার।

বিয়ে হল না কেন?

উনি লোকনিন্দার ভয় পেতেন। একবার রাজি হতেন, আবার নানা টালবাহানা করে পিছিয়ে যেতেন।

বিয়ে না করেই সন্তান হল?

হ্যাঁ। উনি অ্যাবরশন করাতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। ভেবেছিলাম বাচ্চা হলে হয়তো বিয়েতে রাজি করাতে পারব।

উনি রাজি হননি?

না। ওই তো বললাম, খুব দোনোমোনো করতেন। আমি ওঁর ছেলের মা, আমি ভীষণ ইনসিকিউরিটি ফিল করতাম।

উনি টাকাপয়সা দিয়ে কমপেনসেট করতে পারতেন তো!

টাকাপয়সার ব্যাপারে উনি খুব উদার ছিলেন না। উনি যা দিতেন তাতে চলত না। ছেলে হওয়ার পর খরচ তো বেড়েছিল। বিয়ের জন্য চাপ দিতাম বলে উনি ক্রমে ক্রমে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন।

আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। উনি কি ছেলেকে ভালবাসতেন?

বাবা যেমন ছেলেকে ভালবাসে তেমন নয়। তবে বোধহয় মায়া একটু ছিল। আদরটাদর করতেন।

তারপর কী হল?

উনি মেয়ের কাছে আমেরিকা গেলেন। এক বছরের জন্য। আমাকে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছেলের স্কুলের বেতনই মাসে দেড়শো টাকা। আরও খরচ আছে। আমি ফের আয়ার চাকরি শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাজার খারাপ। আয় সামান্যই হত।

আপনি কি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করতেন?

ব্ল্যাকমেল। না। কথাটা তখন মাথায় আসেনি।

উনি একটা ডায়েরিতে ব্ল্যাকমেল করার কথা লিখে গেছেন। অবশ্য তাতে আপনার নাম নেই।

ব্ল্যাকমেল নয়। তবে উনি আমেরিকা যাওয়ার অনেকদিন আগে থেকেই আমার কাছে আসা বন্ধ করেছিলেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম উনি হয়তো আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। বাধ্য হয়ে আমি ওঁর কাছে যাই। ওঁর বাড়িতে যাওয়া বারণ ছিল আমার। বাধ্য না হলে যেতাম না। আমার একার জন্য তো নয়, ছেলেটাকে তো দেখতে হবে। উনি আমাকে দেখে খুব রেগে যান। আমি টাকাপয়সার কথা বলাতে উনি বলেন, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ? এটা কি ব্ল্যাকমেল, আপনিই বলুন তো!

না। তারপর বলুন।

শেষ অবধি উনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

তারপর?

উনি আমেরিকা চলে যাওয়ার পর আর যোগাযোগ ছিল না। উনি আমাকে চিঠি লিখতেন কখনও। আমার তো লেখা বারণই ছিল। এক বছর বাদে উনি ফিরে আসার পর আমার সঙ্গে দেখা করেন। দেখলাম খুব নরম হয়ে পড়েছেন। আমার প্রতি যেন একটা টানও হয়েছে। সেই দুর্বলতার সুযোগে আমি ফের বিয়ের কথা তুললাম। উনি নিমরাজি ছিলেন। তবে চিন্তা ছিল বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। বিয়ে করলে প্রীতীশ ওঁর সম্পত্তির মস্ত ভাগীদার হয়ে দাঁড়াবে। সেটা উনি যেন খুব একটা পছন্দ করছিলেন না। তবে শেষ অবধি রাজি হয়েছিলেন। এমনকী ওঁর কথামতো আমি একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে নিয়মকানুন জেনে আসি। কিন্তু উনি হঠাৎ করে মারা যাওয়ায় সব ভেস্তে যায়।

মিতালিদেবীর সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন কি এসব কথা জানানোর জন্য?

হ্যাঁ। আর এক বছর পর এই বাড়ির লিজ শেষ হয়ে যাবে। আমার মাসোহারা বন্ধ। চাকরি থেকে হাতে টাকাপয়সা আসছে না। আমি কী করতে পারি বলুন তো! আমার ছেলে অবৈধ সন্তান আমি জানি, কিন্তু ধর্মত ওঁরই সন্তান। ও কেন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবে? সেইজন্য আমি প্রথমে ওঁকে টেলিফোনে সব খুলে

বলার চেষ্টা করি। উনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমাকে উলটে গালাগাল করেন।

আপনি কলগার্লের জীবিকা কবে থেকে বেছে নেন?

মাথা নিচু করে একটু চুপ করে থেকে দোয়েল মাথা তুলে বলল, উনি আমেরিকা যাওয়ার প্রায় সাত আট মাস পরে। কলগার্ল নয়। আমি নার্সিং হোম থেকেই একজন মধ্যবয়স্ক পেশেন্টের সঙ্গে তার বাড়ি যাই। সেখানেই শুরু। তবে ইচ্ছে হত না। বাধ্য হয়েই

সমীরণ বা পান্টুর কেসগুলো কী?

পাটুর সঙ্গে এক রাত্রি ছিলাম। ফর অ্যাকসেস টু দ্যাট হাউস।

কী চেয়েছিলেন?

শেষবার চেষ্টা করেছিলাম মিতালির কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে। ও আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তখন ঠিক করি, চুরি করব।

চুরির পক্ষে কি পার্টির দিনটাই প্রশস্ত ছিল?

হ্যাঁ। অনেক লোকের ভিড়ে আমি ঢুকে যেতে পারব বলে বিশ্বাস ছিল।

পান্টু যে মিতালির প্রাক্তন প্রেমিক, জানতেন?

জানতাম। বরুণবাবুর কাছে সব শুনেছি।

সমীরণের সঙ্গে কীভাবে এবং কেন জুটে গিয়েছিলেন?

ক্ষণিকা–অর্থাৎ ওর গার্লফ্রেন্ডকে আমি অনেকদিন চিনি। কিছুদিন ওর বাচ্চার বেবি সিটিংও করেছি। ওই সময়ে আমি ওদের বাড়িতে ওর বাচ্চা রাখছিলাম। ক্ষণিকা সমীরণের ওপর রাগ করে চলে আসায় আমি ঠিক করি সমীরণের সঙ্গে থাকব। তাতে খানিকটা ইনফর্মড থাকা যাবে।

এবার আসল কথায় আসুন দোয়েলদেবী।

দোয়েল এই প্রথম একটু হাসল। হাসলে মুখখানা ভারী সুন্দর দেখায়, লক্ষ করল শবর।

পার্টির রাতে আমি দোতলায় উঠি।

কীভাবে?

পিছনের বাগান দিয়ে। খুব সোজা।

বলুন।

দোতলার ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজে হ্যান্ডব্যাগটা পেয়ে যাই।

রাত তখন কটা?

সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে।

খুব রিস্ক ছিল না? ছিল।

তারপর?

দশ হাজার ডলার ছিল। টাকাটা আর দুটো গয়না সরিয়ে ফেলি।

কিন্তু–

জানি আপনি কী শুনতে চান। কিন্তু আপনাকে হতাশ হতে হবে। রাত দশটার পর আর আমি ও বাড়িতে ছিলাম না। খুনটা আমি করিনি মিস্টার দাশগুপ্ত।

শবর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দোয়েলের দিকে।

দোয়েল চোখ সরাল না, সমানে সমানে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি আমার ছেলের স্বার্থে ওই অপরাধটুকু করেছি। চুরি বললে চুরি। আইন আমার পক্ষে নেই। কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত আমার এবং আমার ছেলের কিছু পাওনা হয়। দশ হাজার ডলার এমন কিছু বেশিও নয়। বরুণবাবুর স্ত্রী হতে পারলে আমার পাওনা অনেক বেশি হতে পারত। আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন?

আপনার অ্যালিবাই আছে? খুনের সময়ে রাত একটা থেকে—

দুটোর মধ্যে? ও সময়ে সবাই ঘুমোয়। কে সাক্ষী দেবে বলুন।

আপনি কোথায় ছিলেন?

দোয়েল একটা শ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে আবার হার মানতে হবে। কারণ আমার ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে।

কীরকম?

সেই দিন দশ হাজার ডলার পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। ফিরে এসে আমি পাশের ফ্ল্যাটের বউদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি। ওরা মাঝে মাঝে আমার ফ্ল্যাটে ভিসিআর-এ ছবি দেখতে আসে। সেই রাতে ওদের পুরো পরিবার আর আমি এই ঘরে বসে রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটে অবধি দুটো বাংলা আর একটা হিন্দি সিনেমা দেখেছি। আপনি খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আরও বলি, পাড়ার আরও দুটো মেয়েও সেই রাতে আমার ঘরে বসে ছবি দেখেছে। কোয়াইট এ ক্রাউড।

শবর মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি।

চুরির জন্য আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, কিন্তু খুনের জন্য নয়। খুনিকে আপনার আরও একটু খুঁজতে হবে।

আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না।

তা হলে?

আমি আপনার সঙ্গে একটা বাণিজ্য করতে চাই। সিম্পল বার্টার।

কী বলুন?

লিভ এ ক্লিন লাইফ। যা করেছেন করেছেন, আর নয়।

দোয়েলের চোখ ভিজে গেল, কে নোংরা জীবন কাটাতে চায় বলুন! যা করেছি ছেলের স্বার্থে, মা হয়ে। ছেলের জন্য মা সব পারে। পারে না বলুন। তবে আর নয়,

কথা দিচ্ছি।

এবার আরও একটু কথা আছে। হয়তো আপনিই পারেন ধাঁধাটা কাটাতে।

০৮. সে পালাতে পারবে না

সে পালাতে পারবে না, জানত। তবু দৌড়োচ্ছিল, প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিল গলি থেকে গলিতে। আরও গলিতে। এসব অলিগলি তার মুখস্থ, হাতের তেলোর মতো চেনা। কোনদিক দিয়ে বেরোতে হবে, সে জানে। পিছনে এক জোড়া, মাত্র এক জোড়া পা-ই দৌড়ে আসছে। শবর দাশগুপ্ত। লালবাজারের টিকটিকি। ওর কাছে পিস্তল আছে। ইচ্ছে করলেই চার্জ করতে পারে। করছে না। পিস্তল তার কাছেও আছে। ইচ্ছে করলে সেও চার্জ করতে পারে। করছে না। করে লাভ নেই।

তবু সে দৌড়োচ্ছ কেন? পালাচ্ছে? না, সে পালাতে চাইলে পারবে। কিন্তু তা নয়। সে দৌড়োচ্ছে নিজের হাত থেকে, নিজেকে ছাড়াতে। না, ঠিক বোঝা যাবে না। কেউ বুঝবে না। এই অবোধ্য জীবন তার কত কী কেড়ে নিয়েছে। তার কত কী চলে গেছে ভেসে সময়ের জলে।

সামনে ডানহাতে একটা কানা গলি। সে ডানদিকেই ফিরল। দৌড়োতে লাগল। তারপর সোজা গিয়ে ঠেকল দেয়ালটায়। থামল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। দেয়ালে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। শুনশান গলি। দুরে গলির মুখ। সেখানে শবর দাশগুপ্ত এসে দাঁড়াল। না, পিস্তলে হাত দেয়নি। দূর থেকে তাকে দেখল। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে আসতে লাগল তার দিকে। দুপুরের রোদ খাড়া হয়ে পড়েছে। শবরকে দেখাচ্ছে। ছোটখাটো, পায়ের নীচে বেঁটে ছায়া।

সেও পিস্তলে হাত দিল না। ফালতু। এখন আর এসব করে লাভ কী!

শবর সামনে এসে দাঁড়াল, পালালে কেন?

পালালে কি ধরতে পারতেন?

খামোখা এতটা দৌড়োনোর মানে হয় না।

হয়। এত সহজে ধরবেন, একটু গা ঘামাবেন না, তা কি হয়?

শবর একটু হাসল, সহজে ধরেছি কে বলল? অনেক চক্কর খেতে হয়েছে।

একটা কাজ করলেন, আপনার মতে ভাল কাজ, পরিশ্রম তো সার্থক।

তুমি তো বেশ কথা বলো!

পিস্তলটা চাইলেন না?

না। তুমি আমাকে গুলি করবে না, জানি।

কেন করব না?

তুমি বুদ্ধিমান বলে। আমাকে মারা যায়, কিন্তু সিস্টেমকে কি মারতে পারবে? অতীতকে মারতে পারবে? যা ঘটে গেছে তাকে মারতে পারবে?

না।

তাই চাইনি। আমি হিরো নই, লজিক্যাল।

আপনিও বেশ কথা বলেন!

শবর একটু হাসল। মৃদু স্বরে বলল, মেয়েটাকে মারলে কেন?

মেয়েটার মরাটা দেখলেন, আমার মরাটা লক্ষ করলেন না?

শবর ম্লান একটু হাসল, তাও দেখছি।

আমি কবে মরে গেছি জানেন? আরও দশ বছর আগে।

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আপনি কি বিশ্বাস করেন স্যার,আমি পালাচ্ছিলাম?

না। পালাতে চাইলে তুমি এই কানাগলিতে ঢুকতে না। কিন্তু তুমি পালালে আমি খুশি হতাম।

সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে শবরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কিছুক্ষণ সময় লাগল সামাল দিতে। তারপর মুখের ঢাকা খুলে তার তীব্র চোখদুখানা শবরের চোখে স্থাপন করে বলল, লোকে জানে, আমি মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছিলাম, লোকে জানে আমি ওকে নষ্ট করেছি। পুলিশ আমাকে এমন মারল, যে, একটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেল। অপটিক নার্ভ জখম হয়ে আমার বাঁ চোখ হয়ে গেল কমজোরি, ভবিষ্যতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ও থেকে গেল। আমার সেক্সয়াল আর্জ চলে গেল। তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি হল, আমার পড়াশুনার। আমার ক্যারিয়ারের। মায়ের কাছে আমার মার্কশিট আছে স্যার। দেখে নেবেন।

দেখতে হবে না। বোর্ডে গিয়ে তোমার মার্কশিটের রেকর্ড আমি চেক করেছি।

স্তিমিত চোখে চেয়ে বলল, কী হল স্যার? বস্তিতে থাকি, গরিবের ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলাম, আমার সামনে ব্রাইট ফিউচার খুলে গিয়েছিল। কিন্তু কী হল স্যার? কী হল বলুন। এই মার্কশিট ধুয়ে কি জল খাব?

তুমি তখন মস্তানি করতে?

মস্তানি কি খারাপ স্যার, যদি তার পিছনে মর্যালিটি থাকে? ব্যায়াম করতাম, খেলাধুলোয় ভাল ছিলাম, গায়ে জোর ছিল, বুকে সাহস ছিল, তাই পাড়া শাসন করে বেড়াতাম। লোকাল থানায় খোঁজ নেবেন স্যার, আমার তখনকার লাইফে কোনও খারাপ রেকর্ড নেই। কোনও চুরি, ছিনতাই, দু'নম্বরি করিনি। কিন্তু বস্তির ছেলে তো, বুক ফুলিয়ে বেড়াতাম বলে ভদ্রলোকরা ভয় পেত। বলত, মস্তান।

মেয়েটার কথা বলো।

মিতালির কথা তো আপনিও জানেন স্যার। বড়লোকের মেয়ে, মাথাটা খাওয়াই ছিল। আমাকে লাইন দেওয়া শুরু করেছিল কবে থেকে, তখন ফ্রক পরত। চিঠি চালাচালি করত, ইশারা ইঙ্গিত করত। তারপর সিনেমায়টিনেমায় নিয়ে গেছি। গরম মেয়ে স্যার। বলতে লাগল, আমাকে নিয়ে পালাও। তখন আমি সায়েন্স নিয়ে কলেজে পড়ছি। ভাল রেজাল্ট করতে হবে বলে খাটছি, অন্যদিকে আমার মাথা খাচ্ছে মিতালি। ওই বয়স তখন আমার, ফাস্ট লাভ। সুন্দরী মেয়ে। বাপ বড়লোক। সব জেনেবুঝেও বয়সের দোষে ঝুলে পড়লাম। পড়া গেল, ক্যারিয়ার গেল। লোকে বলে, আমি ওকে নষ্ট করেছি। লোকে দেখল না, ও আমাকে কতটা

নষ্ট করেছিল। বড়লোকের তো দোষ হয় না। মিতালি ফিরে গেল, বাপের কাছে, ক্ষমা হয়ে গেল, পড়াশুনো করতে লাগল, বিয়ে হল, আমেরিকা গেল। এমনকী অত ভাল পাত্র মিঠু মিত্তিরকে ডিভোর্স করার মতো আস্পর্ধাও দেখাল। মিতালির কি কিছু লস হল স্যার? কিছু না। জীবনটা টালও খেল না, ক্যারিয়ার বিল্ড আপটা দেখুন স্যার। আর অন্য দিকে আমাকেও দেখুন। জীবনটা শুরু করেছিলাম কী দুর্দান্ত। গরিব ঘরের ছেলে, প্রাইভেট মাস্টার দূরের কথা বইপত্তরই জোগাড় হয় না। পুষ্টিকর খাবার নেই। পড়াশুনোর জায়গা জুটত না। তবু ওরকম রেজাল্ট। কত কী করতে পারতাম স্যার। বাপ-মা কত স্বপ্ন দেখত আমাকে নিয়ে। পুরো ধস নেমে গেল। মিতালির দোষ কেউ দেখল না, দেখলেও চোখ ফিরিয়ে নিল। আর আমাকে? প্রথম অপমান আর তাচ্ছিল্য করে গেল মিতালি। তারপর পুলিশ তুলে নিল। তারপর আপনি সব জানেন…

জানি।

আজ আমি পালাব কেন স্যার? পালিয়ে কোথায় যাব? আমার হারানোর কিছু নেই। জিজ্ঞেস করছিলেন মেয়েটাকে মারলাম কেন? আপনি বুদ্ধিমান, কেন মারলাম তা কি বোঝেননি? হাসপাতালে পুরো দু'মাস থাকতে হয়েছিল। হাজতে চার মাস। পুলিশ কেস দিলে আরও কতদিন মেয়াদ হত কে জানে। বরুণ ঘোষ বেশি চাপাচাপি করেনি পাবলিসিটির ভয়ে। তাই ছেড়ে দিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে কী হল স্যার? পাড়ায় সবাই দুয়ো দিত। পড়াশুনোর আর্জ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। তার ওপর শরীর। বাইরে থেকে ভিতরের ভাঙচুর দেখতে পাবেন না স্যার। বলছিলাম না, মিতালি মরল সেদিন, আমি মারা গেছি অনেক আগে। কিন্তু একটা হিসেব তো মেটাতে হবে। ডিভভার্সের পর একদিন মিঠু মিত্তির আমাকে পিটিয়েছিল, আগেই বলেছি স্যার। বলিনি?

বলেছ। কিন্তু মিঠু মিত্তির টের পেয়েছিল সে একটা মরা মানুষকে পেটাচ্ছে। তাই মিঠু মিত্তির আমার সঙ্গে ভাব করে নেয়। শুধু তাই নয়, আমার সব কথা শুনে দয়া করে নিজের রিস্কে ট্যাক্সির লোন বের করে দেয়। নিজের পকেট থেকে টাকাও দিত সময়ে সময়ে। আমরা দোস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। মিঠু মিত্তিরকে কী করেছিল স্যার আপনাদের সুন্দরী বড়লোক মিলি? মিঠু মিত্তিরের দোষটা কী ছিল বলবেন? তার জীবনটাও বরবাদ করে যায়নি কি ওই…যাক স্যার, আজ খারাপ কথা বলব না।

স্থির, অপলক, করুণ দু'খানা চোখে চেয়ে রইল শবর। কিছু বলল না।

হিসেবটা মেটানোর ছিল স্যার। আমার যে জীবনটা মিতালি কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য ছিল মিতালির? ছিল না স্যার। আমি বহু বছর ধরে তার দেশে ফেরার জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করেছি।

তুমি হয়তো জানো না, মিতালিও খুব হ্যাপি ছিল না।

মিলি হ্যাপি ছিল কি না তা জেনে আমার কী হবে স্যার? আমার একটা কিডনি নেই। আপনি জানেন না আমার সেক্স আর্জ চলে গেছে। পুরুষের পক্ষে কত যন্ত্রণার ব্যাপার বলুন, বিছানায় মেয়েমানুষ, সে কিছু করতে পারছে না। পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে পুরুষত্বহীনতায়। এই নষ্ট জীবন নিয়ে বেঁচে আছি কি মিতালিকে হ্যাপি দেখতে স্যার? আমি তো মহাপুরুষ নই। আপনাকে রীতা দাসের কথা বলেছি। যদি কখনও তাকে পান জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে বলবে কীভাবে সেক্সয়াল আর্জের অভাবে আমি মাথা কুটেছি আর কেঁদেছি।

সে বলেছে।

বলেছে? যাক বাঁচা গেল। আপনি তা হলে আমার জ্বালাটা একটু বুঝবেন। পার্টির দিন যখন ওরা ফুর্তি মারছিল তখন আমি মরুভূমি বুকে নিয়ে দুর থেকে ওদের ঘরে আলোর রোশনাই দেখেছি। মাতালের হল্লা শুনেছি। আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম স্যার। সেই রাতে আমি মাতাল হইনি।

জানি। বলো।

রাত সাড়ে বারোটায় আমি দোতলায় উঠি। পিছন দিক দিয়ে। ঘরে ঢুকি। মিতালি তখন মাতাল। জামাকাপড় খোলার চেষ্টা করছে। দু'বার মেরেছিলাম। একটা আমার জন্য। আর

একটা মিঠু মিত্তিরের জন্য।

শবর হঠাৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, এবার পিস্তলটা আমাকে দাও পান্টু।

পান্টু একটু হাসল, সুইসাইড করব বলে ভয় পাচ্ছেন স্যার? আরে না। এখন সুইসাইড করে লাভ কী বলুন? আপনারও বদনাম হবে। লোকে বলবে শবর দাশগুপ্ত নিজেই পান্টুকে মেরে সুইসাইড কেস সাজিয়েছে। মরে আর কী হবে? মরা লোক কি দোবারা মরে স্যার? তবে জজসাহেবকে বলবেন, ওসব

যাবজ্জীবনটিবন আমার ভাল লাগে না। ফালতু চৌদ্দ বছর শুয়ে বসে থাকা। তার চেয়ে ঝটপট ট্রায়ালটা মিটিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন যেন। বলবেন স্যার?

শবর একটু হাসল।

অ্যারেস্ট করবেন না স্যার?

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পালাতে পারতে। কেন যে পালালে না!

বললাম তো স্যার, কোথায় পালাব? কার কাছ থেকে পালাব? আমার ফিলজফিটা আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার?

পারছি। পান্টু অধিকারী, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

.

এটাই কি সেই দীর্ঘ চুমু?

না। এটা অন্য। আর একরকম। অনেক বিষণ্ন, অনেক গভীর।

জানি। আজ তো তুমি আর সেই তুমি নও। আজ তুমি অনেক বিষণ্ন, কত গম্ভীর।

আজ আমি অনেক গভীরও। তাই না?

আমরা কি সুখী হব, বলো না!

কে জানে! কেউ তা বলতে পারে না।

আমরা কোনওদিন তেমন সুখী হতে পারব না বোধহয়! হ্যাগো, একটা কথা বললে তুমি কি রাগ করবে?

রাগ! ফুলশয্যার রাতে? তাও কি হয়?

শোনো, আমরা কেন সব ওদের দিয়ে দিই না?

মিঠু নিবিড়ভাবে জয়িতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখে মিটিমিটি হাসি। মৃদু স্বরে বলল, কাকে দেবে? কী দেবে?

দোয়েল তো আসলে জ্যাঠামশাইয়ের বউই, বলো? প্রীতীশ তো ছেলে। হ্যাগো, কেন ওদেরই সব দিয়ে দিই না আমরা?

জানতাম।

কী জানতে?

তুমি যে এই কথা বলবে।

তুমি বুঝি অন্তর্যামী?

হ্যাঁ। ভালবাসলে মনের কথা টের পাওয়া যায়, জানো না?

আমিও তোমার মনের কথা টের পাই।

কীরকম?

তুমিও চাও। তাই না? তুমিও চাও ওরা সব নিয়ে নিক।

চাই। কিন্তু আস্তে আস্তে। একবারে অত সম্পত্তি হাতে পেলে ওরা দিশাহারা হয়ে যাবে। লোকে ওদের এক্সপ্লয়েট করবে। ছেলেটা আদরে নষ্ট হবে। ধীরে, বন্ধু ধীরে।

আমি বোকা নই তো!

না। তুমি খুব ভাল।

তুমিও। আমরা কি সুখী হব? বলল না!

সুখ চাও? সুখ মানুষকে অলস করে দেয়, ভোঁতা করে দেয়, সুখ থেকে মেদবৃদ্ধি হয়। আমরা সুখ চাইব কেন?

তা হলে?

একটু সুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু দুঃখ মিশিয়ে দেওয়া যাবে। ককটেল। ব্যালান্স।

আমি জানি পান্টুর জন্য তোমার মন ভাল নেই। মিতালিদির জন্য তোমার মন ভাল নেই। দোয়েলের জন্য তোমার মন ভাল নেই। আমি কী করে তোমাকে ভোলাব বলো তো! পারব?

না জয়িতা, ভোলানোর দরকার নেই। এ সবই আমাদের চেতনায় নাড়া দেবে। আমাদের তাকাতে শেখাবে নিজেদের দিকে। দুঃখকে কি তুমি ভয় পাও?

তুমি কাছে থাকলে কিছুকেই ভয় পাই না।

ঠোঁটটা বাড়িয়ে দিল জয়িতা।

মিঠু হেসে বলল, দীর্ঘ চুমু? না। পৃথিবীর দীর্ঘ দীর্ঘতম চুমু–

কাপুরুষ

০১. ওই চলেছে দুঃখী দেবীলাল

ওই চলেছে দুঃখী দেবীলাল তার পুঁটুলিটি কাঁধে নিয়ে। ওই পুঁটুলির ভিতরে আছে কাঠকয়লার উনুন, চিমটে, ছোট্ট বড় বাটালি, সীসের ডেলা। কে আর রোজ রোজ বাসনকোসন ঝালাই করায় বাবা! সারাদিনে কয়েকটা পয়সা মাত্র আয়। দেবীলাল চলেছে মাঠের ভিতর দিয়ে। ওই মাঠে এখন অজস্র প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যেন প্রজাপতির মরশুম। দেবীলাল না মাড়িয়ে দেয় প্রজাপতির ফিনফিনে পাখনা।

কী করে যে মনের কথা টের পেল দেবীলাল কে জানে। মুখটা ফিরিয়ে বলল, আমি কখনও কারও ক্ষতি করিনি, বুঝলে খোকা! তবু ভগবান দিলেন না।

ভগবান কত কী দেন না। আবার কত কী দেনও। সে তো রোজ শোনে, তারা বড় গরিব। বড়ই গরিব। তবু ভগবান তাকে কত কী দেন। আকাশ-ভরা সোনার আলো, আকাশ-ভরা তারা, চারদিকে কত দুর দুর ছড়ানো দিগন্ত, মাঠ-ভরা প্রজাপতি, গাছে পাকা কামরাঙা, লাল ঘুড়ি, ভুলোর মতো বাধ্যের কুকুর। ভগবান না দিলে কি সে পেত তার অত ভাল মাকে!

দুঃখী দেবীলাল একটু কোলকুঁজো হয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। প্রজাপতি ঘিরে ধরেছে তাকে। দেবীলাল দেখছে না, মানুষ কত কী দেখে না! জ্যোৎস্নার রাতে যখন এই মাঠে পরিরা নেমে আসে তখন কেউ দেখতে পায় না। যখন অন্ধকার রাতে হলধর ভূত আর জলধর ভূতে এখানে লড়াই হয় তখনও কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু যখন কাদুয়া চোরকে মাঝে মাঝে বেঁধে এনে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয় তখন কত লোক দেখতে আসে। সেই অমানুষিক মার চোখ চেয়ে দেখতে পারে না সে, কিন্তু কত মানুষ হেসে হররা করে। মারের পরও কাদুয়াকে সারাদিন গোলপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। খাবার পায় না, জল পায় না। কিন্তু সন্ধেবেলা ঠিক দেখা যায়, সে পটলের দোকানের বেঞ্চে বসে দিব্যি বিড়ি ফুঁকছে।

সে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কাদুয়াদা, তোমার লাগে না?

কাদুয়া ঝা বাবুদের মোষের জন্য হাঁসুয়া দিয়ে ঘাস কাটছিল। বলল, লাগে। তবে কিনা আমার হল টাইট শরীর।

টাইট শরীর কাকে বলে তা অবশ্য স্পষ্টভাবে জানে না সে। তবে তার খুব ইচ্ছে করে সে যখন বড় হবে তখন তার শরীরটাও যেন টাইট হয়।

লম্বা একটি ঘাসের ডাঁটি বেয়ে বেয়ে একটা কালো পিঁপড়ে কেন খামোখা উঠছে কে জানে। কিন্তু বিশু খুব নিবিষ্টভাবে লক্ষ করে দৃশ্যটা আর আশ্চর্য হয়ে ভাবে, এই ছোট্ট ঘটনাটা সে ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। কেউ জানে না, কেউ টের পাচ্ছে না, কেউ দেখছে না যে, মস্ত মাঠের অগুন্তি ঘাসের উঁটির একটিতে একটা বোকা পিঁপড়ে ধীরে ধীরে উঠছে। উঠল, চারদিক বুঝি চেয়ে দেখল একটু, তারপর ফের নামতে লাগল। কী মিষ্টি, বোকা, ছোট্ট একটু ঘটনা। পিঁপড়েরা মাঝে মাঝে এমনি মিছিমিছি পরিশ্রম করে।

এইরকম কত কী ঘটে যায়, যা পৃথিবীর আর কেউ দেখে না, জানেও না। শুধু বিশু জানে। একা বিশু। কেষ্টদের বাড়ির পিছনের কচুবনে একখানা আধুলি পড়ে আছে কবে থেকে, কেউ কি জানে! বিশু কখনও পয়সা কুড়োয় না। তার দাদু বলেন, পয়সা কুড়োলে যা কুড়োবি তার দশগুণ তোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। কুড়োয় না ঠিকই, তবে মাঝে মাঝে সে গিয়ে আধুলিটাকে দেখে আসে। একটা লজ্জাবতী লতার ঝুপসি ছায়ায় পড়ে আছে। তাকে দেখলেই করুণ নয়নে চেয়ে আধুলিটা বলতে চায়, নাও না আমায়।

কেউ জানে না, নলিনী স্যারকে সাঁঝবাজার থেকে ফেরার পথে এক সন্ধেবেলা কানাওলা। ভূতে ধরেছিল। কানাওলা ধরলে কিছুতেই আর চেনা পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল, বেভুল ঘুরে ঘুরে মরতে হয়। হাটখোলার কাছে স্যার তাকে দেখে বললেন, খোকা, একখান কথা শুনবা? আমারে মনে লয় কানাওলায় ধঅরছে। আমারে তুমি চিনতে পারতাছো ত’! আমার লগে লগে গিয়া আমারে বাড়ি পর্যন্ত একটু আউগাইয়া দিবা? কাউরে কিন্তু ঘটনাটা কইয়ো না।

বলেওনি বিশু। শুধু সে জানে, আর স্যার। আর কেউ নয়।

সেদিন নিঝুম দুপুরে রুকুদিদি যখন পেয়ারাগাছের নীচে বসে গোল কাঠের ফ্রেমে একখানা কাপড় আটকে সুতোয় ডিজাইন তুলছিল তখন টেরও পায়নি তার বেণী বেয়ে বেয়ে উঠছিল একটা কাঠপিঁপড়ে। পিঁপড়েটার পেটটা লাল, আর দু'দিক কালো। কামড়ে সাংঘাতিক জ্বালা। রুকুদি বিভোর হয়ে একখানা কী সুন্দর যে লতাপাতা ফুলের ছবি তুলছিল রঙিন সুতোয়। ওই তন্ময় ভাব কাটিয়ে দিলে রুকুদি খুব চমকে যাবে। তাই বিশু পিঁপড়েটাকে আলতো চিমটিতে ধরে ফেলে দিল। আর তখনই কুটুস করে কামড়াল পিঁপড়েটা। চোখে জল এসে গিয়েছিল বিশুর। কিন্তু রুকুদি তো জানল না, কেউ তো জানল না। শুধু সে জানল, আর পিঁপড়েটা।

ভগবান কত কী দেন না মানুষকে। এই যেমন রুকুদিদির বাবাকে ভগবান একটাও ছেলে দিলেন না। দিলেন শুধুই মেয়ে। সাত-সাতটা মেয়ে। রুকুদিরা সাত বোন। রুকুদির বাবা অঘোরবাবু প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, আমার সাতটা মেয়েই ভাল, যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি স্বভাবচরিত্রে, তেমনি কাজেকর্মে, তেমনি সেবায়। কিন্তু তা বলে ওদের একটা ভাই থাকবে না? ভগবানের এটা কেমন অবিচার?

একদিন রুকুদি দুঃখ করে বিশুকে বলেছিল, আমরা জন্মে বাবার দুঃখই বাড়িয়ে দিয়েছি। কেন যে জন্মালাম!হা রে, এমন কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না যা খেলে মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে যাওয়া যায়? আমার খুব ছেলে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বিশু ভারী অবাক হয়ে বলে, এ মা! তুমি ছেলে হবে কেন? ছেলে হলে তোমাকে বিচ্ছিরি লাগবে যে! ছেলেদের যে গোঁফ-দাড়ি হয়, ছোট করে চুল ছাঁটে, আর মোটা গলায় কথা বলে!

রুকুদি হেসে ফেলেছিল, তাতে কী? তবু তো বাবা খুশি হত। আমরা সাত বোনে মিলে বাবার জন্য কত করি বল তো! সারাক্ষণ ঘিরে থাকি, বাতাস করি, ঘামাচি মেরে দিই, পিঠে সুড়সুড়ি দিই, একটুও বায়না করি না। তবু...।

জলভরা চোখ, গলায় কান্নার কাপন, রুকুদি চুপ করে যায়।

বিষণ্নতা একদম সহ্য হয় না বিশুর। চোখের জল, মুখ ভার, উদাস ভাব এসব তার দু' চোখের বিষ।

এক-এক দিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে বিশু শুনতে পায়, মাতাল হরিদাস কাঁদে। ঘুনধুনে বুকভাঙা কান্না। বিশুর দাদু মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, লিভার পচে যখন গন্ধ বেরোবে তখন বুঝবে বাবা। মাতাল হরিদাসকে এমনিতে বিশুর খুব ভাল লাগে। মোটাসোটা শান্ত মানুষ। ভীষণ ঠান্ডা, কম কথা বলে। সব সময়ে মুখে একখানা হাসি-হাসি ভাব। লোকে বলে, যখন মদ না খায় তখন হরিদাসের মতো মানুষ হয় না।

কিন্তু কাঁদে কেন হরিদাস? কীসের দুঃখ? তার তিন কুলে কেউ নেই। সে দিব্যি ধানকলে কাজ করে আর খায়-দায়। তবে দুঃখ কীসের? একদিন সকালে হরিদাস বাখারি বেঁধে নিজের ঘর মেরামত করছিল। এইসব হাতের কাজ দেখতে বিশু বড় ভালবাসে। যেখানে যা হয় সে সব গিয়ে দেখে আসে। বেড়া বাঁধা, কুয়ো খোঁড়া, চিড়ে কোটা। সব। তার দিয়ে বাখারি বাঁধতে বাঁধতে হরিদাস দেওঘরে তিলকুট খাওয়ার গল্প করছিল। তিলকুট খাওয়ার গল্পটা একটুখানি, কিন্তু হরিদাস তা এমন বাখনাই করে বলে যে, হাঁ করে শুনতে হয়। গল্প করতে বসলে হরিদাস একেবারে মেতে যায়। তখন এক ফাঁকে বিশু বলল, আচ্ছা হরিকা, তুমি মাঝে মাঝে কাঁদো কেন?

মাতাল হরিদাস কথাটা নিয়ে একটু ভাবল। তারপর খুব করুণ মুখ করে বলল, ওই তো হল মুশকিল। ছাইভস্মগুলো খেলেই যে আমার সব কষ্টের কথা মনে পড়ে।

তোমার আবার কষ্ট কীসের?

আমার নিজের কষ্টের কথা ভাবি না। দিব্যি আছি, খাইদাই ঘুরে বেড়াই। কিন্তু পেটে ওই খারাপ জিনিসগুলো ঢুকলেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। কাল রাতেই তো এক কাণ্ড। সেই যে নিতাই পোড়েলের তিন বছরের বাচ্চাটা রেলে কাটা পড়ে মরল গত বছর জষ্টি মাসে, হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে এমন কাদলুম যে বুক ভেসে গেল। অনেক মানত-টানত করে কত কষ্টে হয়েছিল বাচ্চাটা। সাতবেড়ের শিবমন্দিরে মানতের পুজো দিয়ে ফেরার পথে বোনের বাড়িতে দু’দিন থাকবে বলে এসেছিল। তা বোনের বাড়ি রেললাইনের গায়ে। নিতাই পোড়ড়ল ভগ্নিপতির সঙ্গে বেরিয়েছে, তার বউ আর বোন বসে গল্প করছে, বাচ্চারা বাইরে কোথায় খেলছে। এমন সময় ট্রেনের ঘন ঘন বাঁশি আর গেল-গেল ধর-ধর চিৎকার। মা-টা যখন পাগলের মতো ছুটে গেল তখন সব শেষ। খেলতে খেলতে কখন রেললাইনের। ধারে নুড়ি কুড়োতে চলে গিয়েছিল বাচ্চারা। বোনের বাচ্চারা

সেয়ানা, তারা রেললাইনের ধারেই মানুষ। কিন্তু নিতাইয়ের বাচ্চাটা তো তা নয়। সময়মতো সরে আসতে পারেনি। কাল রাতে সেই পুরনো ঘটনাটা কেন যে মনে পড়ল এত। ভাবছিলুম, নিতাইয়ের বউটি যদি অত অসাবধান না হত যদি সামলে রাখত তা হলে বাচ্চাটা আজও বেঁচে থাকত। এই সব আবোল তাবোল কত কী মনে পড়ে। সকালবেলায় বসে বসে ভাবছিলুম, আমি খুব আহাম্মক, নইলে কোথাকার কে নিতাই পোড়েল, তার বাচ্চা সেই কবে ফৌত হয়ে গেছে, তারাও এখন হয়তো ভুলেটুলে গিয়ে দিব্যি হাসছে খেলছে গল্প করছে, তবে আমি কেন কেঁদে পরলুম! কিছু ভেবে পাই না।

বিশুর চোখ একটু ছলছল করছিল। তারও কেন কষ্ট হচ্ছে তা হলে অচেনা অজানা একটা বাচ্চার জন্য?

হরিদাস হাতের কাজ থামিয়ে খানিকক্ষণ আকাশমুখো চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, দুনিয়ার জন্য আমার অনেক কিছু করার ছিল, বুঝলে! কিছুই করিনি। ভগবানের দান এই জীবন, ভগবানের দুনিয়াটার জন্যই কিছু করা হল না তো, সেই সব পাপ রাতের বেলা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে ওঠে। তখন বড় কষ্ট হয়। সেই কবে এতটা এই তোমার বয়সি ছেলেকে দেখেছিলুম, পটলের দোকানের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পাউরুটি দেখছে। বোধ হয় খুব খাওয়ার ইচ্ছে। একবার মনে হল বলি, ও খোকা খাবি পাউরুটি? খা না। আমি পয়সা দেব'খন। তা অবিশ্যি শেষ অবধি আর বলিনি। মাঝে মাঝে মাতাল হলে সেই ছোঁড়াকে দেখতে পাই যেন। আহা, বোধহয় খিদে পেয়েছিল খুব, আমার পকেটে পয়সাও ছিল, কেন যে দিলুম না। আর তো তাকে খুঁজে পাব না, লাখোঁজনের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন মনে পড়ে আর খুব কষে কান্না আসে। আমার হল ওই বিপদ।

বিশু বলে, আমারও তোমার মতো হয় হরিকা।

হরিদাস আহ্লাদের গলায় বলে, খুব ভাল। ভগবানের দুনিয়ার জন্য কিছু করে যেতে হলে ওইটে চাই। তবে আমার তো এমনিতে হয় না। মাতাল হলেই শুধু হয়।

মাতাল হলে কেমন লাগে তা তো জানে না বিশু। বড় হলে সে একবার মাতাল হয়ে দেখবে।

তবে সে এটা বেশ বুঝতে পারে যে, ভগবান যেমন অনেক কিছু দেন, তেমনি অনেক কিছু দেনও না।

নয়নখ্যাপাকে ভগবান দিয়েছেন ফুর্তি আর অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ। নয়ন হাটখোলার গাছতলায় বসে খুব হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে আর চেঁচায়, তেজাং গোলি! তেজাং গোলি! আকুড়কুড় তেজাং গোলি…

বিশু তার কাছে গিয়ে বসে বসে দেখে, নয়নের মুখে সব সময়ে একটা খুশিয়াল ভাব। হাসি উপচে পড়ছে মুখে। মাথার ওপর চাল নেই, পেটে ভাতের জোগাড় নেই, ছেড়া ট্যানা ছাড়া পোশাক নেই, মা নেই, কেউ আদর করে না। তবু এত খুশি কেন নয়ন? সব সময়ে আনন্দে ডগমগ করছে। বৃষ্টিতে হাপুস হয়ে ভেজে, রোদে পোড়ে, ধুলোয় পড়ে থাকে। নয়নের কাছে বসে বসে বিশুর মনটা ভাল হয়ে যায়।

ও নয়নদা, বৃষ্টি পড়লে হাটখোলার চালের নীচে যেতে পারো না?

যাব কেন? এটা যে আমার বাড়ি।

দূর। গাছতলা বুঝি কারও বাড়ি হয়?

চুপ! কিংটু কাসিং। ডিগ ডিগ ডিগ ক্যালেন্ডারিং। কেলেটারিং, ল্যাকাভুট, ফিনিশ…

ওটা কি ইংরিজি?

ইয়েস।

বিশু হি হি করে হাসে। এটা নাকি ইংরিজি!

ভুটকোরাস! ভুটকোরাস! তেজাং গোলি।

এর মানে কী নয়নদা?

খ্যাট খ্যাট খ্যাট টেলারিং। ঝা বাবুদের মেলা কিকসুং আছে, না রে? খুব গ্যালটারিং ব্যাপার।

তুমি এমন ইংরিজি শিখলে কোথায় নয়নদা?

ইংলিশ ল্যান্ড। লন্ডন। মেমসাহেবরা কাপড় তুলে নাচে, জানিস? চিনেরা ব্যাং ভাজা খায়। আলুসেদ্ধ আর মিল্ক। কার্পেটিং।

কখনও কেউ একটা জামা দেয়। কেউ একটু ফেলে-দেওয়া খাবার। বাচ্চারা ঢিলও মারে। নয়নখ্যাপা কিছু গায়ে মাখে না। দিব্যি আছে।

ঝা বাবুদের বাড়িতে এলেই বিশুর মন ভাল হয়ে যায়। খুব উচু দেয়ালে ঘেরা মস্ত জায়গা নিয়ে ঝা বাবুদের বাড়ি। কত গাছপালা, আর কী সুন্দর ছায়া আর রোদ এখানে। সকাল থেকেই ঝা বাবুদের বাড়ি বোজ সরগরম। হুলুস্থুল সব কাণ্ড হচ্ছে সেখানে। কোথাও মোষের দুধ দোয়ানো হচ্ছে, কোথাও উদুখলে আর হামানদিস্তায় গুড়ো হচ্ছে মশলা, জাতীয় ভাঙা হচ্ছে ডাল, কোথাও তৈরি হচ্ছে পাপড়ের নেছি, কোথাও বা বানানো হচ্ছে হাজারও রকমের আচার। তিনটে দেহাতি চাকর, তিনজন দেহাতি কাজের মেয়ে আর ঝা বাবুদের বাড়ির মোটা মোটা আহ্লাদী চেহারার রুপোর গয়নাপরা ঘোমটা দেওয়া বউ-ঝিরা দিন-রাত শুধু কাজ করছে। মোষের ডাক, কুকুরের চিৎকার, মানুষের কথাবার্তায় বাড়িটা সব সময় ডগমগ করছে যেন। এ যেন উৎসবের বাড়ি।

গঞ্জের বাজারে কিষুণ ঝার মস্ত পাইকারি দোকান। কাছাকাছি যত হাটবাজার আছে সব জায়গার দোকানদাররা মাল কিনতে ঝা বাবুদের দোকানে ভিড় করে। লাখো টাকার কারবার। বাবার সঙ্গে একবার সেই দোকানে গিয়েছিল বিশু। বেশি দূর নয়। মরা খাল পেরিয়ে হবিবগঞ্জ বাঁয়ে ফেলে মাইলখানেক হাঁটলেই গঞ্জের বাজার। বাজারের মাঝখানে একটা পুরনো দালানে মস্ত দোকান। সেই দোকানের ভিতরে ঢুকলেই মশলা, হিং, পাঁপড়, আটা, বস্তা, ধুলো সব কিছু মেশানো একটা ভারী অদ্ভুত গন্ধ আসে নাকে। ইচ্ছে করে, অনেকক্ষণ দোকানটায় বসে থাকে। সেখানে শুধু বিকিকিনি আর বিকিকিনি। বড় ভাল লেগেছিল বিশুর। ঝা বাবুদের দোকানে বা বাড়িতে সব জায়গায় কেবল কাজ আর আনন্দ।

বিশু মাঝে মাঝে বিমলকে জিজ্ঞেস করে, তোদের কোনও দুঃখ নেই, না রে?

কিষুণ ঝা-র নাতি বিমল বিশুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। খুব গবেট। তার লেখাপড়ায় মাথা না থাকলে কী হবে, ব্যাবসায় নাকি খুব মাথা। বিশুর প্রশ্ন শুনে সে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভেবে বলল, নেই কি আর! খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে।

বিমল তাকে একবার এক গেলাস গরম মোষের দুধ খাইয়েছিল। বিশুর সহ্য হয়নি। পরদিন পেট ছেড়ে দিয়েছিল।

দাদুর কাছে গেলেই হত্তুকির পবিত্র একটা গন্ধ পাওয়া যায়। দাদু তার মাথায় আঙুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে, টাকা থাকলেই যে দুঃখ থাকে না তা কিন্তু নয়। কত পয়সাওলা লোকেরও কত জ্বলুনি থাকে। আসল কথা হল মন। মনটাকে যেমনসই করবে তেমনই থাকবে। মানুষ তো কেবলই চায়। এটা চায়, ওটা চায়, সেটা চায়। ওই থেকেই মনটা বিগড়োয়। চাওয়ার ভাবটা রাখতে নেই।

দাদু হচ্ছে বিশুর বুড়ি। ঘুরতে ঘুরতে খেলতে খেলতে এক-একবার করে এসে, বুড়ি ছুঁয়ে যায়। ভয় পেলে, ব্যথা পেলে, রাগ হলে সে ছুটে চলে আসে দাদুর কাছে। তা তার দাদু হরপ্রসন্ন তপাদার আরও অনেকেরই বুড়ি। পুজোপাঠ, যজমানি, কথকতা, কীর্তনের জন্যই শুধু নয়, লোকে বেকায়দায় পড়লে পরামর্শ নিতে আসে, মামলা-মোকদ্দমার মিটমাট করাতে, ঝগড়া-কাজিয়া-বখেরা নিয়েও আসে। তবে তার দাদুর কাছে যে-লোকটা এলে বিশু সবচেয়ে ভয় পায় সে হল খুনে রামহরি।

কালীবাড়ির বড় পুজোয় মানসিকে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশটা পাঁঠা বলি হতে আসে। রামহরি ঝপাঝপ সেগুলো কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। লোকে বলে, পাঠা তো পাঠা, রামহরি যে কত মানুষ কেটেছে তার হিসেব নেই। কী দু'খানা চোখ! বাপ রে! এমন পাগুলে দৃষ্টিতে তাকায় যে রক্ত জল হয়ে যায় মানুষের।

মাঝে মাঝে ভরসন্ধেবেলা, যখন চারদিকে ভুতুড়ে আঁধার কেঁপে আসে ডানা মেলে, বাড়িতে বাড়িতে বিপদ-সংকেতের মতো শাঁখ বাজতে থাকে, তখন নিঃশব্দে একটি ছায়ার মতো আসে রামহরি। দাওয়ায় জলচৌকিতে বসে সেই সময়টায় দাদু নীরবে ঠাকুরের নাম করে। একটু দূরে উবু হয়ে বসে থাকে রামহরি। চুপচাপ। অন্ধকারে তখন তাকে মানুষ বলে মনেই হয় না।

দাদুর নামকরা শেষ হলে রামহরি কী যেন ফিসফিস করে বলে। অনেকক্ষণ ধরে বলে। তারপর দাদু একসময়ে নরম গলায় বলে, আজ যা। আবার আসিস।

রামহরি যেমন এসেছিল তেমনই চলে যায়।

বিশু গিয়ে দাদুকে পাকড়াও করে তখন, ও দাদু, রামহরি তোমার কাছে কেন আসে?

এমনি আসে। মন চায় তাই আসে। কোথাও তো ওর শান্তি নেই।

কী বলে তোমাকে?

কী আর বলবে? কত পাপ করেছে। সেই সব কথা বলে।

পাপ কাকে বলে তা ভাল করে জানে না বিশু। সে যে পাগলুদের বাড়ির পেয়ারা চুরি করে খায় সেটা কি পাপ? সে যে একবার ফটিকের হাতে চিমটি কেটে পালিয়েছিল সে কি পাপ? বর্ষাকালে ডোবার সোনাব্যাংগুলোকে ঢিল মারা কি পাপ?

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলেই ভূতের হাতে চলে যায় পৃথিবী। তখন হ্যারিকেনের সামনে পড়ার বই খুলে বসে সে ভাত ফুটবার গন্ধ পায়, ডালে সম্বরা দেওয়ার শব্দ আসে। আঢ্যদের বাড়ির বুড়ো যতীনবাবুর কাশির শব্দ আসে। পড়ার বইয়ের ওপর ঝুঁকে আসে মাথা। সাঁঝরাতেই ঘুমিয়ে পড়ে বিশু।

আর তখন তার ঘুমের মধ্যে নেমে আসতে থাকে ভূত, পরি, ভগবান, আরও কত কে!... রুকুদিদির একটা ভাই হয়েছে সকালবেলায় আর বিশু খবর পেয়ে ছুটছে পথে পথে আর চিৎকার করছে, রুকুদিবির ভাই হয়েছে!... রুকুদিদির ভাই হয়েছে!... ছুটতে ছুটতে পড়ে গেল বিশু। উঠে দেখল, রামহরি একখানা মস্ত ছোরা হাতে মাঠ পেরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, আর ছোরাটা থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। তাকে দেখে রামহরি চাপা গলায় বলে, কাউকে বোলো না কিন্তু খোকাবাবু। বিশু ভয়ে আর্তস্বরে বলে ওঠে, বলব না! বলব না!... মাতাল হরিদাস ডুকরে কেঁদে ওঠে হঠাৎ, আহা রে, কলকে ফুলের গাছটা যে শুকিয়ে মরে গেল। ওফ, কত দুঃখই যে আছে দুনিয়াতে ভাই রে।... টিফিনের সময় ক্লাসঘরে বিমল তাকে ফিসফিস করে বলতে থাকে, আমাদের বাড়িতে একটা আলমারি আছে, জানিস? কখনও ভোলা হয়নি। দাদু ওটা এক রাজবাড়ি থেকে কিনেছিল। চাবি নেই বলে ভোলা যায় না। দাদু কী বলে জানিস? ওটা খুললেই নাকি পিলপিল করে হাজার হাজার দুঃখ বেরিয়ে আসবে পিঁপড়ের মতো।... ওই তো চলেছে নলিনী স্যার। নিজের বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, একে ওকে জিজ্ঞেস করছেন, শোনো হে, আইচ্ছা কইতে পারো আমি কোন বাড়িটায় থাকি? আমারে চিনলা তো! আমি হইলাম গিয়া নলিনী স্যার।... দুঃখী দেবীলাল একগাদা বাসন নিয়ে বসেছে কদমতলায়। তার মুখে খুব হাসি। কাছেই বসে আছে নয়নখ্যাপা। দু'জনেই হাসছে খুব। সামনে কাঠকয়লার আগুনে লোহার উকো তাতিয়ে তুলছে দেবীলাল... ঝা বাবুদের বাড়িতে জাতা ঘুরছে... খুব ঘুরছে। কে ডাকল, বিশু! ও বিশু!

মা খেতে ডাকছে। বিশু ধড়মড় করে উঠে বসে।

০২. দিল্লি থেকেই ট্রেনটা ছেড়েছিল

॥ দুই ॥

দিল্লি থেকেই ট্রেনটা ছেড়েছিল চার ঘণ্টা দেরিতে। পরশু দিন বাংলা বন্ধ থাকায় গাড়ি সময়মতো পৌঁছোয়নি, তাই দেরি। বিকেল চারটের ট্রেন ছাড়ল রাত আটটায়। তখনই বোঝা গিয়েছিল, কপালে দুর্ভোগ আছে। এ সি টু টায়ারের আরামদায়ক নিরাপত্তায়ও কিছু লোক উদ্বেগ বোধ করছে। বিকেল দুটো নাগাদ এ সি ডিলাক্স এক্সপ্রেস হাওড়ায় পৌঁছনোর কথা। সেটা স্বাভাবিক নিয়মে। চারঘন্টা যোগ করলে দাঁড়াবে রাত দশটা। কিন্তু বিলম্বিত ট্রেনের ভাগ্যও বিড়ম্বিত বলে ভারতীয় রেলের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী আরও দু'-তিন ঘণ্টা দেরি হতে পারে। রাত বারোটা-একটায় হাওড়ায় পৌঁছে একটিও ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, কোথাও পৌঁছানো অসম্ভব। ভোর পর্যন্ত বসে থাকতে হবে স্টেশনে। কী গেরো।

উত্তেজনায় উদ্বেগে শ্যামল বারেবারে উঠে সিগারেট খেতে করিডোরে যাচ্ছে আর কন্ডাক্টর গার্ড এবং সহযাত্রীদের সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময় নিয়ে জরুরি আলোচনা সেরে আসছে। তার সঙ্গে বউ-বাচ্চা-লটবহর।

বকুল একটা ধমক দিল, তুমি অত অস্থির হচ্ছো কেন বলো তো! এ ট্রেনে তো আরও হাজার কয়েক প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে, না কি! তাদের যা হবে আমাদেরও তাই হবে। অত চিন্তা কীসের?

শ্যামল যথাসাধ্য শুকনো গলাকে মোলায়েম করে বলে, আহা, তুমি বুঝছ না…

খুব বুঝছি। একটুতেই তোমার অমন টেনশন হয় কেন? আর-একটাও সিগারেট খাবে কিন্তু খাবারের আগে। গত আধ ঘণ্টায় বোধহয় চারবার উঠে গেলে!

হাওড়া স্টেশনে রাত কাটানো মানে বুঝছ তো! হরিবল। টুকুসটার কত কষ্ট হবে। কিছু হবে না। গাদা গাদা বাচ্চা যাচ্ছে এই ট্রেনে। তাদেরও তো কষ্ট হবে।

আহা, আমি সকলের কথাই ভাবছি। মানে, আমাদের সকলেরই কষ্ট হবে!

বাংলা বন্ধ এর কথাটা মাথায় ছিল না, থাকলে…

থাকলে কী করতে? আজকের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করতে? এখন পুজোর পর সকলের ফেরার রাশ, আগামী পনেরো দিনেও রিজার্ভেশন পেতে না। পনেরো দিন বসে। থাকতে দিল্লিতে? কী বুদ্ধি।

ওয়েল, আমি তোমার মতো অত স্পোর্টিং নই। এই ঝামেলা এড়াতে অন্তত প্লেনে একটা চেষ্টা করা যেত।

তোমার মাথাটা আজকাল একদম নরম্যালি কাজ করছে না। ট্রেন মাত্র চার ঘণ্টা লেট বলে প্লেনে উঠতে? টাকা এত সস্তা হয়েছে নাকি আমাদের? বছরে চারবার প্লেনের ভাড়া বাড়ে, সেটা জানো?

শ্যামল গুম হয়ে বসে রইল। টুকুস এখনও ঘুমোচ্ছে। নির্বিঘ্ন ঘুম। ট্রেন লেট হোক চাই হোক, ওর কিছু যায় আসে না। এই শিশুকালটাই ভাল, দুনিয়ার এত দিকদারি, টেনশন, ছোটখাটো অশান্তি, ভয় এসব স্পর্শই করে না।

শ্যামল আবার উঠতে যাচ্ছিল। বকুল একটা ধমক দিল, আবার কোথায় যাচ্ছ?

চোরের মতো মুখ করে শ্যামল বলে, একবার মাসিমাকে দেখে আসি।

দেখার কী আছে! মাসিমা স্মার্ট মহিলা, সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন। শি ক্যান লুক আফটার হারসেলফ।

একটা কার্টসি তো আছে।

শ্যামল উঠে গেল। বকুল ম্যাগাজিনের ছবি দেখতে লাগল।

মাসিমা আছেন একেবারে শেষ কিউবিকলে। অনেকটা দূর। জায়গা বদল করে একই কিউবিকলে ব্যবস্থার কথা বলেছিল শ্যামল। মাসিমা- হু ইজ এ হার্ড নাট টু

ক্র্যাক–মৃদু হেসে বলেছেন, থাক গে, কী দরকার? আমার কোনও অসুবিধে নেই। কম্পার্টমেন্ট তো একই। আমি তো একা একাই দুনিয়া ঘুরে বেড়াই।

মাসিমা–অর্থাৎ বিনয়ের মা–সত্যিই বিশ্বজনীন মানুষ। তার দুই ছেলে আর এক মেয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে। শুধু বিদেশ-ভীত বিনয়টাই পড়ে আছে দিল্লিতে। বার দুই বিদেশে গিয়ে দেখেছে, ফরেন তার সহ্য হওয়ার নয়। দিদি ও দাদাদের ছিছিক্কার মাথা পেতে নিয়ে সে দিল্লিতেই থানা গেড়েছে। তার জীবনের প্রবলতম উচ্চাকাঙক্ষা হল কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসা এবং জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। রানীক্ষেত, নৈনিতাল, হরিদ্বার ঘুরে ফেরার পথে বিনয়ের কালকাজির বাড়িতে তিনদিন ছিল শ্যামল। তিনদিন বিনয়ের গাড়িতে আগ্রা-টাগ্রা ঘুরে, দিল্লিতে প্রভূত মার্কেটিং করে, কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আর আড্ডা মেরে সময়টা কেটেছে দারুণ। মাসিমা তখন ওখানে মজুত। তিনিও কলকাতায় আসবেন। স্বামীর ভিটে একবার ভিজিট করেই রওনা দেবেন সুইডেনে, মেয়ের বাড়িতে। ভিটেটা অবশ্য দেখার মতো। আয়রনসাইড রোডে বাগানঘেরা পেল্লায় বাড়ি। কেমন একটা প্যালেস-প্যালেস ভাব আছে। সেখানে থাকে এক বুড়ো কেয়ারটেকার আর মাসিমার এক নিঃসন্তান বিধবা ভাইঝি। প্রকাণ্ড বাড়িটা একরকম স্থায়ীভাবে ফাঁকা। শ্যামল মাঝে মাঝে ভাবে, যাদের আছে তাদের এত বেশি আছে কেন? কলকাতায় এক টুকরো ঘরের জন্য এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি আর এদের অত বড় বাড়ি অবহেলায় ফাঁকা পড়ে থাকে।

শেষ কিউবিকলে মাসিমা ছাড়া তিনজনই পুরুষ। মাসিমার পরনে সাদা ধবধবে থান, চোখে ফিতে-বাঁধা চশমা, চেহারায় সম্ভ্রমাত্মক ভাব। ছোটখাটো, ফর্সা, শান্ত চেহারার ভদ্রমহিলা। বয়স সত্তর-উত্তর হবে। ফিট। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ইংরিজি খবরের কাগজ দেখছিলেন।

মাসিমা, কখন যে গাড়ি কলকাতা পৌঁছবে!

বোসো।–বলে মাসিমা একটু জানালার দিকে সরে গেলেন, পাশে রাখা বিদেশি হ্যান্ডব্যাগটা সরিয়ে নিলেন।

শ্যামল বসল। ভিতরটা উচাটন। ট্রেনটা যথেষ্ট জোরে চলছে বলে তার মনে হচ্ছে না। টাইম মেক-আপ করার ইচ্ছে কি আছে এদের। যদি অন্তত আধ ঘণ্টাও মেক-আপ করতে পারত তা হলে সাড়ে নটায় পৌঁছনো যেত হাওড়ায়। উঃ, যদি একটু জোরে চালায় এরা। গাড়িটা! যদি রাস্তায় আর লেট না হয়।

টুকুস ঘুমিয়েছে বুঝি?

অ্যাঁ!—বলে চিন্তাকুল শ্যামল যেন চটকা ভেঙে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাই ভাবছি। নইলে একবার ঠিক আমার কাছে আসত। তিনদিনেই যা ভাব হয়ে গেছে। আমাদের।

মাসিমা—অর্থাৎ মুক্তিদেবীর ডান হাতে একখানা মস্ত হিরের আংটি। একখানা বিছেহার গলায়। আর কোনও গয়না নেই। হিরের বাজারদর শ্যামলের জানার মধ্যে পড়ে না, সোনার দর সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা আছে মাত্র। কিন্তু তার সন্দেহ মাত্র এই দুই আইটেমেই হাজার ত্রিশ-চল্লিশ পড়ে যাবে।

ইয়ে, মাসিমা, হাওড়া থেকে অত রাতে তো আপনাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া যাবে না। আমরা কি সঙ্গে যাব?

মনে মনে অপব্যয়টার একটা হিসেবও করে নেয় শ্যামল। তার ফ্ল্যাট কাঁকুড়গাছিতে। মাসিমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে কাঁকুড়গাছি যাওয়া মানে বিশ-পঁচিশ টাকা বাড়তি খরচ।

মাসিমা অবশ্য হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, তা কেন? আমাকে পৌঁছনোর কোনও দরকার নেই তো! আমার ভাশুরপোর গাড়ি নিয়ে আমাদের কেয়ারটেকার যদু স্টেশনে থাকবে। পুরনো লোক, যত রাতই হোক ঠিক মোতায়েন থাকবে।

শ্যামল একটা শ্বাস ফেলল। ওঃ, তাই এত নিশ্চিন্ত। বড়লোকদের জন্য সব ব্যবস্থাই থাকে। যাদের ভগবান দেয় তাদের এত দেয় যে ভগবানের চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত থাকে না। দিতেই থাকে, দিতেই থাকে। ভগবান-টগবান মানে না শ্যামল, কিন্তু রেগে গেলে, উত্তেজিত হলে সে একজন অদৃশ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে ফর দি টাইম বিয়িং ভগবানকে খাড়া করে নেয়। তাতে নিজস্ব লজিকগুলো শানিয়ে নিতে তার সুবিধে হয়। আর এই ভদ্রমহিলা মানে সো কলড মাসিমা ইনিও তো নিজে থেকে একবার বলতে পারেন, বাবা শ্যামল, তুমি বরং আমার গাড়িতেই যেয়ো। নইলে মালপত্র বউ বাচ্চা নিয়ে মুশকিলে পড়বে। কিন্তু বলল না। এই সৌজন্যটুকু এমন কিছু সাংঘাতিক প্রত্যাশা নয়। যখন বললই না তখন শ্যামলেরই কি লজ্জার মাথা খেয়ে বলা উচিত, ইয়ে মাসিমা, আপনার খুব অসুবিধে না হলে... মানে।

কাঁকুড়গাছি... কাছেই... মানে বউ-বাচ্চা-মালপত্তর... কলকাতা শহর, বুঝতেই পারছেন। লোকে তো এইভাবেই ম্যানেজ করে, না কি? বলিয়ে-কইয়ে স্মার্ট লোকেরা আরও কত কঠিন পরিস্থিতিকে শুধু বুকনি ঝেড়ে জল করে দেয়। সে এটুকু পারবে না? গলা খাঁকারি দিয়ে তৈরি হল শ্যামল। দ্বিধা সংকোচের যে কর্কটা তার গলায় আটকে গিয়ে সঠিক পরিস্থিতিতে সঠিক কথাটা কিছুতেই বলতে দেয় না সেটাকে খুলে ফেলার জন্য গলাটা আর-একবার ঝেড়ে নিয়ে সে একরকম চোখ বুজে মুখ খুলল। এবং বলেও ফেলল।

কিন্তু যা বলল তা মোটেই তার উদ্দিষ্ট কথা নয়। খুবই অবাক হয়ে সে শুনতে পেল যে, সে বলছে, মাসিমা, কলকাতার বাড়িটা তাহলে ডিমলিশ করে ফেলাই ঠিক করলেন?

কী করব বলো! আমরা কেউ থাকি না, অত বড় বাড়ি মেনটেন করে কে? ট্যাক্সও তো কম নয়। আমার দাদাশ্বশুর তিন ছেলের জন্য তিনটে বাড়ি করে রেখে গিয়েছিলেন, ভাশুরপোরা কবে তাদের বাড়ি ভেঙে মাল্টিস্টোরিড করে নিয়েছে। শুধু আমাদেরটাই পড়ে আছে।

কোনও আগ্রহ নেই জানবার তবু কথাটা যখন উঠে পড়েছে তখন কথার ঝোঁকেই শ্যামল বলল, কীরকম বন্দোবস্ত হল?

হয়নি। সেই সব কথা বলতেই কলকাতা যাওয়া। একজন প্রোমোটার গত জুন মাসে আমেরিকায় গিয়ে বেকার্সফিল্ডে আমার ছেলের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। মোটামুটি ঠিক হয়েছে চার ছেলেমেয়ে আর আমার জন্য পাঁচটা বড় ফ্ল্যাট দেবে, আমার ভাইঝি আর যদুর জন্য দু'খানা ঘর।

কে থাকবে?

কে আর থাকবে। এক বিনয় যদি কলকাতায় আসে তো থাকবে। বিদেশে যারা আছে তারা কেউ ফিরবে না এ দেশে। তবে সবাই চায় কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বা কিছু থাক। ওটা একটা সেন্টিমেন্ট। কলকাতায় আমার একটা আশ্রয় আছে, এটুকু ভেবেই যা সান্ত্বনা। দু-চার বছর পর এসে দু-চারদিন থাকবে হয়তো।

পুরনো বাড়ি ভেঙে বহুতল বাড়ি ওঠার সব কাহিনিই প্রায় একরকম, খুব একটা ভ্যারিয়েশন নেই। এত একরকম যে, বস্তাপচা মনে হয়। কাজেই মুক্তিদেবী তথা

মাসিমার গল্পেও সেই রিপ্লে। শুধু একটা ব্যাপার শ্যামলের শ্বাসরোধ করে দেয়, এরা কত বড়লোক। যিশুখ্রিস্টই কি বলেছেন কথাটা যে, ছুঁচের ফুটো দিয়ে বরং হাতি গলে যাবে, তবু কোনও ধনী ব্যক্তি কখনও স্বর্গে পৌঁছোবে না! ওয়েল ওয়েল, মাই ডিয়ার জেসাস, এর চেয়ে বড় স্বর্গ আর কোন আহাম্মক চায়? তোমার স্বর্গ তো ঝোপের পাখি ধর্মাবতার। আরও একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিই অনারেবল জেসাস, তোমার সর্বশক্তিমান গডই যদি সব কিছুর মূলে আছে, তবে এই যে কিছু বড়লোক এবং তাদের তেলা মাথায় আরও তেল দেওয়া এটাও সেই কীর্তিমান একচোখো লোকটারই কাজ। বুঝলে জেসাস স্যার, তোমার গড হল পক্ষপাতদুষ্ট রেফারি। যে দল জিতছে তাকেই ফের পেনাল্টি পাইয়ে দেওয়া ছাড়া এটা আর কী বলো তো! থাকবে না, তবু পাঁচ-পাঁচটা ফ্ল্যাট তালাবন্ধ কঁকা পড়ে থাকবে। এইজন্যই তো লোকে কমিউনিস্ট হয়।

কমিউনিস্ট লোকে আরও নানা কারণেই হয়, শ্যামলও বার কয়েক হয়েছে। এখনও যে সে কমিউনিস্ট নয় এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ সে এখন কমিউনিস্ট কি না সেটা শ্যামলও জানে না। তবে ট্রেনটা যদি আরও এক কি দুই ঘণ্টা লেট করে তবে ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠতে পারে।

শ্যামল একটা শ্বাস একটু ধীর ও গভীর ভাবে মোচন করে বলে, যাক মাসিমা, আপনার জন্য যে একটা গাড়ি থাকবে এটা জেনে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি তো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, গাড়ি না এলে আপনার তো খুবই অসুবিধে হবে।

মুক্তিদেবী আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটা হাসি হেসে বললেন, না না, তুমি একদম চিন্তা কোরো না। গাড়ি ঠিক আসবে। যদু নিজে থাকবে স্টেশনে। ত্রিশ বছরের পুরনো লোক।

তবু একবারও বলল না, আমার তো ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তোমার কী হবে বাবা শ্যামল। আমার গাড়িটা বরং তোমাদের পৌঁছে দিক।

বলল না। পোঁটলা পুঁটলি বাক্স বউ বাচ্চা নিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাওড়ার উদোম প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা ছাড়া শ্যামল আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না আশু ভবিষ্যতে। কারণ দিল্লি থেকে ছেড়ে গাজিয়াবাদ পার হয়েই ট্রেনটা আবার থেমেছে। এবং অনেকক্ষণ থেমে আছে। ভোগাবে। খুব ভোগাবে। শ্যামল একটু একটু কমিউনিস্ট হয়ে উঠছে কি?

মাসিমা নিচু হয়ে তার স্যামসোনাইট সুটকেসটা সিটের তলা থেকে টেনে বের হবার চেষ্টা করেছিলেন।

দাঁড়ান মাসিমা।—বলে শ্যামল সেটা বের করে দিল। ঘ্যাম জিনিস। চব্বিশ ইঞ্চি, ষাঁড়ের রক্ত রঙা, কম্বিনেশন লকওলা স্যামসোনাইট। হার্ড টপ। এ দেশের বাজারে যদি বা পাওয়া যায় হেসে খেলে হাজার দুই টাকা দাম পড়ে যাবে।

মাসিমা সুটকেস খুলে এক প্যাকেট লবঙ্গ বের করে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার বউকে দিয়ো। এ দেশে শুনি লবঙ্গর খুব দাম!

লবঙ্গ!—বলে শ্যামল একটা হাঁ করে রইল। লবঙ্গ তাদের কোন কাজে লাগবে সে মোটেই বুঝতে পারছে না।

দারচিনি আর এলাচিও এনেছিলাম, সেগুলো দিল্লিতেই বিলি হয়ে গেছে। ভাল জিনিস তো এখানে পাওয়াই যায় না।

শ্যামলের একবার বলতে ইচ্ছে করল, লবঙ্গ নয় মাসিমা, আই ওয়ান্ট এ লিফট।

এই সময়ে ট্রেন ছাড়ল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বকুল এসে দাঁড়াল, এই, তুমি একটু টুকুসের কাছে গিয়ে বোসো তো। আমি বরং মাসিমার সঙ্গে গল্প করি।

সর্বহারার অর্থহীন দৃষ্টিতে শ্যামল বকুলের দিকে চেয়ে লবঙ্গের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, লবঙ্গ!

লবঙ্গ!—বকুলের চোখ যেন ঝলমল করে উঠল, ওমা! মাসিমা দিলেন বুঝি! ইস, কী দারুণ।

বলে শ্যামলের পরিত্যক্ত জায়গায় ঝুপ করে বসে পড়ে বকুল।

দেখি মাসিমা, বিদেশ থেকে আর কী আনলেন!

এই যে দেখাচ্ছি।

বকুল যদি ম্যানেজ করতে পারে তো প্রবলেমটা ফর্সা হয়ে গেল। রাত্তিরটা ভাল ঘুম হবে তার।

টুকুস–তিন বছরের আদুরে মেয়েটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, নো প্রবলেম। ঠিক এইরকম একটা বয়সে স্থির থেকে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল। মানুষের বয়স বাড়ে, মাথা পাকা হয়, ততই বাড়ে প্রবলেম। এই যে টুকুস এত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এবং দুনিয়ার সব বাচ্চাই যে নিশ্চিন্তে খায়-দায়, খেলা করে, ঘুমোয়, কোনও টেনশনে ভোগে না তার কারণ হচ্ছে ওরা টের পায় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, দুশ্চিন্তা পোয়ানোর জন্য ওদের বাবা, মা এবং বড়রা আছে। কিন্তু বড় হয়ে গেলে তখন আর সে সুবিধে নেই। সেইজন্যই কি লোকে ভগবান নামে একজন বড় বাবাকে খাড়া করে নিয়েছিল। যাতে ঝাট-ঝামেলাগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে খানিকটা শিশু হয়ে থাকা যায়।

উলটোদিকে দু'জন গম্ভীর লোক। একজন মাড়োয়ারিই হবে বোধহয়, অন্যজন যুবক চেহারার। বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে। চুপচাপ বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। এ সি টু টায়ারে ডবল কাচ লাগানো থাকে জানালায় এবং কাচ যথেষ্ট ময়লা ও ঘোলা। দিনদুপুরেই বাইরেটা ভাল দেখা যায় না। রাতে তো কথাই নেই। তবু কিছু লোক চেয়ে থাকে। খামোখাই চেয়ে থাকে।

আপনি কি কলকাতা অবধি নাকি?

লোকটা ধীরে মুখটা ফেরাল। শ্যামল সামান্য একটু বিস্মিত হল মুখটা দেখে। খুবই বিষণ্ন, শোকাহত চেহারা। কেউ মারা-টারা গেছে নাকি? ডেকে কথা বলে কি ভুল করল শ্যামল?

সামান্য ভাঙা এবং ধরা গলায় যুবকটি বলল, আমাকে কিছু বললেন?

সরি টু ডিস্টার্ব, না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম কলকাতা অবধি যাচ্ছেন কি না?

হ্যাঁ, কলকাতা। ট্রেন যা লেট চলছে, কখন যে পৌঁছবে!—বলে কথাটা ছেড়ে দিল।

ছেলেটা মৃদু স্বরে বলল, পৌঁছবে।

ওই যাঃ, বকুল তো জানেই না যে মাসিমার গাড়ি আসবে। না জানলে ম্যানেজ করবে কীভাবে? এখনই ওকে অ্যালার্ট করে দিয়ে আসা দরকার। ভেবে উঠতে যাচ্ছিল শ্যামল। হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, তাড়া কীসের! কাল সারা দিনটা তো হাতে আছে।

আপনি কি দিল্লিতে থাকেন?

ছেলেটা ফের জানালার বাইরে চেয়ে ছিল। বিষণ্ণ সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ, দিল্লিতে।

ছোকরার যে একটা কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। জখমটা হয়তো একটু গুরুতরই।

সিগারেট চলে তো?

সিগারেট! হ্যাঁ, তা চলে।

কী নুইসেন্স বলুন তো! এত টাকা দিয়ে লোকে এ সি টু টায়ারে ট্রাভেল করছে, কিন্তু সিগারেট খেতে হলে করিডোরে যেতে হবে। আমি একটু বেশি স্মোক করি বলে আরও অসুবিধে হয়। অথচ সেকেন্ড ক্লাসে নো রেস্ট্রিকশন। এ সি ফার্স্ট ক্লাসেও স্মোকিং অ্যালাউড। ওনলি এইসব কম্পার্টমেন্টের জন্যই এ নিয়ম। মিনিংলেস।

বলে শ্যামল উঠে পড়ে।

ছেলেটা স্তিমিত গলায় বলে, আপনার মেয়েটা কি একা থাকবে? বউদি রাগ করবেন না তো একা রেখে গেলে? পড়ে-উড়ে গেলে—

আরে না। শি ইজ এ কোয়ায়েট চাইল্ড। তবু আপনি যখন বলছেন—

বলে শ্যামল সিটের তলা থেকে বড় সুটকেসটা বের করে সিট ঘেঁষে খাড়া করে রাখল, নাউ শি ইজ সেফ। পাশ ফিরতে গেলে পড়ে যাবে না।

কামরার ভিতরটা অনেকটাই শব্দহীন। কিন্তু করিডোরে রেল কাম ঝমাঝম শব্দে কান ফেটে যেতে চাইছে। ট্রেনটা হঠাৎ একটু বেশিই স্পিড দিল নাকি? এত দুলছে যে দাঁড়ানোই কষ্টকর। এত স্পিড তো ভাল নয় বাপু! ভারতবর্ষের রেল লাইনকে বিশ্বাস কী? কোথায় নাটবল্টু আলগা হয়ে রয়েছে কে জানে বাবা। গাড়ি যদি রেল থেকে ছিটকে মাঠে নেমে যায় এই স্পিডে, তবে দলা পাকিয়ে যেতে হবে। উইথ টুকুস। অ্যান্ড বকুল। ভাবতেই কেমন গা শিরশির করে। তার ওপর

দেশে যা টেরোরিজম শুরু হয়েছে। কোথায় বোমা মেরে লাইন উড়িয়ে রেখেছে, কি লাইনে টাইম বোমা বা মাইন ফিট করে রেখেছে কে জানে!

সিগারেট ধরিয়ে শ্যামল বুক ভরে ধোঁয়া টানল। ছেলেটা অ্যামেচারিশ। সিগারেট ধরাল আনাড়ির মতো। বোধহয় চান্স স্মোকার।

ট্রেনটা কেমন দৌড়চ্ছে দেখেছেন? কোনও মানে হয় এত স্পিডে রান করার?

ছেলেটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে ছিল। চোখ খুলে বলল, হ্যাঁ, ভাল। খুব ভাল।

আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, ইউ আর ইন এ শক। এনি মিসহ্যাপ?

ছেলেটা সিগারেটের দিকে চেয়ে ছিল। মাথা নাড়ল, না।

এসি টু টায়ার করিডোরে সর্বদাই কিছু উটকো লোক উঠে পড়ে। উবু হয়ে বসা দু'জন ময়লা জামাকাপড়ওয়ালা হ্যাভ নটস কথাবার্তা বলছে। একজন চাওয়ালা দুই বাথরুম এবং দু' কামরার যোগাযোগের দরজার কাছে ব্যাবসা করছে। তার সামনে দু'জন হ্যাভস খদ্দের। খাবারের ট্রে হাতে রেস্টুরেন্ট কার থেকে দু'জন বেয়ারা ছিমছাম অভ্যস্ত পায়ে টাল না খেয়ে এসে ঢুকে গেল কামরায়।

কন্ডাক্টরের ফোল্ডিং সিট পেতে চশমাধারী মাঝবয়সী কালো লোকটা চার্ট দেখে কী সব মেলাচ্ছিল।

কন্ডাক্টর সাহেব, লেট কিছু মেক-আপ হবে নাকি? লোকটা মাথা তুলে অতিশয় দার্শনিকের মতো বলল, কুছ হো শকতা। কোই মালুম নেহি।

লেট তো বাড়তেও পারে।

কুছ ভি হো শকতা। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে হ্যায় না। লেট হোনা হি ইসকা দস্তুর হ্যায়।

এত স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে শ্যামল নির্বিকার হওয়ার চেষ্টা করল।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে মাসিমার সেই ভাশুরপোর বাড়িও কাঁকুড়গাছিতেই। গাড়ি মাসিমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে সেখানেই যাবে!

এরকম তো হতেই পারে, তাই না? পৃথিবীতে কত অঘটনই তো ঘটে। সেই যে সে একটা সত্য ঘটনার কথা কোথায় যেন পড়েছিল, অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়িয়ে কয়েকজন নাবিক ফুর্তি করতে নেমেছিল। সেখানে একটি সরল যুবতীর সঙ্গে এক নাবিকের প্রেম হল এবং তারা গির্জায় গিয়ে বিয়েও করে। ফেলল। তারপর নাবিকটি চলে গেল জাহাজে, আর তার কোনও পাত্তা নেই। মেয়েটি অপেক্ষা করে করে ধৈর্যহারা, কিন্তু বোকা মেয়েটা তার ঠিকানাও ভাল করে জানে না। শুধু জানে তার নাম জন, তার বাড়ি লন্ডনে। একদিন মেয়েটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। অতি কষ্টে টাকাপয়সা জোগাড় করে সে একদিন টিকিট কেটে লন্ডনগামী জাহাজে উঠে পড়ল। লন্ডনের জাহাজঘাটায় নেমে সে হারা উদ্দেশ্যে ‘জন! জন! বলে এগোচ্ছে। কী আশ্চর্য, ঠিক সেই সময়ে জনও আসছে উলটো দিক থেকে। দু’জনেই আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরল দু’জনকে। টুথ ইজ সামটাইমস স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

আঙুলে গরম লাগায় সিগারেটের শেষ অংশটা দেয়ালের উপচে পড়া অ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে দিয়ে শ্যামল বলে, কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?

কলকাতা! না, কলকাতায় আমার তেমন কোনও আস্তানা নেই। মাঝে মাঝে অফিসের কাজে আসি, হোটেলে থাকি।

আত্মীয়স্বজন?

কলকাতায় তেমন কেউ নেই। দূর-সম্পর্কের দু’-চারজন আছে।

ছেলেটা সিগারেট তেমন করে খায়নি। দুটো-একটা টান দিয়ে ফেলে দিল। শ্যামল আর একটা ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, আর চলবে?

না, থাক।

প্যাকেটটা বুকপকেটে রাখতে গিয়ে লাইটারটা টুকুস করে পড়ে গেল। ছ্যাত করে উঠল বুকটা। লাইটারটা তার দারুণ প্রিয়। এক বন্ধু হংকং থেকে এনে দিয়েছিল। একটু অসভ্য ব্যাপার আছে জিনিসটার গায়ে। চ্যাপটা ছিমছাম লাইটারটার গায়ে দুটো বিকিনি পরা সুন্দরীর ছবি। আপসাইড ডাউন করলেই বিকিনি অদৃশ্য হয়ে দু’জনেই সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যায়। বকুল কয়েকবারই এটাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তোমার রুচিটা কী বলো তো! খুব রস পাও ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখে?

টুকুস কিন্তু বড় হচ্ছে মনে রেখো। শ্যামল আজকাল লাইটার বকুলের সামনে পারতপক্ষে বের করে না। জনসমক্ষেও একটু লুকিয়েই রাখতে হয় জিনিসটা। কিন্তু লাইটারটা তার ভীষণ প্রিয়। খুব পাতলা, ছিমছাম, ভিতরে গ্যাস কতটা আছে তা দেখার জন্য উইন্ডো, বেশির ভাগ সময়ে এক স্ট্রোকেই জ্বলে। তাইওয়ান ফাইওয়ানের মতো দেশও আজকাল কত পারফেক্ট প্রোডাকশন করছে। উঠে আসছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, এমনকী ইন্দোনেশিয়াও। কিন্তু ইন্ডিয়া কোথায়? এখনও ইন্ডিয়ায় ভদ্রগোছের ব্যবহারযোগ্য ইলেকট্রনিক লাইটার তৈরি হয় না, ভাবা যায়?

লাইটারটা কুড়িয়ে ট্রাউজারের গায়ে মুছে পকেটে ভরল শ্যামল।

আপনি দিল্লি-বেসড বাঙালি?

ছেলেটা মাথা নাড়ে, না।

দেন হোয়ার আর ইয়োর ফোকস? মানে আপনার নিয়ার রিলেটিভরা সব কোথায়?

ছেলেটা তার আকর্ষণীয় ঈষৎ ভাঙা কিন্তু স্বপ্নালু গলায় বলে, আমার তেমন কেউ নেই। আমি একটু লোনলি।

একদম একা?

একরকম তাই। আমি ওনলি চাইল্ড। মা-বাবা ডিসিসড।

বিয়ে করেননি?

না।

না-টা খুব কনফিডেন্স নিয়ে বলল না। একটু থেমে থেমে বলল, অনেক কথা ঠিক অফ হ্যান্ড বলা যায় না।

খুব সমবেদনার সঙ্গে শ্যামল বলে, তা তো বটেই। আই অ্যাম বিয়িং এ নোজি পার্কার। ডোন্ট মাইন্ড ব্রাদার। আপনার নামটা জানতে পারি কি?

বিশ্বরূপ।

আপনার নোজি কিন্তু একটু মেলাঙ্কলিক। তাই হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, কোনও মিসহ্যাপ হয়ে গেছে কি না।

মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সি সুন্দর ছেলেটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, অনেকের কাছে এই বেঁচে থাকাটাই একটা মিসহ্যাপ।

কামরার দরজাটা খুলে গেল। বকুল। রুষ্ট মুখ।

এই, তুমি এখানে! বাচ্চাটাকে একা ফেলে এসেছ, আচ্ছা তোক তো!

শ্যামল তাড়াতাড়ি সিচুয়েশন সামাল দিতে গিয়ে বলে, আরে, এ হল বিশ্বরূপ। এ ব্রাইট বয়। একটা আলোচনা হচ্ছিল। আমি তো টুকুনের পাশে সুটকেস খাড়া করে প্রোটেকশন দিয়ে এসেছি, দেখোনি!

বকুল ঝড়াক করে দরজাটা ছেড়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেল রাগ করে।

ছেলেটার ব্যথাতুর মুখে একটা ক্লিষ্ট হাসি ফুটল, বউদি রাগ করবেন বলেছিলাম।

শ্যামল কাঁধ ঝাকিয়ে স্পোর্টসম্যানের মতো বলল, ম্যারেজ হ্যাজ ইটস টোল। বউ তো রাগ করার জন্যই আছে। রাগ ছাড়া অন্য মুড খুব রেয়ার। আমি সিজনড হয়ে গেছি।

ছেলেটা বেশ লম্বা। শ্যামলের চেয়েও ইঞ্চি দুয়েক। শ্যামল পাঁচ ফুট ন’ ইঞ্চি। এ প্রায় ছ’ ফুট। চেহারাটা বেশ পেটানো। দেখতে ভাল। কিন্তু মুখখানায় একেবারে ছাই মাখানো যেন। সামথিং রং। ভেরি মাচ রং।

খুব ঘুরলেন?— যেন কথা বলার ইচ্ছে নেই, তবু জোর করে বলার মতো বলল ছেলেটা।

শ্যামল সিগারেট শেষ করে বলে, আমরা প্রতি বছরই এ সময়টায় বেরোই। গতবার সাউথ ইন্ডিয়া, তার আগেরবার রাজস্থান, তারও আগে কুলু মানালি। ঘোরাঘুরি এবার বন্ধ করতে হবে। যা অবস্থা। কাশ্মীরে লাশ পড়ছে, পঞ্জাবে লাশ পড়ছে, আরও হবে। ভয় হয়, সব জায়গাতেই না বেড়ানোতে কুলুপ পড়ে যায়। আচ্ছা, আপনি কি চাকরি করেন? না কি বিজনেস? চাকরি!

ওঃ হ্যাঁ, বলছিলেন বটে অফিসের কাজে কলকাতা যাচ্ছেন। দিল্লি বেস করে থাকা খুব ভাল। সেন্ট্রাল জায়গা। কী জানি কেন মশাই, আমার দিল্লি শহরটা বেশ লাগে।

হ্যাঁ, ওপর থেকে খুবই সুন্দর।

নিচু থেকে কি অন্যরকম? নীচের দিল্লিও আছে নাকি?

সব শহরেরই থাকে। ওপর থেকে একরকম, নীচের লেভেল থেকে অন্যরকম।

তাও হয় নাকি? দুটো দিল্লি!

বিশ্বরূপ মৃদু হেসে বলে, দুটো কেন, বড় বড় শহরগুলোর ভিতরে অনেক লেভেল থাকে। যেখান থেকে যেমন দেখায় সেরকমই দেখে মানুষ। পলিটিক্যাল লেভেল, কালচারাল লেভেল, ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল, ক্রাইম লেভেল। আপনি যেটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন শহরটাকে সেই অ্যাঙ্গেল থেকেই বিচার করতে থাকবেন।

ওয়েল বিশ্বরূপ, আপনার লেভেলটা কী? পলিটিক্যাল না কালচারাল?

ক্রাইম।

অ্যাঁ! তার মানে?

আমি পুলিশে চাকরি করি।

মাই গড! আপনাকে আর যা-ই হোক, পুলিশ বলে কিছুতেই মনে হয় না। আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ এ মেলাঙ্কলিক পুলিশম্যান। ওয়েল, ওয়েল, আই অ্যাম ড্যামড।

ক্রাইমের লেভেল থেকে দিল্লি কিন্তু ততটা সুন্দর নয়।

শ্যামল মাথা নেড়ে বলে, সে তো বটেই। আমি ওসব লেভেল-টেভেল থেকে বলছি।। এমনিতে অ্যাপারেন্টলি দিল্লি চমৎকার শহর। অনেকে বলে লাইফ নেই, আড্ডা নেই, অ্যাজ ইফ ওটা একটা ভাইট্যাল ব্যাপার। বাঙালি যে আড্ডা দিয়ে দিয়ে শেষ হয়ে গেল সেটা কে দেখছে?

বিশ্বরূপ ঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, আপনি ভিতরে যান। বোধহয় এতক্ষণে আপনাদের ডিনার সার্ভ করে দিয়েছে। দেরি হলে বউদি ফের রেগে যাবেন।

ওঃ ইয়েস। নতুন করে রাগবার কিছু নেই। উনি ইন ফ্যাক্ট রেগেই আছেন।

বাথরুম ঘুরে দু'জনেই ফিরে আসে কামরায়। শীতল নিস্তব্ধতা। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি। দুটো ঢাকা দেওয়া ট্রে সাজানো রয়েছে টেবিলে। সিটের এক পাশে দুটো বেডরোলও সাজানো রয়েছে। মাড়োয়ারিটি বাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বকুল একটা বাংলা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করছে। মুখটা থমথমে।

গাড়িটা কি পাগল হয়ে গেল? এত জোরে যাচ্ছে কেন? শ্যামল সামান্য উদ্বেগ বোধ করল। একবার তাকাল বকুলের দিকে। ভারী অভদ্র বকুল। সে বিশ্বরূপকে ইনট্রোডিউস করে দিল, বকুল একটা হ্যালো গোছের কিছু বলল না। অত রেগে যাওয়ার কী আছে? এত ন্যাগিং হলে কি চলে?

খাবে?—বইটা রেখে বকুল ঠান্ডা গলায় বলে।

শ্যামল একটু গম্ভীর হয়ে বলে, খেতে পারি।

হাত ধুয়ে এসো। বাস্কেটে সাবান আছে।

জানি।-বলে শ্যামল একটু গুম হয়ে সাবান নিয়ে হাত ধুয়ে এল।

বিশ্বরূপ কিন্তু খাচ্ছে না। ফের জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে।

মুরগির একটা ঠ্যাং তুলে গন্ধটা শুকে নিয়ে শ্যামল বলে, আপনি কি ডিনার সেরে এসেছেন?

বিশ্বরূপ স্তিমিত গলায় বলে, হ্যাঁ।

খাওয়ার সময় শ্যামলের একটা প্যাশন কাজ করে। এতটাই করে যে সে খেতে খেতে গল্প-গাছা বা টিভি দেখা বা অন্যমনস্ক হওয়া পছন্দ করে না। সে খেতে ভীষণ ভালবাসে। ফলে পঁয়ত্রিশেই তার শরীরে বেশ মেদ জমে গেছে। পেটটায় বিশেষ রকমের। আগে তার কুকুরের মতো চিমসে-মারা পেট ছিল। বকুল আর

তার মধ্যে একটা নীরবতার বলয় তৈরি হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে এটা খুবই হয়। যখন-তখন হয় এবং আবার একসময়ে বলয়টা ভেঙেও যায়। মেয়েটা হওয়ার পর থেকেই এটা বেশি হয়েছে। মেয়েকে উপলক্ষ করে তাদের আজকাল বেশ লেগেও যায়।

শ্যামল আর বকুল যখন খাচ্ছে তখন নাঙ্গা সিটের ওপর হাতে মাথা রেখে বিশ্বরূপ একসময়ে গড়িয়ে পড়েছে। খাওয়ার ঝেকে লক্ষ করেনি শ্যামল। খেয়ে আঁচিয়ে এসে সে বকুলকে চাপা গলায় বলে, মাসিমাকে নিতে হাওড়ায় গাড়ি আসবে। একবার বলে দেখবে নাকি গাড়িটা যদি আমাদের একটু পৌঁছে দেয়!

বকুল চুপ করে থেকে রাগের গলায় বলে, তুমিও তো বলতে পারতে?

আহা, সবাই জানে আমার চেয়ে তুমি বেটার টকার।

কাজের বেলায় আমি, না!

প্লিজ! অত রাতে পৌঁছে আমরা স্ক্র্যান্ডেড হয়ে যাব। গাড়ি যখন মাসিমাকে নিতে আসছেই আমাদের ইজিলি পৌঁছে দিতে পারবে।

বকুল সামান্য থমথমে মুখে বলে, আমি পারব না। তুমি যে কেন সামান্য ব্যাপারেই এত টেনশনে ভোগো? তোমাকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। একটা রাত হাওড়ায় বসে থাকলে কী হয়? রাতটাও পুরো নয়। ভোর চারটে সাড়ে চারটেয় ট্যাক্সি চালু হয়ে যাবে। ম্যাক্সিমাম ঘণ্টা তিনেক বসে থাকতে হতে পারে, তাতে এমন কী অসুবিধে বলল তো!

টুকুসটার যে কষ্ট হবে।

কীসের কষ্ট? সুটকেস পেতে শুইয়ে রাখব, অঘোরে ঘুমোবে।

মুখখানা তোম্বা করে শ্যামল বলে, তা অবশ্য ঠিক।

যাও ওপরে উঠে শুয়ে পড়ো। তার আগে আমাদের বেডরোলটা পেতে দাও। কম্বলচাপা দিতে হবে, যা ঠান্ডা ছেড়েছে। ওদের একটু বলল না গো, ঠান্ডাটা একটু কমিয়ে দিতে।

বললেই কি আর দেবে?

বলেই দেখো না।

এত রাতে কি আর মেশিনের লোক জেগে বসে আছে?

তুমি সব ব্যাপারেই বড্ড ফাঁড়া কটো। ঘরের বাঘ, বাইরের বেড়াল। যাও তো, একটু হাঁকডাক করো। পুরুষ মানুষকে একটু হাঁকডাক করতে হয়। মেনিমুখো হয়ে থাকলে চলে না।

যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি।

এইসব ছোটখাটো প্রবলেম কখনওই মেটাতে পারে না শ্যামল। তার কপালটাই এরকম। বউ তাকে যত তাড়না করে ততই সে নার্ভাস হয়ে পড়ে, ততই গুবলেট হয়ে যায় সবকিছু। এই যেমন এখন শ্যামল করিডোর বা আশেপাশে কাউকে পেল না। মেঝেতে একটা কাপড় পেতে দু'টি লোক গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছে। কন্ডাক্টরও জায়গায় নেই। শূন্যকে তো আর কিছু বলা যায় না। শ্যামল অগত্যা ফিরে এল।

কেউ নেই। কাকে বলব?

ইস, এত ঠান্ডায় ঠিক সর্দি লেগে যাবে টুকুসের। ওর তো ঠান্ডা একদম সহ্য হয় না।

ভাল করে কম্বলচাপা দিয়ে রাখো না। মনে করে নাও এটা শীতকাল।

শীতকালের ঠান্ডা আর এয়ারকন্ডিশনারের ঠান্ডা মোটেই এক নয়। আর্টিফিসিয়াল ঠান্ডা শরীরের পক্ষে ভীষণ খারাপ, বিশেষ করে যাদের সর্দির ধাত আছে। তোমার দ্বারা কোনও কাজ হওয়ার নয়। আমি টুকুসকে নিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি বিছানাটা তাড়াতাড়ি করে দাও।

ঠিক এই সময়ে বিষণ্ণ বিশ্বরূপ মৃদু স্বরে বলে, দাঁড়ান, আমি ঠান্ডা কমানোর ব্যবস্থা করে আসছি।

বলে উঠে গেল।

দেখলে! সবাই তোমার মতো নয়। তুমি নিজের জন্য যা পারলে না, এ ছেলেটা পর হয়েও কেমন উঠে গেল।

বিছানা পাততে পাততে শ্যামল বলে, তুমি ছেলেটার সঙ্গে কিন্তু বেশ অভদ্র ব্যবহার করেছ। আমি ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া সত্ত্বেও একটাও কথা বলোনি।

বেশ করেছি। যা ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছিল! সেইজন্যই তো উঠে মাসিমার কাছে গিয়েছিলাম।

তাকাচ্ছিল! ওয়েল, ওয়েল, দ্যাটস এ গুড সাইন।

তোমার মুন্ডু! এখন যাও তো, ওপরে ওঠো। পর্দাটা টেনে দাও।

পায়জামা আর হাওয়াই শার্ট পরা একটা লোক এসে কিউবিকলের ভিতরে উঁকি দিয়ে বলে, ঠান্ডা কমিয়ে দিয়েছি স্যার। বুঝতে পারছেন?

বকুল বলে, না তো। বেশ ঠান্ডাই লাগছে।

আর দশ মিনিটের মধ্যেই টের পাবেন। না হলে বলবেন আমাকে, আমি মেশিনের। কাছেই থাকব।

ঠান্ডাটা বাস্তবিকই একটু কম-কম লাগছিল শ্যামলের। একটু লজ্জাও করছিল। সে পারেনি। বিশ্বরূপ পারল।

ছেলেটা ফিরে আসতেই শ্যামল বলে, থ্যাংক ইউ। আমি লোকটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছিল, তাই বুঝতে পারেননি।

বকুল একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলে, আপনাকে উঠতে হল, লজ্জা করছে সেজন্য। আসলে আমার কর্তাটি একদম মুখচোরা মানুষ। আমিই ওকে চালিয়ে নিই।

বুঝতে পারছি। আপনাদের আরও একটা প্রবলেম আছে বোধহয়। হাওড়া স্টেশনে বেশি রাতে পৌঁছানোর প্রবলেম।

শ্যামল সোৎসাহে বলে, হ্যাঁ, বিগ প্রবলেম।

বিশ্বরূপ মৃদু হেসে বলে, নো প্রবলেম। আমার জন্যও স্টেশনে একটা গাড়ি থাকবে। সেই গাড়িই পৌঁছে দেবে আপনাদের। নিশ্চিন্তে ঘুমোন।

ভগবানে বিশ্বাস ছিল না শ্যামলের। এখন মনে হল, বলা যায় না, ওরকম একটা কেউ থাকলেও থাকতে পারে। একটু একচোখো বটে, বড়লোকদের পিছনেই বেশি তেল খরচা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘোর নাস্তিককেও একটু খাতির-টাতির দেখায়।

বারকয়েক থ্যাংক ইউ বলে বাঙ্কে উঠে পড়ল শ্যামল। এত নিশ্চিন্ত এত ভারহীন লাগছিল তার যে ঘুম আসতে চাইছে না। অথচ, কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম। বাস্তবিকই নিঝুম। হঠাৎ একটু সচকিত হয়ে ওঠে সে, গাড়িটা কি বড্ড বেশি জোরে চলছে না! বড্ড বেশি দুলছে না! ব্রেক-ট্রেক ফেল করেনি তো! এমনও তো হতে পারে যে, কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী ইঞ্জিনে উঠে অ্যাট গান-পয়েন্ট ড্রাইভারকে বাধ্য করছে গাড়ি একনাগাড়ে চালিয়ে নিতে। এ দেশে সবই হতে পারে। কিছু বিশ্বাস নেই।

বাথরুম ঘুরে আসবে বলে বাঙ্ক থেকে নেমে সে দেখল, বকুল আর টুকুস নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওপরের বাঙ্কে মাড়োয়ারি, নীচের সিটে বিশ্বরূপ এবং আশেপাশে কেউ জেগে নেই। সে করিডোরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেল। ট্যাপ থেকে একটু জলও খেল।

এরপর ঘুমটা হল তার। লম্বা ঘুম। সকাল আটটা পর্যন্ত। তখনও পাটনা জংশন আসেনি। আসতে দেরি আছে। টুকুস শান্তভাবে বসে বিস্কুট খাচ্ছে। বকুল আধো-জাগা আধো-ঘুমে শুয়ে আছে তখনও। বিশ্বরূপ জানালার বাইরে তেমনি চেয়ে আছে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বোধহয় বাথরুমে।

শ্যামল ঘড়ি দেখে বলল, আরও লেট করেছে নাকি ট্রেন?

বিশ্বরূপ মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, করেছে। কিন্তু দারুণ রান করছিল মাঝরাতে। মোঘলসরাইয়ের আগে আটকে ছিল অনেকক্ষণ।

এঃ, তা হলে যা ভয় করছিলাম তাই হল।

কীসের ভয়?

মধ্যরাত্রির ভয়।

বিনা স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। কামরার আবছায়া থেকে করিডোরে বেরিয়ে আসে শ্যামল। হাতে পেস্ট লাগানো টুথব্রাশ, কাঁধে তোয়ালে। ডানদিকের দরজাটা খোলা। দরজার সামনে উবু হয়ে বসে একটা লোক দাতন করছে। আর দরজার ওপাশে হা হা করছে উদোম চাষের মাঠ, রোদে ঝলমল। ঠান্ডা বাতাস আসছে হু হু করে। কী যে অপার্থিব সুন্দর লাগল এই পৃথিবীকে! মুগ্ধ হয়ে শ্যামল চেয়ে থাকে। গাছপালা, খেতখামার, কুটির, বোদ, দিগন্ত সে কি অনেক দেখেনি? তবু মাঝে মাঝে এরা সব এক বিশেষ বিন্যাসে এমন অপরূপ হয়ে যায়, যেন ম্যাজিক। আসলে তার মনটাও বোধহয় আজ ভাল আছে। কোনও টেনশন নেই। কিছুক্ষণের সম্মোহন কাটিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে গেল।

সম্মোহন আরও কাটল যখন বেলা তিনটে নাগাদ ঝাঝা স্টেশনের আগে গাড়ি একদম চুপ মেরে গেল। গেল তো গেলই। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। এক ঘণ্টা বাদে অফ করে দেওয়া হল এয়ার-কন্ডিশনার। শোনা গেল, সামনের লাইনে ফাটল। ট্রেন কখন ছাড়বে ঠিক নেই। কন্ডাকটর আর মেকানিকের সঙ্গে কিছু যাত্রী লড়ালড়ি করল বটে, কিন্তু কন্ডাকটর সাফ জবাব দিল, ট্রেন চালু না হলে এ সি চালানো যাবে না সাহেব। মেশিন বসে যাবে। সুতরাং বদ্ধ কামরা গরম হতে লাগল। ভেপে উঠতে লাগল।

বকুল বলল, কী হবে?

হতাশ শ্যামল বলে, কী আর হবে! সাফার করা ছাড়া আর কী উপায় আছে?

কামরার গরম ভ্যাপসা ভাব সহ্য করতে না পেরে অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বিশ্বরূপ অনেকক্ষণ হল সিটে নেই। মাড়োয়ারিও নেই। শ্যামলও উঠল।

কোথায় যাচ্ছ? সিগারেট খেতে?

আরে না। সিগারেটও শেষ হয়ে এল প্রায়। আর মোটে গোটা পাঁচেক আছে। আদ্রা বা পাটনায় কিনে নিলে হত। বাইরে গিয়ে একটু ভোলা হাওয়ায় দাঁড়াই।

আচ্ছা স্বার্থপর তোক তো তুমি! নিজে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াবে! আর আমরা।

এইভাবেই সূচনা হয় এবং লেগে যায়। বিবাহিত জীবনকে কি এখন ভয় পায় শ্যামল? পায় বোধহয়। আবার বকুল ছাড়াও কি তার চলে? প্লাসও আছে, মাইনাসও আছে। পাঁচ বছর বয়সি বিয়েটা শেষ অবধি টিকে থাকবে কি না এ নিয়েও তার সন্দেহ আছে। মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে চলে যায় তাদের ঝগড়া যে শ্যামল সংসার-ত্যাগের কথা ভাবে, ডিভোর্সের কথা ভাবে। মেয়েটা হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের কিছু অবনতি হয়েছিল। তারপর থেকে ক্রমাবনতি।

শ্যামল খুব ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বলে, তুমি নামতে চাও? কিন্তু ট্রেন হঠাৎ ছেড়ে দিলে!

মোটেই নামতে চাই না। তুমিও নামবে না। সকাল থেকে মেয়েটাকে আগলে বসে আছি। ওকে একটু রাখো, আমি শোব। মাথা ধরেছে।

অগত্যা মেয়েকে কোলে নিয়ে শ্যামল বলে, একটু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি কি? না কি তাতেও আপত্তি আছে?

গাড়ি থেকে নামবে না কিন্তু, খবরদার!

আরে না।

করিডোরে এখন দু'দিকেরই দরজা খোলা। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ। প্রকৃতির দৃশ্য এখন আর তত সুন্দর নেই। রুক্ষ, গরম, ঘোলাটে, বাইরে অন্তত কয়েকশো লোক নেমে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। হকার ঘুরছে। শান্ত মেয়েটিকে কোলে নিয়ে শ্যামল দাঁড়িয়ে রইল। থেমে থাকা ট্রেনের মতো এমন অভিশাপ আর মানুষের জীবনে কীই বা আছে?

ওটা কী বাবা?

শ্যামল হঠাৎ দুর্দশার কথা ভুলে মেয়ের গালে নাক ডুবিয়ে দিল।

০৩. মস্ত নিমগাছের ছায়ায়

॥ তিন ॥

মস্ত নিমগাছের ছায়ায় এখনও খাঁটিয়া পাতা। খাঁটিয়ায় আধময়লা সবুজ সস্তা একখানা চাদর বিছানো, একখানা বালিশ। খাঁটিয়ার মাথার দিকে পায়ার কাছে ঝকমকে পেতলের ঘটি, তাতে ঢাকনা দেওয়া। পীতাম্বর মিশ্র সুতরাং বাড়িতেই আছেন। রিকশা থেকে নেমে কাঠের ফটক ঠেলে বাড়ির চত্বরে ঢুকেই অনুমানটা মজবুত হল অজিতের। পীতাম্বর মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস নিমগাছের ছায়া এবং নিমের হাওয়ার জোরেই সত্তরেও তার স্বাস্থ্য এত ভাল।

স্বাস্থ্য কতটা ভাল এবং সক্ষম সেটা পরীক্ষা করতেই কি পীতাম্বর হঠাৎ মাত্র কয়েকমাস আগে ছাব্বিশ বছরের দুরন্ত এক দেহাতি যুবতীকে বিয়ে করে বসলেন? না কি বিয়েটা আসলে এতদিন বাদে তার "এক্স ওয়াইফ" ভজনাদেবীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই?

বেলা সাড়ে দশটাও বাজেনি, গরমের রোদে চারদিক যেন চিতাবাঘের মতো ওত পেতে আছে। বিহারের গ্রীষ্ম মানেই বাঘের থাবা। পীতাম্বর মিশ্রর বাড়িটা তেমন কিছু দেখনসই না হলেও এলাকা বিশাল। চারদিক মাটি আর ইটে গাঁথা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে মস্ত ইদারা দেখা যাচ্ছে। ইদারার ওপর কপিকল লাগানো। সরু শেকলে বাঁধা বালতিতে মহেন্দ্র জল তুলছে।

অজিত একটু দুর থেকেই হাঁক দিল, মহিন্দর, মিশিরজি হ্যায়?

জি সাব। বৈঠ যাইয়ে। লালুয়া, আরে এ লালুয়া, চারপাই লাগা রে!

পীতাম্বর মিশ্রর পার্সোনালিটিকে কখনও সন্দেহ হয়নি অজিতের। তার ঘরদোর এবং তাকেও যারা সামলে রাখে তারা কেবলমাত্র বেতনভুক চাকরবাকর নয়।

এরা মিশ্রজির ভক্ত এবং অনুগামীও বটে। মহেন্দ্র বোধহয় ত্রিশ বছরের ওপর পীতাম্বরের কাছে আছে। লালুয়াও আছে শিশুকাল থেকে। পীতাম্বরের কাছ থেকে এরা অর্থকরী দিক দিয়ে তেমন কিছু পায় না, অজিত জানে।

অনাথ শিশু লালুয়া এখন কিশোরটি হয়েছে। থ্যাবড়া নাকের নীচে গোঁফের সুস্পষ্ট আভাস, পুরু ঠোঁটের ফাঁকে তৃপ্তি এবং আনন্দময় একটা হাসি। চারপাইটা ছায়ায় পেতে দিয়ে খুশিয়াল গলায় বলে, বৈঠ যাইয়ে। অউর বিড়ি মত পিজিয়ে।

এ বাড়ির চৌহদ্দিতে ধূমপান নিষেধ। খৈনিও নয়। এ বাড়িতে চা বা অন্য কোনও নেশার দ্রব্যের প্রচলন নেই। পীতাম্বর নেশার ঘোর বিরোধী। অজিত দড়ির চারপাইতে বসে বলল, পানি তো পিলা রে।

পানি এবং পীতাম্বর প্রায় একসঙ্গেই এলেন। পরনে ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া গোছের জিনিস, তাতে পকেট আছে। পায়ে খড়ম। গামছাও থাকে কাঁধে, তবে এখন সেটা বালিশের আড়ালে রাখা আছে, দেখতে পেল অজিত। গত বাইশ বছরে পীতাম্বর তেমন পালটায়নি। বাইশ বছর ধরে অজিত তাকে দেখে আসছে। তারও আগে থেকেই পীতাম্বর বোধহয় একইরকম থেকে গেছেন।

পীতাম্বর প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন, কলকাতায় ছাত্র আন্দোলন করেছেন এবং কিছুদিন চাকরিও। জলের মতো বাংলা বলতে পারেন। অজিত যেমন পারে হিন্দি বলতে। কিন্তু পীতাম্বর বোধহয় অজিতের হিন্দিকে তেমন বিশ্বাস করেন না, বরাবর অজিতের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন। অজিত যখন জল খাচ্ছিল তখন পীতাম্বর খাঁটিয়ায় বসে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখছিলেন।

আশাকরি তুমি ইন্টারভিউ নিতে আসোনি!

অজিত একটু অবাক হয়ে বলে, ইন্টারভিউ? না তো!

মজবুত দাত দেখিয়ে পীতাম্বর হাসলেন, আমি এখন নিঃশেষিত পানপাত্র। কেউ আর পোঁছে না। তবে বিয়ে করার পর কিছু কাগজ কেচ্ছা হিসেবে সেটা ছেপেছে। তোমার মতলব কী? ইজ ইট এ প্রফেশনাল ভিজিট?

অজিত পিতাম্বরকে ভালই চেনে। যখন রাজনীতি করতেন তখনও রাজ্যসভায় মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত মন্তব্য করতেন বা ছড়া কাটতেন যে লোকে বলত ছিটিয়াল।

তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়নি। তোমার চোখ দেখে মনে হয় লিভার ভাল কাজ করছে না। বোধহয় রাত জাগো। আজকাল কি ড্রিংকও ধরেছ নাকি?

না মিশিরজি। আপনি তো জানেন নিউ পাটনা টাইমস ছোট কাগজ। ভাল চলছে না। রিট্রেনচমেন্ট তো হবেই, কাগজও উঠে যেতে পারে। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি।

তোমার এডিটর রঙ্গনাথ হচ্ছে একটি আস্ত পাঠা, বিক্রি বাড়াতে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে। ওতে কি কাগজ চলে? এ দেশে খবরের অভাব নেই, ঠিকমতো লিখতে পারলে কত খবর কুড়িয়ে আনা যায়। তোমরা শুধু বস্তাপচা রাজনীতি ছাপবে, তাতে হয়? এ দেশের রাজনীতি নিয়ে কারও কোনও মোহ আছে বলে মনে করো? আমি তো করি না। আমি কীসের ওপর রিসার্চ করছি এখন জানো?

কীসের ওপর?

এ কে ফর্টি সেভেন। কালাশনিকভ। উজি। অনেক বই আনিয়েছি।

অজিত একটু অবাক হয়ে বলে, রিসার্চ করছেন কেন? এসব তো টেরোরিস্টদের অস্ত্রশস্ত্র।

বটেই তো। উগ্রবাদীরাই তো ক্ষমতায় চলে আসছে। তোমার গভর্নমেন্টকে তো হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে উগ্রবাদীরা। এত কামান বন্দুক পুলিশ মিলিটারি লেলিয়ে কিছু করতে পারলে? আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি উগ্রবাদীরা আরও বহুত খেল দেখাবে।

অজিত অবাক হয়ে বলে, আপনি কি মনে করেন উগ্রবাদীরা পাওয়ারে আসবে?

উগ্রবাদীরা আর অলরেডি ইন পাওয়ার। এখন তো তারাই সরকারকে ইচ্ছেমতো চালাচ্ছে। পঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, খানিকটা বিহার, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ক'টা স্টেট হল অজিত? সব জায়গায় উগ্রবাদীরা তোয়াজ আর খাতির পাচ্ছে। কীসের জোরে জানো? এ কে ফর্টি সেভেন, কালাশনিকভ, উজি। এসব নিয়ে আমি পড়ছি এবং লিখছি। হাতেকলমেও দেখছি।

অজিত নড়েচড়ে বসে বলে, হাতেকলমে?

পীতাম্বর তার চিরকেলে চাপা হাসি হেসে বলেন, কাউকে যদি না বলো তো বলতে পারি।

আপনি কি কোনও অস্ত্র হাতে পেয়েছেন মিশিরজি?

আলবাত। এসব কি শুধু থিয়োরেটিক্যাল নলেজ থেকে হয় নাকি? দেখতে চাও?

চাই।

তা হলে এসো।

পীতাম্বরের পিছু পিছু তাঁর বাড়ির পিছন দিককার একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল অজিত। একটা সুটকেস খুলে পীতাম্বর দেখালেন ভাঁজ করা খুলে রাখা একটা রাইফেল! খুবই আধুনিক জিনিস।

পীতাম্বর বললেন, কয়েক সেকেন্ডে অ্যাসেম্বল করা যায়। আমি রোজ প্র্যাকটিস করি। তবে দুঃখের বিষয় গুলি নেই। কয়েক দিনের মধ্যে পেয়ে যাব। তখন চাঁদমারি করব পিছনের বাগানে।

পীতাম্বর কি পাগল হয়ে গেলেন? অজিত এত অবাক হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, আপনার কি এর লাইসেন্স আছে মিশিরজি?

পাগল! এর লাইসেন্স সরকার কাউকে দেয় নাকি? লাইসেন্সের প্রয়োজনই বা কী? হাতে হাতে ঘুরছে। অ্যাভেলেবল এভরিহোয়ার। তুমি যদি মিলিটান্ট হওয়ার ডিসিশন নাও তা হলে তোমার হাতেও এসে যাবে।

অজিত একটু শিহরিত হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে কি উগ্রবাদীদের যোগাযোগ আছে? মিশিরজি তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে তাকে ঘরের বাইরে ঠেলে বের করে দরজায় তালা দিয়ে বললেন, আছে। তোমার নেই?

না। আমার কী করে থাকবে?

তা হলে তুমি কীসের রিপোর্টার? ঘোড়ার ঘাস-কাটা রিপোর্টিং করে বলেই তোমাদের কাগজগুলো এত স্টেল। আমি অ্যাকটিভ পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছি

বলেই ধরে নিয়ে না যে আমি পলিটিক্যালি ডেড। আই অ্যাম ভেরি মাচ ইন পলিটিক্স। ভারতবর্ষের ভাবী পলিটিক্স যেখানে তৈরি হচ্ছে আমি সেই গর্ভগৃহ আন্ডারগ্রাউন্ডের পলিটিক্সকে এখন স্টাডি করছি। তুমি কি নার্ভাস হয়ে পড়লে অজিত?

হ্যাঁ মিশিরজি। খুবই নার্ভাস। আপনি এসব কেন করছেন?

সেটা আগেই বলেছি। তোমার মাথা ক্রিয়া করছে না বলে বুঝতে পারেনি। বাঙালি হয়ে উগ্রবাদের প্রসঙ্গে নার্ভাস হয়ে পড়া কি তোমাকে মানায়? উগ্রবাদের জন্ম দিয়েছিল কে অজিত? ব্রিটিশ আমলের কথা বাদ দাও, নকশাল মুভমেন্টও কি ভুলে গেছ? বাঙালি নকশালদের হাতে এইসব অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তারা দিশি বোমা, ভোজালি, চপার, কয়েকখানা পিস্তল আর পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাই করা পুরনো মডেলের কয়েকটা রাইফেল নিয়ে গোটা দেশ কাঁপিয়ে ছেড়েছিল, মনে নেই? ভাবতে পারো ওরা এইসব সফিস্টিকেটেড অস্ত্র পেলে কী কাণ্ড করতে পারত? পুরো পাওয়ার নিয়ে নিতে পারত হাতে! বাঙালি এখন নকশালি ছেড়েছে, কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে রেখে গেছে তার প্রভাব। নকশালরাই তো এই উগ্রবাদের গুরু এবং অগ্রপথিক। বাঙালি ছেড়েছে। ধরেছে বিহার, অন্ধ্র, কেরল। ধরেছে কাশ্মীর, পঞ্জাব, অসম, তামিলনাড়ু। আরও ছড়াবে। বহুত ছড়িয়ে যাবে। তোমাদের নপুংসক গদি আঁকড়ে থাকা আর কর্তাভজা রাজনীতির দিন শেষ হয়ে আসছে।

পীতাম্বরের বাড়িটি নেহাত ছোট নয়। অনেকগুলো ঘর। আসবাবের বাহুল্য নেই। আধুনিকতারও বালাই নেই। পীতাম্বর খুব সহজ সরল জীবনযাপন করতে ভালবাসেন। বাহুল্য পছন্দ করেন না। যে ক'টা কারণে পীতাম্বরকে এখনও গভীর শ্রদ্ধা করে অজিত তার একটা হল লোকটার এই সাদাসিধা জীবনযাপন।

আমার মনে হচ্ছে অজিত, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাটিকে দেখার একটা আগ্রহ তোমার আছে। দেখতে চাও?

অজিত অন্যমনস্ক ছিল। পীতাম্বর তাকে যথেষ্ট নার্ভাস করে দিয়েছেন। সে একটু চমকে উঠে বলল, না না, সেরকম কোনও–

আরে, লজ্জা পাচ্ছ কেন? বি ফ্র্যাঙ্ক। তুমি তো জানো আমি ফ্র্যাঙ্কনেস পছন্দ করি।

আমি অন্য একটি দরকারে এসেছিলাম মিশিরজি। আমি বলতে এসেছিলাম নিউ পাটনা টাইমসের কোনও স্থায়িত্ব নেই। আপনি আমাকে এই চাকরিটা দিয়ে একসময়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে চাকরিটা থাকবে না। কাগজটা হয়তো উঠে যাবে।

মিশিরজি অতিশয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, ওসব বস্তাপচা কাগজ রেখেই বা লাভ কী অজিত? তুলে দাও, না হলে রঙ্গনাথের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেরা চালাও। আর ভজনার কোষ্ঠী ও জাতক বিচারটা সবার আগে বাদ দিয়ে দেবে। জ্যোতিষী একটা মস্ত ধাপ্পাবাজি।

অজিত একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, আপনি হয়তো ওঁর ওপর রেগে আছেন। কিন্তু নিউ পাটনা টাইমসের সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন হল, ভজনা দেবীর ফোরকাস্ট এবং জাতক বিচার।

ভ্রু কুঁচকে পীতাম্বর বলে, জানি। ভজনার কাছে এখন বহু ভি আই পি তাদের ভাগ্য জানতে আসে। অনেকে নাকি তাকে আজকাল মাতাজি বলেও ডাকে। খুব শিগগিরই হয়তো সে একটা স্পিরিচুয়াল লিডার হয়ে উঠবে। এই পোড়া দেশে এরকম ঘটাই তো স্বাভাবিক। তুমি বোধহয় তার কাছে যাতায়াত করো!

মিশিরজি, উনি আমাকে স্নেহ করেন। আমাদের কাগজে ওঁকে লিখতে রাজি করিয়েছিলাম আমি। যতদিন উনি লিখবেন ততদিন আমি সেফ।

পীতাম্বর হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হাসলেন, তাই বলো! ভজনাকে তা হলে তুমিই ভিড়িয়েছ ওই কাগজে। এখন আমার কাছে আসার মতলবটা কী? ভজনা যখন তোমার ফেবারে আছে তখন চিন্তা কীসের?

কাগজটা রিভাইটালাইজ করতে হলে আপনাকেও আমাদের দরকার। আপনি একসময়ে দারুণ জার্নালিজম করেছেন।

লেখা-টেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি অজিত। লিখে কিছু লাভ নেই। যে দেশে নিরক্ষরের হার এত বেশি সে দেশে কাগজে লিখে কোনও ফল হয় না। আমি যা বলতে চাই তা ওই নিরক্ষরদের জন্যই। আমি অন্য মিডিয়ামের কথা ভাবছি যা কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছবে।

মিশিরজি, সমস্যাটা আমার একার নয়। গোটা কাগজ এবং তার চল্লিশ-পঞ্চাশজন কর্মচারীর। আপনি লিখতে শুরু করলে কাগজটা বোধহয় বেঁচে যাবে।

কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ। একে যে তেল-দেওয়া বলে তা জানো?

জানি। আর এও জানি যে মানুষ সত্তর বছর বয়সে এ কে ফর্টি সেভেন নাড়াচাড়া করে সে তেলের তোয়াক্কা করে না।

পীতাম্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, আমি যা লিখব তা ছাপাতে পারবে?

অজিত একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, আপনি এখন উগ্রবাদ নিয়েই বোধহয় লিখবেন? তা-ই লিখবেন। ছাপব।

ইট মে বি ভেরি এক্সপ্লোসিভ অ্যান্ড ডেনজারাস অ্যান্ড সিডিশাস। রঙ্গনাথ অ্যারেস্টও হয়ে যেতে পারে।

রঙ্গনাথজির অনেক দোষ আছে, কিন্তু উনি এ ব্যাপারে খুব সাহসী। উনি আগেও দু'বার গ্রেফতার হয়েছেন এবং আমাদের কাগজের বিরুদ্ধে অন্তত চারটে ডিফারমেশন কেস ঝুলছে।

লেখা কিন্তু এডিট করতে পারবে না।

পাগল! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

ঠিক আছে, তোমার মুখ চেয়ে লিখব। তুমি আমার ছেলের মতো। তোমার অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়, তবু স্নেহ জিনিসটা বোধহয় কোনও যুক্তিরই ধার ধারে না। আচ্ছা একটা কথা বলতে পারো, বাঙালিদের এরকম হাল হল কেন?

কীরকম হাল মিশিরজি?

কিছুদিন আগে পুরুলিয়ায় দুটো শিখ উগ্রবাদী ঢুকে পড়েছিল, মনে আছে?

আছে।

সংখ্যায় তারা মাত্রই দু'জন। দুটো লোক সারা জেলায় দাপাদাপি করে বেড়াল, মানুষ মারল, পুলিশ মারল। তাদের ভয়ে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে দেওয়ার মতো

অবস্থা হল পুলিশের। ধেয়ে এল লালবাজার এবং বিরাট অপারেশনের আয়োজন হল। প্রায় বাঘ মারার মতো করে মারা হল তাদের। হোয়াট এ গ্রেট ফুলিশনেস। যেখানে দু'জন উগ্রপন্থীকে ধরলে অনেক ইনফর্মেশন আদায় করা যেত, পাওয়া যেত অনেক গুপ্ত খবর সেখানে তাদের ধরার চেষ্টাই হল না। মেরে ফেলা হল। অথচ সে দুটো মানুষ তখন অবসন্ন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। লড়াই করার ক্ষমতাও তাদের আর ছিল না। আর কিছুক্ষণ ঘিরে রাখলেই অজ্ঞান অবস্থায় তাদের ধরা যেত। কিন্তু বাঙালি পুলিশ এত ভয় খেয়ে গিয়েছিল যে, তারা সেই চেষ্টাই করেনি। আমি শুধু ভাবছি মাত্র দুটো লোক আর দুটো এ কে ফর্টি সেভেন যদি তোমাদের এই অবস্থা করতে পারে তা হলে পঞ্চাশ বা পাঁচশো উগ্রবাদী ঢুকে পড়লে তো তোমাদের সরকার গদি ছেড়ে পালিয়ে যাবে! বাঙালিদের হল কী অজিত? উগ্রবাদের আগরওয়ালাদের এই হাল কেন?

মিশিরজি, আপনি বড় উগ্রবাদের ভক্ত হয়ে পড়েছেন।

না রে বাচ্চা, আমি আরও বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছি এ কে ফর্টি সেভেনের। আমি রোজ অস্ত্রটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। চিনের সবচেয়ে সাকসেসফুল এক্সপোর্ট আইটেম। তার চেয়েও বড় কথা, এ কে ফটি সেভেনই এখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সম্মানিত জিনিস।

অস্ত্রটা আপনাকে কে দিল?

আছে আছে। তুমিও যদি চাও তো পাবে। কিছু টাকা খরচ করতে হবে, এই যা। নিমগাছের নীচে গিয়ে বসো, আমি মিঠিয়াকে ডাকছি। সে বোধহয় গোসলখানায় আছে।

আমার দ্বিতীয় পক্ষকে দেখে যাও, ভজনাকে গিয়ে বোলো কেমন দেখলে।

লজ্জা পেয়ে অজিত বলে, কী যে বলেন মিশিরজি!

নিমের ছায়ায় বসে লালুয়ার এনে-দেওয়া এক গেলাস ঘোল খেল অজিত। তারপর মিশিরজি এলেন, পিছনে সদ্যস্নাতা এক যুবতী। যুবতীই বটে। সারা অঙ্গে এমন উচ্চাবচ ব্যাপার যে তাকাতে লজ্জা করে।

আরে আরে, নববধুর মতো মুখ নামিয়ে নিলে যে! দেখো, ভাল করে দেখে নাও। ভজনাকে গিয়ে বোলো, আমার বয়স সত্তর আর আমার দ্বিতীয় পক্ষের বয়স

তেইশ, তবু ওর কোনও অভিযোগ নেই। শি ইজ কনটেন্টেড। ইচ্ছে করলে তুমি ওকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তবে খবরদার, পরকীয়া করার চেষ্টা কোরো না। জানোই তো, আমার এ কে ফর্টি সেভেন আছে।

এটা সেই গ্রীষ্মকালের কথা। অজিত পাটনায় ফিরে পরদিনই ভজনা দেবীর বাড়িতে গেল। ভজনাকে সে মা বলে ডাকে। শুধু জ্যোতিষী করে কেউ যে এই ভাল আর্থিক অবস্থায় পৌঁছতে পারে তার ধারণা ছিল না অজিতের। আগেও জ্যোতিষবিদ্যা চর্চা করতেন, ডিভোর্সের পর সেটা পেশা হিসেবে নিলেন। পাটনার এক গলিতে একখানা ঘর নিয়ে থাকতেন। এখন বাড়ি করেছেন দোতলা। গাড়িও কিনবেন। পীতাম্বর মিথ্যে বলেননি, অনেকেই আজকাল ভজনাকে মাতাজি বলে ডাকে। তার চেয়েও বড় কথা ভজনা দেবী এখন এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, নানা পর্যায়ে তার প্রভাব ক্রমে বাড়ছে। বেশিরভাগ সময়েই লালপেড়ে গরদ পরে থাকেন, সিঁথিতে তেল সিঁদুর বহাল আছে। অজিতের কাছ থেকে বিবরণ শুনে বললেন, মিশিরজির কাছে তুই হঠাৎ যেতে গেলি কেন? লোকটা ভেবে নিল, আমিই তোকে পাঠিয়েছি ওর নতুন বউকে দেখে আসতে।

সেরকমই ভাবলেন। কিন্তু আমাকে পাঠিয়েছিলেন রঙ্গনাথজি। পীতাম্বরের লেখা তো খুব ঝাল মশলাদার হয়, ইংরিজিটা লেখেনও চোস্ত। কাগজটা একটু হয়তো চলবে।

বউটা কি ভাল? যত্নআত্তি করে?

সেটা কী করে বলব? তবে মিশিরজি ভালই আছেন।

লালুয়াটা কেমন আছে?

ভাল মা। সব ভাল।

ভাল হলেই ভাল। তবে একটা ফাঁড়া আছে মিশ্রজির।

এর বেশি কিছু আর ভজনা দেবী বলেননি। অজিতেরও আগ্রহ হয়নি জানবার।

পুজোর আগে রঙ্গনাথজি ডেকে বললেন, অজিত, পীতাম্বরের কোনও খবর নেই। লেখাটা কী হল? তুমি পাত্তা লাগাও।

ঠিক আছে, চিঠি দিচ্ছি।

আরে দূর। পীতাম্বর চিঠির জবাব দেওয়ার মতো ভদ্রলোক নাকি? নিজে চলে যাও। ক্যাশ থেকে যাওয়া-আসার ভাড়া তুলে নিয়ে যাও, আমি অ্যাকাউনট্যান্টকে স্লিপ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ফের পীতাম্বরকে ধরা-করা করতে এল অজিত। এসেই বুঝল, সব ঠিকঠাক নেই। কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটেছে। সেটা এতই বেশি যে, ফটকে ঢোকবার আগেই বোঝ যায়। ফটকের কাছে লালুয়া দাঁড়িয়ে ছিল, অজিতকে দেখেই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। অজিত কাছে এসে দেখল, ফটকে তালা আটকানো। দুটোই অস্বাভাবিক ঘটনা।

অজিত বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, লালুয়া! এ লালুয়া! মহেন্দর!

একটু বাদে লালুয়া বেরিয়ে এল। হাতে চাবি। মুখে হাসি নেই। ফটক খুলে অজিতকে ঢুকতে দিয়েই আবার তালা আটকাল।

অজিত অবাক হয়ে বলে, তালা দিচ্ছিস কেন?

ওইসাহি হুকুম হ্যায়।

বাইরে নিমগাছের ছায়ায় তাকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল লালুয়া। বাইরে যে খুব কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, কিন্তু অজিত কেমন অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করল, বাড়িটায় কোনও প্রাণ নেই। কেন যেন থমথম করছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে পীতাম্বর এলেন। অপেক্ষাকৃত ধীর চলন। মুখ একটু যেন বেশি গম্ভীর। কিংবা গাম্ভীর্যের চেয়ে বলা উচিত উদ্বিগ্ন। গ্রীষ্মকালে যা দেখে গিয়েছিল তার চেয়ে যেন এই কয়েক মাসে একটু বুড়িয়ে গেছেন।

মিশিরজি, কী হয়েছে?

কিছু হয়নি তো! কী হবে?–পালটা বিস্ময় প্রকাশ করেন পীতাম্বর। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য হল না। কৃত্রিম শোনাল।

আপনার শরীর খারাপ করেনি তো?

শরীর থাকলেই খারাপ-ভাল হয়।–শুকনো গলায় বললেন পীতাম্বর। আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে গলায়।

কে জানে বাবা কী। নতুন বউটা পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো! বিয়েটাই বোধহয় ভুল হয়েছিল। অজিত বিনীতভাবে লেখাটার কথা তুলতেই পীতাম্বর যেন চমকে ওঠেন, লেখা! কীসের লেখা!

ভুলে গেছেন মিশিরজি? আমাদের কাগজে লিখবেন বলেছিলেন যে। রঙ্গনাথজির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। লেখা না পেলে আমার চাকরি থাকবে না।

পীতাম্বরের মুখে বিরক্তি এবং হতাশা যুগপৎ ফুটে উঠল। তেতো গলায় বললেন, লেখা টেখা আমার আসছে না বাপু। আমি খুব পরেসান আছি।

কেন মিশিরজি?

এত প্রশ্ন করো কেন অজিত? আমি এত প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

রাগলে পীতাম্বর একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন বটে, কিন্তু সহজে রাগবার পাত্রই উনি নন। সারাজীবন পলিটিক্স করে করে ঝানু হয়েছেন। গালমন্দ অপমান বিস্তর হজম করতে হয়েছে। রাগ উত্তেজনা ভাবাবেগ সবই অতিশয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। তাই এই সামান্য কথায় পীতাম্বরকে রেগে যেতে দেখে অজিত খুবই অবাক হল। এরপর কী বললে পীতাম্বর রাগ করবেন না সেটা বুঝতে না পেরে অজিত চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। হতবুদ্ধি।

পীতাম্বর নিজে থেকেই বললেন, আজ বরং যাও অজিত। পরে যোগাযোগ কোরো। আমার এখন একটু–

বলেই থেমে গেলেন।

অজিত খুব গাড়ল নয়। সাংবাদিকতা করে করে তার চোখ কিছু পেকেছে। হঠাৎ তার মনে হল, মুখ নয়, কিন্তু পীতাম্বরের চোখ তাকে কিছু বলতে চাইছে। সে স্থির চোখে পীতাম্বরকে নজর করতে করতে বলল, মিশিরজি, আমি আপনার অতিথি। অন্তত একটু জলও তো পেতে পারি।

জল! ওঃ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এ লালুয়া

লালুয়া নয়, খুব ধীর পায়ে পায়জামা আর গেঞ্জি পরা একটা বিশাল চেহারার যুবক সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পেয়ারা গাছটার নিচু ডালে হাতের ভর রেখে দাঁড়াল। ছোকরাকে জন্মে দেখেনি অজিত।

লোকটি কে মিশিরজি?

পীতাম্বর খুব দ্রুত বললেন, আত্মীয় হয়। আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের।

পীতাম্বর জীবনে মিথ্যে কথা বলেছেন খুবই কম। হয়তো-বা একটিও বলেননি। এই মিথ্যেটা বলতে তাই বোধহয় তার মুখ ব্যথাতুর হয়ে উঠল। আগন্তুকটি কদাচ মিঠিয়ার আত্মীয় হতে পারে না। মিঠিয়া দেহাতি পেঁয়ো যুবতী, এ ছোকরার চোখে মুখে শিক্ষা ও আভিজাত্যের ছাপ আছে।

হঠাৎ পীতাম্বর বলে উঠলেন, যা দেখতে পাচ্ছ না তা কল্পনা করে নিয়ো না অজিত। প্লিজ।

কথাটার মানে অজিত বুঝতে পারল না। আলটপকা এ কথাটা পীতাম্বর বলছেন কেন? তবে সে ফের স্পষ্টভাবে টের পেল, পীতাম্বরের মুখ এক কথা বলছে, কিন্তু চোখ অন্য কিছু বলতে চাইছে।

অজিত খুব ভিতু নয়। সে মাফিয়া লিডার থেকে শুরু করে খুনে লুচ্চা বদমাশ বিস্তর ঘেঁটেছে চাকরির সুবাদে। সে হঠাৎ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে, ছোটে মাতাজির আত্মীয়ের সঙ্গে কি পরিচয় হতে পারে না মিশিরজি?

পীতাম্বর হঠাৎ সচকিত হলেন, পরিচয়! ওঃ হ্যাঁ, কেন নয়?

পীতাম্বরের অস্বস্তি লক্ষ করে হঠাৎ অজিত লোকটার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, নমস্তে জি, আইয়ে না, বৈঠিয়ে ইহা পর।

লোকটা খুব অবাক হল। তবে এল। বেশ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পদক্ষেপ। বেশ অহংকারী উচ্চশির গেরামভারী হাবভাব। মুখে হাসি-টাসি নেই। চারপাইয়ের ওপর সাবধানে বসে পলকহীন চোখে অজিতের দিকে চেয়ে রইল। জরিপ করছে। হিসেব করছে।

অজিতের একটা ইনটুইশন আছে। খুনি দেখলেই সে চিনতে পারে। কখনও ভুল হয় না। খুনির চোখে একটা আলগা চকচকে ভাব থাকবেই। সবাই বুঝতে পারে না, অজিত পারে। সে স্পষ্টই বুঝে নিল, এ লোকটা খুনি। পীতাম্বরের বাড়িতে এর জায়গা হওয়ার কথাই নয়। পীতাম্বরের বাড়ির জীবনযাত্রার একটা প্যাটার্ন আছে, তাতে এ ভীষণ বেমানান।

তার চেয়েও বড় কথা, মুখটা অজিতের চেনা। আবছা হলেও চেনা। কোনও ফোটোগ্রাফে সে এই মুখটা দেখেছে।

পীতাম্বর গুম মেরে গেছেন।

অজিত তরল গলায় হিন্দিতে বলে, আপনি মিশিরজির শ্বশুরবাড়ির মেহেমান শুনলাম। আমি অজিত, সামান্য সাংবাদিক।

লোকটা বিবেকানন্দের মতো বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দুর্দান্ত গমগমে গলায় বলে, ইহা ক্যা কাম হ্যায়?

অজিত মৃদু হেসে বলে, মিশিরজিকা সাথ কুছ কাম হ্যায়।

লোকটা অপমানজনক গলায় প্রায় ধমকে উঠল, তো ওহি কর লিজিয়ে।

পীতাম্বরের অস্বস্তি এরপরে বেড়ে গেল। অজিত সংকেতটা বুঝতে পারছে। কিন্তু পীতাম্বরের চোখ কী বলছে বা বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারল না। শুধু আন্দাজ করল পীতাম্বর সুখে নেই, সোয়াস্তিতে নেই, পীতাম্বর ভয় পেয়েছেন, চাপের মধ্যে আছেন।

অজিত উঠল। স্বাভাবিক গলায় বলল, আজ চলি মিশিরজি। আমাদের লেখাটার কথা মনে রাখবেন। সপ্তাহে একটা। পার আর্টিকেল আমরা দুশো টাকা করে দেব।

ভেবে দেখব। এখন যাও। ঠিকমতো কাম কাজ করো। হুশিয়ারসে। রঙ্গনাথকে বোলো আমরা ভাল আছি। ভজনাকেও বোলো।

পীতাম্বরের পুরো কথাটাকেই কেন সংকেতবাক্য বলে মনে হল অজিতের? যখন চলে আসছিল তখন শুনতে পেল, লোকটা পীতাম্বরকে জিজ্ঞেস করছে, হু ইজ হি?

লাইক মাই সনা—পীতাম্বর বললেন।

পাটনায় ফিরে অজিত সোজা অফিসে চলে গেল। তখন অনেক রাত। নাইট শিফট চলছে। অজিত তার কাগজ এবং অন্যান্য কাগজের পুরনো ফাইল নিয়ে বসল। বেয়ারা হবিবুরকে বলল, টেররিস্টদের ফোটোর ফাইলটা বের করে আনো।

প্রায় সারা রাত ফাইল ঘাঁটল অজিত। ভোরের দিকে একটা ফোটোগ্রাফ খুঁজে বের করল। পিছনে একটা ট্যাগ লাগানো। বেশ বড় ট্যাগ। সুরেন্দ্র ওরফে হরমিক সিং ওরফে বুক্কা ওরফে নাম সিং... অনেক নাম। সাসপেকটেড কিলার অফ... খুনের তালিকাটাও বেশ বড়। বেসড ইন কানাডা। সঙ্গে সবসময়ে দু'জন বা তিনজন সঙ্গী থাকবেই। চার বছর আগে দিল্লিতে ছিল, একবার গ্রেফতার হয়, কিন্তু প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে যায়। সবসময়ে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও থেমে থাকে না। প্রপার আইডেন্টিফিকেশনের জন্য দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সকাল আটটায় টেলেক্স করল অজিত। কী হবে কে জানে!

তারপর ফোন করল ভজনা দেবীকে, মাতাজি, পীতাম্বর সাহেবের সত্যিই ফাঁড়া।

ভজনা দেবী শান্ত গলাতেই বলেন, কী হয়েছে রে?

আপনি অনেক ভি আই পিকে চেনেন মাতাজি। আপনি বললে তাড়াতাড়ি কাজ হবে। মিশিরজি বিপন্ন। নিজের বাড়িতেই উনি একজন উগ্রবাদীর প্রতিভূ হয়ে আছেন।

কী যা-তা বলছিস রে পাগলা?

ঠিকই বলছি।অজিত সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে গেল।

ভজনা দেবী একটু চুপ করে থেকে বলেন, তোকে তো বলেইছি ওর ফাঁড়া আছে।

এখন জ্যোতিষ ছাড়ুন মাতাজি। মবিলাইজ অল রিসোর্সেস।

আমার কি সত্যিই কিছু করা উচিত?

সেটা আপনার ধর্মই আপনাকে বলে দেবে। তিনি তো আপনার হাজব্যান্ড। ডিভোর্স পীতাম্বর করলেও আপনি তো মানেননি মাতাজি। আপনি সিঁদুর পরেন।

তুই তো আমাকে মা ডাকিস। এখন মাতাজি ডাকছিস কেন?

উঃ মা, এখন এই বিপদের মধ্যে ওসব প্রশ্ন কেন?

ভজনা দেবী আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, কেন যে তুই আবার আমাকে ওর ব্যাপারে জড়াতে চাইছিস!হা রে, তোর কোনও ভুল হচ্ছে না তো! লোকটা হয়তো সত্যিই ওর শ্বশুরবাড়ির লোক।

না মা, আমি তোক চিনি। এ হচ্ছে, সুরেন্দ্র বা সুরিন্দর। ব্যাড নেম ইন পুলিশ রেকর্ড।

তুই একটা কাজ করবি অজিত?

কী কাজ?

আর-একবার ওখানে যা।

গিয়ে?

ভাল করে বুঝে আয়। নইলে একটা হাল্লা মাচিয়ে পরে লজ্জায় পড়ে যেতে হতে পারে।

ঠিক আছে মা, যাব। কিন্তু আপনি ইতিমধ্যে বসে থাকবেন না কিন্তু। কিছু হয়ে যেতে পারে।

তুই আগে যা তো! কিন্তু খুব সাবধান।

অজিত গিয়েছিল। আর গিয়েছিল বলেই স্কুপ খবরটা দিতে পেরেছিল একমাত্র নিউ পাটনা টাইমস। পীতাম্বর, তার যুবতী বউ, দু'জন কাজের লোক অটোমেটিক রাইফেলের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে ছিল বিশাল বাড়ির বিভিন্ন জায়গায়। পীতাম্বরের লাশ পড়ে ছিল তার প্রিয় নিমগাছের ছায়ায়। তার সত্তর বছরের মজবুত শরীর— যা নিয়ে চাপা অহংকারও ছিল তার প্রায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল কোমরের কাছ বরাবর। নিউ পাটনা টাইমস-এর সব কপি বিক্রি হয়ে

গেল চোখের পলকে। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারায় অজিত যখন পাটনায় ফিরে অফিসে এল তখন রঙ্গনাথ তার পিঠ চাপড়ে একশো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

অজিত ভ্রুক্ষেপও করল না। টেলেক্সে আর-একটা মেসেজ পাঠাল দিল্লিতে। তিনজন উগ্রবাদী পীতাম্বরকে সপরিবারে খতম করে রাত বারোটার ডাউন দানাপুর এক্সপ্রেস ধরেছে। লোকাল পুলিশ খবর নিয়েছে, তাদের কলকাতার টিকিট ছিল।

বিস্বাদ মুখে, খিদে-তেষ্টা-ঘুমহারা অজিত ভজনা দেবীকে ফোন করল, মা, সরি।

একটু চাপা ধরা গলায় ভজনা দেবী বললেন, আমি ভবিতব্য মানি।

আমারই ভুল, লোকাল পুলিশকে আমারই অ্যালার্ট করে আসা উচিত ছিল।

কিছু লাভ হত না। পুলিশও এদের ভয় পায়। হয়তো পুলিশের আরও কিছু লোক মারা যেত। লালুয়াটাকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম। আর মহেন্দ্র– সেও তো কত ছেলেবেলায় আমার কাছে এসেছিল।

আপনার ওকে ডিভোর্স দেওয়া উচিত হয়নি মা। আপনি থাকলে এটা হতে পারত না।

কে বলল? যা হওয়ার ঠিকই হত। আমরা কি সবকিছু খণ্ডন করতে পারি?

মা, আপনি বড় ভাগ্যবাদী।

আমার বিজ্ঞান তাই বলে। কী করব বল!

পীতাম্বরের জন্য শোক— সে ত আছেই অজিতের। কিন্তু এ ঘটনার পিছনে স্টোরিটা কী? পীতাম্বর তাকে চোখ দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। ওই অসমসাহসী লোকটিও মুখ খুলতে সাহস পাননি। পীতাম্বরকে চেনে অজিত, তিনি মৃত্যুভীত ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত মৃত্যুকে অনেক কাপুরুষও ভয় পায় না, ভয় পায় প্রিয় বা আশ্রিতজনের মৃত্যুকে। পীতাম্বরের ভয়ও কি তাই ছিল? মিঠিয়া, লালুয়া, মহেন্দ্র এদের বাঁচানোর জন্যই কি তিনি মুখ বন্ধ রেখেছিলেন? সেটাই সম্ভব। পীতাম্বর সবসময়েই বলতেন, আই লাভ মাই ফোকস। চেনাজানা মানুষ,

বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, দলের লোক বা অনুগামী সকলকেই তিনি সবসময়ে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

স্থানীয় পুলিশ অজিতের কাছে মুখ খুলল অনায়াসেই। তার কারণ ঘটনাটা বেশ বড় ধরনের এবং তারা যথেষ্ট ভীত। এক ইন্সপেক্টর বললেন, ফোর মার্ডারস ইয়েস। বাট থ্যাংক গড দে আর আউট অফ আওয়ার হেয়ার।

এ কথা কেন বলছেন?

আরে ভাই, ওদের ট্যাকল করার মতো কী আছে আমাদের বলুন তো? ওই তো গাদা বন্দুকের মতো আদ্যিকালের সব ভারী বন্দুক, আর এরাটিক রিভলবার। আর ওদের কাছে সফিস্টিকেটেড এ কে ফর্টিসেভেন আর সাবমেশিনগান, যা দিয়ে আমাদের এখানকার পুরো পুলিশ ফোর্সটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এদের সঙ্গে লড়ার জন্য কী দিয়েছে আমাদের গভর্নমেন্ট! এনি ট্রেনিং? দু-চার দিন লেফট-রাইট করে ছেড়ে দিলেই হয়ে গেল? ওদের দেখুন, প্রত্যেকে কম্যান্ডো ট্রেনিং নিয়ে আসছে পাকিস্তান বা চিন থেকে। বিদেশেও ট্রেন আপ করা হচ্ছে। ফুল মিলিটারি ট্রেনিং। আমাদের এক্স-মিলিটারিমেনরাও ওদের ভিতরে রয়েছে। আমরা সিভিলিয়ানদের ট্যাকল করতে পারি, মব ভায়োলেন্সের মোকাবিলায় যেতে পারি, গুন্ডাবাজি সামলাতে পারি, বাট নট দিস টাইপ অফ অ্যাডভারসারিজ।

একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

রিগার্ডিং পীতাম্বর মিশ্রজির ইয়ং ওয়াইফ। ওয়াজ শি রেপড?

মাই গড! নো স্যার। আমরা ও অ্যাঙ্গেলটা খুব ভাল করে দেখেছি। মিলিটান্টরা এ কাজ। বড় একটা করে না। মে বি দে হ্যাভ সাম আইডিয়ালস। তবে মার্ডারের তিন-চারদিন আগে আশেপাশের দুটো গ্রামীণ ব্যাংক লুটপাট এবং মার্ডার হয়েছে। লাখ খানেকের মতো টাকা গেছে। দুটো ব্যাংকেই আমরা এনকোয়ারি করেছি। কেউ মুখ খুলছে না। উলটোপালটা বলছে। অ্যাবসেলিউটলি টেরোরাইজড। এখন বুঝতে পারছি পীতাম্বর মিশ্রজির মার্ডারার আর ব্যাংক ডাকাত একই দল।

তারা ক’জন?

তিনজন?

টাকার অ্যাঙ্গলটার কথা মনে ছিল না অজিতের। সে এরপর পীতাম্বরের ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ নিল। গত সপ্তাহে পীতাম্বর তার চারটে মোটা টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচুরিটির অনেক আগেই ভাঙিয়ে নিয়েছেন এবং তুলে নিয়েছেন সেভিংস অ্যাকাউন্টের প্রায় সব টাকা। সব মিলিয়ে লাখ দেড়েক তো হবেই।

মুংলি পীতাম্বরের তিনটে মোষের জন্য ঘাস কেটে এনে দিত। আর রতুয়া আসত খেউরি করতে। পীতাম্বরের খানাতল্লাসে তারা প্রথমটায় ভয় পেয়ে মুখ বুজে থাকলেও পরে যা জানাল তা হল, প্রায় এক মাস হল তিনটে গুন্ডা ধরনের লোক পীতাম্বরের বাসায় থানা গাড়ে। প্রথমটায় কিছু বোঝা যায়নি। পিছনের বাগানে পীতাম্বর ওদের সঙ্গে কয়েকদিন বন্দুক নিয়ে চাঁদমারি করেছিলেন। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন ফটকে তালা পড়ে গেল। বাড়ি থেকে কেউ বেরোত না। মুংলি ঘাসের বোঝা নিয়ে গেলে ফটকের ওপর দিয়ে ভিতরে ফেলতে হত, লালুয়া তুলে নিয়ে যেত। রতুয়া অবশ্য ভিতরে ঢুকে খেউরি করে আসত, তবে সবসময়ে লক্ষ করত আশেপাশে কেউ না কেউ মোতায়েন আছেই!

তবে বাজারহাট করত কে?

ওই তিনজনেরই একজন। আর কেউ বাড়ির বাইরে আসত না। পীতাম্বরজি অবশ্য কয়েকবার বেরিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে ওদের কেউ থাকত।

তোরা পুলিশে খবর দিসনি কেন? বা

প রে! জানে মেরে দিত বাবু! ওসব বহুত খতরনাক আদমি।

পুলিশের অনুমতি নিয়ে একদিন পীতাম্বরের বাড়িতে ঢুকল অজিত। দু’জন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, তাদেরই একজন বাড়ির দরজার তালা খুলে দিয়ে সাবধান করে দিল, জিনিসপত্রে হাত দেবেন না।

পিছনের ঘরটায় সেই ছোট সুটকেসটা খুঁজে দেখল অজিত। পাবে বলে আশা করেনি। পেলও না। বিপ্লবীর অস্ত্র হাতে পেয়েও পীতাম্বর নিজেকে বাঁচাতে পারেননি, অস্ত্রটাও যোগ্য হাতে ফিরে গেছে। পীতাম্বরের লেখাপড়ার টেবিলটা

খুঁজল অজিত। ফুলস্ক্যাপ কাগজের দেড়খানা লেখা পৃষ্ঠা পেল। মনে হল, তাদের কাগজের জন্যই লিখতে শুরু করেছিলেন পীতাম্বর। এগোতে পারেননি। অজিত দেড়খানা পৃষ্ঠা চুরি করল অম্লানবদনে।

পাটনায় এসে সে পীতাম্বর মার্ডার কেসের ওপর সংগৃহীত তথ্যাবলী সহ স্টোরি খাড়া করল। মুখপাত্র হিসেবে রইল পীতাম্বরের অসম্পূর্ণ লেখাটা। পরপর কয়েকদিন ধরে বেরোল রংদার কাহিনিটি।

নিউ পাটনা টাইমস ডুবতে ডুবতেও যেন প্রবল বিক্রমে ভেসে উঠতে লাগল। রাতারাতি সার্কুলেশন বেড়ে গেল দশ হাজার। রঙ্গনাথের মুখে হাসি। অথচ লোকটা একসময়ে পীতাম্বরের বন্ধু ছিল। এখন পীতাম্বর এঁর কাছে শুধু একটা গরম খবর মাত্র। আর কিছু নয়। পীতাম্বরের খুনের খবর স্কুপ করতে পারায় এ লোকটা দারুণ খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন!

অজিত শিউরে উঠে ভাবে, আমিও কি ওরকম হয়ে যাব? ওরকম হৃদয়হীন, স্বার্থপর?

রঙ্গনাথ একদিন তাকে ডেকে বললেন, শোনো অজিত, নিউ পাটনা টাইমসের একটা হিন্দি এডিশন বের করার পারমিশন চেয়ে আমি অনেক আগেই একটা দরখাস্ত করেছিলাম। পারমিশনটা এসে গেছে। বাজার গরম থাকতে থাকতেই আমি হিন্দি এডিশনটা বের করতে চাই। গেট রেডি ফর মোর ওয়ার্ক।

উইথ মোর পে স্যার?

রঙ্গনাথ ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। তারপর হাসলেনও, অফকোর্স। তোমাকে ওভার অল ইনচার্জ করে দিচ্ছি। দুটো কাগজই দেখবে।

পীতাম্বর বরাবর তার উপকারই করে এসেছেন। পুত্রবৎ দেখতেন অজিতকে। মৃত্যুর ভিতর দিয়েও শেষ উপকারটাই করে গেলেন বোধহয়। অজিতের চোখ ঝাপসা হয়ে এল আবেগে।

পাটনার আই বি কালিকাপ্রসাদের সঙ্গে অজিতের খাতির অনেকদিনের। আগাগোড়া যোগাযোগ। কালিকা একদিন বলল, তুই ভাবতে পারিস, সুরিন্দর— শুধু সুরিন্দরের জন্যই একটা আলাদা সেল আছে স্পেশাল ব্রাঞ্চে? চারটে মোস্ট এফিসিয়েন্ট অফিসার দিনরাত মনিটর করছে ওর অ্যাকটিভিটি। সারা

ভারতবর্ষে যেখানে সুরিন্দরের গন্ধ পায় সেখানেই ছুটে যাচ্ছে ওরা। ওদের সন্দেহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পঞ্জাব থেকে অসম সারা দেশে একটা সন্ত্রাসের ঢেউ তুলে দিচ্ছে ওই একটা লোক। ওকে ধরতে পারলে অবশ্য ধরা কথাটা নিতান্তই কথার কথা আসলে মারতে পারলে সরকার হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

০৪. বিশু চমকে উঠল

॥ চার ॥

বিশু! ওঠ, ওঠ। খাবি না? ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে যে বাবা! আয় আমি খাইয়ে দিই।

বিশু চমকে উঠল। তারপর ধীরে চোখ খুলল বিশ্বরূপ। মা নেই, বাবা নেই, দাদু নেই, কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই। মাঝে মাঝে এক অচেনা জগতের মধ্যে জেগে ওঠে বিশ্বরূপ। এরা কারা? এ কোথায় এল সে?

রাত বারোটার কাছাকাছি। ট্রেন এখনও বর্ধমানে পৌঁছোয়নি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ধৈর্যহারা যাত্রীরা গা ছেড়ে দিয়েছে। জল ফুরিয়েছে, খাবার নেই। শুধু ক্লান্তি আছে, আর বিরক্তি, আর রাগ। নিল রাগ। উলটোদিকের স্বামী আর স্ত্রীতে স্বাভাবিক বনিবনা নেই, ট্রেনের গর্দিশে মেজাজ আরও বিগড়ে গেছে। অন্তত চারবার চাপা ঝগড়া হয়েছে দু'জনের। এখন কথা বন্ধ। ভদ্রলোক বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছন। ভদ্রমহিলা নীচের সিটে মেয়ের পাশে শোওয়া, তবে ঘুমোচ্ছন কি না বলা শক্ত। একটু আগে বিশ্বরূপ দেখেছে, ভদ্রমহিলা তাকে চোরা চোখে লক্ষ করছেন। বেশ সুন্দরী, তবে বিলম্বিত ট্রেনের বিরক্তিকর এই যাত্রায় সৌন্দর্যটা ধরে রাখতে পারছেন না।

কামরায় এখন কোনও কথাবার্তা নেই। কথাও ফুরিয়েছে বোধহয়। ট্রেন আট ঘণ্টার ওপর লেট। স্টেশনে পৌঁছেও অনেকে বাড়ি যেতে পারবে না। খাবার পাবে না। লটবহর নিয়ে বসে থাকতে হবে প্ল্যাটফর্মে। বেশিরভাগ লোকেরই আর নতুন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। প্রতিবাদ নেই। প্রতিকার নেই। তারা অগত্যা ঢুলছে। তবু এরা ঘরে ফিরবে, যখনই হোক। ট্রেন লেট হওয়া ছাড়া আর তেমন কোনও বিপদ হবে না এদের।

বিশ্বরূপ বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল ছিটোল। এক ঝলক নিজের সিক্ত বিষণ্ণ মুখখানার দিকে তাকাল। লোকে বলে, এ মেলাঙ্কলিক ফেস। কেউ কেউ আড়ালে তাকে উইপিং অফিসার বলে উল্লেখ করে। নিজের মুখে কিছুই খুঁজে পায় না বিশ্বরূপ। তার কেবল একটা কথাই মনে হয়, সে এক সাজানো মানুষ। সে প্রতিপক্ষের উদ্যত অস্ত্রের সামনে এগিয়ে দেওয়া খড়ের পুতুল। সে এক অন্তহীন ক্যাসেট, যাতে অন্তহীন ক্রস-একজামিনেশন, অন্তহীন জেরা, অন্তহীন তথ্যাবলী রেকর্ড করা হয়। সে এক বিবেকহীন ভাড়াটে খুনি। মাস-মাইনের বিনিময়ে সে ফর ল অ্যান্ড অর্ডার অস্ত্র প্রয়োগ করে। তার নিশ্চিন্ত ঘুম বলে কিছু নেই, কানের কাছে ফোন রেখে পোশাক পরা অবস্থায় সে উৎকর্ণ হয়ে ঝিমোয় মাত্র। ফোন বাজলেই ছুটতে হয় এখানে সেখানে। রোবটের মতো দীর্ঘ রিপোর্ট টাইপ করে ফাইলবন্দি করতে হয় তাকে। মাঝে মাঝে একত্র হলে তারা চারজন। ক্লান্ত অফিসার চুপচাপ বসে থাকে। কথা আসে না। ভাব আসে না। পারস্পরিক সিগারেট বিনিময় পর্যন্ত ভুলে যায় তারা।

অ্যাসাইনড টু কিল! না কি অ্যাসাইনড টু বি কিলড! কে জানে কী। তবে বিশ্বরূপ জানে সে গুপ্তঘাতকের প্রিয় টার্গেট। কে আগে কাকে দেখতে পাবে তা ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বর জানেন কে আগে গুলিটা চালাবে। ঈশ্বর জানেন কার টিপ আসল মুহূর্তে থাকবে কতটা নির্ভুল।

গৃহস্থদের কি হিংসা করে বিশ্বরূপ? একটু করে। ওরা বেশ নিজেদের নিয়ে মেতে আছে। এই যে শ্যামল, তার সুন্দরী স্ত্রী বকুল, শিশু মেয়েটি ট্রেন লেট হওয়া ছাড়া, বাড়ি পৌঁছোনো ছাড়া এদের কোনও সমস্যাই নেই। এদের চলার পথে কেউ এদের জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করছে না।

বিশ্বরূপ সিটে ফিরে এল। বকুল উঠে বসল উলটোদিকের সিটে। নিজের চুল ঠিক করতে করতে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, এত রাতে আপনি কোথায় গিয়ে উঠবেন?

বিশ্বরূপ সামান্য অবাক হয়ে বলে, আমি! ওঃ। আমার জন্য কোনও হোটেলে একটা রুম বুক করা আছে।

হোটেলে কেন? কলকাতায় আপনার কোনও আত্মীয় নেই?

না।

আত্মীয়রা সব কোথায়? দিল্লিতে বুঝি।

না। আমার তেমন আত্মীয় বলতে কেউ নেই।

শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় তো আছে!

বিশ্বরূপ সামান্য হাসল, আমার বউ বা শ্বশুরবাড়িও নেই।

আপনার তো সবই নেই দেখছি।–বলে বকুল একটু হাসল, তা হলে আছেটা কী?

স্মৃতি আছে। আর আছে কাজ।

ভাইবোন ছিল না আপনার?

না। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।

বকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, খুব আদরের ছিলেন বুঝি! এখন তো যত্ন করার কেউ নেই, কষ্ট হয় না?

না। কষ্ট কেন হবে?

আমি তো বারো বছর বয়স অবধি মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলাম। তখন আদরটাকে মাঝে মাঝে অত্যাচার বলে মনে হত। গুচ্ছের খাবার গিলতে হত জোর করে, গাদা গাদা জামাকাপড় খেলনায় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসত, একটু অসুখ হলেই দু'জন-তিনজন ডাক্তার চলে আসত, ওষুধ খেয়ে খেয়ে ড্রাগ-অ্যাকশন হয়ে আমার নর্মাল স্বাস্থ্যই নষ্ট হতে বসেছিল। প্রাইভেট পড়ানোর জন্য তিনজন মাস্টারমশাই আর দু'জন দিদিমণি ছিলেন। গানের স্কুলে যেতে হত, ব্যায়ামের স্কুলে যেতে হত, আঁকা শিখতে যেতে হত। একা আমাকে যে কত কিছু করতে চেয়েছিল আমার মা আর বাবা। বারো বছর যখন আমার বয়স তখন হঠাৎ আমার দু'টি যমজ ভাইবোন হয়। ওরা হওয়ার পর আমার ওপর থেকে অ্যাটেনশন সরে গিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আপনারও কি সেরকম ছিল?

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে স্মিতমুখে বলে, না। আমরা ছিলাম গরিব রিফিউজি। বনগাঁর কাছে একটা গাঁয়ে থাকতাম। আদরটা ঠিক আপনার মতো টের পাইনি। তবে

থেমে গেল বিশ্বরূপ। বললে এ মেয়েটা বুঝবে না। সে কী করে বলবে যে, তাকে আদর করত শরতের নীল আকাশ, দিগন্ত থেকে ছুটে আসা বাতাস, রাতের নক্ষত্র, মাঠের ঘাস, জ্যোৎস্নারাতের পরি। তাকে আদর করত জোনাকি পোকা, ঝিঁঝির ডাক, কালো পিঁপড়ে। তখন ভগবান ছিল। মা ছিল। দাদু ছিল। বাবা ছিল। রুকুদি ছিল।

সেই গাঁয়ে কেউ নেই এখন?

না। কেউ নেই।

বাড়িটা?

ঠোঁট উলটে বিশ্বরূপ বলে, সামান্য টিনের ঘর। হয়তো উড়ে-পুড়ে গেছে। আমি আর যাই না।

কেন যান না? শত হলেও দেশ তো! আমাদেরও যশোরের কোথায় যেন দেশ ছিল। মা-বাবা সারাক্ষণ দেশের কথাই বলে। আমি জন্মাই কলকাতায়। দেশ নেই বলে খুব খারাপ লাগে।

কেন, কলকাতাই তো আপনার দেশ!

মোটেই না। কলকাতাকে কক্ষনও দেশ বলে মনে হয় না।

কেন মনে হয় না? কলকাতার কী দোষ?

কী জানি কেন! থাকতেই ভাল লাগে না। এ যেন অন্যের শহর। আমরা কেমন যেন। ভাড়াটে-ভাড়াটে হয়ে আছি।

বিশ্বরূপ অর্থহীন ফ্যাকাসে হাসি হাসল।

মাটির গন্ধ না থাকলে কি কোনও জায়গা আপন হয়, বলুন? আমার খুব ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে থাকতে। মাটির ঘর করব, বেশ বড় একটা বাগান থাকবে, তাতে অনেক গাছপালা। আমার গাছপালার ভীষণ শখ। আমার হাজব্যান্ডকে কত বলি, ও শুনে কেবল চটে যায়। বলে, দূর দুর, গাঁয়ে আজকাল ভীষণ পলিটিকস, থাকতে পারবে না। কত বুঝিয়ে বলি যে, আমরা তো সবসময়

থাকতে যাচ্ছি না, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব। কতই বা খরচ হবে গাঁয়ে মেটে বাড়ি করতে? ও বলে, ও বাবা, না থাকলে সব বেদখল হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনাদের গ্রামটা কেমন ছিল?

বিশ্বরূপ ব্যথাতুর মুখে শূন্যের দিকে চেয়ে ছিল। অবশ্য সামনে শূন্য বলে কিছুই নেই। একটা আবদ্ধ কামরায় লটবহর, মানুষজন। তবু হঠাৎ কামরাটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখ থেকে। সামনে জলভরা বর্ষার মাঠ। সেদিন বাড়িতে রান্নাই হয়নি। একপেট খিদে নিয়ে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছিল বিশু। তার তিনটে নৌকোর কোনওটাই শেষ অবধি সোজা হয়ে ভেসে রইল না। কেতরে পাশ ফিরে রইল। তারপর ঝমঝম বৃষ্টিতে ডুবেই গেল হয়তো। বর্ষার মাঠের ধারে একটু ভাঙা জমিতে কাকের মতো ভিজতে ভিজতে বসে রইল বিশু। পেটের খিদে থেকে রাগ উঠে আসছে মাথায়। এই বৃষ্টিতে কাগজের নৌকো কি ভাসে? ভাসে না, বিশু জানে। কিন্তু কেন রাগ হচ্ছিল? রাগের চোটে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল তিড়িং করে। তারপর আর কী করে? রেগে গিয়ে সে কী করে পৃথিবীকে জানান দেবে। তার রাগ? সে হঠাৎ দুই হাত ক্ষিপ্তের মতো ওপরে তুলে জলে নেমে শুধুই লাফাতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, কেন? কেন! কেন এরকম হবে? কেন সবসময়ে এরকম হবে? উদ্বাহু সেই নৃত্যের না ছিল মাথা, না ছিল মুন্ডু। লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে কেমন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল তার মাথা, চোখ আবছা হয়ে আসছিল বৃষ্টির জলে আর অশ্রুতে। রাতে স্বপ্নের ভিতরে তার তিনটে নৌকোই ফিরে এল সাজ বদল করে। পালতোলা মস্ত কাঠের নৌকো তরতর করে উজিয়ে আসছিল তার কাছে।

বিশুর ভগবান ছিল। বিশ্বরূপের নেই।

বিশ্বরূপ তার ঈষৎ ভাঙা ধীর কণ্ঠস্বরে বলে, কেমন আর ছিল। আর-পাঁচটা গাঁয়ের মতোই। খুব গরিব গাঁ। কিছুই তেমন ছিল না সেখানে। বন্যা হত, খরা হত, চাষে পোকা লাগত। বর্ষাকালটা ছিল আকালের ঋতু। কতদিন খাওয়া জোটেনি আমাদের।

আহা রে! পথের পাঁচালী পড়তে পড়তে আমি তো কত কাদি। কী সাংঘাতিক লেখা, না? কী ভীষণ গরিব ছিল ওরা।

মৃদু একটু হাসল বিশ্বরূপ। কিছু বলল না। এ মহিলা রোমান্টিক। এঁর এখনও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই হয়নি।

আপনি পুলিশ কেন হলেন বলুন তো? অন্য চাকরি জুটল না?

বিশ্বরূপ একটু হাসে, আপনার কি পুলিশের ওপর রাগ আছে?

না, তা নয়। পুলিশকে তো আমাদের ভীষণ দরকার হয়। তবে চাকরিটা কি ভাল? একটু কেমন যেন, না?

বোধহয়। তবে আমার এটাই জুটেছিল। চাকরি বাছাবাছি করার উপায় তো ছিল না। তখন বড্ড খিদে পেত।

আমার হাজব্যান্ড বলছিল আপনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

পুলিশের চাকরিতেও মেধার দরকার হয়।

যাঃ। পুলিশের চাকরি তো চোর-ডাকাত ধা। আর কী? আর ট্র্যাফিক কন্ট্রোল, আর বোধহয় মব ভায়োলেন্স আটকানো। এসবের জন্য মেধার আবার কী দরকার মশাই?”।

বেঁচে থাকতে গেলেও মেধার দরকার হয়। নইলে মরতে হয়। একটু শক্ত কাজ।

আপনাকে দেখে কিন্তু একটুও পুলিশ মনে হয় না। বরং ভাল লোক বলে মনে হয়। বিশ্বরূপ কখনও জোরে হাসে না। এখনও হাসল না। স্মিত মুখে বলল, পুলিশ তা হলে ভাল লোক নয়?

অপ্রতিভ বকুল বলে, ঠিক তা বলিনি। চাকরিটা একটু রাফ গোছের লতা। একটু র’। তাই? আপনাকে যেন মানায় না।

বিশ্বরূপ নিজের করতলের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বোধহয় ঠিকই বলেছেন আপনি।

রাগ করলেন না তো!

রাগ! না। রাগ আমার খুব কম হয়।

খুন-টুন করেননি তো? মানে, পুলিশকে তো অনেক সময় দুষ্টু লোককে গুলি-টুলি করতে হয়।

বিশ্বরূপ এ কথাটারও জবাব দেয় না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বকুল বলে, তার মানে করেছেন। উঃ, কী করে যে একজনকে আর-একজন খুন করে, তা সে হোক না চোর বা ডাকাত!

বিশ্বরূপ মৃদু-মৃদু হেসে বলে, আপনার মেয়েকে আপনি খুব ভালবাসেন তো?

ও বাবা, ওকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না আজকাল। আমার দিনরাত্তির তো ওই ভরে রাখে।

ধরুন আপনার মেয়েকে যদি কেউ কিডন্যাপ করে আর মেরে ফেলার ভয় দেখাতে থাকে?

বকুল স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে বিশ্বরূপের দিকে। তারপর হঠাৎ বলে, বুঝেছি। পুলিশ কেন খুন করে কিংবা আপনি কেন খুন করেন সেটাই বোঝাচ্ছেন তো?

বোঝা মোটেই শক্ত নয়। তবে ওসব নিয়ে না ভাবাই ভাল। আপনাদের জীবন অন্যরকম।

আর আপনারটা?

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বুঝতে পারি না। আমি হলাম খড়ের পুতুল। কে যেন চালায় আড়াল থেকে।

আপনি কীরকম পুলিশ? বাবু-পুলিশ না কেজো-পুলিশ?

দু’রকম আছে নাকি?

ওর এক বন্ধু আছে। লালবাজারে। সে কোনও অ্যাকশন-ট্যাকশন করেনি কখনও। ভাল তবলা বাজায় আর বই পড়ে। সে বলে সে নাকি বাবু-পুলিশ। আপনি?

আমি কেজো। বিশেষ ধরনের কেজো।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ?

আপনি অনেক জানেন দেখছি। হ্যাঁ, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ।

আপনার কাজটা বোধহয় বিপজ্জনক, তাই না?

ইট ডিপেন্ডস। বর্ধমান এসে গেল কিন্তু। জল-টল লাগবে?

আপনি আজ তিনবার আমাদের ওয়াটার বটল ভরে দিয়েছেন। ছিঃ ছিঃ, যা লজ্জা করেছে আমার। আমার হাজব্যান্ডটি একদম স্মার্ট নয় যে! লেখাপড়া-জানা, মায়ের আদুরে ছেলে।

মেয়েটির বয়স তার মতোই হবে, অনুমান করল বিশ্বরূপ। পঁচিশ-ছাব্বিশ। আদুরে এও কম নয়।

আপনার রান্না কে করে দেয়?

লোক আছে। মাইনে করা লোক।

বিশ্বাসী?

পুলিশকে সবাই একটু সমঝে চলে।

ওঃ, তাও তো বটে। ভুলেই গিয়েছিলাম। পুজোর মাসখানেক আগে আমাদের একটা কাজের মেয়ে সব চুরি করে পালিয়ে গেল। পাশের ফ্ল্যাটের ঝি এনে দিয়েছিল দেশ থেকে। খাওয়া-পরার লোক। বেশ কাজেরও ছিল। পালাল। পাশের বাড়ির ঝিটাও কাজ ছেড়ে দিয়েছে এ ঘটনার আগেই। ওদের গায়ের নামটা অবধি ভুলে গেছি। পাঁচ ভরি সোনা, ঘড়ি, জামা-কাপড়, অনেক বাসন আর আমার কিছু কসমেটিকস। পুলিশ কিছু করতে পারল না। বলল, অজ্ঞাতকুলশীলকে রাখা ঠিক হয়নি, তোক রাখতে হলে আগে থানায় এনে নাম-ধাম এন্ট্রি করে রাখতে হয়। তাই নাকি?

হবে হয়তো।

আপনার বাড়িতে তো চুরির বা ডাকাতির কোনও ভয় নেই, না?

বিশ্বরূপ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তার চেয়েও বেশি ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে। সত্যিই জল বা চা কিছু চাই না তো?

না। জল আছে। এখন শুধু চাই বাড়ি ফিরে নিজের ঘরদোর আর নরম বিছানা। ক'টায় পৌঁছোব বলুন তো?

রাত দেড়টা নাগাদ।

আপনার গাড়ি সত্যিই থাকবে তো! না কি রাত বেশি হলে ফিরে যাবে?

থাকবে। চিন্তা করবেন না।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে আপনার তো হোটেলে ফিরতে আরও রাত হবে। আমাদের ফ্ল্যাটটা কিন্তু বেশ বড়, তিনটে বেডরুম। আপনি ইচ্ছে করলেই থাকতে পারেন।

বিশ্বরূপ মাথা নাড়ে, আপনি বাড়ি ফিরছেন, কিন্তু আমি বাড়ি ফিরছি না। গন্তব্যটাই জানি না এখনও। হোটেলের কথা বলেছিলাম বলে ভাববেন না সেখানেই যাব। হয়তো যাওয়া হবেই না।

আপনি কি কোনও মিশনে যাচ্ছেন? অন ডিউটি?

হ্যাঁ। অন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সারভিস।

আপনি যাকে বিয়ে করবেন সে বেচারার ভারী দুর্ভোগ আছে কপালে।

বিশ্বরূপ মাথাটা কোলে আর-একটু নামিয়ে নিল।

সরলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক পার্টিতে। অন্য মেয়েদের মত ঝলমলে নয়, বরং সিরিয়াস এবং চুপচাপ। কে যে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আজ আর তা কিছুতেই মনে পড়ে না। সব পার্টিতেই কিছু উটকো লোক আসে, স্মার্ট রসিক বাকচতুর এবং শিকড়হীন। ওরকমই কেউ হবে। আলাপ সামান্য, কিন্তু খুব গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল সরলা।

ওই চোখদুটো তার পিছু নিয়েছিল সেদিন থেকে। তিনদিন বাদে ফোন এল মেয়েটির, তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

তখনই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল তার। কেননা সে মেয়েটিকে নিজের ফোন নম্বর দেয়নি। হয়তো সন্দেহ হয়েছিল, সেটা দাঁড়ায়নি, আবেগে ভেসে গিয়েছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরেও তো ফুটো ছিল!

সরলা কুঁয়ারি নিজের পরিচয় দিয়েছিল দিল্লির মেয়ে বলে। মা বাবা নেই। এক পিসির কাছে মানুষ। পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বি এ পড়ছে দিল্লির কলেজে। দেখা হল প্রগতি ময়দানের এক একজিবিশনে। তারপর দেখা হতে লাগল। সরলা হাসে কম, কথা কম, শুধু গভীরভাবে তাকায়। সেটাই ওর কথা।

এক মাস মাত্র সময় নিল তারা। তারপর বিয়ে করে ফেলল।

বিশ্বরূপের জীবনে এই বিয়ের চেয়ে ভাল ঘটনা আর কিছুই ঘটেনি। সরলা বুদ্ধিমতী, কাজে চটপটে, সেবায় সিদ্ধহস্ত। যত রাতেই ফিরুক বিশ্বরূপ, গরম কফি পেয়েছে সঠিক মাপের চিনি ও দুধসহ। ঝরঝরে ভাত রাঁধতে পারত সরলা, জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতে পারত। ঘর সাজাতে ভালবাসত। কখনও ঝগড়া বিবাদ করেনি।

মাত্র তিনমাস সেই অপরিমেয় গার্হস্থ্যের সুখ স্থায়ী ছিল। একদিন অফিসে কাজ করছে, হঠাৎ মালহোত্রা এসে বলল, বিশু, বাড়ি যাও। ব্যাড নিউজ।

বিশ্বরূপ চমকে উঠে বলে, ইজ শি ডেড?

না, তার চেয়ে খারাপ। শি ইজ আন্ডার অ্যারেস্ট।

বিশ্বরূপের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, অ্যারেস্ট! কী বলছ?

বাড়ি যাও। দে আর ওয়েটিং।

হু দি হেল?

পুলিশ।

বাড়ি ফিরে দেখে, সরলাকে তখনও নিয়ে যায়নি। থানার ওসি এবং কয়েকজন পুলিশ অফিসার গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করছেন। শোয়ার ঘরে কড়া পাহারায় নতমুখী সরলা।

কী হয়েছে?

শি ওয়াজ ইন আওয়ার লিস্ট।

হোয়াট লিস্ট।

স্যার, এ মেয়েটির সঙ্গে সুরিন্দরের গ্রুপের কানেকশন আছে। ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। আপনি ফাইল ঘাঁটলেই দেখতে পাবেন। ফরগেট দা ম্যারেজ স্যার। ইট ওয়াজ এ কনসপিরেসি টু পাম্প আউট ইনফরমেশনস ফ্রম ইউ।

বিশ্বরূপ চেঁচাতে গিয়েও হঠাৎ স্থিতধী হয়ে গেল। শান্ত হল। তার মস্তিষ্ক কাজ করতে লাগল হঠাৎ। বাধা দিল না। পুলিশ সরলাকে নিয়ে গেল।

পরদিন সুপিরিয়র ডেকে পাঠালেন বিশ্বরূপকে। গম্ভীর মুখ। প্রশ্ন করলেন, একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার কী করে এতটা ইডিয়ট হতে পারে বিশ?

সারা রাত ঘুমোয়নি বিশ্বরূপ। মুখ সাদা, শরীরে জ্বোরো ভাব। কথা বলতে পারল না।

শি ওয়াজ অন দি লিস্ট। মাত্র একমাসের পরিচয়ে মেয়েটাকে তুলে নিলে ঘরে? তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি আনিয়েছি, দেখেছি চারজন সিভিলিয়ান তাতে সই করেছে সাক্ষী হিসেবে। যদি একজনও কলিগকে ডাকতে বিয়েতে তাহলেও হয়তো আটকানো যেত।

আমি বিয়ের পর একটা পার্টি দিয়েছিলাম। তাতে কলিগরা ছিল স্যার। তারা তখন সরলাকে দেখেছে।

সুপিরিয়র একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, কী দেখেছে বিশ? তোমার বউ সেদিন বিউটি পারলারে গিয়ে হেভি মেক-আপ নেয়, আইব্রো বদলায়, লিপ-লাইন বদলে ফেলে, টায়রা, নাকছাবি, নাকের গয়না, উইগ সবই সে ব্যবহার করেছিল। তুমি প্রেমে অন্ধ হয়ে লক্ষ করোনি।

বিশ্বরূপ মাথা নত করেছিল।

হেল অফ এ ম্যারেজ!

বিশ্বরূপের তখন নিজেকে পরাস্ত, বিধ্বস্ত, নিঃশেষ বলে মনে হয়েছিল।

তারপর চলল জেরা আর জেরা। পুলিশ হেফাজতে অন্তহীন জেরা, মনস্তাত্ত্বিক চাপ আর ভয়। ওরা দু'দিনের মধ্যে সরলাকে ভেঙে ফেলল। গলগল করে বেরিয়ে এল তথ্য। তারপর আরও তথ্য। তারপর ধীরে ধীরে অসংলগ্ন কথাবার্তা। তারপর প্রলাপ।

বিশ্বরূপ তাকে জেরা করার অনুমতি চেয়েছিল। সুপিরিয়র বলেছেন, বেটার নট। ওর আর কিছু বলার নেই।

একবার যদি দেখা করি।

বেটার নট। ফরগেট ইট লাইক এ ব্যাড ড্রিম।

কতখানি ভালবাসা ছিল সরলার, আর কতটাই বা অভিনয় সেটা মেপে দেখা হল নাবিশ্বরূপের। সন্ত্রাসবাদীরা ওর কাছ থেকে কতটুকু জেনেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। বিশ্বরূপের। ওদের অনেক চ্যানেল আছে। সব খবরই পৌঁছে যায়।

শুধু মালহোত্রা একদিন বলল, সুপিরিয়র একটা গাধা।

কেন বলো তো!

মেয়েটাকে অ্যারেস্ট করার মানেই হয় না।

বিশ্বরূপ চমকে উঠে বলে, তার মানে? ইজ শি ক্লিন?

আরে না ভাই, ক্লিন নয়। তবে আমরা ওকে তোমার বউ হিসেবে আরও এফিসিয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারতাম। কাউন্টার-এসপিওনেজে। ও আমাদের ভাইটাল কানেকশন হয়ে উঠতে পারত। এরা যে কেন সবসময়ে হাল্লা মাচিয়ে কাজ বিলা করে দেয় কে জানে! তুমি কখনও ওর হ্যান্ডব্যাগ বা জিনিসপত্র দেখেছ খুঁজে?

না তো!

শি হ্যাড এ গান। সবুজ সুটকেসটার তলায় পাওয়া গেছে।

বিশ্বরূপ শিহরিত হল।

আশ্চর্যের বিষয় সরলা অ্যারেস্ট হওয়ার পর ওর আত্মীয়স্বজন কেউ এগিয়ে এল না। ওর যে পিসিকে আবছা চিনত বিশ্বরূপ সেও অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। বাস্তবিকই গোটা ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মতোই অলীক মনে হতে লাগল।

একটা মেন্টাল হোম-এ পুলিশ হেফাজতে এখনও বেঁচে আছে সরলা। তবে সম্পূর্ণ উন্মাদ। চেঁচায়, কাঁদে, হাসে। বিশ্বরূপ কখনও তার সঙ্গে আর দেখা করেনি। তিনমাসের একটা সুখকর স্মৃতিকে কি বিসর্জন দিতে পারে সে? তার সুপিরিয়র বলেছিলেন, ফরগেট ইট লাইক এ ব্যাড ড্রিম। কথাটার কোনও যুক্তি নেই। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সুখ-দুঃখের স্থিতি কী? ওই তিনমাস যদি অভিনয়ও করে থাকে সরলা তাতেই বা কী ক্ষতি? ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রী, বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে কি এরকম অভিনয় মাঝে মাঝেই করে না? মানুষে মানুষে অবিরল অনাবিল ভালবাসা বলে কি কিছু আছে? কাজেই বিশ্বরূপ তার বিপজ্জনক, অস্থায়ী এই জীবনে পদ্মপত্রে জলের মতো ওই টলটল করা তিনটে মাসের সুখ তার ভিতরে বন্দী করে রেখেছে। ওপরওয়ালার আদেশ সত্ত্বেও ভোলেনি। উন্মাদিনী সরলার কাছেও যায়নি ওই একই কারণে, মহার্ঘ তিনমাসের সৌন্দর্য ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

বিশ্বরূপ বকুলের দিকে চেয়ে তার ধীর গম্ভীর গলায় বলে, ঠিকই বলেছেন আপনি। আমাদের বউ হতে যদি কেউ রাজিও হয় তবে তার কপালে বিস্তর দুঃখ জমা আছে।

গাড়ি বর্ধমান ছাড়ল। বকুল তার গলার হারখানা ঠোঁটে নিয়ে একটু খেলা করে। মানুষ কখন যে কী করে তার ঠিক নেই। একটু চাপা হাসির ভাব আছে মুখে। বলল, তবু কেউ হয়তো সব জেনেই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। তেমন মেয়েও কি আর নেই? আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল একজন জঙ্গি পাইলট বা মিলিটারি অফিসারকে বিয়ে করি।

মানুষের প্রফেশনটা খুব বড় কথা নয়।

তবে কোনটা বড় কথা?মানুষটা? ওসব হল দার্শনিক কথা। আজকাল সবাই প্রফেশনটারই দাম দেয়। তবে আমি কিন্তু কখনও পুলিশ পছন্দ করিনি।

সেটা আগেই বলেছেন।

বকুল হাসছিল, জিরো জিরো সেভেন হলে অবশ্য আলাদা কথা। বা শার্লক হোমস।

ও দুটোই অলীক।

তা জানি মশাই। বাচ্চা ছেলেটাও জানে। ওরকম স্পাইও হয় না, ওরকম গোয়েন্দাও নেই। তবু কী থ্রিলিং ক্যারেকটার বলুন?

হ্যাঁ, সবসময়ে জয়ী, সবসময়েই সফল। ওরকম যদি বাস্তবেও হত।

হয় না, না?

বিশ্বরূপ হাসল, না। মাঝে মাঝে আমরা ভীষণ কাপুরুষের মতো আচরণ করি। পালাই। হারি। সাকসেস স্টোরির চেয়ে আমাদের আনসাকসেস স্টোরি অনেক বেশি লম্বা। তা যদি না হত তা হলে অপরাধীতে দেশটা এত ভরে যেত না।

আপনিও কি লাইসেন্সড টু কিল?

বিশ্বরূপ অসহায়ের মতো মুখ করে বলে, এ দেশে সবাই লাইসেন্সড টু কিল।

বর্ধমান ছেড়ে গাড়ি এখন চমৎকার দৌড়োচ্ছ। ঘুমন্ত মুখটা বাঙ্ক থেকে ঝুলিয়ে শ্যামল জিজ্ঞেস করে, ক'টা বাজে?

বকুল বলে, সাড়ে বারো।

আমরা কোথায়?

এই তো বর্ধমান পেরোলাম।

ওঃ, তা হলে দেরি আছে।

দেরি নেই। নামো। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।

রাত দেড়টায় সত্যিই কলকাতা পৌঁছে গেল তারা। যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ছিল, যদি ভাগ্যক্রমে দু-একটা ট্যাক্সি থাকে সেই আশায়। অব্যবস্থায় ভরা বিশৃঙ্খল উদ্ধৃঙ্খল এই দেশে কাউকে কারও দোষারোপ করার নেই।

উদ্বিগ্ন শ্যামল বলে, আপনার গাড়ি আছে তো বিশ্বরূপ?

বিশ্বরূপ তার জায়গা থেকে নড়েনি। নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকেছে। সামনেই কারপার্ক। জানালার সোজাসুজি পুলিশ-জিপটা দেখতে পাচ্ছিল বিশ্বরূপ। ঠিক এ রকম জায়গাতেই থাকার কথা। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একজন সশস্ত্র লোক জিপের পাশে দাঁড়িয়ে। চোখ গাড়ির দিকে।

আছে। চলুন। গাড়িটা কিন্তু জিপ, আপনাদের একটু অসুবিধে হবে।

অসুবিধে! কী যে বলেন! এই মাঝরাতে কলকাতা শহরে জিপই আমাদের রোলসরয়েস।

বউ-বাচ্চা-মাল নিয়ে শ্যামল উঠল জিপের পিছনে। সামনে বিশ্বরূপ, ড্রাইভারের পাশে। বিশ্বরূপের ঘাড়ের কাছে সিটের কানায় একখানা নরম হাত। চুড়ির শব্দ। বকুল ঠিক তার পিছনেই বসেছে। ইচ্ছে করেই কি? জীবন ক্ষণস্থায়ী। সেইজন্যই এর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সামান্য প্রাপ্তিকেও ফেলতে নেই। বিশ্বরূপ খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল। কলকাতার বাতাস অপরিশুদ্ধ। বায়ুদূষণ সাংঘাতিক। প্রকৃতিহীন এই শহরকে সবাই ভয় পায়। কিন্তু এই গভীর রাতে, জিপটা যখন ভ্যাম্প ঘুরে হাওড়া ব্রিজে উঠে এল তখন গঙ্গার ঠান্ডা জল-ছোঁয়া বাসটি বড় শুদ্ধ বলে মনে হয়।

আপনার শীত করছে না?–মেয়েলি গলা।

বিশ্বরূপ মাথা নাড়ল, না। কলকাতায় শীত কোথায়?

শ্যামল হঠাৎ উদ্বেগের গলায় বলে, এই যাঃ, মাসিমার খবর নেওয়া হল না যে! তাড়াহুড়োয় ভীষণ ভুল হয়ে গেছে।

মাসিমার তো গাড়ি আসবেই। যদু থাকবে। চিন্তা কীসের?

তবু কার্টসি বলে একটা জিনিস আছে তো!

নেই। উনি কার্টসি দেখিয়েছেন আমাদের? কই একবারও তো বলেননি, এত রাতে পৌঁছোবে, ঠিক আছে আমার গাড়ি বরং পৌঁছে দেবে তোমাদের। বলেছেন একবারও?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোধহয় একটা মনোমালিন্য পাকিয়ে উঠছে। বাড়িতে গিয়ে হয়তো জনান্তিকে সেটা ফেটে পড়বে। বিশ্বরূপ তার ধীর ভাঙা গলায় বলে, শ্যামলবাবু, রাস্তাটা একটু খেয়াল রাখবেন। কাঁকুড়গাছি আর বেশি দূরে নয়। আমরা মানিকতলা পেরোচ্ছি।

মানিকতলা? এত তাড়াতাড়ি?

এরা বাড়ি ফিরছে। ভ্রমণের আনন্দের পর বাড়ি ফেরার নিশ্চিন্ত। বাড়ি ফিরে সংসারে মজে যাবে। ঝগড়া-বিবাদ-মান-অভিমান খুনসুটি-ভালবাসা সব মিলেমিশে একটা সম্পর্ক শেষ অবধি স্থায়ী হবে। যতদিন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ না ঘটায়। বিশ্বরূপের ঠিক এরকম জীবন বোধহয় হবে না আর কখনও।

খুব নরম করে বকুল বলল, এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন কিন্তু! নইলে ছাড়ব না।

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে বলে, না। এত রাতে নয়।

আপনি আমাদের জন্য এত কষ্ট করলেন, আমাদের কিছু করতে দিচ্ছেন না কেন?

শোধবোধ করতে চান? পাওনা রইল।

এবার দিল্লি গেলে ঠিক আপনাকে খুঁজে বের করব। ঠিকানা টুকে রেখেছি।

ওয়েলকাম।

আপনি তো কাল বা পরশু, আপনার সুবিধেমতো আমাদের বাড়িতে লাঞ্চ বা ডিনারে আসতে পারেন?

আমি কলকাতায় থাকব না। কালই হয়তো যশিডির ট্রেন ধরতে হবে।

কী এত কাজ বলুন তো আপনার!

ক্রাইম। ক্রাইম আফটার ক্রাইম।

শ্যামল বলে উঠল, এই যে ডানদিকে।

গাড়ি ডাইনে চওড়া রাস্তায় ঢুকল।

এবার বাঁ দিকে।

কয়েকবার মোড় নিল গাড়ি। তারপর মস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল।

মালপত্র নামল। ওরা নামল। ভদ্রতাসূচক কিছু কথাবার্তা ও আবার দেখা হওয়ার আশ্বাসের পর জিপ ঘুরিয়ে নিল মুখ। তারপর হু হু করে দূরত্ব বাড়িয়ে নিল চোখের পলকে। দূরত্বই ভাল। গার্হস্থ্য থেকে তার দূরে থাকাই উচিত।

অপারেশন সুরিন্দর। কলকাতার পুলিশ সন্দেহজনক দু'জনকে গ্রেফতার করে রেখেছে। দলে আরও একজন ছিল, সে পালিয়ে গেছে। বিশ্বরূপ জানে, ধৃত দুজনের কেউ বা পলাতক লোকটি সুরিন্দর নয়। সুরিন্দরকে গ্রেফতার করতে হলে পুরোদস্তুর যুদ্ধ হবে। কিছু লোকের মৃত্যু অবধারিত। সুরিন্দর মিলিটারি প্রশিক্ষণ পাওয়া লোক, পুরোদস্তুর কম্যান্ডো। নিজেকে সবসময়ে কন্ডিশনিং-এ রাখে। সারা ভারতবর্ষে তার সমব্যথী ও বন্ধু ছড়ানো। পীতাম্বর মিশ্রকে সপরিবারে খুন করে সে সোজা কলকাতায় চলে আসবে এটা নাও হতে পারে।

সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন গ্রেফতার না করে অনুসরণ করা ও গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখা। তাতে গোটা দলের হদিশ পাওয়ার আশা থাকে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার কাজে পুলিশ কিছুটা ঢিলা।

স্যার, হোটেলে যাবেন?

লোকদুটোকে কোথায় রাখা হয়েছে?

হেয়ার স্ট্রিট লক-আপে।

সেখানেই চলুন।

জিপ তাকে হেয়ার স্ট্রিটে নিয়ে এল। কয়েকজন ক্লান্ত কনস্টেবল ছাড়া বিশেষ কেউ নেই। তারাই খাতির করে লকআপে নিয়ে গেল তাকে। কম্বলের বিছানায় দু'জন চিতপাত হয়ে ঘুমোচ্ছ।

এরাই কি স্যার?

না। বড়বাবুকে বলবেন, অন্য কোনও অভিযোগ না থাকলে এদের কাল সকালে রিলিজ করে দিতে।

সুরিন্দরের ফোটোর সঙ্গে ডানদিকের লোকটার কিছু মিল আছে স্যার।

সুরিন্দর আর আমি দিল্লির একই ক্লাবে একসঙ্গে হকি খেলতাম। তাকে আধ মাইল দূর থেকেও চিনতে পারব।

তা হলে ঠিক আছে স্যার। বড়বাবুকে বলব।

ক্লান্ত বিশ্বরূপ এসপ্ল্যানেডের কাছে একটা হোটেলের বুক করা ঘরে ফিরল রাত আড়াইটেয়। ধৃত দু'জনকেই চেনে বিশ্বরূপ। পুরনো দিল্লির স্মাগলার। বাংলাদেশ, নেপাল, চিন সীমান্ত দিয়ে এদের কাজ-কারবার। সোনা, ইলেকট্রনিক জিনিস আর কসমেটিকস এর কারবার, দু'জনেই পুলিশের টাউট, আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে পুলিশের ভাইট্যাল লিঙ্ক। অপরাধী বটে, কিন্তু উপকারী বন্ধুও।

বিশ্বরূপ বিছানায় শুয়েই ঘুমোল। কলকাতায় তার কোনও কাজ নেই। সকালে ট্রেন ধরতে হবে। গন্তব্য যশিডি, পাটনা। সামনে ঘুমহীন অনেক রাত অপেক্ষা করছে তার জন্য। অপেক্ষা করছে গুপ্তঘাতক ও আততায়ী। অপেক্ষা করছে পরাজয়, গ্লানি, রক্তপাত বা গৌরবহীন জয়। তার চেয়ে বেশি ক্লান্তি, বিষাদ, শূন্যতা।

লম্বা ঘাসের ডঁটি বেয়ে একটা পিঁপড়ে খামোখাই ওপরে ওঠে। দোল খায়। তারপর ফের নামে। ঘাসের গভীর অরণ্যে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। পিঁপড়েরা কি পথ চিনে চিনে ঘরে ফিরে আসতে পারে? বটপাতায় একটা পিঁপড়েকে তুলে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল বিশ্বরূপ। কোনও চঞ্চলতা প্রকাশ করেনি পিঁপড়েটা। নিশ্চিন্তে বটপাতা থেকে নেমে অচেনা মুলুকে গটগট করে হেঁটে চলে গেল কোথায় যেন! পিঁপড়ের দেশ নেই। মানুষের আছে! দাদু তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বনগাঁ সীমান্তে যেত। চেকপোস্টের এপাশে দাঁড়িয়ে ওই পাশের দিকে মায়াভরা চোখে চেয়ে থাকত। ওই দিকে কোথাও তার দেশ। বিশ্বরূপ তার গভীর ঘুমের মধ্যেই পাশ ফেরে। হলধর ভূত আর জলধর ভূতের লড়াইতে কেউ হারে না, কেউ জেতে না। কিন্তু রোজ তারা লড়াই করে। শেষহীন লড়াই। অন্তহীন, জয়-

পরাজয়হীন এই লড়াই আজও হয় ওইখানে, ওই মাঠের মধ্যে, যেখানে জ্যোৎস্নারাতে পরিরা নামে, যেখানে মাঝে মাঝে কাদুয়া চোরকে গোলপোস্টে বেঁধে পেটানো হয়, আর ঘাসের মধ্যে নির্বিকার ঘুরে বেড়ায় পিঁপড়ে। প্রতিদিন ওই মাঠ ক্লান্ত পায়ে পেরোয় দুঃখী দেবীলাল।

০৫. কলকাতার খবরের কাগজ

॥ পাঁচ ॥

আঃ! আবার কতদিন পর কলকাতার খবরের কাগজ! কলকাতার ভোর। কলকাতার সোঁদা স্যাঁতা গন্ধ! গত রাত্রি যেন দুঃস্বপ্নের মতো প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছে।

মাঝরাত্তিরে শুয়েও ভোরবেলা উঠেছে শ্যামল। পৌঁনে ছ'টায়। উঠেই কেমন ফ্রেশ লাগছে। ক্লান্তি নেই, গ্লানি নেই। মনটা ফুরফুর করছে। আজ অবধি তার ছুটি। কাল জয়েন করবে অফিসে। একটি আলস্যে ভরা শ্লথ দিন সামনে পড়ে আছে ভাবলেই মনটা খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

তার ফ্ল্যাটটা মাঝারি মাপের। তিনটে শোওয়ার ঘর, একটা লম্বা ডাইনিং কাম লিভিং, ছোট ব্যালকনি। চারতলার মনোরম আবাস, তার রঙিন টিভি আছে, দেয়ালে প্লাস্টিক পেইন্ট, দু-চারটে বেশ দামি আসবাব, ওয়াল ক্যাবিনেট, প্রাণপণে খরচ করে সাজিয়েছে তারা। যদি তাতে সুখী হওয়া যায়। মুশকিল হল সুখ একবগ্গা জিনিস নয়। এই যে সকালবেলাটা তার এত ভাল লাগছে— এ সুখ হয়তো বেলা দশটায় আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাবে, ব্যাট করতে নামবে তিক্ততা এবং রাগের একটি জুটি। তারা হয়তো অনেকক্ষণ টিকে থাকবে উইকেটে। যতক্ষণ বকুল ঘুম থেকে উঠছে না ততক্ষণে নিশ্চিন্ত। উঠলেই কিন্তু অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।

বকুল এখন গভীর ঘুমে। পাশে টুকুস, গভীর ঘুমে। চটপট নিজের হাতে চা করে নিল শ্যামল। তারপর চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে বসল তার অভ্যস্ত প্রিয় সোফায়, পাশেই জানালা। পুবের রোদ একটু কোনাচে হয়ে এই সময়টায় ঢোকে তার ফ্ল্যাটে। দু'পাশে এবং সামনে উঁচু উঁচু বাড়ি থাকায় এ বাড়িতে ঢুকতে

রোদকে রীতিমতো ব্যায়াম করতে হয়। তা হোক তবু তার ফ্ল্যাটে যথেষ্ট আলো হাওয়া আছে। সে সুখী। যতক্ষণ বকুল ঘুমোচ্ছে ততক্ষণ সে সুখী…

কিন্তু বকুল জাগা মানেই বিবেক জাগল। বিবেক জেগে উঠেই তাকে নিয়ে পড়ল। সে যে কত অপদার্থ, কত অযোগ্য, কত ভিতু, কত অসফল সেই সব কথাই তার বিবেকের হয়ে প্রম্পট করে বকুল। সেই বকুল যাকে ছাড়া বাঁচবে না, নির্ঘাত মরে যাবে বলে মনে হয়েছিল তার, একদা। ওই একদা কথাটাই তাকে পেড়ে ফেলে। কেন সে একদা যে অত বোকা ছিল, প্রেমিক ও রোমান্টিক। শেকসপিয়র সাহেবও কি বোকা ছিলেন না? রোমিও জুলিয়েটের ট্র্যাজিক প্রেমের গল্প আজও দুনিয়াসুদ্ধ লোককে কাঁদায়। দুনিয়াসুদ্ধ লোক যদি তারই মতো বুরবক হয় তা হলে কী করতে পারে শ্যামল? শেকসপিয়র সাহেব, যদি রোমিও আর জুলিয়েটকে মিলিয়ে দিতেন তা হলে কী হত স্যার, একবার ভেবে দেখেছেন। প্রেমের কথাটুকুই লিখেই কলম পুঁছে ফেললেন, কিন্তু গল্পের পরও তো গল্প আছে। ধরুন স্যার, রোমিও আর জুলিয়েট বিয়েতে বসল, তিন মাস পর থেকে শুরু হল খটাখটি, তারপর চেঁচামেচি এবং চঁা ভা, আর তারপর সাহেবদের দেশ বলে কথা, রোমিওর হয়তো জুটল আরও জুলিয়েট, জুলিয়েটের জুটল আরও রোমিও, কেঁচে গেল বিয়ে কেঁচে গেল প্রেম, খাট্টা হয়ে গেল সম্পর্ক। এইসব প্রেমের কী দাম আছে মশাই? তবু যে প্রেমটা কেন বর্তে আছে দুনিয়ায় সেটাই হল প্রশ্ন।

আজকাল তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, খুব মনে হয়, মানুষের এইসব ভ্যাবলাকান্ত আচরণের পিছনে কারও একটা অদৃশ্য হাত আছে। অতি পাজি ও ধূর্ত একটা হাত। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে হাতটা ওই বিতর্কিত পার্সোনালিটি ভগবানের তা হলে স্বীকার করতেই হয় ওরকম লোকের জন্য গির্জা-মন্দির-মসজিদ বানানো নিতান্তই গাঁটগচ্চা দেওয়া। রামমন্দির বাবরি মসজিদের কাজিয়ার পিছনে কি ওই কালো হাতটাই নেই? একটা অ্যান্টি-গড মিছিল বের করলে কেমন হয়? তাতে স্লোগান থাকবে, ভগবানের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

রোদটা চোরের মতো ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে ঘাড়ের কাছে। উত্তরমুখো ফ্ল্যাট বলে শীতে রোদ আসে না। এই ভৌগোলিক গণ্ডগোলের জন্য সে ছাড়া আর কোন অদূরদর্শী আহাম্মক দায়ী। সকালের এই এক চিলতে রোদ দাঁত কেলিয়ে তার সঙ্গে একটু হেঁ হেঁ ভদ্রতা করতে আসে। মাঝে মাঝে তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে

করে, গেট আউট! নিকালো হিয়াসে! ছ্যাচড়া কোথাকার, যারা কপাল করে এসেছে তাদের বাড়ি গিয়ে চাকরের মতো শীতের রোদ ঢেলে দিয়ে এসো গিয়ে। তোমাদের সবাইকে হাড়ে হাড়ে জানি।

সকালের সুখ-সুখ ভাবটা মানসিক উত্তেজনায় চলে যেতে চাইছে। শ্যামল নিজেকে শাসন ও সংযত করল। রোদের দিকে চেয়ে বলল, অলরাইট ম্যান, তোমার ওপর আমার রাগ নেই। এসেছ যখন, ওয়েলকাম। কিন্তু আমার দুঃখের কপালটার কথাও একটু ভেবো হে। দুনিয়ায় আমার যত চেনা-জানা সবাই কেমন সাউথ-ফেসিং ফ্ল্যাট পায়? কার কালো হাত অলক্ষ্যে কাজ করে বলল তো! গ্রেটা গার্বো নয়, সায়রা বানু নয়, শ্রীদেবী নয়, মোস্ট অর্ডিনারি একটা বাঙালি মেয়ের কাছে এই নর্থ-ফেসিং ফ্ল্যাটের জন্য আমাকে কীরকম নাকাল হতে হয়, জানো? আর বদমাশ প্রোমোটার ব্যাটা আমাকে বুঝিয়েছিল, বেশ মোলায়েম আন্তরিক গদগদ গলায় সেই পাক্কা হেড টু ফুট চারশো বিশ আমাকে বুঝিয়েছিল, দুটো → একটু বিস্ময়ে উপরে তুলে বুঝিয়েছিল, সে কী দাশগুপ্ত সাহেব, আপনিও এই দক্ষিণের দলে? আপনি তো কালচার্ড মানুষ, নিশ্চয়ই জানেন, আর্টিস্টদের পছন্দ উত্তরের ফ্ল্যাট, উত্তরের আলো হচ্ছে ছবি আঁকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। যার চোখ আছে, পছন্দ আছে, রুচি আছে সে যে কেন দক্ষিণের ফ্ল্যাট নেয়! আমার হয়ে গেল ওই শুনে। তেলে ভগবান মজে, আমি তো ছার। ভেবে বোসো না যে আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। তবে আমি যে এক সময়ে একটু আধটু ছবিও আঁকতুম, সেই ধূসর স্মৃতি এমন ঠেলে উঠল যে, অন দি স্পট ডিসিশন নিয়ে ফেললুম, নাঃ, উত্তরের ফ্ল্যাটই নেব। এখনও সেই আহাম্মকির হ্যাপা সামলাতে হচ্ছে।

কাগজে মন বসাতে পারছিল না শ্যামল। কত অ্যাং ব্যাং খবরে বোঝাই, মিথ্যের ঝুড়ি, পলিটিকসের কূটকচালিতে আঁস্তাকুড় খবরের কাগজ জিনিসটা না হলে কেন যে তবু সকালে মানুষের কোষ্ঠ পরিষ্কার হতে চায় না তা বোঝে না শ্যামল। চা খেতে খেতে অন্তত পঁচিশ দিন বাদে কলকাতার খবরের কাগজ পড়ছে সে।

পাতা উলটে একটা খবরে চোখ আটকাল তার। দেওঘরে একজন এম পি তার নিজের বাড়িতে খুন হয়েছেন। হত্যাকারীরা উগ্রবাদী এবং বহিরাগত। হত্যার আগে কয়েকদিন তারা নিহতের পুরো পরিবারকে একরকম বন্দি করে রাখে এবং প্রচুর টাকা আদায় করে নেয়। সন্দেহ করা হচ্ছে উগ্রবাদীদের নেতা কুখ্যাত সুরিন্দর। পীতাম্বর মিশ্রকে সপরিবারে খুন করার পর তারা গভীর রাতের ডাউন দানাপুর এক্সপ্রেসে কলকাতা পালিয়ে গেছে।

সন্ত্রাস আর সন্ত্রাস। অন্তত পশ্চিমবঙ্গটা এদের আওতায় ছিল না এতদিন। এখন যদি একে একে দুইয়ে দুইয়ে এখানেও ঢুকতে থাকে তা হলে আর ভরসাটা কীসের? ওরা বাজারে হাটে যেখানে সেখানে ট্যারা-রা-রা ট্যাট… ট্যাট করে ছেড়ে দিচ্ছে ঝাকে ঝাকে গুলি, টু হুম ইট মে কনসার্ন। রাম গেল না রহিম গেল তাতে কিছু যায় আসে না। মাত্র দুটো এ কে ফর্টি সেভেন নিয়ে দুটো শিখ উগ্রবাদী গোটা পুরুলিয়াকে প্রায় দখল করে নিয়েছিল, ভোলেনি শ্যামল। মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী একদিন বুড়ো রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য বাংলাকে জয় করে নিয়েছিল, তার চেয়েও এটা আরও খারাপ ঘটনা। আবার তার চেয়েও খারাপ এই সুরিন্দরের এদিকপানে আসা।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই ঠিকই, যেমন ভগবান নেই, হিপনোটিজম নেই, ভূত নেই, পরি নেই, পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই। তবু শ্যামলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ ধরে। শ্যামল সেটা বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। হঠাৎ দেয়ালের ইলেকট্রনিক ঘড়িটার দিকে চেয়ে সে ঝড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বাজার! আজ সকালে বাজার না হলে রান্না হবে না। বাজার এনে ফেলতে হবে পৌঁনে আটটার মধ্যেই, কারণ প্রতি সকালে সে সাতটা পঞ্চাশ মিনিটের টিভি-র ইংরিজি খবরটা ভক্তিভরে দেখে এবং শোনে। সকালের খবরটায় কিছু বিদেশি সংবাদ থাকে।

ঘরে এসে পাতলুন চড়াতে চড়াতে সে তার বউ আর মেয়েকে লক্ষ করে। তার গোটা দুনিয়া কনসেনট্রেট করে আছে এইখানে, ওই বিছানায়। সে যা-কিছু করে তার যাবতীয় শ্রম ও চিন্তা, উদ্বেগ ও প্ল্যানিং সব কিছু মাত্র এই দু'জনকে কেন্দ্র করে। অথচ পৃথিবীটা কত বড় এবং তাতে জীবাণুর মতো কোটি কোটি মানুষ। রোগ-ভোগ, এইডস, ক্যানসার, ভূমিকম্প, বন্যা, আগুন, সুরিন্দর সবাই মিলে এত মেরে মেরেও নিকেশ করতে পারছে না। রক্তবীজের ঝাড় জনসংখ্যা ক্রমে সংখ্যা ছাড়িয়ে চলেছে অসীমের দিকে। এই এত মানুষের জন্য তার কোনও চিন্তা নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই। তার জন্য মাত্র দুটো মানুষ! ওনলি টু! এবং দুটোই লেডিজ!

বকুলের মুখে কোনও আঁচিল ছিল কি? সর্বনাশ! মনে তো পড়ছে না! কিন্তু ঘুমন্ত বকুলের মুখে বাঁ চোখের নীচে মস্ত আঁচিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে! তাহলে কি ছিল, সে লক্ষ করেনি এতদিন! এবং আঁচিলটার ফলে বকুলকে যে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, এটাও সে লক্ষ করেনি নাকি এতদিন! সর্বনাশ! এতকালের— না হোক

পাঁচ বছরের তো বটেই বিয়ে করা বউয়ের আইডেন্টিফিকেশন মার্কগুলো তার জানা নেই, এটা কেমন কথা? সত্য বটে মেয়েদের চেনে এমন বাপের ব্যাটা আজও জন্মায়নি, তা বলে আঁচিলটা এতকাল তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে রয়ে গেল কী করে?

একটু ঝুঁকে সে দেখতে পেল, না আঁচিল নয়, একটা মাছি। আগন্তুকের সাড়া পেয়েই উড়ে গেল। বাঁচা গেল বাপ! শ্যামল তো ঘামতে শুরু করেছিল, মাঝরাতের ট্রেন থেকে কোনও পরমহিলাকে ঘুমচোখে নামিয়ে নিয়ে এল নাকি।

জামা পরতে পরতে হঠাৎ আবার শ্যামল একটু ঝুঁকে বকুলের মুখখানা দেখল। হতেও পারে, এ এক পরমহিলাই। মুখে একটু মৃদু সুন্দর সুখের হাসি, একটা স্বপ্নময়তার চোরা ঢেউ যেন উথলে আনছে মুখের লাবণ্যকে। বকুল সুন্দর বটে, কিন্তু এ যে সামথিং এল। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে শ্যামল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এখন এই মুহূর্তে বকুল তার বউ নয়। বকুল এখন অন্য কাউকে দেখছে স্বপ্নে। অন্য এক পুরুষ কি? যার মধ্যে শ্যামলের ড্র-ব্যাকগুলো নেই?

কে লোকটা? কাল গাড়ির সেই পুলিশ অফিসারটি কি? সেই বিষণ্ণ রুস্তম!হ্যাঁ, হ্যান্ডসাম, মেলাঙ্কলিক, লোনলি সব ঠিক আছে। পুরুষালিও। তাই বলে... ঠিক আছে ভাই, চালিয়ে যাও। চালিয়ে যাও। লাইফ তো দু'দিনের বই নয়। যা পাও, কুড়িয়ে কাচিয়ে লুটেপুটে তুলে নাও জীবন থেকে। শ্যামল আদ্যন্ত স্পোর্টসম্যান। কিছু মাইন্ড করবে না।

ছোকরা ব্রড-মাইন্ডেড বলে ভেবেছিল শ্যামল। এখন মনে হচ্ছে, ডাল মে কুছ কালা ভি হ্যায়। এমন তো হতেই পারে যে, ট্রেনে গতকাল অনেকক্ষণ দু'জনে দু'জনকে একটু একলাএকলি পেয়েছিল। এবং তখন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়! কিছুই অসম্ভব নয়। ট্রেনটা ওইরকম অসম্ভব লেট না করলে হয়তো ঘটতে পারত না ব্যাপারটা।

ট্রেন লেট করা যে খুব খারাপ তা বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করল সে। ট্রেন লেট হওয়ার বিরুদ্ধে সে কাগজে খুব কড়া করে চিঠি লিখবে।

এমন কি হতে পারে যে, সুরিন্দরকে ধরার জন্যই বিশ্বরূপকে দিল্লি থেকে পাঠানো হয়েছে! হতেই পারে। সে ক্ষেত্রে বিশ্বরূপের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম।

সুরিন্দরের এ কে ফটি সেভেন আছে। বাক আপ সুরিন্দর, তোলো এ কে ফর্টি সেভেন, চালাও গোলি, খতম কর দো শ্যালেকো…

বাজার করাটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়ে থাকে শ্যামল। তার ভিতরে যে লড়াকু লোকটা আছে সে মালকোঁচা মারে, আস্তিন গোটায়, পাঁয়তারা ভাঁজে, বাজার মানেই ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ, প্রত্যেকেই দুর্যোধন, দুঃশাসন, জরাসন্ধ। কাম অন দুর্যোধন, কাম অন দুঃশাসন..

স্যার, অনেকদিন দেখিনি আপনাকে! পুজোয় বাইরে গিয়েছিলেন বুঝি! ভাল পিরশে আনলাম একদিন, আপনি তো পারশে খুব ভালবাসেন, খুব মনে হচ্ছিল আপনার কথা।

সাবধান! সাবধান!–বলে ভিতরের লড়াকু লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, দুঃশাসন প্যাঁচ কষছে স্যার ডেকে, নেই আঁকড়ে ভাব করে তোমাকে ভিজিয়ে ফেলছে, বি স্ট্রং অ্যান্ড আনবেন্ডিং …

কিন্তু এখনকার দুঃশাসনদের অস্ত্রশস্ত্র আলাদা। এ এক অন্য ধরনের এ কে ফর্টি সেভেন।

আজ ফার্স্টক্লাস কই আছে স্যার, এ বাজারে এই প্রথম উঠল। দর একটু কম করে দেব’খন।

শ্যামল ভিজল এবং নেতিয়ে পড়ল। দশখানা কই মাছ দাপাতে লাগল তার নাইলনের ছোট ব্যাগে। সম্ভবত তারাও ভৎসনাই করতে চাইছে তাকে। সে যে কলকাতায় ছিল না, অনেকদিন সে যে বাজারে আসেনি এটা লক্ষ করেছে আলুওয়ালাও। লক্ষ করেছে সবজিওয়ালাও। লক্ষ করেছে ডিমউলিও। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। তার বিরহে এরা খানিকটা কাতরও ছিল! দীর্ঘ বিরহের পর নিজের প্রিয়জনকে দেখে মানুষ যেমন খুশি হয় তেমনই খুশির ভাব এদের মুখেচোখে! পকেটে রুমাল থাকলে চোখের আনন্দাশ্রু মুছে ফেলত শ্যামল। তাড়াহুড়োয় রুমাল আনতে ভুলে গেছে। তবু সজল চোখে চারদিকে চেয়ে দেখল শ্যামল, ওহে কৃষ্ণ, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করো, আমাকে দেখতে দাও কে আমার শত্রু, কে আমার মিত্র। আজ শ্যামল শত্রুপক্ষ খুঁজেই পেল না। সকলকেই তার বন্ধু বলে মনে হতে লাগল।

কই মাছ!–বলে আর্তনাদ করে উঠল বকুল। আর্তনাদ না হর্ষধ্বনি তা ঠিক বুঝতে পারল না শ্যামল। সে তো হর্ষধ্বনিই আশা করছিল। সিজনের প্রথম কই!

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আত্মবিশ্বাসহীন গলায় সে প্রতিধ্বনি করে, কই মাছ! হ্যাঁ, কই। মাছই তো!

কঠিন-সুন্দর, হাস্যবিহীন মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে পলকহীন চোখে তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বকুল বলে, কে কাটবে এখন কই মাছ! সরলা আজ আসেনি। ওই কাঁটাওলা মাছ এখন কে সামলাবে! কাল রাতেই না তোমাকে বলে রেখেছিলুম, শুধু ডিম পেঁয়াজ আর আলু আনলেই হবে!

শ্যামল খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলে, নো প্রবলেম। ডিম সামনের মুদির দোকানেই পাওয়া যায়। মাছ বরং ফ্রিজে রেখে দাও।

ফ্রিজে! জ্যান্ত মাছ কখনও ফ্রিজে রাখে কেউ? কী বুদ্ধি!

তা হলে!

জ্যান্ত মাছ জলে রাখতে হয়।

ইয়েস ইয়েস, মাকেও দেখেছি ছেলেবেলায় জিয়োল মাছ জলে ছেড়ে রাখতে। ভুলে। গিয়েছিলাম।

রাখলেই তো হল না। জিইয়ে রাখলে সারাদিন খলবল করবে। সে এক অশান্তি।

কুইজ কনটেস্টের প্রতিযোগীর মতো শক্ত প্রশ্নের পাল্লায় চিন্তিত হয়ে পড়ে শ্যামল। ছোটখাটো কত ব্যাপারই যে কী সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে!

যাবে? যাও না ওই লাল বাড়িটার পিছনে থাকে। ওর বরের নাম পরিতোষ।

শ্যামল ভারী অবাক হয়ে বলে, কোথায় যেতে বলছ!

সরলাকে ডেকে আনতে। খবর দিলেই চলে আসবে। ভাল ঘুম হয়নি, শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। সরলা এলে সব সামলে নেবে। আজ একটু রেস্ট নেওয়া দরকার।

ঝাড়া দশ মিনিট এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল শ্যামল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে হল। লালবাড়ির পেছনে যে একটা বস্তি আছে তাই জানত না সে। বস্তি এমনিতেই নোংরা ও বিপজ্জনক বলে সে শুনেছে। পরিতোষকে সে চেনে না। সরলাকে পাওয়া যাবে কি না কে জানে! বস্তিবাসীরা ফ্ল্যাটবাড়ির লোকদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কি? তারা আগন্তুকদের কী নজরে দেখে? অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে। তৎসহ গভীর উদ্বেগ।

অতিশয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল শ্যামল। এ যেন সুরিন্দরের রাইফেলের মুখে এগিয়ে যাওয়া।

লালবাড়ির পিছনে বস্তির চত্বরে ঢুকেই সে দেখতে পেল, রাস্তাময় বাচ্চাকাচ্চা খেলছে। তার মেয়ের চেয়েও ছোট বাচ্চারা বেওয়ারিশের মতো ধুলোবালি নোংরায় পড়ে আছে। সর্পিল একটা রাস্তায় প্রাণ হাতে করে ঢুকল সে এবং একজন মাঝবয়সি মহিলাকে পেয়ে একটু কাঁপা গলায় বলল, পরিতোষের ঘরটা কোথায়?

পরিতোষ! আরও ভিতরবাগে চলে যান। শেষের বাঁ দিকের ঘর।

সরলা কি আছে?

থাকতে পারে। দেখুন গিয়ে।

এগোতেই একটা বাঁধানো চাতাল। সেখানেও বিস্তর বাচ্চা, তবে নোংরা সব কাপড় শুকোচ্ছে, আঁশটে বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে পচা মাছ রান্নার।

দাদাবাবু!–বলে আহ্লাদিত সরলা আঁচল সামলে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত কোলের বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল।

উদ্বেগটা কেটে গেল শ্যামলের। একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, তোমার বউদি ডাকছে তোমাকে।

কাল সন্ধেবেলাই তো ফেরার কথা ছিল আপনাদের। আমি গিয়ে সাতটা থেকে সেই রাত ন'টা অবধি বসে ছিলুম।

হ্যাঁ, আমরা মাঝরাতে পৌঁছেছি।

আপনি যান, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। খবর পেলে কোন সকালে চলে যেতাম।

বস্তি ছেড়ে ভদ্রলোকদের এলাকায় ঢুকে আরামের শাস ফেলল শ্যামল। চেনা দোকান থেকে এক প্যাকেট দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট কিনল। প্রবলেম সলভড়। একটা মস্ত কাজ করার পর বিজয়ীর মতো লাগছে না নিজেকে? কই মাছ রান্না হবে, বকুলের বিশ্রাম হবে, এর চেয়ে সুসংবাদ আর আপাতত কী হতে পারে?

সিগারেট ধরাতে গিয়েই হঠাৎ বিশ্বরূপকে মনে পড়ল। নন-স্মোকার যখন সিগারেট খায় তখন স্মোকাররা স্পষ্টই বুঝতে পারে, লোকটা আনাড়ি। বিশ্বরূপ তাদের পারিবারিক জীবনে খানিকটা ঢুকে পড়ল নাকি? হয়তো আর দেখা হবে না কখনও, শরীরী হয়ে আর আসবে না কাছাকাছি, কিন্তু স্মৃতি হয়ে? চোরাপথে? গোপন হৃদয়ের দরজা খুলে?

বিশ্বরূপ কি একজন হিরো? ডার্ক, টল, হ্যান্ডসাম। জীবন-মৃত্যু নিয়ে নিয়ত ছেলেখেলা করে! যার প্রতিদ্বন্দ্বী সুরিন্দরের মতো ভয়ংকর সব লোক! মেয়েরা কি শুধুই বীরের পূজারি?

এইজন্যই খেলোয়াড়, হিন্দি সিনেমার নায়ক, পাইলট এবং গায়কদের তেমন পছন্দ করে না শ্যামল। এরা হল অনেকটা দীপশিখার মতো, যাতে ঝাপ দিয়ে পুড়ে মরতে চায় নারী পতঙ্গেরা। একটু যাত্রার ডায়ালগের মতো শোনালেও কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।

কিন্তু বিশ্বরূপ হিরো কেন? বিশ্বরূপকে কাল অধিক রাত্রি পর্যন্ত পছন্দই তো ছিল শ্যামলের, আজ সকাল থেকে তবে অপছন্দ হচ্ছে কেন? বেলা বাড়ছে, খিদে পেয়েছে। খুব সম্ভবত সরলা গিয়ে জলখাবারের জন্য পরোটা আর আলুচচ্চড়ি বানাচ্ছে। তবু পাড়ার মস্ত সুন্দর পার্কটাতে কিছুক্ষণ বসে গভীরভাবে চিন্তা করল শ্যামল। দুটো সিগারেট উড়ে গেল। কোথাও পৌঁছানো গেল না। চিরকাল তার চিন্তার ধারা একটা চৌমাথায় এসে হারিয়ে যায়। পথ পায় না। ওইখানে একজন ট্র্যাফিক পুলিশ থাকলে তার সুবিধে হত, চিন্তার গতিটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারত সঠিক রাস্তায়।

পরোটাই। এবং আলুচচ্চড়িও। সরলাকে পাওয়া না গেলে এই প্রিয় জলখাবারটি আজ কিছুতেই জুটত না শ্যামলের কপালে। বড়জোর পাউরুটি এবং সম্ভবত

একটি ডিমসেদ্ধ।

তিনখানা পরোটা খেয়ে তৃপ্ত শ্যামল উঠল এবং খবরের কাগজ নিয়ে আর-একবার বসল গিয়ে প্রিয় সোফায়। খবরের কাগজ কী বলছে? খবরের কাগজ বলছে, পৃথিবীর অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। দিনকে দিন আরও খারাপ হবে। এবং আরও। শ্যামল সেটা জানে। কথা হল, ততটা খারাপই হবে যার ঢেউ এসে লাগবে তার চারতলার নিরিবিলি প্রিয় এই ফ্ল্যাটে? ভাবী পৃথিবী গোল্লায় যাক, কিন্তু টুকুসটার কোনও বিপদ হবে না তো! একটু আগে বস্তির বাচ্চাগুলোকে দেখে এসেছে সে, ওরকম কিছু অপেক্ষা করছে না তো তার ডলপুতুলের মতো মেয়েটার জন্য?

তোমার মুখটা আজ এত গোমড়া কেন বলো তো! বাথরুমের দরজায় মুখোমুখি দেখা হল দু'জনের। বকুল বেরোচ্ছে, শ্যামল ঢুকতে যাচ্ছে। কথাটা বলল বকুল।

শ্যামল তার গালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে, বোধহয় দাড়ি কামাইনি বলে।

দাড়ি কামালেই বুঝি তোমাকে হাসিখুশি লাগে?

মেলাঙ্কলিক ফেস-এরও তো একটা অ্যাট্রাকশন আছে।

সে তোমার মুখ নয়। বিষণ্ন মুখ আর গোমড়া মুখ কি এক হল?

তফাতটা কী?

সবার মুখে বিষাদ থাকে না, মানায়ও না।

তা হলে কাকে মানায়! হু ইজ দ্যাট রোমিও?

বাঃ রে, কাকে মানায় তা কে খুঁজতে গেছে! তোমাকে মানায় না এটা বলতে পারি।

আমাকে কিছুই মানায় না, আমি জানি।

আহা, আবার ছেলেমানুষের মতো রেগে যাচ্ছে দেখো! তোমাকে অপমান করার জন্য মোটেই কথাটা বলিনি। শুধু সিম্পল একটা প্রশ্ন করেছি, মুখ গোমড়া কেন? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল?

হল। আমি মোটেই গোমড়া মুখ করে নেই। আমি একটু চিন্তিত। সেটাকে গোমড়া মুখ বললে অপব্যাখ্যা হয়।

আচ্ছা বাবা, ঘাট মানছি।— চুলে জড়ানো গামছাটা খুলতে খুলতে শ্যামলের দারুণ সুন্দরী স্ত্রী স্নানের পর আরও সুন্দরী দেখাচ্ছে— বলল, জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে তুমি চিন্তিতই বা কেন? সকাল থেকে কী এমন ঘটল চিন্তার মতো?

শ্যামল তিলেক বিলম্ব না করে ঝটিতি একটা গল্প বানিয়ে নিয়ে বলল, সুরিন্দর ইজ হিয়ার অ্যান্ড বিশ্বরূপ ইজ হিয়ার। একটা ফ্যাটাল এনকাউন্টার অবশ্যম্ভাবী। উই মে লুজ এ গুড ফ্রেন্ড।

অবাক বকুল বলে, কিছুই তো বুঝলাম না, কী যা-তা বলছ?

শ্যামল একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিশ্বরূপ এখানে কেন এসেছে জানো? সুরিন্দরকে ধরতে।

সুরিন্দরটা কে?

ওঃ, ইগনোরেন্স দাই নেম ইজ উয়োম্যান। সুরিন্দর হল সেই সাংঘাতিক আতঙ্কবাদী যার ভয়ে সরকার থরহরি। মাত্র কয়েকদিন আগে দেওঘরে একজন প্রাক্তন এম পি-কে সপরিবারে খুন করেছে। টোটাল ম্যাসাকার। সে এখন কলকাতায়। বিশ্বরূপের আসার কারণ হল সুরিন্দর।

এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারল কি শ্যামল? বউয়ের দ্বিচারিণী মুখখানা সে জহুরির মতো লক্ষ করছিল। সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল কি মুখটা?

তোমাকে কে বলল?

নির্বিকারচিত্তে মিথ্যে কথা বলে গেল শ্যামল।— কে আবার বলবে! বিশ্বরূপ নিজেই। করিডোরে সিগারেট খেতে খেতে। ওর মুখে যে মেলাঙ্কলিক ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছ। সেটা আসলে ভয়।

সুরিন্দর কি টেররিস্ট?

টেররিজমের গডফাদার বলতে পারো। সুরিন্দর ইজ দা রুট অব টেররিজম। আজকের কাগজেই খবরটা আছে। দেখবে?

কেন যে মেয়েরা সাজে, সেটা এক বিরাট কুইজ শ্যামলের কাছে। বকুল স্নান করেছে। সব রূপটান ধুয়ে মুছে গেছে মুখ থেকে। এখন তার কাটা কাটা মুখচোখে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের যে অসহনীয় প্রকাশ ঘটেছে তা কি বোঝে তার বোকা বউ?

বকুল শ্লথ অন্যমনস্ক হাতে মাথা থেকে গামছাটা সরিয়ে আনমনা পায়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

বাথরুমে আজ গান গেয়ে হুল্লোড় করে স্নান করল শ্যামল। গল্পটা দারুণ বানিয়েছে সে। এ কথা খুবই সত্য যে, দুনিয়াতে কোথাও কিছুরই পুরো দখল পাওয়া যায় না। এই যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, কন্যা-পুত্র-কলত্রাদি কোনও কিছুরই ওপরেই মানুষের পুরো প্রভুত্ব নেই। লিজ, লং লিজ বা শর্ট টার্ম পজেশন মাত্র। বউও তাই। বকুলের সম্পূর্ণ হৃদয় জয় করে। নেওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা তার নেই। সম্ভবও নয়। তা হলে একই সঙ্গে তাকে রাজীব গাঁধী, অমিতাভ বচ্চন, ফাইটার পাইলট, ব্রিগেডিয়ার, হেমন্ত মুখার্জি, মাইক টাইসন, মারাদোনা এবং বোরিস বেকার হতে হয়। সুতরাং আংশিক দখল নিয়ে সে মোটামুটি খুশি। মাঝে মাঝে এক-আধজন আগন্তুক যদি সেই দখলে নাক গলায় তা হলেও তেমন কিছু নয়। সেটা স্পোর্টিংলি নিতে পারে শ্যামল। তবে তখন নিজের দখলটা একটু জাহির করেও নেওয়া উচিত। বিষণ্ণবদন ওই পুলিশ অফিসারটি যে খানিকটা মাথা খেয়েছে বকুলের এবং বকুল ওই বিষবেদন অফিসারের, তাতে সন্দেহ নেই। নইলে কেউ গভীর রাতে কষ্ট করে বাড়ি পৌঁছে দেয়! গাড়ির পরিচয় যত প্রগাঢ়ই হোক তা গাড়িতেই শেষ হওয়া উচিত। তাকে আবার বাড়িতে লাঞ্চে বা ডিনারের নেমন্তন্ন করা কেন বাপু?

যখন স্নান করে বেরোল শ্যামল তখন বাইরের ঘরে খবরের কাগজের ওপর আলুথালু হয়ে ঝুঁকে আছে বকুল। আলুথালু বলেই মনে হল শ্যামলের। শোয়ার ঘরে এসে আলমারির পূর্ণাঙ্গ আয়নায় এক কাপুরুষের মুখোমুখি হল শ্যামল।

০৬. গাঁধীবাদ দিয়ে শুরু

॥ ছয় ॥

গাঁধীবাদ দিয়ে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ দিয়ে যে শেষ করতে চায়, তাকে কী বলা যায় বলো তো! পাগল? আমি কিন্তু মিশ্রজিকে পাগল বলি না। আমি বলি ও ছিল চঞ্চলমতি, সবসময়ে জীবন নিয়ে নানা পরীক্ষা করত। কী বলল তাকে তোমরা? গবেষণা? তাই হবে। উনি বোধহয় জীবন নিয়ে সবসময়ে রিসার্চ করতেন।

ঘরটা একটু অন্ধকার। একটা স্ট্যান্ডের ওপর শেড দেওয়া একটা মাত্র আলো। ভজনা দেবীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। সাদা থানের ঘোমটাটা আজ বোধহয় উনি একটু বেশিই টেনে দিয়েছেন কপালের ওপর। একটা ভাগলপুরি সুতির চাদরে গা ঢাকা। পাটনায় একটু শীত পড়ে গেছে। আজ ভজনা দেবী কোনও মক্কেল নেননি। তার মুখোমুখি লম্বা সোফায় পাশাপাশি অজিত আর বিশ্বরূপ।

ঈষৎ ভাঙা ধীর গলায় চোস্ত হিন্দিতে বিশ্বরূপ বলে, ওঁর ওই রিসার্চ কি আপনি পছন্দ করতেন না?

তা কেন? যে লোকটা বুড়ো বয়সেও নিজেকে ভাঙচুর করে ফের গড়তে চাইছে সে তো জ্যান্ত লোক। মিশ্রজিকে বার্ধক্য স্পর্শও করেনি। না, তার বাইরের জীবন আমাকে কখনও ডিস্টার্ব করেনি।

আপনাদের ডিভোর্স হয় বেশ পরিণত বয়সেই, সাধারণত যে বয়সে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি আমরা বড় একটা দেখতে পাই না।

খুব ঠিক কথা। তবে আইনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার অনেক আগেই মিশ্রজির সঙ্গে আমার আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই সেসব ব্যাপার জানতে চাইবে না!

আমি শুধু জানতে চাই, মিশ্রজি কি অত্যাচারী পুরুষ ছিলেন!

সব পুরুষই খানিকটা অত্যাচারী। মিশ্রজিকে একা দোষ দিয়ে লাভ কী? মেয়েরা তা মেনে নিয়েই স্বামীর ঘর করে। আমার বিয়ে হয় আট বছর বয়সে, আর গাওনা হয় যখন আমার বয়স আঠারো। এই আট থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি আমাকে শেখানো হয়েছিল কী করে স্বামীর মনোরঞ্জন করে চলতে হবে, রাগী-খেয়ালি বাইরের কাজে ব্যস্ত ভি আই পি স্বামীকে কী রকম করে তোয়াজ করতে হবে। তোমরা তো জানোই মিশ্রজি ছাত্রজীবনেই ভি আই পি হয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলন করে আর জেল খেটে, গাঁধীবাবার সঙ্গেও তার কানেকশন ছিল।

আমরা মিশ্রজির ব্যাকগ্রাউন্ড জানি মাতাজি।

মাতাজি! না, তুমি আমাকে মাতাজি বলে ডেকো না। অজিতের মতো তুমিও মা ডেকো। আজকাল অনেকে আমাকে গুরু বানিয়ে ফেলেছে, তাই মাতাজি ডাকটা চাউর হয়ে যাচ্ছে। পাঁচজনে ডাকুক, আমি তা ঠেকাতে পারব না। কিন্তু তোমরা ডেকো না।

মিজির সঙ্গে আপনার কোথাও প্রফেশন্যাল জেলাসি ছিল কি? শুনেছি উনি জ্যোতিষ টোতিষ মানতেন না।

ওঁর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়েই নটখট ছিল। জ্যোতিষও তার মধ্যে একটা। তবে বাবা তোমাকে বলি জ্যোতিষ কিন্তু আমি টাকা রোজগারের জন্য করি না। আমার আগ্রহ ছিল, তাই প্রথম নিজে নিজে শিখেছিলাম। টের পেতাম, আমি অনেক অদেখা জিনিস অনুমান করতে পারি, অনেক অজানা কথা টের পাই। বিদ্যেটা আমি ভালবাসি। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করো না, না করাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার কাছে এটা লোক-ঠকানোর কায়দা নয়। অজিতকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, ও আমাকে অনেকটাই জানে।

জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি।

ভজনা দেবী যে একটু হাসলেন তা বোঝা গেল ঘোমটার অন্ধকারেও তার ঝকঝকে দাত ঝিকিয়ে ওঠায়। বললেন, বিশ্বাস করো?

বিশ্বরূপ এ প্রশ্নটার জবাব দিল না।

ভজনা দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পুলিশরা সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। একজন পুলিশ অফিসারের তো এমনও সন্দেহ হয়েছিল যে, আমিই নাকি ভাড়াটে খুনি পাঠিয়ে মিশ্রজিকে খুন করিয়েছি। তার কারণ মিজির দ্বিতীয় বিয়ে।

কথাটা বলে ভজনা দেবী একটু আনমনা হয়ে বসে থেকে একটু ধরা গলায় বললেন, না হয় তাই হল, কিন্তু আমি কি পারি লালুয়া আর মহেন্দ্রকে খুন করতে? লালুয়াকে যে এইটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছি। আমাকে গাল ভরে মা ডাকত।

আমি মিজির দ্বিতীয় বিয়েটা সম্পর্কে জানতে চাই। উনি বিয়েটা করলেন কেন? হয়তো ওটাও জীবন নিয়ে ওর রিসার্চ। তোমরা পুরুষমানুষেরা বাবা, এমনিতেই একটু নির্লজ্জ। বুড়ো বয়সেও কামকামনা সব দগদগ করে। আর তার জন্য না করতে পারো এমন কাজ নেই।

কিছু যদি মনে করেন, মিশ্রজি কি ওইরকমই ছিলেন?

ভজনা দেবী আবার একটু চুপ করে থাকেন। তারপর ধীর গলায় বলেন, সেটা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে বাবা। মিশ্রজি গাঁধীবাবার শিষ্য। মেয়েছেলে নিয়ে ওঁর কোনও দুর্নাম কখনও ছিল না। কিন্তু এই বিয়েটা করেছিলেন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই।

আপনি জেলাসি ফিল কেন করতেন না?

আমার বয়স কত জানো? আর ন'মাস পর পাক্কা ষাট হবে। এ বয়সে আর জেলাসির কী থাকে বাবা?

জেলাসির কি বয়স আছে?

তুমি অনেক মানুষ ঘেঁটেছ, তোমাকে আর কী বোঝাব বলো! এই বয়সের যে জেলাসি তার রকম আলাদা।

শুনেছি, আপনি মিশ্রজিকে ডিভোর্স দেননি!

ঠিকই শুনেছ। যদিও আমাদের সম্পর্ক আলগা হয়ে গিয়েছিল, তবু বিয়েটা আমি মানতুম। এখনও মানি। যদি কুসংস্কার বলতে চাও তো বোলো। আমাদের

পরিবারের শিক্ষা অন্যরকম। আমরা দেওঘরের ঠাকুরজির শিষ্য। ঠাকুরজি ডিভোর্স পছন্দ করতেন না। মিশ্রজি সেটা ভালই জানতেন। ঠাকুরজি যতদিন দেহে ছিলেন, মিশ্রজি তার কাছে যেতেন। উনি দীক্ষা নেননি, কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল। মিশ্রজি জানতেন, আমি ডিভোর্সের মামলা মরে গেলেও করব না। কিন্তু উনি করলেন।

আপনি মামলা লড়েননি?

লড়ে কী হবে? যেখানে আমিই ওঁর দু’ চোখের বিষ সেখানে আইনের লড়াই তো পণ্ডশ্রম। লোকে খোরপোশের কথা বলে। লোকেরা আহাম্মক। খোরপোশ নিতে যাব কেন বলো তো। আমি কি ভিখিরি? মিশ্রজি অবশ্য দিতে চেয়েছিলেন, আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, নেব না। তাতে ওঁর পৌঁরুষে লেগেছিল। উনি হয়তো ভেবেছিলেন, ভজনার আমার খোরপোশ বেঁচে থাকা মানেই ডিভোর্সের পরও একরকম বশ্যতা স্বীকার করা।

জ্যোতিষচর্চা থেকে আপনার আয় তা হলে ভালই হয়!

এখন হয়। আগে কষ্ট গেছে খুব।

চাকর কফি দিয়ে গেল। সঙ্গে বিস্কুট।

স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ভজনা বললেন, তুমি তদন্তে এসেছ বলে শক্ত হয়ে থেকো না। আমার ছেলেপুলে থাকলে হয়তো তোমার বয়সিই হত। ভাল ডালমুট আছে, খাবে?

না।

আর সিগারেট খেতে চাইলে খেতে পারো। কিছু মনে করব না।

কফির কাপটা তুলে নিয়ে বিশ্বরূপ বলে, মিশ্রজির দ্বিতীয় স্ত্রী মিঠিয়া সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

কিছুই জানি না। তাকে চোখেও দেখিনি। অজিতের কাছে শুনেছি সে নাকি দেহাতের মেয়ে। গরিবের মেয়েরা লোভে পড়েই তো এরকম বিয়ে করে।

একটা গভীর শ্বাস ফেলে বিশ্বরূপ বলে, মিঠিয়া সম্পর্কে আমরা তেমন কোনও খবর সংগ্রহ করতে পারছি না।

কেন বাবা, তার গায়ে খোঁজ করলেই তো হয়।

অজিত এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল, একটিও কথা বলেনি। এবার হঠাৎ বলল, না মা, মিঠিয়ার কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় বাড়ি, কার মেয়ে কিছুই কেউ জানে না।

ভজনা দেবী খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, অদ্ভুত কথা।

বিশ্বরূপ ধীর গলায় বলে, ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কোনও মানুষ তো নেই। রুট তো একটা থাকতেই হবে।

সে তো বটেই। তোমরা ভাল করে খুঁজেছ?

লোকাল পুলিশ খুঁজছে। পায়নি। কোনও অজ্ঞাতকুলশীলকে বিয়ে করার মতো অ্যাডভেঞ্চারাস মিশ্রজি ছিলেন কি?

ভজনা দেবী মাথা নেড়ে বললেন, ও মানুষ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। কখন যে কী করবেন তার কিছু ঠিক ছিল না। তবে অগাধ বুদ্ধিমান ছিলেন। আবার বোকার মতো কাজও করতেন।

বিশ্বরূপ আচমকা প্রশ্ন করে, বেশ কিছুদিন আগে আপনার বাড়িতে মিরচি নামের একটা মেয়ে কাজ করত কি?

ভজনা দেবী একটু অবাক হয়ে বললেন, মিরচি? ওঃ হ্যাঁ, মিরচি বলে একটা মেয়ে ছিল তো! কেন বাবা?

এমনিই। কীভাবে সে ঢুকেছিল এ বাড়িতে তা মনে আছে?

ভজনা আবার ভাবিত হলেন, খুব সম্ভবত লালা রামবিলাসজি ওকে পাঠিয়েছিলেন।

মেয়েটা কেমন ছিল?

ওর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। খুব বেশিদিন ছিলও না আমার বাড়িতে। মেয়েটা ভাল ছিল না। আড়ি পেতে কথা শুনবার অভ্যাস ছিল। আমার মক্কেলরা যখন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করত তখন ও গিয়ে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করত। লালাজি পাঠিয়েছিলেন বলে প্রথমে তাড়াইনি। লালাজি মিশ্রজির বন্ধু ছিলেন। আমাকে এখনও স্নেহ করেন। পাটনায় আমাকে সেটল হতে উনি অনেক সাহায্য করেছেন। ওঁর খাতিরে মিরচিকে কিছুদিন রেখেছিলাম। তারপর তাড়িয়ে দিই।

মেয়েটিকে মনে আছে?

আছে। দেহাতি মেয়ে। খুব ভাল স্বাস্থ্য। মুখখানাও খারাপ নয়। হঠাৎ মিরচির কথা কেন বাবা? তোমরা যারা পুলিশ তাদের আমি একটু ভয় পাই। এমন সব অদ্ভুত প্রসঙ্গ তোলো

যে অস্বস্তিতে পড়তে হয়।

মিরচির ব্যাকগ্রাউন্ডও কিছু জানেন?

না। লালাজি হয়তো জানবেন।

লালাজি কবুল করেছেন যে, তিনিও জানেন না।

মিরচিকে নিয়ে এত কথা উঠছে কেন?

আমাদের যতদূর জানা আছে, মিরচিই মিঠিয়া।

ভজনা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বলো কী?

বিশ্বরূপ একটা ফোটো বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলে, এ ছবিটা প্রেস ফোটোগ্রাফারের তোলা। বিহারের অনেক কাগজে এ ছবি এবং আরও অনেক ছবি রসালো ক্যাপশন সহ ছাপা হয়। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। খবরের কাগজে এরকম ছবি আপনি দেখেননি!

ভজনা কুণ্ঠিত হাতে ছবিটা তুলে নিয়ে অল্প আলোয় ঝুঁকে দেখলেন।

চিনতে পারছেন?

মিশ্রজির পাশে এ তো মিরচিই মনে হচ্ছে।

আপনার বাড়িতে খবরের কাগজ নিশ্চয়ই আসে!

ভজনা মাথা নেড়ে বলেন, আমি খবরের কাগজ পড়ি না বাবা। রাখিও না। খুন জখম পলিটিকস আমার ভাল লাগে না। তবে নিউ পাটনা টাইমস পাই কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে।

অজিত বলল, তা হলে আপনার দোষ নেই, নিউ পাটনা টাইমসের ছাপা এত খারাপ যে বাপের ছবি ছেলে চিনতে পারে না।

ভজনা দেবী হাসলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই রহস্যময়। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই কিছু জানো বাবা। কিছু একটা আঁচ করেই কথাটা তুলেছ! তবে সত্যি কথাটা হল, মিরচিই যে পরে মিঠিয়া হয়েছে এটা আমার আজ অবধি জানা ছিল না।

লোকাল পুলিশ কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করবে না।

কেন বাবা?

তাদের এমন সন্দেহ হতে পারে যে, মিরচিকে ষড়যন্ত্র করে আপনিই ভিড়িয়ে দিয়েছেন মিশ্রজির সঙ্গে, যাতে মিশ্রজির হাঁড়ির খবর আপনার নলেজে থাকে।

ভজনা শান্ত কণ্ঠেই বলেন, এরকমও হয় নাকি? শত হলেও মিশ্রজি আমার স্বামী, আমি নিশ্চয়ই চাইব না তিনি আবার বিয়ে করে আমার অপমান করুন। তোমার মতও কি লোকাল পুলিশের মতোই? তোমাকে দেখে যে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছিল!

বিশ্বরূপ একটু হাসল।–বুদ্ধিমান নই, তবে লজিক্যাল। আপনি যদি মিরচিকে মিজির বাড়িতে প্ল্যান্ট না করে থাকেন তা হলে মিশ্রজিই তাকে প্ল্যান্ট করেছিলেন আপনার বাড়িতে।

অবাক ভজনা বলেন, কেন বাবা, তা উনি কেন করবেন?

আপনার হাঁড়ির খবর জানার জন্য। ইন ফ্যাক্ট লালাজির কাছে উনিই মিরচিকে পাঠান যাতে লালাজি মিরচিকে আপনার বাড়িতে বহাল করতে সাহায্য করেন। কথাটা গোপন রাখতেও বলা হয়েছিল।

তোমরা কী করে জানলে?

লালাজি সবই কবুল করেছেন। তিনি নিরপরাধ।

ভজনা দেবী অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর বললেন, মিশ্রজি এতটা করতে গেলেন কেন? আমার তো গোপন করার মতো কিছু নেই।

হতে পারে, আউট অব জেলাসি। আপনার কাছে কার কার যাতায়াত সে বিষয়েও হয়তো কৌতূহল ছিল।

তুমি কি বলতে চাও উনি আমাকে সন্দেহ করতেন? বিশ্বরূপ একটু চুপ করে থেকে বলে, সন্দেহ নানারকম আছে। উনি হয়তো আপনার নৈতিক চরিত্রে সন্দেহ করতেন না। কিন্তু পলিটিকসের লোকদের আরও নানা সন্দেহ থাকে। উনি হয়তো সন্দেহ করতেন যে, আপনি লোকের কাছে ওঁর কুৎসা রটান এবং ওঁর পলিটিক্যাল কেরিয়ারের ক্ষতি করার চেষ্টা করেন।

সেটা তো অন্য কথা।

সেটাই কথা। আপনিই অন্যরকম ভয় পাচ্ছেন।

ভজনা দেবী একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে বললেন, বাঁচালে বাবা। মরার আগে যে অন্তত চরিত্রের দোষের কথা শুনে যেতে হচ্ছে না এটা মস্ত কথা। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দোষটা আমারই। কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা রয়েই গেল। তা হল মিঠিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড।

আমি জানলে তোমাকে সাহায্য করতাম।

একটু মনে করে দেখবেন যে কখনও তার দেশ বা গ্রামের কথা আপনাকে বলেছিল কি! কথাচ্ছলেও তো মানুষ কত কথা বলে!

ভজনা দেবী মাথা নাড়লেন, না বাবা, তার সঙ্গে ওসব কথা কিছু হয়নি। লালাজির লোক বলে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেসও করিনি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মিরচি বা মিঠিয়াকে নিয়ে খুব চিন্তিত।

হ্যাঁ। মিঠিয়াই হয়তো মিশ্রজির নিয়তি। তাকে বিয়ে করার আগে অবধি মিশ্রজি সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। বিয়ের পর উনি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আপনি বোধহয় জানেন না যে, মিশ্রজি একটা এ কে ফটি সেভেন রাইফেলও জোগাড় করেছিলেন।

জানি বাবা, অজিত বলেছে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো বাবা, সন্ত্রাসবাদীরা মিঠিয়াকেও মেরেছে।

ক্লান্ত স্বরে বিশ্বরূপ বলে, আমি কিছুই সহজে ভুলি না।

তুমি খুব এফিসিয়েন্ট অফিসার, তাই না বাবা?

হঠাৎ এ কথা কেন বলছেন?

অন্য পুলিশদের মতো তুমি কাঠ-কাঠ নও, কড়া কথাও বলতে চাও না। সুরিন্দরের সঙ্গে পাল্লা নিতে তুমি একা এসেছ, তাতেই বুঝতে পারছি সরকার তোমার ওপর ভরসা করেন।

মাথা নেড়ে বিশ্বরূপ বলে, কথাটা ঠিক নয়।

অজিত তোমার কথা আগে কখনও বলেনি। তোমরা কি ছেলেবেলার বন্ধু?

হ্যাঁ, বনগাঁর কাছে একটা গ্রামে আমরা থাকতাম। আমরা খুব গরিব ছিলাম। অজিতরাও।

গাঁয়ে কে আছে?

কেউ নেই। আমি বড় হয়ে কখনও সেখানে যাইনি।

কেন যাওনি বাবা?

অজিত হাসল, ও মনে করে গাঁয়ে গেলে ছেলেবেলার মুখগুলি সব হারিয়ে যাবে। ও ছেলেবেলাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

এ তো অদ্ভুত কথা!

মা, ও যে কত অদ্ভুত তা আপনি জানেন না। হার্ডকোর টেররিস্ট সুরিন্দর একসময়ে ওর দারুণ বন্ধু ছিল। জিগির দোস্ত। দু'জনে এক টিমে হকি খেলত।

বলো কী? একটা খুনির সঙ্গে।

তখন সুরিন্দর খুনি ছিল না, টেররিস্টও নয়। কাকার সঙ্গে ব্যাবসা করতে কানাডা গেল। কিছুদিন বাদেই ফিরে এল টেররিস্ট হয়ে। বিশ্বরূপের আরও হিস্টরি আছে মা, তবে সেগুলো বলা যাবে না। ও রিটায়ার করার পরও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে ওর ওপর একটা স্টোরি লিখব। তখন দেখবেন।

বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, সন্ত্রাসবাদীরা অনেক সময়ে নিজের লোককেও মারে বিপদ বুঝলে। মিঠিয়ার মৃত্যুটা সেরকমই কিছু। তবে আমাদের ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা দরকার।

হঠাৎ ভজনা দেবী মুখ তুলে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, সুরিন্দরকে পেলে তুমি কী করবে বাবা?

বিশ্বরূপ চুপ করে রইল।

মারবে তো! অজিত আমাকে বলছিল, তাকে সরকারের চাই-ই, ডেড অর অ্যালাইভ। কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায় তাকে ধরা অসম্ভব। তাই না?

বিশ্বরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এ প্রশ্নের কি জবাব হয়?

ভজনা দেবী একটু ভেজা গলায় বলেন, সে তোমার বন্ধু ছিল, তোমাদের ভালবাসা ছিল। এটা খুব খারাপ সময় বাবা, এ যুগে ভালবাসা বড্ড তাড়াতাড়ি মরে যায়। তোমার হাতটা একটু আমাকে দেখাবে?

বিশ্বরূপ অবাক হয়ে বলে, হাত!

ভজনা দেবী হাসলেন, আমার কাছে যে-কেউ যে-কোনও কাজেই আসুক, সকলেই একবার হাত বা কোষ্ঠী দেখিয়ে নিয়ে যায়। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, সকলেরই নিজের ভবিষ্যৎ জানার কৌতূহল আছে। এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। তুমি মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমের একজন। তোমার কোনও কৌতূহল নেই?

বিশ্বরূপ একটু যেন লজ্জা পেয়ে বলে, ভবিষ্যৎ জানবার কিছু নেই আমার।

এইটুকু বয়সেই তোমার মুখখানা ভারী মলিন আর হতাশ কেন বাবা?

আমার মুখটাই ওরকম।

তোমার হাতটা আমি দেখতে চাই। তোমার কৌতূহল না থাকতে পারে, আমার আছে। লাজুক একটু হাসি হেসে বিশ্বরূপ তার ডান হাতখানা কুণ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে দিল। ভজনা দেবী হাতের কাছেই একটা সুইচ টিপে একটা ছোট স্পটলাইট জ্বাললেন। একখানা ভারী আতস কাচ দিয়ে হাতখানা দেখলেন মন দিয়ে। প্রথমে ডান, পরে বাঁ হাতও।

দেহে মনে তুমি খুব শক্তিমান মানুষ।

পুলিশে চাকরি করি বলে বলছেন?

তা কেন? তুমি যেরকম তোমার হাতও সেই রকমই বলবে।

ভজনা দেবী আরও কিছুক্ষণ হাত দেখে চোখ বুজে একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর। ফের সেই অদ্ভুত প্রশ্নটা করলেন, তুমি সুরিন্দরকে মারবে?

বিশ্বরূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত গলায় বলে, মারব না মরব তা তো জানি না। এ হল "জয়হীন চেষ্টার সংগীত"। আমাদের শুধু চেষ্টা আছে। ফল জানি না।

এ তো গীতার কথা। পড়েছ? পড়েছি। বারবার পোডড়া। তোমার যা জীবন, গীতা সবসময়ে তোমার পকেটে থাকা উচিত। দাঁড়াও, আমার কাছে একটা ছোট্ট গীতা আছে তোমাকে দিই। দেবনাগরী তো পড়তেই পারো।

হিন্দি আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষা। কিন্তু গীতার দরকার নেই।

আছে। এই মায়ের এ কথাটা শুনো। সঙ্গে রেখো।

বাইরের ঘরেই বুক-শেলফ। ভজনা দেবী উঠে ছোট্ট একখানা পকেট গীতা এনে বিশ্বরূপের হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমাকে আমার উপহার।

তা হলে আজ চলি।— গীতাটা বুকপকেটে রেখে বিশ্বরূপ বলে।

এসো বাবা, জয়ী হও।

বিশ্বরূপ একটু হাসে, আমার জয়ী হওয়া মানে কিন্তু সুরিন্দরের মৃত্যু।

ভজনা দেবী সামান্য শিহরিত হয়ে চোখ বুজলেন।

চোখ বুজে থেকেই ভজনা দেবী গাঢ় স্বরে বললেন, কত মারবে তুমি? মেরে মেরে কি শেষ করতে পারবে ওদের? একজন মরছে তো দশজন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

আপনি তো গীতা মানেন। যা ঘটবার তা ঘটেই আছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।

অস্ফুট কণ্ঠে ভজনা দেবী বললেন, ভুল হচ্ছে। কোথাও বড় ভুল হচ্ছে আমাদের।

তাই হবে হয়তো। কে জানে! দুর্বল পুরুষকার, দৈব বলবান।

তারা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখনও নিথর হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন ভজনা দেবী।

ফ্যাক্স মেশিনে মিঠিয়ার ছবি পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে। পরদিনই জবাব এল, নাম সুন্দরী। পদবি নেই। দেহাতি মেয়ে, তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ধানবাদে একটা ঠেক আছে। বন্দনা শর্মা হয়তো কিছু জানে। কিন্তু বন্দনা বড়লোকের মেয়ে, প্রভাবশালী। হ্যান্ডল উইথ এক্সট্রিম কেয়ার…

দু'দিন বাদে এক সন্ধ্যায় ধানবাদের এক অফিসার্স ক্লাবে একটি সুন্দরী মেয়ে বিলিয়ার্ড খেলছিল। আচমকাই টেবিলের ওপর একটা অচেনা ছায়া এসে পড়ল।

হু আর ইউ?

দি ল!

গো টু হেল।

উই আর ইন হেল ম্যাডাম।

বন্দনা নির্বাক মুখে বিষাদগ্রস্ত মুখখানার দিকে চেয়ে রইল। এত স্পর্ধা সে কারও দেখেনি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী। লোকটার পিছনে সে তিন-চারজন লোককে দেখতে পেল, যাদের এখানে দেখার কথাই নয়। সে জানে, স্পর্ধার কাছে কখনও কখনও নত হতে হয়।

বন্দনা মুখ নামিয়ে নিল।

বিশ্বরূপ ইংরিজিতে বলল, আমি খুব বেশি সময় নেব না। কিন্তু একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।

বন্দনা ঈষৎ রক্তাভ মুখে বলে, বাইরে আমার গাড়ি আছে।

চলুন।

ক্লাবের চমৎকার পার্কিং লটে একখানা নতুন মারুতি দাঁড়ানো। সবুজ রঙের ওপর ফ্লাডলাইট পিছলে যাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে বন্দনা ইঞ্জিন আর এয়ারকন্ডিশনার চালিয়ে দিল।

নাউ শুট, হি-ম্যান।

বিশ্বরূপ তার ঘুম-ঘুম ঠান্ডা গলায় ইংরিজিতে বলে, আপনি যে কোনওরকম চেঁচামেচি রাগারাগি বা জোর জবরদস্তি না করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার সঙ্গে চলে এলেন তার জন্য ধন্যবাদ।

মোটেই তা নয়, মিস্টার সুপারম্যান। আমি অতটা সহজ লোক নই। আপনার সঙ্গে চার পাঁচজন প্লেনড্রেস পুলিশ অফিসার ছিল, তাদের সবাইকে আমি চিনি। ডি এস পি চৌধুরী সাহেবকে আমি কাকা বলে ডাকি, উনি চোখ টিপে ইশারা করায় আমি রেজিস্ট করিনি। বুঝলেন, মিস্টার জিরো জিরো সেভেন? এখন দয়া করে বলুন তো ক্লাবে এসে হামলা করার মতো এমন কী জরুরি ব্যাপার।

বিশ্বরূপ ক্লান্ত গলায় বলে, ক্লাবে না এলে আপনাকে আজ ধরা যেত না। আজ রাতে আপনার বাড়িতে বিরাট পার্টি আছে।

আপনি চালাক হলে সেই পার্টিতেই কৌশলে ঢুকে যেতে পারতেন। সিন ক্রিয়েট করতে হত না।

আমি আজ রাতেই ধানবাদ ছেড়ে যাব মিস শর্মা। আমার হাতে সময় ছিল না।

একটা ফোটোগ্রাফ বের করে বন্দনার হাতে দিয়ে বিশ্বরূপ বলে, দেখুন তো একে চেনেন কি না?

বন্দনা বাতিটা জ্বেলে এক পলক দেখেই বলল, সুন্দরী।

আমরা এর ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই।

সেটা আমি আপনাকে জানাব কেন? আমার কী দায়?

সামনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আনমনে স্বগতোক্তির মতো মৃদু স্বরে বিশ্বরূপ বলে, আপনার কোনও দায় নেই মিস শর্মা।

বন্দনা শ্লেষ মেশানো গলায় বলে, নাউ মে আই গো ব্যাক টু মাই গেম, মিস্টার সেক্সঅ্যাপিল?

তেমনি আনমনে বিশ্বরূপ স্বগতোক্তির মতো করে বলে, গেম মিস শর্মা?

চাপা তীব্র গলায় বন্দনা বলে, মিস্টার বিশ্বরূপ সেন, উইল ইউ প্লিজ গেট আউট অফ মাই হেয়ার নাউ?

বিশ্বরূপ তার ক্লান্ত বিষণ্ন চোখ দুখানা ধীরে ফেরাল বন্দনার মুখের ওপর, আপনি আমার নাম জানেন। জানার কথা নয় কিন্তু।

বন্দনা বিষ-হাসি হেসে বলে, আই হেট ইউ স্মার্ট আলেক। আই হেট ইয়োর গাটস।

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমন নির্বিকারভাবে বিশ্বরূপ বলে, উই কুড টক অ্যাবাউট গেমস। হোয়াট ইজ ইয়োর গেম মিস শর্মা?

সেটা আমি আপনাকে বলব কেন? আপনি আপনার খেলা খেলবেন, আমি আমার খেলা খেলব।

বন্দনার গলার ঝঝ এবং তীব্র রাগ বা ঘেন্না স্পর্শও করল না বিশ্বরূপকে। আপনমনে মাথা নেড়ে সে বিড়বিড় করে বলল, ইট ওয়াজ নট সুরিন্দরস গেম আইদার। সুরিন্দর নেভার কিলড এ উয়োম্যান।

ঝাঁঝালো মার্কিন ইংরিজিতে বন্দনা বলে, কী সব যা-তা বলছেন! প্লিজ! আমি আর সময় দিতে পারছি না।

বিশ্বরূপ একটু হাসে, সময়টা কাকে দেবেন মিস শর্মা? যখন হাতে অনেক সময় পাবেন, কিন্তু বিলিয়ার্ড টেবল থাকবে না, ক্লাব থাকবে না, পার্টি থাকবে না, গাড়ি থাকবে না, বন্ধু থাকবে না, এমনকী এক চিলতে আকাশ বা সামান্য ঘাসজমিটুকুও থাকবে না, থাকবে শুধু গরাদের অবরোধ, তখন সময়টা কাকে দেবেন?

বন্দনা চিড়চিড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

বিশ্বরূপ শান্ত গলায় বলে, অযথা আনপ্রফিটেবল রাগ করতে নেই। ইউ আর নট বিয়িং লজিক্যাল।

আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন? অন হোয়াট গ্রাউন্ড?

এ কথাটাও যেন শুনতে পেল না বিশ্বরূপ। বিড়বিড় করে বলে, কারও হাতে অঢেল সময়, কারও হাতে একটুও সময় নেই।

কী বলছেন?

আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট এ গেম মিস শর্মা। এ ডেডলি গেম। তাতে কেউ হারে না, কেউ জেতে না। শুধু লড়াই হয়।

ননসেন্স।

বিশ্বরূপ তেমনই বিড়বিড় করে, একদিন আমি আপনাকে আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাব, যদি সময় আমাদের দয়া করে।

আমি শুনতে চাই না।

গাড়ি স্টার্ট দিন মিস শর্মা।

কেন?

উই আর গোয়িং ফর এ রাইড।

হোয়াট রাইড?

প্লিজ! স্টার্ট দি কার। ড্রাইভ।

বন্দনা গাড়িতে স্টার্ট দিল। ঝাঁঝালো স্টার্ট।

আস্তে মিস শর্মা। উই আর নট গোয়িং টু কমিট সুইসাইড। আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ।

হ্যাকনীড।

মিস শর্মা, যে-কোনও অন্ধকার নির্জন জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করান।

কেন?

আমি নেমে যাব।

তার মানে?

আমার কাজ শেষ হয়েছে। আর-কোনওদিনই আমাদের দেখা হবে না। গাড়িটা দাঁড় করান।

বন্দনা স্তিমিত গলায় বলে, আর ইউ লিভিং?

হ্যাঁ। ওই সামনে একটা গাছের ছায়া আছে। ওখানেই দাঁড় করান।

বন্দনা গাড়ি দাঁড় করায়। বাঁ দিকের দরজাটা খুলতে হাত বাড়িয়েছিল বিশ্বরূপ।

এক মিনিট মিস্টার সেন।

বিশ্বরূপ ধীরে হাতটা তুলে নিজের কোলের ওপর ফিরিয়ে আনে। অস্ফুট গলায় বলে, বলুন।

সুন্দরী আমাদের আয়া ছিল। তারপর সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দেয়। প্রথমে নকশাল ছিল। পরে অন্য কোনও ফ্যাকশনে জয়েন করে। অ্যাকটিভিস্ট, হার্ডলাইনার। পীতাম্বর। মিশ্রর সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ হয় জানি না। তারপর খুন হয়ে যায়।

আপনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের লিয়াজোঁ কে ছিল? সুন্দরী?

বন্দনার মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ে স্টিয়ারিং-এর ওপর। দুর্বল গলায় সে বলে, হ্যাঁ।

সন্ত্রাসবাদ একটা রোমান্স, তাই না? একটা বেটার সিস্টেম আনার স্বপ্ন দেখা। নকশালরাও দেখেছিল। দুনিয়ার সব সন্ত্রাসবাদীরাই স্বপ্ন দেখে।

সময় আসবে, স্মার্ট আলেক। সন্ত্রাস কেউ চায় না, তবু সন্ত্রাসের ভিতর দিয়েই পথ। করতে হয়। যে জগদ্দল সিস্টেম আমাদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে তাকে ধাক্কা দেব কী করে?

বিশ্বরূপ বিড়বিড় করে, সবাই এ কথাই বলে, অল টেররিস্টস।

আপনি সিস্টেমের প্রতিনিধি, আপনি বুঝবেন না।

বিশ্বরূপ আনমনে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। তারপর বিড়বিড় করে, আই হ্যাভ কাম এ লং ওয়ে টু কিল এ ম্যান।

বন্দনা তীব্র চাপা গলায় বলে, হোয়াট ম্যান?

যেন সামান্য সচকিত হয়ে বিশ্বরূপ বলে, আমারও সেই প্রশ্ন। হোয়াট ম্যান!

বন্দনা সামান্য ঝুঁকে পড়ে তেমনই তীব্র গলায় বলে, এটা ইয়ার্কি নয় মিস্টার সেন। আমি জানতে চাই লোকটা কে। আপনি যাকে মারতে এসেছেন?

ক্লান্ত চোখে চেয়ে বিশ্বরূপ তার ভাঙা ধীর গলায় বলে, কখনও হৃদয়বৃত্তিকে সন্ত্রাসের সঙ্গে মেশাতে নেই মিস শর্মা। সন্ত্রাসবাদীরা বরাবর ওই ভুল করে।

কী বলছেন?

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে তার স্বগতোক্তি করতে থাকে, একটা আনপড়, সরল দেহাতি মেয়েকে বিনা অপরাধে ওরকম ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া উচিত কাজ হয়নি।

সুন্দরীকে কারা মেরেছে তা আমি জানি না।

সুন্দরীর কথা হচ্ছে না।

তবে কার কথা?

সুন্দরীর বদলে যাকে মারা হয়েছিল।

তার মানে?

বিশ্বরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সুন্দরী মারা যায়নি মিস শর্মা। কিন্তু তার মৃত্যু দেখানোর জন্য একজন দেহাতি মেয়েকে তুলে আনা হয়েছিল পীতাম্বরের বাড়ির মধ্যে। তাকে মারা হয়েছিল এমনভাবে যাতে চেনা না যায়। মেয়েটাকে মেরেছিল সুন্দরীই।

বডি আইডেন্টিফাই করা হয়নি?

কে আইডেন্টিফাই করবে? কেউ তাকে ভাল করে দেখেনি। লোকাল লোকেরা তাকে চেনেও না। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নিহত মেয়েটা মিঠিয়া অ্যালিয়াস মিরচি অ্যালিয়াস সুন্দরী।

উত্তেজনায় ঠোঁট কঁপছিল বন্দনার, সুন্দরী বেঁচে আছে? আর ইউ সিয়োর?

ভেরি মাচ।

মাই গড!—-বলে একদম নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল বন্দনা।

বিশ্বরূপ তার স্বপ্নময় কণ্ঠে খুব ধীরে বলল, আপনার জীবনের আনন্দটাই মরে গেল বোধহয় আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বেঁচে আছে শুনে!

আই ডোন্ট বিলিভ ইউ।

নো ম্যাটার, সুরিন্দর আর সুন্দরী বোধহয় এখন একসঙ্গে থাকে। কোথায় থাকে তা জানেন?

কথাটার জবাব দিল না বন্দনা। চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর একসময়ে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বিশ্বরূপের দিকে। আপনাকে এক ঘণ্টা পর কোথায় পাওয়া যাবে?

পাওয়া যাবে না মিস শর্মা।

প্লিজ! আমার জরুরি কথা আছে।

বিশ্বরূপ ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, রেস্ট হাউসের ফোন খুব আনসেফ। তবু নম্বরটা লিখে নিন।

নোটবইতে নম্বরটা টুকে নিয়ে বন্দনা বলে, আপনি নিশ্চয়ই আর এক ঘণ্টার মধ্যে ধানবাদ ছাড়বেন না?

বোধহয় না। আমি নেমে যাচ্ছি মিস শর্মা। এক ঘণ্টা— ঠিক এক ঘণ্টা পর কথা হবে।

বিশ্বরূপ নেমে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভাঙল। তারপর ধীরে হাঁটতে শুরু করল। অনেকক্ষণ অবধি বন্দনার গাড়ি স্টার্ট নিল না, টের পেল সে। তারপর স্টার্ট নিল। চলে গেল হু হু করে।

মৃতের মতো মুখ নিয়ে রেস্ট হাউসে ফিরে এল বিশ্বরূপ। যন্ত্রের মতো ঘর খুলল। দরজা বন্ধ করল। তারপর পোশাক ও জুতোসুদ্ধু বিছানায় চিতপাত হয়ে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। ঘাসের ডাঁটি বেয়ে একটা পিঁপড়ে উঠছে। খামোখা। আবার নামছে। তাও অর্থহীন।

এই বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্রে কার উত্থান, কার পতন তা কে বলবে? সে শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। নিমিত্তের ভাগী। খড়ের পুতুল। কাজটুকু শুধু করে যাওয়া। ফললাভে তার অধিকার নেই। সে মেডেল পাবে না। যে দেশে সবাই চোর সে দেশে চোর ধরা পড়লে অন্য চোরেরা তাকে জোট বেঁধে পেটায়। চোরেরাই তাকে ধরে, তার বিচার করে চোরেরা, তাকে বন্দি করে পাহারা দেয় অন্য সব চোর। এর চেয়ে হাস্যকর সিস্টেম আর কী আছে? চোরেরা আইন বানায়, চোরেরাই তা ভাঙে। বিশ্বরূপ এই

সিস্টেমের দালাল, বেতনভুক খুনি। প্রতি সন্ধেবেলা তার দাদুর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের পাপের কথা বলতে ইচ্ছে করে।

দাদু নেই। মা নেই। বাবা নেই। কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই।

ফোনের প্রথম রিং হতেই সতর্ক তন্দ্রা ভেঙে প্রস্তুত-হাতে রিসিভার তুলে নিল। বিশ্বরূপ।

বন্দনা দূর-গলায় বলল, মিস্টার সেন?

হ্যাঁ।

জিৎ হোটেল। রুম সতেরো।

ধন্যবাদ। পার্টি কেমন চলছে?

এখনও শুরু হয়নি। লেট-নাইট পার্টি অফ ইয়ং পিপল। রাত নটায় শুরু হবে, চলবে সারা রাত। আসবেন? আমি নেমন্তন্ন করছি আপনাকে। মিউজিক, ড্যান্স, ড্রিঙ্কস, আসবেন?

বিশ্বরূপ মৃদু হাসে, নেমন্তন্ন নিলাম, তবে যেতে পারব কি না কে জানে, জীবন এত অনিশ্চিত।

গড সেভ ইউ। অপেক্ষা করব কিন্তু।

আচ্ছা। বাই।

বাই।

আর-একটা অতি সংক্ষিপ্ত ফোন করল বিশ্বরূপ। একটু অপেক্ষা করল, তারপর বেরোল।

ফটকের সামনে দাঁড়াতেই একটা ধীরগতি পেট্রল পুলিশ-ভ্যান এসে তুলে নিল তাকে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে চোখ বুজে রইল বিশ্বরূপ। সে জানে, বন্দনা শর্মা তার সঙ্গে তঞ্চকতা করছে না, তার দেওয়া খবর একশো ভাগই ঠিক আছে। সুরিন্দর যদি তাকে একটু নাচিয়ে থাকে তবে সুরিন্দরের দোষ নেই। এই সব

ফ্যানসি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে কি সুরিন্দরের চলে? এরা তার কাজে লাগে, এদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় হয়। প্রয়োজনে এদের প্রভাব ব্যবহার করা যায়, অসময়ে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব হয়, এদের। উচ্চকোটির বন্ধুবান্ধবদেরও কিছু সমর্থন মেলে, এই পর্যন্ত। বিশ্বস্ত, জান-কবুল সাথিয়া তো এরা নয়। তার জন্যই সুরিন্দরের লাগে সুন্দরীর মতো মেয়েদের, যারা যে-কোনও কষ্ট স্বীকার করতে পারবে, কখনও ছেড়ে যাবে না, কখনও অবাধ্যতা প্রকাশ করবে না, কেটে ফেললেও মুখ থেকে কোনও কথা কেউ যার বের করতে পারবে না। সুন্দরীর পরিচয়টা সেই জন্যই জানা দরকার ছিল বিশ্বরূপের। পীতাম্বর মিশ্র বুঝতেও পারেননি তিনি কোন আগুন নিয়ে খেলছেন। নিজের স্ত্রী ভজনা দেবীর ওপর প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ অবধি সুন্দরীর প্রভাবে হয়ে পড়েছিলেন উগ্রবাদের সমর্থক। হয়তো একটা সময়ে ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে চৈতন্যোদয় হয়েছিল তার, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। গুনাগার অনেক দিতে হল তাকে।

ভজনা দেবী বলছিলেন, সায়নমতে পীতাম্বরের সূর্যরাশি হল বৃশ্চিক। বৃশ্চিকের জাতকেরা বুড়ো বয়সে হয় পাগল হয়ে যায়, নয়তো অপঘাতে মরে।

বিশ্বরূপের সূর্যরাশিও তাই। স্কোর্পিও বৃশ্চিক।

স্টেশনের কাছেই জিৎ হোটেল, নতুন ঝকঝকে ঝলমলে। প্রায় দুশো গজ দূরে গাড়ি থেকে নামল বিশ্বরূপ। হাতে সুটকেস।

তার পায়ে পায়ে উচ্চারিত হচ্ছে একটি শ্লোক, হতো বা প্রাপ্তসি স্বর্গং, জি বা ডোক্ষসে মহীম। তার বুকপকেটে ভজনা দেবীর দেওয়া গীতা। কিন্তু এ লড়াইতে কি হারজিত আছে?

আই ওয়ান্ট এ রুম।–রিসেপশন কাউন্টারে অকম্পিত হাত রেখে একটু ঝুঁকে বলে বিশ্বরূপ। ঠান্ডা গলায়। বাঁ দিকে মস্ত রেস্তরাঁ। অনেক লোক খাচ্ছে।

ইয়েস স্যার।— বলে বিনীত স্মার্ট সুবেশ অবাঙালি রিসেপশনিস্ট তার রুমচার্ট দেখতে দেখতে বলে, এ সি অর নন এ সি স্যার?

নন এ সি। ইটস অলরেডি কোল্ড ইন ধানবাদ।

ইয়েস স্যার।

একটু সময় লাগে। তারপর ঘরের চাবি হাতে আসে। হোটেল বয় তার সুটকেস তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে নিতে থাকে।

ঘরে এসে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় সে। এই ফ্লোরেই কোণের দিকে সতেরো নম্বর ঘর। ঘরের আলো নিভিয়ে দেয় বিশ্বরূপ। একটু বসে থাকে চুপচাপ। হঠাৎ তার মনে পড়ল, সুরিন্দর তাকে ডাকত রূপা বলে। খেলার মাঠে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠত, আরে রূপা, গেন বাড়া রে!

এতক্ষণে নীচের রেস্তরাঁয় অন্তত ডজন খানেক সাদা পোশাকের পুলিশ ঢুকে পড়েছে খদ্দের হয়ে। তারা সশস্ত্র, প্রস্তুত। অন্ধকারেই ঘড়ি দেখল বিশ্বরূপ। একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে করিডোর দিয়ে।

বিশ্বরূপ উঠে দরজা চুল-পরিমাণ ফাঁক করে দেখল। ঘর থেকে বেরোনোর আগে সুরিন্দরের লোক আগে দেখে নেবে, রাস্তা পরিষ্কার কি না। এ সেই অগ্রদূত, লম্বা, ফিট, চটপটে।

দরজাটা আর-একটু ফাঁক করে দাঁড়ায় বিশ্বরূপ। লোকটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নেয়। তারপর নেমে যেতে থাকে।

সতেরো নম্বরের দরজা ধীরে খুলে গেল। বুকটা হঠাৎ খাঁ খাঁ করে ওঠে বিশ্বরূপের। অতীত থেকে একটা কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল কি ‘রূপা, গেন বাড়া রে…’?

সুরিন্দর বেরিয়ে এল। ফেটে পড়ছে স্বাস্থ্য। ফেটে পড়ছে আত্মবিশ্বাস। ফেটে পড়ছে অন্তর্নিহিত ক্রোধ।

নিঃশব্দে দরজা খুলে মুখোমুখি করিডোরে দাঁড়াল বিশ্বরূপ।

বিদ্যুৎস্পর্শে কেঁপে গেল সুরিন্দর। তার ক্রুর চোখ স্থাপিত হল বিশ্বরূপের চোখে। কে জানে কেন হঠাৎ কোমল হয়ে এল সেই চোখ।

করিডোরের বাতাসে একটা তরঙ্গ তুলে গভীর একটা কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, রূপা!

০৭. জানালার ধারে তার প্রিয় সোফায়

॥ সাত ॥

জানালার ধারে তার প্রিয় সোফায় আজও সকালে খবরের কাগজ খুলে বসেছে শ্যামল, সেন্টার টেবিলে গরম চায়ের কাপ। ভোরের রোদ রোজকার মতো এসে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। রান্নাঘর থেকে চিংড়ি রান্নার গন্ধ আসছে। তার সুন্দরী স্ত্রী একটু আগেই উঠে বাথরুমে গেছে। বাতাসে এখন চোরা শীত। চমৎকার আবহাওয়া। মাঝে মাঝে নিজেকে বেশ সুখীই লাগে শ্যামলের। মাঝে মাঝে মনে হয় মোটা মাইনের চাকরি, নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, সুন্দরী স্ত্রী, ফুটফুটে বাচ্চা, তার অ্যাচিভমেন্ট বড় কম নয় আবার মাঝে মাঝে এক-একটা ভুতুড়ে দিন আসে যখন সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যেতে চায়। তখন মনে হয়, তার মতো এমন অভাগা আর কে আছে?

একটা খবরের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ল সে। গান ব্যাটল অ্যাট ধানবাদ। ড্রেডেড টেররিস্ট কিলড। সুরিন্দর নিহত হয়েছে ধানবাদের এক হোটেলে। তার তিন সঙ্গীর মধ্যে দু'জন প্রাণ দিয়েছে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে।

খবরটা পড়ে একটু নিশ্চিন্ত খাস ছাড়ে শ্যামল, যাক বাবা, সুরিন্দর যে কলকাতায় হাজির হতে পারেনি সেটাই বাঁচোয়া, ওরা সাংঘাতিক লোক। বাজারে হাটে, রাস্তায় ঘাটে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ মারে। মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা কাউকে রেহাই দেয় না। ওদের হাতে থাকে সেই ভয়ংকর মারণাস্ত্র, যার নাম এ কে ফটি সেভেন। কী যে শুরু হয়েছে দেশটায়?

আপনমনে মাথা নাড়ল শ্যামল। অফিসের সময় এগিয়ে আসছে। একটু অন্যমনস্ক ভাবে চা খেয়ে সে বাথরুমে গেল।

খবরটা বকুল পড়ল আর-একটু বেলায়, যখন শ্যামল অফিসে গেছে। মেয়ে গেছে পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে। একা জানালার ধারে বসে বকুল খবরটা পড়ে চুপ করে বসে রইল। বুকের মধ্যে একটু দোলা। শ্যামল বলেছিল, সুরিন্দরকে ধরতেই কলকাতায় এসেছিল বিশ্বরূপ। সেই থেকে সারাক্ষণ বকুলের বুকে কাটা দিয়ে ছিল একটা ভয়। ওই বিষণ্ণ, সুন্দর, শান্ত লোকটা কি পারবে এই লড়াইতে?

বুক থেকে একটা বন্ধ বাতাসকে মোচন করল বকুল। জানালার বাইরে তাকিয়ে সে খুব আনমনা হয়ে গেল। এরকম কোনও বিপজ্জনক মানুষের সঙ্গে যদি বিয়ে হত তার, তা হলে কেমন জীবন হত বকুলের? থ্রিলিং। কিন্তু না, সে জীবন সহ্য করতে পারত না বকুল। অত টেনশন তার হয়তো হার্টের অসুখ তৈরি করত। তার চেয়ে এই-ই ভাল। এই সে বেশ আছে। জীবনটা একটু একঘেয়ে, কিছুটা আলুনি। তবু এ জীবনে তো কোনও টেনশন নেই। উদ্বেগ নেই। গান ব্যাটল অ্যাট ধানবাদ। ড্রেডেড টেররিস্ট কিল্ড। মাগো! লোকটার ভয়ডর বলে কিছু নেই। একদিন মরবে।

না, ওরকম পুরুষ চায় না বকুল। তবে মাঝে মাঝে বিশ্বরূপের কথা ভাবতে তার ভাল লাগবে। গায়ে কাঁটা দেবে আনন্দে, শিহরনে। সে চায় না বটে, কিন্তু পুরুষ মানুষ তো ওরকমই হওয়া উচিত। জঙ্গি পাইলট, আর্মি অফিসার, মাউন্টেনিয়ার, দুঃসাহসী গোয়েন্দা, রেসিং কারের ড্রাইভার।

বিশ্বরূপ তার মনটা জুড়ে রইল আজ। যদি লাঞ্চে বা ডিনারে আসত! যদি দেখা হত আবার! হবে কি? না বোধহয়। পথের পরিচয় পথেই ফুরিয়ে যায়। এতক্ষণে বিশ্বরূপই কি তার কথা মনে রেখেছে?

কলকাতায় একরকম সকাল, পাটনায় আর-একরকম। আজ পাটনার আকাশ মেঘলা। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তার মধ্যে ভজনা দেবী তার ঘরখানা পর্দা টেনে আর-একটু আঁধার করে নিয়েছেন।

অজিত এল বেলা দশটা নাগাদ।

মা, খবর শুনেছেন তো?

বোস অজিত। সকালে পুলিশ সাহেব টেলিফোন করে জানিয়েছেন।

আজ মিশজির আত্মা ঠান্ডা হল মা। তাঁর খুনি খতম হয়েছে।

ভজনা দেবী ধ্যানস্থের মতো বসে ছিলেন। বললেন, তুই কি খুশি হয়েছিস?

হয়েছি। মিজির মতো মানুষকে ওরকম অপমান করেছিল বলে তার খতম হওয়ার খবরে খুশি হয়েছি। মিশ্রজি গান্ধীবাদী নেতা ছিলেন, ছাত্র আন্দোলন করেছেন, জেল খেটেছেন, মানুষের জন্য ত্যাগ ছিল অনেক। ওরকম একজন মানুষকে লোকটা অন্তত সাতদিন ধরে প্রায় চাকর বানিয়ে রেখেছিল। শুধু খুন করলে কিছু ছিল না, নেতারা খুন হতেই পারেন। কিন্তু হুকুমদাস বানিয়ে রাখবে কেন?

ভজনা দেবী পাথরের মতো বসে রইলেন। তারপর বললেন, ঠাকুরের যা ইচ্ছা। আজ সকাল থেকে তারই ধ্যান করছি। ঠাকুর বলতেন, মা খ্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপায়। বলতেন, ডেথ ইজ এ কিওরেবল ডিজিজ। মৃত্যুর বিরোধী ছিলেন খুব। কিন্তু আজ চারদিক থেকে কেন যে এত মরণ আমাকে ঘিরে ধরেছে!

একটা কথা আছে মা।

কী কথা রে?

মিঠিয়াকে নিয়ে।

তাও জানি। পুলিশ সাহেব বলেছেন। মিঠিয়া মরেনি, ওরা মিঠিয়া সাজিয়ে আর-একটা মেয়েকে মেরেছে।

মিশ্রজির সম্পত্তি এখনও অনেকটা আছে মা। কে দখল নেবে?

উড়ে-পুড়ে যাক।

আমার সন্দেহ হয়, মিঠিয়া এসে ক্লেম করবে। পুলিশকে বলবে আতঙ্কবাদীরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। বাকি ঘটনা ব্যাখ্যা করা সোজ।

নিক বাবা, মিঠিয়াই নিক। মিশজিকে পাপে ধরেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত হোক। আমাকে ওর কথা বল।

কার কথা মা?

ওই যে দুঃখী ছেলেটা, বিশ্বরূপ। ও তোর কেমন বন্ধু?

ও একটা পাগল। বিশুর এখনও ধারণা, আমাদের গাঁ জগদীশপুরে আজও অন্ধকার রাতে হলধর ভূত আর জলধর ভূত লড়াই করতে আসে, আর জ্যোৎস্নারাতে খেলা করতে নামে পরিরা। ওর দাদু নাকি প্রতিদিন সন্ধেবেলা আজও দাওয়ায় বসে থাকেন। মা অপেক্ষা করেন, আরও কত কী।

ওর কি কেউ নেই রে অজিত?

না, পরপর মরে গেল সবাই। কত কষ্ট করে মানুষ হয়েছে।

দুঃখী লোকেরা ভগবানের বড় আপন মানুষ হয়, জানিস তো!

বিশুর ভগবানও নাকি জগদীশপুরেই থাকেন। আর কোথাও নয়। জগদীশপুরে।

ওর ভাল হোক বাবা। কোনও চোট পায়নি তো! ভাল আছে?

অজিত আনমনে বলে, চোট হয়নি। তবে কেমন আছে কে জানে মা। কোন এনকাউন্টারে কবে খরচ হয়ে যাবে। ওর কথা বেশি ভাববেন না। দুঃখ পাবেন।

ওকে একখান গীতা দিয়েছিলাম। ওকে রোজ পড়তে বলিস।

দিল্লিগামী ট্রেনের এক চেয়ারকারে আর-একরকমের ভোর হল। বাইরে রোদে ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট। ধানখেত, প্রান্তর, উচ্চাবচ ভূমি পিছনে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে রেলগাড়ি। একটি সিটে এলিয়ে পড়ে থাকা বিশ্বরূপের কাছে থেমে গেছে সব গতি। থেমে আছে সময়। হে কৃষ্ণ, আমি কেন কিছুই বুঝতে পারছি না কে আমার শত্রু, আর কেই বা আমার বন্ধু। হে কৃষ্ণ… হে কৃষ্ণ… কেন বুঝতে পারি না? কেন পারি না, কৃষ্ণ… হে কৃষ্ণ… হে কৃষ্ণ… কেন ভোরবেলা আমার আঁধার নেমে আসে… কেন হারিয়ে যায় কাগজের নৌকো, পরি, ভূত…

ব্রেকফাস্ট সাব?

ধীরে মুখখানা তোলে বিশ্বরূপ। ক্লান্তি আর ক্লান্তি।… রূপা, গেন বাড়া রে…

ডবল ডিমের ওমলেট, টোস্ট, হট কফি…

আর ইউ সিক?

বিশ্বরূপ মুখ ঘোরাল। চশমা পরা একজন ভদ্র মানুষ। বিশ্বরূপ মৃদু হেসে বলে, নো, থ্যাংক ইউ।

ইউ লুক সিক। আই ক্যান হেলপ ইউ। আই অ্যাম এ ডক্টর।

বিশ্বরূপ সোজা হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বসে, আই অ্যাম ও কে, ডক্টর।

ডাক্তারের ওপাশে জানালার ধারে এক ভদ্রমহিলা। একটু ঝুঁকে তিনি বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে বলেন, ইউ লুক ভেরি ডিজেক্টেড। টায়ার্ড পারহ্যাপস?

এ বিট অফ দ্যাট। বাট ইটস অলরাইট।

একটু শীত করে বিশ্বরূপের।

আই অ্যাম ডক্টর মণি, অ্যান্ড দিস ইজ মাই ওয়াইফ মুকুল। উই আর বোথ ডক্টরস। লেট মি ফিল ইয়োর পালস।

বিশ্বরূপ হাতটা এগিয়ে দেয়।

মাই গড। ইউ আর রানিং এ হাই টেম্পারেচার। হিয়ার আর টু ট্যাবলেটস। টেক দেম উইথ টি।

বিনা প্রতিবাদে ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নিল বিশ্বরূপ। তারপর ঘুমোল কিছুক্ষণ।

ইউ হ্যাভ এ মেলাঙ্কলিক ফেস।

বিশ্বরূপ চোখ খোলে। মণি পাশে নেই। বোধহয় টয়লেটে। তার পাশে মুকুল।

বিশ্বরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হে কৃষ্ণ, আমি কেন আর বুঝতে পারছি না কে শত্রু কে মিত্র? কেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব! কত দূর ছড়িয়ে দিয়েছ তোমার কুরুক্ষেত্র, কত দূর?

আপকা শুভ নাম?

বিশ্বরূপ সেন।

ইটস এ নাইস নেম। ইউ হ্যাভ এ নাইস ফেস।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

গো টু স্লিপ নাইস ম্যান। উই আর হিয়ার টু হেলপ ইউ।

বিশ্বরূপ চোখ বোজে। একদিন গুপ্তঘাতক তাকে পেয়ে যাবে। বোমা বা অটোমেটিক রাইফেল বা চপার শেষ করে দেবে তাকে। তৈরি হচ্ছে তার আততায়ী। হে কৃষ্ণ, আমি কেন কিছুতেই আর বুঝতে পারি না কিছু? এই বিষাদ, এই প্রগাঢ় ক্লান্তির অর্থ, এই বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়ার অর্থ, গৃহবধু-সন্তানের অর্থ, যশ ও উন্নতির অর্থ, আমি কিছুই আর বুঝতে পারি না কেন? হে কৃষ্ণ…

কালো বেড়াল, সাদা বেড়াল

০১-০৫. ইন্টারকমে অতনুর গলা

কালো বেড়াল, সাদা বেড়াল – রহস্য উপন্যাস – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ইন্টারকমে অতনুর গলা পাওয়া গেল, স্যার, একজন পুলিশের লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

মনোজ সেন খুবই অবাক হয়ে বলল, পুলিশের লোক? পুলিশের লোক আমার কাছে কী চায়?

সেটা উনি আপনাকেই বলতে চান।

আজ আমার সময় কোথায়? এখনই ফরেন ডেলিগেটরা এসে পড়বেন। একটু আগে তাজ বেঙ্গল থেকে ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। মিনিস্টারের সঙ্গে জাস্ট পনেরো মিনিটের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরেই চলে আসবেন। আমি কতটা ব্যস্ত বুঝতে পারছ? আই অ্যাম গোয়িং থ্রু দি পেপার্স নাউ। লাস্ট মিনিট চেকিং।

সবই বলেছি স্যার। তবু উনি ইনসিস্ট করছেন।

ওঁকে ফোনটা দাও।

ও-কে স্যার।

টেলিফোনে একটা মিহি গলা পাওয়া গেল যা মোটেই পুলিশি কর্তৃত্বব্যঞ্জক নয়। বরং খুবই ভদ্র ও বিনয়ী গলা, মিস্টার সেন, আমার প্রয়োজনটা বিশেষ জরুরি।

আপনি আগামী কাল আসুন।

আমি জানি আপনি আজ ফরেন ডেলিগেটদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আজ তাদের সঙ্গে আপনার লাঞ্চ এবং মিটিং। একটা কন্ট্রাক্টও আজ সই হবে। কিন্তু আমার দরকারটাও গুরুতর।

খুবই মুশকিলে ফেললেন। এনিওয়ে, দু'মিনিটের বেশি সময় নেবেন না। বাই দি বাই, আপনি কি লালবাজারের লোক?

না।

তা হলে কি লোকাল থানা?

না। আমার হেড কোয়ার্টার প্যারিসে।

বলেন কী? ফরাসি পুলিশ কি বাংলা বলে?

বলে। যদি ইন্টারপোলের লোক হয়। আমি বাঙালি। দুর্ভাগ্যবশত।

ইন্টারপোল? সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আসুন মশাই।

তার সেক্রেটারি সোনালি সোম চুক্তিপত্রের কাগজগুলো টেবিলে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিচ্ছিল। মনোজ সেন তার দিকে চেয়ে বলল, ইন্টারপোলের কে একজন দেখা করতে চাইছে।

ঠিক আছে স্যার, আমি পরে আসছি।

কাগজগুলো চটপট ফাইলবন্দি করে সোনালি পাশের সুইংডোর ঠেলে ও ঘরে চলে গেল। যেতে না যেতেই বেয়ারা সামনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে স্লিপ রাখল টেবিলে।

মনোজ সেন স্লিপটা নিয়ে নামটা দেখল। সুধাকর দত্ত। ইন্টারপোল।

ভিতরে নিয়ে এসো।

যে লোকটা ঘরে ঢুকল তার চেহারাটা বেশ ভাল। তাকতওয়ালা লোক। লম্বাই চওড়াই আছে। নেভি ব্লু সুট পরা। গলায় বো। বয়স ত্রিশের কাছেপিঠে।

নমস্কার।

নমস্কার, বসুন।

আপনি আজ খুবই ব্যস্ত আমি জানি সেনসাহেব। ডিস্টার্ব করলাম বলে ক্ষমা করবেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন কী করতে পারি।

আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে বলা যাবে না। ইটস এ লং স্টোরি।

কিন্তু

কিন্তু আজ আপনার হাতে সময় নেই। ইন ফ্যাক্ট আমার হাতেও নেই। সেইজন্য শুধু কাজের কথাটুকু বলে নিই। কেমন?

সেই ভাল।

আমি আসছি এখন পশ্চিম এশিয়া থেকে।

এই যে বললেন প্যারিস?

হ্যাঁ। আমার হেড কোয়ার্টার প্যারিসে। কিন্তু আমি অন ডিউটি একটা অ্যাসাইনমেন্টে আছি।

বুঝেছি। বলুন।

আপনার কোম্পানি একটা বড় কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ।

মোট বারোজন ডেলিগেট এসেছেন, সবাই সরকারি প্রতিনিধি?

হ্যাঁ।

আপনি ক'দিন আগে ওখানে গিয়েছিলেন?

মাস আটেক আগে।

এঁদের সবাইকে কি আপনি চেনেন?

না। তবে কারও কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দু’-তিনজনকে চিনি।

এই বারোজনের মধ্যে একজনকে আমার দরকার।

তার মানে?

তিনি একজন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল।

বলেন কী?

ভয় পাবেন না। আমি তাকে অ্যারেস্ট করব না, কোনও ঝঞ্ঝাট ঝামেলাও হবে না। আমি তাকে জাস্ট আইডেন্টিফাই করতে চাইছি।

তার মানে কি আপনি তাকে চেনেন না?

না। তবে এই বারোজনের মধ্যে একজন তিনি।

কিন্তু এরা সবাই সরকারি প্রতিনিধি। প্রত্যেকেই সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। আপনার কি মনে হয় কোনও সরকার একজন ক্রিমিন্যালকে গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখবেন?

দুটো কারণে রাখতেই পারেন। এক, সরকার সম্ভবত জানে না যে ইনি একজন ক্রিমিন্যাল। দুই, ইনি হয়তো একজন এমন বিশেষজ্ঞ যে, সরকারের পক্ষে এঁকে তাড়ানো সম্ভব নয়। তৃতীয় আর একটা কারণও আছে। ইনি হয়তো সরকারকে ব্ল্যাকমেল করেছেন বা এঁর খুঁটির জোর আছে।

আইডেন্টিফাই করলে কী করবেন?

আমার কাজ আইডেন্টিফাই করা এবং হেড কোয়ার্টারে জানানো।

তারপর?

ডেলিগেটরা এরপর মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড যাবেন। তারপর দেশে ফিরবেন। সম্ভবত আমাকেও ওঁদের পিছুপিছু যেতে হবে।

আমাকে কী করতে বলছেন?

আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি আজ ডেলিগেটদের কাছাকাছি থাকতে চাই। এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

কীভাবে?

আপনি আমাকে আপনার সেক্রেটারি হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করবেন। আমি ওঁদের রিসেপশনের চার্জে থাকব।

তা কি হয়? আপনাকে আমি চিনিই না। একজন অচেনা লোকের ওপর এতটা দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনার ক্রেডেনশিয়ালসও আমি এখনও দেখিনি।

কোটের পকেট থেকে সুধাকর তার কার্ড ও পাসপোর্ট বের করে টেবিলে রেখে বলল, দেখুন। আই অ্যাম নট অ্যান ইমপস্টার।

মনোজ দেখল। জাল বলে মনে হচ্ছে না। পাসপোর্টে বহু দেশের ইমিগ্রেশনের ছাপ আছে। সে আইডেন্টিটি কার্ড আর পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বলল, কাজটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।

আপনার পয়েন্টটা আমি বুঝতে পারছি। আমার দিক থেকে যদি ডেলিগেটদের কারও কোনও বিপদ ঘটে তা হলে আপনার এত বড় কন্ট্রাক্ট ভন্ডুল হয়ে যাবে। তাই না?

সেরকম একটা ভয় তো আছেই।

প্রথম কথা, আমার কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই। আপনি আমাকে সার্চ করে দেখতে পারেন। দ্বিতীয় কথা, আপনি ইচ্ছে করলে লালবাজারে ফোন করে আমার সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না জানিয়ে আসিনি। আপনার কোনও ভয় নেই। ডেলিগেটরা কিছুই টের পাবেন না। তবে আমি যে ইন্টারপোলের লোক তা অতনুবাবু জানেন এবং আপনার সেক্রেটারি

সোনালি সোমও হয়তো জানেন। আপনি সোনালিদেবীকে একটু অ্যালার্ট করে দিলেই হবে।

আপনি সোনালি সোমের নাম জানলেন কী করে?

সিম্পল হোমওয়ার্ক। এবার বলুন, আপনি রাজি?

মনোজ মুশকিলে পড়ল। দ্বিধা, আশঙ্কা দুটোই হচ্ছে। একটু ভেবে সে বলল, কিন্তু আমার কোম্পানির ব্যাপারে এরা আপনাকেও প্রশ্ন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কী হবে?

সে ক্ষেত্রে জবাব দেবেন মিস সোম। আমার কাজ হবে ওঁদের আপ্যায়নের দিকে নজর রাখা। কাছে কাছে থাকা ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

আপনি লোকটাকে আইডেন্টিফাই করবেন কী করে বুঝতে পারছি না।

ক্রিমিনালদের চোখমুখ অনেক সময়ে বিট্রে করে। কথাবার্তা থেকেও কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।

লোকটার নাম জানেন?

আসল নাম রজার ভ্যালন। কিন্তু এদের মধ্যে ও নামে কেউ নেই।

তা হলে?

নামটা বদলে নেওয়া শক্ত কাজ নয়। ক্রিমিন্যালরা এ কাজ প্রায়ই করে থাকে।

এর ক্রাইম কী?

অনেক রকম। ইনি একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। আপাতত এর বেশি জানার দরকার কী?

ক্রিমিন্যালটির এখানে আসার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে কি?

আছে। কিন্তু সে কথাও আপাতত থাক।

দাঁড়ান মশাই, লালবাজারে ফোনটা আগে করে নিই।

করুন। এই যে নম্বর...

মনোজ ফোন করল। তারপর বলল, ঠিক আছে। কিন্তু ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

ওসব নিয়ে আপনি ভাববেন না।

মনোজ সোনালিকে ইন্টারকমে ডাকল। সোনালি এলে বলল, ইনিই সেই ইন্টারপোল অপারেটর। বিশেষ কারণে ইনি আজ ডেলিগেটদের সঙ্গে থাকতে চান, অ্যাজ মাই সেক্রেটারি। আপনি সামলে নিতে পারবেন তো?

সোনালি একটু অবাক হল। কিন্তু সেটা প্রকাশ পেল চোখে। গলাটা স্বাভাবিক রেখেই বলল, পারব।

কথাবার্তা–মানে টেকনিক্যাল কোনও প্রসঙ্গ উঠলে আপনি সামলে নেবেন। ইনি শুধু অন্যান্য দিক দেখবেন। এঁর নাম সুধাকর দত্ত।

কেউ কারও দিকে ভাল করে তাকাল না। সোনালি নিজের ঘরে চলে গেল।

সুধাকর দত্ত বলল, আপনার আর কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

মনোজ একটু চিন্তিতভাবে সুধাকরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, প্রশ্ন তো অনেক। একজন ক্রিমিন্যাল আমার কোম্পানিতে আসছে কেন? আমার কারখানা তো তেমন গুরুতর কিছু তৈরি করে না। আমরা এক ধরনের অ্যালয় তৈরি করি যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পোনেন্টস তৈরির কাজে লাগে। প্রোডাকশন বেশি নয়, কারণ অনেক মেটেরিয়াল পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার এখানে গোপনীয় কিছু নেই।

সুধাকর সামান্য একটু ভেবে বলল, লোকটা কেন এ দেশে এসেছে তা আমরা এখনও জানি না। উদ্দেশ্য ধরা গেলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমরাও অন্ধকারে হাতড়ে মরছি। তবে ওয়াচ করতে পারলে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে। আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?

না। টেনশন হচ্ছে। আপনি আমাকে একটু চিন্তায় ফেলেছেন।

টেলিফোন বাজল। মনোজ টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, সেন... আচ্ছা ঠিক আছে।

ফোনটা রেখে বলল, ওঁরা রাইটার্স থেকে রওনা হচ্ছেন। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন। ভাল কথা, ওঁরা কিন্তু গুজরাত, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানাতেও কয়েকটা কারখানা ভিজিট করেছেন।

সেটা আমি জানি। তবে আমরা খবরটা দেরিতে পেয়েছি বলে ওসব জায়গায় ওঁদের ধরতে পারিনি। কলকাতায় ওঁদের শেষ স্টপ ওভারে ধরতে পেরেছি।

ঘড়িটা দেখে নিয়ে মনোজ বলল, আর পনেরো মিনিট পরে আমাদের নীচে যেতে হবে।

সুধাকর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ততক্ষণে আমি আপনার কমপ্লেক্সটা একটু ঘুরে দেখে নিতে চাই। উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশন।

কোনও বাধা নেই। তবে একা তো পারবেন না। সোনালি বরং আপনাকে নিয়ে যাক।

মনোজ সোনালিকে ডেকে বলল, ওঁকে কারখানাটা চটপট ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিন। হাতে খুব বেশি সময় নেই।

সোনালির ভ্রু সামান্য কুঁচকে ফের সহজ হয়ে গেল। বলল, ঠিক আছে। আসুন মিস্টার দত্ত।

সোনালি মেয়েটাকে মনোজ গত এক বছরেও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি। অত্যন্ত কাজের মেয়ে। চটপটে, স্মার্ট। দেখতেও চমৎকার। কিন্তু মেয়েটার মুখে কখনও হাসি দেখা যায় না। এত গম্ভীর এবং এতই সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব যে মনোজ ওর বস হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে ওকে সমীহ করতে বাধ্য হয়। সোনালির অ্যাকাডেমিক রেকর্ড খুবই ভাল। ইংরেজিতে এমএ এবং আরও কয়েকটা ট্রেনিং নেওয়া আছে। কম্পিউটার ভাল জানে। খুব গোছানো এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। গত এক বছরের মধ্যে একদিনও অফিসে দেরি করে আসেনি। কখনও কাজে কোনও ঢিলেমি দেখা যায়নি। ওর শরীর খারাপ হয় না। কোনও বায়না বা দাবিদাওয়া নেই। সোনালির ওপর চোখ বুজে নির্ভর করা যায়। কিন্তু ওর মধ্যে একটু রোবট

রোবট ভাবটা খুব বেশি পছন্দ করতে পারে না মনোজ। এই যে একটু ভ্রু কোঁচকাল এতেই মনোজের অস্বস্তি হচ্ছে। রেগে গেল নাকি সোনালি?

ইন্টারকমে অতনুকে ডেকে মনোজ বলল, ওঁরা রাইটার্স থেকে রওনা হয়েছেন। তোমার রিসেপশন কমিটি ঠিক আছে তো?

সব ঠিক আছে স্যার।

তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সুধাকর দত্ত নামে যে ভদ্রলোক এসেছেন, আমার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবেন। বুঝেছ?।

সেক্রেটারি?

হ্যাঁ। অ্যান্ড নো কোশ্চেন।

ওকে স্যার।

আর ইন্টারপোল কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে যাও। বুঝেছ।

হ্যাঁ স্যার। উনিও আমাকে সেটা বুঝিয়ে গেছেন।

মনোজ উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। বিশাল দেওয়াল-জোড়া কাঁচের শার্সি। অখণ্ড অভঙ্গুর কাচ। পিছনে গাছপালা, সাজানো বাগান-ঘেরা লন, লনের ওপাশে কয়েকটা লম্বা লম্বা শেড। ওইসব শেড হল তার কারখানা। ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়। বাঁ দিকে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, ডানদিকে মেল্টিং শপ। খুব বেশি লোক এখানে কাজ করে না। লোকের তেমন দরকারও নেই। কিন্তু দরকার ভাল বিশেষজ্ঞের। আগে কারখানার আবহাওয়া শান্ত ছিল। এখন একটা ইউনিয়ন হয়েছে। কিছু কিছু অশান্তি দেখা দেয় মাঝে মাঝে। তবে এখনও তা মাত্রা ছাড়ায়নি। আর একটা ঝামেলা হচ্ছে, কিছু পয়সাওলা লোক কারখানাটা কিনে নিতে চায়। তার জন্য চাপও দেয় নানাভাবে। অনেক টাকার অফার।

টেনশন মনোজ সহ্য করতে পারে না। তার নার্ভ শক্ত নয়। কিন্তু তার বউ রোজমারির নার্ভ খুব শক্ত। জার্মানিতে যখন ছিল মনোজ তখন রোজমারির সঙ্গে তার প্রেম এবং বিয়ে। রোজমারিও মনোজের মতোই একজন মেটালার্জিস্ট। তাদের দুজনেরই উঁচু ডিগ্রি আছে। এই কারখানা করার ব্যাপারে রোজমারির

অবদানই বেশি। সে-ই একটি জার্মান কোম্পানিকে ধরে একটা কোলাবরেশনের ব্যবস্থা করে। এই কারখানার পিছনে সেই জার্মান কোম্পানির টাকা ও প্রযুক্তি বারো আনাই কাজ করছে।

রোজমারি ছাড়া মনোজ অচল। রোজমারি যেমন কর্মঠ তেমনি বুদ্ধিমতী। ক্ষুরধার তার ধাতু সংক্রান্ত জ্ঞান। এই কারখানায় যে অ্যালয় তৈরি হয় তার যে বাজার একদিন এত ভাল হবে তা রোজমারিই প্রথম বুঝতে পেরেছিল। আজ কারখানা চলছে রমরম করে। বিদেশের বাজার তারা অনেকটাই দখল করতে পেরেছে। যে প্রতিনিধিদল আজ আসছে, তাদের সঙ্গেও প্রথম যোগাযোগ করেছিল রোজমারিই।

বাইরের দিকে চেয়ে সে আনমনে কিছুক্ষণ নানা কথা ভাবল। একটু টেনশন হচ্ছে। কেন হচ্ছে কে জানে। এই সুধাকর দত্তর হঠাৎ উদয় তার একটুও ভাল লাগছে না।

ইন্টারকম বাজল। অতনু।

স্যার, এইমাত্র খবর এল ডেলিগেটদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁরা তাজ বেঙ্গলে ফিরে যাচ্ছেন।

কী বলছ? কে অসুস্থ হয়ে পড়ল?

নাম তো বলেনি স্যার। তবে ওঁরা এখন আসতে পারছেন না।

পরে আসবে?

তাও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

কে ফোন করেছিল?

সুব্রত।

সুব্রত মনোজের পিআরও। ডেলিগেটদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। মনোজ বিরক্ত হয়ে বলল, সুব্রত কি আবার কন্ট্রাক্ট করবে?

হ্যাঁ স্যার, হোটেলে পৌঁছে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে।

ঠিক আছে স্যার।

মনোজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রোজমারি লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে গ্র্যান্ডে রয়েছে। তাকে কি জানানো দরকার? জানানোই ভাল। লাঞ্চটা বোধহয় ক্যানসেল করতে হবে। সে ফোনটা তুলে নিল।

০২.

আজ, তেরোই সেপ্টেম্বর সকালে একগোছা নৈর্ব্যক্তিক রক্তগোলাপ কে পাঠাল তাকে? পার্ক স্ট্রিটের এক ফ্লোরিস্টের নোক এসে দিয়ে গেল। সেলোফেনে যত্ন করে মোড়া, তোড়ার গায়ে একটা ট্যাগ। তাতে টাইপ করা একটি বাক্য: হ্যাপি বার্থ ডে টু রোজমারি। কোনও মানে হয় না ব্যাপারটার। আজ রোজমারির জন্মদিন? তার জন্মদিন পার হয়ে গেছে আরও দশ দিন আগে। ট্যাগে কারও নাম নেই এটা রীতি নয়। রহস্য তার ভাল লাগে না। ঘটনাটা তাকে ভাবিয়ে তুলল।

তাদের বাড়ির কাজের লোক তিনজন। ঘরের কাজ করে তাজু আর লেখা। বাগানের জন্য আছে বনমালী। তাজু আর লেখা বাপ আর মেয়ে। দু'জনেই খুব কাজের। তাজু রাঁধে, বাজারহাট করে, জামাকাপড় মেশিনে কাঁচে ও ইস্তিরি করে, ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিল মেটায়, জার্মান শেফার্ড কুকুরটার দেখাশুনো করে এবং আরও নানা কাজে সাহায্য করে। লেখা ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, বিছানা করা ও তোলা ইত্যাদি। দু'জনেই খুব পরিশ্রমী। বনমালীও বেশ কর্মঠ। এরা সকলেই সাতশো টাকা করে মাইনে, খাওয়া, থাকার ঘর, কাপড়চোপড় পায়। ডয়েশ মার্কের হিসেবে বেতন এতই কম যে রোজমারি খুবই অবাক হয়। কোনও সভ্য দেশে এই বেতনে দিন-রাতের কাজের মানুষ পাওয়া যায় এরকম সে স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রায় ক্রীতদাসের মতোই এরা হুকুম তামিল করে, খুবই ভদ্র এবং অনুগত। মাঝে মাঝে সে ভাবে, এদের কি আমরা এত সস্তায় কিনে নিয়েছি?

গোলাপের তোড়াটা যখন এল তখন দোতলার বারান্দায় সকালের রোদে বসে ছিল রোজমারি। গায়ে হালকা সানট্যান তেল মেখে নিয়ে রোজই সে কিছুক্ষণ সকালের রোদ পোয়ায় এবং চোখ বুজে খুব স্থিরভাবে সারা দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে নেয়। তার স্বামী মনোজ একটু অগোছালো স্বভাবের এবং হয়তো

আত্মবিশ্বাসেরও কিছু অভাব আছে। মনোজের ফাঁকগুলো রোজমারিকেই ভরাট করতে হয়। সকালবেলায় এই রোদ পোয়ানোর সময়টুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দিনটাকে আগাম সাজিয়ে নেওয়া। ঘড়ি ধরে এবং সঠিক পরম্পরায়।

ঠিক ওই সময়েই গোলাপের তোড়াটা নিয়ে ফুলওয়ালার লোক এল। তোড়াটা ওপরে নিয়ে এল তাজু। মেমসাব, ফুল।

কীসের ফুল?

বার্থ ডে। ফ্লোরিস্টের লোক দিয়ে গেল।

রোজমারি ফুল এবং ট্যাগ দেখে ভ্রু কুঁচকে বলল, আমার বার্থ ডে তো আজ নয়!

জানি মেমসাব।

ঠিক পঁয়ত্রিশটা ফুল। রোজমারির বয়স এখন পয়ত্রিশই। কিন্তু কে এই ভুল দিনে ফুল পাঠাল সেটা বুঝতে পারল না সে। ফুল সে খুবই ভালবাসে। ভালবাসে কাজ। ভালবাসে সাফল্য। ভালবাসে লড়াই। ভালবাসে হেলথ ফুড। ভালবাসে আরও অনেক কিছু।

রোজমারি তাজুকে বলল, লিভিং রুমে সাজিয়ে রেখে দাও।

তাই রাখল তাজু। মধ্যবয়স্ক তাজু একটু কম কথার মানুষ। সে লম্বা ও রোগা এবং মধ্যবয়স্ক। তার মেয়ে লেখার বয়স কুড়ি হতে পারে। একটু লাজুক। বাবাকে খুব ভয় পায়। এই বাবা আর মেয়েকে খুব লক্ষ করে রোজমারি। এমন অদ্ভুত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার ভাব সে কদাচ দেখেনি। এদের মধ্যে সবসময়ে যেন কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে থাকে। মনোজ বলেছিল, এ দেশে ঝি-চাকরের মাইনে নাকি অনেক কম। এরা বেশি মাইনে পায় বলেই অমন কৃতার্থ। রোজমারির বিস্ময় এখানেই। সাতশো টাকাও কি খুব খুব খুব কম টাকা নয়? মাত্র সাতশো টাকায় একটা মানুষ!

ব্রেকফাস্ট করতে যখন লিভিং রুম পেরিয়ে ডাইনিং হলের দিকে যাচ্ছিল রোজমারি তখন বুককেসের ওপর কাট গ্লাসের ফুলদানিটা চোখে পড়ল।

পঁয়ত্রিশটা গোলাপের কুঁড়ি। সেলোফেন ছিঁড়ে তাজু সাজিয়ে রেখেছে। রোজমারি কাছে গিয়ে ফুলগুলো দেখল। টাটকা এবং সুন্দর গন্ধ। একটা গোলাপকে সে একটু স্পর্শও করল।

কে পাঠাল? ভুল দিনে কেন? সে কি তার জন্মদিন জানে না?

ব্রেকফাস্ট খুব সামান্যই খায় রোজমারি। এ দেশের দুধ তার সহ্য হয় না, মুখেও রোচে না। তার বদলে সে বিদেশ থেকে আনানো একটা বিভারেজ খায়। সঙ্গে দুটো মাখন ছাড়া টোস্ট, একটা কলা। সকাল ঠিক নটায়। আর এই সময়েই তার দু'জন সেক্রেটারি এসে হাজির হয়। একজন শুভ, অন্যজন মৈত্রেয়ী। দু'জনেরই বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। খুব চটপটে এবং বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী। শুভ ডিকটেশন নেয় এবং কাগজপত্তর গুছিয়ে রাখে। মৈত্রেয়ী রাখে বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এরা খানিকটা রোজমারির সঙ্গীও।

দু'জন লিভিং রুমে অপেক্ষা করছিল। রোজমারি তার ব্রেকফাস্ট সেরে এসে ঢুকতেই তারা উঠে দাঁড়াল।

রোজমারি বলল, একটা মজার ঘটনা দেখবে? আজ আমার বার্থ ডে বলে কে একজন ফুল পাঠিয়েছে। ওই দেখো।

দু'জনে দেখল। মৈত্রেয়ী বলল, কিন্তু আপনার বার্থ ডে তো

সেইটেই তো মজা। কে পাঠাতে পারে বলে তো!

শুভ বলল, কোনও অন্যমনস্ক লোকই হবে।

শুভ গিয়ে ট্যাগটা দেখল। তারপর হঠাৎ বলল, ম্যাডাম, ট্যাগের উলটো পিঠে কিছু লেখা আছে।

কী লেখা আছে?

আর আই পি।

রোজমারি খুব অবাক হয়ে বলল, এটা কীরকম ইয়ারকি? আর আই পি?

হ্যাঁ ম্যাডাম, তাই লেখা।

রোজমারি একটু রেগে গেল। বলল, আর আই পি মানে তো রেস্ট ইন পিস। কবরের ওপর লেখা থাকে। শুভ, ফ্লোরিস্টের নাম আর ঠিকানা ট্যাগে ছাপা আছে। এখনই খোঁজ নাও তো।

নিচ্ছি ম্যাডাম। বলে শুভ ফোন তুলে নিল।

রোজমারি দোতলায় উঠে তার মুখটা আয়নায় দেখে চুলটুল ঠিক করে নিল। আজ বিদেশের ডেলিগেটরা আসবে। তার অনেক কাজ। অফিস থেকে তাকে দুপুরের আগেই চলে যেতে হবে গ্র্যান্ডে। মাননীয় অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়িত করতে হবে মধ্যাহ্নভোজে।

যখন নীচে নেমে এল তখন শুভ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে।

ম্যাডাম, ওরা বলছে আর আই পি হল একজনের নাম। রজার আইভ্যান পোলক। ফুলটা সে-ই পাঠিয়েছে।

রোজমারি অবাক হয়ে বলল, কিন্তু লোকটা কে? এ নামে তো আমি কাউকে চিনি না।

ওরাও বলতে পারল না। ওদের অর্ডার বুকে এই নাম লেখা আছে। ওদের বলা ছিল যেন কার্ডের পিছনে আর আই পি প্রিন্ট করা হয়।

রোজমারি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মিস্টার পোলক বেঁচে থাকুন, কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারছি না। আমাদের আর সময় নেই। চলো।

তারা বেরিয়ে পড়ল। মনোজ আজ একটু আগেই বেরিয়ে গেছে অফিসের রিসেপশন ঠিক করতে। আজকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ।

রোজমারি কোনও ব্যাপার নিয়ে অকারণ দুশ্চিন্তা করে না। সে কাজের মানুষ। কিন্তু গোলাপের তোড়াটা তাকে ভাবাচ্ছে।

আগে নিজের গাড়ি নিজেই চালাত রোজমারি। কিন্তু কলকাতার রাস্তার ভিড় আর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে সে গাড়ি চালানো ছেড়েছে। তার গাড়ি চালায় শিউশরণ। শিউশরণ খুবই ভাল ড্রাইভার। তাকে দু'হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। এ

টাকাটাও যাচ্ছেতাই রকমের কম। ভারতবর্ষের অর্থনীতির ধাঁচটা রোজমারি আজও বুঝে উঠতে পারল না।

নতুন বড় মারুতির সামনের বাকেট সিটে রোজমারি, পিছনে শুভ আর মৈত্রেয়ী। গাড়ির কাঁচ বন্ধ, এয়ার কন্ডিশনার চলছে।

রোজমারি কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলা এবং ভাঙা হিন্দিতেই কথা বলে। কারণ তার মাতৃভাষা জার্মান কেউ বুঝবে না। আর ইংরেজি এখনও রোজমারি ভাল রপ্ত করতে পারেনি। মনোজের সঙ্গে আগে সে জার্মান ভাষায় কথা বলত। আজকাল বাংলায় বলে। তাতে ভাষাটা শিখতে তার সুবিধে হয়। এখন সে বাংলা হরফ শেখার পর বই পড়ার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে শুভ আর মৈত্রেয়ী তাকে খুব উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করে।

লাল গোলাপের ঘটনাটা মন থেকে তাড়ানোর জন্য রোজমারি শুভকে বলল, এবার তুমি আমাকে কোন বইটা পড়তে দেবে শুভ?

পথের পাঁচালী পড়বেন ম্যাডাম?

ও বইটার কথা তুমি আর মৈত্রেয়ী অনেকবার বলেছ।

হ্যাঁ, খুব ভাল বই।

শক্ত নয় তো! শক্ত হলে আমি পারব না। জানো তো রাতে শোওয়ার আগে মাত্র কিছুক্ষণ আমি পড়ার সময় পাই।

জানি ম্যাডাম। এটা শক্ত বই নয়। তবে ঘটনাবহুল নয়।

দিয়ো। তুমি যে মহাভারতটা দিয়েছ সেটা কিন্তু খুব কঠিন। আমি অর্ধেক কথাই বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনাকে একটা সহজ অনুবাদ এনে দেব।

অফিসে নিজের চেম্বারে বসে রোজমারি দ্রুত কয়েকটা কাজ সারল। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে গিয়ে চারদিকে চরকিবাজি করল। সব ঠিক আছে। ছায়ার মতো

তার পিছনে সবসময়ে মৈত্রেয়ী আর শুভ। ওরা তাকে খুব পছন্দ করে, এটা টের পায় রোজমারি। সেও এ দুটিকে বেশ ভালবাসে।

মনোজের সঙ্গে টেলিফোনে তার কিছু কথা হল।

মনোজ, আমি তা হলে গ্র্যান্ডে যাচ্ছি।

যাও।

তুমি একা সব দিকে চোখ রাখতে পারবে তো।

পারব। সব ঠিকই আছে।

ডেলিগেটদের লিডার একজন বাতিকগ্রস্ত লোক। খুব খুঁতখুঁতে। শকুনের মতো চোখ। ইনফ্রাস্ট্রাকচার পছন্দ না হলে কন্ট্রাক্ট দেবে না।

জানি। আমরা তো সাধ্যমতো করছি।

রোজমারি তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হোটেলে রোজমারির কাজ হল স্যুইটটা ঠিকঠাক গোছানো আছে কি না তা দেখা। সে নিজেও খুঁতখুঁতে। লাঞ্চের মেনু এবং ড্রিঙ্কস সে নিজে অনেক ভাবনাচিন্তা করে ঠিক করেছে। ডেলিগেটদের তেল দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। এমনিতেই তার রুচি একটু নিখুঁত ঘেঁষা। এ দেশের লোকরা বেশির ভাগই একটু অলস এবং অসতর্ক। এদের ওপর নির্ভয়ে ভরসা করা যায় না। তাই রোজমারি সব ব্যাপারেই তদারকিকে গুরুত্ব দেয়।

টেবিলে সাদা টেবিল ক্লথ পাতা। ফুলদানিতে টাটকা ফুল। এবং এখানেও রক্তগোলাপ।

রোজমারি ভ্রু কোঁচকাল, শুভ, মৈত্রেয়ী, দেখতে পাচ্ছ?

মৈত্রেয়ী বলল, কী ম্যাডাম?

এখানেও লাল গোলাপ!

হ্যাঁ। তাই তো!

আমি রজনীগন্ধার কথা বলেছিলাম। একটু খোঁজ নাও তো লাল গোলাপ কেন রেখেছে।

মৈত্রেয়ী গেল এবং একটু বাদেই একজন এসে দুঃখপ্রকাশ করে বলল, ম্যাডাম, আপনার ফ্লোরিস্ট লাল গোলাপই পাঠিয়েছে।

কেন, আমার তো বলা ছিল রজনীগন্ধা। শুভ, খোঁজ নাও।

শুভ টেলিফোন করতে ছুটল এবং ফিরে এসে বলল, ওরা বলছে আপনি নাকি ফোন করে আগের অর্ডার ক্যানসেল করে লাল গোলাপ দিতে বলেছেন!

কখনওই নয়।

রোজমারির ফরসা রং হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে গেল। সে বলল, কেউ একজন আমার সঙ্গে আজ রসিকতা করছে। আমি এটা পছন্দ করছি না।

শুভ এবং মৈত্রেয়ী পরস্পরের দিকে চেয়ে খুব গম্ভীর হয়ে গেল। শুভ মৃদু স্বরে বলল, আমি ওদের বলে দিয়েছি রজনীগন্ধা পাঠাতে। এখনই এসে যাবে।

রোজমারি শুভর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, কিন্তু কে এরকম করছে বলতে পারো?

না ম্যাডাম। আমাদেরও একটু অবাক লাগছে।

ট্যাগের পিছনে আর আই পি লেখাটাও আমার ভাল লাগছে না।

আপনি কি রজার আইভ্যান পোলক নামে কাউকে মনে করতে পারছেন?

না শুভ, আমার স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল। মানুষের নাম আমার মনে থাকে। ওরকম নামের কাউকে আমি চিনি না। নামটা শুনিওনি কখনও।

শুভ বলল, তা হলে ভাবনার কথা।

মৈত্রেয়ী বলল, এটা প্র্যাকটিক্যাল জোক হতে পারে।

রোজমারি বলল, সেটা হতে পারে, কিন্তু রসিকতাটা করবে কে? আমার তেমন বন্ধু বান্ধবী তো এখানে কেউ নেই। শুভ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। ফ্রুট ককটেল দিতে বলল তো আমাদের।

যতক্ষণ পানীয় না এল ততক্ষণ রোজমারি চুপ করে সোফায় বসে রইল। তার দু'পাশে দু'জন ছায়াসঙ্গী, শুভ আর মৈত্রেয়ী।

বেয়ারা পানীয় দিয়ে যাওয়ার পর মৈত্রেয়ী বলল, ম্যাডাম, আপনি অত ভাববেন না। ব্যাপারটা হয়তো সিরিয়াস নয়।

রোজমারি গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, কোনও ডিসকর্ড ঘটলে আমি অস্বস্তি বোধ করি। ঘটনাটা স্বাভাবিক নয়।

এগারোটা নাগাদ মনোজের ফোন এল।

রোজি, একটা ঘটনা ঘটেছে।

কী ঘটনা?

ডেলিগেটরা আসতে পারছেন না। ওঁদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁরা হোটেলে ফিরে গেছেন।

সে কী?

রাইটার্স থেকে ফেরার পথে ঘটনাটা ঘটেছে। সুব্রত ওঁদের সঙ্গে আছে। সে ফোন করলে ঘটনাটা জানতে পারব।

আর লাঞ্চের কী হবে?

মনে হচ্ছে লাঞ্চ ক্যানসেল করতে হবে।

আমি কি তাজ বেঙ্গলে যাব? বা কাউকে পাঠাব?

দরকার নেই। সুব্রত ফোন করুক, তারপর দেখা যাবে।

আমি ওয়েট করছি।

শোনো, আর-একটা ঘটনা ঘটেছে।

কী ঘটনা?

হঠাৎ ইন্টারপোলের একজন অপারেটর এসে হাজির।

ইন্টারপোল! সে কী?

সে বলছে, ডেলিগেটদের মধ্যে একজন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল আছে। সে তাকে আইডেন্টিফাই করতে চায়। অপারেটরটি বাঙালি। তার নাম সুধাকর দত্ত।

এসব কী হচ্ছে বলো তো! অপারেটরটি কোথায়?

সে কমপ্লেক্স ঘুরে দেখতে গেছে। সঙ্গে সোনালি।

ডেলিগেটদের মধ্যে ক্রিমিন্যাল ঢুকবে কী করে? ওরা তো বেশির ভাগই সরকারি লোক। তিনজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন, তারা সরকারি লোক না হলেও অনারেবল।

সব বলেছি। সুধাকর দত্ত বলছে, ক্রিমিন্যালটি সাধারণ নয়। সে একজন বিশেষজ্ঞ এবং নিজের নাম ব্যবহার করছে না।

তা হলে আমরা এখন কী করব?

বুঝতে পারছি না। কিন্তু তোমাকে নার্ভাস মনে হচ্ছে কেন? তুমি তো ঠান্ডা মাথার মেয়ে।

মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছি না। এ দিকেও কিছু ঘটনা ঘটছে।

কী হল রোজি?

দেখা হলে বলব। আমি নার্ভাস নই, বিরক্ত।

বুঝতে পেরেছি।

সুব্রত ফোন করার পরই আমাকে জানাবে।

ঠিক আছে।

ফোন ধরার সময় তার ছায়াসঙ্গী দু'জন সঙ্গে থাকে না। তারা জানে ফোনে এমন অনেক কথা হয় যা তাদের শোনা উচিত নয়।

রোজমারি ঘরে ফিরে এসে দু'জনকে বলল, তোমরা জানো আমাদের অফিসে আজ ইন্টারপোলের এজেন্ট এসেছে?

দু'জনেই অবাক হয়ে বলল, সে কী?

আজকের দিনটাই বড্ড গোলমেলে। ওদিকে ডেলিগেটদের একজন অসুস্থ। ওঁরা আসবেন কি না বোঝা যাচ্ছে না।

শুভ বলল, কীরকম অসুস্থ?

তা জানি না। সবকিছু ধাঁধার মতো লাগছে।

পানীয়টা ঢকঢক করে শেষ করল রোজমারি। তারপর চুপ করে বসে রইল চোখ বুজে।

অনেকক্ষণ বাদে শুভ বলল, আপনি যখন ফোনে কথা বলছিলেন তখন ফ্লোরিস্টের লোক এসে ফুল বদলে দিয়ে গেছে।

রোজমারি চোখ খুলে দেখল, একগোছা রজনীগন্ধা যেন হেসে উঠল।

ফুল সে খুব ভালবাসে। বিশেষ করে সাদা ফুল। মনটা হঠাৎ যেন এত খারাপের মধ্যেও ভাল হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে ফুলগুলোকে হাত দিয়ে একটু আদর করল। তারপর হঠাৎ শুভর দিকে চেয়ে বলল, শুভ, কেউ কি আমাকে খুন করতে চায়?

০৩.

লোকটাকে একটুও ভাল লাগছে না সোনালির। মনে হচ্ছে, লোকটা ধূর্ত ও কুট। কারখানা দেখার নাম করে লোকটা একটা নোটবই বের করে কী সব যেন টুকে নিচ্ছিল।

মেল্টিং শপ দেখে শুধু প্রশ্ন করল, আপনারা কোল গ্যাস ব্যবহার করেন বুঝি?

সোনালি বলল, হ্যাঁ।

চারদিকে ঘুরেটুরে দেখে বলল, প্রোডাকশন তো বোধহয় তেমন বেশি নয়।

না। এই অ্যালয় একটু রেয়ার টাইপের।

সবচেয়ে বেশি সময় নিল কেমিক্যাল ল্যাবে। ল্যাবের ইনচার্জ ড. ইউ প্রসাদ একজন মস্ত ডিগ্রিধারী মানুষ। দীর্ঘকাল আমেরিকায় কাজ করেছেন। বয়স্ক লোক, কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসেন। সুধাকর অনেকক্ষণ চাপা গলায় কথা বলল প্রসাদের সঙ্গে। কী কথা হচ্ছে তা চার-পাঁচ ফুট দূরত্বে বসেও সোনালি বুঝতে পারছিল না। কথা বলতে বলতে টেবিলের তলায় আড়ালে নোট করা অব্যাহত ছিল।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে বাগান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুধাকর জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম আপনি ক'দিন এখানে কাজ করছেন?

এক বছর।

তা হলে তো অনেক কিছুই জানেন।

কী জানব?

এই এখানকার টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার।

না। আমি সায়েন্টিস্ট নই। আমার কাজ অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে।

তা হলেও কিছু নিশ্চয়ই জানেন। কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্ডার পান আপনারা?

তার কোনও ঠিক নেই।

ইন্ডাস্ট্রি অনেক রকমের আছে। আপনাদের অ্যালয়টা ঠিক কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগে বলতে পারেন?

না। আমার জানা নেই।

হয়তো আপনি বলতে চাইছেন না।

এ ব্যাপারে আপনি মনোজবাবুর সঙ্গেই কথা বলতে পারেন।

সুধাকর দত্ত একটা ছোট্ট ক্যামেরা বের করে চটপটে হাতে কারখানার কয়েকটা ছবি তুলে নিল বাগানে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা ভাল লাগল না সোনালির। সে অবশ্য প্রতিবাদও করল না। ইন্টারপোলের এজেন্টদের হয়তো এসব স্বাধীনতা আছে।

লোকটা ক্যান্টিনের কাছ বরাবর এসে নাক তুলে একটু গন্ধ শুকে বলল, মাদ্রাজি খাবারের গন্ধ পাচ্ছি। আপনাদের ক্যান্টিন কি কোনও সাউথ ইন্ডিয়ান চালায়?

না। তবে সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ তৈরি হয়।

মিস সোম, আপনি কি বিবাহিতা?

সোনালি একটু অবাক ও বিরক্ত হয়ে বলল, কেন?

এমনি।

আমি ডিভোর্সি।

মুখে একটু আপশোসের চুক চুক করে সুধাকর দত্ত বলল, আজকাল ডিভোর্স খুব বেড়ে গেছে, না?

হবে হয়তো। সোনালি নিস্পৃহ জবাব দিল।

সুধাকর দত্ত হঠাৎ ফের জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন রোজমারির এটাই প্রথম বিয়ে কি না!

বিরক্ত সোনালি বলল, তা আমি কী করে বলব?

আহা, মেয়েরা তো অনেক কিছু টের পায়। ইন্সটিংক্ট।

না। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

সুধাকর দত্ত যেন বেড়াতে এসেছে, এরকমই হাবভাব। নিশ্চিন্ত মনে বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বলল, বাগানখানা বেশ সুন্দর, না?

সত্যিই সুন্দর। কারখানার ভিতরে এই বাগান এবং দুর্লভ নানারকম গাছগাছালি লাগানোর শখ রোজমারিির। প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, অনেক পরিশ্রম গেছে তার। বনবিভাগের সহযোগিতায় অবশেষে হয়েছে এই বাগান। সোনালি অবশ্য অত কথায় গেল না। শুধু বলল, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর।

সুধাকর হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা মনোজবাবু কি খুব এফিশিয়েন্ট লোক?

তার মানে?

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই কারখানার আইডিয়া, একজিকিউশন, এসবের পিছনে আছেন রোজমারি। তাই না?

দেখুন, আমি এত সব জানি না। আপনি যা খুশি ডিডাকশন করতে পারেন, আমার মতামত চাইবেন না।

আপনি একটু শর্ট টেম্পার্ড। আচ্ছা ঠিক আছে। শুধু এটুকু তো বলতে পারেন, আমি যা বললাম তা ভুল না ঠিক!

না, তাও পারি না। আমাদের কিন্তু হাতে সময় নেই। ডেলিগেটরা এসে পড়বেন।

সুধাকর দত্ত অবাক হয়ে বলল, কারা আসবে?

ফরেন ডেলিগেটরা।

তাই নাকি?

কেন, আপনি জানেন না?

জানি। কিন্তু তারা যে আসবেনই এমন গ্যারান্টি নেই।

কী যা তা বলছেন?

ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, দেয়ার আর মেনি এ স্লিপস, বিটউইন দি কাপ অ্যান্ড দি লিপস!

তা আছে। কিন্তু আমাদের সত্যিই সময় নেই।

ব্যস্ত হবেন না। ডেলিগেটদের আসার সময় হলে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিক টের পাবে।

সোনালি হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আপনি বরং একা একাই কমপ্লেক্সটা ঘুরে দেখুন, আমি অফিসে যাচ্ছি।

সেটা কি উচিত হবে? এখনও সবাই তো আমাকে চেনে না। একজন ইনট্রিউডার হিসেবে ট্রিট করতে পারে। তা ছাড়া আপনার কাছ থেকে আমার আরও কিছু জানার আছে।

বরং তা হলে সেটাই জানুন।

হ্যাঁ। আসুন, ওখানে একটা চমৎকার পাথরে বাঁধানো বসার জায়গা দেখতে পাচ্ছি। ছায়া আছে। একটু বসি?

একটা ঝুপসি সুন্দর গাছের নিবিড় ছায়ায় গাছটাকে ঘিরে সুন্দর শ্বেতপাথরের স্ল্যাব বসানো। সামনেই একটা ফোয়ারা রয়েছে। একটা ছোট্ট সরু পাথরে বাঁধানো জলপথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে। সেই জলধারার ওপর ধনুকের মতো বাঁকা পাথরের সাঁকো। ভারী সুন্দর রুচির পরিচয় দিয়েছেন রোজমারি।

বসবার পর সুধাকর তার কাঁধের ব্যাগটার মুখ খুলে ভিতরে যেন কিছু খুঁজল। তারপর হাতখানা ভিতরে রেখেই বলল, খুবই সাধারণ প্রশ্ন। জবাব দেবেন?

চেষ্টা করতে পারি।

সাক্কি ইনকরপোরেটেড নামে একটা কোম্পানির নাম শুনেছেন?

না।

ভাল করে ভেবে বলুন।

ভাববার কিছু নেই। শুনিনি।

নামটা বিদেশি। উচ্চারণে সবসময়ে ধরা যায় না। আপনারা হয়তো সাক্কিকে শচি বা সাচি বলে উল্লেখ করেন।

সোনালি একটু থমকাল। শচি ইনকরপোরেটেডের সঙ্গে এই কোম্পানির ট্রানজ্যাকশন আছে। কিন্তু লোকটাকে সেকথা কি বলা উচিত হবে? সে একটু ভেবে বলল, রেকর্ড না দেখে বলা যাবে না।

আপনি একটু ফল্টার করলেন। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে নামটা আপনার অচেনা নয়।

সোনালি মাথা নেড়ে বলল, অনেক কোম্পানির সঙ্গে এঁদের ট্রেড আছে। সব কোম্পানির নাম কি মনে রাখা সম্ভব?

ফর দি টাইম বিয়িং আপনার যুক্তি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তর্ক বা জেরা করতে আমি এতদূর আসিনি। ধরেই নিচ্ছি সাক্কির সঙ্গে আপনাদের ব্যাবসা আছে।

আপনি অনেক কিছুই ধরে নিতে পারেন। কিন্তু আমাদের আর সত্যিই সময় নেই। ওঁরা হয়তো এসেই পড়েছেন।

সুধাকর মৃদু একটু হেসে বলল, ওঁরা আসছেন না। এলে সবার আগে আমি টের পাব।

কী করে টের পাবেন?

এ যুগটা উন্নত প্রযুক্তির যুগ। আমার পকেটে এই যে কলমের মতো জিনিসটা দেখছেন এটা আসলে একটা বিপার। ওঁরা এদিকে রওনা হলেই এই বিপার আওয়াজ দেবে। কারণ আমার একজন কলিগ ওঁদের অনুসরণ করছেন।

ও, তা হলে—

চিন্তা করবেন না। উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। এখন ফের আমরা সাক্কির প্রসঙ্গে আসি।

বললাম তো, আমি কিছু বলতে পারব না। আপনি মনোজবাবুর সঙ্গেই তো কথা বলতে পারেন।

পারি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে পারলে আমার অ্যাডভান্টেজ বেশি থাকবে।

অ্যাডভান্টেজ! কীসের অ্যাডভান্টেজ?

আছে একটা কিছু।

দেখুন, আমার আর এসব কথা ভাল লাগছে না।

আমার প্রশ্নগুলো তো একটুও অস্বস্তিকর নয় মিস সোম। তবে বিরক্ত হচ্ছেন কেন?

যা আমি জানি না আপনি তাই নিয়ে কেন বারবার প্রশ্ন করছেন?

শুধু বলুন সাক্কি ইনকরপোরেটেডের ব্যাবসাটা কী?

বললাম তো জানি না। সোনালি ভীষণ রেগে যাচ্ছিল। হয়তো অভদ্রের মতো উঠে যেত। কিন্তু ঠিক এই সময়ে সুধাকরের বিপার থেকে একটা ক্ষীণ বংশীধ্বনির মতো আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে সুধাকর ব্যাগ থেকে একটা খুদে সেলুলার ফোন বা ওয়াকিটকি গোছের কিছু একটা বের করে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সুধাকর। ফোনটা যথাস্থানে রেখে একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়ে বলল, যাক, ওঁরা এখানে আসছেন না।

আসছেন না?

না।

কেন?

সুধাকর একটু হেসে বলল, অজুহাত একটা আছে। ওঁদের একজন একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এনিওয়ে, অল ফর দি গুড। এখন আমরা পুরনো কথায় ফিরে আসতে পারি কি? রিগার্ডিং ইনকরপোরেটেড?।

বললাম তো জানি না।

আপনার জানা নেই, বলছেন? আপনি গত এক বছর ধরে মনোজবাবুর একান্ত সচিব। অনেক ট্রেড সিক্রেট আপনার জানা।

আপনি যা খুশি মনে করতে পারেন। কিন্তু আমি কিছু কমিট করছি না।

আপনাকে কমিট করতে হবে না। ভিতরকার কথা হয়তো আপনি জানেন না। কিন্তু ট্রেডের ব্যাপারটা তো গোপন থাকতে পারে না আপনার কাছে। বিশেষ করে আপনি কন্ট্রাক্টগুলো হ্যান্ডেল করেন, করেসপন্ডেস করেন।

হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি, এঁদের ব্যাবসা বেশ বড়। অনেক কোম্পানি এঁদের অ্যালয় কেনেন। সব কোম্পানিকে মনে রাখা সম্ভব নয়।

ছেড়ে দিন। লেট আস ফরগেট সাক্কি ইনকরপোরেটেড। এখন বরং আপনার কথা বলুন।

সোনালি অবাক হয়ে বলল, আমার কথা! আমার কথা কেন আপনাকে বলতে যাব?

আরে না, তা নয়। আপনার পারসোনাল লাইফ সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে চাইছি না। দয়া করে বলবেন কি আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ে চাকরিটা কী করে পেলেন?

সোনালি একটু অপমান বোধ করে বলল, কেন, তাই বা কেন বলতে যাব আপনাকে?

থ্রু প্রপার চ্যানেল?

তা ছাড়া আর কী হতে পারে?

এনি রেফারেন্স?

এখানে আমার মতো আরও অনেকেই চাকরি করে। আপনি কি সকলকে এরকম প্রশ্ন করতে পারেন?

না। আর কারও সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। কারণ তারা কেউ গোপীনাথ বসুর এক্স-ওয়াইফ নয়।

সোনালি একটু শিউরে উঠল নামটা শুনে। গোপীনাথ বসু তার প্রাক্তন স্বামী।

আপনি তাকে চেনেন?

মুখোমুখি পরিচয় নেই। তবে জানি। হি ইজ এ স্মার্ট গাই।

ও। কিন্তু আমি তার এক্স-ওয়াইফ বলে কোনও অপরাধ করিনি তো?

আরে না। মাইন্ড করবেন না। গোপীনাথকে বিয়ে বা ডিভোর্স যাই করে থাকুন আমাদের কিছু যায় আসে না। তবে উই আর ইন্টারেস্টেড ইন হিম।

সোনালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, ও।

সুধাকর ফের একটু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে তার বিয়েটা কতদিন টিকে ছিল বলবেন?

প্রায় দু'বছর।

বনিবনা হল না, না?

না।

গোপীনাথের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে আপনি কতখানি জানেন?

ও একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কনসালট্যান্ট।

হ্যাঁ, সেসব আমরা জানি। উনি উচ্চশিক্ষিত এবং হাইলি সাকসেসফুল।

হ্যাঁ। আমি এটুকুই জানি।

আপনার সঙ্গে আফটার ডিভোর্স গোপীনাথের কোনও সম্পর্ক আছে কি?

সোনালি সামান্য রেগে গিয়ে বলল, না। কেন থাকবে?

আহা, আজকাল তো ডিভোর্সের পরও অনেক এক্স হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ পরস্পরের বন্ধু হিসেবে থাকে।

না। আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

গোপীনাথ বসু যে এখন বিদেশে চাকরি করে তা কি আপনি জানেন?

সেইরকমই শুনেছিলাম।

কোথায় এবং কোন কোম্পানিতে চাকরি করে তা কি জানেন?

না। জানার কথাও নয়।

ঠিক আছে। এবার চলুন, যাওয়া যাক। আমার বেশ খিদে পেয়েছে।

সোনালি আগে, লোকটা দু'পা পিছনে। তারা এসে অফিসের রিসেপশনে ঢুকল। মনোজ রিসেপশনেই দাঁড়িয়ে ফোন করছিল কাকে যেন। হাতের ইশারায় তাদের অপেক্ষা করতে বলে কথা শেষ করে ফোন রেখে বলল, হ্যাঁ, মিস্টার দত্ত, একটা কমপ্লিকেশন দেখা দিয়েছে।

সুধাকর বলল, ডেলিগেটদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তো! শুনেছি, স্যাড কেস।

সুতরাং আপনার তো এখানে নিশ্চয়ই আর দরকার নেই।

ইউ ওয়ান্ট মি আউট অফ ইয়োর হেয়ার, তাই না? বলে সুধাকর বেশ উঁচু গলায় হাসল।

মনোজ একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বলল, মানে তা ঠিক নয়। আপনাকে এখন বোধহয় ওঁদের হোটেলেই যেতে হবে। তাই বলছিলাম–

ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। বাই দি বাই, আপনার কমপ্লেক্সটা কিন্তু খুব সুন্দর।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি কমপ্লিমেন্টস।

সোনালিদেবীও খুব কো-অপারেট করেছেন।

শুনে খুশি হলাম।

সুধাকর সোনালির দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, বাই। সুধাকর বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর মনোজ সোনালিকে জজ্ঞেস করল, কী চাইছিল লোকটা বলুন তো!

ঠিক জানি না।

বেফাঁস কিছু জিজ্ঞেস করেনি তো?

না।

তা হলে তো ঠিকই আছে। আমি একটু টেনশনে ছিলাম। সোনালি দোতলায় উঠে তার ঘরে ঢুকে চুপ করে কম্পিউটার মনিটরের সামনে বসে রইল। মনোজের টেনশন কমলেও তার কমেনি। তার টেনশন শুরু হল।

প্রথম কথা, ‘সাক্কি ইনকরপোরেটেড’ তাদের মস্ত বড় ক্লায়েন্ট। দ্বিতীয় কথা, তার ভূতপূর্ব স্বামী গোপীনাথ বসু সাক্কির সঙ্গে খুব গম্ভীরভাবে যুক্ত। লোকটা হয়তো সব জানে। কিন্তু সোনালি বুঝতে পারছে না সাক্কি বা উচ্চারণভেদে শচি ইনকরপোরেটেডকে নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কী আছে। সাক্কি নানারকম অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ তৈরি করে বলে সে জানে। পৃথিবীর অনেক দেশে তাদের কারখানা আছে।

সোনালি চিন্তা করতে লাগল। গম্ভীরভাবে।

০৪.

প্যারিসের দক্ষিণ শহরতলির একটি অনভিজাত পাড়ায় দোতলার একটি ছোট ফ্ল্যাটে মধ্যরাত্রে টেলিফোন বেজে যাচ্ছিল। একজন ক্লান্ত মানুষ গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ উঠে বসে টেলিফোন তুলে নিয়ে চোস্ত ফরাসিতে বলল, আমি বোস বলছি।

সুপ্রভাত মঁসিয়ে বোস।

আপনি কে?

আমার নাম পল বা জন বা লিওনার্দো যা খুশি হতে পারে। আপনি আমাকে পল বলেই ডাকবেন। অবশ্য ডাকবার দরকারও হয়তো আর হবে না।

এসব কীরকম হেঁয়ালি?

মঁসিয়ে বোস, কাল বিকেলে শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে পুবদিকে একটি বিমান ছেড়ে যাবে। তাতে আপনার একটি সিট বুক করা আছে। তাই না?

হ্যাঁ। তাতে কী?

মঁসিয়ে বোস, আপনি কি টোকিওতে মরতে চান? নাকি ব্যাঙ্ককে? সিঙ্গাপুর, না মেলবোর্নে? আপনি যে-কোনও জায়গা বেছে নিতে পারেন। কোথায় মরতে আপনি পছন্দ করবেন প্রিয় মঁসিয়ে বোস?

ঘুম-ভাঙা লোকটির বুক কাঁপছিল, ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এই রসিকতা তার ভাল লাগছিল না। অবশ্য রসিকতা নাও হতে পারে। উগ্রবাদের এই যুগে কিছুই

অবিশ্বাস্য নয়। সে গলাটা স্বাভাবিক রেখে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমি শুধু সরল একটা প্রশ্ন করছি। আপনি কোথায় মারা যেতে পছন্দ করবেন?

মারা যেতে আমি পছন্দ করি না।

কিন্তু প্রিয় মঁসিয়ে বোস, আমরা যে আপনার ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছি। মরতে যে আপনাকে হবেই।

তা হলে আমি কোথায় মরতে চাই জিজ্ঞেস করছেন কেন? মরতে যদি হয়ই তা হলে প্যারিসই বা দোষ করল কী? প্যারিসে তো হাজার গন্ডা উগ্রবাদী ঢুকে বসে আছে।

পল একটু হেসে বলল, আপনি রসিক ব্যক্তি। কোনও রসিক ব্যক্তিকে মারা আমি পছন্দ করি না। পৃথিবীতে রসিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যাই হোক, আমরা আপনাকে জানাতে চাইছি, আমাদের সংগঠন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

আমাদের হাত থেকে আপনার পালানোর কোনও পথ নেই। পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই আপনাকে হত্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু আমি পালাতে চাইছি, একথা আপনাকে কে বলল?

হয়তো আমাদের শর্ত শুনলে চাইবেন।

নাও চাইতে পারি। আমি মরতে পছন্দ করি না বটে, কিন্তু আমার মৃত্যুভয় নেই।

মঁসিয়ে বোস, আপনি কি নিজেকে খুব সাহসী লোক বলে মনে করেন?

না। বরং আমি বেশ ভিতুই।

তা হলে মরতে ভয় পান না বলছেন কেন?

বলছি, কারণ সত্যিই আমার মৃত্যুভয় নেই।

শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণাকেও কি ভয় পান না?

বোস নামক লোকটি একটু হাসির শব্দ করে বলল, যথেষ্ট নাটক হয়েছে। আপনি আসল কথাটা বলার আগে জমি তৈরি করতে চাইছেন। ওসব আমি জানি। কাজের কথায় আসুন।

এই কারণেই বুদ্ধিমানদের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে।

সে তো বটেই। কিন্তু এখন রাত দুটো বাজে এবং আমি সত্যিই ক্লান্ত। দয়া করে কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেললে আমি আরও ঘণ্টা পাঁচেক ঘুমিয়ে নিতে পারি। ঘুমটা আমার সত্যিই দরকার।

মঁসিয়ে বোস, আমরা আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস চাই।

কী জিনিস?

এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রি-র একটা বিস্তারিত কম্পিউটার প্রিন্ট আউট।

বোস হঠাৎ একটু শক্ত হয়ে গেল। তারপর সহজ এবং তরল গলায় বলল, সেটা আবার কী?

মঁসিয়ে বোস, আপনি নিজেই বলছিলেন আপনি ক্লান্ত এবং আপনার ঘুম দরকার। তা হলে কথা বাড়াচ্ছেন কেন? এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রি কাকে বলে তা আপনি না জানলে আর কে জানবে? ওটি তো আপনারই মস্তিষ্কপ্রসূত।

বোস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না মঁসিয়ে পল, আমার একার মাথায় কাজটা হয়নি। বিজ্ঞানের এটা সে যুগ নয় যে, একজন বৈজ্ঞানিক হঠাৎ করে একটা কিছু যুগান্তকারী জিনিস আবিষ্কার করে ফেলবে। এখন হচ্ছে দলগত কাজ, দীর্ঘ গবেষণা, অন্তহীন চেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের যুগ। অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ, নিখুঁত এবং পর্যায়ক্রমে এগোনো। এখন একটা আবিষ্কার যে কত জটিল ও কঠিন পদ্ধতিতে হয় এবং তার পিছনে জলের মতো যে কত টাকা খরচ হয় তা কি আপনি জানেন মঁসিয়ে পল?

জানি মঁসিয়ে বোস। আমি নিজেও একজন ছোট মাপের বিজ্ঞানকর্মী। আপনার মতো বড় ডিগ্রি এবং ধুরন্ধর প্রতিভা আমার নেই বটে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানকর্মের কিছু খোঁজখবর আমি রাখি।

ধন্যবাদ মঁসিয়ে পল। কিন্তু এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রি সম্পর্কে আপনার তথ্য ঠিক নয়। আমরা একটা জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করছি মাত্র। সেই গবেষণা এখনও শেষ হয়নি। হলেও তা যে সাফল্যমণ্ডিত হবেই এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময়েই এইসব গবেষণায় প্রচুর ব্যয় হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। কিন্তু এ সম্পর্কে আপনার এত উৎসাহ কেন?

মঁসিয়ে বোস, আপনি একজন প্রতিভাবান মিথ্যেবাদী। এত সুন্দর সাজিয়েগুছিয়ে মিথ্যে কথাগুলো বললেন যে আমার সেগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেও উপায় নেই মঁসিয়ে বোস। আপনার মতো মানুষকে বিশ্বাস করা মানে প্রচণ্ড বোকামি।

বিশ্বাস করা বা না-করা আপনার অভিরুচি। কিন্তু আমার তো কিছুই করার নেই।

মঁসিয়ে বোস, আপনি চতুর এবং সাহসী। কিন্তু সাহসও মাঝে মাঝে বোকামির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আপনি তো জানেন এ যুগটা ব্যক্তিগত সাহস, শিভালরি বা

তথাকথিত সততার যুগ নয়। কুট বুদ্ধি এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়াই এ যুগের ধর্ম। তা ছাড়া আমি একটি বিশাল সংগঠনের সামান্য একজন অপারেটর মাত্র। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা মানে সেই সংগঠনটিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা। আশা করি বুঝবেন, আমি রাত দুটোয় আপনার সঙ্গে রসিকতা করছি না।

আপনারা আসলে কারা তা কি জানতে পারি মঁসিয়ে পল?

পারেন মঁসিয়ে বোস। আমরা হচ্ছি ভিকিজ মব।

বোস একটু শিহরিত হল। আজকের লে মদ কাগজেও দুটি নৃশংস ও নিপুণ হত্যাকাণ্ডের খবর ছিল। ফরাসি পুলিশ অনুমান করছে, এটি কুখ্যাত ভিকিজ মব-এর কাজ। গলাটা তবু স্বাভাবিক রেখে এবং একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বোস বলল, ভিকিজ মব? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম একটা নাম যেন আজকের খবরের কাগজেও দেখেছি।

আপনি একজন চমৎকার অভিনেতাও মঁসিয়ে বোস। আমি টুপি খুলে ফেলেছি। আর আপনার রক্তও বেশ ঠান্ডা।

আপনি বৃথাই আমার প্রশংসা করছেন। আমি নিজের কাজ নিয়ে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকি। বাইরের জগতের তেমন খোঁজখবর রাখি না। ভিকিজ মব কি খুবই বিখ্যাত সংগঠন?

বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত। মঁসিয়ে বোস, আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল এবং আপনি মোটেই খুব আপনভোলা লোক নন। আপনার যাবতীয় খোঁজখবর এবং তথ্যাদি আমাদের ডাটা ব্যাঙ্কে মজুত রয়েছে। আপনি সাক্কি ইনকরপোরেটেডের গবেষণা শাখার প্রধান ব্যক্তি। সাক্কি আপনাকে বছরে কয়েক লক্ষ ডলার বেতন দেয়। দু’বছর আগে আপনি একমি করপোরেশনের গবেষণাগারে ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়ুলে সেই চাকরি করার সময় আপনি একমি করপোরেশনের প্রায় একশো মিলিয়ন ডলারের একটি গবেষণাকর্ম ভেস্তে দিয়েছিলেন। আপনি ইয়ুল থেকে পশ্চিম এশিয়ায় পালিয়ে যান। আপনি প্যারিসে এসেছেন একটি মাইক্রো কম্পিউটার কোম্পানির কাজকর্ম দেখে একটি চুক্তি করতে। আপনার কোম্পানি যে বহনযোগ্য ছোট ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে এটা তার শেষ ধাপ। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি আফ্রিকার কোনও একটি দেশ থেকে চূড়ান্ত সতর্কতার ঘেরাটোপে

হাতেকলমে পরীক্ষা করা হবে। আপনাদের টার্গেট প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও জনমানবহীন দ্বীপ অথবা দক্ষিণ মেরুর কোনও নির্জন জায়গা।

দাঁড়ান মঁসিয়ে পল, দাঁড়ান। রাত দুটোর সময় আপনি যে আমাকে রূপকথার গল্প শোনাতে বসলেন। বহনযোগ্য দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কথাটা কি স্ববিরোধী নয়? আপনি নিজে বিজ্ঞানের লোক হয়ে এরকম অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন কী করে?

মঁসিয়ে বোস, আপনার ওপর নজরদারি করার জন্য আমাদেরও বছরে কয়েক লক্ষ ডলার খরচ হয়। কথাটা কবুল করলাম, যাতে আপনাকে আর অভিনয় করার কষ্টটা স্বীকার করতে না হয়।

আপনি সবজান্তা হলেও আমি নাচার। আমার কাছে আপনার এইসব কথা পুরো ধাঁধার মতো লাগছে। একটা বহনযোগ্য ছোট ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে কতখানি জ্বালানি ভরা যাবে মঁসিয়ে পল, যাতে তা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারবে?

সেটা আমার জানার কথা নয়। আপনার জানার কথা। আর আমরা আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই।

ভিকিজ মব কি বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করে মঁসিয়ে পল?

আজ্ঞে না। আমরা আর একজনের হয়ে কাজ করছি মাত্র।

সেই আর একজন কে?

আপনার পক্ষে সেটা জানা অস্বাস্থ্যকর হতে পারে।

আপনি আমার স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই চিন্তিত দেখছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই চিন্তিত। কারণ আপনার সহকারী এক গবেষক ইতিমধ্যেই খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন কলকাতার এক বড় ক্লিনিকে শয্যাশায়ী। নাও বাঁচতে পারেন।

সচকিত হয়ে বোস এই প্রথম উত্তেজিত গলায় বলল, কে? কার কথা বলছেন?

আপনার প্রিয় আদ্রেঁ।

আদ্রেঁ! তার কী হয়েছে?

উনি সকালে কফির সঙ্গে সামান্য একটু বিলম্বিত ক্রিয়ায় বিষ পান করেছেন।

সর্বনাশ!

সেইজন্যই আপনার স্বাস্থ্য বিষয়েও আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মঁসিয়ে বোস।

বোস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলাল। তারপর শান্ত গলায় বলল, আদ্রেঁকে কি আপনারা খুন করলেন?

ওভাবে বললে আমরা একটু বিব্রত বোধ করি। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, কাজটায় আমাদের একজন এজেন্টের হাত ছিল।

আদ্রেঁর অপরাধ কী?

উনি একজনকে চিনতে পেরেছিলেন। এর বেশি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

আদ্রেঁ কি বেঁচে আছে?

মস্তিষ্কের মৃত্যু বলে ডাক্তারি শাস্ত্রের একটা কথা আছে না?

আছে।

প্রিয় মঁসিয়ে বোস, আদ্রেঁ বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই।

আপনারা খুবই ভয়ংকর লোক।

পল একটু হাসল। বলল, আমাদের মৃত্যু-শিল্পীও বলতে পারেন। আমরা মোটা দাগের উগ্রবাদীদের মতো দুমদাম বোমা-বন্দুক ব্যবহার করি না, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। অপ্রয়োজনে নিরীহ মানুষকেও মারি না। আমরা শিল্পসম্মত এবং অনাটকীয়ভাবে কাজ করতে ভালবাসি।

কিন্তু আপনারা কি জানেন যে আদ্রেঁ মারা গেলে আমাদের গবেষণা আটকে যাবে এবং এই শেষ পর্যায়ের কাজ আরও বহুদিন পিছিয়ে যাবে?

না মঁসিয়ে বোস, আমার তা জানার কথা নয়। তবে আরে না মরে কোনও উপায় ছিল। অপারগ না হলে আমরা কাউকে মারি না।

আপনারা পিশাচ।

যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না মঁসিয়ে রোস। ওটা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

দুঃখিত মঁসিয়ে পল, আপনার প্রস্তাব আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম। ভিকিজ মব যা খুশি করতে পারে, আমি পরোয়া করি না। শুভ রাত্রি।

বলেই বোস ফোনটা রেখে দিল। এবং পরমুহূর্তেই তুলে কলকাতার একটা নম্বর ডায়াল করল। অনেকক্ষণ রিং বেজে যাওয়ার পর একটা ঘুমকাতর পুরুষের গলা বলে উঠল, হ্যালো।

সুব্রত, আমি গোপীদা বলছি, প্যারিস থেকে।

আরে বলুন গোপীদা, কী খবর?

খবর তুমিই দেবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের ব্যাপারে যে দলটা গিয়েছিল তাতে একজন ছিল আদ্রেঁ। তার খবর কী?

স্যাড কেস গোপীদা, উনি খুব অসুস্থ।

বেঁচে আছে?

কাল রাত বারোটা অবধি উডল্যান্ডসে ছিলাম। তখন অবস্থা ভাল ছিল না। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। একটা ফোন করে দেখব?

দেখো। কিংবা আমাকে নম্বরটা দাও। আমি ফোন করছি।

নম্বরটা টুকে নিয়ে ফের ডায়াল করল গোপীনাথ বসু। যা খবর পেল তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। আদ্রেঁর বাঁচার কোনও আশাই নেই।

ফোন রেখে গোপীনাথ ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে রইল। কাকে চিনতে পেরেছিল আদ্রেঁ?

বাকি রাতটা আর ঘুম হবে না তার। মাথাটা গরম, আর বুকটা অন্ধকার। আদ্রেঁ তরুণ যুবা নয়, পঞ্চান্ন বছরের মধ্যবয়সি মানুষ। বুদ্ধিমান, সংযতবাক, খুবই কর্মঠ মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করেছে। অভিজ্ঞতাও অনেক। সাক্কি ইনকরপোরেটেডে তাকে নিয়ে এসেছিল গোপীনাথ নিজেই। আদ্রেঁর মৃত্যুর জন্য কি সে-ই দায়ী থাকবে?

গোপীনাথ ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতেই টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে একটা দৈনিক কাগজের অফিসে ফোন করল।

আপনারা কি আমাকে ভিকিজ মব সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন?

আপনি একটু লাইনটা ধরুন। একজন মহিলার কণ্ঠ বলল।

কিছুক্ষণ পর ফোনে মহিলা বললেন, ভিকি একজন দক্ষিণ আমেরিকার লোক। বেস ছিল ব্রাজিলে। দশ বছর আগে তার একবার জেল হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সে পালায়, ভিকি পেশাদার অপরাধী। সারা পৃথিবীতে তার অপারেটররা কাজ করে। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির হয়ে সে অনেক কিছু করেছে। এক সময়ে তার প্রধান কাজ ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে যেসব মগজওলা লোক পালিয়ে যায়, যেমন বৈজ্ঞানিক, গবেষক, লেখক, গায়ক বা শিল্পী, তাদের ধরে আনা বা খতম করা। এ কাজে সে মোটা টাকা নিত।

এখন সে কোথায় থাকে?

সে এক জায়গায় থাকে না।

ধন্যবাদ। প্যারিসে তার এজেন্ট কে আছে জানেন?

দাতা।

দাতা? পুরো নাম কী?

এস দাতা।

তার সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে হতে পারে।

তা জানি না। আন্ডারওয়ার্ল্ড জানে। প্যারিসের গুন্ডা বদমাশরা জানবে।

এরকম কারও খোঁজ দিতে পারেন। আমার প্রয়োজনটা জরুরি।

লাইনটা ধরুন, দেখছি।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি বলল, দুঃখিত। আমাদের যে রিপোর্টার এসব জানে সে এখন নেই।

ধন্যবাদ।

টেলিফোনটা রেখে দিল গোপীনাথ। কিন্তু রাখতেই টেলিফোনটা তারস্বরে বেজে উঠল।

গোপীনাথ ফোনটা তুলে নিল।

•

খুব ভোরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে বলে রোজমারি এ সময়টায় নিজেই গাড়ি চালায়। গাড়ি চালিয়ে সে আসে ময়দানে। ভোরের ময়দানের মতো সুন্দর জায়গা কলকাতায় নেই। রোজমারির পরনে থাকে শর্টস, গায়ে কখনও কামিজ, কখনও টি-শার্ট, পায়ে দৌড়োনোর জুতো। সকালে খানিকটা দৌড় এবং খানিকটা জগিং করার পর সে কয়েকটা বেন্ডিং করে। তারপর বাড়ি ফেরে। এই সময়টায় সে কোনও সঙ্গী পায় না। তার স্বামীর শরীরবোধ কম, ব্যায়ামট্যায়ামের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। সকালে ঘুম থেকে তাকে তোলাই মুশকিল। রোজমারিকে তাই একাই আসতে হয়।

আজও রোজমারি একা। ভোর সাড়ে চারটের আবছা আলোয় প্রেতপুরীর মতো ফাঁকা কলকাতার পথ। রোজমারির একটু অস্বস্তি হচ্ছে। গতকাল অনেকগুলো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেছে। তাকে কেউ ভুল করে বা ইচ্ছে করে লাল গোলাপ পাঠিয়েছে। না, ভুল করে নয় মোটেই। ইচ্ছে করেই। কারণ, ফ্লোরিস্টকে ফোন করে লাঞ্চ টেবিলের জন্য রজনীগন্ধার বদলে লাল গোলাপ পাঠাতে বলাটা তো আর ভুল করে করা নয়। তার ওপর ডেলিগেটদের একজনের অসুস্থ হওয়া এবং ইন্টারপোলের এক এজেন্টের আগমন, সবটাই একটা জিগস পাজলের মতো।

ময়দানে রোজমারি একা নয়। এখানে তার এক বান্ধবী জুটেছে। ডোরিন। ডোরিন জার্মান মেয়ে, বিয়ে করেছে মার্কিন কনসুলেটের এক অফিসারকে। সেই সুবাদে ডোরিন কলকাতায় থাকে এবং রোজ সকালে জগিং করতে ময়দানে আসে। ভিক্টোরিয়ার মূল ফটকের উলটো দিকে তাদের গাড়ি পার্ক করা হয়। দু'জনে একসঙ্গে হয়ে দৌড়োয়।

গাড়িটা পার্ক করল রোজমারি। ডোরিনের গাড়ি এখনও আসেনি। রোজমারি চুপ করে গাড়িতে বসে রইল। চারদিকে কুয়াশার আস্তরণ। একটু আবছা পথঘাট। লোকজন বেড়াতে বেরিয়েছে। কয়েকজন দৌড়োচ্ছেও। এত ভোরেও জায়গাটা নির্জন নয়। কলকাতার মতো ভিড়াক্রান্ত শহর রোজমারি দেখেনি। এত ভিড় তার ভাল লাগে না। কিন্তু আজ এই ভোরে চারদিকে লোকজন দেখে, কেন কে জানে, রোজমারির বেশ ভাল লাগছিল।

রোজমারি ঘড়ি দেখল। ডোরিন আজ একটু বেশি দেরি করছে কি? এ সময়ে তো রোজই এসে যায়।

গাড়ির সব কাঁচ তোলা থাকে রোজমারির। ভিতরে এয়ার কন্ডিশনার চলে। কলকাতার দূষিত বায়ুকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে সে। হঠাৎ ডানধারের কাঁচে টুক টুক করে দুটো টোকা পড়তেই রোজমারি একটু চমকে উঠল। চেয়ে দেখল, একজন বেশ লম্বাচওড়া লোক দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি এবং পরনে শর্টস।

রোজমারি কাচটা নামিয়ে প্রশ্নভরা চোখে তাকাতেই লোকটা পরিষ্কার জার্মান ভাষায় বলল, সুপ্রভাত।

সুপ্রভাত। কী চাই?

লোকটা জার্মান নয়, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। লম্বাচওড়া হলেও লোকটাকে তার বাঙালি বলেই মনেই হল। তবে জার্মানটা মাতৃভাষার মতোই বলতে পারে।

লোকটা বলল, আপনার কি আর একটু সতর্ক হওয়া উচিত নয়?

রোজমারি অবাক হয়ে বলল, আপনি কে?

আমার নাম সুধাকর দত্ত।

ও, আপনি সেই ইন্টারপোলের এজেন্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখানে কী করছেন?

আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

আমার জন্য? কেন বলুন তো!

আপনার নিরাপত্তার জন্য।

আমার নিরাপত্তার অভাব ঘটেছে নাকি?

লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তা জানি না। তবে সাবধান হওয়া ভাল।

আপনি আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাংলাতেও কথা বলতে পারেন।

আপনি যে বাংলা ভালই জানেন সে খবর আমি রাখি। তবু জার্মান ভাষায় কথা বলাটাই এখন নিরাপদ। হয়তো বাতাসেরও কান আছে। আপনার সঙ্গে আমার দু'-একটা কথা ছিল।

কথা তো অফিসেও বলতে পারতেন।

সুধাকর মৃদু হেসে বলল, কেন ময়দান জায়গাটাই বা মন্দ কী? এত সুন্দর সকাল, এমন খোলা মাঠ।

রোজমারি ঠোঁট উলটে বলল, কী এমন কথা?

কথাটা আপনার অতীত নিয়ে।

আমার অতীত? সে আবার কী?

জোসেফ ক্লাইন নামটা কি আপনার চেনা ঠেকছে?

জো ক্লাইন আমার প্রাক্তন স্বামী। কেন?

মুশকিল কী জানেন? আমার এই মিশনটাই যেন প্রাক্তন স্বামীদের নিয়ে। কালকেও আর একজনের প্রাক্তন স্বামীকে নিয়ে নাড়াঘাটা করতে হল। জো ক্লাইন সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ফ্রাউ ঘোষ?

অনেক কিছুই জানি। আমরা এখনও বেশ বন্ধু।

জো ক্লাইনের সঙ্গে আপনার শেষ যোগাযোগ কবে হয়েছে?

যোগাযোগ? না, গত এক বছরের মধ্যে নয়।

তার মানে আপনি তার গতিবিধির খবর রাখেন না?

না।

গত জুলাই মাসে প্যারিসে একজন পুলিশের গোয়েন্দা খুন হন।

রোজমারি চেয়ে ছিল। বলল, এ খবরটায় আমার কী হবে?

দত্ত মাথা নেড়ে বলল, কিছু না, কিছু না। খবরটা আপনি উপেক্ষা করতে পারেন।

তবে বললেন কেন?

এই গোয়েন্দাটি একটি বিশেষ তদন্তে কাজ করছিল।

তাতে আমার কী?

সাক্কি ইনকরপোরেটেডের ব্যাপারে।

ও। কিন্তু তাতেই বা আমার কী যায়-আসে। সাক্কির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা নিতান্তই ব্যবসায়িক।

কিন্তু এই গোয়েন্দা খুনের ব্যাপারে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের নামের একটা তালিকা আমি দেখেছি।

বেশ তো।

তালিকাটায় অন্তত পাঁচজনের নাম আছে। একদিন সন্ধেবেলা প্যারিসের এক কুখ্যাত গলির মধ্যে খুনটা হয়। অত্যন্ত পেশাদার কাজ। খুনিরা কোনও চিহ্ন ফেলে যায়নি।

এসব কথা কেন আমাকে বলছেন হের দত্ত?

সুধাকর যেন খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলল, তাই তো! কেন যে বলছি।

রোজমারি ঘড়ি দেখে আপনমনে বলল, ডোরিন যে কেন আসছে না।

সুধাকর দত্ত অত্যন্ত নিরীহভাবে বলল, আসতে একটু দেরি হবে। ফ্ল্যাট টায়ার পালটাতে একটু সময় তো লাগবেই।

ফ্ল্যাট টায়ার? সেটা আপনি জানলেন কী করে?

আমাকে অনেক কিছুই জানতে হয়।

রোজমারি একটু বিরক্ত ও বিস্মিত হয়ে সুধাকরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তাই নাকি হের দত্ত? কিন্তু আমি জানতে চাই দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আপনি কেন আমাদের পিছনে লেগেছেন? আমি এবং আমার স্বামী একটা ছোট কারখানা চালাই, কোনও বিপজ্জনক কাজ করি না, আমরা এ দেশে কিছু বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগও করিয়েছি এবং আমরা বিদেশি মুদ্রা আয়ও করি। তবু কেন আপনি বা আপনারা আমাদের বিরক্ত করছেন?

সুধাকর সামান্য অপ্রতিভ মুখ করে বলল, আপনাদের বিরক্ত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিল না। অবস্থা এবং পরিস্থিতি আমাদের কিছু অসুবিধের মধ্যে ফেলেছে বলেই

ডোরিনের গাড়ির চাকা কীভাবে পাংচার হল হের দত্ত? আর আপনিই বা তা কী করে জানলেন দয়া করে বলবেন কি?

সুধাকর খুবই লজ্জিত মুখ করে বলল, সামান্য একটু হাতের কাজ। ওটাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন না ফ্রাউ ঘোষ। তার চেয়ে চলুন, আজ আপনার সঙ্গে আমিও খানিকক্ষণ জগিং করি। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

এটা অনুরোধ না আদেশ? নাকি প্রচ্ছন্ন হুমকি?

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন! আপনার সঙ্গে জগিং করতে পারাটা আমি সৌভাগ্য বলেই বিবেচনা করব।

ক্ষতি কী? বলে রোজমারি নামল। গাড়ি লক করে বলল, চলুন হের দত্ত। আমি প্রস্তুত।

দু’জনে পাশাপাশি ধীরগতিতে দৌড়োতে লাগল। ঘাসে শিশির পড়েছে। শিশিরের জল ছিটকে উঠে তাদের মোজা ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

রোজমারি বলল, আপনি কি জানেন গতকাল আমাকে কে এক গোছা রক্তগোলাপ পাঠিয়েছিল?

রক্তগোলাপ?

হ্যাঁ, হ্যাপি বার্থ ডে জানিয়ে। কিন্তু গতকাল আমার জন্মদিন ছিল না।

কেউ ভুল করে পাঠিয়েছিল বলছেন?

মোটেই না। কার্ডের অন্য পিঠে লেখা ছিল আর আই পি। তার একটা ব্যাখ্যা ফ্লোরিস্ট দিয়েছে। জনৈক রজার আইভ্যান পোলক নাকি ফুল পাঠিয়েছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। আর আই পি মানে রেস্ট ইন পিস। আমাকে কেউ হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

সুধাকরের ছোটার গতি কমল না। সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।

আমি জানতে চাই কে কী কারণে আমাকে খুন করতে চায়? আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি হের দত্ত।

না, জ্ঞানত করেননি। তবু কারও কায়েমি স্বার্থে হয়তো না জেনে আঘাত করেছেন। আমি অনেক ভেবেও সেরকম কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। আপনিই বলুন, আমি কার কায়েমি স্বার্থে আঘাত করতে পারি?

সুধাকর মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না।

আপনার রহস্যময় আগমনটাও আমার ভালো লাগছেনা হেরদত্ত। আপনার ক্রেডেনশিয়ালস হয়তো সবই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু আমি জানি পাসপোর্ট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড সবই নকল করা যায়। আপনি আসল না নকল তা কে বলবে?

ফ্রাউ ঘোষ, আপনার সন্দেহ অমূলক নয়।

তা হলে কি আমার অনুমান নির্ভুল?

তাও বলছি না। তবে আপনি যে পরিস্থিতিতে আছেন তাতে এরকম সন্দেহ হতেই পারে।

আদ্রেঁর অসুস্থ হয়ে পড়াটাও মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয় হের দত্ত।

মানছি। উনি অসুস্থ হননি।

তা হলে?

ওঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।

সে কী?

বলে থমকে দাঁড়ায় রোজমারি।

দাঁড়াবেন না ফ্রাউ। দয়া করে দৌড়োতে থাকুন। এবং দয়া করে পিছনে তাকাবেন না।

কেন হের দত্ত?

সুধাকর একটু চাপা জরুরি গলায় বলল, প্রশ্ন করবেন না ফ্রাউ। শুধু স্বাভাবিক গতিতে দৌড়াতে থাকুন। ভয় পাবেন না।

কিন্তু রোজমারি ভয় পাচ্ছিল। বেশি দৌড়োয়নি সে, তবু হাঁফ ধরে যাচ্ছিল তার। বুকটাও দুরুদুরু করছে। সে হাঁফসানো গলায় বলল, কেউ কি আমাদের পিছু নিয়েছে?

হা ফ্রাউ। পিছু ফিরে না তাকালে আপাতত ভয় নেই।

রোজমারির পা ইতিমধ্যেই ভারী হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে সে এবার পড়ে যাবে। শুধু মনের জোরে দৌড়োতে দৌড়োতে সে বলল, ওরা কারা?

আমি সবজান্তা নই ফ্রাউ। তবে আমরা এক বিপজ্জনক পৃথিবীতে বাস করি।

আচমকাই পিছনে একটা শব্দ হল। চাপা শিস দেওয়ার মতো শব্দ। মানুষের শিস নয়, ধাতব শিস। যেন কোনও উচ্চশক্তিসম্পন্ন রাইফেল বা পিস্তলের সাইলেন্সর লাগানো শব্দ। তারপরই একটা আর্তনাদ।

পিছনে তাকাবেন না। দৌড়োন।

কেউ কি কাউকে গুলি করল?

পৃথিবীতে কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে, সবটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী আমাদের? আমাদের সামনে এখন একটাই কাজ। দৌড়োনো এবং স্বাস্থ্যরক্ষা।

হের দত্ত, আপনি এত নির্বিকার কেন? ঘটনাটায় কি আপনার কোনও হাত নেই?

আমি নিমিত্ত মাত্র।

আমি গীতা পড়েছি। কথাটা গীতা থেকে বললেন?

আপনি যে মহাভারত পড়ছেন তাও আমি জানি।

কী সর্বনাশ। আপনি আমার সম্পর্কে আর কী জানেন?

একটা মানুষ সম্পর্কে জানার কি শেষ আছে?

সেটা ঠিক কথা। কিন্তু আমি এমনই একজন সাধারণ মানুষ যার সম্পর্কে জানাটাও বাহুল্য মাত্র। আমার সম্পর্কে জেনে কী হবে হের দত্ত?

আপনি একজন ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলে বলছেন?

ঠিক তাই। আমি একটা প্রোজেক্ট দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি মাত্র।

কিন্তু আপনি যতটা নিরীহ নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করেন বলে মনে হয়, আসল ঘটনা হয়তো তা নয়।

আপনি যে কী বলছেন হের দত্ত, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ফ্রাই, আপনাকে তা হলে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করি। দয়া করে বলবেন কি যে আপনি জেনেশুনে জো ক্লাইনের মতো একজন খুনিকে কেন বিয়ে করেছিলেন?

রোজমারি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, জো ক্লাইন কি খুনি?

আপনি তা ভালই জানেন। ভিয়েনার এক হোটেলে আপনার সামনেই সে গডার্ড নামে একজন ইংলিশ এজেন্টকে খুন করেছিল। আপনি তখন তার সঙ্গে ছিলেন।

ঘটনাটা ওভাবে ঘটেনি।

কীভাবে ঘটেছিল?

আমরা একটা কনসার্টের পর ঘরে ঢুকে দেখি, একটা লোক আমাদের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। জো তাকে চ্যালেঞ্জ করতেই লোকটা একটা পিস্তল বের করেছিল। তখন জো তাকে গুলি করে।

সুধাকর একটু হাসল, বেশ বললেন। লোকটা পিস্তল বের করার পর জো ক্লাইনও তার পিস্তল বের করল এবং গুলি করল এবং লোকটা ততক্ষণ পিস্তল নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল? এরকমও হয় নাকি?

আমি ঘটনাটা দেখিনি। লোকটার হাতে পিস্তল দেখে ভয়ে চিৎকার করে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। চোখ খুলে দেখলাম, লোকটা পড়ে আছে।

ঠিক আছে ফ্রাউ। মেনে নিচ্ছি। আপনি কি জানতেন না জো কার বা কাদের হয়ে কাজ করে?

না। সে চাকরি করত জানি! আর কিছু জানি না। তার ওই ঘটনার পরই জো-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। একজন অনধিকার প্রবেশকারীকে মেরেছিল বলে জো বিচারে ছাড়া পেয়ে যায় বটে, কিন্তু আমি ওকে অপছন্দ করতে শুরু করি। আমি ভায়োলেন্স পছন্দ করি না।

প্যারিসে একজন পুলিশ অফিসারকে মারার ব্যাপারে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের তালিকায় জো-র নাম আছে।

তা হতে পারে।

ফ্রাউ, জো-কে আপনি ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু সে হয়তো আপনার জীবনে আবার ফিরে আসবে। তবে অন্য ভূমিকায়।

রোজমারি অবাক হয়ে বলল, কেন?

ধৈর্য ধরুন। জানতে পারবেন।

এবার কি পিছন ফিরে তাকাতে পারি?

না। পিছনে একজন আহত বা নিহত মানুষ পড়ে আছে। পুলিশ আসবে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের খোঁজ করবে। আমি বা আপনি কেউই প্রত্যক্ষদর্শী হতে চাই না, তাই না?

কে কাকে মারল?

সেটা জেনেও আপনার লাভ নেই।

কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি জানেন। তাই না?

হ্যাঁ। জানাটা যে কত বড় অভিশাপ তা যদি জানতেন।

আপনি কে বলুন তো! সত্যিই কে?

প্যারিসে আমাকে অনেকে দাতা বলে ডাকে। এস দাতা। সেখানে আমার বেশ খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে।

দাতা?

হ্যাঁ। দত্তকে ওরা দাতা করে নিয়েছে।

আদ্রেঁকে কে বিষ দিয়েছে হের দত্ত?

কী করে বলব বলুন তো!

হের দাতা, আমি আপনাকে পছন্দ করতে পারছি না।

০৬-১০. আদ্রেঁ মারা গেল বেলা বারোটায়

আদ্রেঁ মারা গেল বেলা বারোটায়। লাউঞ্জে তার এগারোজন সঙ্গী, মনোজ, রোজমারি, সোনালি, সুব্রত, শুভ, মৈত্রেয়ী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক সময়োচিত গাম্ভীর্য মুখে মেখে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাটা বড় আকস্মিক এবং সকলেই খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে।

ডেলিগেটদের প্রধান একজন বয়স্ক কোলকুঁজো মানুষ। পদবি লোম্যান। চোখদুটি নীল এবং চাউনি তীব্র। মনোজ তার কাছাকাছি গিয়ে মৃদু স্বরে বলল, আদ্রেঁর পরিবারকে খবরটা কীভাবে জানানো যায়?

লোম্যান মাথা নেড়ে বলল, আদ্রেঁর পরিবার কেউ নেই। একা মানুষ। কাউকে কিছু জানানোর নেই।

ও।

আমি একটা কথা জানতে চাই। আদ্রেঁর ডেডবডি আমরা নিয়ে যেতে চাইলে সেটা কত তাড়াতাড়ি সম্ভব?

দেরি হওয়ার তো কথা নয়।

যদি আজই নিয়ে যেতে চাই?

বোধহয় ব্যবস্থা করা যাবে।

লোম্যান একটা নিশ্চিন্তের খাস ছেড়ে বলল, যাক, বাঁচা গেল।

আপনারা কি মায়ানমার যাওয়ার প্রোগ্রাম বাদ দিচ্ছেন?

অবশ্যই। আদ্রেঁর মৃতদেহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আমার এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ।

মনোজ একটু অবাক হয়ে বলে, কেন বলুন তো! আদ্রেঁর তো কেউ নেই বললেন।

লোম্যান তার দিকে মিটমিটে চোখে চেয়ে বলল, কাজ আছে মিস্টার ঘোষ। জরুরি কাজ। আপনি দয়া করে আমাদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ডেডবডির জন্য ভাল কফিন চাই।

ভাববেন না। সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।

ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট কি দিয়েছে?

হ্যাঁ। সুব্রতর কাছে আছে।

মনোজ ডেথ সার্টিফিকেটটা নিয়ে লোম্যানকে দিল। লোম্যান সেটা দেখে পকেটে রেখে দিল। বলল, আপনার সঙ্গে ডিলটা এবার হল না। যা হোক, আমাদের দু'জন প্রতিনিধি আগামী মাসেই আসবে। তারা চুক্তি পাকা করে যাবে।

ধন্যবাদ।

রোজমারি মনোজের কাছাকাছি এসে চাপা গলায় বলল, ডেথ সার্টিফিকেটে কী লিখেছে দেখেছ?

হার্ট অ্যাটাক।

হ্যাঁ। কিন্তু ঘটনাটা কি তাই?

মনোজ একটু অবাক হয়ে বলে, অন্যরকম কেন হবে?

রোজমারি একটু চিন্তিত মুখে বলল, কিছু বিষ আছে যা ধরা যায় না। খুব অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হলে হয়তো ধরা পড়বে। সেই ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই।

মনোজ ভীষণ অবাক হয়ে বলে, বিষ! বিষের প্রশ্ন উঠছে কেন? এটা সহজ সরল হার্ট অ্যাটাক। আদ্রেঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি।

সেটা হলেই ভাল। কিন্তু আমার কেন যেন ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।

অদ্ভুত কেন?

আঁদ্রে সাক্কি ইনকরপোরেটেডের হয়ে কাজ করে।

তাতে কী?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। মস্ত বিশেষজ্ঞ। মনোজ, ওরা যদি আরে মৃতদেহ দেশে নিয়ে গিয়ে অটোপসি করে এবং ওর শরীরে কোনও বিষ পাওয়া যায় তা হলে কী হবে?

কী যে বলছ পাগলের মতো। এটা সেরকম কোনও ঘটনাই নয়।

তবু আমার ভয় করছে।

মনোজ রোজমারিকে বাঁ হাতে বেষ্টন করে বলল, কেন বলো তো! তোমার মতো সাহসী মেয়ের ভয় পাওয়ার মতো কী হল?

আমাদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র হচ্ছে না তো?

মনোজ অবাক থেকে আরও অবাক হয়ে বলল, ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র করার মতো কী আছে আমাদের? একটা অ্যালয় তৈরি করি, তা সেরকম অ্যালয় আরও কেউ কেউ তৈরি করে। খামোখা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে কেন?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না, বুঝতে চাইছি। হঠাৎ এই দত্ত লোকটাই বা কেন প্যারিস থেকে এসে হাজির হল? কেন আদ্রেঁ মারা গেল? কেন আমাকে পাঠানো হল রক্তগোলাপ? প্রশ্ন যে অনেক।

তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলছ। আমি এমনিতেই নার্ভাস লোক, তোমার ওপর নির্ভর করে চলি। তুমি ভয় পেলে আমার আর ভরসা কীসের?

চলো আমরা ঠান্ডা মাথায় ঘটনাগুলো নিয়ে একটু ভাবি।

ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আদ্রেঁর ডেডবডি দেশে পাঠানো এবং ডেলিগেটদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাববার কিছু নেই। ওরা ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। ওদের ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। একটা এয়ারলাইন্সে জায়গা না হলে অন্য এয়ারলাইন্সে যেতে পারবে।

তা জানি। কিন্তু ব্যবস্থাটা এখনই চালু করা দরকার।

সুব্রত অত্যন্ত দক্ষ এবং চটপটে ছেলে। ছিপছিপে বেতের মতো চেহারা। একসময়ে ভাল টেনিস খেলত। খুব স্মার্ট আর অনেক যোগাযোগ। পিআরও হিসেবে তাকে মোটা মাইনে দেওয়া হয়। তাকে ডেকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল মনোজ।

সুব্রত সব শুনল। তারপর বলল, কিছু ভাববেন না স্যার। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লোম্যান লোকটা খুঁতখুঁতে। একটু দেখো, পরে যেন কথা শুনতে না হয়।

সুব্রত হাসল, না স্যার, কথা শুনতে হবে না।

তা হলে আমরা যাচ্ছি। আমাদের কিছু জরুরি কাজ আছে।

ঠিক আছে স্যার। এদিকটা আমি সামলাচ্ছি।

***

দ্বিতীয় ফোনটাও করেছিল পল।

মঁসিয়ে, খবরের কাগজে টেলিফোন করে আমাদের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার কোনও দরকার ছিল কি?

খবরের কাগজে ফোন করেছিলাম কে বলল?

আপনার টেলিফোন যে আমরা ট্যাপ করব তা আন্দাজ করা আপনার উচিত ছিল।

আমার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে এ কাজ আপনিও করতেন মসিয়া পল।

ওদের চেয়ে বেশি ইনফর্মেশন আমিই আপনাকে দিতে পারতাম। আমাদের প্যারিস হেড কোয়ার্টার্সের চিফ মঁসিয়ে দাতা এখন প্যারিসের বাইরে। তাকে

আপনার প্রয়োজন হলে একটা ফোন নম্বর লিখে নিন। কিন্তু একটা কথা। এই নম্বরটা দয়া করে পুলিশকে দেবেন না। দিলে আপনি বোকা বনবেন। কারণ এটি একটি নিরীহ রেস্তোরাঁর টেলিফোন। পুলিশ এখানে কিছুই খুঁজে পাবে না।

বুঝেছি, নম্বরটা বলুন?

পল বলল, গোপীনাথ টুকে নিল।

এখানে ফোন করে মিশেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। ওরা বলবে, মিশেল বলে এখানে কেউ নেই। তখন আপনি বলবেন, সে কী, আজ যে মিশেলের সঙ্গে আমার নোতরদাম যাওয়ার কথা।

বুঝেছি। এটাই কোড তো?

হ্যাঁ। তবে মঁসিয়ে দাতাকে অকারণে বিরক্ত না করাই ভাল। আপাতত উনি এখানে নেই। আমি ওঁর হয়ে কাজ চালাচ্ছি।

গোপীনাথ একটা খাস ফেলে বলল, তাই বুঝি? আচ্ছা, শুভরাত্রি।

ফোন রেখে গোপীনাথ দ্রুত ভাবতে লাগল। যা করার এখনই করতে হবে। এখনই তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শত্রুপক্ষ প্রবল এবং সতর্ক।

গোপীনাথ চটপট একটা অ্যাটাচি কেস গুছিয়ে নিল। পোশাক পরল। তারপর মধ্যরাত্রিতেই বেরিয়ে পড়ল পথে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেল না।

খানিক দুরে হেঁটে গিয়ে সে একটা ট্যাক্সি ধরল। হাজির হল একটা দিনরাতের গ্যারেজে। ক্রেডিট কার্ডের জোরে সে একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড সিট্রিয়ে গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দূর প্রাচ্যের প্লেন তার প্যারিস থেকে আর ধরা হবে না।

গাড়ির টেলিফোন তুলে সে ডায়াল করল তাদের মূল ল্যাবরেটরি লাইপজিগে। সিকিউরিটির প্রধান মালিককে। মালিক একজন আফগান।

মালিক, ল্যাবরেটরির সিকিউরিটি কেমন?

সব ঠিক আছে।

না, সব ঠিক নেই। সিকিউরিটি বাড়াও। চারদিকে কড়া নজর রাখো। খুব তৎপর থেকো।

ঠিক আছে। কোনও হামলা হবে বস?

হতে পারে।

আমি গা গরম করতে ভালবাসি।

তুমি ভিকিজ মব-এর নাম শুনেছ?

কে শোনেনি? সবাই জানে।

ভিকিজ মব আমাদের পিছনে লেগেছে।

তা হলে দুঃসংবাদ বস। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

আপাতত ঈশ্বরের চেয়ে তোমার ওপরেই আমার নির্ভরতা বেশি, কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওরা এখনই রেড করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধান থাকা ভাল।

গোপীনাথ গাড়ি চালাতে চালাতে গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল। এই যে সে পালাচ্ছে, সে জানে এটা পণ্ডশ্রম। কিছুতেই সে ভিকিজ মবকে এড়াতে পারবে না। তবু অন্তত কিছুক্ষণের জন্য অনুসরণকারীদের ঝেড়ে ফেলা একান্তই দরকার। রোমে তাদের রিসার্চ সেন্টারে আদ্রেঁর কিছু ডকুমেন্ট আছে। সেটা সরিয়ে ফেলা দরকার।

দ্বিতীয় ফোনটা সে করল রোমে।

বিল্লে, কী খবর?

কী খবর চান?

অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি তো!

না। কেন?

ভাল করে মনিটরটা চেক করো। ল্যাবের সব দিক দেখো। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখলে আমাকে জানাও। আর, আদ্রেঁর ঘরটা ভাল করে দেখো, দরজা ভাঙার বা খোলার কোনও চেষ্টা হয়েছে কি না।

আদ্রেঁর দরজায় ইলেকট্রনিক লক আছে। কোড ছাড়া খুলবে না। তবু দেখছি।

আমি আবার পনেরো মিনিট পরে ফোন করব।

পনেরো মিনিট বাদে ফের ফোন করল গোপীনাথ। বিল্লে বলল, সব ঠিক আছে।

গোপীনাথ একটা উজ্জ্বল এয়ারপোর্ট টার্মিনালে ঢুকে গাড়ি থামাল। শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে সে অন্তত একটা কদমও এগোতে পেরেছে কি? মাত্র একটি বা দুটি ঘণ্টা সময় তার দরকার। তাকে ভাবনায় ফেলেছে আদ্রেঁর নিজস্ব অফিসঘরের দরজায় ইলেকট্রনিক লক। দরজাটা খোলা দরকার। আদ্রেঁর রিসার্চ পেপার এবং কম্পিউটরের তথ্য তার ভীষণ প্রয়োজন। ওটা হাতছাড়া হলে তাদের এত পরিশ্রম বৃথা যাবে।

দু'বার প্লেন বদল করে রোমে যখন নামল গোপীনাথ তখন বিকেল। সারাক্ষণই নানা অস্বস্তি ও সন্দেহে কেটেছে তার কেউ অনুসরণ করছে কি না, কেউ লক্ষ করছে কি না সারাক্ষণ কেবল এই চিন্তা।

সবচেয়ে কঠিন কাজ তার রোমেই। প্রথম কথা আদ্রেঁর ঘরের ইলেকট্রনিক লক খোলা। কাজটা অসম্ভব যদি না লকের কোড জানা থাকে। আদ্রেঁ কোডটা কোথাও নোট করে রেখেছে এরকম একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। এবং তা নোট করে রাখার সম্ভাবনা আছে তার ডেবুক এ। ডেবুক যদি আদ্রেঁ সঙ্গে করে নিয়ে না গিয়ে থাকে তা হলে তা আছে। আরে ফ্ল্যাটে আদ্রেঁ একা থাকে, সুতরাং গোপীনাথ বসুকে এখন যে কাজটা করতে হবে তা অতীব আইনবিরুদ্ধ এবং অপরাধমূলক। তাকে তালা ভেঙে ঢুকতে হবে আদ্রেঁর ফ্ল্যাটে, চোরের মতোই।

গোপীনাথ আদ্রেঁর ফ্ল্যাট চেনে, বেশ কয়েকবার এসেছে। আদ্রেঁ একা বলেই বোধহয় মাঝে মাঝে পার্টি দিত। ইতালির বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য আর্টিস্টের সঙ্গে তার ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তারাও এসেছে।

গোপীনাথ দু'বার ট্যাক্সি বদল করে যখন আদ্রেঁর ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে পৌঁছোল তখন শহরতলির অভিজাত পাড়াটি নির্জন। রাত আটটা বাজে। সময়টা

চৌর্যবৃত্তির পক্ষে প্রশস্ত নয়। কিন্তু গোপীনাথের হাতে আর সময় নেই। যা করার এখনই করতে হবে।

এইসব ফ্ল্যাটবাড়িতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া ঢোকা বেশ শক্ত। প্লেক্সি গ্লাসের শক্ত পাল্লা ইলেকট্রনিক সংকেত ছাড়া খোলে না। দরজার বাইরে একটা ইলেকট্রনিক বোর্ড আছে। তাতে বাসিন্দাদের নামের কার্ড লাগানো। পাশে বোতাম। যার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার নামের বোম টিপলে সে ওপর থেকে আর একটা বোতাম টিপে দেয়। একমাত্র তখনই দরজা খোলে। গোপীনাথ দরজাটা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে একজন লম্বাচওড়া লোককে দরজার কাছে যেতে দেখে গোপীনাথ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। লোকটা ভিজিটর। একটা বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে লাগল। গোপীনাথও একটা বোতামে আঙুল ছোঁয়াল, কিন্তু টিপল না। লোকটা যাতে বুঝতে না পারে যে সে ফাঁকতালে ঢোকার মতলব করছে।

কাঁচের দরজা খুলে যেতেই সে লোকটার পিছু পিছু ঢুকে পড়ল ভিতরে। লোকটা তাকে বিশেষ গ্রাহ্য করল না। একটু মাল খেয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছিল। গিয়ে লিফটের কাছে দাঁড়াল।

আদ্রেঁ তিনতলায় থাকে। গোপীনাথ এলিভেটর নিল না। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ওপরে। অ্যাটাচি কেসটা খুলে একটা সরু শিকের মতো জিনিস বের করল সে। তারপর দ্রুত হাতে তালাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। উত্তেজনায় তার কপালে ঘাম ফুটতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে চেষ্টা করল সে। কঠিন দরজা অনড় রইল। যতদুর মনে হচ্ছে আদ্রেঁ কোনও বার্গলার অ্যালার্ম লাগিয়ে যায়নি। তা হলে এতক্ষণে গার্ডরা ছুটে আসত।

লম্বা প্যাসেজ দিয়ে দুটো লোক হেঁটে আসছিল। নিঃশব্দে। গোপীনাথ একটু শক্ত হয়ে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের টাইয়ের নটটা একটু ঠিকঠাক করে নিতে লাগল। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি। লোকদুটো যখন তার কাছাকাছি চলে এসেছে তখন গোপীনাথ দুটো হাত মুঠো করে রইল। এরা ভিকির লোক হতে পারে কিংবা নিরীহ সজ্জন।

লোকদুটো দাঁড়াল না। তাকে পেরিয়ে গেল। গিয়ে থামল এলিভেটরের সামনে। এক মিনিট পর তারা লিফটে উঠে যেতেই আবার কাজ শুরু করে দিল

গোপীনাথ। বিস্ময়ের কথা, দ্বিতীয়বার প্রায় বিনা ভূমিকায় দরজা খুলে গেল।

ভিতরটা অন্ধকার। দরজাটা বন্ধ করে আলো জ্বালল গোপীনাথ। আদ্রেঁ একা থাকলেও খুব গোছানো লোক। ফ্ল্যাটটা বিশাল বড়। অন্তত তিন হাজার স্কোয়ার ফুট। ঢুকতেই হলঘর। এক ধারে বসবার জায়গা। অন্য ধারে একটা লাইব্রেরির মতো। দুটো মস্ত শোয়ার ঘরের মধ্যে একটা হল আদ্রেঁর কাজের ঘর। অন্তত গোটা পাঁচেক কম্পিউটার সাজানো রয়েছে চারধারে। একটা ল্যাপটপ কম্পিউটারও রয়েছে বাড়তির মধ্যে। একটা ওয়ার্কিং টেবিলে নানা ধরনের মডেল। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড দেয়ালে শাগলের একখানা ওরিজিন্যাল পেইন্টিং ঝুলছে। আদ্রেঁ ছবি-পাগল লোক ছিল। বিজ্ঞানী না হলে হত অবশ্যই একজন আর্টিস্ট।

ডেবুকটা বাইরে কোথাও পড়ে নেই। টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে দেখল গোপীনাথ। কখনও কাজের জিনিসটা সহজে পাওয়া যায় না।

পাশের শোয়ার ঘরে গিয়ে গোপীনাথ দেখতে পেল, বিশাল রাজকীয় একখানা খাট ও বিছানা। আদ্রেঁ একটু বিলাসবহুল জীবন কাটাতে ভালবাসত। ভালবাসত একা থাকতে। অনেকে সন্দেহ করে আদ্রেঁ হোমোসেক্সুয়াল। গোপীনাথ অবশ্য ততটা ভাল করে জানে না। শুনেছে, এই পর্যন্ত। আদ্রেঁ আর যাই হোক, ছিল অসম্ভব কাজপাগলা।

শোয়ার ঘরে খুঁজতে খুঁজতেও হয়রান হল সে। কোথায় রাখতে পারে ডে-বুকটা? গোপীনাথ অবশেষে বাথরুমে হানা দিল। বাথরুমটাও রাজকীয়। কোনও আধুনিক গ্যাজেট বাদ নেই।

বাথরুমে থাকার কথা নয়। তবু বাথরুমেই পেয়ে গেল ডায়েরিটা গোপীনাথ। একটা টেনশনমুক্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দেখল, ডে-বুকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই তার দরজা খোলার কোডটা লেখা রয়েছে। আদ্রেঁ কোড পালটাত না। তার স্বভাব একটু একবগগা। পরিবর্তন জিনিসটা সে পছন্দ করত না।

ডায়েরিটা অম্লানবদনে অ্যাটাচি কেসে ভরে বাতি নিভিয়ে দরজার সামনে একটু অপেক্ষা করল গোপীনাথ। আদ্রেঁ কি মারা গেছে?

সে ফের বাতি জ্বালাল এবং টেলিফোনের সামনে এসে বসে একটা নম্বর ডায়াল করল।

ও পাশ থেকে একটা পুরুষ গলা বলে উঠল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়।

আমি রোম থেকে বলছি। সুব্রত রায় কি আছেন?

না। উনি অফিসের বাইরে।

আমি একটা ইনফর্মেশন চাই। রিগার্ডিং আদ্রেঁ। ডেলিগেটদের একজন।

হ্যাঁ, উনি আজ মারা গেছেন সকাল এগারোটায়।

টেলিফোনের ওপরে গোপীনাথের মুঠো শক্ত হয়ে গেল। সে ঠান্ডা গলাতেই বলল, ডেডবডি কি নিয়ে আসা হচ্ছে?

হ্যাঁ। আজ রাতের ফ্লাইটে।

টেলিফোনটা রেখে গোপীনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

০৭.

দরজাটা খুব সাবধানে চুল পরিমাণ ফাঁক করল গোপীনাথ। নিবিষ্ট চোখে করিডরটা দেখল। ফাঁক দিয়ে শুধু বাঁ দিকের করিডরটাই দেখা যায়। ডান দিকেরটা দেখতে হলে মুন্ডু বের করতে হবে।

কিন্তু ভয় পেলে এবং বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে গেলে মূল্যবান সময়ের অপচয়। ভিকিজ মব-এর চেয়ে এক-দুই কদম এগিয়ে না থাকলে এতদিনের এত পরিশ্রম পণ্ড হবে।

গোপীনাথ দরজাটা ঝড়াক করে খুলে ফেলল। না, ডানধারেও কেউ নেই। যদি থাকেও তবে সে বা তারা নিশ্চয়ই গোপীনাথের সামনে বোকার মতো বুক চিতিয়ে হাজির হবে না। থাকলে তারা আড়ালে বাঘের মাসির মতো ওত পেতে অপেক্ষা করছে। যথাসময়ে ঘাড়ে এসে পড়বে। সুতরাং ভেবে লাভ কী?

গোপীনাথ নামবার সময়েও লিফট নিল না। দু'ধাপ করে সিঁড়ি দ্রুত পায়ে ভেঙে নীচে নামল। তার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। পচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনাসমূহও তার হুবহু মনে থাকে। সে কারও নাম একবার শুনলে আর ভোলে না। বিশেষ করে সংখ্যার ব্যাপারে তার স্মৃতি আরও তীক্ষ্ণ। ইলেকট্রনিক সুইচ বোর্ডটার কাছে গিয়ে সে মাত্র দু'সেকেন্ড ভাবল। আদ্রেঁ যে চারটে নম্বর টিপে দরজা খুলত সেটা ফটোগ্রাফের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সাত দুই তিন চার।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল গোপীনাথ। হাতে সময় বড্ড কম। দ্রুত পায়ে সে পাড়া ছাড়িয়ে ভিড়ের রাস্তায় চলে এল এবং ট্যাক্সি নিল। সারাদিন তাকে যথেষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে, উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা তাড়া করেছে। তবু উত্তেজক পরিস্থিতিতেই সে ভাল থাকে। তার বোধ, বুদ্ধি, রিফ্লেক্স সবই যেন চনমনে হয়ে ওঠে।

ইতালিয়ান আধবুড়ো ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে দু'-একটা রসিকতাও করল। ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে গেল রাত দশটার মধ্যেই।

সাক্কি ইনকরপোরেটেডের এই ল্যাবরেটরিটি বিশাল। চারদিকে উঁচু ঘের-পাঁচিল তো আছেই, তা ছাড়া আছে নানারকম ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি এবং বার্গলার অ্যালার্ম। সশস্ত্র প্রহরী এবং পাহারাদার কুকুর সারা এলাকা সর্বক্ষণ পাহারা দেয়।

ফটকে নিজের আইডি কার্ডটা যন্ত্রে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে হল তাকে। ছাড় পেয়ে দ্বিতীয় গাঁট। নিজের গাড়িতে এলে কথা ছিল না। কিন্তু ট্যাক্সি নিয়ে ভিতরে যাচ্ছে বলেই গার্ডরা এসে উকিঝুঁকি দিয়ে ভিতরটা দেখে নিল। আইডি কার্ড দেখল। তারপর বলল, ওকে

স্যার, ইউ মে এন্টার।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দ্রুত পায়ে গোপীনাথ ভিতরে ঢুকল। এসকালেটরে উঠে এল দোতলায়। আদ্রেঁর ঘর দোতলাতেই।

গোপীনাথ বৈদ্যুতিক সংকেতে দরজা খুলল, ঘরে ঢুকল এবং আলো জ্বালল। আদ্রেঁ অত্যন্ত গোছানো মানুষ। তার সবকিছুই খুব নিখুঁত ও পারস্পরিক। আদ্রেঁ যে চেয়ারটায় বসে কাজ করে সেটায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল গোপীনাথ,

তারপর ধীরে ধীরে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগল। কম্পিউটার চালু করে কিছুক্ষণ দেখল। প্রিন্ট আউট বের করল।

রাত ক্রমে গভীর হচ্ছে। সে অনেকক্ষণ কিছুই খায়নি। খিদে পাচ্ছে এবং দুর্বল লাগছে। কাজ শেষ করে অ্যাটাচি কেসে কাগজপত্র ভরে সে বেরিয়ে এল।

রিসেপশন থেকে ফোন করে একটা ট্যাক্সি আনাল সে। তারপর বেরিয়ে পড়ল। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসে সে প্রথমেই কালো কফি খেল। তারপর ফ্রিজ খুলে কিছু খাবার বের করে গরম করে গোগ্রাসে খেল।

খাওয়ার পর সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ কলকাতায় সুব্রতকে ফোন করল।

সুব্রত, গোপীদা বলছি। কী খবর?

গোপীদা, খবর খারাপ। আদ্রেঁ মারা গেছে।

অ্যাজ এক্সপেক্টেড। ডেডবডি?

ওরা আজই নিয়ে যাচ্ছে।

ভাল। অটোপসিটা এখানে হলেই ভাল হয়।

অটোপসি হবে কেন গোপীদা? ডাক্তাররা তো হার্ট অ্যাটাক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে।

কারণ আছে বলেই হবে। ক্রিমিন্যাল সায়েন্সও অনেক এগিয়ে গেছে, বুঝলি? আর কী খবর?

আপনি কি জানেন যে, ইন্টারপোলের একজন বাঙালি এজেন্ট এসে হাজির হয়েছে?

না তো। কেন?

শুনছি সে নানারকম এনকোয়ারি করছে।

ইন্টারপোলের ইন্টারেস্ট কী?

বউদি আমাকে বলেছেন, ব্যাপারটা আপনাকে জানাতে।

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, সোনালিকে তুই এখনও বউদি বলে ডাকিস নাকি?

আরে না। আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

কী বলে ডাকিস?

দিদি। সোনালিদি।

সোনালি হঠাৎ ইনফর্মেশনটা আমাকে দিতে বলল কেন? সে তো আমার নাম শুনতেও পারে না।

বোধহয় সিচুয়েশনটা ঘোরালো বলেই বলেছেন।

কী বলেছে?

লোকটার নাম সুধাকর দত্ত, ইন্টারপোল এজেন্ট। সাক্কি ইনকরপোরেটেড সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্ট।

সাক্কি সম্পর্কে আজকাল সকলেরই ইন্টারেস্ট দেখা যাচ্ছে।

কী ব্যাপার গোপীদা?

তা জানি না। তবে চারদিকে বেশ একটা তৎপরতা শুরু হয়েছে। শোন সুব্রত, লোকটা সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ নে। চেহারার বিবরণ এবং আর যা কিছু।

বউদির সঙ্গে লোকটার আলাপ হয়েছে। লম্বা প্রায় ছ'ফুট। বেশ ভাল পেটানো স্বাস্থ্য। গলার স্বর খুবই ভাল। হ্যান্ডসাম। প্যারিসে হেড কোয়ার্টার। এতে হবে?

ওর আইডেন্টিটি কার্ড কি সোনালি দেখেছে?

না বোধহয়। তবে আমাদের অফিসে চেক করা হয়েছে বোধহয়। মিস্টার সেন তো কাঁচা লোক নন।

গোপীনাথ একটু হাসল। বলল, এ যুগটা অত্যন্ত বুদ্ধিমানদের যুগ। বুঝলি? ক্ষুরধার বুদ্ধি ছাড়া এই কম্পিটিটিভ এজ-এ কিছু করা খুব কঠিন। মনোজের সেই বুদ্ধি নেই।

কিন্তু আপনি তো ওঁকে চেনেন না গোপীদা।

না। ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কিন্তু অনুমান করতে পারি। সিম্পল ডিডাকশন।

মেমসাহেব কিন্তু বুদ্ধিমতী।

রোজমারি সম্পর্কে আমার কোনও রিজার্ভেশন নেই। রোজ সত্যিই বুদ্ধিমতী। কিন্তু ওর একটা অতীত আছে। সেইটেই বিপজ্জনক।

সে কী গোপীদা?

সময়মতো জানতে পারবি হয়তো। এখন একটা কথা মন দিয়ে শোন।

বলুন গোপীদা।

আমার একটা বিপদ চলছে।

কী বিপদ?

একটা আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল গোষ্ঠীকে কেউ আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। এই গোষ্ঠীর নাম ভিকিজ মব।

ও বাবা! এরা তো সাংঘাতিক।

আমার ধারণা আদ্রেঁকে ওরাই মেরেছে।

মেরেছে! ওয়াজ ইট এ মার্ডার?

হ্যাঁ সুব্রত। নিট অ্যান্ড ফুলপ্রুফ।

সর্বনাশ! তা হলে এরা তো আপনাকেও

না সুব্রত। আমাকে এখনই মারবে না। তার কারণ সাক্কি ইনকরপোরেটেডের একটা গুরুতর প্রোজেক্টের আমি কো-অর্ডিনেটের সায়েন্টিস্ট। প্রোগ্রাম চিফও আমি। আমাকে মারলে প্রোজেক্টটা বানচাল হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ভিকিজ মব-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ওরা প্রোজেক্টটার ব্লু প্রিন্ট চায়।

বুঝেছি।

সেইজন্যই ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। প্রয়োজন হলে অবশ্য মারতে দেরি করবে না। তবে ভয় হচ্ছে, অ্যাবডাকশনের।

আপনাকে চুরি করবে?

হ্যাঁ, আমার ফটোগ্রাফিক মেমরির কথা ওরা জানে। যদি আমাকে চুরি করতে পারে তা হলে ওদের খানিকটা সুবিধে হবে।

আপনি পালাচ্ছেন না কেন?

গোপীনাথ হেসে বলল, তোর জানা কোনও নিরাপদ জায়গা আছে নাকি? শোন বোকা ছেলে, দুনিয়ার কোথায় আমি মরতে চাই তা ওরা প্রথমেই জানতে চেয়েছিল। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পৃথিবীর সব জায়গায় ওদের কুশলী খুনিরা আছে।

তা হলে কী হবে গোপীদা?

আমার কাছে আদ্রেঁর কিছু কাগজপত্র আছে। আমি সেগুলোর কিছু জেরক্স কপি আজ রাতেই করে রাখছি। কিন্তু আমার অ্যাপার্টমেন্ট নিরাপদ নয়। ওরা ইচ্ছে করলে চুরি করতে পারবে। এখন শোন, আমি কাগজগুলোর কয়েকটা ছবি আমার হ্যাসেলব্লাড ক্যামেরায় তুলে রাখছি। ইন কেস আমার যদি কিছু হয় তা হলে তুই একটা ফোন করে সিসি নামে এক মহিলাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিবি।

সিসিকে আপনিই কেন জানাচ্ছেন না?

তার কারণ হল, সিসি সদ্য বিয়ে করে নতুন বরের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছে। এক মাসের ছুটি। আরও পঁচিশ দিন তাকে ধরা যাবে না।

হ্যাসেলব্লাড ক্যামেরাটা কোথায় আছে?

বলছি। আমার অ্যাপার্টমেন্টে একটা ডার্করুম আছে। সেখানেই ক্যামেরাটা মাউন্ট করা আছে। আমি ছবি তুলব কিন্তু ফিল্ম ক্যামেরার মধ্যেই থেকে যাবে। বুঝেছিস।

বুঝেছি গোপীদা। কিন্তু আমার যে আপনার জন্য ভয় করছে।

ভয় করে লাভ কী? এখন সিসির ফোন নম্বরটা টুকে নে।

বলুন।

গোপীনাথ ফোন নম্বরটা বলল। তারপর বলল, আজ ছাড়ছি। অনেক রাত হয়েছে। আমি খুব টায়ার্ড। ঘুমোনোর সময় হচ্ছে না।

গুড নাইট গোপীদা।

গোপীনাথ ফোন রেখে তার শোয়ার ঘরের কাবার্ড খুলে একটা শক্তিশালী পিস্তল বের করে আনল। ক্লিপটা খুলে দেখে নিল, সব গুলি আছে কি না। সব ঠিকই আছে। অনেক দিন আগে কেনা জিনিসটা গোপীনাথের কোনও কাজেই লাগেনি। হয়তো ভবিষ্যতেও লাগবে না। তবু কাছে থাক, একটা ভরসা তো।

ডার্করুমে ঢুকে সে আদ্রেঁর কাগজপত্রগুলো একটা বোর্ডে পিন দিয়ে সাঁটল। তারপর বিশাল হ্যাসেলব্লাড ক্যামেরায় একটার পর একটা ছবি তুলল। তারপর কপি মেশিনে কয়েকটা করে কপি তুলে নিল। স্টাডিতে ঢুকে কাগজপত্রগুলোকে কয়েকটা বইয়ের মধ্যে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিল। এসব ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। শত্রুপক্ষ যদি পেশাদার অপরাধী হয়ে থাকে তবে সব জায়গাই নিপুণভাবে খুঁজে দেখবে। ভরসা একটাই, আঁদ্রের কাগজপত্র কিছু কিছু জায়গায় কোডেড।

গোপীনাথ তার বড় অ্যাপার্টমেন্টটা ভাল করে ঘুরে দেখল। তার অনুপস্থিতিতে কেউ ঢোকেনি বা জিনিসপত্র ঘটেনি বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে।

রাত প্রায় একটা বাজে। গোপীনাথ ঘরের আলো নেভাল এবং জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। নিজের জীবনটাকে তার কখনও অভিশপ্ত বলে মনে হয়। সোনালির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। সম্বন্ধ করা বিয়ে। জাত গোত্র সব দেখেশুনেই তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই বউ আর কাজ এই দুইয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। তখন গোপীনাথ সাক্কিতে ছিল না। অন্য কোম্পানিতে। সারা দুনিয়া দৌড়ঝাপ করে বেড়াতে হত। বাড়ি ফেরার ঠিক ছিল না। দিনের পর দিন সারা রাত গবেষণার কাজে কাটাতে হয়েছে ল্যাবরেটরিতে। সোনালি যদি সেই একাকিত্ব সহ্য করতে না পেরে থাকে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিছানার দিকেই যাচ্ছিল গোপীনাথ। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

আমি আপনার বন্ধু পল।

গোপীনাথের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। তবু সে গলাটা নিরুদ্বেগ রেখে বলল, হ্যাঁ পল, বলুন।

চোস্ত ফরাসিতে পল বলল, আপনার প্যারিস থেকে রোমে আসার গোটা অ্যাডভেঞ্চারটাই আমরা খুব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করেছি মঁসিয়ে বোস।

গোপীনাথ একটু কেঁপে গেল। যা ভয় করেছিল তাই। ওরা সারাক্ষণ তাকে মনিটর করেছে।

মঁসিয়ে পল, আমাকে কাজ করে খেতে হয়। আমাকে নিজের কাজেই আসতে হয়েছে।

অবশ্যই মঁসিয়ে। এমনকী নিজের কাজে আপনাকে চুরি এবং বাটপাড়িও করতে হচ্ছে তাও আমরা জানি।

চুরি! বাটপাড়ি। কী যে বলেন মঁসিয়ে পল।

মঁসিয়ে বোস, আপনি যদি ক্রিমিন্যাল হতেন তা হলে জীবনে উন্নতি করতে পারতেন। আমাদের অভিনন্দন।

অভিনন্দন কেন?

আদ্রেঁর কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করে আনার জন্য।

গোপীনাথ নার্ভাস বোধ করছিল। বলল, এরকম ঘটনা ঘটেছে নাকি?

মঁসিয়ে বোস, আপনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে, আপনাদের ল্যাবরেটরির প্রত্যেকটা ঘরেই ইলেকট্রনিক আই বসানো আছে। প্রত্যেকটা ঘরই সারাক্ষণ মনিটর করা হয়।

গোপীনাথ ঠান্ডা গলায় বলল, জানব না কেন?

আমরা মনিটরে আপনার সব কার্যকলাপই খুব মন দিয়ে দেখেছি।

গোপীনাথ দ্রুত ভাবছিল। তাদের ল্যাবরেটরির সিকিউরিটি অত্যন্ত উচ্চমানের। বাইরের লোক ঢোকা অসম্ভব। তা হলে কি ভিতরেই কিছু পাজি লোক আছে?

গোপীনাথ বলল, আপনারা আমাদের ল্যাবরেটরিতে মনিটরিং রুমে ঢুকেছিলেন কী করে?

আমাদের লোক সর্বত্র আছে, আপনাকে আগেই বলেছি।

গোপীনাথ বলল, ঠিক আছে। এবার কাজের কথাটা বলুন।

প্রিন্ট আউটটা আমাদের চাই।

গোপীনাথ মৃদু স্বরে বলল, আপনি নিশ্চয়ই বোকা নন।

কেন বলুন তো!

আদ্রেঁর কাগজপত্রের বা কম্পিউটারের প্রিন্ট আউট পেলেই তো আর হবে না। প্রোজেক্টটা বিরাট, জটিল। অনেক সায়েন্টিস্ট কাজ করছে।

আপনি কো-অর্ডিনেটর, আপনি ভালই জানবেন কার কাছে কী আছে।

না মঁসিয়ে পল, আমিও জানি না। এত বড় প্রোজেক্ট যে, একজনের পক্ষে সব জানা বা মনে রাখা সম্ভব নয়। আমরা মাঝে মাঝে মিটিং করে নানা তথ্য বিনিময় করি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। প্রত্যেকেরই কাজের ধরন আলাদা।

আমরা তা জানি মঁসিয়ে বোস। আমাদের সবচেয়ে বেশি জানা দরকার আপনাদের জ্বালানি সম্পর্কে। আপনারা কী জ্বালানি ব্যবহার করছেন মঁসিয়ে বোস?

দুঃখিত পল। আমার তা জানা নেই।

এ ব্যাপারে আদ্রেঁর কিছু অবদান আছে, তাই না?

হয়তো। কিন্তু আদ্রেঁকে খুন করে আপনারা হয়তো বিজ্ঞানের এক মস্ত সম্ভাবনাকেই নষ্ট করে দিলেন।

তাই কি মঁসিয়ে বোস?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এই প্রথম পল যেন একটু দ্বিধায় পড়ল। একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, হতে পারে আদ্রেঁকে খুন করাটা এক মস্ত ভুল।

গোপীনাথ মৃদুস্বরে বলল, মস্ত, মস্ত, ভীষণ ভুল মঁসিয়ে পল। আপনারা উন্মাদের মতো কাজ করেছেন।

দয়া করে রাগ করবেন না। রেগে লাভ নেই।

গোপীনাথ ঠান্ডা গলায় বলল, রাগ করে লাভ নেই জানি। কিন্তু বোকামি আমার সহ্য হয়। আদ্রেঁকে হত্যা করার মতো বোকা লোককে আপনারা সহ্য করেন কী করে?

পল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে, নিশ্চিন্ত থাকুন।

কী শাস্তি?

আমাদের শাস্তি মোটামুটি একটাই। এলিমিনেশন।

গোপীনাথ একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। অন্তত একটা শয়তান তো নিকেশ হবে।

০৮.

সকালটি বেশ মনোরম। চারদিকে ঝলমল করছে রোদ। মনোজের অফিস ঘরেও বাইরের আলোর আভা আসছে। স্বাভাবিক আলো, স্বাভাবিক বাতাস মনোজের খুব প্রিয়। সে একটু প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। নিজের অফিসঘরে বসে সকালে সে প্রথমেই এক কাপ কালো কফি খায়। খুব শিথিল ভঙ্গিতে বসে। এ সময়টায় সে একা থাকতে ভালবাসে। কফি শেষ করে কাজ শুরু করে।

ব্যাবসায় একটা টেনশন থাকেই। মনোজ টেনশন ভালবাসে না। ব্যাবসা জিনিসটার প্রতি বরাবর তার একটা ভীতি আছে। ব্যাবসা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। সে জার্মানিতে একটা মোটা মাইনের গবেষণাধর্মী চাকরি করত। খুব নিশ্চিন্ত ছিল তখন। বছরে একবার কি দু'বার ইউরোপে বা অন্য কোথাও বেড়াতে যেত। রোজমারির সেই বাঁধা জীবন ভাল লাগছিল না। তাকে টেনে নামাল ব্যাবসায়, প্রোডাকশনে। রোজমারি একটু অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের। তবে ব্যাবসাটা ইউরোপে করলে ভাল হত। নিজের দেশকে চেনে মনোজ, এখানে ব্যাবসা করতে গেলে পদে পদে বাধা। সস্তা শ্রমিক এবং ওভারহেড খরচ কম বলে এবং ভারতবর্ষের প্রতি একটা করুণামিশ্রিত ভালবাসা আছে বলে রোজমারি এদেশেই কারখানা করার গোঁ ধরেছিল। আর করেই ছাড়ল। কাজটা উচিত হয়েছে কি না তা মনোজ এখনও বুঝতে পারছে না। তবে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। বিদেশে যাওয়ার পর থেকেই এদেশের প্রতি তার একটা বিরূপতা জন্মেছিল। সেটা এখনও কাটেনি।

কফি শেষ হয়ে গেল। এখন অনেক কাজ। সোনালি এবং সুব্রতকে ডাকা দরকার। আজ কোনও মিটিং বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি না, অর্ডার এবং প্রোডাকশন সংক্রান্ত খোঁজখবর এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাদের এসময়ে কথা হয়।

মনোজ খানিকক্ষণ বসে রইল। চুপচাপ। ডেলিগেটরা ফিরে গেছে। আদ্রেঁর মৃতদেহ এতদিনে কবরস্থ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। শুধু একটা দাগ থেকে গেল। মুখে একটা তেতো স্বাদ।

মনোজ ইন্টারকম তুলে প্রথমে সুব্রতকে ডাকল।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং সুব্রত।

সুব্রত এমন একটি ছেলে যাকে দেখলেই ভাল লাগে। বেশ বাঙালি ধরনের সুপুরুষ। অনেকটা জমিদারদের মতো অভিজাত চেহারা। আসলে বোধহয় ওরা জমিদারই। এর পদবি রায়চৌধুরী। বয়স আঠাশ-উনত্রিশের মতো হতে পারে। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কিছু একটা আছে, যা মনোজ ভাল করে জানে না। এসব স্টাফ নিয়োগ করেছে রোজমারি নিজে দেখেশুনে। কোনও নির্বাচনই খারাপ বলে মনে হচ্ছে না মনোজের।

সুব্রত বসল। বলল, আজ তেমন গুরুতর কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই স্যার।

নেই?

না। ফিনান্স সেক্রেটারির সঙ্গে একটা মিটিং ছিল, কিন্তু তিনি জরুরি কাজে দিল্লি গেছেন।

মনোজ মৃদু হেসে বলল, আমি যে মিটিং অপছন্দ করি সেটা তুমি টের পেয়ে গেছ, না?

হ্যাঁ স্যার। মিটিংগুলো একটু বোরিং...

মনোজ একটু চুপ করে থেকে বলল, খুব বোরিং।

আপনি আজ রিল্যাক্স করুন স্যার।

আচমকা মনোজ জিজ্ঞেস করল, পুলিশের সঙ্গে তোমার জানাশুনো কেমন সুব্রত? নো এনি বিগ গাই?

না স্যার। আমার চেয়ে আপনি বেশি চেনেন। কিন্তু কেন?

মনোজ মাথা নেড়ে বলে, সেভাবে চিনি না। জাস্ট সোশ্যাল মেলামেশা একটু-আধটু। কারণটা হচ্ছে রোজমারিকে কেউ একজন সেদিন লাল গোলাপ পাঠিয়ে

একটু রসিকতা করেছে। লাঞ্চ টেবিলেও লাল গোলাপ ছিল, যদিও ইনস্ট্রাকশন ছিল অন্যরকম। আর আই পোলক নামে একজন লোক নাকি কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।

শুনেছি স্যার।

আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। কিন্তু রোজমারির টেনশন হচ্ছে। আমি লোকাল থানায় একটা রিপোর্ট করেছিলাম। ওরা ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভাবছি একটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হলে কেমন হয়।

সুব্রত সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি কথাটা বলার আগেই আমি নিজে সামান্য এনকোয়ারি করেছি। ফুলওলার বক্তব্য হল, লোকটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে টেলিফোনে এবং ইংরেজিতে। পেমেন্টের টাকাটা খামে পুরে আগের দিন ওদের লেটার বক্সে রেখে যায়।

তা হলে তো চিন্তার কথা সুব্রত।

সুব্রত মাথা নেড়ে বলে, চিন্তার কিছু নেই স্যার। বোধহয় ওঁর কোনও বন্ধু বা বান্ধবীই কাজটা করেছে। এখানে তো ওঁর অনেক বন্ধু।

মনোজ একটু অসহায় গলায় বলে, তা হলে তো ভালই। রোজি সাহসী মহিলা, সহজে ঘাবড়ায় না। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে একটু নার্ভাস।

পুলিশ যাতে ব্যাপারটা একটু এনকোয়ারি করে তা আমি দেখব স্যার।

দেখো। এবার সোনালিকে ডাকা যাক। লেট আস স্টার্ট আওয়ার মর্নিং সেশন।

সোনালি এল। রোজকার মতোই গম্ভীর মুখ, হাতে ফাইল। প্রথমে কয়েকটা চিঠিপত্রে সই করিয়ে নিল। তারপর বসল।

মনোজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোনালিকে বলল, সেই সুধাকর দত্ত লোকটার কী খবর মিস সোম?

কোনও খবর পাইনি তো?

লোকটা কি এখনও এদেশে আছে?

তাও জানি না।

লোকটা একটু অদ্ভুত টাইপের না?

সোনালি মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

কী মনে হল আপনার সেদিন? আপনি তো ওকে কারখানা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

লোকটার সঙ্গে কিছু গ্যাজেটস ছিল। ওয়াকি টকি ধরনের।

আর কিছু?

একটু বেশি জানতে চাইছিল। শচি ইনকরপোরেটেড সম্পর্কে কৌতূহলটাই বেশি।

শচি? ওর আসল নাম সাক্কি। কী জানতে চায়?

আমরা সাক্কির সঙ্গে ব্যাবসা করি কি না।

সাক্কি আমাদের স্টেডি ক্লায়েন্ট।

সেটা আমি ওঁকে বলিনি। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি বলেই বলিনি।

বললেও ক্ষতি ছিল না। সাক্কি এক্সপ্লোসিভ নিয়ে কাজ করত। ইদানীং সলিড ফুয়েল নিয়ে করছে। গোপন করার কিছু নেই। কিন্তু লোকটা ইন্টারেস্টেড কেন তা বোঝা যাচ্ছে না। সুব্রত, কিছু আন্দাজ করতে পারো?

না স্যার।

আমিও পারছি না। ইন ফ্যাক্ট, আমরা যে অ্যালয়টা তৈরি করি তা বিজ্ঞানের অনেক সম্ভাবনা খুলে দিচ্ছে। শুনেছি, এই এলিমেন্টটা নানা কাজে লাগে। কতরকম কাজে লাগে তা আমিও জানি না।

সুব্রত একটু দ্বিধা করে হঠাৎ বলল, আদ্রেঁ ছিলেন সাক্কির ফুয়েল এক্সপার্ট।

মনোজ মাথা নেড়ে বলল, ওদের কে যে কী তা আমি জানিনা। রোজি জানে হয়তো। তবে হাই পাওয়ার ডেলিগেশন। আদ্রেঁর মৃত্যুটা খুব আকস্মিক। ভেরি ডিস্টার্বিং। ডেলিগেটদের লিডার রীতিমতো ক্ষুব্ধ কিন্তু আমাদের তো দোষ নেই। হার্ট অ্যাটাকের জন্য তো আমরা দায়ী হতে পারি না।

সুব্রত মৃদুস্বরে বলল, ওদের সন্দেহ, আদ্রেঁ পয়জনিং-এ মারা গেছে।

মনোজ অবাক হয়ে বলে পয়জনিং! কিন্তু সেরকম হলে ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেট দিত না।

পয়জনিং নানারকমের হয় স্যার। অনেক সময়ে ধরা যায় না। তাই ওঁরা ডেডবডি নিয়ে গেছেন দেশে গিয়ে অটোপসি করাবেন।

অটোপসি! মাই গড!

সুব্রত অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ওদের কথাবার্তা শুনে তাই মনে হল।

কিন্তু পয়জনিংই বা হবে কেন? কী কারণে?

বলা মুশকিল স্যার।

মনোজ খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। তারপর বলল, তুমি আমার দুশ্চিন্তাটা বাড়িয়ে দিলে সুব্রত।

আমাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। আমাদের কী?

ফুড পয়জনিং মনে করছে কি?

না স্যার। ওদের সন্দেহ এটা খুন।

সর্বনাশ, এ তো ভয়ংকর কথা!

আপনি রিল্যাক্স করুন স্যার। আমার মনে হয় ওঁরা একটু বাড়াবাড়ি করছেন। এটা আসলে হয়তো নরম্যাল ডেথ।

মনোজ সোনালির দিকে চেয়ে বলল, কফি খাবেন?

না।

কাইন্ডলি আমার আর সুব্রতর জন্য দুটো কফির কথা বলে দিন।

সোনালি উঠে গিয়ে বেয়ারাকে কফির কথা বলে এল।

মনোজ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে ঘটনাবলিকে সাজানোর চেষ্টা করল মনে মনে। পারল না। মানসিক শৃঙ্খলা বলতে তার এখন কিছু নেই।

কফি এল। দু'জনে নিঃশব্দে কফি শেষ করার পর মনোজ বলল, তা হলে আজ আমার কিছু করার নেই?

সুব্রত বলল, না স্যার।

আমি তা হলে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কিছু কাজ করি। অনেকদিন রিসার্চ ওয়ার্ক কিছু করা হয়নি।

সুব্রত গলা খাঁকারি দিয়ে খুব সতর্ক গলায় বলল, স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

কী কথা সুব্রত?

এখানে যে অ্যালয় তৈরি হয় সেটা কি খুব রেয়ার অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ?

মনোজের ভ্রু একটু কুঁচকে গেল। তারপর একটু ভেবে সে বলল, বিজ্ঞানে নিত্য নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে বিস্তর বাই প্রোডাক্টও আছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনও একটা বাই প্রোডাক্ট মূল জিনিসটার চেয়েও ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠেছে। আমরা যে অ্যালয়টা তৈরি করি তার প্রসেসটা কমপ্লিকেটেড। একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক এটা প্রথম তৈরি করেন। তখনও এটার ইউটিলিটি সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অনেক সফিস্টিকেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে এটার ডিম্যান্ড হয়েছে। এক্সকুসিভ বলা যাবে না, কারণ পৃথিবীতে এই অ্যালয় আরও কোথাও কোথাও তৈরি হয়। তবে বেশি নেই, একথা ঠিক। ইস্টার্ন জোনে আমরাই শুধু তৈরি করছি। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করলে?

এমনিই। জাস্ট কৌতূহল।

মনোজ একটু ভেবে খুব চিন্তিতভাবে বলল, এমন হতে পারে যে, আমরা যা ভেবে জিনিসটা তৈরি করছি অন্য কেউ সেটা সেভাবে ব্যবহার করছে না। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এ জিনিসটার এমন কিছু প্রপার্টি বা ইউসেজ আছে যা আমরা জানি না।

সেটা কীরকম স্যার? আপনি নিজেও তো সায়েন্টিস্ট আপনি কেন জানবেন না?

মনোজ ম্লান হেসে বলল, আমি সায়েন্টিস্ট ঠিকই, কিন্তু উর্বর মস্তিষ্কের মানুষের অভাব তো নেই। এই অ্যালয় হয়তো অন্য কোনও ম্যাটারের সঙ্গে রি-অ্যাক্ট করে, তার হয়তো জটিল প্রক্রিয়া আছে। সব কি আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব?

আপনি কি মনে করেন অ্যালয়টা বিপজ্জনক?

না সুব্রত, অ্যাপরেন্টলি বিপজ্জনক নয়। কিন্তু জিনিসটা নতুন, এখনও এর সব প্রপার্টি নিয়ে গবেষণা হয়নি। আমাদের ল্যাবরেটরিতে তো সবসময়েই জিনিসটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে।

আমি টেকনিক্যাল লোক নই স্যার, বিজ্ঞানের কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই অ্যালয়টা কারও কারও কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

হতে পারে। তুমি কি বলতে চাও রোজমারিকে সেইজন্যই ভয় দেখানো হচ্ছে?

তা জানি না স্যার।

মনোজ চিন্তিত মুখে চেয়ে থেকে বলল, কারখানাটা অনেকে বহু টাকায় কিনতেও চাইছে।

হ্যাঁ স্যার, জানি।

মনোজ অসহায়ভাবে হাত উলটে বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না। দেয়ার মাস্ট বি এ প্যাটার্ন সামহোয়ার। আদ্রেঁকে যদি খুন করা হয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে আমাদের খুব নিশ্চিন্ত থাকা চলবে না। তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে।

সোনালি মাথা নিচু করে বসে ছিল। একটিও কথা বলেনি। তার দিকে চেয়ে মনোজ বলল, মিস সোম, আজকের দিনটা আমি ল্যাব-এ কাটাতে চাই।

রোজমারি আজ একটা অনাথ আশ্রমে গেছে। আপনারা এদিকটা একটু ম্যানেজ করবেন। আই মাস্ট নট বি ডিস্টার্বড।

সোনালি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে।

চিন্তিত মনোজ উঠে পড়ল। মিটিং শেষ।

সোনালি নিজের ছোট ঘরখানায় এসে তার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রইল কিছুক্ষণ। তারপরই ফোন এল।

সোনালিদি।

বলুন।

বস কি একটু ভয় পেয়েছেন?

হ্যাঁ সুব্রতবাবু, ওভাবে বলাটা আপনার ঠিক হয়নি।

একটু অ্যালার্ট করার দরকার ছিল। এতে উনি সতর্ক হবেন। ওঁর এখন সত্যিই বিপদ।

কীসের বিপদ?

আপনি ভিকিজ মব-এর নাম শুনেছেন?

শুনব না কেন?

ভিকিজ মব ফিল্ডে নেমে পড়েছে।

তার মানে?

মানে বিপদ।

কিছু বুঝতে পারছি না।

আমিও কি ছাই পারছি। তবে আপনি যার নাম শুনলেই চটে যান সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে টেলিফোনে কথা হচ্ছে, উনিই খবরটা দিয়েছেন।

খবরটা কী?

সেটা আপনার জানার দরকার নেই। তবে গোপীদাও এখন বেশ ঝামেলার মধ্যে আছেন।

তাতে আমাদের কী?

একটু আমাদেরও ব্যাপার আছে। যতদূর মনে হচ্ছে এই অ্যালয়টা নিয়েই গণ্ডগোল।

সোনালি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমাদের কি কিছু করার আছে?

না। কিন্তু চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ভাল।

ঠিক আছে।

আর একটা কথা।

কী?

মিস্টার সুধাকর দত্ত ইন্টারপোল এখনও কলকাতাতেই আছে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আমি তাকে দেখতেও পাচ্ছি। এইমাত্র আমাদের রিসেপশনে ঢুকল এসে।

০৯.

রিসেপশন থেকে যে টেলিফোনটা আশা করেছিল সোনালি সেটা এল বটে, কিন্তু এল আরও দশ মিনিট পর।

মিস সোম, আপনার সঙ্গে মিস্টার সুধাকর দত্ত দেখা করতে চান।

সোনালি ভেবে পেল না, দশ মিনিট দেরি হল কেন এবং সুধাকর তার কাছে কী চায়। সে শুধু বলল পাঁচ মিনিট পরে পাঠিয়ে দিন।

পাঁচ মিনিট সময়টা দরকার। এই পাঁচ মিনিট তাকে মন ও চিন্তাভাবনাকে গুছিয়ে নিতে হবে। লোকটা তাকে প্রশ্ন করবেই। কিন্তু জেরা করার মতো করে নয়। খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এবং সারল্যের সঙ্গে। অনেকটা বাচ্চা ছেলেদের মতো 'এটা কী, ওটা কী' গোছের হঠকারী প্রশ্নই। কিন্তু ওগুলোই হল বেশি বিপজ্জনক। ছদ্ম মোড়কে ঢাকা ওইসব প্রশ্নই মানুষের সতর্কতাকে ভন্ডুল করে দেয়। সুধাকরের এখন অনেক কিছু জানা বাকি। কিন্তু সোনালি তাকে সবকিছু বলতে চায় না। তাই কী বলবে এবং কী বলবে না তা এখনই ঠিক করে নেওয়া দরকার।

সোনালি চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ধ্যানস্থ হল। এই ধ্যানের প্রক্রিয়া তার খুব প্রিয়। এতে মনের শক্তি বাড়ে, ইচ্ছাশক্তিরও বৃদ্ধি ঘটে।

পাঁচ মিনিট পর দরজায় মৃদু ও ভদ্র করাঘাত। সোনালি তার কম্পিউটার মনিটরের ওপর চোখ রেখে ব্যস্ততার ভাবটি শরীরে ফুটিয়ে রেখে সামান্য অধৈর্যের গলায় বলল, কাম ইন।

সুধাকরের চেহারাটা সত্যিই অ্যাথলিটদের মতো। একখানা আড়া মাল্টি কালার স্ট্রাইপের টি-শার্ট পরে আছে বলে শরীরের ছমছমে ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে। হয়তো স্পোর্টসম্যান ছিল।

সুধাকর তার ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে একটু হেসে বলল, জ্বালাতে এলাম। আপনি বোধহয় খুব ব্যস্ত।

সোনালি একটু ক্লান্তির অভিনয় করে বলল, না, ঠিক আছে। আপনি বসুন।

টেবিলের ওধারে মুখোমুখি বসল সুধাকর। একটু চিন্তিত, একটু গম্ভীরও। আগের দিন বেশ বাচাল ছিল।

মিস সোম, আপনার পক্ষে কি একটা কাজ করা সম্ভব?

সোনালি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কী কাজ?

আমাকে এক কাপ কফি খাওয়ানো কি আপনার পক্ষে কঠিন হবে?

সোনালি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই একটু হেসে বলল, না, কঠিন আর কী।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে কফির কথা বলে দিয়ে সোনালি বলল, এবার দরকারের কথাটা বলুন।

সুধাকর যেন একটু অবাক হয়ে বলল, দরকার? না, দরকার কিছুই নেই। জাস্ট প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যাওয়া।

প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে দেখা করার কী দরকার তা বুঝল না সোনালি। বলল, ও।

বাই দি বাই, গোপীনাথবাবুকে আপনার কোনও মেসেজ দেওয়ার আছে কি? থাকলে আমাকে দিতে পারেন। বা যে-কোনও জিনিস। অনেকে তো এখান থেকে আমসত্ত্ব, পাটালি গুড় আর বাংলা বই পাঠায়, তাও দিতে পারেন।

সোনালির মুখখানা কঠিন হয়ে গেল। নিরাসক্ত গলায় বলল, আপনি ভুলে গেছেন যে, ওঁর সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই। তিনি কোথায় আছেন তাও জানি না।

সুধাকর জিব কেটে বলল, তাই তো, ইস ছি ছি, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ডিভোর্সের কথাটা আমার খেয়াল ছিল না।

অভিনয়টা চমৎকার করল সুধাকর। কিন্তু সেটা অভিনয় বলে বুঝে নিতে সোনালির কষ্ট হল না। সে মনিটরটার দিকে চেয়ে অকারণেই একটা পুরনো প্রোগ্রাম রিকল করল।

সুধাকর খুবই লজ্জিতভাবে একটা স্বগতোক্তি করল, অবশ্য উনি বোধহয় এখন প্যারিসে নেইও। আছেন রোমে, ওঁর হেড কোয়ার্টাসে।

যেখানেই থাকুন আমার কিছু যায়-আসে না।

সে তো বটেই।

বলে সুধাকর খুব চিন্তিত মুখে বসে রইল।

আর কিছু বলবেন?

না, না, আপনি কাজ করুন। আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো!

সোনালি জবাব দিল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সুধাকর বলল, আপনি বোধহয় রোমে থাকতেন, না?

না। জুরিখে।

চলে এলেন কেন?

সোনালি বিরক্ত হয়ে বলল, চলে আসব না কেন? আমি তো বিদেশে থাকতে যাইনি। বিয়ে ভাঙার পর চলে আসতে ইচ্ছে হল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। তখন বোধহয় মিস্টার বোস সাক্কিতে জয়েন করেননি, না?

না।

বাই দি বাই, সাক্কির সঙ্গে আপনাদের কানেকশনটা চেক করে দেখেছেন?

দেখেছি। সাক্কি আমাদের ক্লায়েন্ট। বানান আর উচ্চারণের তফাতটা জানা ছিল না বলে সেদিন বলতে পারিনি।

একটা কথা বলবেন? সাক্কির পারচেজের পরিমাণ কি এখন হঠাৎ একটু বেড়ে গেছে?

বেড়ে থাকতে পারে।

সাক্কি কি আপনাদের ইউরোপিয়ান এজেন্ট?

না। আমরা সাক্কিকে এজেন্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করিনি। তারা প্রোডাকশন কিনে নেয়, তারপর কী করে তা জানি না।

ঠিক কথা। মিস সোম, সাক্কি ঠিক কীসের বিজনেস করে তা কি আপনি জানেন?

খুব ভাল জানি না। শুনেছ এক্সপ্লোসিভস অ্যান্ড কো-রিলেটেড থিংস।

বাঃ, এই তো অনেক জানেন।

সাক্কি নামকরা কোম্পানি। সবাই জানে। আমি বরং কমই জানি।

গোপীনাথবাবু যে এই কোম্পানিতে আছেন তা আপনি জানতেন না, না?

না। আমি ওঁর কোনও খবর রাখি না।

ঠিক কথা। আফটার অল হি হ্যাজ ডেজার্টেড ইউ।

প্রসঙ্গটা আর না তুললেই খুশি হব।

সরি। গোপীনাথ বসু ইজ নাউ এ ফ্লাই ইন ইয়োর অয়েন্টমেন্ট। কিন্তু ওঁর প্রসঙ্গটা উঠছে কেন জানেন? হি ইজ এ বিগ গাই ইন হিজ ফিল্ড।

হতে পারে, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড।

সে তো ঠিক কথাই। আচ্ছা মিস সোম, আমি কি আপনাকে একটা গুরুতর প্রশ্ন করতে পারি?

ভ্রু কুঁচকে সোনালি বলে, কী প্রশ্ন?

প্রশ্নটা হল, কফি আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন বলুন তো!

সোনালি ফের একটু হাসল এবং বেল বাজাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রে-তে দু’ কাপ কফি নিয়ে বেয়ারা ঢুকল।

বেয়ারা কফি রেখে চলে যাওয়ার পর সুধাকর তার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ, চমৎকার! এরকম কফির জন্যই বেঁচে থাকাটার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়।

সোনালির মনে হল, কথাটা বড্ড বাড়াবাড়ি এবং বাহুল্য। সে মৃদুস্বরে বলল, আপনি বুঝি খুব কফি খান?

হ্যাঁ। তবে এরকম নয়। পারকোলেটরে তৈরি করা ব্ল্যাক তেতো কফি। ব্ল্যাক কফি ইজ এ ম্যাসকুলিন ড্রিঙ্ক।

আর এটা বুঝি ফেমিনিন?

না, না, তা নয়। এটাও চমৎকার। অত্যন্ত চমৎকার। ধন্যবাদ।

সোনালি লোকটাকে মনেপ্রাণে মোটেই পছন্দ করতে চাইছে না। আবার লোকটাকে তার খারাপও লাগছে না। এরকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া তার আর কখনও হয়নি।

হঠাৎ সোনালি বেমক্কা প্রশ্ন করল, সাক্কিকে নিয়ে আপনি এত চিন্তিত কেন মিস্টার দত্ত?

সুধাকর কফির কাপে তার অখণ্ড মনোযোগ অব্যাহত রেখে খুবই মৃদু স্বরে বল, গুজব। সাক্কিকে নিয়ে হাজারও গুজব।

কীসের গুজব?

সেসব আপনার জানার দরকার নেই, সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবেন কেন? এসব কারবারে যত না জেনে থাকা যায় ততই ভাল।

তাই বুঝি?

ঠিক তাই। এই যে আমি হাজার হাজার মাইল দৌড়ে মরছি তার অধিকাংশই হল পণ্ডশ্রম। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে চিলের পিছনে ছোটার মতো বোকামি। ওয়াইল্ড গুজ চেজ। সাক্কিকে নিয়ে যা রটেছে তাও এরকমই ব্যাপার হতে পারে।

তাই বুঝি?

আচ্ছা মিস সোম, আপনি নিজে সাক্কিকে নিয়ে চিন্তিত নন তো!

অবাক হয়ে সোনালি বলল, আমি! আমি কেন সাক্কিকে নিয়ে চিন্তিত হব?

ঠিক ঠিক, তাই তো। আপনার তো টেনশনের কারণ নেই।

না নেই।

আপনার বস মনোজ সেনের আছে কি?

ওঁর কথা আমি কী করে বলব?

তাও তো বটে। আপনি তো আর থট রিডার নন। আচ্ছা উনি এমনিতে তো লোক ভালই, না?

হ্যাঁ, ভালই তো।

আমারও তাই মনে হল। বেশ লোক। তবে ভাল লোকেরা তেমন বুদ্ধিমান বা যাকে চালাক চতুর চটপটে বলে তা হন না, তাই না?

সোনালি একটু হাসল। কিছু বলল না। আপনার কি মনে হয় মনোজবাবু খুব বুদ্ধিমান?

সোনালি মুখটা গম্ভীর করে বলল, বোকা হলে কি এত বড় কারখানা তৈরি করতে পারতেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও একটা পয়েন্ট।

সোনালি এবার সুধাকরের চোখে অকপট চোখ রেখে ঠান্ডা গলায় বলল, আপনি নিশ্চয়ই গালগল্প করতে আমার কাছে আসেননি। কী জানতে চান স্পষ্ট করে বলুন তো।

খুবই বিব্রত হয়ে সুধাকর কফির কাপটা রেখে বলল, এই দেখুন আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করে ফেললাম। আসলে আমি একটু মাঠো লোক। কিছু মনে করবেন না। আমার বোধহয় এখন বিদায় নেওয়াই উচিত, কী বলেন?

ভ্রু কুঁচকে সোনালি বলল, প্রয়োজন শেষ হয়ে থাকলে অবশ্যই বিদায় নেবেন।

সুধাকর উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়ে বলল, প্রয়োজন! প্রয়োজনের কথা বলেই মুশকিলে ফেললেন। আপনার কম্পানিটাই এত লোভনীয় যে সেটাকেই প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া যায়।

মিস্টার দত্ত, ফ্ল্যাটারি আমি পছন্দ করি না।

সুধাকর খুবই অপ্রতিভ হয়ে বলল, যথার্থ বলেছেন। ফ্ল্যাটারি জিনিসটা বোধহয় ভালও নয়। তবু মানতেই হবে যে, জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয়। অবস্থা বিশেষে

খুবই কাজে লাগে।

কিন্তু ভুল জায়গায় হলে উলটো ফল হতে পারে।

সুধাকর দত্ত ঘনঘন নেতিবাচক মাথা নাড়া দিয়ে বলল, আমি আপনাকে মোটেই ফ্ল্যাটারি করিনি। এ যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন হওয়া উচিত আপনি ঠিক তেমনই। আপরাইট, স্পষ্টবক্তা এবং সাহসী। ইউ আর রিয়েলি এ গুড কম্পানি।

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে মিস্টার দত্ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আমি উঠব।

আসুন নমস্কার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। আচ্ছা মিস সোম, লাল গোলাপের ব্যাপারটা কি একটু বলতে পারেন?

লাল গোলাপ?

গুজবই হবে। তবে শুনেছি রোজমারি সেনকে কে বা কারা লাল গোলাপ পাঠিয়ে থ্রেট করেছে!

সোনালি ফের ভ্রূ কোঁচকায়। তারপর বলে, থ্রেট হবে কেন? হয়তো কেউ রসিকতা করেছে।

আপনি তাই মনে করেন?

আমার মনে করায় কী আসে যায় বলুন।

তা বটে। তবে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিগত কিছু ডিডাকশন আছে। আপনার ডিডাকশন কী বলে?

সেটা তো বললামই।

রসিকতা? তা হলে তাই হবে। কিন্তু এরকম রসিকতা কে করতে পারে বলুন তো!

তা জানি না। তবে মিসেস সেনের অনেক বন্ধু আছে কলকাতায়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

সুধাকর কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে সোনালির দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, অঙ্কটা মিলছে না।

কীসের অঙ্ক?

আমার ব্যক্তিগত ডিডাকশন। সেখানে কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে।

তার মানে?

আদ্রেঁ এবং লাল গোলাপ দুটো এক হাতের কাজ নয়। বাট হু ইজ দি সেকেন্ড পার্টি?

কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

সরি। আই ওয়াজ জাস্ট থিঙ্কিং অ্যালাউড।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা, রোজমারি বোধহয় খুবই বুদ্ধিমতী। না?

হ্যাঁ।

এই প্রোজেক্টটা কি উনিই চালান?

তা কেন? মিস্টার সেনও আছেন।

দু'জনের মধ্যে কাকে আপনার বেশি এফিশিয়েন্ট বলে মনে হয়?

দু'জনকেই সমান এফিশিয়েন্ট বলে মনে হয়।

ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি আপনাকে কিছু কমিট করতে বলছি না। জাস্ট সিম্পল কৌতূহল। কিছু মনে করবেন না।

মনে করিনি। কিন্তু এখন আমি কাজ করব।

ছি ছি, সত্যিই আমি একটা ইডিয়ট। আপনার মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট করলাম। আসি তা হলে?

আসুন।

সুধাকর উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে এল।

আচ্ছা মিস সোম এই যে অ্যালয়টা এঁরা তৈরি করছেন এর কোনও পিকিউলিয়ার ইউসেজের কথা কি আপনি কিছু জানেন?

সোনালি একটু হেসে বলল, আমি নন-টেকনিক্যাল হ্যান্ড। আমার কাজ করেসপন্ডেন্স অ্যান্ড অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ওসব ব্যাপার আমার জানার কথা নয়।

তাও তো ঠিক কথা। আমারই ভুল। কিন্তু অনেক সময়ে অনেক কিছু তো আন্দাজও করে মানুষ।

মাথা নেড়ে বিরক্ত সোনালি বলল, না, আমার অত আন্দাজ করার মতো ক্ষমতা নেই।

মিস সোম, ইউ আর রিয়েলি এ গুড কম্পানি।

ধন্যবাদ।

আচ্ছা, তা হলে গোপীনাথবাবুকে আপনার কোনও মেসেজ দেওয়ার নেই।

সোনালি কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনি ইচ্ছে করেই আমাকে উত্যক্ত করতে চাইছেন।

জিব কেটে সুধাকর বলল, তা নয়, তা নয়। আসলে আমি তো এখন রোমেই যাচ্ছি। দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ এ চান্স মিটিং। ঠিক আছে মিস সোম,

আমি যাচ্ছি।

আসুন।

সুধাকর দত্ত চলে যাওয়ার পর সহজ হতে পারল সোনালি। আবার তার লোকটাকে খারাপও লাগছে না। যদি আবার কখনও দেখা হয় তা হলে সোনালি অন্তত বিরক্ত হবে না। লোকটা খুবই অদ্ভুত। বিরক্তিকর, অস্বস্তিকর, কিন্তু আকর্ষকও।

সোনালি কাজকর্ম শুরু করতে যাচ্ছিল, টেলিফোন বাজল।

সোনালিদি আমি সুব্রত।

হ্যাঁ, বলুন।

দত্ত তো চলে গেল দেখলাম।

হ্যাঁ।

খুব জ্বালিয়েছে নাকি আপনাকে?

একটু।

কেন যেন লোকটাকে আমার বিপজ্জনক মনে হয়।

হতে পারে। ভেবে কী করবেন?

১০.

একটা পোর্টেবল আইসিবিএম তৈরি করাটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আমি একজন ভাড়াটে বেতনভুক বৈজ্ঞানিক। প্রভুরা যা চান আমার তা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাক্কির হয়ে আমি যা করেছি তা একজন কর্মচারী হিসেবেই করেছি। কর্মচারী হওয়া ছাড়া একজন বৈজ্ঞানিকের এ যুগে উপায়ও নেই। তার কারণ বহুল ব্যয়সাপেক্ষ গবেষণা চালাতে গেলে তার দরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশাল সংগঠন, যা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা যায় না। কর্মচারী হিসেবে আমি প্রচুর বেতন ও সুবিধা পাই। তার চেয়েও অনেক বেশি পাই কাজ করার

অফুরন্ত সুযোগ ও পরিবেশ। সাক্কি অস্ত্রের কারবারি। তাদের তৈরি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নরমেধেই প্রযুক্ত হয়। তাদের বিধ্বংসী অস্ত্রে অনেক কলকারখানা, বাড়িঘর, নগর বন্দর ছারেখারে যায় আমি জানি। এইসব অস্ত্র তৈরিতে আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের অবদান তো কম নয়। এই যে পোর্টেবল, স্বল্প ওজনের দুরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরি হচ্ছে এটি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পক্ষে এক অভিশাপ হয়ে রইল। সাক্কি কোনও দেশের হয়ে কাজ করে না, তার কোনও স্থানিক পরিচয়ও নেই। এটি একটি নৈর্ব্যক্তিক, অর্থগৃধ্নু, ক্ষমতালিপ্সু প্রতিষ্ঠান। পৃথিবী ছারেখারে গেলেও এর কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এদের ক্ষমতা ও অর্থবল বিশাল। এদের হাতে যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। কিন্তু আমি–গোপীনাথ বসু এই বিশাল সংগঠনের কতটুকু? লক্ষ ভগ্নাংশও নয়। কিন্তু এই আইসিবিএম তৈরি করতে গিয়ে আদ্রেঁ এবং আমি একটি অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই। আলোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী আদ্রেঁ-ধাতব রসায়ন বিক্রিয়া থেকে জ্বালানি তৈরির কথা ভেবেছিল। তাই ওকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সাক্কিতে। জ্বালানি তৈরির জটিল ও সূক্ষ্ম কাজে দিনের পর দিন মগ্ন থেকেছে সে। অবশেষে সে একদিন আমাকে তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু স্বরে বলেছিল, হয়তো আমি স্বপ্ন দেখছি না মঁসিয়ে বোস। জিনিসটা হয়তো আমাদের নাগালে এসে গেছে।

ঠিক যে ধরনের আপাত-অসম্ভব জ্বালানির কথা আদ্রেঁ ভেবেছিল তা সত্যিই তৈরি হলে শুধু সাক্কির আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রই উড়বে না, তার চেয়েও অনেক বড় কাজ হবে, আদিগন্ত ভবিষ্যতের জন্য মানুষের জ্বালানি সমস্যারও সমাধান হয়ে যেতে পারে।

যে অ্যালয় নিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কাজ করছিল আদ্রেঁ, সেটি কলকাতা এবং পৃথিবীর আরও কয়েকটি জায়গায় তৈরি হয়। কিংবা আরও অন্য কোনও ধাতু বা সংকর ধাতু নিয়ে সে কাজ করছিল। আমি সঠিক জানি না, কিন্তু তার এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আর একজন আদ্রেঁ দরকার। নইলে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে ব্যর্থ হয়ে যাবে এত বড় একটা প্রয়োজনীয় আবিষ্কার। ধ্বংসের বিজ্ঞান থেকে অন্তত এটুকু সদর্থক একটা কিছু বেরিয়ে এলে আমি খুশি হতাম। তা হল না, কোন মূর্খ ঘাতক তাকে খুন করে দিল।

আজই আদ্রেঁর অটোপসির রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তার মৃত্যু হয়েছিল অত্যাধুনিক বিষে। খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষা ছাড়া যা ধরাই যায় না। হার্ট অ্যাটাকের

সমুদয় লক্ষণ নিয়েই মানুষ মারা যায়। তবু সন্দেহের বশে তার ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বিশেষজ্ঞ দিয়ে।

জানি না ভিকিজ মব-ই তাকে মেরেছে কি না। যদি তারাই এ কাজ করে থাকে তা হলে তাদের অবিলম্বে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া দরকার। জানি তা সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে যা কিছু অসুন্দর, নিষ্ঠুর ও দুষণীয় তা দুর করা যায়নি, যাবেও না। কিন্তু আদ্রেঁর মৃত্যু যে আমাদের কতখানি ক্ষতি করল তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি বড় অসহায় বোধ করছি।

সুব্রত, তোমাকে সবই বুঝিয়ে লিখলাম। ভিকিজ মব আমার ওপর সর্বত্র ও সর্বক্ষণ নজর রাখছে বটে, কিন্তু আমার কাজে এখনও বাধা দিচ্ছে না। তার কারণ আদ্রেঁ মারা যাওয়ায় আমাদের প্রোজেক্ট এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। আরে অসমাপ্ত কাজ শেষ করার মতো কেউ নেই। আশা করছি ভিকিজ মব কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিরস্ত হবে। কিন্তু বিপদ আসছে অন্যদিক থেকে। অপ্রত্যাশিত বলব না, এরকম যে ঘটবে তা আমি জানতাম।

বিপদটা হল, সাক্কি ইনকরপোরেটেডের কর্তৃপক্ষ গন্ধ পেয়ে গেছে যে, আদ্রেঁর গবেষণার ভিতরে সোনার খনি রয়েছে। সাধারণত তাদের ভাড়াটে বৈজ্ঞানিকরা কী কাজ করে সে সম্পর্কে সাক্কি কর্তৃপক্ষ ততটা খবর রাখে না। তাদের মূল লক্ষ্য ব্যাবসা এবং মুনাফা। তুমি তো জানোই, এই জ্বালানির ব্যাপারে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কীরকম প্রচেষ্টা চলছে। এই নতুন রকেট ফুয়েল শুধু আইসিবিএম নয়, সামান্য হেরফের ঘটিয়ে প্রায় সব ব্যাপারেই এই জ্বালানিকে কাজে লাগানো যাবে, যদি না কোনও বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আপাতত সাক্কি এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গত পরশু সাক্কির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তাদের হাবভাব আমার ভাল লাগছে না। নানারকমভাবে তারা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা বলছে প্যারিস থেকে পালিয়ে আসার পর আদ্রেঁর কাগজপত্র সরানো এবং ফটোকপি করা ইত্যাদির সব খবরই তারা রাখে। তাদের সন্দেহ আমার উদ্দেশ্য খুবই অসাধু। আমি তাদের ভিকিজ মবের কথা বুঝিয়ে বলেছি, কিন্তু তারা সেটা বিশ্বাস করছে না। আমার দূরভিসন্ধিমূলক কাজকর্ম তারা বরদাস্ত করতেও রাজি নয়। আরে যাবতীয় কাজকর্মের ফটোকপি তাদের হাতে আমি তুলে দিয়েছি, কিন্তু তারা তাতেও খুশি নয়। আমার কাছ থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেলে তারা সহজে ছাড়বে না আমাকে।

কাজেই ভিকিজ মব-এর সঙ্গে সাক্কির ভাড়াটে গুন্ডারাও আমার ওপর নজরদারি করছে। আপাতত রোম ছেড়ে আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমার প্রবেশ নিষেধ হয়েছে। সাক্কি যাদের কাজে লাগিয়েছে তারা সিসিলির মাফিয়া। চোখের পলকে খুন করে বসে।

আমি বেঁচে থাকার কোনও আশা দেখছি না। মৃত্যু অবধারিত বলেই মনে হচ্ছে। তবে তুমি তো জানোই, কাজ ছাড়া বেঁচে থাকাটাও আমার কাছে অর্থহীন। আমার মনে হয় না সাক্কি আমাকে কাজ করতে দেবে। আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছি।

আমার বিষয়সম্পত্তি নিয়েই প্রশ্ন। তুমি তো জানোই যে, আমার নিকট আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। মা-বাবা গত হয়েছেন। আমার দিদি সম্প্রতি আমেরিকায় মারা গেছেন। তার ছেলেমেয়েরা আছে বটে, কিন্তু তারা আমাকে চেনেও না। সুতরাং আমার উত্তরাধিকারী বলে কেউ নেই। একমাত্র সোনালি আছে–যে আইনত আমার কেউ নয়, কিন্তু একসময়ে সে আমার স্ত্রী ছিল। এখানে আমি আমার অ্যাটর্নি মারফত যাবতীয় সম্পত্তি সোনালির নামে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করেছি। তাকে সরাসরি এ কথা জানানোর উপায় আমার নেই। কারণ আমার প্রতি তার একটা ঘৃণার ভাব আছে। অতীত যে কত বড় বর্তমান হয়ে বাধার সৃষ্টি করে। সে যাক, খবরটা তুমিই তাকে দিয়ো। আমি জানি তার তেমন আর্থিক সচ্ছলতা নেই। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের চাকরি থেকে প্রাপ্ত বেতন থেকে তাকে বাপের বাড়ির জন্য অনেকটাই খরচ করতে হয়। সে আমার কাছ থেকে খোরপোষ বা ক্ষতিপূরণ বাবদও কিছু নেয়নি। হয়তো এবারও নেবে না। কিন্তু আমার তো আর কেউ নেই। তাকে বোলো, গ্রহণ করলে আমি বড় শান্তি পাব।

আমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়তে হয়েছে। আমি একটা রুমিং হাউসে। এখানে টেলিফোন আছে বটে, তবে পাবলিক ফোন। সাক্কি আপাতত আমার অ্যাপার্টমেন্টের চার্জ নিয়েছে। কেন তা জানি না। আমি হয়তো বা গৃহবন্দি, কারণ, সবসময়ে একটা অস্বস্তি বোধ করছি। আমার চারদিকে অনেক নজরদার।

সোনালিকে আমার অসহায় অবস্থার কথা বোলো। আমার অ্যাটর্নি কয়েকদিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ও যেন প্রত্যাখ্যান না করে। ওকে রাজি করানোর ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।

রোমে আমার একটা ভিলা আছে। আছে কিছু শেয়ার আর নগদ টাকা। খুব কম করে ধরলেও সব মিলিয়ে দশ কোটি টাকার ওপর হবে। সোনালি বিদেশে থাকা পছন্দ করে না। যদি চায় অ্যাটর্নি মারফত বিক্রি করে সব টাকা কলকাতায় ওর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নিতে পারে। আর যদি আসে তা হলে তো নিজেই সব বুঝে নিতে পারবে। যদি বেঁচে থাকি সাতদিন বাদে আমি তোমাকে ফোন করব। সোনালি রাজি হল কি না জানার জন্য উদগ্রীব রয়েছি। ভালবাসা জেনো। গোপীদা।

.

চিঠিটা পেয়ে সুব্রতর মন খারাপ হয়ে গেল। এতটাই খারাপ যে, চোখে জল এল তার। গোপীনাথ শুধু তার ডাকের দাদা নয়, গোপীনাথ ছিল তার আশৈশব হিরো। মেধাবী, সাহসী ও প্রচণ্ড প্রাণবান গোপীনাথ যাতে হাত দিত তাতেই সোনা ফলিয়ে তুলতে পারত। চমৎকার অভিনয় করত, মূর্তি বানাত, ছবি আঁকত, বাচ্চাদের ব্যায়াম শেখাত। তবে গোপীনাথ ছিল গরিব। কষ্ট করে, লড়াই করে বড় হয়েছে। চিররুগ্ণ বাবা গোপীনাথের কিশোরবয়সেই মারা যান। মা মারা গেলেন গোপীনাথ কলেজে ভরতি হওয়ার আগেই। গোপীনাথের দিদি সুন্দরী ছিলেন বলে অল্পবয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং বিয়ের পরই যে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, আর বড় একটা আসতেন না। গোপীনাথ প্রায় একা একা জীবন কাটিয়েছে। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই গোপীনাথ শুধু লেখাপড়া আর চিন্তাভাবনায় সময় কাটাত। ছাত্র অবস্থা থেকেই চেষ্টা করত বিদেশে চলে যাওয়ার। শেষ অবধি গেল। আমেরিকায়। দারুণ সব রেজাল্ট করল, বড় চাকরি পেল। তারপর সাধের বিয়ে।

সুব্রত আজও বিয়ে ভাঙার আসল কারণ জানে না। গোপীনাথ ভেঙে কিছু বলেনি কখনও। কিন্তু সোনালির সঙ্গে একটা যোগাযোগ সুব্রতর ছিল বরাবর। বিয়ের আগে থেকেই চেনা। এই যে সোনালি আর সে একই কোম্পানিতে চাকরি করে এটা কোনও অ্যাক্সিডেন্ট নয়, একটি ধুরন্ধর মাথার ঠান্ডা, হিসেব করা প্ল্যানিং। গোপীনাথ বসু দুর থেকে কলকাঠি নেড়ে এটা ঘটিয়েছে। সোনালি জানে না, সুব্রত জানে। কিন্তু গোপীদা কেন এটা ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট জানে না সুব্রত।

চিঠিটা পেয়ে সুব্রত কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। গোপীদা যদি খুন হয় তবে তার ভীষণ খারাপ লাগবে। লোকটা জীবনে কখনও সুখ পায়নি। টাকা রোজগার করেছে অনেক, কিন্তু সেই টাকারও ভাগীদার নেই, গোপীদা এমনই দুর্ভাগা।

একটি দুঃখী লোক বিদেশ বিভুয়ে অকারণে গুন্ডাদের হাতে খুন হবে, ভাবতেই তার বুক হাহাকার করে।

পরদিন অফিসে এসেই সুব্রত সোনালির ঘরে ফোন করে বলল, ম্যাডাম, একটু কথা আছে।

কী কথা?

একটু সময় লাগবে। লাঞ্চে কি ফ্রি আছেন?

লাঞ্চ বলে কিছু তো আমার নেই। তবে বেলা একটায় সময় দিতে পারব।

তা হলে ওই কথাই রইল।

সোনালি কম কথার মানুষ। বেশ ব্যক্তিত্বও আছে। সোনালি কেন গোপীদাকে পছন্দ করতে পারেনি সেটা আজও রহস্য রয়ে গেল সুব্রতর কাছে।

লাঞ্চ পর্যন্ত সুব্রত আজ অন্যমনস্ক রইল। কাজে তেমন মন বসল না। বেলা একটায় ফোন করল সোনালিকে।

সোনালিদি, আর ইউ ফ্রি নাউ?

হ্যাঁ।

আমি কি আপনার ঘরে আসব?

আসুন।

সুব্রত যখন সোনালির ঘরে গিয়ে ঢুকল, তখন সোনালি নিশ্চিন্তে বসে বাড়ি থেকে আনা স্যান্ডউইচ আর কফি খাচ্ছে। বাঁ হাতে একটা টাইপ করা চিঠি দেখছে। সোনালি সবসময়ে কাজ ভালবাসে।

তার দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে সোনালি বলল, কী ব্যাপার বলুন তো। বেশ টেনশ দেখাচ্ছে আপনাকে।

হ্যাঁ। আমি একটু টেনশনেই আছি।

বসুন।

সুব্রত বসে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কী করে কথাটা বলবে তা সে গুছিয়ে আসেনি। একটু এলোমেলো লাগছে ভিতরটা।

বলুন। বলে সোনালি খুব গা ছেড়ে বসল।

সুব্রত সামান্য একটু দ্বিধা করে পকেট থেকে গোপীনাথের চিঠিটা বের করে সোনালির হাতে দিয়ে বলল, এ চিঠিটা পড়ুন।

কার চিঠি?

পড়লেই বুঝবেন।

চিঠিটা যতক্ষণ পড়ল সোনালি ততক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সুব্রত। ভাবান্তর দেখার জন্যই।

ভাবান্তর হল। মুখটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগল। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল সোনালি। ভ্রু কুঁচকে রইল। চিঠিটা পড়া শেষ করে সুব্রতর দিকে নীরবে চেয়ে রইল সোনালি।

সুব্রত বলল, কিছু বুঝলেন?

কী বুঝব?

গোপীদা আপনার একটা জবাব চাইছে।

সোনালি ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ, ও তো বিষয়সম্পত্তির কথা। তা দিয়ে আমার কী হবে?

কিন্তু গোপীদা যে—

সোনালি কেমন যেন লাল হয়ে বলল, একটু চুপ করবেন? আমাকে ভাবতে দিন।

সুব্রত থতমত খেয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সোনালি বলল, ও টেলিফোনে অ্যাকসেসেবল নয়। তা হলে কী করে যোগাযোগ করবেন?

চিঠি।

চিঠি? বলে যেন অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল সোনালি। তারপর বলল, চিঠি পৌঁছোতে তো সময় লাগবে।

তা ছাড়া উপায় কী? সাতদিন বাদে টেলিফোন করবেন বলে লিখেছেন। আমার হিসেবে আগামীকাল। কিছু বলতে হবে?

না। আমার কথা ওকে কিছু বলবেন না, প্লিজ।

তা হলে?

সোনালি একটু চুপ করে থেকে বলল, টাকার লোভ যে একটা মানুষকে কতখানি নষ্ট করে ফেলে।

কার কথা বলছেন?

আপনার গোপীদার কথা।

গোপীদা কি লোভী?

আর কী বলা যায় বলুন তো! ভূতের মতো খাটে, দু'হাতে পয়সা রোজগার করে, এ ছাড়া আর কী করে আপনার গোপীদা? জীবনটা কি ওরকম? শুধু কাজ আর টাকা?

আপনি ভুল বুঝছেন।

সোনালি মাথা নেড়ে বলল, ভুল বুঝব কেন? আমি ঘর করেছি বলেই জানি। পরিণতিটাও দেখুন, একটাও নিজের জন নেই লোকটার, ওর টাকা হাত পেতে নেওয়ার লোক নেই। ওর তো এরকমই হওয়ার কথা।

আপনি একটু ভুল বুঝছেন ম্যাডাম।

সোনালি একটা তীব্র হেসে বলল, ভুল বুঝলে তো ভালই হত। আপনিই দেখুন, বিপদে পড়েও এখন শুধু ওর বিষয়সম্পত্তি আর টাকার কথাই ভাবছে।

সকলেই তো তাই ভাবে। মরার সময়ে যাবতীয় উত্তরাধিকার কাউকে দিয়ে যেতে চায়।

ওটা মানি-সেন্ট্রিকের ভাবনা।

সুব্রত কী একটা বলতে গেল, কিন্তু জুতসই কিছু খুঁজে পেল না। চুপ করে রইল।

সোনালি মৃদু স্বরে বলল, ওকে বলে দেবেন ওর টাকায় আমার দরকার নেই।

সোনালিদি, আপনি বড্ড নিষ্ঠুরতা করছেন। একটু ভেবে বলুন।

আমার ভাবনাচিন্তা অনেক আগেই হয়ে গেছে। আমি কোনওভাবেই গোপীনাথ বসুর উত্তরাধিকারী নই।

তা হলে কী হবে সোনালিদি?

কী আবার হবে। ওর সব টাকাপয়সা বাড়ি গাড়ি সরকার নিয়ে নিক। আমার দরকার নেই।

সুব্রত তবু কিছুক্ষণ বসে রইল। সোনালি তার স্যান্ডউইচ আর খেল না। তুলে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল। কফিটাও আর ছুঁল না।

সোনালিদি, আমাকে আজ একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

গোপীদাকে আপনি এত অপছন্দ করেন কেন?

অপছন্দ করার মতো বলেই।

এর বেশি কিছু বলবেন না?

আজ থাক সুব্রতবাবু, অন্য দিন বলব।

গোপীদা কি হৃদয়হীন?

সোনালি একটু চুপ করে থেকে বলল, তাই তো মনে হয়।

আমি ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি, আপনি তো জানেন।

জানি। পুরনো কথা শুনে আমার লাভ নেই। গোপীনাথ জীবনে যা চেয়েছে পেয়েছে। তার বেশি কিছু চায়নি, পায়নি।

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল।

পরদিন রাত প্রায় দশটায় গোপীনাথের ফোন এল তার বাড়িতে।

সুব্রত, গোপীদা বলছি।

হ্যাঁ, গোপীদা, ওদিককার কী খবর?

খবর ভাল নয়। জাল গুটিয়ে আনছে।

তার মানে?

মেয়াদ খুব কম। সোনালি কী বললে?

ভেবে বলবে।

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানতাম।

১১-১৫. লক্ষ করো বেনভেনুটি

লক্ষ করো বেনভেনুটি, ওই যে মেয়েটি করিডর ঝাড়ু দিচ্ছে, ওর মতো উরু তুমি কখনও দেখেছ? ওরকম যার ঊরু সে কোন দুঃখে জ্যানিটরের কাজ করছে বলতে পারো? এ তো কোটিপতিদের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে।

বেনভেনুটি নামক গরিলার মতো বলবান লোকটি করিডরের সিঁড়ি ও লিফটের মুখোমুখি একটা পাথরের মূর্তির আড়ালে দুটি চেয়ারের একটিতে বসে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সিগারেট খেতে খেতে বলল, বাসিলোঁ, লক্ষ করাই আমার কাজ।

বাসিলোঁ ছিপছিপে এবং বেশ লম্বা। তার দেহ-গঠনে একটা চিতা বাঘের মতো তৎপরতা আছে। বয়সে সে বেনভেনুটির চেয়ে অন্তত আট-দশ বছরের ছোট। বেনভেনুটির যদি মধ্য ত্রিশ তা হলে এ ছেলেটি পঁচিশ হতে পারে। দু'জনের পরনেই জিক্স এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে গরম জ্যাকেট। রোমে একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। বাসিলোঁ তরল গলায় বলল, তুমি কি ইমপ্রেসড নও?

অবশ্যই। সুন্দরী মেয়েরা বরাবরই আমাকে ইমপ্রেস করে থাকে।

বেনভেনুটি, তুমি ভাল করে মেয়েটাকে দেখোনি। আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটা আমাদের লোভাতুর করতে চাইছে। বুঝলে! ঠিক একজন ব্যালেরিনার মতোই চমৎকার ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কেমন ঝাড়ু চালাচ্ছে দেখো।

বেনভেনুটি মাথার টুপিটা ভ্রু পর্যন্ত টেনে নামিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মিনি স্কার্ট পরা কোনও ঝাড়ুদার আমি দেখিনি কখনও বাপু।

মেয়েটা বোধহয় নতুন কাজ পেয়েছে। একটু আলাপ করে আসব?

আসতে পারো। তবে বেশি মজে যেয়ো না। ওর হয়তো বয়ফ্রেন্ড আছে, কিংবা স্বামী।

তুমি সত্যিই বুড়ো হয়েছ। দেখো, দেখো, মেয়েটার মুখখানা কী সুন্দর! এতক্ষণ পিছন ফিরে ছিল বলে মুখটা দেখা যায়নি। সোনালি চুল, নীল চোখ এবং অসাধারণ ঠোঁট।

মেয়েমানুষই তোমাকে খেলো, বাসিলোঁ।

আহা, গত সাতদিন ধরে একঘেয়ে যে কাজটা আমাদের করতে হচ্ছে সেটাই বা কোন মজার কাজ? একটা ভিতুর ডিম ইন্ডিয়ান তার ঘরে দরজা বন্ধ করে দিন-রাত বসে আছে আর আমরা বাইরে বসে মাছি তাড়াচ্ছি।

ইন্ডিয়ানটা হয়তো ইম্পর্ট্যান্ট লোক। আমাদের কাজ নজর রাখা, রাখছি।

তুমি কি জানো, বেনভেনুটি, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট লোকগুলোই হয় সবচেয়ে বেশি বোর?

জানি।

এ লোকটা যদি একটু পালানোটালানোর চেষ্টা করত তা হলেও না হয় হত। এ তো শুধু মাঝে মাঝে নীচের ল্যান্ডিং-এ গিয়ে ফোন করে, আর রাস্তার ওপাশে সুপার স্টোরে কেনাকাটা করতে যায়। কোনও অ্যাডভেঞ্চারই নেই। আমাকেও ও চিনে ফেলেছে। ওর গায়ের সঙ্গে লেগে লেগে তো আমাকেই থাকতে হচ্ছে।

আমাদের যা করতে বলা হয়েছে তা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই বাসিলোঁ। আমরা এ কাজের জন্য যথেষ্ট টাকা পাচ্ছি।

লোকটাকে এক-আধটা ঘুসি মারা কি বারণ?

হ্যাঁ, বারণ। ওর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। হয়তো সময়মতো ওকে খুন করা হবে এবং সে ভার পাবে হয়তো বা তুমিই।

চমৎকার। আমি সেই হুকুমটার জন্যই অপেক্ষা করছি। কিন্তু বেনভেনুটি, মেয়েটা যে বড্ড কাছে এসে পড়েছে এবং আমাকে কটাক্ষও করল বোধহয়।

ঠিক আছে, এগিয়ে যাও। এখন সকাল আটটা বাজে, সন্ধে ছ'টায় আমাদের জায়গা নিতে আসবে দিনো আর নিনো দুই ভাই। যদি মেয়েটার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাও সেটা ছ'টার পরে যেন হয়।

তাই হবে।

একটু শিস দিতে দিতে হালকা পায়ে বাসিলোঁ এগিয়ে গেল।

সুপ্রভাত।

মেয়েটা যেমন অবাক তেমনি যেন শিহরিত। বড় বড় নিষ্পাপ চোখে চাইল, তারপর স্মিত হাসি হেসে বলল, সুপ্রভাত।

কী নাম তোমার?

সিসি। তোমার?

বাসিলোঁ। তুমি কি জানো, তুমি ভীষণ সুন্দর?

মেয়েটা যেন ভীষণ লজ্জা পেয়ে খুশির গলায় বলল, ধন্যবাদ।

তোমাকে তো আগে দেখিনি। নতুন নাকি?

মেয়েটা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, আসলে আমার বাবা এ বাড়ির জ্যানিটার। আমি এখানে থাকি না, প্যারিসে রান্না শিখতে গিয়েছিলাম। ছুটিতে এসেছি। বাবাকে একটু বিশ্রাম দিতেই তার কাজ করে দিচ্ছি।

দুটো হাত ঘষাঘষি করতে করতে বাসিলোঁ বলল, ভাল, ভাল, খুব ভাল কথা।

মেয়েটা হঠাৎ ভ্রু কুঁচকে বলল, আচ্ছা, তোমরা এখানে বসে আছ কেন? কারও জন্য অপেক্ষা করছ নাকি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইরকমই কিছু। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে? ধরো যদি আজ সন্ধেবেলায় তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করি?

মেয়েটা আবার শিহরিত হল আনন্দে। রাঙা হয়ে বলল, সত্যি। উঃ, তা হলে তো ভীষণ মজা হয়। কিন্তু আজ নয়। আজ আমার বিকেলটা আগে থেকেই আর একজনকে দিয়ে রেখেছি।

সে কে?

কোনও বয়ফ্রেন্ড নয়। আমার এক বিধবা নিঃসন্তান বুড়ি পিসি। সে মারা গেলে তার সম্পত্তি আমিই পাব। পিসি রাগী মানুষ, তাকে খুশি রাখতেই হবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাল হলেও হবে।

তোমরা দু'জন বুঝি বন্ধু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা খুব বন্ধু।

ওর নাম কী? বেনভেনুটি। একজন প্রাক্তন হেভিওয়েট বক্সার।

বক্সার? আমি বক্সারদের খুব পছন্দ করি।

বাসিলোঁ একটু হেসে বলল, শুধু বক্সারদের? জানো তো, বক্সারদের মাথা মোটা হয়? আর আমাকে দেখো, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

মেয়েটি খুব লজ্জা পেয়ে বলল, তুমিও ভাল। নিশ্চয়ই খুব ভাল তুমি।

আচ্ছা, আচ্ছা। আমি ভাল কিনা সেটা তো তুমি বিচার করতে পারবেই। কাল সন্ধেবেলা তা হলে?

মেয়েটি ফের যেন লাল হল। বলল, আমার হাতে এখন একটু সময় আছে। তোমাদের দু'জনকে আমি কফি আর কুকি খাওয়াতে পারি।

পারো! কী ভাল কথা! সত্যিই পারো?

হ্যাঁ। এর ঠিক নীচের তলাতেই আমার ঘর।

কেন, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকে না?

আমাদের জায়গা হয় না। তাই দোতলায় একটা ছোট ঘর নিয়ে আছি। এসো না, তোমার বন্ধুকেও ডাকো।

একটা হাই তুলে বাসিলোঁ বলল, একটু অসুবিধে আছে। এখানে একজনকে মোতায়েন থাকতেই হবে।

কেন বলো তো!

আমাদের এক বন্ধুর ওপর নজর রাখতে হচ্ছে।

ও, তা হলে থাক।

কেন, থাকবে কেন? আমি তো যেতে প্রস্তুত।

মেয়েটি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, থাক, পরে হবে।

ওঃ, তুমি তো দেখছি সত্যিই বক্সারদের খুব পছন্দ করো। শোনো, আমি বক্সার না হলেও আমার অন্য বিদ্যে জানা আছে। আমি সার্কাসে খেলা দেখাতাম, জানো? ট্রাপিজের খেলা।

মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলল, তাই!

বাসিলোঁ হাসল, এবার খাওয়াবে কফি?

মেয়েটা একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলল, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, একা ঘরে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানো বিপজ্জনক। আমার একজন দেহরক্ষী দরকার।

বাসিলোঁ হেসে বলল, বুঝেছি।

তারপর ফিরে সে বেনভেনুটিকে ডেকে বলল, কিছুক্ষণের জন্য একটা কফি ব্রেক নেওয়া যাবে কি?

বেনভেনুটি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সিগারেট খায়। বলল, না।

একটি সুন্দরী মেয়ের সম্মানেও নয়? সিসি তোমাকে খুব পছন্দ করেছে।

কাজটা উচিত হবে না।

আরে ওই ইন্ডিয়ানটা তো নড়াচড়াই করছে না। বোধহয় এখন ঘুমোচ্ছে।

কত কী ঘটে যেতে পারে।

দশ মিনিটে কিছুই ঘটবে না, সাত দিনে যখন ঘটেনি। সিসির বক্সারকে পছন্দ।

বেনভেনুটি গড়িমসি করে উঠল। বলল, দশ মিনিট, তার বেশি নয় কিন্তু।

আরে না। এসো, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

তিনজনে কথা বলতে বলতে নীচের তলায় নামল। মেয়েটি তাদের করিডরের শেষ প্রান্তে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার সিঁড়ির মুখোমুখি আর একটা ঘরের দরজা খুলে হরিণের পায়ে ওপরে উঠে এল সুধাকর দত্ত। সোজা গিয়ে গোপীনাথের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, দরজাটা খুলুন। তাড়াতাড়ি।

গোপীনাথ বাংলা কথা শুনে তাড়াতাড়িই দরজা খুলল।

সুধাকর চাপা গলায় বলল, শিগগির আসুন। পাসপোর্টটা নিয়ে।

কোথায়?

কথা বলার সময় নেই। প্লিজ।

গোপীনাথ পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে এল। সুধাকরের পিছু পিছু দোতলায় নেমে এল সে। সুধাকর তার ঘরের দরজা খুলে গোপীনাথকে প্রায় টেনে ঢুকিয়ে নিল ঘরে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, এখন আপনি অনেকটা নিরাপদ।

গোপীনাথ বলল, আপনি কে?

সুধাকর হাত তুলে বলল, এসব প্রশ্নের জবাব পরে দেব। আমি কে জেনে আপনার লাভ নেই। শত্রুও হতে পারি, মিত্রও হতে পারি। সমুদ্রে শয়ান যার,

শিশিরে কি ভয় তার? আপনার তো মশাই, জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। তাই নয় কি?

গোপীনাথ ক্লিষ্ট একটু হেসে বলল, তা বটে।

বসুন। একটু কফি খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেবেন?

তা খেতে পারি।

খান মশাই, আপনার এখন অনেক কিছু বলার আছে।

আমার ওপর কিন্তু সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে। আপনি যে আমাকে নিয়ে এলেন এটা ওরা টের পাবে না?

এখনই পাবে না। কারণ ওরা আপনার ঘরের দরজাটা শুধু নজরে রাখে, আর আপনি বেরোলে পিছু নেয়, তাই না?

হ্যাঁ।

তা হলে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। আপনার ঘরে কি ফোন আছে?

না।

বাঃ চমৎকার।

গোপীনাথ মৃদুস্বরে বলল, করিডরের পাহারাদার দু'জন কোথায় গেল?

কাছেপিঠেই আছে। ওদের কফি খেতে পাঠিয়েছি।

পাঠিয়েছেন? তার মানে কি ওরা আপনার লোক?

না মশাই, না। পাঠিয়েছি মানে কি আর আমার হুকুমে গেছে? টোপ ফেলে সরাতে হয়েছে। এবার কফি খেতে খেতে আপনার সমস্যার কথা বলুন।

সমস্যা! বলে গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সমস্যা বললে কিছুই বলা হয় না। আমি রয়েছি অন্তিম সংকটের মধ্যে। রামেও মারবে, রাবণেও মারবে।

তবু বলুন।

গোপীনাথ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ থাকল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল, আপনি একজন বাঙালি। এইসব ঘটনার মধ্যে আপনি কী করে এসে পড়লেন বুঝলাম না। তবু আপনাকে বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। তাই বলছি।

গোপীনাথ আদ্যোপান্ত তার সব ঘটনাই সংক্ষেপে বলে গেল।

সুধাকর চাপা গলায় বলল, আপনি এখন কী চান?

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। বাঁচার সম্ভাবনা আমার নেই। শুধু আমার বিষয়সম্পত্তিগুলো যাতে শয়তানদের হাতে না পড়ে এইটেই আমার চিন্তা।

কী করতে চান?

আমার প্রাক্তন স্ত্রীকে অনুরোধ করেছি আমার উত্তরাধিকারী হতে। তিনি রাজি হলে নিশ্চিন্ত হই।

এখনও রাজি হননি?

জানি না। ভায়া মিডিয়া কথা চলছে। একটা টেলিফোন থাকলে জেনে নিতাম।

টেলিফোন? দাঁড়ান।

বলে সুধাকর উঠে গিয়ে একটা কর্ডলেস রিসিভার এনে গোপীনাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা স্ক্র্যাম্বলার। ট্যাপ করার ভয় নেই। করুন।

কিন্তু কলকাতায় এখন তো শেষ রাত।

তাতে কী? আপনার বিপদ চলছে। এখন কারও ঘুম ভাঙানো অপরাধ নয়।

গোপীনাথ সুব্রতর নম্বর ডায়াল করল।

সুব্রত, গোপীদা বলছি।

বলুন গোপীদা।

কী খবর? আমার চিঠি পেয়েছিস?

পেয়েছি।

সোনালি কী বলল?

আগে বলুন, আপনি কেমন আছেন?

এখনও মরিনি, বুঝতেই পারছিস।

বিপদ কি চলছে?

হ্যাঁ, ভীষণভাবে। সোনালি কী বলল?

নেগেটিভ।

তার মানে? উনি সম্পত্তি চান না।

বলল?

হ্যাঁ। উনি বললেন, আপনি টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করেন। এটাই ওঁর অপছন্দ।

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, ও।

গোপীদা, আমিও বলি, আপনি এসব নিয়ে ভাবছেন কেন? ওসব ভাবনা ছেড়ে দিন।

গোপীনাথ বলল, ঠিক আছে।

ভাল থাকুন গোপীদা। অল গুড উইশেস।

গোপীনাথ ফোনটা অফ করে মলিন মুখে রিসিভার ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

সুধাকর একটু হাসল, সোনালিদেবী রিফিউজ করলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

তা হলে কী হবে?

গোপীনাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কে জানে। উড়ে পুড়ে যাক।

সুধাকর হঠাৎ চকিতে উঠে দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল। তারপর ফিরে এসে বলল, আপনার পাহারাদাররা ওপরে গেল।

বিবর্ণ মুখে গোপীনাথ বলল, তা হলে কি আমার বিপদ?

না। এখনও নয়। বাঁপাশে একটা ছোট ঘর আছে। সেখানে নতুন পোশাক আর কিছু মেক-আপ আছে। আপনি কি ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারেন?

না।

চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

ছদ্মবেশে কি কাজ হবে?

অন্তত একটা ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আসুন, সময় নেই।

গোপীনাথকে নিয়ে সুধাকর ভিতরের ঘরটায় গেল এবং নিপুণ হাতে তার চেহারার পরিবর্তন ঘটাতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে গোপীনাথ আয়নার দিকে চেয়ে নিজেকে একদম চিনতে পারল না। তাকে হুবহু একজন কাফ্রি বলে মনে হচ্ছে।

এবার কী হবে?

সুধাকর মৃদু হেসে বলল, লেট আস টেক এ চান্স। আপনাকে এ বাড়ি থেকে বের করে নিতে হবে। আসুন।

সুধাকরের পিছু পিছু গোপীনাথ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা দরজা দিয়ে একটি মেয়ে বেরোল অন্য ঘর থেকে।

আপনি মেয়েটার একটা হাত ধরে ধীরেসুস্থে নামুন। তাড়াহুড়ো করবেন না।

ঠিক আছে।

নীচে গাড়ি আছে। কোনও দিকে তাকাবেন না।

গোপীনাথ মেয়েটার হাত ধরে নামতে লাগল। বুক কাঁপছে, পা টলছে। ধরা পড়ে যাবে নাকি গোপীনাথ?

১২.

উমাকান্ত প্রসাদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল। একটু আত্মভোলা কাজপাগল লোক। চোখ দুখানা সবসময়েই যেন অন্তর্গত কোনও চিন্তায় তন্ময় হয়ে আছে। বিহারের লোক এই মানুষটি মনোজ ও রোজমারির অনেকদিনের চেনা। পরিচয় জার্মানিতেই। প্রসাদ বিদেশে থাকা পছন্দ করছিলেন না। দেশে ফেরার প্রস্তাবে উজ্জ্বল সম্মতি দিয়েছিলেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের কেমিক্যাল ল্যাব-এর ভার পেয়ে খুব খুশি। প্রসাদের একটাই ছেলে, এখন সে আমেরিকায় পিএইচডি করছে।

সকালে অফিসে এসে প্রসাদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ডুবেছিল মনোজ। একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। মনোজের সন্দেহ হচ্ছে, তাদের তৈরি অ্যালয়টার উদ্দিষ্ট ব্যবহারযোগ্যতা ছাড়াও আরও কিছু উপযোগ আছে। সেটা তারা ধরতে পারছে না। কথাটা তাই নিয়েই।

প্রসাদ মাথা নেড়ে বলল, এই অ্যালয় সোজাসুজি অন্য কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তবে কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন ঘটিয়ে হতে পারে। আপনি বলার পর থেকে গত সাতদিন আমি দিনে প্রায় আঠারো-উনিশ ঘণ্টা ধরে নানারকম টেস্ট করেছি। কিছু পাইনি। তবে এও বলছি, টেস্ট আরও অনেক করা যায়।

পারলে আপনিই পারবেন।

আমি শুধু ভাবছি, এটা বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে কি না, সবটাই পণ্ডশ্রম হবে তো। মনোজ মাথা নেড়ে বলল, তা বোধহয় হবে না। এর আর একটা ইউজ নিশ্চয়ই আছে। ঘটনাগুলি অন্তত তারই সাক্ষী দেয়।

প্রসাদ গম্ভীর মুখ করে বলে, আদ্রেঁর মৃত্যুর কথা বলছেন?

সেটা অনেক ঘটনার মধ্যে একটা।

মুখে আপশোসের একটা চুকচুক শব্দ করে প্রসাদ বলল, এ গ্রেট লস। আদ্রেঁ ওয়াজ এ জিনিয়াস।

আপনি কি ওকে চিনতেন? বলেননি তো কখনও!

চিনতাম। তবে ডেলিগেটদের মধ্যে যে সেও আছে তা জানতাম না। যেমন সেও জানত যে, আমি এই কোম্পানিতে কাজ করি।

আপনি কি জানেন যে, আদ্রেঁর ডেডবডি নিয়ে গিয়ে রোমে একটা অটোপসি করা হয়েছে। এ ভেরি সফিস্টিকেটেড টেস্ট। তাতে ধরা পড়েছে যে, হি ওয়াজ পয়জনড।

তাও শুনেছি। রোজমারি বলেছেন। ঘটনা কি আরও আছে?

আছে। সাক্কি ইনকরপোরেটেড তাদের অর্ডার বহু গুণ বাড়াতে চাইছে। তার পিছনে অন্য মতলব? ঠিক তাই। সাক্কি যা নেয় এ প্রায় তার দশ গুণ। খবরটা ব্যাবসার পক্ষে নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু আরও ভাল হয় যদি আমরা তাদের মতলবটা বুঝতে পারি এবং তাদের আগেই জিনিসটা তৈরি করে বাজারটা ধরে ফেলি।

ওয়াইজ অব ইউ।

সেইজন্যই আপনাকে খাটাচ্ছি।

প্রসাদ মৃদু হেসে বলল, খাটতে আমার কোনওদিনই আপত্তি নেই। কাজ তো আমি ভালইবাসি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার চেয়েও অনেক বড় এক্সপার্ট ছিল আদ্রেঁ।

তা তো ঠিকই। কিন্তু আদ্রেঁ আমাদের নাগালের বাইরে।

প্রসাদ একটু ভাবল। তারপর বলল, আর একজন আছে।

সে কে? তার নাম গোপীনাথ বসু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম শুনেছি। কিন্তু তিনি তো আদ্রেঁর লাইনের লোক নন।

প্রসাদ মাথা নেড়ে বলল, না। তবে গোপীনাথ হ্যাজ ইনমেনন্স কোয়ালিটিজ। আরও একটা কারণ হল, সে আদ্রেঁর বন্ধু।

আপনি এত সব জানলেন কী করে?

আদ্রেঁ আমার বন্ধু। গোপীনাথও আমার খুব চেনা। তারা দুজনেই সাক্কিতে কাজ করত। ইন ফ্যাক্ট, সাক্কিতে আদ্রেঁকে ঢুকিয়েছিল গোপীনাথই। বিশাল কোম্পানি, অনেক প্রোজেক্ট।

জানি। আমরা সাক্কির সঙ্গে বিজনেস করি, আপনি কি তা জানেন না?

প্রসাদ মাথা নেড়ে বলে, আমি ল্যাব নিয়ে পড়ে থাকি, বিজনেসের খবরে আমার ইন্টারেস্ট নেই। তবে গোপীনাথ বসুর সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে পারেন, হি মে বি অব সাম হেলপ।

গোগাপীনাথ কি সাক্কির গোপন প্রোজেক্টের খবর আমাদের দেবে?

প্রসাদ একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না। তবে হয়তো একটা হিন্ট দিলেও দিতে পারে। ওয়ান হিন্ট উইল বি এনাফ ফর মি। আমি অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছি। কী করতে চাইছি তাই তো জানি না।

মনোজ ভ্রু একটু কুঁচকে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমিও জানি না। আপনি কি গোপীনাথবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?

প্রসাদ একটু হাসল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। কিন্তু সেটা কতটা প্র্যাক্টিকেবল হবে জানি।

কী বলুন তো!

আপনার পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস সোম গোপীনাথের এক্স ওয়াইফ।

মনোজ অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি? তা হলে তো বলেই মনোজ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল।

প্রসাদ হাত তুলে মৃদু হেসে বলল, ডোন্ট বি হেস্টি।

লেট আস আস্ক হার।

প্রসাদ মাথা নেড়ে বলল, ওদের সম্পর্কটা এখন ভীষণ সেনসিটিভ। কেউ কারও নাম শুনতে পারে না।

তা হলে?

মিস সোম আপনাকে হেল্প করবেন না। তবে শি মে গিভ আস দি টেলিফোন নাম্বার অব গোপীনাথ। কিন্তু ও কাজটা আমিই করব।

মনোজ বলল, ঠিক আছে।

প্রসাদ মৃদু হেসে উঠল। বলল, গোপীনাথ যদি ভাইট্যাল হিন্টটা নাও দেয় তা হলেও আমি হাল ছাড়ছি না। চিন্তা করবেন না।

আচ্ছা। থ্যাঙ্ক ইউ।

প্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যদি একটা অত্যাধুনিক ল্যাব এবং যন্ত্রপাতি পেতাম তা হলেও না হয় হত। আমাদের ল্যাব তো তেমন সফিস্টিকেটেড নয়।

মনোজ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, ঠিকই বলেছেন। তবু যতদূর যা করা যায়। তারপর দেখা যাবে।

প্রসাদ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল মনোজ। একটু অবাক লাগছে। সোনালি গোপীনাথ বসুর স্ত্রী! কী আশ্চর্য। গোপীনাথ মস্ত মানুষ। জিনিয়াস।

সোনালি এল আরও আধ ঘণ্টা পরে। কয়েকটা জরুরি চিঠিপত্র সই করাতে।

সইগুলো করে দিয়ে মনোজ হঠাৎ বলল, মিস সোম। বসুন। একটু কথা আছে।

সোনালি হয়তো অবাক হল। তবু বসল।

মনোজ ভদ্রতা বজায় রেখে আড়চোখে সোনালির মুখখানা লক্ষ করে নিল। মুখখানা ঠিক স্বাভাবিক নয়। এমনিতেই সোনালির মুখটা বেশ গম্ভীর। তার ওপর এখন একটা বিষাদের ভাব যেন যুক্ত হয়েছে।

প্রসাদ সাবধান করে দিয়ে গেছে, তবু মনোজ কথাটা উত্থাপনের লোভ সামলাতে পারল না। একটু দ্বিধা ও দোলাচলের পর বলল, মিস সোম, আমি যদি দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি তা হলে কি কিছু মনে করবেন?

সোনালি একটু অবাক হয়ে বলল, কী কথা?

একটু পারসোনাল।

পারসোনাল?

মানে রিগার্ডিং এ পার্সন।

পার্সনটি কে?

গোপীনাথ বসু।

হঠাৎ তার কথা কেন?

মনোজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, উই আর ইন এ জ্যাম। সর্ট অব জ্যাম। আমাদের প্রোডাকশন কিনে নিয়ে কেউ অন্যরকম কিছু কাজ করছে।

ও। কিন্তু এসবের সঙ্গে তো আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

হয়তো একটু আছে। কিন্তু সে-কথা পরে। আমাদের সমস্যাটার কথা একটু বুঝে দেখুন। আমাদের ধারণা হয়েছে এই অ্যালয় থেকে কেউ আরও কোনও একটা প্রফিটেবল জিনিস তৈরি করছে। সেটা করছে সাক্কি।

সোনালি গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে যাচ্ছিল। বলল, কিন্তু আমি কী করতে পারি?

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারত আদ্রেঁ। ইন ফ্যাক্ট, কাজটা সে-ই করছিল। কিন্তু আদ্রেঁ এখন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আদ্রেঁ ছাড়া আর যে

পারে সে হল গোপীনাথ বসু।

সোনালি হঠাৎ শুকনো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারি না।

মনোজ অপ্রতিভ হয়ে বলল, আই অ্যাম সরি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—

সোনালি সামান্য হাঁফ-ধরা গলায় বলল, দেখুন, আমি অফিসিয়াল কাজকর্মের বাইরে যেতে চাই না।

মনোজ বেকুবের মতো চেয়ে রইল। প্রসাদের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করাটা মস্ত ভুল হয়ে গেল হয়তো। বড্ড বোকা বোকা লাগল নিজেকে।

সোনালি বলল, আর কিছু বলবেন?

না না। আপনাকে ডিস্টার্ব করেছি বলে ক্ষমা করবেন।

সোনালি আর একটাও কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল।

মনোজ ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য এক কাপ কফি খেল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বিকেলের দিকে পিআরও সুব্রতর একটা ফোন এল।

স্যার, একটু আসতে পারি?

এসো।

সুব্রত এল। ছেলেটিকে মনোজের বেশ পছন্দ। স্মার্ট, চটপটে, হাসিখুশি। বসে হাসিমুখে বলল, আপনি কি কারও সম্পর্কে কোনও ইনফর্মেশন চান?

বুঝতে না পেরে মনোজ বলল, কার কথা বলছ?

সুব্রত সামান্য দ্বিধা করে বলল, শুনলাম আপনি গোপীনাথ বসুর ইনফর্মেশন চাইছেন।

মনোজ বলল, চাইছিলাম। কিন্তু তোমাকে কে বলল?

মিস সোম।

মনোজ অবাক হয়ে বলে, মিস সোম। আশ্চর্য! উনি তো মনে হল, গোপীনাথ প্রসঙ্গে অসন্তুষ্টই হলেন।

সুব্রত মাথা নেড়ে বলল, শি হ্যাজ হার গ্রাজ।

তা তুমি কী জানো?

আমি বলতে এসেছি যে, গোপীনাথ বসু টেলিফোনে অ্যাভেলেবল নন।

কেন, ওঁর টেলিফোন নেই?

আছে। কিন্তু উনি একটা ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আছেন।

তুমি কী করে জানলে?

গোপীনাথ বসুকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি আর দাদা বলে ডাকি।

ওঃ, দ্যাটস গুড। কিন্তু বিপদের কথা কী বলছিলে?

উনি একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। আপাতত, ওঁর প্রাণসংশয়।

মনোজ একটু ভাবল। গোপীনাথ বসুকে সে ব্যক্তিগতভাবে চেনে না, সুতরাং তার বিপদে বিচলিতও সে হচ্ছিল না। সে বলল, বিপদটা কীরকম এবং কেন তা জানো?

খানিকটা জানি। ভিকিজ মব নামে একটা গুন্ডার দল ওঁকে চেজ করছিল। তারপর সাক্কির কর্তারাও ওঁর পিছনে মাফিয়া লাগিয়েছে।

কিন্তু কেন?

কারণ হল আদ্রেঁর মৃত্যু এবং তার গবেষণার কাগজপত্র। গোপীদা সেগুলো নিরাপদে রাখতে গিয়ে উলটে বিপদে পড়ে গেছেন।

মনোজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেঁচে আছেন কি না জানো? যেরকম গুন্ডার কথা বলছ তাতে তো মনে হচ্ছে মর্টাল ডেনজারের মধ্যে আছেন।

হয়তো তাই।

মনোজ কাধ একটু ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি আমার হয়ে সোনালিকে বোলো যে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছি বলে আমি দুঃখিত।

ঠিক আছে স্যার, বলে দেব।

সুব্রত চলে যাওয়ার পর ঘড়ি দেখে মনোজ তার ফোন তুলে নিয়ে সোজা রোমের একটা নম্বর ডায়াল করল নোটবই দেখে।

কিছুক্ষণ পর একটা গমগমে গলা ফোনে ভেসে এল, হ্যালো... হ্যালো...হ্যালো...

মনোজ একটু হাসল। জার্মান ভাষায় বলল, গলাটা নামাও মার্ক।

মার্ক বলল, আরে সেন নাকি? কী খবর?

খবর ভাল নয়। আমাদের একটা বাজে সময় যাচ্ছে।

সেরকম তো সকলেরই হয়। ও কিছু নয়।

শোনো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

বলে ফেলো।

তুমি সাক্কির একজন মস্ত কর্তা। খবরটা তোমার জানা উচিত।

কী খবর?

তোমাদের একজন সায়েন্টিস্ট আছে, গোপীনাথ বসু। চেনো?

কে না চেনে? সবাই চেনে। বিগ ম্যান।

তার কী খবর?

কেন, খবর তো ভালই হওয়ার কথা।

সে কি অফিসে আসে?

এক মিনিট ধরে থাকো। খবর নিয়ে বলছি।

মনোজ ধরে রইল।

একটু বাদে মার্ক বলল, না আসেনি আজ।

গতকাল কি এসেছিল?

না। মনে হচ্ছে ছুটি নিয়ে কোথাও গেছে। ওর বাড়িতে রিং করে দেখতে পারো।

তাতে লাভ নেই। তুমি আরও একটু খোঁজ নাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি। রাতে আমাকে আমার বাড়িতে ফোন করে খবরটা জানাও জরুরি।

ঠিক আছে।

মনোজ তার কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে ফিরে ডিনার খেয়ে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ মার্কের ফোন এল।

কী জানতে চাও?

মনোজ বলল, সবকিছু।

সবকিছু আমি জানি না। তবে আমি অফিশিয়াল সোর্সে খবর নিয়ে জেনেছি যে, সে বাড়িতে নেই, অফিসে আসছে না।

আনঅফিসিয়ালি কী জানো?

সেটা তোমাকে আনঅফিশিয়ালি বলছি। লোকটা খুব সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ছিল।

ছিল? পাস্ট টেন্স?

হাঁ। পাস্ট টেন্স। আমার সঙ্গে রোমের আন্ডারওয়ার্ল্ডের যোগাযোগ আছে। আমি তাদের কাছে জেনেছি, মিস্টার বোস অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে একটা প্রায় অসম্ভব অবস্থা থেকে পালিয়ে গেছে। নইলে মাফিয়া আর ভিকিজ মব তাকে প্রায় শেষ করে এনেছিল।

মাই গড! পালাল কীভাবে?

বোধহয় কারও সাহায্যে। আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। জানি না।

তোমাকে ধন্যবাদ। শোনো, গোপীনাথ বসুকে আমার খুব দরকার। কোনও খবর পেলে জানাবে?

জানাব। তবে সে বোধহয় সাক্কিতে ফিরবে না। সেটা সম্ভব নয়। সাক্কি চারদিকে ওকে খুঁজছে। এটাও আনঅফিশিয়াল।

১৩.

রুমিং হাউস থেকে বেরিয়ে এসে যখন সামনের চাতালে একটা লাল টুকটুকে ছোট্ট স্পোর্টস কারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল গোপীনাথ, তখন তার বাঁ হাত ধরে যুবতীটি বারবার ঢলে পড়ছে তার গায়ে, ভীষণ মজার কথা বলছে এবং হাসছে। তারও হাসা এবং কিছু কথা বলা উচিত। কিন্তু গোপীনাথ কিছুতেই হাসতে পারছে না।

গোপীনাথ ভিতু নয়। বরং অত্যন্ত সাহসী। কিন্তু গত কয়েক দিনের কিছু ঘটনা তার ভিতরটাকে একেবারে নির্জীব করে ফেলেছে। আদ্রেঁর মৃত্যু এবং তার কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্কির অতি-উৎসাহ। তার ওপর সোনালির শীতল প্রত্যাখান। গোপীনাথের ভিতরে একটা ভাঙচুর হয়েই গেছে। তাই সে যেন নিজের বশে ছিল না। যুবতীটি যথেষ্ট ভাল অভিনয় করছিল, কিন্তু গোপীনাথ পারছিল না। সে এর সঙ্গে কেন যাচ্ছে, কেন এরা তাকে ছদ্মবেশ পরিয়েছে কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। সে তাই অভিনয়ও করছিল না।

চাতালটা স্বাভাবিক। দু-চারটে গাড়ি পার্ক করা। দু-চারজন লোক এধারে ওধারে। কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।

মেয়েটা গাড়ির দরজা খুলল। গোপীনাথ বাকেট সিটে বসে পড়ল নির্বিকারভাবে। মেয়েটা স্টিয়ারিং ধরে বসল। খুব স্বাভাবিকভাবেই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ধীর গতিতে ফটক পেরিয়ে বা ধারের রাস্তা ধরল।

গোপীনাথ ইতালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কোথাও যাচ্ছি। চুপ করে থাকো।

তুমি কে?

লুসিল।

তুমি কার লোক?

তার মানে?

ও লোকটা কে?

লুসিল একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার বস।

লোকটা বাঙালি?

হ্যাঁ।

বস মানে কী? তোমরা কি সরকারি লোক?

না।

তা হলে তোমরা আসলে কারা?

সে কথা বস হয়তো তোমাকে কখনও বলবে। এখন চুপ করে থাকো। আমার মনে হচ্ছে, একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে।

গোপীনাথ আয়নার দিকে চেয়ে বলল, কোন গাড়িটা?

একটা কালো সিত্রঁন।

গোপীনাথ কিছুক্ষণ গাড়িটাকে লক্ষ করল আয়নায়। মেয়েটা কয়েকটা মোড় ফিরল ইচ্ছে করেই। গাড়িটা লেগে রইল পিছনে। গোপীনাথ মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ, গাড়িটা পিছু নিয়েছে। তুমি কি পারবে ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে?

মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর। লম্বাটে, মেদহীন, নমনীয় চেহারা। ব্যালেরিনার মতো দেখতে। মুখখানাও বেশ সুন্দর। কিন্তু এসব ব্যাপারে কতখানি দক্ষ তা বোঝা যাচ্ছে না। গোপীনাথ বলল, শোনো সুন্দরী লুসিল, অত বেশি পাক খেয়ো না। তা হলে ওরা জানতে পারবে যে তুমি ওদের অস্তিত্ব টের পেয়েছ।

তা হলে কী করতে হবে?

স্বাভাবিক গতিতে চালাও। টাইবার নদীর দিকে চলল। ওদের বুঝতে দাও, আমাদের পালানোর কিছু নেই।

মেয়েটা মৃদু একটু হেসে বলল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তোমাকে ওই জয়েন্ট থেকে বের করে আনতে আমাদের অনেক মেহনত আর ঝুঁকি গেছে। একটা বোকামির ফলে ঘটনাটা কেঁচে গেলে সর্বনাশ।

কিন্তু তুমি গাড়িটা নাটকীয়ভাবে চালিয়ো না। যে-কোনও একটা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ চালাও। তোমার যদি ব্যাক আপ থেকে থাকে তবে কার-টেলিফোনে তাকে খবর দাও। যদি গাড়ি সুইচ করার ব্যবস্থা থাকে, তবে ভালই। না হলে একটু মুশকিল আছে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে দু-তিনটে গাড়ির ব্যবস্থা রাখা ভাল।

মেয়েটা একবার গোপীনাথের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, তোমার কি এরকম সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার অভিজ্ঞতা আছে?

গোপীনাথ ম্লান একটু হেসে বলল, আমি নিরীহ একজন প্রযুক্তিবিদ মাত্র। আমি বিপজ্জনক জীবন যাপন করি না। তবে এরকম কয়েকটা বিপদে আমাকে পড়তে হয়েছে। শোন, রোম আমার ভীষণ চেনা শহর। তুমি স্টিয়ারিং আমার হাতে দাও। হয়তো তোমার চেয়ে আমি সিচুয়েশনটা একটু বেশি সামাল দিতে পারব।

কীভাবে সামাল দেবে? তোমার ইগো তো খুব স্ট্রং দেখছি।

ইগো নয়। অস্তিত্বের সংকট থেকে আমি কিছু বেশি দক্ষতার অধিকারী।

তুমি চুপ করে বসে থাকো। এটা তোমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। তুমি অতিথি।

তারা রোমের প্রধান সড়কগুলিতেই মাঝারি গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। একটু পিছনে সিত্রঁন গাড়িটা। সামনের সিটে দু'জন কালো সুট পরা লোক বসে আছে। দু'জনেরই কালো টুপি কপাল পর্যন্ত ঢাকা। দু'জনেরই চোখে কালো চশমা।

গোপীনাথ বলল, তুমি বোধহয় তেমন ভয় পাওনি।

আমি অকারণে ভয় পাই না।

অকারণে?

এখন পর্যন্ত তো তাই। ওরা পিছু নিয়েছে, কিন্তু এখনও অবধি তোমাকে ছিনতাই করার তো চেষ্টা করেনি।

করলে?

দেখা যাবে।

লুসিল, আমার একটু টয়লেটে যাওয়া দরকার।

টয়লেট! মাই গড!

খুবই দরকার।

দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন টয়লেটে যাওয়া মানেই হল—

প্লিজ! কতগুলো ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক চলে না।

বুঝতে পারছি।

মেয়েটা হঠাৎ বাঁ ধারে একটা রাস্তায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে স্পিড বাড়িয়ে দিল। বলল, তুমি কোনও ফন্দি করছ নাকি?

না। আমার যা অবস্থা, ফন্দি করে লাভ নেই।

একটা ছোট হোটেলের চত্বরে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল লুসিল। বলল, চলো।

গোপীনাথ গম্ভীর মুখে নামল। তার বাথরুম পায়নি এবং সে সত্যিই একটা প্ল্যান করেছে। সেটা কতদুর ফলপ্রসূ হবে তা সে জানে না।

লুসিল তাকে সোজা রিসেপশনের পিছনে টয়লেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, পালানোর চেষ্টা করবে না তো! করে লাভ নেই। এটা আমার কাকার হোটেল। চারদিকেই আমাদের লোক।

গোপীনাথ মৃদু হেসে বলল, তোমার মতো সুন্দরীকে ছেড়ে পালায় কোন আহাম্মক?

টয়লেটে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল গোপীনাথ। বাস্তবিক সে কোথায় যাবে এবং কী করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু তার মনে হচ্ছে–কিংবা বলা যায় মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি হচ্ছে–সে আর একটা জালে জড়িয়ে পড়ছে না তো?

টয়লেটের আয়নায় নিজের ছদ্মবেশে ঢাকা চেহারাটা দেখে সে একটু আঁতকে উঠল। এরকম অদ্ভুত ছদ্মবেশ তাকে কেন পরানো হল কে জানে? এরকম ছদ্মবেশ বরং লোকের দৃষ্টি বেশিই আকর্ষণ করে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল গোপীনাথ। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘুরে চেয়ে অবাক হয়ে দেখল, একটা বেঁটে এবং স্বাস্থ্যবান ইতালিয়ান যুবক তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গোপীনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, কী চাও?

তুমি একটু বেশি সময় নিচ্ছ।

তাতে কী? আমার কোথাও যাওয়ার তাড়াহুড়ো নেই। তুমি কে?

আমি লুসিলের জ্ঞাতি ভাই। আমরা তোমাকে পালাতে সাহায্য করছি।

গোপীনাথ একটা শ্বাস ফেলে বলল, তা হয়তো করছ, কিন্তু তোমাদের সব কাজই কাঁচা এবং অ্যামেচারিশ। আমাদের ফলো করে এসেছে একটি সিত্রঁন গাড়ি,

লুসিল সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। তার ওপর কোথাও গাড়ি সুইচ করার ব্যবস্থা রাখেনি। আমাকে এরকম কাফ্রি সাজানোরই বা মানে কী?

ওসব আমরা জানি না। আমাদের যা করতে বলা হয়েছে আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে করেছি।

এই অপারেশনটা করাচ্ছে কে?

আমাদের বস।

তোমরা কারা?

হয়তো তোমার বন্ধু।

গোপীনাথ কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, নির্বোধের বন্ধুত্বের চেয়ে বুদ্ধিমানের শত্রুতাও ভাল। তোমরা আমাকে বের করে এনেছ কি খোলা ময়দানে খুনির সামনে এগিয়ে দেওয়ার জন্য?

আমাদের বস যদি তাই চান তবে তাই হবে।

তোমাদের বসের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। কে তোমাদের বস?

বিগ ম্যান। এখন চলে এসো, আমাদের অনেক জায়গায় যেতে হবে।

গোপীনাথকে নিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে এল। বাইরে মেয়েটা রিসেপশনের চেয়ারে বসে মন দিয়ে কিছু নোট করছে। একবার চোখ তুলে তাকাল। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভয় পেয়েছ নাকি?

না। তবু দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মেয়েটি হেসে বলল, ওই সিত্রঁন গাড়িটা ওখানে পার্ক করা আছে। ওতে যারা ছিল তারা আমাদেরই লোক। ব্যাক আপ কথাটা বোঝো। ওরা হল আমাদের ব্যাক আপ। এখন ওরা। ডাইনিং হলে বসে কফি খাচ্ছে।

গোপীনাথ একটু বেকুব হয়ে গেল। বলল, এরপর আমরা কোথায় যাব?

সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত এই হোটেলেই একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

গোপীনাথ একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচা গেল। এবার কি আমি আমার মুখের মেক-আপ তুলতে পারি?

পারো। কিন্তু জানালা দিয়ে বেশি উকিঝুঁকি মেরো না। তোমার খোঁজখবর হচ্ছে। জুতো জামা পরেই থেকো, যে-কোনও সময়ে পাঁচ মিনিটের নোটিসে রওনা হতে পড়তে পারে। লুইজি, বোসকে তার ঘরে নিয়ে যাও।

লুইজি হল বেঁটে ছেলেটা। গোপীনাথকে লিফটে করে চারতলায় এনে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে গেল, রুম সার্ভিস চালু আছে। খাবার বা পানীয় ঘরেই আনিয়ে নিয়ো। ঘরের বাইরে না যাওয়াই নিরাপদ। আর হ্যাঁ, এ ঘরে কিন্তু টেলিফোন নেই। শুধু ইন্টারকম।

গোপীনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, কেন নেই?

নিরাপত্তার কারণে। টেলিফোন কল ট্রেস ব্যাক করা যায়। ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?

গোপীনাথ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মেক আপ তুলল। জামাকাপড় বদলানোর উপায় নেই। তাই ঘরের বিছানায় জামাকাপড় সমেত শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, ওই বাঙালিটি নিছক তাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য এতটা ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে এনেছে। বরং এর পিছনে আর একটা চক্র যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। এত তাড়াতাড়ি সবাই স্বার্থের গন্ধ কী করে টের পেয়ে গেল তা বুঝতে পারছে না গোপীনাথ।

কিন্তু এই গণ্ডিবদ্ধ জীবনটাও তার ভাল লাগছে না। তাকে ঘিরে, তাকে নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটছে যেগুলোর ওপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এটাই বা সে মেনে নেবে কী করে?

ঘণ্টাখানেক বাদে সে রুম সার্ভিসকে ডাকল ইন্টারকমে। বেশ রাজসিক একটা লাঞ্চের অর্ডার দিল। যতদূর সম্ভব এদের ঘাড় ভাঙা যাক।

লাঞ্চ আসতে সময় লাগল প্রায় চল্লিশ মিনিট। সত্যিই এলাহি লাঞ্চ। তিনজন ওয়েটার তিনটে ট্রে-তে বয়ে আনল। ইতালিয়ান আর ফরাসি খাবার।

গোপীনাথ খেল। ফেললও অনেক। এত খাওয়া একজনের পক্ষে তো সম্ভব নয়।

লাঞ্চের পর সে একটু ঘুমিয়ে নিল। ঘুমের মধ্যে সে নানা ধরনের অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নগুলোর কোনও মানে হয় না। অসংলগ্ন প্রলাপের মতো।

সন্ধের পর দরজায় টোকা পড়ল। সাড়া দিতেই লুইজি এল ঘরে। তার হাতে একটা সুটকেস।

এটা কী?

তোমার জিনিসপত্র। সবই নতুন কেনা হয়েছে।

গোপীনাথ অবাক হল। এরা তার পিছনে যথেষ্ট খরচ করছে। পরে সুদে আসলে তুলবে বোধহয়।

লুইজি সুটকেসটা বিছানায় রেখে ডালা খুলে দিয়ে বলল, দেখে নাও। পাজামা-সুট থেকে শুরু করে সবকিছু আছে। শেভিং সেট, কোলন, সবকিছু।

ধন্যবাদ। রুমিং হাউসে আমার অনুপস্থিতি কি ধরা পড়েছে?

যতদুর জানি, এখনও কেউ টের পায়নি। ল্যান্ডিং-এর পাহারা বদল হয়েছে। তবে বেশিক্ষণ আর নয়। টের পেল বলে।

আজকাল পেশাদার গুন্ডারা এত অসাবধানি হয়, জানা ছিল না।

লুইজি একটু হাসল। বলল, আমাদের চালাকিটা এতই ছোট আর সাধারণ যে, ওরা এরকম ঘটতে পারে বলে ভাবতেই পারেনি। বাই দি বাই, তুমি কি বেনভেনুটিকে চেনো?

কে বেনভেনুটি?

তোমাকে যে দু’জন পাহারা দিচ্ছিল তাদের একজন।

সে আসলে কে?

বেনভেনুটি একসময়ে দুরন্ত বক্সার ছিল। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রাইজ ফাইটিং-এও দুনিয়া কাপিয়ে দিয়েছিল।

বক্সিং! ওঃ হ্যাঁ, নামটা শুনেছি বটে।

আমি ওর খুব ফ্যান। দুঃখের বিষয়, বেনভেনুটি এখন একজন মাফিয়া ডনের হয়ে গুন্ডামি করে বেড়ায়। প্রতিভার কী অপচয়।

গুন্ডামি করে কেন?

কপাল। রোমের একটা নাইট ক্লাবে মারপিট করে একটা লোককে খুন করে বসেছিল। জেল তো হতই, ফাঁসিও হতে পারত। সেই সময় বেনভেনুটি ডনের কাছে আশ্রয় নেয়। বক্সিং আর পারত না। তবে গুন্ডামিটাই এখন ওর রুজি রোজগার।

তুমি কি ওর খুব ভক্ত?

লুইজি হাসল, খুব। আমিও বক্সার। যে-কোনও বক্সারই জানে বেনভেনুটির মধ্যে কী সাংঘাতিক সম্ভাবনা ছিল। আমাদের স্বপ্নের মানুষ। তোমার সৌভাগ্য যে ওরকম একটা লোক তোমায় পাহারা দিচ্ছিল।

বেনভেনুটি কার হয়ে কাজ করছিল জানো?

না। তবে ও ভিকিজ মব-এর লোক নয়।

তা হলে কি সাক্কির?

হলেও হতে পারে।

লুইজি, আমি অনেক কিছুই জানি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করো।

সকালে একজন বাঙালি আমাকে উদ্ধার করে। সে কে?

লুইজি অবাক হয়ে বলে, ও তো দাতা।

দাতা!

হ্যাঁ। ওই তো দাতা। আমাদের বস।

১৪.

শুভ আর মৈত্রেয়ী এয়ারপোর্টে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আজ রোজমারি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরবে।

রোজমারি প্রায়ই সিঙ্গাপুর যায়। ওখানে ওর এক বোন থাকে, তার স্বামী আন্তর্জাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা। বোনও ওই কোম্পানিরই একজিকিউটিভ। সিঙ্গাপুরে রোজমারির কিছু কেনাকাটাও থাকে। মাসে বা দু'মাসে একবার কয়েক দিনের জন্য তার সিঙ্গাপুরে যাওয়া চাই-ই।

শুভ বলছিল, আচ্ছা, রোজমারি দুনিয়ার সব বড় শহরেই তো যায়, তবু সিঙ্গাপুর ওর এত প্রিয় কেন বলো তো!

মৈত্রেয়ী বলল, কে জানে বাবা, আমার তো মনে হয় ওর বোনের বাচ্চাকে বোধহয় ভালবাসে, নিজের তো নেই। তাই ঘনঘন বোনের কাছে যায়।

যাঃ, ওটা কোনও কারণ হতে পারে না। একটা বাচ্চাকে ভালবাসে বলেই দু'দিন পর পর এক কাঁড়ি টাকা গচ্চা দিয়ে এত দূর যায় কখনও?

সিঙ্গাপুর আর কী এমন দূর। আর টাকাটা আমাদের হিসেবে অনেক হলেও রোজমারির কাছে কিছুই নয়। ওর বোনপোটাকে খুব ভালবাসে রোজমারি। গতবার খ্রিসমাসে এসেছিল, কী ফুটফুটে দেখতে। খুব চটকাতে ইচ্ছে করছিল।

আমার মনে হয় বাচ্চা ছাড়াও অন্য কারণ আছে।

আছেই তো। মার্কেটিং। সিঙ্গাপুর থেকে কত কী নিয়ে আসছে প্রতি মাসে।

শুভ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, দেখো মৈত্রেয়ী, রোজমারির অনেক টাকা। কিন্তু কখনও বেহিসেবি নয়। রোজমারি কখনও কোনও ফ্যান্সি সেন্টিমেন্টের জন্য

টাকার অপচয় করবে না। আমি রোজমারিকে কৃপণ বলছি না, কিন্তু ভীষণ হিসেবি।

তোমার অত মাথা ঘামানোর দরকার কী? তুমি তো আর গোয়েন্দা নও। বেশ করে সিঙ্গাপুরে যায়। এর পরের বার আমাকেও সঙ্গে নেবে বলেছে।

তাই বলো! সেইজন্যই রোজমারির পক্ষ নিচ্ছ। কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখো।

আচ্ছা, একজন মানুষ ঘনঘন সিঙ্গাপুর যায়–এর মধ্যে ভেবে দেখার কী আছে বলো তো! তুমি একটু বেশ অদ্ভুত আছ কিন্তু।

শুভ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো করে বলল, ভাগ্যিস তুমি বক্কেশ্বরের কথা জানো না।

মৈত্রেয়ী ভ্রু কুঁচকে বলল, বক্কেশ্বর। সেটা আবার কে?

একটা বেঁটে মতো লোক। বেশ ফরসা আর টাইট চেহারা। খুব স্মার্ট।

সে আবার কে?

সে-ই বক্কেশ্বর।

তার মানে?

শুভ একটুও না হেসে বলল, গত চারবার লোকটাকে লক্ষ করেছি।

কোথায় লক্ষ করেছ?

শুভ বলল, আমার ভিতরে বোধহয় একজন ন্যাচারাল গোয়েন্দা আছে। লক্ষ করা এবং ডিডিউস করা আমার ভীষণ প্রিয় পাসটাইম।

থাক, আর নিজের সম্পর্কে অত সার্টিফিকেট দিতে হবে না। লোকটা কে?

তার আমি কী জানি।

এই যে বললে বক্কেশ্বর!

ওঃ, নামটা আমিই দিয়েছি। কেন যে লোকটাকে দেখলেই আমার বক্কেশ্বর নামটা মনে আসে।

কিন্তু লোকটাকে নিয়ে ভাবছ কেন?

ভাবছি কে বলল? আমি ভাবছি রোজমারিকে নিয়ে।

তা হলে বক্কেশ্বরবক্কেশ্বর করছ কেন?

গত চার মাসে রোজমারি যতবার সিঙ্গাপুরে গেছে ততবারই একই ফ্লাইটে বক্কেশ্বরও গেছে।

মৈত্রেয়ী প্রথমটায় একটু অবাক হলেও সামলে নিয়ে হাসল। সে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে। বলল, গত চার মাসে রোজমারি সিঙ্গাপুর গেছে মোট তিনবার।

তিনবার?

পাক্কা হিসেব। চার মাসে তিনবার সিঙ্গাপুরে যাওয়াটা বড় কথা নয়। সিঙ্গাপুরে আরও অনেকেই আরও বেশি ঘনঘন যায়। অনেকেরই বিজনেস ইন্টারেস্ট আছে। আমাদের এক কাকু আছেন, যিনি প্রতি সপ্তাহে হংকং যান। বুঝেছ?

হ্যাঁ। এটা আমার মাথায় খেলেনি।

সুতরাং তোমার গোয়েন্দাগিরিটা জলে গেল।

তুমি বলছ বক্কেশ্বরও খুব ঘনঘন সিঙ্গাপুর যায় এবং গত চারবার রোজমারির সঙ্গে তার সিঙ্গাপুর যাওয়াটা কোনও সন্দেহজনক ঘটনা নয়?

ঠিক তাই। তবু লোকটাকে আমি দেখতে চাই।

শুভ যেন খুব লজ্জিত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, আসাটাও তাই?

তার মানে?

লোকটা

শুধু যায় না, আসেও।

একই ফ্লাইটে?

অবশ্যই।

মৈত্রেয়ী শুভর দিকে চেয়ে বলল, ইউ মাস্ট বি কিডিং।

শুভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ মুখ করে বলল, আমার দুঃখটা কী জানো?

কী?

তোমারও দু'খানা ড্যাবডেবে চোখ আছে। সে দুটোকে মাশকারা, কাজল ইত্যাদি দিয়ে সেবাও কম দাও না। কিন্তু সে দুটোর আসল কাজটায় কেন যে এত ফাঁক থাকে!

তুমি শুধু ফাজিলই নও, অসভ্যও। সাজগোজ নিয়ে কথা বলা এটিকেট নয়।

শুভ নিপাট ভালমানুষের মতো বলল, সাজতে কেউ বারণ করেনি। বারণ করলেই বা শুনছে কে? আমি বলছি ভগবানের দেওয়া ইন্দ্রিয় সকলের সদ্ব্যবহার করা উচিত। চোখ শুধু কটাক্ষ করার জন্য তো নয়, পর্যবেক্ষণও তার আর একটা কাজ।

আহা, আমি বুঝি তোমার চেয়ে কম অবজার্ভ করি? তুমিই তো বরং গত শুক্রবার রাস্তা পেরোনোর সময় স্কুটারের ধাক্কা খেয়েছিলে।

আচ্ছা, লেট আস মেক পিস। কথা হল, গত চারবার রোজমারির ফ্লাইটে আমি লোকটাকে যেতে এবং আসতে দেখেছি। রোজমারির সঙ্গে লোকটার আলাপ নেই, কেউ কাউকে চেনে বলেও মনে হয় না। না, একটু ভুল হল। রোজমারি চেনে বলে মনে হয় না। কিন্তু লোকটা সম্পর্কে আমি শিয়োর নই।

রহস্য পুষে না রেখে রোজমারিকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।

অবাক হয়ে শুভ বলল, কেন জিজ্ঞেস করব? কিছু তো ঘটেনি। জাস্ট কো-ইনসিডেন্স।

কিছুই যদি ঘটেনি তা হলে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

দুটো কারণে। রোজমারিকে সম্প্রতি ভুল জন্মদিনে লাল গোলাপ পাঠানো এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের আচমকা গুরুত্ব বৃদ্ধি। আমার মনে হচ্ছে ম্যাডাম রোজমারির আরও একটু সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে।

রোজমারিকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। উনি নিজের দেখভাল ভালই করতে পারেন।

শুভ একটু চুপ করে থেকে মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে বলল, তোমার কি সত্যিই তাই মনে হয়?

মৈত্রেয়ী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এই তো বলছ তেমন ঘটনা কিছু ঘটেনি বলে রোজমারিকে কিছু বলোনি। আবার বলছ রোজমারির সতর্ক হওয়া দরকার।

শুভ কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে বলল, আমার দোষ কী জানো? কাউকেই কিছু ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। সেইজন্যই না বিদিশা কোনওদিন আমার ভালবাসা টেরই পেল না। বিয়ে করে বসল একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্টকে।

মৈত্রেয়ী হেসে ফেলে বলল, আর ইয়ারকি করতে হবে না। বিদিশার গল্পটা পুরো গুল।

শুভ মাথা নেড়ে বলল, গুল! বলো কী? আমার আজও তার জন্য কী ভীষণ কষ্ট হয়। অথচ সে তো অপ্রাপ্য ছিল না। শুধু একটু বুঝিয়ে বললেই হত।

মৈত্রেয়ী হেসে বলল, আমি বিদিশা নই। বুঝতে পারি।

কী বুঝতে পারো?

তুমি একটু বোকা আর একটু পাগল। যা বলছিলে বলো।

শুনবে? বোরিং নয় তো!

বোরিং হবে কেন? এ তো রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের গল্প।

গল্প হবে কেন? একটা হাইপোথেসিস বলতে পারো, বেসড অন সলিড ফ্যাক্টস।

কিন্তু ফ্যাক্টগুলো এলোমেলো, ক্যাওটিক।

তাও ঠিক। প্রথম অবস্থায় প্যাটার্নটা বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হচ্ছে, রোজমারি ইজ বিয়িং টেইলড। এভরিহোয়ার।

রোজমারিকে ফলো করে কী হবে?

সেইজন্যই তো সিঙ্গাপুর যাওয়াটার একটা ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম। রোজমারি একটা বাচ্চাকে আদর করতে প্রায়ই সিঙ্গাপুর যাচ্ছে, আর আর-একটা লোক কাজকর্ম ফেলে এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে তাকে ফলো করছে, এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকছে।

বাড়াবাড়িই তো। লোকটা মোটেই রোজমারিকে ফলো করছে না। সে যাচ্ছে নিজের কাজে। তোমার উর্বর মাথা বাকিটা বানিয়ে নিচ্ছে।

শুভ চিন্তিতভাবে চেয়ে রইল মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে। তারপর বলল, সে যাই হোক, আজ রোজমারির সঙ্গে তার গাড়িতে তুমিই যাবে। আমি মোটরবাইক এনেছি।

হ্যাঁ, সেটাও জিজ্ঞেস করা হয়নি তোমাকে। মোটরবাইক এনেছ কেন?

আমি বক্কেশ্বরকে ফলো করব।

মৈত্রেয়ী চোখ বড় করে বলল, বলো কী? তোমার কী দরকার লোকটাকে ফলো করার?

কারণ আছে। আই ওয়ান্ট টু নো।

শোনো শুভ, মোটরবাইক তুমি সবে কিনেছ। এখনও হাত সেট হয়নি। পাগলামি কোরো না।

তুমি কি জানো নলেজ জিনিসটা মানুষের মস্ত বড় হাতিয়ার?

এটাকে নলেজ বলে না শুভ, বড়জোর ইনফর্মেশন বলা যায়।

ইনফর্মেশনও নলেজ। তবে ছোট মাপের, এই যা।

বাড়াবাড়ি কোরো না শুভ। পুলিশের কাছে বলে দিলে তারাই হয়তো লোকটার খোঁজ করবে।

পুলিশ কেন ইন্টারেস্ট নেবে? লোকটা তো এখনও কোনও ক্রাইম করেনি। এমনকী একমাত্র রোজমারির পিছু পিছু সিঙ্গাপুর যাওয়া-আসা ছাড়া বিশেষ কোনও সন্দেহজনক কাজও করেনি।

ওঃ, তোমার সঙ্গে কিছুতেই পারা যায় না।

শুভ একটু হাসল, রোজমারি আমার বস, তার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আমার নয়। কিন্তু রহস্যের গন্ধ পেলে আমি কেন যেন একটু চনমনে হয়ে উঠি। ছেলেবেলা থেকে ডিটেকটিভ বই আর থ্রিলার পড়ে পড়েই বোধহয় এরকমটা হয়েছে।

বুঝেছি। এখন খোঁজ নাও তো, ফ্লাইট এত দেরি করছে কেন? ল্যান্ড করার শিডিউল টাইম তো ঘণ্টাখানেক আগে পেরিয়ে গেছে।

আধ ঘণ্টা লেট তো ছিল। হয়তো আরও একটু বেড়েছে। ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। ফ্লাইট যখন আসবার আসবে। আমাদের কাজ হল অপেক্ষা করা।

তা হলে চলো, গাড়িতে গিয়ে বসি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গেল। এরা যে কেন লাউঞ্জে আমাদের ঢুকতে দেয় না।

এ দেশের প্রশাসন খুবই নির্বোধ। সিকিউরিটির অজুহাতে আজকাল ভিতরে ঢুকতে দেয় না, কিন্তু আদতে সিকিউরিটি ব্যাপারটায় হাজার ফুটো। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, ইচ্ছে করলে এই আমিই কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে যে-কোনও প্লেন হাইজ্যাক করতে পারি? কিংবা পারি যে-কোনও প্লেনে এক্সপ্লোসিভ লোড করে দিতে?

থাক বাবা, তোমাকে আর ওসব পারতে হবে না। তবে কথাটা হয়তো মিথ্যে বলোনি। পাবলিককে লাউঞ্জে ঢুকতে না দিয়ে খুব একটা কাজের কাজ কিছু হয়নি।

তারা ফিরে এসে পার্কিং লটে রাখা গাড়িতে বসে রইল। স্টিয়ারিং-এ অতীব বিশ্বস্ত শিউশরণ। গম্ভীর, মিতবাক শিউশরণ খুবই ঠান্ডা মানুষ। এরকম কর্তব্যপরায়ণ ও

প্রভুভক্ত লোক বিশেষ দেখা যায় না। স্টিয়ারিং-এর পিছনে বসে সে একখানা নাম-কিতাব পড়ছে। বইখানা মজার। ওতে কেবল একটি বীজমন্ত্র পর পর ছাপা আছে। বইটা পড়ে যাওয়া মানেই জপ করে যাওয়া। শিউশরণ অবসর পেলেই বইখানা খুলে বসে যায়। শুভ আর মৈত্রেয়ী যখন গাড়িতে উঠে বসল তখন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দেখে নিল শিউশরণ। কোনও প্রশ্ন করল না, প্লেন দেরি কেন তা নিয়ে উদ্বেগ দেখাল না, নাম বই পড়ে যেতে লাগল শুধু।

মৈত্রেয়ী বলল, শুভ, তোমার বঙ্কেশ্বর কি পাজি লোক?

কে জানে! তবে সন্দেহজনক।

সত্যিই পিছু নেবে নাকি?

প্রয়োজন হলে। যদি দেখি, ওকে নিতে কোনও গাড়ি এসেছে তা হলে ফলো করব না। গাড়ির নম্বরটা টুকে নেব। পরে ট্রেস করা যাবে।

ট্যাক্সি নিলে?

অবশ্যই পিছু নেব।

কিন্তু তার আগে রোজমারিকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভাল, লোকটাকে সে চেনে কি না।

করেছি।

করেছ? কবে?

এর আগের বার। জিজ্ঞেস করেছিলাম এরকম ড্রেসক্রিপশনের কোনও লোককে সে চেনে কি না। রোজমারি আকাশ থেকে পড়ল। তুমি কি একটু টেনশন করছ আমি লোকটার পিছু নেব বলে?

মৈত্রেয়ী বলল, হ্যাঁ। রিস্ক নেওয়ার দরকারটা কী বুঝছি না।

এসব পরে বোঝা যাবে।

হঠাৎ শিউশরণ মুখ ঘুরিয়ে বলল, হাওয়াই জাহাজ নামছে।

মৈত্রেয়ী শুভ ব্যস্ত হল না। তারা জানে প্লেন নামলেও কাস্টমস ইমিগ্রেশন ইত্যাদিতে আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট কম করেও লাগবে। ধীরেসুস্থে নেমে তারা যখন টার্মিনালের দরজার বাইরে দাঁড়াল তখন খাড়া দুপুর। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল, সিঙ্গাপুর ফ্লাইটের যাত্রীরা ইমিগ্রেশনে জড়ো হচ্ছে এসে। তবে এত দূর থেকে কাউকে চেনা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ শুভ বলল, মৈত্রেয়ী, ওই যে বঙ্কেশ্বর!

মৈত্রেয়ী চমকে উঠে বলল, কোথায়? আসছে। ওর কোনও মালপত্র নেই, শুধু একটা ছোট ব্যাগ। ও আগে বেরিয়ে যাবে। তুমি রোজমারির জন্য থাকো।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, রোজমারি তোমাকে খুঁজবে যে! তিনটে বড় বড় সুটকেস আসছে, কে টানবে বাবা?

পোর্টার আছে। আমার সময় হবে না আজ।

টার্মিনালের গেট দিয়ে যে-লোকটা বেরিয়ে এল সে একটু বেঁটে সন্দেহ নেই, কিন্তু ফরসা টকটকে গায়ের রং। চুলগুলো একটু লালচে, মোটা লালচে গোঁফ। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। ঝকঝকে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক। পরনে জিন্স ও মেরুন রঙের টি শার্ট। লোকটা বেরিয়ে আসার পথে প্রি-পেইড ট্যাক্সি বুথে থেমে ট্যাক্সি বুক করল।

শুভ বলল, সরি মৈত্রেয়ী, আমাকে যেতেই হচ্ছে।

ওয়াইল্ড গুজ চেজ।

বোধহয় ব্যাপারটা ততটা কো-ইনসিডেন্স নয়। এনিওয়ে, গুডবাই...

কিন্তু রোজমারিকে কী বলব?

সত্যি কথাই বোলো। শি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড।

শুভ একরকম দৌড়ে গিয়ে তার মোটরবাইকে চেপে বসল। হেলমেট মাথায় বসিয়ে বাইক স্টার্ট দিল। ওদিকে বঙ্কেশ্বর ট্যাক্সির লাইন ধরে গিয়ে উদ্দিষ্ট

গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেল। বেশ ধীর-স্থির হাবভাব। মৈত্রেয়ী ভাবল, এত হ্যান্ডসাম একটা লোক কি খুব খারাপ লোক হতে পারে?

ট্যাক্সিটা ছাড়ল। বিশ গজ পিছনে শুভর বাইক। শুভ একবার বাঁ হাতটা তুলে তাকে একটা অস্পষ্ট সংকেত জানিয়ে চলে গেল।

হাই মৈত্রেয়ী! শুভ কোথায়?

মৈত্রেয়ী চমকে উঠল।

১৫.

কলকাতার রাস্তায় মধ্য দ্বিপ্রহরে একটা ট্যাক্সিকে অনুসরণ করা যে কত কঠিন তা বুঝতে একটুও দেরি হল না শুভর। কলকাতার রাস্তায় শয়ে শয়ে ট্যাক্সি। তার মধ্যে কেবল একটিকে লক্ষ রাখা যে কত কঠিন। শুধু নম্বর প্লেটটা ভরসা, তার ওপর মোটরবাইক চালানোর অভিজ্ঞতা শুভর খুব দীর্ঘ নয়। তাকে পেরিয়ে বহুট্যাক্সি, গাড়ি এবং অটোরিকশাও ট্যাক্সিটাকে আড়ালে ফেলে দিয়েছে। শুভ তবু প্রাণপাত করছিল। ভিআইপি রোডেই যদি এই অবস্থা হয় তা হলে শহরের ভিতরকার ঘিঞ্জি রাস্তা বা গলিঘুজিতে ঢুকলে কী হবে?

উলটোডাঙার মোড় অবধি অবশ্য ট্যাক্সিটাকে শেষ পর্যন্ত নজরে রাখতে পারল শুভ। তার পর থেকেই শুরু হল ভজঘট্ট। হাজারো গাড়ি, হাজারো বাইক আর স্কুটারের জঙ্গলে দিশেহারা শুভ যে কতবার দুর্ঘটনা থেকে বরাতজোরে বেঁচে গেল তার হিসেব নেই। বার কয়েক রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথেও উঠে পড়ল সে। ট্যাক্সিটা অবধারিত মানিকতলার মোড়ের দিকেই চলেছে। মোড়গুলোকেই ভয়। কোনদিকে বাঁক নেবে কে জানে। তাই বেশ কাছাকাছিই থাকতে হচ্ছিল তাকে। লক্ষ করল লোকটা একবারও পিছন দিকে তাকাল না। বেশ আয়েশ করেই বসে রইল। বাঁচোয়া।

মানিকতলা ছাড়িয়ে বিবেকানন্দ রোড। তারপর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের খাঁচাকল। তারপর ডানধারে মোড় নিয়ে সোজা এসে থামল পোদ্দার বিল্ডিং-এর কাছ বরাবর। ট্যাক্সি থামল। তারপর অলস ভঙ্গিতে নেমে ফুটপাথে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে যেন চারদিকটা খুব মেপেরুপে দেখল, ক্রিটিক্যাল আই।

শুভ বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে লক করল। তারপর ধীর কদমে লোকটার দশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। বক্কেশ্বর এখন কোনদিকে যায় সেইটেই সমস্যা।

বক্কেশ্বর তার দিকে তাকাল না। সোজা হেঁটে যেতে লাগল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের দিকে। ডানদিকে মোড় ফিরল। হাঁটতে লাগল। দুলকি চাল। কোনও তাড়া নেই। মিনিট পাঁচেক ভিড়ের রাস্তায় ডানধার ঘেঁষে হাঁটবার পর আচমকাই ডানধারে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল শুভ। সেও কি ঢুকবে? কাজটা উচিত হবে কি? অবশ্য এই অঞ্চলের বাড়িগুলির ভিতরে অসংখ্য অফিস, গুদাম এবং দোকান রয়েছে। ঢুকলেও কেউ কিছু সন্দেহ করবে না, সুতরাং দ্বিধার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে শুভও ঢুকল। কিন্তু ওই সামান্য দ্বিধা আর কালক্ষেপই সব গণ্ডগোল করে দিল।

বাড়ির ভিতরে ঘিঞ্জি সব দোকান, আড়ত এবং থিকথিক ভিড়। দিশাহারা পরিস্থিতি। শুভ সেই ভিড়ের মধ্যে বেদিশা হয়ে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করল। ডান ধারে একটা সরু সিঁড়ি পেয়ে সেটা বেয়ে ওপরেও উঠল সে। ওপরেও হাজার রকমের ব্যাবসা বাণিজ্যের আয়োজন। সর্বত্রই মানুষ আর মানুষ। কোথাও বক্কেশ্বরকে দেখা গেল না।

প্রায় চল্লিশ মিনিট ঘোরাঘুরি করার পর হতাশ হয়ে নেমে এল সে। একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটার নম্বর শুধু টুকে নিল সে। যদিও বুঝতে পারল, নম্বর নিয়ে কোনও লাভ নেই, এই বিশাল বাড়িতে অচেনা একটা লোককে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় উঁচ খোঁজার মতো ব্যাপার।

হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসে সে হাঁটতে হাঁটতে মোটরবাইকের কাছে ফিরে এল। ভাগ্য ভাল ইতিমধ্যে মোটরবাইকটা চুরি হয়ে যায়নি। নতুন কেনা মোটরবাইকটাকে নিয়ে সর্বদাই তার দুশ্চিন্তা থাকে।

যখন অফিসে ফিরে এল শুভ তখন তিনটে বেজে গেছে। তাকে দেখে মৈত্রেয়ী চোখ বড় বড় করে বলল, আর আধ ঘণ্টা দেরি হলেই পুলিশে খবর দেওয়া হত। রোজমারি তোমার ওপর খুব রেগে আছে ওরকম রিস্ক নিয়েছ বলে।

শুভ অপ্রতিভ হয়ে বলল, তুমি কি রোজমারিকে সব বলে দিয়েছ নাকি?

না বলে উপায় ছিল? কী অ্যাডভেঞ্চার করে এলে?

শুভ মাথা নেড়ে বলল, কলকাতা শহরটা ফলোটলো করার পক্ষে একদম স্যুটেবল নয়, লোকটা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে একটা বিরাট বাড়িতে ঢুকে হারিয়ে গেল।

তুমি যে ফলো করছিলে তা টের পেয়েছিল?

না, বোধহয় না।

এখন যাও, রোজমারি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বকাঝকা করবে নাকি?

করতেও পারে, যাও।

শুভ কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, আমি তো ওর ভালই করতে চেয়েছিলাম।

মৈত্রেয়ী একটু হেসে বলল, তা হলে ভয় পাচ্ছ কেন?

রোজমারি একতলার বাঁ হাতি উইং-এ বসে। তার এলাকাটা খুব সাজানো গোছানো। শুভ আর মৈত্রেয়ীর বসার জায়গা উইংটার মুখে। রোজমারির ঘরখানা একটু তফাতে, মাঝখানে একটা কনফারেন্স রুম আছে।

বিনা অনুমতিতে রোজমারির ঘরে ঢোকা বারণ। বাইরে একজন বেয়ারা মোতায়েন রয়েছে। ভিতরে খবর পাঠিয়ে একটু অপেক্ষা করতে হল শুভকে। মিনিট তিনেক বাদে বাইরের দরজার মাথায় সবুজ আলোটা দু'বার জ্বলে নিবে গেল।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল শুভ। যাকে খুশিয়াল ঘর বলে রোজমারির ঘরখানা তাই। চার দেওয়ালে সিলিং থেকে মেঝে অবধি চিত্রিত মাদুরের ঢাকনা। সিলিং-এ চমৎকার বাঁশের কাজ, বাঁশের তৈরি ঝাড়বাতি আছে। বাঁশ আর মাদুরের কাজের জন্য ত্রিপুরা থেকে কারিগর আনানো হয়েছিল। মেঝেতে কার্পেট পাতেনি রোজমারি। খুব সুন্দর নরম রঙের নকশাদার টাইলস বসানো হয়েছে। রোজমারির কাজের টেবিলটাও তিন ভাগে বিভক্ত এবং ডিজাইন প্রায় ফিউচারিস্টিক। আসবাব বিশেষ নেই। একধারে, হাতের নাগালে একটি স্ট্যান্ডের ওপর খুব দামি একটা বিদেশি কম্পিউটার বসানো। পাঁচখানা টেলিফোন আছে রোজমারির। শুভ যখন ঢুকল তখন রোজমারি কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা

বলছিল। শুভকে ইঙ্গিতে বসতে বলে আরও কিছুক্ষণ কথা বলল রোজমারি। তারপর টেলিফোন রেখে শুভর দিকে কৃত্রিম ভ্রুকুটি করে বলল, তারপর, কোন অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলে?

আমি লোকটার কথা আপনাকে আগেও বলেছি। লোকটা প্রতিবার আপনার ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর যায় এবং আসে।

রোজমারি মাথা নেড়ে বলল, তাতে কী হয়েছে?

আমি লোকটাকে ট্রেস করার চেষ্টা করেছিলাম।

তুমি আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছ বলে ধন্যবাদ। তুমি সত্যিই একটি ভাল ছেলে। কিন্তু আমাদের বিপদটা মনে হয় আরও গভীর। আর শত্রুও বোধহয় অনেক কঠিন।

শুভ একটু অবাক হয়ে বলল, একথা কেন বলছেন?

রোজমারি একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, তুমি কি আমাদের কারখানাটির সম্পর্কে সব জানো?

শুভ মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তো বৈজ্ঞানিক নই। তবে জানি যে, এটা খুবই আধুনিক কারখানা, ভারতবর্ষে কেন, এশিয়াতেও এরকম অত্যাধুনিক কারখানা নেই।

ঠিক তাই। আর আমাদের প্রোডাকশনটাও আংশিক একচেটিয়া ব্যাবসা করছে। ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট বাড়িয়ে দিলে শতকরা মুনাফা কোথায় পৌঁছোবে তার ঠিক নেই। কারণ পৃথিবীতেও এরকম কারখানা বেশি নেই। কিন্তু আমরা যে ব্যাবসাটা করছি তা অনেকেই ভাল চোখে দেখছে না। প্রথমে এটা আমাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এখন চেষ্টা হচ্ছে কেড়ে নেওয়ার, ভয় দেখিয়ে।

কিন্তু কেন?

সেইটে আমরা এখনও বুঝতে পারছি না।

শুভ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তা হলে এখন কী করবেন?

ভাবছি।

পুলিশকে জানালে হয় না?

পুলিশকে জানালে একটা কংক্রিট অভিযোগ করতে হয়। আমরা সেটা করতে পারছি না। আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ এবং তথ্য নেই। পুলিশকে জানালে তারা বড়জোর কিছুদিন কারখানা বা আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে। কিন্তু তাতে তো লাভ নেই।

কেন নেই?

রোজমারি হেসে বলল, এই লড়াইটা অর্থনৈতিক লড়াই। এই লড়াইয়ে পুলিশের ভূমিকা নেই।

শুভ খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, ম্যাডাম, আমার এক কাকা লালবাজারের গোয়েন্দা, তিনি সাহায্য করতে পারেন।

তোমাকে ধন্যবাদ শুভ। আমার মনে হয় তোমার কাকা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন না। তবু তিনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন।

শুভর মনটা খারাপ লাগছিল। সে ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে এল। রোজমারিকে সে নিজের মতো করে পছন্দ করে। রোজমারি অনেকটা তার দিদির মতো। স্নেহশীলা এবং প্রশ্রয়দাত্রী।

তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বলল, কী হল?

কিছুই নয়।

তোমাকে বকেননি তো!

না। তবে রোজমারি বিপদের মধ্যে আছে বলে মনে হল।

তোমাকে তো বলেইছি বড়লোকদের সবসময়েই বিপদ, তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছ?

আমরা কি কিছু করতে পারি না মৈত্রেয়ী?

কী করবে?

রোজমারি বলল, এই কারখানা নিয়েই নাকি নানারকম খেলা চলছে।

কীরকম খেলা?

খুব একটা ভেঙে বলল না। তোমার কি মনে আছে রোজমারিকে কিছুদিন আগে একগোছা লাল গোলাপ পাঠানো হয়েছিল!

কেন থাকবে না? খুব মনে আছে।

ট্যাগে লেখা ছিল আর আই পি, খ্রিস্টানদের কবরে লেখা থাকে।

তাও জানি।

ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস মৈত্রেয়ী।

হলেও তোমার কিন্তু কিছু করার নেই শুভ।

.

শুভ ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরই রোজমারি ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল।

ওপাশ থেকে একটা মোলায়েম গলা বলল, লুলু হিয়ার।

রোজমারি জার্মান ভাষায় বলে, বোকামিটা কেন করলে?

জার্মান ভাষাতেই জবাব এল, বোকামি করিনি। শেষ অবধি ছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলেছি।

সেটা কথা নয়। তোমার চলাফেরা এবং হাবভাবই তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। তোমার আরও অনেক ট্রেনিং বাকি।

আসলে তোমার সঙ্গে একই ফ্লাইটে যাওয়া এবং আসাটাই একটা বোকামি হয়েছে। কিন্তু ইদানীং আমি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে একটু চিন্তিত বলেই একই ফ্লাইটে যাই আসি।

বুঝলাম, কিন্তু ধরা পড়ে গেছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমাকে শেষ অবধি ট্রেস করতে পারেনি।

এর পর থেকে আমি আরও একটু সতর্ক হব রোজমারি।

ছেলেটা তোমার মুখ মনে রেখেছে। কাজেই তুমি আমার অফিসে কখনও আসবে না।

না। আর কিছু?

আপাতত কিছু নয়, পরে কথা হবে।

রোজমারি ফোনটা রেখে দিল।

ভ্রু কুঁচকে চিন্তিত রোজমারি কিছুক্ষণ ফাঁকা ঘরে পায়চারি করল, তারপর মনোজকে ফোন করল।

মনোজ, কী খবর?

কোনও খবর নেই। গোপীনাথ বসু অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমাদের সায়েন্টিস্ট কী বলছে?

না, কোনও পথ দেখাতে পারছে না।

তা হলে?

অপেক্ষা করা ছাড়া পথ দেখছি না।

আমি কি একটু রোমে যাব?

যেতে পারো, কিন্তু কী লাভ হবে?

তা জানি না, কিন্তু এভাবে অনিশ্চয়তা নিয়েও তো থাকা যায় না। আমার টেনশন হচ্ছে।

টেনশন, টেনশনের কী আছে? গোপীনাথ বসু যদি বেঁচে থাকে তবে একদিন যোগাযোগ করতে পারব।

তুমি কি সোনালিকে একটু ট্যাপ করছ?

ও বাবা, তাতে উলটো ফল হয়েছে। কিন্তু সুব্রত গোপীনাথের খুব কাছের লোক। পারলে সে-ই সাহায্য করবে।

.

যাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল সেই গোপীনাথ বসুর অবস্থা গৃহবন্দির মতোই। ঘর থেকে বেরোনোর উপায় নেই। টেলিফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। শুয়ে বসে সময় কাটানোর ধাত তার নয়। ফলে ক্রমে ক্রমে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল।

মজা হল, দ্বিতীয় রাতেই তার কাছে ফোন করে একজন গম্ভীর গলার মানুষ জানতে চাইল, তার বান্ধবীর দরকার আছে কি না।

গোপীনাথ অবাক হয়ে বলল, বান্ধবী! হঠাৎ একথা কেন?

টেনশন কাটাতে বান্ধবী খুব সাহায্য করে।

গোপীনাথের মনে হল ফোনটা করছে ওই দাতা, অর্থাৎ বাঙালি মস্তানটি, যদিও কথা বলছিল ইতালিয়ানে। ফোন বলতে ইন্টারকম। তার মানে লোকটা এখন এই হোটেলেই আছে।

গোপীনাথ বলল, আমার বান্ধবীর দরকার হয় না।

আপনি হোমোসেক্সুয়াল নন তো?

না, এ প্রশ্নই বা কেন?

আপনার সব খবর আমাদের জানা নেই বলে, ভয় পাবেন না, বান্ধবীটি কিন্তু অন্য কোনও মতলবে যাবে না, শুধুই সঙ্গ দেবে।

গোপীনাথ একটু দ্বিধায় পড়ে বলল, পাঠিয়ে দিন।

বান্ধবী এল দশ মিনিট বাদে। তাকে দেখে চমকে গেল গোপীনাথ। বছর পচিশ-ছাব্বিশ বয়সের চাবুক চেহারার একটি ইতালিয়ান মেয়ে। জিপসিদের ধরনের পোশাক পরা। মাথায় একটা ধাতুর তৈরি সাপের মুকুট।

কটাক্ষ এবং লোল হাসির পর মেয়েটি বলল, পছন্দ?

হ্যাঁ।

ড্রিঙ্কস?

না।

তুমি ড্রিঙ্ক করো না?

না, আমার অভ্যাস নেই।

তা হলে সন্ধেটা কাটাবে কী করে?

আমরা কথা বলতে তো পারি? কথা,

কথা দিয়ে সময় কাটানো যায় নাকি?

যায় না?

কিছু অ্যাকশনও তো দরকার, নাচলে কেমন হয়?

আমি নাচ জানি না।

তুমি কি পণ্ডিত লোক?

গোপীনাথ হাসল, পণ্ডিতরাও ফুর্তি করে। আমি আসলে ফুর্তিবাজ নই।

তুমি কেমন?

সেটা তুমিই আজ আবিষ্কার করো।

মেয়েটা তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাঃ, এই তো সুন্দর কথা, আমি আজ তোমার ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে দেব। তুমি নিজেকে চিনতেই পারবে না।

তথাস্তু।

১৬-২০. গোপীনাথের ভিতরে আগুন

না, গোপীনাথের ভিতরে কোনও আগুনই জ্বলল না, মেয়েটি কিছু ছলাকলা শুরু করতেই গোপীনাথ হঠাৎ খুব ঠান্ডা গলায় বলল, ক্ষান্ত হও, বৃথা পরিশ্রম কোরো না।

মেয়েটা থমকে গিয়ে বলল, কেন? আমি যথেষ্ট আকর্ষক নই?

নিশ্চয়ই, তবু ক্ষান্ত হও, আমি পরিশ্রান্ত, উদ্বিগ্ন এবং খানিকটা ভীত একজন মানুষ। এখন কোনও সুন্দরী মহিলার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য আমি উপভোগ করতে পারছি না।

মেয়েটা একটু হেসে বলল, মানুষ তো ওসব কাটানোর জন্যই মেয়েদের চায়। গোপীনাথ মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি জানো সেক্সের মধ্যে কতটা শরীর আর কতটা মন?

মেয়েটা বলল, সেক্স তো শরীর মাত্র।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, সকলের কাছে নয়। আমার কাছে সেক্স-এর অর্ধেক মন আর অর্ধেক শরীর।

তুমি বোধহয় জ্ঞানী লোক।

না, তবে আমি একজন মনোযোগী ছাত্র।

তুমি কী চাও বলো তো!

আপাতত আমি তোমার সঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে একটু কথা বলতে চাই।

মেয়েটা মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, তবে তাই হোক।

গোপীনাথ ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। এই হোটেলের রুম সার্ভিস খুবই ভাল, ঠিক সাত মিনিটের মাথায় একজন বেয়ারা এসে কফির ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

কফি খেতে খেতে মেয়েটা বলল, কী কথা বলতে চাও?

প্রথমে জানতে চাই তোমার নাম কী?

আমার নাম জিনা।

তুমি কি কল গার্ল? খানিকটা তাই। তবে আমি চাকরিও করি।

পুরুষদের খুশি করে বেড়াতে কি পছন্দ করো?

মেয়েটার মধ্যে হঠাৎ যেন সব চঞ্চলতা থেমে গেছে। কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে ধরে একটু ভেবে বলল, তুমি আমাকে নীতি উপদেশ দেবে না তো!

না, ওসব আমার আসে না।

খুব ভাল। কারণ ওসব আমি মানি না। যা খুশি করি।

সবাই আজকাল তাই করে। আজকালকার মানুষ কিছু মানার ধার ধারে না।

আমরা একটা ছোট্ট জীবন পেয়েছি আর চারদিকের এই পৃথিবী, জীবনটা যতদূর পারি ভরে নেওয়াই তো ভাল।

ঠিক কথা। জীবনটা যদি ভরে নেওয়া যায় তা হলে আপত্তি কীসের? আমি জানতে চাই তুমি কি এই হোটেলেই চাকরি করো?

হ্যাঁ।

কী চাকরি?

স্ট্রিপ ড্যান্স।

দাতা কে জানো?

মেয়েটা ভ্রু কুঁচকে বলল, দাতা! দাতা আবার কে?

একজন ভারতীয়, আমার মতোই।

না, আমি লুইজির বান্ধবী।

লুইজি কি এই হোটেলের মালিক?

ওর কাকা মালিক।

লুইজির বোনকে চেনো?

চিনি, কেন বলো তো!

না, আমি একটা প্যাটার্ন বুনবার চেষ্টা করছি।

কীসের প্যাটার্ন?

নানা ঘটনাবলির।

কীরকম ঘটনা?

একে বেশি কিছু বলে লাভ নেই, জানে গোপীনাথ, তবু কাউকে তার কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। সে বলল, তুমি কি সাহসী মেয়ে?

তাই তো জানি।

তা হলে তোমাকে বলা যায়। শুনবে?

শুনব।

গোপীনাথ একটু ভেবে তার কাহিনিটা ছাঁটকাট করে বেশ সংক্ষেপে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আমি যাদের হেপাজতে রয়েছি তারা কেমন লোক তা কি তুমি জানো জিনা?

জিনা কফির শূন্য কাপটা ট্রে-তে রেখে বলল, এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব হয় না। তবে লুইজি ভাল ছেলে। ওর কাকা হোটেল চালায় বলে গুন্ডা বদমাশ এবং সন্দেহজনক লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তবু বলতেই হবে এমপ্লয়ার হিসেবে লোকটা তেমন খারাপ নয়।

আমি লুসিলের কথা জানতে চাই।

লুসিল! না তার কথা আমি তেমন কিছু জানি না। লুইজির কাছে শুনেছি তার বোন লুসিল প্যারিসে থাকে।

এই হোটেলে কোনও মাফিয়া বা গুন্ডার দলের নজর আছে কি না জানো?

তারা তো সব জায়গাতেই আছে।

আমি একটু স্পেসিফিক হতে চাইছিলাম।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, এই হোটেলে সন্ধ্যায় আমাকে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হয়। কত লোক আসে! নাচঘর তখন অন্ধকার থাকে।

ঠিক কথা, তুমি আমাকে অনেক কথাই বলেছ। আলাপ করে খুশিই হলাম।

তার মানে তুমি কি আমাকে এখন চলে যেতে বলছ?

তা নয়। তবে আমার যেটুকু জানার ছিল জেনেছি।

শোনো পণ্ডিত মানুষ, তোমার মুখখানা আমার খারাপ লাগছে না। তুমি সেক্সি না হতে পারো, কিন্তু বর্বর নও।

ধন্যবাদ।

আমার কথা শেষ হয়নি।

তা হলে বলো।

আমি মাফিয়া এবং গুন্ডা বদমাশদের ঘেন্না করি।

খুব ভাল।

তুমি যে একটা বিপদের মধ্যে রয়েছ তা আমি বিশ্বাস করছি। তোমার মুখে উদ্বেগটা প্রকাশ পাচ্ছে।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি মিথ্যে কথা সহজে বলি না।

শোনো, তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই।

কীভাবে সাহায্য করবে?

মেয়েটা একটু ভেবে বলল, আমি তোমার নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারি না।

সেটা জানি।

তবু তোমাকে আমি এখান থেকে পালাতে সাহায্য করতে পারি। শুধু তাই নয়, আমাদের পরিবারে তুমি দু'-একদিন আশ্রয়ও পাবে। যদি ইচ্ছে করো।

তারপর?

তারপর তোমার যা ইচ্ছে।

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, ভিকিজ মব বা মাফিয়াদের হাত খুবই লম্বা। তারা যেখানেই হোক আমার নাগাল পাবেই।

সেটা ঠিক কথা।

তবু আমি এই জোন থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই।

কোথায় যাবে?

কলকাতায়।

তোমার কাছে ভাড়ার টাকা আছে?

না, তবে আমার কাছে চেকবই আছে। কিন্তু আমি টাকা তুলতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে পারি।

টাকাটা যদি আমি তোমাকে ধার দিই?

ধন্যবাদ, কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা থাকতে ধার করার মানেই হয় না।

হয়। টাকাটা এখনই তোলার দরকার নেই। চেকটা তুমি আমাকে দিয়ো। তুমি নিরাপদে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর আমি আমার ব্যাঙ্কের সাহায্যে টাকাটা তুলে নেব।

বাঃ। চমৎকার। আমাকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে তো?

হচ্ছে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। এখন সবচেয়ে বেশি গুরুতর ব্যাপার হল, তোমাকে এই হোটেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া।

কীভাবে সেটা সম্ভব? আমি যতদূর জানি ভিকিজ মব-এর একজন এজেন্ট হল দাতা, অন্যজন লুসিল এবং হয়তো লুইজিও।

দাতাকে আমি চিনি না। তবে লুসিল এখন নিউ ইয়র্কে। লুইজি বার্সিলোনায়। দাতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে।

নাও।

কীরকম দেখতে সে?

লম্বাচওড়া এবং সুপুরুষ। চেহারায় একটা নিষ্ঠুরতা আছে। এবং খুবই বিস্ময়ের কথা, তোমাকে সেই আমার কাছে পাঠিয়েছে।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, আমাকে তোমার কাছে আসতে বলেছে এই হোটেলের ম্যানেজার নিনো। সে ভারতীয় নয়, ইতালিয়ান।

তা হলেও পিছনে দাতা আছে।

মেয়েটা উঠে পড়ল, বলল, ভেবো না, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি। তুমি তৈরি থেকো। এই হোটেলের ফায়ার এসকেপ দিয়ে নামলে পিছনে একটা সরু গলি

পাবে। আমার গাড়িটা ছোট, থ্যাবড়া আর লাল রঙের। ফিয়াট। যদি রাস্তা পরিষ্কার থাকে তা হলে আধঘণ্টা বাদে আমি গাড়ি নিয়ে গলিতে অপেক্ষা করব।

গোপীনাথ সামান্য উদ্বেগের গলায় বলল, তোমার এতে কোনও বিপদ নেই তো!

না। তোমার সঙ্গে আমার দু'ঘণ্টা থাকার কথা। দু'ঘণ্টা পার হয়েছে। এখন চলে গেলে কারও সন্দেহ হওয়ার কিছু নেই। হলেও ভয় পেয়ো না। আমি যেখানে থাকি সেটা রোমের একটা ঘিঞ্জি পাড়া। বাইরের লোক ঢুকে সুবিধে করতে পারবে না, আমরা জোট বেঁধে থাকি।

জিনা বেরিয়ে যাওয়ার পর খুব দ্রুত গোপীনাথ পোশাক পরে নিল। কফির ট্রে দরজার বাইরে রেখে ডোন্ট ডিস্টার্ব সাইন টাঙাল দরজায়। পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বাতি নিবিয়ে পেছনের ফায়ার এসকেপের কাছে এসে দাঁড়াল।

আধঘণ্টা সময় যে কতটা সময় তার কোনও ঠিক নেই। এক-এক পরিস্থিতিতে আধঘন্টা পাঁচ মিনিটের মতো আচরণ করে, এক-এক সময় পাঁচ ঘণ্টার মতো, এখন পাঁচ ঘণ্টার মতো লাগছে।

একজন অচেনা মেয়ের কাছে নিজেকে এতটা সমর্পণ করে কি বোকামি করছে না গোপীনাথ? এটা হয়তো এদেরই তৈরি করা ফাঁদ! গোপীনাথের এখানে তবু একটু নিরাপত্তা ছিল, এরপর কী হবে কে জানে! তবে তার তো জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। বেশি আর কী-ই বা হতে পারে?

ফায়ার এসকেপটা লাথি মেরে খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল গোপীনাথ।

গলির মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে। তারপর ডানপ্রান্ত দিয়ে একটা আলো নেবানো ছোট্ট গাড়ি মুখ ঢোকাল গলিতে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় লাল রংটা বোঝা গেল।

সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াতেই দরজা খুলে জিনা বলল, উঠে পড়ো, কেউ এখন হোটেলে নেই।

গোপীনাথ উঠে পড়ে বলল, দাতা কোথায়?

খোঁজ নিয়ে জানলাম, যে একটা জরুরি টেলিফোন পেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।

গোপীনাথ ব্যাগটা পিছনের সিটে রেখে সামনের সিটে জিনার পাশে উঠে বসল। জিনা গাড়ি ছাড়ল।

.

আর ঠিক এসময়ে গোপীনাথের হোটেলের ঘরের দরজাটা কেউ লাথি মেরে খুলে ফেলল। ঘরে ঢুকল দু'জন। তাদের একজন বেনভেনুটি, অন্যজন বাসিলোঁ, দু'জনের হাতেই পিস্তল। চারদিক দেখে নিয়ে বাসিলোঁ বলল, বেনভেনুটি, আমাদের কপাল নিতান্তই খারাপ দেখছি।

বেনভেনুটি বাথরুমে উঁকি মেরে দেখছিল। বলল, কপাল খারাপ বললে তো হবে না বাসিলোঁ, লোকটাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে আমাদের কী হবে তা ভেবে দেখেছ?

দেখেছি, কিন্তু ভাবতে চাই না।

আর এসবের জন্য দায়ী তুমি বাসিলোঁ। মেয়েছেলে দেখলেই তুমি এমন চঞ্চল হয়ে ওঠো যে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, মেয়েটার সঙ্গে খুনসুটি করতে না গেলে সেদিন চিড়িয়া উড়ে যেতে পারত না।

ভুল বেনভেনুটি, তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওদের একটা পরিকল্পনা কার্যকর না হলে আর একটা হতই, আমরা ওদের প্রথম কৌশলটারই শিকার হয়ে গিয়েছিলাম।

বেনভেনুটি ভ্রু কুঁচকে বলল, এখন কী করবে?

অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখব। হোটেলটা তছনছ করব।

দাঁড়াও। ফায়ার এসকেপটা দেখো।

কী দেখব?

ফায়ার এসকেপটা খোলা রয়েছে।

ঈশ্বর! বলে বাসিলোঁ এগিয়ে গেল। ফায়ার এসকেপ খুলে নীচের দিকে চেয়ে বলল, পরিশ্রম অনেকটাই বেঁচে গেল মনে হচ্ছে। হোটেলটা আর তছনছ করতে হবে না। আমাদের পাখি এদিক দিয়েই পালিয়েছে।

অথবা তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

একই কথা বেনভেনুটি। আমাদের গর্দান যূপকাষ্ঠেই রয়ে গেল। এসো বেনভেনুটি, তলাটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

দু'জনে নীচে নামল। গলির মধ্যে পা রেখে বাতাস শুকে বাসিলোঁ বলল, বেনভেনুটি, পেট্রোলের গন্ধ পাচ্ছ? এই গলি দিয়ে সচরাচর গাড়ি চলাচল করে না। সুতরাং আমাদের পাখিটির জন্য কিছুক্ষণ আগেই এখানে গাড়ি ঢোকানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। গলিটা সরু তাই নিশ্চয়ই কোনও ছোট গাড়ি।

তুমি পুলিশে চাকরি করলে পাকা ডিটেকটিভ হতে।

ডিটেকটিভরা বড্ড গরিব হয় বেনভেনুটি। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, আমি দরিদ্রের জীবন যাপন করি।

কিন্তু শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসুকে খুঁজে বের না করতে পারলে আমাদের দুজনকেই হয়তো ভিক্ষে করতে হবে।

না বেনভেনুটি, না। দলে নতুন এসেছ, তাই জানোনা। ভিখিরি হয়েও যদি বেঁচে থাকতে পারো তো সেটা পরম সৌভাগ্য। লোকটা যদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তা হলে আমাদের দু'জনকেই গুলি করে টাইবারের জলে ফেলে দেওয়া হবে।

ঈশ্বর! তা হলে কিছু করো বাসিলোঁ।

হ্যাঁ। করতেই তো আসা। আপাতত চলল, ম্যানেজারকে আরও একটু কড়কানো যাক।

দু'জনেই ফিরে এল ফায়ার এসকেপ দিয়ে। আবার চারদিক দেখে নিল। তারপর নেমে এল একতলায়। যেখানে তাদের দলের আরও জনাপাঁচেক পেশাদার গুন্ডা

ম্যানেজারের ঘরে এবং দরজায় পাহারা দিচ্ছে। রেস্টুরেন্টের দিক থেকে নাচগানের শব্দ এবং কিছু হল্লা আসছে।

ভীত ইতালিয়ান ম্যানেজার সাদা মুখে নিজের চেয়ারে বসে ছিল।

বাসিলোঁ মৃদু গলায় বলল, গোপীনাথ বোস তার ঘরে নেই।

আ-আমি জানি না।

না জানলে কি চলে? এত মাননীয় দামি একজন অতিথির খবর রাখো না, তুমি কেমন ম্যানেজার?

বিশ্বাস করো, তার এখন ঘরেই থাকার কথা। একটু আগে জিনা তাকে সেবা করতে গিয়েছিল। দু’ঘণ্টা ছিলও তার ঘরে। একটু আগেই জিনা নেমে এল।

জিনা কে?

স্ট্রিপটিজ করে।

বাঃ। তা হলে অতিথির জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা ভালই ছিল।

হ্যাঁ, জিনা এসে বলল অতিথি ভাল আছে।

জিনা কি রোজ গোপীনাথের কাছে যেত?

না। আজই প্রথম।

অন্যান্য দিন কারা যেত?

কেউ না, উনি বোধহয় খুব একটা সেক্সি নন।

তা হলে আজ হঠাৎ জিনাকে দরকার হল কেন?

আ-আমি জানি না।

তা হলে কে জানে?

একজন লোক জিনাকে যেতে বলেছিল।

লোকটা কে?

আমি চিনি না। তবে তাকে দাতা বলে কেউ কেউ ডাকছিল।

বাসিলোঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল, দাতা! কোন দাতা?

তা জানি না।

রিভলভারটা ম্যানেজারের দিকে আলগোছে তুলে বাসিলোঁ বলল, ব্যাপারটা গুরুতর। বলো।

ম্যানেজার তোতলাতে তোতলাতে বলল, ভিকিজ মব-এর সর্দার।

ঈশ্বর! সে কোথায়?

এখানে নেই। একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

মিথ্যে কথা।

বিশ্বাস করো। তবে সে বেশি দূর হয়তো যায়নি। আসবে।

আমরা অপেক্ষা করব। জিনার ঠিকানাটা দাও। তাড়াতাড়ি।

১৭.

কোনও মহিলাকে এত জোরে গাড়ি চালাতে আগে দেখেনি গোপীনাথ। বিশেষ করে রোমের কিছু অপ্রশস্ত রাস্তায়।

জিনা, তোমার সাহস আছে বটে, কিন্তু এটাই কি সাহস দেখানোর সময়?

জিনা একটা মোড় অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরে গতি সামান্য কমাল। তারপর বলল, আমি বিপদের গন্ধ পাই।

সেটা কীরকম?

যখন গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছিলাম তখন হোটেলের চত্বরে তিনটে গাড়ি এসে থামল। একসঙ্গে প্রায় আট-দশজন লোক নেমে এল। তাদের মধ্যে একজন আমার গাড়িতে অত্যন্ত অভদ্রভাবে উঁকি দিয়েছিল।

কই, বলোনি তো?

তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি।

ওরা কারা?

ওরা আর যাই হোক ভালমানুষ নয়। এদের একজনকে আমি চিনি। তার নাম বাসিলোঁ। অত্যন্ত ভয়ংকর লোক।

বাসিলোঁ?

নামটা শুনেছ?

আমি অনেকদিন রোমে বাস করছি। সুতরাং শুনতেই পারি। নামটা চেনা চেনা ঠেকছে।

একটা মাফিয়া দলের সর্দার গোছের। আমার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল।

বন্ধুত্বও হয়েছিল কি?

জিনা ব্যথিত গলায় বলল, আমাদের যা জীবন তাতে কত কিছু হয়। না, লোকটা আমাকে ব্যবহার করেছিল বটে, কিন্তু বন্ধুত্ব হয়নি। শোনো গোপীনাথ, আমি গুন্ডা বদমাশদের একদম পছন্দ করি না।

হ্যাঁ, কথাটা বোধহয় আগেও বলেছ।

আর সেইজন্যই অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে ওখান থেকে বের করে এনেছি।

গোপীনাথ সামান্য উদ্বেগের গলায় বলল, কিন্তু ওরা তো তোমার ঠিকানা জানে জিনা।

জানে। তবু আমার ঠিকানায় তুমি নিরাপদ। আমি যদি পাড়ার লোকদের বলে রাখি তবে তারা এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না। আমার পাড়াটায় আমারই নানা আত্মীয়স্বজনের বাস। আমরা খুবই আত্মীয়বৎসল।

জিনা ক্রমশ রোমের ঘিঞ্জি একটা এলাকায় ঢুকে পড়ছিল। সরু সরু গলি, বাচ্চারা খেলছে, বউ-ঝিরা গল্পসল্প করছে। রাস্তাটা যেন রাস্তা নয়, বৈঠকখানা। পথে ঝগড়াঝাটিও হচ্ছে কোথাও কোথাও।

জিনা যে পাড়ায় ঢুকল সেটা প্রায় দমবন্ধ করা একটা গলি। বহু পুরনো পাড়া, বাড়িগুলো যেন একটা আর-একটার ওপর ভর করে আছে।

নামো।

শোনো জিনা, তোমাদের বাড়িতে কি আমি অনভিপ্রেত লোক নই?

না। কারণ তুমি বিপন্ন। বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের পরিবারের সুনাম আছে।

গোপীনাথ নামল। জিনা গাড়িটা পথের পাশেই লক করে রেখে তাকে হাতে হাত ধরে নিয়ে চলল।

জিনাদের বাড়িটা আরও একটা গলির মধ্যে, যেখানে গাড়ি ঢুকবে না। বাড়িটা বেশ বড় এবং পুরনো। গলির পাথরে বাঁধানো রাস্তা থেকে সরাসরি বাড়ির সদর দরজায় উঠতে হয়, অনেকটা উত্তর কলকাতার গলিঘুজির মতোই।

দরজা খুলেছিল একজন বৃদ্ধা।

জিনা চাপা গলায় বলল, আমার পিসি। কথা বলার চেষ্টা কোরো না, বুড়ি কানে শোনে না।

তোমাদের কি যৌথ পরিবার?

না। আমরা মাত্রই কয়েকজন। ভাইরা বেশির ভাগই বিদেশে। আমি, মা, পিসি আর একজন কাকা।

তোমার বাবা?

বাবা নেই।

‘নেই’ কথাটার অনেক রকম মানে হয়। তবে গোপীনাথ আর বেশি জানতে চাইল না।

জিনা তাকে দোতলায় নিয়ে এল। একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, এই ঘরটাই আপাতত তোমার গাড্ডা। আমি বেরোচ্ছি তোমার টিকিটের ব্যবস্থা করতে। ইতিমধ্যে আমার মা তোমার দেখাশোনা করবে। তোমার কি খিদে পেয়েছে?

না। আমি একটু চোখ বুজে পড়ে থাকতে চাই।

বেশ কথা। শুয়ে থাকো। ভয় নেই, কোনও বিপদ হবে না। আমি পাড়ায় বলে যাচ্ছি।

জিনা বেরিয়ে এল। গোপীনাথ জুতোজোড়া খুলে রেখে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। গভীর ক্লান্তি। অথচ ক্লান্তির কারণ নেই। গত দু’দিন সে কোনও পরিশ্রমের কাজই করেনি। তবে কি ভয় আর উদ্বেগই এই ক্লান্তির কারণ?

একটু বাদে দরজায় টোকা পড়ল। গোপীনাথ শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। চাপা গলায় বলল, ভিতরে আসুন।

খিটখিটে চেহারার এক বুড়ি ঢুকেই বলল, তুমি গোপীনাথ?

হ্যাঁ।

কী খাবে?

কিছু না।

কফি?

তারও দরকার নেই।

জিনা তোমার দেখাশোনা করতে বলে গেছে। আমি জিনার মা।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তোমার কি খুব বিপদ?

হ্যাঁ।

চিন্তা কোরো না। এখানে কিছু হবে না। তুমি নিরাপদ।

আপনাকে ধন্যবাদ।

ঘুমোও।

বুড়ি চলে গেল।

গোপীনাথ উঠে ঘরের ছোট জানালাটা দিয়ে গলিটা একটু দেখল। ডাইনে গলির মুখটায় কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

কৌতূহলী গোপীনাথ গরাদহীন জানালা দিয়ে আরও একটু ঝুঁকে ছেলেগুলোকে দেখার চেষ্টা করতে যেতেই হঠাৎ বাড়ির নীচে আড়াল থেকে একটা অল্পবয়সি ছেলে বেরিয়ে তার দিকে চেয়ে ইতালিয়ান ভাষায় বলল, ভিতরে যাও। একদম জানালায় থেকো না। ওরা আসছে।

কারা আসছে?

মাফিয়ারা।

গোপীনাথ কেঁপে উঠল। বলল, কী করে জানলে?

আমাদের লোক চারদিকে আছে।

আমার জন্য তোমাদের যদি বিপদ হয়?

আমরা বিপদ পছন্দ করি। তুমি দয়া করে জানালা দিয়ে মুন্ডুটা বের কোরো না।

গোপীনাথ ছেলেটাকে ভাল করে দেখল। বছর কুড়ির বেশি বয়স নয়। রোগা লম্বা চেহারা।

গোপীনাথ বলল, আমার জানা দরকার ওরা আসলে কারা।

বাসিলোঁকে চেনো?

নাম শুনেছি। বা

সিলোঁ আর বেনভেনুটি। সঙ্গে ওদের আরও লোক আছে।

ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। পারবে না।

আগ্নেয়াস্ত্র আমাদেরও আছে। তার চেয়েও বড় কথা, এ পাড়ায় ঢুকবার আগে ওদের দু'বার ভাবতে হবে।

কেন বলো তো?

কারণ এখানে বাইরের লোক সুবিধে করতে পারে না।

গোপীনাথ ঘরের মধ্যে পিছিয়ে এল। এভাবে পালিয়ে থাকাটা তার কাপুরুষোচিত বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বাসিলোঁ কে তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। নামটা সে কার কাছে শুনেছে। ওদের কে লাগাল তার পিছনে?

গোপীনাথ ফের বিছানায় এসে শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ একটা দৌড়োদৌড়ির শব্দ পেল গোপীনাথ। একটা শিস দেওয়ার শব্দও। সে তাড়াতাড়ি উঠে জানালাটা ফাঁক করে চোখ রেখে দেখল, গলিটা ফাঁকা। মোড়ের ছেলেরাও কেউ নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গোপীনাথ দরজা খুলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল। এদিক ওদিক চাইতেই বাঁদিকে সিঁড়িটা দেখতে পেল সে। সিঁড়ি বেয়ে সোজা ছাদে উঠে এল গোপীনাথ। ছাদ থেকে ঝুঁকে দেখল, গলি ছাড়িয়ে আর একটু দূরের রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়ানো। দু'জন লোককে নিয়ে কয়েকটা ছেলে। উত্তপ্ত কিছু কথাবার্তা হচ্ছে। এখান থেকে শোনা গেল না।

গোপীনাথ তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে ভুলেই গিয়েছিল যে, সে ভোলা ছাদে দাঁড়ানো। তাকে রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ, আর শিস তুলে একটা তীব্র গতির বুলেট তার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল তার। সে বসে পড়ল এবং হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল সিঁড়ির মুখে।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতগতিতে নেমে দোতলার প্যাসেজে একটু দাঁড়াল সে। রাস্তার ও দুটো লোককে সে চেনে। এরাই আগের রুমিং হাউসটার করিডরে বসে তাকে পাহারা দিত। মারতে চাইলে তো তখনই মারতে পারত। গোপীনাথের বিশ্বাস ছিল, সাক্কি বা ভিকিজ মব কেউই তাকে মারতে চায় না। মেরে লাভ কী? বরং গোপীনাথ বেঁচে থাকলেই তাদের লাভ। কিন্তু আজ সে বিশ্বাস আর গোপীনাথের রইল না। বুঝতে পারছে তাকে খুন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাস্তায় আরও দু'বার গুলির শব্দ হল। জিনা যে আশ্বাস দিয়েছিল তা কতটা নির্ভরযোগ্য কে জানে। পাড়ার ছেলেরা হয়তো প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পারবে কি?

ঘরে এসে গোপীনাথ একটা চেয়ারে বসল। জানালার কাছে যেতে সাহস পেল না। একটু দূরে কোথাও আবার দুটো গুলির শব্দ হল। নীচের গলি দিয়ে একাধিক দৌড়পায়ের শব্দ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

তারপরই তাকে চমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের মধ্যেই। প্রথমটায় টেলিফোনটা খুঁজেই পেল না গোপীনাথ। তারপর পেল। দেয়ালে ঝোলানো সবুজ রঙের টেলিফোনটা জংলা ছাপের ওয়াল পেপারের সঙ্গে এমন মিশে গেছে যে বোঝা যাচ্ছিল না।

আমি জিনা।

উত্তেজিত গোপীনাথ বলল, জিনা, এখানে ভীষণ বিপদ। গুলি চলছে।

গুলি?

হ্যাঁ। আমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। কিন্তু তোমার পাড়ার ছেলেদের কিছু হলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না।

জিনা শান্ত গলাতেই বলল, আমাদের এসব নিয়েই বাঁচতে হয়। তুমি ভেবো না।

না জিনা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে মরা ভাল।

বীর হওয়ার চেষ্টা কোরো না। মন দিয়ে শোনো। আজ রাত বারোটা নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ফ্লাইট রোম হয়ে দিল্লি যাবে। আমি তার একটা টিকিট জোগাড় করেছি।

ঈশ্বর! তুমি তো অসম্ভব সম্ভব করতে পারো।

আমার এক বন্ধু ট্রাভেল এজেন্ট। সে সাহায্য করেছে।

কিন্তু এয়ারপোর্টে যাব কী করে?

আমি তোমায় ঠিক বের করে আনব। অনেক গোপন পথ আছে। আমাদের পাড়াটা একটি পাক্কা গোলকধাঁধা।

জিনা, এ সময়ে তোমার পাড়ায় আসা বিপজ্জনক।

বিপদ কেটে যাবে। ভেবো না। অপেক্ষা করো।

জিনা লাইন কেটে দিল।

গোপীনাথ উঠে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করল। তারপর গিয়ে জানালাটা ফাঁক করে গলিটা দেখল। সন্ধের আলোয় গলিটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই।

গোপীনাথ মুন্ডু বের করে ভাল করে চারদিকটা দেখে নিল। মাফিয়ারা এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র কি?

দরজায় টোকা এবং জিনার মায়ের প্রবেশ, হাতে কফির কাপ।

একটু কফি খাও।

গোপীনাথ বলল, ধন্যবাদ। কফি না হলেও চলত।

তুমি নার্ভাস। কফি খেলে ভাল লাগবে। ওতে একটু ব্র্যান্ডি মেশানো আছে। খাও।

গোপীনাথ কফিতে চুমুক দিয়েই বুঝল, ভদ্রমহিলা জাতশিল্পী। ব্র্যান্ডি মেশানো কালো কফি কীভাবে করতে হয় তা দারুণ জানেন।

গোপীনাথ বলল, হ্যাঁ, আমি নার্ভাস। আমি আপনাদের খুব অসুবিধেয় ফেলেছি।

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অসুবিধে কিছুই নয়। আমরা এরকম বিপদে প্রায়ই পড়ি। নিম্নবিত্ত ইতালিয়ানদের অবস্থা তুমি তো জানো না। আগে আমাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করা হত। আন্তনিও সেসব বন্ধ করেছে।

আন্তনিও কে?

এ পাড়ার সে-ই মোড়ল। সে-ই সবাইকে এককাট্টা করে একটা বাহিনী গড়েছে। মাফিয়াবিরোধী গোষ্ঠী। হয়তো সে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে না। কিন্তু একটু প্রতিরোধ তো হল। ইতালি শেষ হয়ে যাচ্ছে গুন্ডাবাজিতে।

জানি। আন্তনিওকে আমার নমস্কার জানাবেন।

আন্তনিও যদি সফল হয় তবে সারা রোমে এরকম প্রতিরোধ গড়ে উঠবে, দেখো।

তাই হোক।

আর আন্তনিও যদি মারা যায় তা হলে কী হবে বলা যায় না।

গোপীনাথ কফিটা শেষ করে বলল, উপায় থাকলে আমি আন্তনিওর দলে নাম লেখাতাম।

শুকনো মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত করে জিনার মা বলল, তোমাকে ধন্যবাদ। আন্তনিও শুনলে খুব খুশি হবে। জিনা কি তোমাকে ফোন করেছিল?

হ্যাঁ। আজ রাতেই আমি রোম ছাড়ছি। খু

ব ভাল। মাফিয়ারা লোক খুব খারাপ। যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারো ততই ভাল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করো।

জিনা কেন স্ট্রিপটিজ করে?

ওটা ওর পেশা। খারাপ কী? আমাদের তো বাঁচতে হবে।

এটা তো খারাপ পেশা।

হয়তো তাই। বিশেষ করে এই এইডসের যুগে। তবে বেশিদিন নয়। জিনা হয়তো চাকরি পেয়ে যাবে।

জিনা ভাল মেয়ে। ওকে বলবেন স্ট্রিপটিজ মোটেই ভাল পেশা নয়।

বলব। তুমি যে ওর জন্য ভেবেছ তাতে খুশি হলাম।

নীচে ডোর বেল বাজল। উৎকর্ণ হল গোপীনাথ।

১৮.

জিনার পিসিই বোধহয় দরজা খুলল নীচের তলায়। একটি মেয়েলি কণ্ঠ কী যেন জিজ্ঞেস করল। তারপর একজোড়া লঘু পা উঠে এল ওপরে। একটু বাদে যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে বালিকাই বলা যায়। পনেরো-ষোলো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। পরনে হালকা নীল রঙের পুলওভার, গরম কাপড়ের প্যান্ট, পায়ে ভারী রবার সোলের জুতো, মাথায় খুব রংদার একখানা রাশিয়ান কান-ঢাকা টুপি।

ঘরে ঢুকেই গোপীনাথের দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে ইতালিয়ানে বলল, মারিয়া। আমি জিনার বন্ধু।

করমর্দন করে গোপীনাথ বলল, আমি গোপীনাথ।

জানি। জিনা তোমার হুবহু বর্ণনা আমাকে দিয়েছে।

জিনা কোথায়?

জিনা তোমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করবে। আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে।

গোপীনাথ একটু অস্বস্তি বোধ করে বলল, তুমি! তোমার বয়স কম। তুমি কেন এসব বিপদের মধ্যে এলে?

মেয়েটি ভারী সুন্দর হাসি হেসে বলল, আমি বিপদ ভালবাসি।

গোপীনাথ তবু একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। একবার জিনার মায়ের দিকে তাকাল।

জিনার মা তার শুকনো মুখে বললেন, ওকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ও আন্তনিওর বোন।

আন্তনিওর বোন! তা হলে তো সত্যিই অবিশ্বাসের কিছু নেই। গোপীনাথ তৈরিই ছিল। উঠে পড়ে বলল, চলো।

আমি কিন্তু তোমাকে একটা মোটরবাইকে চাপিয়ে নিয়ে যাব। ভয় পাবে না তো?

না। ভয়ের কী আছে?

সবাই বলে আমি নাকি বড্ড জোরে চালাই।

রোমের রাস্তায় জোরে না চালানোই বুদ্ধির কাজ।

মারিয়া হাসল, জোরে না চালালে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব কেমন করে? এ পাড়া থেকে বেরোবার মোট চারটে পথ আছে! চারটের মধ্যে তিনটে পথই ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।

কীভাবে?

বন্ধ করেছে বলতে ওদের লোক তিনটে মোড়েই পাহারা দিচ্ছে। আন্তনিওর ভয়ে ভিতরে এসে হামলা করেনি। কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ চলবে না। ওরা শেষ অবধি দল বাড়িয়ে ভিতরে ঢুকবে। তার আগেই তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া সময়ও বেশি নেই।

চার নম্বর পথটা কি নিরাপদ।

মারিয়া ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবল। তারপর বলল, তুমি দশ ফুট উঁচু থেকে লাফ দিতে পারবে?

অবাক হয়ে গোপীনাথ বলল, তার মানে?

চার নম্বর পথ বলতে কিছু নেই। কিন্তু একটা ছাদ ডিঙিয়ে ওপাশে পড়তে পারলে কোনও চিন্তা নেই। ও পাশে আমার মোটরবাইক রাখা আছে।

গোপীনাথ বলল, পারব।

তা হলে চলো। দেরি করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে।

আমার জন্য তোমরা অনেক ঝুঁকি নিচ্ছ।

ঝুঁকি আবার কীসের? এসব আমাদের কাছে জলভাত। মাফিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের আরও বড় লড়াই করার আছে। চলো।

গোপীনাথ জিনার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে গোপীনাথের আগে আগে নামতে নামতে মারিয়া বলল, একটু দৌড়োতেও হবে। তুমি দৌড়োতে পারবে তো?

পারব। তবে গত এক সপ্তাহ আমি কোনও ব্যায়াম করিনি।

কিন্তু তোমার ফিগার তো ভাল। দেখতে বেশ শক্তপোক্ত।

হ্যাঁ। আমি সহজে কাবু হই না।

তা হলে পারবে।

রাস্তায় বেরিয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে মারিয়া বলল, গলির মুখে যে আড়াআড়ি রাস্তাটা দেখছ ওটাই দৌড়ে পার হতে হবে। কারণ ডানদিকে একটা প্রান্তে ওরা ওত পেতে আছে।

হ্যাঁ, ওদিক থেকেই ওরা আমাকে তাক করে গুলি চালিয়েছিল।

জানি। ওই রাস্তায় তোমার দিকে আবার গুলি চলতে পারে, যদি ওরা দেখতে পায়। তবে গলির মুখের বাতিগুলো আমরা নিবিয়ে দিয়েছি।

ওখানে তোমাদের পাহারা নেই?

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল, আছে। তবে এটা একটা খোলা রাস্তা। বাইরের গাড়িটাড়ি যায়। কাজেই ওটা আমরা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারিনি। করলে পুলিশ এসে ঝামেলা করবে, ট্রাফিক জ্যাম হবে।

বুঝেছি।

গলির মুখে এসে সাবধানে ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিল মারিয়া। সামনের রাস্তায় খানিকটা সত্যিই অন্ধকার।

মারিয়া চাপা গলায় বলল, এবার আমাদের বাঁদিকে খানিকটা দৌড়ে যেতে হবে। ওই যে জলের কলটা দেখছ, ওর পিছনে ডানদিকের গলিতে ঢুকে যেতে হবে। তারপর নিশ্চিন্ত।

গোপীনাথ ব্যাগটা কাঁধের ওপর ফেলে বলল, চলো, আমি প্রস্তুত।

মারিয়া যত জোরে ছুটতে পারে তত জোরে গোপীনাথ পারে না। অন্তত এখন পারছে। দুশো মিটারের মতো পথ মারিয়া এক লহমায় পার হয়ে গেল। গোপীনাথ মাঝামাঝি পর্যন্ত যেতেই হাঁফাচ্ছিল। কে যেন সামনে থেকে চাপা গলায় বলল, জোরে জোরে দৌড়োও দেখতে পাবে।

জলের কলের কাছটায় পৌঁছেই গিয়েছিল গোপীনাথ। একেবারে শেষ সময়ে আচমকা দূর থেকে একটা গুলির শব্দ হল। কোথায় লাগল কে জানে, কিন্তু গোপীনাথ একটা ধাক্কা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

দু’জোড়া পা ছুটে এল। দু’জোড়া হাত তাকে ধরে প্রায় হিঁচড়ে গলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

মারিয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তোমার কোথায় লেগেছে?

গোপীনাথ উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে অনুভব করল। না, তার গায়ে গুলি লাগেনি। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে সে বলল, সম্ভবত ব্যাগে লেগেছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

মারিয়া বলল, পরে দেখা যাবে। চলো, সময় নেই।

যে দুটি ছেলে তাকে টেনে এনেছিল, তাদের দুজনের হাতেই পিস্তল। একজন এসে বলল, দূর থেকে চালিয়েছে বলে বেঁচে গেছ, নইলে ব্যাগসুষ্ঠু তোমাকে ফুটো করে দিত।

মারিয়া গলির মধ্যে তাকে নিয়ে আরও প্রায় দুশো মিটার গেল। কানা গলি। দারুণ ঘিঞ্জি। গলির শেষ প্রান্তের কাছাকাছি মারিয়া তাকে নিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকল। সরু সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এল চার তলার ছাদে।

গোপীনাথ একটু হাঁফাচ্ছিল। ধকল কম যাচ্ছে না। ব্যায়াম নেই, তার ওপর উদ্বেগ ও অশান্তি তাকে খানিকটা কাহিল করে ফেলেছে।

মারিয়া ছাদের রেলিং-এর কাছে এসে বলল, ও পাশের ছাদটা মাত্র চার ফুট তফাতে। রেলিং-এ উঠে দাঁড়ালে অনায়াসে লাফিয়ে ওপাশে পড়া যায়। তুমি নার্ভাস নও তো?

গোপীনাথ বিবর্ণ মুখে হেসে বলল, আমার অন্য উপায় থাকলে এসব নিয়ে ভাবতাম। তবে এই লাফটা আমাদের প্রোগ্রামে তো ছিল না!

এটা ধর্তব্যের মধ্যে নয় বলে বলিনি।

মারিয়া রেলিং-এর ওপর উঠে দাঁড়াল। নীচে চারতলার ছাদ। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য না করে বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে ও পাশের ছাদের রেলিং-এর ওপর চলে গেল। ছাদে নেমে হাত বাড়িয়ে বলল, তোমার ব্যাগটা দাও।

গোপীনাথ ব্যাগটা ওর হাতে চালান করে রেলিং-এর ওপর উঠল। উচ্চতার ভয় তার আছে, তবে এখন তার কাছে এগুলো কোনও ব্যাপার নয়। সে দাঁড়িয়ে একটু ঝুল খেল। তারপর খুব জোরে নিজেকে ছুঁড়ে দিল ওপাশে, এমনভাবে যাতে রেলিং-এ না থেমে ছাদে গিয়ে পড়া যায়। কিন্তু হিসেবের একটু ভুল হল গোপীনাথের। চমৎকার লাফটা দিলেও পা ভাল করে না গোটানোর ফলে পাশের ছাদের রেলিং-এ পা লেগে সে ও পাশের ছাদে গিয়ে পড়ল একেবারে কুমড়ো গড়াগড়ি খেয়ে।

মারিয়াই তাকে তুলে দাঁড় করাল, তোমার লাগেনি তো!

লেগেছে। ভালই চোট হয়েছে বাঁ হাঁটু আর বাঁ কনুইয়ে। শীতকাল বলে ব্যথাও হচ্ছে প্রচণ্ড। কিন্তু তা স্বীকার করে কী করে? সে বলল, না। তেমন কিছু নয়।

এসো, আমাদের সময় নেই।

মারিয়ার পিছু পিছু সে দোতলা অবধি নামল। বাড়িটা ফাঁকা এবং পোড়ো বলে মনে হচ্ছিল তার। জিজ্ঞেস করল, এটা কার বাড়ি?

এ বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে শিগগির। এসো।

তারা একটা ঝুল বারান্দার মতো জায়গায় এল। নীচে গলি।

নীচের দিকে চেয়ে গোপীনাথ আতঙ্কিত গলায় বলল, তুমি বলেছিলে দশ ফুট, কিন্তু এ তো দেখছি পনেরো ফুটের কম হবে না।

না, না, অত নয়। দশের জায়গায় বারো হতে পারে। পারবে না?

না পেরে উপায় কী?

শোনো। লাফ দেওয়ার সময় শরীরটাকে স্প্রিং-এর মতো করে নেবে। মাটিতে পড়েই পারলে গড়িয়ে নেবে একটু। তা হলে ইমপ্যাক্টটা টেরও পাবে না।

গোপীনাথ বলল, চেষ্টা করব।

আমি আগে নামছি।

মারিয়া রেলিংটা ডিঙিয়ে বিনা প্রস্তুতিতে লাফ দিল। অবিকল বেড়াল। পড়ল হাঁটু ভেঙে, পা আর হাতে চমৎকার ভর দিয়ে। এত অনায়াসে কাউকে এরকম নামতে দেখেনি গোপীনাথ। ব্যাগটা নীচে ফেলে সে-ও রেলিং ডিঙোল। তারপর নিজেকে ছেড়ে দিল ওপর থেকে। মারিয়ার নকল করেই নামল সে। কিন্তু গোঁড়ালি আর হাতের কবজি ঝিনঝিন করে উঠল লাফের ধাক্কায়। দাঁতে দাঁতে একটা জোর ঠোকাঠুকিও হল। তবু তেমন গুরুতর কিছুই ঘটল না।

মারিয়া তাকে ধরে গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে বলল, তুমি দারুণ লোক। এসো, ওই আমার বাইক।

গোপীনাথ দেখল মোটরবাইকটা মোটেই মেয়েলি নয়। বেশ শক্তিশালী এবং বড়সড়। দুটো হেলমেট রাখা ছিল সিটের ওপর। মারিয়া তাকে একটা পরিয়ে নিজেও পরল।

শুরু থেকেই গোপীনাথ বুঝল মারিয়া বিপজ্জনক মেয়ে। গলিটা যে স্পিডে পার হল তাতে গোপীনাথের হাত-পা শিরশির করে উঠল।

একটু আস্তে চালাও মারিয়া। এত স্পিড, আমি হয়তো উড়ে যাব।

মারিয়া একটা ডানমুখী মোড় ফিরে স্পিড কমিয়ে বলল, এটা রোম, এখানে খুব স্পিডে কি চালানো যায়? আচ্ছা, তোমার সম্মানে আমি স্পিড কমাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখো আমাদের হাতে সময় নেই।

দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মারিয়া বহুবার তার কথা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে এমন গতিতে চালাল যে গোপীনাথ মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থেকেও ভাবছিল বোধহয় বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে পিছনে। কিন্তু তারা পৌঁছোল অবিশ্বাস্য কম সময়ে।

নির্দিষ্ট টার্মিনালের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল জিনা। মুখে একটু উদ্বেগ।

এসেছ? বাঁচা গেল।

গোপীনাথ একটা অদ্ভুত আবেগ বোধ করল মেয়েটার প্রতি। কিছুক্ষণ আগেই এই জিনা এসেছিল তাকে সঙ্গ দিতে। কিন্তু তার পরেই মেয়েটা নিল ত্রাতার ভূমিকা। জীবনটাই অদ্ভুত।

সে জিনার হাত আবেগে চেপে ধরে বলল, আমার জন্য তুমি এতটা করলে কেন?

জিনা একটু হাসল। বলল, সুযোগ পেলে পরে বলব।

আমি তোমার ঋণ কীভাবে শোধ করব বলল তো!

কেউ কারও কাছে ঋণী নয়। আমরা সবাই মানবতার জন্য যেটুকু পারি, করি।

জিনা, তুমি স্ট্রিপটিজ ছেড়ে দাও। তুমি তো সামান্য মেয়েমানুষ নও যে শরীর বেচে খাবে।

যাদের শরীর ছাড়া আর কিছু নেই তারা কী করবে বলো তো?

তোমার অনেক কিছু আছে জিনা। তুমি এক মহান নারী।

জিনা হাসল, এরকম কথা এর আগে আমাকে আর কেউ বলেনি। তুমিই প্রথম।

এটা তোষামোদ নয়। আমি আমার সত্যিকারের মনের কথা বললাম।

জানি। তোমার মুখ দেখে মনে হয় তুমি ধূর্ত নও। এই নাও তোমার টিকিট।

গোপীনাথ তার চেকবই বের করে সই করল। জিনার হাতে দিয়ে বলল, কিছু বেশি টাকা আছে, নিয়ো!

জিনা অবাক হয়ে বলল, কেন?

আমি চাই তুমি সাত দিন ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে এসো। এটা এক বন্ধুর প্রীতি উপহার।

জিনা চেকটা হাতে নিয়ে চোখ বড়বড় করে বলল, কিন্তু এ তো অনেক টাকা!

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, বেশি নয় জিনা, মোটেই বেশি নয়। তুমি তো জানো না মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যখন মৃত্যুর মুখে বসে আছি তখন আমি উত্তরাধিকারী খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার টাকা পয়সা, ভিলা, গাড়ি কাকে দিয়ে যাব বলো তো! পাঁচ ভূতে লুটে নিত সব। এখনও আমার উত্তরাধিকারী নেই। আমি যদি মারা যাই আমারটা ভোগ করার কেউ নেই।

তা বলে এত টাকা!

টাকার অঙ্কটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওটা কিছু নয়।

জিনা তাকে হঠাৎ কাছে টেনে এনে গালে একটা পর একটার চুমু খেয়ে বলল, তোমাকে ধন্যবাদ।

গোপীনাথ আর একটা চেক তাড়াতাড়ি সই করে হাস্যমুখী মারিয়ার হাতে দিয়ে বলল, খুকি তোমাকে এটা দিচ্ছি কেন জানো? এটা ঘুষ। যত তাড়াতাড়ি পারো

ওই মোটরবাইকটা ঝেড়ে ফেলে একটা গাড়ি কিনে নাও। দু'চাকা বড্ড বিপজ্জনক জিনিস।

চেকটার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে একটা শিস দিল মারিয়া। বলল, আমি জীবনে একসঙ্গে এত টাকা দেখিনি।

লজ্জিত গোপীনাথ বলল, বন্ধুর সামান্য উপহার।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে গোপীনাথ ভিতরের দিকে পা বাড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল। দুটি মেয়ে তার দিকে করুণ গম্ভীর মুখ করে চেয়ে আছে। গোপীনাথ মুখ ফিরিয়ে নিল। তার কান্না আসছে।

মধ্যরাত্রির এখনও একটু দেরি আছে। সে বিমানবন্দরের বিবিধ বিধি অতিক্রম করে একসময়ে লাউঞ্জে পৌঁছে গেল। ডিসপ্লে মনিটার দেখল, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রোম ছেড়ে যাবে।

গোপীনাথ একটা আরামদায়ক আসনে বসে গা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল। গত কয়েক ঘণ্টায় তার ওপর দিয়ে উদ্বেগ ও অশান্তির যে ঝড় বয়ে গেছে তার ফলে সে গম্ভীরভাবে ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। গোপীনাথের একটু ঝিমুনিও এসেছিল।

হঠাৎ কানের কাছে কে যেন পরিষ্কার বাংলায় বলল, বাঃ, এই তো চাই। আপনি তা হলে এসে গেছেন।

গোপীনাথ চমকে উঠে যাকে তার পাশের সিটে দেখল তার মতো অপ্রত্যাশিত লোক হয় না। তার শরীর হিম হয়ে গেল। পাশে বসে দাতা।

চমকে গেলেন নাকি?

আপনি?

আরে ভয় পাচ্ছেন কেন, সব কিছুর পিছনেই তো আমি।

তার মানে?

জিনা তো আমারই লোক।

গোপীনাথ হাঁ হয়ে গেল।

১৯.

আকস্মিক সাক্ষাৎকারের ধাক্কাটা সামলাতে গোপীনাথের কিছুক্ষণ সময় লাগল। লোকটা বাঙালি বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে এই লোকটাই ভিকিজ মব-এর প্যারিস শাখার চাঁই, আর ভিকিজ মব যে তার পরম শত্রু সেটা আর সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

গোপীনাথ তার অশান্ত হৃদযন্ত্রকে কিছুক্ষণ সময় দিল শান্ত হতে। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, আপনারা কী চান বলুন তো?

দাতা একটু হেসে বলল, আমরা কী চাই তা তো আপনার অজানা নয়। আমার বন্ধু পল প্যারিসে আপনার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল। এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রির সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রিন্ট আউট।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি কি সায়েন্টিস্ট?

না। কিন্তু বন্ধু পল একজন ছোটখাটো বিজ্ঞানী। গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রি কত বড় প্রোজেক্ট তা আপনি জানেন। পলকে আমি বুঝিয়ে বলেছিলাম অত বড় একটা কাজের হাজারো দিকের হদিশ দেওয়া সহজ নয়। তা ছাড়া আমি সাক্কি ছেড়ে দিয়েছি, এখন তা আরও অসম্ভব। আপনি তো জানেন, সাক্কি আমাকে কীভাবে নজরবন্দি করে রেখেছিল। আপনি আমাকে উদ্ধার করেছিলেন।

হ্যাঁ। তারপর আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, জিনা আপনার লোক অমি তা জানতাম না। জিনাকে আমার ভাল মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওখান থেকে আমাকে বের করে আনার নাটকটা করলেন কেন?

আপনি বেনভেনুটি আর বাসিলোঁকে চেনেন কি?

বাসিলোঁর নামটা শোনা।

হ্যাঁ, বেনভেনুটিও বিখ্যাত লোক। প্রাক্তন বক্সার। একটা মাফিয়া দলের নিচু দরের অপারেটর। নির্বোধ, কিন্তু ভয়ংকর। আপনার ওপর ওদের প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল, কারণ রুমিং হাউস থেকে পালিয়ে এসে আপনি ওদের বিপদে ফেলেছিলেন।

তাই নাকি? আমি এত কিছু জানতাম না।

আপনি জিনার সঙ্গে পালিয়ে আসার মাত্র আধ ঘণ্টা আগে আমি খবর পাই যে, ওরা আসছে। জিনাকে সেইমতো সংকেত পাঠাই। জিনা আপনাকে নিয়ে পালিয়ে আসে।

জিনাকে কীভাবে সংকেত পাঠালেন? টেলিফোন তো বাজেনি।

দাতা হাসল, ইলেকট্রনিক্সের এই যুগে একজন বৈজ্ঞানিকের মুখে এই কথা? জিনার গলায় একটা সরু হার আছে, দেখেছেন? তার লকেটে....

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি। এবার কী হবে?

দাতা মাথা নেড়ে বলল, কিছু হবে না। আপনাকে আমি নির্ভয়ে কলকাতা পর্যন্ত যেতে দিচ্ছি। কলকাতায় আপনি আপনার নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকবেন। কেউ বাধা দেবে না। সেইখানে বসে ঠান্ডা মাথায় আপনি এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রি-র ব্লু প্রিন্টটা তৈরি করবেন।

অসম্ভব!

জানি। আমরা আপনাকে সাহায্য করব। কিছু তথ্য আমরা আপনাকে দিচ্ছি। এগুলোকে লিঙ্ক আপ করা আপনার পক্ষে হয়তো সম্ভব। জিনিসটা একটা মারাত্মক পোর্টেবল ক্ষেপণাস্ত্র আমরা তার সবটুকু জানতে চাই। সবটুকু হলেও অনেকটাই আপনি জানাতে পারবেন।

কলকাতায় কি আমি নিরাপদ?

মৃদু একটু হেসে দাতা বলল, নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে কাকে দিতে পারে বলুন তো?

আপনি পারেন। কারণ আপনার অর্গানাইজেশনই আমাকে হুমকি দিয়েছিল।

দাতা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, আপনি বিজ্ঞানের মানুষ, নিজের কাজ নিয়ে থাকেন। পৃথিবীর অন্ধকার জগতের খবর রাখেন না। যদি রাখতেন তা হলে বুঝতেন, অপরাধের জগৎও কী বিপুল।

আপনি এই জগতে ঢুকলেন কেন?

সেটাও আমার কাজ। তবে আমার পা দু'নৌকায়। সেসব আপনি বুঝবেন না। বোঝার দরকারও নেই।

আন্তর্জাতিক একটা অপরাধ চক্রের চাঁই একজন বাঙালি, এ যে আমি ভাবতেই পারি না।

তা হলে ভাববার দরকার কী? ওসব না ভাবাই ভাল। বাঙালি একটা জাতিসূচক পরিচয় মাত্র। মানুষকে কত ভাবে বাঁচতে হয়।

দাতা তার পাশে রাখা একটা চামড়ার ব্যাগ খুলে একটা ফাইল বের করল। ফাইলটা তার হাতে দিয়ে বলল, এটা সঙ্গে রাখুন।

কী এটা?

এর মধ্যেই আপনার সাধের এক্স টু থাউজ্যান্ড থ্রি-র তথ্যগুলো আছে। সাজিয়ে নেওয়া আপনার কাজ।

আমার কলকাতার ফ্ল্যাটে কম্পিউটার নেই।

দাতা অবাক হয়ে বলল, কে বলল নেই?

আমিই বলছি। কলকাতায় খুব কম যাই, গেলেও বিশ্রাম নিই বলে কম্পিউটার রাখি না।

ওসব ভাববেন না। আপনার ফ্ল্যাটে গেলেই দেখতে পাবেন যে, সেখানে একটা কম্পিউটার বসানো রয়েছে।

গোপীনাথ হাঁ করে দাতার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আপনি তো সাংঘাতিক লোক?

বিনীতভাবে দাতা বলল, নানা, আমি তেমন কিছুনই। আসলে আমাদের অর্গানাইজেশনের হাত খুব লম্বা। তারা সব পারে।

তা বটে।

আর-একটা কথা। সাক্কি কিন্তু জানে যে, আপনি রুমিং হাউস থেকে পালিয়েছেন। তারা এটাও অনুমান করবে যে, আপনি ইতালি ছাড়ার চেষ্টা করবেন।

গোপীনাথ তটস্থ হয়ে বলল, তাই নাকি?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, তা বটে।

সুতরাং একটু সাবধান থাকবেন।

কীরকম সাবধান?

তা জানি না। সেটা নিজেই ঠিক করে নেবেন।

আপনি কি আমার সঙ্গে এই ফ্লাইটেই যাবেন?

মাথা নেড়ে দাতা বলল, না। আমি যাব অন্য জায়গায়, অন্য কাজে। আপনার ভয় নেই, ভিকিজ মব আপনার পিছু নেবে না। যতদিন আমাদের কথা শুনে চলবেন ততদিন নয়।

আর সাক্কি?

সাক্কি একটা কোম্পানি। তারা তো গুন্ডামি করে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে পেশাদার গুন্ডা লাগায়। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। আমি শুধু আপনাকে সতর্ক করতে পারি।

ধন্যবাদ।

লম্বা ও সুপুরুষ লোকটা উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বলল, চলি, এটা আমার টার্মিনাল নয়। আমার ফ্লাইট অন্য টার্মিনালে। কখনও দেখা হয়ে যাবে হয়তো।

গোপীনাথ কথা বলল না। শুধু হাতটা একবার তুলল।

লোকটা দ্রুত পদক্ষেপে লাউঞ্জ পেরিয়ে কোন দিকে যে চলে গেল তা বুঝতে পারল না গোপীনাথ। কিন্তু লোকটার গতিবিধি যে অবাধ তাতে সন্দেহ রইল না তার।

আরও আধ ঘণ্টা বাদে প্লেনে ওঠার নির্দেশ ফুটে উঠল মনিটরে। খুব ধীরে উঠল গোপীনাথ। এগোতে লাগল যন্ত্রের মতো। মাথায় চিন্তার ঝড়।

যখন সিকিউরিটির গাঁট পেরিয়ে প্লেনের ভিতরে ঢুকল তখনও তার গভীর অন্যমনস্কতা কাটেনি।

সাধারণত আইল সিট তার প্রিয়। আজ সে ইচ্ছে করেই আইল সিট নেয়নি। নিয়েছে জানালার ধার। প্লেনের পিছনে প্রায় টয়লেটের কাছাকাছি। পিছনে মাত্র দুটো রো।

অ্যাটাচি কেসটা পাশে নিয়েই বসল সে। ফাইলটা কোলের ওপর রেখে খুলল। কম্পিউটার প্রিন্ট আউট এবং মাইক্রো ফিমের অনেক কিছুই জোগাড় করেছে এরা। ফাইলটা বন্ধ করে অ্যাটাচি কেসটা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সে। কেসটা সিটে তার শরীর ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রেখে সে বসল।

গভীর রাত। প্লেনে অনেক ভারতীয় যাত্রী। বাংলা কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছে সে। কিন্তু তার ভারতীয়ত্ব অর্ধমৃত। দীর্ঘকাল বিদেশে বসবাসের ফলে বাঙালি বা ভারতীয় দেখলেই আজকাল আর হামলে পড়তে ইচ্ছে যায় না।

পাশের সিট দুটো খালি ছিল। একজোড়া স্বামী-স্ত্রী এসে বসল এবং গোপীনাথ খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কারণ দু'জনেই বাঙালি। মহিলাটি শাড়ি পরা, সিঁথিতে সিঁদুর। সে বাঙালি টের পেলেই আলাপ জমানোর চেষ্টা করবে।

গোপীনাথ ঘুমের ভান করে সিটে এলিয়ে রইল।

হঠাৎ শুনতে পেল মহিলাটি তার স্বামীকে খুব চাপা গলায় বলল, হ্যাগো, ভদ্রলোককে বললে জানালার পাশের সিটটা ছেড়ে দেবে না?

আরে নাঃ, ওসব বলতে গেলে রেগে যাবে হয়তো।

রাগবে কেন? ভালভাবে বললে ঠিক ছেড়ে দেবে। মুখ দেখে তো ভাল লোকই মনে হচ্ছে, বোধহয় বাঙালিই।

তোমার মাথা। জানালার পাশে বসেই বা কী দেখবে? বাইরের কিছু দেখা যায়?

আহা, আজ চাঁদ উঠেছে দেখোনি? জানালার পাশে বসে জ্যোৎস্না দেখব।

দেখতে হবে না। ঘুমিয়ে পড়ো। গত কুড়ি দিনে অনেক কিছু দেখেছ। জ্যোৎস্নাটা বাদ দাও।

অনেক কিছু না হাতি। প্যাকেজ টুরে কিছু কি দেখা যায়? লুভ্র মিউজিয়ামটায় মাত্র একদিন নিয়ে গেল। রোমও তো কিছু দেখা হল না।

আচ্ছা, পরে আবার আসা যাবে।

আর এসেছ! এবার আসতেই কত সাধাসাধি করতে হয়েছে।

ছেলেমেয়ে রেখে বিদেশ বেড়াতে আমার ভাল লাগে না বলেই আপত্তি ছিল।

ওরা এখন বড় হয়ে গেছে। অত চিন্তা করো কেন বলো তো পুরুষমানুষ হয়ে?

আমার মন তোমার মতো শক্ত নয়।

মহিলা বললেন, এরা কিন্তু আমাদের খুব খাওয়ার কষ্ট দিয়েছে। এরকম জানলে এদের সঙ্গে আসতামই না। খেতে গিয়েই তো টাকা সব ফুরিয়ে গেল, মার্কেটিং হলই না।

আর মার্কেটিং! ইউরোপে যা জিনিসের দাম? ওসব মার্কেটিং দেশে করলে দশ ভাগের এক ভাগ দামে পাওয়া যেত।

ওগো, ভদ্রলোক বোধহয় ঘুমোননি। হাঁটু নাড়ছেন। বলবে?

আরে না, প্লেনে যে যার সিট বেছে নেয়। বললে রেগে যাবে।

আমি বাজি ফেলতে পারি, ভদ্রলোক বাঙালি।

বাঙালিরা তো আরও প্রতিবাদী হয়।

ধ্যাত, তুমি কোনও কাজের নও।

গোপীনাথ আর পারল না। চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বলল, আসুন, আপনি এই সিটে বসুন।

মহিলা জিভ কেটে হেসে ফেললেন, এ মা, আপনি আমার কথা শুনতে পেলেন নাকি?

না না, একদম শুনতে পাইনি। কিন্তু আকাশে আজ যে জ্যোৎস্নাটা উঠেছে সেটা মনে হল এক্সক্লুসিভলি মহিলাদের জন্যই। আসুন, লজ্জার কিছু নেই।

একটু 'না না' করে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা জানালার দিকে সরে গেলেন। গোপীনাথ আইল সিটে বসল। ওপরের ক্যাবিনেটে অ্যাটাচি রাখতে ভরসা পাচ্ছে না। পাশেই রাখল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এনআরআই?

কী করে বুঝলেন?

বোঝা যায়।

হ্যাঁ, আমি এনআরআই-ই বটে।

আমার নাম গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলি।

আমি গোপীনাথ বসু।

কোথায় থাকেন?

রোমে।

দু-চার কথা আলাপ জমে উঠছিল। কিন্তু এই আলাপটা খুব একটা চাইছিল না গোপীনাথ। তার চারদিকে নজর রাখা দরকার। সে আড়চোখে ভিতরটা দেখে নিয়েছে। সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়নি। সামনের দিকে কয়েকজন বিদেশি আছে বটে, কিন্তু তারা মাফিয়া কি না কে বলবে।

গৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ল। কেবিন লাইটগুলো নিভে গেল একে একে। প্লেন ভেসে চলেছে আকাশের অনেক ওপর দিয়ে।

আজ রাতে গোপীনাথের ঘুম আসবে না। সে মাথাটা এলিয়ে রেখে চোখ বুজে রইল। সামনে অনিশ্চিত একটা সময়। সে নিজের পরিস্থিতি বুঝতে পারছে না।

ঘণ্টাখানেক বাদে হঠাৎ সে একটু চমকে উঠল। সামনের চারটে রো আগে একটা লম্বা লোক আধো অন্ধকারে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। লোকটা বিদেশি। লোকটা পিছনের দিকে আসছে।

অ্যাটাচি কেসটা শক্ত করে চেপে ধরল গোপীনাথ। লোকটা তাকে পেরিয়ে টয়লেটের দিকে চলে গেল। একটু বাদে ফিরে গেল নিজের সিটে।

গোপীনাথ ভাবল, আমার কি রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে?

ঘড়িতে যখন রাত তিনটে তখনই পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয় ঘটে গেল। প্লেনের ভিতরটা ঝলমল করে উঠল সকালের আলোয়।

গৌরাঙ্গ একটা হাই তুলে বলল, সকাল হয়ে গেল বুঝি?

হ্যাঁ। আমরা পুবদিকে যাচ্ছি তো, তাই।

বেশ মজার ব্যাপার। আচ্ছা, এরা ব্রেকফাস্ট কখন দেবে?

দেবে।

লোকটা টয়লেটে গেল। মহিলা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এঁরা কষ্ট করে ইউরোপ ভ্রমণ করে এলেন প্যাকেজ ট্যুরে। এই টুরগুলো মধ্যবিত্ত বাজেটে বাঁধা থাকে বলে খানিকটা কষ্ট হয়।

গোপীনাথ খুব সন্তর্পণে চারদিকটা দেখল। টয়লেটে যাওয়া দরকার, কিন্তু অ্যাটাচি কেসটা কারও জিম্মায় না দিয়ে যায় কী করে? একটু অপেক্ষা করার পর গৌরাঙ্গ ফিরলে সে বিনীতভাবে বলল, দয়া করে অ্যাটাচি কেসটা একটু নজরে রাখবেন? আমি টয়লেট থেকে আসছি।

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে বলল, উড়ন্ত প্লেন থেকেও চুরিটুরি হয় নাকি?

গোপীনাথ একটু লজ্জা পেল। বাস্তবিক, প্রস্তাবটাই অবাস্তব। মৃদু হেসে বলল, কত কী হয়।

গৌরাঙ্গ বলল, আমার অবশ্য ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের তেমন অভিজ্ঞতা নেই। ঠিক আছে, আপনি যান।

টয়লেট থেকে যখন ঘুরে এল গোপীনাথ তখন বারো-তেরো মিনিট কেটেছে। এসে দেখল, অ্যাটাচি নেই, গৌরাঙ্গ নেই। শুধু মহিলাটি ঘুমোচ্ছন।

আতঙ্কে খানিকক্ষণ স্ট্যাচু হয়ে রইল গোপীনাথ। তারপর ভদ্রমহিলাকে হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে হিংস্র গলায় বলল, আপনার হাজব্যান্ড কোথায়?

মহিলা ভয় পেয়ে সোজা হয়ে বললেন, জানি না তো! আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।

সর্বনাশ! বলে গোপীনাথ সামনের দিকে দ্রুত পায়ে ছুটে গেল। উড়ন্ত প্লেন থেকে কেউ কখনও পালাতে পারেনি। সুতরাং লোকটাকে ধরা যাবেই।

ধরা গেল সহজেই। গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলি খাবারের ঘরের সামনে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে একজন এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করতে করতে কফি খাচ্ছে। গোপীনাথের অ্যাটাচি কেস তার ডান হাতে। গোপীনাথ গিয়ে তার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সেটা।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, ও আপনি? আমি ভাবলাম ছিনতাই হচ্ছে বুঝি। ভাবলাম, যখন দেখতে বলে গেছেন তখন অ্যাটাচি কেসটায় গুরুতর জিনিস আছে। তাই এটা নিয়েই কফি খেতে এসেছিলাম।

গোপীনাথ অপ্রস্তুতের একশেষ। মৃদু স্বরে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন।

২০.

গোপীনাথ বুঝতে পারছে পরিস্থিতির চাপে সে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। নার্ভাস, নির্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না আনতে পারলে সে হয়তো আরও বোকার মতো কাণ্ড করে ফেলবে। গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলির হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা কেড়ে নিয়ে সে এমন একটা কাণ্ড করল যা আশেপাশের সকলের চোখে পড়েছে।

নিজের সিটে ফিরে এসে সে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। মিসেস গাঙ্গুলির ঘুম সে এমন ভাবেই ভাঙিয়ে দিয়েছে যে ভদ্রমহিলা জড়সড় হয়ে বসে ভিতু ভিতু চোখে মাঝে মাঝে তাকে দেখছে। বড় লজ্জা করছে গোপীনাথের। ভদ্রমহিলার হাঁটু সে খিমচে দিয়েছিল।

গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলি সিটে ফিরল আরও প্রায় দশ মিনিট পর। বউকে বলল, গুহবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। পরশু পাস্তা খেয়ে পেট খারাপ হয়েছিল। এখন ভাল আছেন।

বউ একটু গুম হয়ে আছে। শুধু বলল, ও।

এখনই বউটি ফিসফিস করে গৌরাঙ্গর কাছে এবং গৌরাঙ্গ ফিসফিস করে বউয়ের কাছে তার বিষয়ে বলবে। তখন গোপীনাথের ভাবমূর্তি যে এদের কাছে কী হবে তা ভাবতেই গোপীনাথের বড্ড লজ্জা হচ্ছে। ফিরে আসার পর গৌরাঙ্গ বা তার বউ তার সঙ্গে কথা বলছে না, এটাও অস্বস্তিকর। যদিও প্লেন থেকে নেমে যাওয়ার পর আর কারও সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, তবু একটা বিচ্ছিরি ঘটনার তেতো স্বাদ থেকে যাবে। গোপীনাথ তাই এদের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করার উপায় ভাবতে লাগল।

হঠাৎ একজন তরুণী এয়ার হোস্টেস তাদের সামনে এসে মিসেস গাঙ্গুলিকে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার গোপীনাথ বসুর এই সিটে বসার কথা। তিনি কোথায়?

গাঙ্গুলির বউ থতমত খেয়ে গোপীনাথকে দেখিয়ে দিয়ে বাংলায় বলল, উনি এই সিটে ছিলেন।

এয়ার হোস্টেস নিচু হয়ে প্রায় তার কানে কানে বলল, ইউ আর ওয়ান্টেড অন দি ফোন স্যার। ইটস ইন্টারপোল!

ইন্টারপোল! গোপীনাথ তটস্থ হল। ইন্টারপোল তাকে চাইছে কেন?

এবার সে আর অ্যাটাচি কেসটা সঙ্গে নিল না, গৌরাঙ্গকে দেখতেও বলে গেল না। সেটা পড়ে থাকল তার সিটে। যাক, ওইটুকুই তার গৌরাঙ্গ আর তার বউয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা।

টেলিফোনে নির্ভুল দাতার কণ্ঠস্বর, কেমন আছেন?

ভালই।

কোনও ঘটনা ঘটেনি তো!

না। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

প্যারিস। শুনুন, আপনার পিছনে দুটি ছায়া আছে।

তার মানে?

ইউ আর বিয়িং শ্যাডোড বাই টু অপারেটর্স।

তারা কারা?

সাক্কির ভাড়া করা মাফিয়ারা।

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, কী করব বলুন তো!

সতর্ক থাকবেন।

সতর্কই আছি।

আমার অনুমান ওরা প্লেনের ভিতরে কিছু করবে না।

কোথায় করবে এবং কী করবে সেটাই জানা দরকার।

কিছুই বলা যায় না। আপনি যে তিমিরে আমিও সেই তিমিরে। আপনি ভয় পাননি তো?

যথেষ্ট নার্ভাস বোধ করছি। কারণ আমি তো বিপজ্জনক জীবন যাপন করি না। এসব অভিজ্ঞতা নতুন।

তা হলে অভিজ্ঞতাটা হোক। জীবনের এসব দিক সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা দরকার।

তাই দেখছি।

এবার ভাল করে শুনুন। আমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন তো! পাচ্ছি। আর ঘণ্টা দেড়েক বাদে আপনার প্লেন দিল্লিতে নামবে। নামবার সময় আপনি মোটেই তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনার আগে অন্য সবাইকে নামতে দেবেন। প্রত্যেকটা লোককে ওয়াচ করার চেষ্টা করবেন।

ঠিক আছে। অ্যাটাচি কেসটা কখনও হাতছাড়া করবেন না। গোপীনাথ একটু শঙ্কিত গলায় বলল, কিন্তু এখন তো ওটা আমি সিটে রেখে এসেছি। সর্বনাশ। তা হলে! ওতে যা আছে সেগুলো তো কপি মাত্র। আপনার সঙ্গে তো আরও কপি আছে।

আছে আবার নেইও। ওতে এমন কিছু ইনফর্মেশন আছে যা হাতছাড়া হলে আমাদের হয়তো তেমন ক্ষতি হবে না, কিন্তু শত্রুপক্ষ বিরাট দাও মেরে দেবে।

আমি সিটে ফিরে যাচ্ছি। শুনুন। যে দু'জন অপারেটর আপনাকে ফলো করছে তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে যেমন করেই হোক। কথাটা খেয়াল রাখবেন।

চেষ্টা করব। ফোন রেখে গোপীনাথ দ্রুত পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল। অ্যাটাচি কেসটা রয়েছে জায়গামতোই। আছে গৌরাঙ্গ এবং তার বউও। তবে গৌরাঙ্গ তার দিকে কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে।

সে বসার পর কিছুক্ষণ ফাঁক দিয়ে গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলি হঠাৎ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

নিশ্চয়ই। করুন না।

আপনার অ্যাটাচি কেসটায় কী আছে জানি না, কিন্তু আপনি কি কোনও বিপজ্জনক বা গোপনীয় জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন? আপনি উঠে যাওয়ার পর একটা কালোমতো লোক ওদিক থেকে এসে অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে বলল, মিস্টার বোস এটা চাইছেন, নিয়ে যাচ্ছি।

বলেন কী?

ঠিকই বলছি। লোকটা খুব লম্বা, অন্তত ছ'ফুট দু'ইঞ্চি হবে। ব্ল্যাক।

আপনি কী করলেন?

আমি বললাম, না, অ্যাটাচিটা আপনি আমার হেফাজতে রেখে গেছেন। সুতরাং দরকার হলে আমি নিয়ে যাব।

আপনাকে ধন্যবাদ। লোকটা কী করল?

ইংরিজিতে বলল, আপনার নাকি খুবই দরকার অ্যাটাচিটা না হলেই নয়। একটু টানাহ্যাঁচড়াও করছিল।

তারপর?

গায়ের জোরে পারতাম না। কিন্তু হঠাৎ দু'জন এয়ার হোস্টেস এসে পড়ল। তারা লোকটাকে বলল নিজের জায়গায় চলে যেতে। লোকটা বিড়বিড় করে বোধহয় গালাগাল দিতে দিতেই চলে গেল সামনের দিকে।

লোকটা কোথায় বসেছে বলুন তো!

জানি না। সামনের কোথাও হবে।

আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব! আপনার সঙ্গে আমি একটু অভদ্র ব্যবহারও করেছি। বিশেষ করে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে। আপনারা দুজনেই আমাকে মাপ করে দেবেন। আমি একটা বিশেষ টেনশনের মধ্যে রয়েছি।

আরে তাতে কী হয়েছে? আমরাও বলাবলি করছিলাম যে আপনার একটা টেনশন চলছে।

সম্পর্কটা সহজ হওয়ায় একটা শ্বাস ফেলল গোপীনাথ। তারপর অ্যাটাচিটা খুলল।

গাঙ্গুলি পাশ থেকে আড়চোখে অ্যাটাচির অভ্যন্তরটা দেখে নিয়ে বলল, ইম্পর্ট্যান্ট পেপার্স।

হ্যাঁ।

কাগজপত্র ঠিক আছে দেখে ফাইলটা বন্ধ করে অ্যাটাচিটা ফের পাশে রাখল সে। ব্রেকফাস্ট আসছে। আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই দিল্লি।

ব্রেকফাস্টে মোটেই মন বসাতে পারছিল না সে। পাশের গাঙ্গুলিরা অবশ্য গোগ্রাসে খাচ্ছিল। খাওয়ারই কথা। ট্রাভেল এজেন্টদের সঙ্গে ইউরোপ ঘোরা মানেই খাওয়ার কষ্ট। গোপীনাথ যতদূর জানে ওরা ব্রেকফাস্ট ছাড়া মোটে আট-দশটা রাউন্ড মিল দেয়। সুতরাং ডিনার আর লাঞ্চ খেতে হয় নিজের পয়সায়, যেটা অধিকাংশ ভারতীয় ভ্রমণকারীই পেরে ওঠে না। ইউরোপে খাবারদাবারের দাম এঁদের পথে বসিয়ে দেয়।

বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট খাওয়ায় তো এরা।

হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে কোনও আইটেম আবার চাইতে পারেন।

গাঙ্গুলি তার বউয়ের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কিছু নেবে?

না বাবা, অনেক খেয়েছি।

গাঙ্গুলি বলল, কলকাতায় যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

কোথায় থাকেন?

গোপীনাথ কথাটা চেপে গিয়ে বলল, দেশের সঙ্গে বহুকাল সম্পর্ক নেই। হোটেলেই থাকতে হবে।

গ্র্যান্ড নাকি?

দেখা যাক।

 আপনারা যারা বিদেশে থাকেন তারা বেশ আছেন। অঢেল পয়সা। আমরা গ্র্যান্ডে এক রাত্রি কাটানোর কথাও ভাবতে পারি না।

হোটেলে থাকা কি ভাল?

টুকটুক এসব কথাবার্তায় সময় কেটে যাচ্ছিল। অবশেষে সিটবেল্ট বাঁধা ও সিগারেট নিবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ঘোষিত হল। তারপর অবতরণের সূচনা।

গোপীনাথ মনে মনে সংযত ও শক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সামনেই কি বিপদ?

প্লেন টার্মিনালের গায়ে যখন এসে ঠেকল তখন যাত্রীদের মধ্যে নামবার বেশ হুড়োহুড়ি। গাঙ্গুলিরাও ব্যস্তসমস্ত।

গৌরাঙ্গ বলল, নামবেন না? কলকাতার ফ্লাইট এখনই ছাড়বে। আজ ডিরেক্ট ফ্লাইট।

হা নামব। আপনারা এগোন, আমি যাচ্ছি।

গৌরাঙ্গ সস্ত্রীক আর অপেক্ষা করল না। ঘরমুখো বাঙালিকে ঠেকায় কার সাধ্য।

গোপীনাথ অপেক্ষা করল। প্লেনের পিছন দিকটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। যখন সব লোক দরজার কাছ বরাবর চলে গেছে তখন হঠাৎ গোপীনাথের মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। যদি কেউ বাথরুম টয়লেটে লুকিয়ে থেকে থাকে তবে এই তার সুযোগ। সে চট করে উঠে পড়ল এবং দ্রুত পায়ে এগোতে লাগল সামনের দিকে।

সিদ্ধান্তটা যে সে ঠিকই নিয়েছে সেটা বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গেই। পিছনে একটা ক্লিক শব্দ শুনে চট করে পিছনে তাকিয়ে সে একটা লোককে দেখতে পেল। লোকটা মাঝারি উচ্চতার এক সাহেব। চওড়া কাঁধ এবং বিশাল স্বাস্থ্য। লোকটা তার দিকে চিতাবাঘের মতো ছুটে আসছিল।

গোপীনাথ জীবনে কখনও শারীরিক সংঘর্ষে যায়নি। আসলে যেতে হয়নি তাকে। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আত্মরক্ষার্থে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হল। ছুটে দরজা অবধি যাওয়ার সময় ছিল না। কেউ পিছু ফিরে দেখতও না কী হচ্ছে।

লোকটার হাতে একটা ছোরার মতো জিনিস। মারবে নাকি? লোকটা তার ওপর এসে পড়ার আগেই গোপীনাথ গিয়ে পড়ল লোকটার ওপর, হিংস্র আক্রোশ এবং সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে। কী করে লোককে মারতে হয় তা জানে না গোপীনাথ। তার সম্বল শুধু রাগ।

আর সেই রাগটাই পেশাদার মাফিয়া গুন্ডার বিরুদ্ধে আশ্চর্য সফল হয়ে গেল। গোপীনাথ লম্বা মানুষ, পায়ে একজোড়া ভারী ইতালিয়ান জুতো। সে তার লম্বা পায়ে লোকটাকে সরাসরি একটা জম্পেশ লাথি কষাল অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। লোকটা নিশ্চয়ই মারপিটের কৌশল জানে। বাগে পেলে গোপীনাথকে হালুয়া বানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু গোপীনাথ যে উলটে আক্রমণ করবে এটা প্রত্যাশা করেনি বলেই লাথিটা খেয়ে গেল লোকটা এবং উলটে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল দু’সারি আসনের মাঝখানে অপরিসর জায়গাটায়। পড়ার সময় সিটের হাতলে মাথাটা ঠুকেও গেল খুব জোরে।

গোপীনাথ দ্রুত দরজায় কাছে পৌঁছে গেল। শেষ চার-পাঁচজন যাত্রী বেরিয়ে যাচ্ছে। গোপীনাথ তাদের সঙ্গেই বেরিয়ে এল।

লাউঞ্জ পেরিয়ে কলকাতার প্লেন ধরার জন্য আর একটা লাউঞ্জে পৌঁছে গেল সে। কলকাতায় ফ্লাইটের ঘোষণা চলছে লাউড স্পিকারে।

গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলি আর তার বউ মুষ্টিমেয় কলকাতা-যাত্রীদের মধ্যে বসা। গৌরাঙ্গ তাকে দেখে বলে উঠল, দেরি হল যে!

একটু কাজ ছিল।

আসুন মশাই, বসুন এখানে। মেলা জায়গা। কলকাতার যাত্রী তো দেখছি নেই-ই।

সাবালক হওয়ার পর জীবনে এই প্রথম আজ সে একটা শরীরী সংঘর্ষে গেল। আর লাথি খেয়ে একটা লোক এখনও ওই প্লেনের মেঝেয় পড়ে আছে। ঘটনাটা এখনও বিস্মিত ও উত্তেজিত রেখেছে তাকে। সে বসে রুমালে মুখ মুছল। তারপর উঠে গিয়ে কল থেকে জল খেয়ে এল। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল তার।

গৌরাঙ্গ বলল, আপনাকে একটু রেস্টলেস লাগছে। শরীর ঠিক আছে তো?

আছে।

গৌরাঙ্গের বউ ওপাশ থেকে বলল, ওঁর কী সুন্দর ফিগার দেখছ না? শরীর খারাপ হবে কেন?

ফিগারের প্রশংসায় খুশি হওয়ার মতো অবস্থা এখন তার নয়। তবু ভদ্রতার হাসি হাসল সে।

গৌরাঙ্গ বলল, তা অবশ্য ঠিক। আপনার স্বাস্থ্যটা হিংসে করার মতোই। আপনি কী করেন বলুন তো?

চাকরি।

কোথায়?

রোমে।

বেশ আছেন। প্রাচীন শহর, কত কী দেখার আছে। আমাদের তো রোমটা দেখালই না। যাওয়ার সময় দু'দিন মাত্র ছিলাম। দু'দিনে আর কী দেখা যায় বলুন। ওই কলোসিয়ামটিয়াম যা একটু দেখাল। ফেরার সময় লন্ডন থেকে ছেড়ে দিল টিকিট দিয়ে।

আপনারা কি রোম থেকে ওঠেননি?

না মশাই, না। রোমে প্লেন আসতেই আমরা হ্যান্ডব্যাগট্যাগ নিয়ে টার্মিনালে গিয়ে উকিঝুঁকি মারলাম একটু।

তাই বলুন।

কলকাতার বিমানে ওঠার নির্দেশ ঘোষিত হল। গোপীনাথ চারদিকে নজর রাখছিল। না, লাথি খাওয়া লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

বিশাল এয়ারবাসের অভ্যন্তরে যাত্রীসংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশ জন হবে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসার পরও অভ্যন্তরটা হাঁ হাঁ করছিল।

গৌরাঙ্গদের পাশাপাশি সিট পড়েছিল তার। কিন্তু নির্দিষ্টসিটে বসার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং সে বসল গৌরাঙ্গদের পিছনের সারিতে জানালার ধারে।

প্লেন ছাড়তে কি একটু বেশি সময় নিচ্ছে? এখনও দরজা খোলা। কেউ কি উঠবে আরও?

গোপীনাথের বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। একটা দীর্ঘকায় লোক দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে একজিকিউটিভ ক্লাসের দিকে চলে গেল না! লোকটা তো কালোই মনে হল!

আরও কিছুক্ষণ দরজাটা খোলা রইল। একেবারে শেষ সময়ে গোপীনাথকে শিহরিত করে ঢুকল লাথি-খাওয়া লোকটা। গতি ধীর। একবার প্লেনের পিছন দিকে তাকাল। তারপর সামনের একজিকিউটিভ ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেল।

গোপীনাথ একটু ঘাবড়ে গেল। ফের নিজেকে সংযত করে নিল। একটা লাথি তত দিতে পেরেছে। ভয় কী?

২১-২৫. কলকাতা অবধি সময় লাগে

কলকাতা অবধি সময় লাগে পৌনে দু’ঘণ্টার মতো। এই পৌনে দু’ঘণ্টায় কী কী ঘটতে পারে তার সম্ভাবনা নিয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করছিল গোপীনাথ। কিন্তু মানসিক চঞ্চলতা তাকে নিবিষ্ট হতে দিচ্ছে কই?

প্লেন আকাশে উঠল বেশ কিছুক্ষণ পর। গোপীনাথ তার অ্যাটাচি আঁকড়ে বসে রইল সিটে। কিন্তু শক্ত হয়ে। প্রতিটি মিনিট কাটছে যেন ঘণ্টার লয়ে।

শীতের মেঘমুক্ত আকাশে প্লেনের গতি অতি মসৃণ। কোনও ঝাঁকুনি নেই, হেলদোল নেই। ছোট একটা পরদায় দেখানো হচ্ছে একটা ডকুমেন্টারি। গোপীনাথ সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও বুঝতে পারল না, ডকুমেন্টারিটা কী বিষয়ে। বাইরে উজ্জ্বল রোদ, নীল আকাশ, নীচে সবুজের বিস্তার। কিন্তু গোপীনাথ কিছুই উপভোগ করছে না। তার শ্যেনদৃষ্টি সামনের দিকে। একজিকিউটিভ এনক্লোজারে দু’জন সম্ভাব্য আততায়ী ওত পেতে আছে। তার একদা প্রভু কর্মকর্তারা ওদের নিয়োগ করেছে তাকে সস্নেহে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে।

কিন্তু কী লাভ তাতে সাক্কির? কয়েক কোটি টাকার অত বড় প্রোজেক্টের সর্বময় কর্তা গোপীনাথকে সরিয়ে দিলে যে প্রোজেক্টটাই অনেক পিছিয়ে যাবে। গোপীনাথ এও জানে, তার বিকল্প বিশেষজ্ঞ চট করে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। সাক্কি তা হলে তার বিরুদ্ধতা করছে কেন? সত্য বটে, কোম্পানিগুলোর কোনও নীতিবোধ থাকে না। সামান্য স্বার্থে ঘা লাগলেই তারা যে-কোনও মানুষকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু গোপীনাথ তো তাদের স্বার্থই দেখছিল। আদ্রেঁর কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে সে কোম্পানির উপকারই করতে চেয়েছে। কিন্তু কথাটা বোর্ডকর্তাদের বোঝাতে পারেনি সে। তারা গম্ভীর মুখে শুনেছে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। তাই এতদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে চাকরি করার পর তার বরাতে জুটল এই শত্রুতা। কিন্তু

গোপীনাথ কোম্পানির এই বিশ্বাসঘাতকতা হজম করতে পারছে না। রাগে তার ভিতরটা জ্বলছে।

রাগের একটা উপকারী দিকও আছে। রাগটা গনগনে হয়ে তার ভয়ডর কিছু কমিয়ে দিচ্ছে। রাগ তার ভিতরে কিছু শক্তিরও সঞ্চার ঘটাচ্ছে কি? হয়তো তাই।

আবার নতুন করে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হচ্ছে এই বিমানেও। সবিনয়ে ট্রে-টা প্রত্যাখ্যান করল গোপীনাথ। শুধু কফি খেল এক কাপ। বারবার ঘড়ি দেখছিল সে। সময় কাটছে না কিছুতেই। দিল্লি থেকে খবরের কাগজ বোঝাই হয় প্লেনে। যাত্রীরা খবরের কাগজ খুলে মন দিয়ে পড়ছে। গোপীনাথের সে ইচ্ছেটা অবধি হল না। দাতা বলেছে, এই দু'জন অনুসরণকারীর চোখে ধুলো দিতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব তাই ভাবছিল সে। এসব কাজে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। ভরসা এই যে, মাফিয়া গুন্ডারা কলকাতায় নতুন। সুতরাং গোপীনাথ হয়তো পারবে।

ক্রমে ক্রমে কলকাতা কাছে আসছে। বড্ড ধীর গতিতে অবশ্য। কিন্তু অমোঘভাবেই আসছে।

গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলি সামনের সিট থেকে উঁকি দিয়ে বলল, কী মশাই, সব ঠিক আছে তো! গোপীনাথ একটু হেসে বলল, ঠিক আছে।

গৌরাঙ্গ একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা রাখুন। দরকার হলে যোগাযোগ করবেন কলকাতায়।

গোপীনাথ কার্ডটা পকেটে রাখল।

ভাল কথা, এয়ারপোর্টে আমার গাড়ি থাকবে, যদি চান তো আপনাকে গ্র্যান্ড হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি। আমি গলফ ক্লাব রোডে থাকি। ওদিক দিয়েই যাব।

গোপীনাথ অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল, আমাকে রিসিভ করতে আমার এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে আসবে। তবু আপনাকে ধন্যবাদ।

ঠিক আছে। তবে যোগাযোগ করলে খুশি হব। একদিন ডিনার বা লাঞ্চে আমার বাড়িতে এলে আরও খুশি হব।

বিমান নামবার ঘোষণা হল। বিশাল বিমানটি হেলতে দুলতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে উচ্চতা হারাতে লাগল। গোপীনাথ দেখল, এখনও কেউ তার দিকে আসছে না। দুই মাফিয়া এখনও চোখের আড়ালে।

প্লেন নেমে পড়ল। গোপীনাথ একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। এটা কলকাতা, রোম নয়। গোপীনাথ আর তেমন অসহায় বোধ করছে না।

এবার সে আর ভুল করল না। দাতা তাকে বলেছিল সবার শেষে নামতে। আর সেটা করতে গিয়েই দিল্লিতে বিপদে পড়েছিল সে। এবার তা করবে না। সিঁড়ি লাগবার পর সে সকলের সঙ্গেই দরজার কাছে গিয়ে হাজির হয়ে গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, মাফিয়া দু'জনের দেখা নেই।

গোপীনাথ নামল। প্রথম গাঙ্গুলি দম্পতি এবং তার পরেই সে ইমিগ্রেশন পার হল। গাঙ্গুলিরা লাগেজের জন্য অপেক্ষা করবে। সুতরাং সে বেশ তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিয়ে সোজা প্রি-পেইড ট্যাক্সির কাউন্টারে চলে গেল। কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। লক্ষ অবধি করছে না।

ট্যাক্সিতে বসে সে যখন বালিগঞ্জের দিকে ছুটছে তখনও ভাল করে লক্ষ করল, কেউ তার পিছু নেয়নি। হতে পারে, মাফিয়ারা তার কলকাতার ঠিকানা জানে। তাই অকারণে কোনও অ্যাডভেঞ্চার করার ঝুঁকি নিচ্ছে না।

বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে নেমে খুব একটা নিরাপদ বোধ করল না গোপীনাথ। কারণ, দাতা তাকে বলেছে, তার ফ্ল্যাটে তারা একটা কম্পিউটার বসিয়ে দিয়েছে। এটা যদি সম্ভব, তা হলে ফ্ল্যাটের মধ্যে গোপীনাথের নিরাপত্তা বলতে আর কী থাকল?

লিফটে ছ'তলায় উঠে সে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলল। বিশাল তিন হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। দক্ষিণ আর পুবে চমৎকার ব্যালকনি। বিশাল হলঘর এবং তিনটে শোয়ার ঘর। সবগুলিই বড়। এ ছাড়া আলাদা সারভেন্টস রুম আছে।

ফ্ল্যাটে গোপীনাথ বড় একটা থাকে না। কচিৎ কখনও কলকাতায় এলে হোটেলেই থাকে। এমনকী সুব্রতর বাড়িতেও থাকে না। তবে বিবাহিত জীবনে বার দুই শ্বশুরবাড়িতে থেকেছিল। এতদিনকার বন্ধ ফ্ল্যাটে আশ্চর্যের বিষয়–ধুলোময়লা

তেমন জমেনি। বেশ চকচক ঝকঝক করছে সবকিছু। যেন কেউ সদ্য ঝটপাট দিয়ে ডাস্টিং করে গেছে।

হলঘরটা সোফাসেটে সাজিয়েছিল তার প্রাক্তন স্ত্রী। ফ্ল্যাটের সব আসবাবই তার পছন্দ করে কেনা বা বানিয়ে নেওয়া।

গোপীনাথ কিছুক্ষণ গা এলিয়ে একটা নরম সোফায় বসে রইল। জিরিয়ে নিয়ে সে হলঘরের এক কোণে রাখা টেলিফোনটা গিয়ে তুলল। হ্যাঁ, ডায়ালটোন আছে। টেলিফোনের রেন্টাল চার্জ থেকে শুরু করে ফ্ল্যাটের মেনটেনেন্স বা ট্যাক্স সবই সুব্রতই দেয়। তাকে টাকা পাঠিয়ে দেয় গোপীনাথ।

সুব্রতর বাড়ির নম্বরে ডায়াল করে তাকে পাওয়া গেল না। অফিসে পাওয়া গেল।

তার গলা পেয়ে সুব্রত গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, গোপীদা! আপনি বেঁচে আছেন। কোথা থেকে কথা বলছেন?

গোপীনাথ মৃদু স্বরে বলল, ওরে চেঁচাসনি, বেঁচে আছি বটে, কিন্তু কত দিন বেঁচে থাকব বলা যায় না। তবে এখনও বেঁচে আছি বটে। শোন, আমি এখন কলকাতায়।

কলকাতায়! মাই গড! সত্যি কলকাতায়?

হ্যাঁ রে, সত্যিই। নিজের ফ্ল্যাটে।

বলেন কী? রোম থেকে বেরোলেন কী করে? শুনলাম সেখানে নাকি গুন্ডারা আপনাকে ঘিরে রেখেছিল।

এত খবর তোকে কে দিল?

আমাদের বসের এক ইতালিয়ান বন্ধু আছে সাক্কিতে। সে-ই নাকি বলেছে।

তোর বস আমাকে চেনে?

খুব চেনে, আপনাকে তার ভীষণ দরকার। খুব চেষ্টা করছিল যোগাযোগ করতে।

খবরদার, আমার খবর কাউকে দিবি না। কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে।

কেন গোপীদা, এখন তো আপনি কলকাতায়। আর ভয় কীসের?

গোপীনাথ একটু হেসে বলল, তুই নিতান্ত ছেলেমানুষ। আন্তর্জাতিক গুন্ডাদের চিনিস না তো!

তার মানে কি এখানেও আপনার কিছু হতে পারে।

খুব পারে। ইন ফ্যাক্ট আমার পিছু পিছু দুটি গুন্ডা রোম থেকে কলকাতায় এসেছে। তাদের গতিবিধি এখনও বুঝতে পারছি না।

তা হলে আপনি আমার বাড়িতে চলে আসুন। ফ্যামিলির মধ্যে থাকলে কিছু করতে পারবে না।

না, তা হয় না। আমার বিপদের চেয়েও তখন তোদের ফ্যামিলির বিপদ বেশি।

কিছু হবে না গোপীদা।

কথা বাড়াস না সুব্রত। শোন, আমার এখন খিদে পেয়েছে। ধারেকাছে কোনও এমন দোকান আছে কি, যেখান থেকে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে?

ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনার ফ্ল্যাটে খাবার পৌঁছে যাবে। কী খাবেন বলুন।

ভাত খাব, ডাল খাব। আর যা হয়।

আর কিছু?

না, আপাতত আর কিছু নয়। অফিসের পর চলে আয়, একটু আড্ডা মারা যাবে।

বউদির সঙ্গে কথা বলবেন? লাইন ট্রান্সফার করতে পারি।

উঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না। ওরে গবেট, আমি যে কলকাতায় আছি এ খবরটা তোর বউদিকেও দেওয়া বারণ।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

শুধুই তুই জানলি, আর যেন কেউ না জানে। এমনকী তোর বাড়ির লোকও নয়। বুঝেছিস?

বুঝেছি। নিশ্চিন্ত থাকুন।

ঘরগুলো ঘুরে দেখতে গিয়ে স্টাডিতে কম্পিউটারটা আবিষ্কার করল গোপীনাথ। একটা স্টিলের টেবিলের ওপর বসানো। দামি জিনিস। বেশ কয়েক বাক্স ফ্লপি রয়েছে।

অ্যাটাচি কেসটা শোয়ার ঘরের স্টিলের আলমারিতে রেখে চাবি দিল সে। তারপর বাথরুমে গিয়ে গিজার অন করল। ভাল করে স্নান করা দরকার।

সারা ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে লক্ষ করল সে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, কেউ এটা খুব সম্প্রতি ঝাড়পোঁছ করেছে। শোয়ার ঘরের প্রত্যেকটা খাটের পাশে ছোট্ট কাশ্মীরি টুলের ওপর ফ্লাওয়ার ভাসে টাটকা ফুল। এরকমটা তো স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এসব করল কে? ভিকিজ মব-এর লোকেরা?

বাথটাবে জল ভরতি করে বেশ কিছুক্ষণ ঈষদুষ্ণ জলে বসে রইল গোপীনাথ। কলকাতায় এখনও বেশ শীত আছে। আবহাওয়া চমৎকার।

স্নান করে উঠে গোপীনাথ গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে দেখল। অনেক দিন আগে ব্যবহৃত জামাকাপড় এখনও রয়েছে কিছু। গোপীনাথ মোটা হয়নি। সুতরাং মাপেও হয়ে গেল। পাজামার ওপর একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি চাপিয়ে একটা শাল জড়িয়ে নিল গায়ে।

সুব্রতকে ফোন করার ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ডোরবেল বাজল। গোপীনাথ দরজা খুলে দেখল দু’জন লোক ঢাকা ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে।

গোপীনাথের সত্যিই খিদে পেয়েছে। লোক দুটো সযত্নে তার ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিল। অন্তত দশ রকমের আইটেম। দই-মিষ্টি অবধি।

খাওয়ার পর বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাতে ক’টার সময় কী কী খাবার দিয়ে যাবে তা জিজ্ঞেস করে নোট করে নিয়ে গেল। চমৎকার ব্যবস্থা। দাম নিল না। বলল, ওসব পরে হবে।

গোপীনাথ দরজা লক করে একটু শুয়ে রইল। শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। রোমে যেরকম বিপদ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল এখন পরিস্থিতি তেমন নয়। কিন্তু উদ্বেগ রয়েই গেল।

গোপীনাথের চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে।

বিকেল চারটে নাগাদ টেলিফোন বাজল।

একটা পরিচিত গলা বলে উঠল, এই যে! পৌঁছে গেছেন?

গম্ভীর গোপীনাথ বলল, হ্যাঁ।

কোনও ঘটনা ঘটেনি তো?

ঘটেছে।

কী বলুন তো! ওই যে একটা লোককে আপনি প্লেনে লাথি মেরেছিলেন।

অবাক গোপীনাথ বলল, হ্যাঁ, কিন্তু

আরে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওরা দু'জন আমার লোক।

গোপীনাথের এক গাল মাছি। সে বলল, আপনার লোক। আপনার লোকেরা আমাকে অ্যাটাক করবে কেন?

আক্রমণ নয়। আসলে ওরা আপনাকে অ্যালার্ট রাখতে চাইছিল। যাতে আপনি অসতর্ক না হয়ে পড়েন।

তা হলে মাফিয়ারা কোথায়?

তারাও আছে।

আপনি কি বলতে চান একগাদা টাকা খরচ করে আপনার দু'জন লোককে আপনি আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য বা অ্যালার্ট রাখার জন্য পাঠিয়েছেন।

না না। ওদের অন্য কাজ আছে। দে আর অন স্পেশাল ডিউটি, ঘাবড়াবেন না, ওরা আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না।

গোপীনাথ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আপনি আসলে কে বলবেন?

আমি হলাম দাতা।

সে তো জানি। কিন্তু আপনার আসল পরিচয়টা আমার জানা দরকার।

সবকিছু জানা কি ভাল? এসব পরিস্থিতিতে যত না জানবেন ততই মঙ্গল।

গোপীনাথ গম্ভীর গলায় বলল, অন্তত এটুকু কি বলবেন যে, হোয়েদার ইউ আর অন দি রাইট সাইড অব দি ল?

রাইট সাইডে থাকলেও রং সাইডেও মাঝে মাঝে যেতে হয়। আই অ্যাম অন বোথ দি সাইডস।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। প্লেনে এয়ার হোস্টেস বলেছিল, ইন্টারপোল থেকে আমাকে চাইছে। আপনি কি ইন্টারপোল?

তাও বলতে পারেন। কিন্তু ফরগেট মাই আইডেন্টিটি। এবার কাজের কথা বলি।

বলুন।

আজকের দিনটা আপনি বিশ্রাম নিন। কিন্তু কাল থেকে একটু কাজ শুরু করুন।

কী কাজ?

আদ্রেঁর কাজ। যেখানে আদ্রেঁ শেষ করেছিল সেখান থেকে শুরু করা দরকার। ইটস এ ম্যাটার অফ ভাইটাল ইম্পট্যান্স।

জানি। সলিড ফুয়েল।

হ্যাঁ। এ কাজ আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

আপনি কি তেল দিচ্ছেন নাকি মশাই?

আরে না। আপনি তেল দেওয়ার পাত্র নন।

তবে বলছেন কেন? আদ্রেঁর লাইন আমার লাইন এক নয়। আমি ছিলাম প্রোজেক্ট কো অর্ডিনেটর। আদ্রেঁ ছিল স্পেশালিস্ট।

সব জানি।

জানেন না। ইউ আর নট এ সায়েন্টিস্ট।

তাও ঠিক। তবু আমি জানি আদ্রেঁকে এ কাজে লাগিয়েছেন আপনিই।

তাতে কিছু যায়-আসে না।

মানছি। তবু আদ্রেঁর কাজ আর কে শেষ করতে পারে বলুন!

গোপীনাথ একটা শ্বাস ফেলে বলল, হয়তো কেউই পারে না। ঠিক আছে, আগে ঠান্ডা মাথায় ওর পেপারওয়ার্কগুলো দেখি। তারপর ভাবা যাবে।

দয়া করে তাই করুন।

মুশকিল হল, একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি তে চাই। এদেশে সেটা কোথায় পাব?

ভেবে দেখছি। কিছু একটা উপায় হবেই। একটা কথা, দরজাটা লক করে শোবেন।

কেন?

বিপদ।

২২.

সন্ধেবেলা টেলিফোনটা এল। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে। রোজমারি জরুরি একটা মিটিং সেরে গুরুতর কিছু কাজ নিয়ে বসেছিল নিজের একটেরে অফিস ঘরে। মৈত্রেয়ী তাকে সাহায্য করছিল।

ঠিক এই সময়ে রিং বাজল। ফোন ধরল মৈত্রেয়ী।

ম্যাডাম, কে একজন আপনাকে চাইছে। বলে মৈত্রেয়ী ফোনটা এগিয়ে দিল রোজমারির দিকে।

রোজমারি এত অবাক হল যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। পৃথিবীতে জো ক্লাইন নামের লোক হয়তো আরও আছে। কিন্তু এ লোকটার ফ্যাসফ্যাসে চাপা গলা এবং একটু বিদেশি অ্যাকসেন্টের জার্মান উচ্চারণ রোজমারির ভুল হওয়ার নয়।

রোজমারি গলার বিস্ময় আর বিরক্তিটা চেপে রাখতে পারল না, জো, তুমি কী চাও? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো চুকেবুকে গেছে।

সম্পর্কের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর নই ঠিকই, কিন্তু হয়তো পুরনো বন্ধুত্ব তুমি সবটা ভুলে যাওনি।

কে বলল ভুলে যাইনি? আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করি না।

ঠিক আছে রোজমারি, সেটাও মেনে নিলাম। কিন্তু আমি যদি তোমার কাছে একটু সাহায্য চাই, পাব কি?

কী ধরনের সাহায্য?

বলছি। কিন্তু তার আগে তোমার গলার কাঠিন্য একটু কমানো দরকার। মনে হচ্ছে তুমি খুব রেগে কথা বলছ।

হয়তো তাই। আমি ব্যস্ত মানুষ। একদম সময় নেই।

জানি। শুধু ব্যস্ত নও, এখন তুমি বেশ গুরুতর মানুষও।

বাজে কথা রাখো জো, যা বলার চটপট বলে ফেলল।

অত তাড়াহুড়োয় বলার মলোকথায়। একটুসময় লাগবে। তাছাড়া কথাটা টেলিফোনেও বলা যাবে না। আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমি কলকাতাতেই আছি।

অসম্ভব। তোমার সঙ্গে দেখা করার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই।

শোনো রোজমারি, দরকারটা জরুরি।

যত জরুরিই হোক, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রোজমারি, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দটা বড় কথা নয়। আমি তোমার অপছন্দের মানুষ হতে পারি, কিন্তু আমি তোমার ক্ষতি করার জন্য আসিনি।

আমাকে ভুলে যাচ্ছ না কেন জো? আমি তো ভুলতে চাই।

ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হওয়ার বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি রোজমারি। দুনিয়াটা কঠিন জায়গা। আমাকেও কষ্ট করেই বেঁচে থাকতে হয়। তোমারও বয়স বসে নেই। আমরা নিশ্চয়ই আর ছেলেমানুষ নই।

তোমার দরকারটা কী ধরনের?

সেটা দেখা হলে বলা যাবে।

দেখা করতেই হবে তা হলে?

হ্যাঁ, এবং গোপনে।

যদি তা সম্ভব না হয়?

রোজমারি, তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় সময় না দিলে আমি যেমন করেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করবই। এ ব্যাপারে কোনও বাধাই মানব না। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারটা তোমার আরও অপছন্দের হতে পারে।

এটা কি হুমকি?

রোজমারি, আমাকে খামোখা জেদি করে তুলছ কেন? আমি অনেক কিছুই ভুলিনি।

কী ভোলোনি?

ভিয়েনা।

রোজমারি চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তা লক্ষ করছিল মৈত্রেয়ী। রোজমারি মাউথপিসটা হাত দিয়ে চেপে রেখে মৈত্রেয়ীকে বলল, তুমি একটু বাইরে যাবে মৈত্রেয়ী?

মৈত্রেয়ী চলে গেলে রোজমারি ক্লান্ত গলায় বলল, জো, তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ?

না রোজমারি। শুধু বলছি, অতীতকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া ভাল নয়।

জো, আজ একটা সত্যি কথা বলবে?

শপথ করতে পারি না। তবে সম্ভব হলে চেষ্টা করব।

তুমি কী কাজ করো?

যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তখন যা করতাম এখনও তাই করি।

তুমি বলেছিলে তুমি একটা কোম্পানির রোভিং সেলসম্যান।

হ্যাঁ।

কথাটা মিথ্যে।

হতে পারে।

তুমি সত্যিই কী করো?

আমি যা করি তা বলার মতো নয়। আমার চাকরিটা এমনই যে ভাল কাজ করলে কেউ পিঠ চাপড়ায় না, কিন্তু ভূল করলে প্রাণ যায়।

তুমি কি পেশাদার খুনি বা গুন্ডা?

এরকম সন্দেহের কারণ কী?

আমার মনে পড়ছে একটা লোক মাসখানেক আগে আমাকে বলেছিল, জোসেফ ক্লাইন আমার জীবনে ফিরে আসবে, তবে অন্য ভূমিকায়।

লোকটা খুবই জ্ঞানী। কিন্তু সে কে?

তার নাম সুধাকর দত্ত। সে ইন্টারপোলের অফিসার বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল।

জো একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি আজকাল বিপজ্জনক লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো নাকি?

কেন, সুধাকর কি বিপজ্জনক লোক?

হা রোজমারি, খুব সাংঘাতিক বিপজ্জনক লোক। সে হয়তো তোমার অতীতের কথাও জানে।

কী করে জানলে?

সুধাকর দত্তকে গোটা ইউরোপের পাপীতাপীরা চেনে। প্যারিসে তার নামে অনেকে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকে।

কিন্তু আমি তো পাপীতাপী নই। ভিয়েনায় যা ঘটেছিল তা একটা আপতন মাত্র।

জানি রোজমারি। কিন্তু অনেকে হয়তো ততটা আপতন বলে মনে করবে না। সেই ঘটনাটার জন্য আজ আর তোমাকে কেউ দায়ীও করবে না। তবে বদনামের ভয় আছে, ব্যাবসার সুনাম নষ্ট হতে পারে।

জোসেফ ক্লাইন, তুমি অতীতের ভূত। কী চাও বলো!

আপাতত একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

তুমি আগামী কাল ঠিক এসময়ে আমাকে একটা টেলিফোন কোরো।

করব। কিন্তু তারপর?

তোমার সঙ্গে দেখা করব জো।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। এই তো চাই। একটা কথা।

কী কথা?

আমাদের এই সাক্ষাৎকারের কথা কাউকে জানাবে না।

কেন?

সেটা তোমার ভালর জন্যই। যদি বলো তা হলে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে।

কিন্তু জো, আমার নিরাপত্তার জন্য কথাটা কাউকে জানানো দরকার বলেই আমার মনে হয়।

জো একটু হেসে বলল, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী। আমাকে বিশ্বাস করা যে ঠিক নয় তা আমরা দুজনেই জানি। তুমি কি তোমার স্বামীকে জানাতে চাও?

না। মনোজ একটু ভিতু গোছের মানুষ। হয়তো উদ্বেগে ভুগবে।

তবে কাকে?

সেটাও কি তোমাকে বলতে হবে?

বললে বলতে পারো। না বললেও ক্ষতি নেই। তবে ব্যাপারটা যত গোপন রাখবে ততই ভাল।

কেন?

আমি একজন সন্দেহজনক লোক, তোমার ভূতপূর্ব স্বামী। আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটাটা খুব স্বাভাবিকভাবে লোকে নেবে না হয়তো।

তুমি কতদূর সন্দেহজনক?

এক-একজনের কাছে এক-একরকম।

তার মানে তুমি ভাল জীবন যাপন করো না জো।

আমার মতো আরও অনেকেই তাই।

আমার একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত রোজমারি?

আমি তোমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। আমাকে তোমার সম্পর্কে সব জানাতে হবে।

জো একটু চুপ করে থেকে বলল, তাতে কী লাভ?

আমি জানতে চাই আমাদের রোমান্সের সময়ে তোমাকে আমার কেন খুব ভাল লোক বলে মনে হয়েছিল।

অদ্ভুত তোমার কৌতূহল। তবু বলি, হয়তো তখন আমি খুব খারাপ লোক ছিলাম না।

এখন কি খারাপ হয়েছ?

তা কি জো ক্লাইন নিজে বলতে পারে?

ঠিক আছে, কাল ফোন কোরো।

.

রোজমারি ফোনটা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার মন এমনিতেই ভাল নেই। তার ওপর অতীত থেকে জো ক্লাইনের এই ফিরে আসা এই ঘটনার মধ্যে নিয়তির কোন মার লুকিয়ে আছে কে জানে!

রোজমারি মৈত্রেয়ীকে ইন্টারকমে ডেকে নিল। তারপর ডুবে গেল কাজে।

সন্ধের পরও সে আর মনোজ অনেকক্ষণ অফিসে থাকে। বিস্তর কাজ তাদের। মাঝে মাঝে অফিস থেকেই তারা একসঙ্গে কোনও পার্টিতে যায়। পার্টি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আজও এক পার্টি ছিল। কিন্তু রোজমারির মনে ছিল না।

মনোজের ফোন এল সাতটার পর।

রোজি, হল? সাতটা বাজে যে!

সাতটা! কেন, আজ কি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

বাঃ, আজ যে সিং সাহেবের পার্টি।

ওঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।

রোজমারি বলল, শোনো, আমি যাব না।

সে কী? কেন?

আমার শরীরটা ভাল নেই। তুমি আজ একাই যাও।

হয়তো ওরা কিছু মনে করবে। একটু ছুঁয়ে গেলে পারতে।

না। আমি আরও একটু কাজ করে সোজা বাড়ি যাব।

মনোজ আর ঝোলাঝুলি করল না। রোজমারি খুব সহজে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না। সে হতাশ গলায় শুধু বলল, আচ্ছা।

রোজমারি ফোনটা রেখে দিয়ে মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে বলল, আজ আর কাজ করব না। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখো। আমি যাচ্ছি।

রোজমারি বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠল। বাড়ি ফিরে একটা ছোট মাপের ওয়াইন খেয়ে বাথটবে গরম জলে পড়ে রইল অনেকক্ষণ। মাথায় চিন্তা আর চিন্তা। স্মৃতি আর স্মৃতি।

গা মুছে সে একটা ঢিলা পোশাক পরে লিভিং রুমে এসে কিছুক্ষণ আনমনে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে ছবি দেখে গেল।

তাজু খুব বিনীতভাবে এসে বলল, মেমসাব, ডিনার করবেন কি?

না তাজু। আজ কিছু নয়।

একটু স্যুপ?

না। বরং একটা ড্রিঙ্ক দাও। পোর্ট।

ঠিক আছে।

রোজমারি পোর্টটা খুব উপভোগ করল। আবার নিল। এবং আবার। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

.

পরের দিনটা গেল একটু মন্থর গতিতে। সন্ধে ঠিক ছ'টার সময় ফোন এল।

রোজমারি, আমি জো।

হা জো, আর এক ঘণ্টা পর তুমি আমার দেখা পাবে।

কোথায়?

জায়গাটা তুমি ঠিক করো।

আমি?

হ্যাঁ তুমি।

রোজমারি, তুমি আমাকে ক্রমশ বেশি অবাক করে দিচ্ছ।

এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

তা হলে এক কাজ করো। তুমি একটা গাড়ি নিয়ে চলে এসো ভিক্টোরিয়ার সামনে। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

তারপর?

কোথাও যাওয়া যাবে।

আমার গাড়ি চালায় ড্রাইভার। সে থাকলে আপত্তি নেই তো?

আছে। তুমি নিজে ড্রাইভ করলে ভাল।

তাই হবে।

তা হলে এক ঘণ্টা পরে?

হ্যাঁ।

এক ঘণ্টার একটু আগেই সময় হিসেব করে উঠে পড়ল রোজমারি। ড্রাইভার ছেড়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি চালাতে লাগল। আজ কলকাতায় মিছিল নেই। জ্যামও তেমন নয়।

ভিক্টোরিয়ার বড় ফটকের সামনে জো দাঁড়িয়ে ছিল। গায়ে একটা জিনসের জ্যাকেট, পরনেও জিন্স। কাঁধে একটা ঝোলা।

দরজাটা খুলে দিয়ে রোজমারি বলল, উঠে পড়ো।

জো উঠল।

এবার কোথায় যাব জো?

খিদিরপুর চেনো?

চিনি। কিন্তু সেটা তো ঘিঞ্জি জায়গা।

তা হোক। চলো।

রোজমারি গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, তোমার দিক থেকে আমার সত্যিই কোনও ভয় নেই তো?

জো একটু হাসল, বলা যায় না রোজমারি। তোমার চেহারা এখন এত সুন্দর হয়েছে যে, আমার মতো বুড়োরও লোভ হতে পারে।

তেল দিয়ো না। তুমি কি বুড়ো হয়েছ নাকি?

চল্লিশের ওপর তো বুড়োই।

তোমাকে অন্তত সেরকম দেখাচ্ছে না। এখনও গুন্ডাদের মতোই চেহারা আছে তোমার।

বাইরেটাই সব নয়। ভিতরে অনেক ভাঙন।

কীরকম ভাঙন?

বলে লাভ নেই। শুনতে চেয়ো না।

তোমার কথা কি লম্বা?

না না। সেরকম কিছু নয়।

এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কেন বলো তো। কী এমন গোপন কথা?

কথার আগে তোমাকে আরও একটু তেল দিয়ে নিই। তুমি একা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি। আমাকে বিশ্বাস করেছ বলে ধন্যবাদ।

কেন তোমাকে কি আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না?

না।

কেন করে না?

হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নই বলেই।

জো, তুমি কী কাজ করো?

শুনবে?

হ্যাঁ।

আমি সেলসম্যান।

সেটা তো মিথ্যে কথা।

জো দু’পাশে মাথা নেড়ে বলল, না, মিথ্যে নয়। আমি ফিরি করি। তবে কী ফিরি করি তা জানতে চেয়ো না।

কলকাতায় কেন এসেছ?

কাজে।

কী কাজ সেটাই জানতে চাই।

কাজটা তোমার কাছে।

আমার কাছে? আমি কী করব?

তোমার কারখানায় একটা অ্যালয় তৈরি হয়।

হয়।

তোমার কারখানায় তৈরি অ্যালয়ের হঠাৎ চাহিদা খুব বেড়ে গেছে।

হ্যাঁ।

কেন বেড়েছে রোজমারি?

তা জানি না।

আমাকে তোমাদের কারখানা একটু দেখতে দেবে?

কেন? এটাই কাজ। খুব জরুরি।

২৩.

জো-কে বিশ্বাস হয় না রোজমারির। কিন্তু কয়েক বছর আগে মিউনিখে এই জোসেফ তাকে পাগল করে দিয়েছিল। এমন আকর্ষক দুরন্ত পুরুষ সে তার আগে আর দেখেনি। জোসেফ আমেরিকান, পয়সাওয়ালা মানুষ শুধু নয়, চমৎকার ভদ্র ও নম্র ছিল তার স্বভাব। তারপর সামান্য কোর্টশিপের পরই তাদের বিয়ে। এবং

সামান্য বিবাহিত জীবনের পরেই ছাড়াছাড়ি। তবু আজও জো ক্লাইন যেন সমান আকর্ষক। জোর ভিতরে একটা চুম্বক আছে হয়তো।

জো তার কারখানা দেখতে চায়। এটা নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর গোপন কথা হতে পারে না যার জন্য রোজমারিকে এভাবে টেনে আনতে হবে। রোজমারি মৃদুস্বরে বলল, জো ক্লাইন, আমার কারখানা রোজই বাইরের লোক এসে দেখে যায়। গোপন কিছু নেই। তোমার এই নাটকের তো দরকার ছিল না।

জো সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি পর্যটকের মতো দেখব না। আমি দেখব বিশেষজ্ঞের মতো।

তার মানে কি স্ক্রুটিনি?

হ্যাঁ রোজমারি। রোজমারি মাথা নেড়ে বলল, সেটা সম্ভব নয়।

কেন নয়?

তুমি নিশ্চয়ই জানো সেরকমভাবে পরীক্ষা করতে গেলে আমাদের কারখানার প্রোডাকশন মার খাবে, পাঁচটা কথা উঠবে। তা ছাড়া হঠাৎ তোমার এরকমই ইচ্ছেই বা হচ্ছে কেন?

জো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি যতটা নিরাপদ জীবনযাপন করছ বলে ভাবো, তোমার জীবন হয়তো ততটা নিরাপদ নয়।

তার মানে?

রোজমারি, তুমি হয়তো অজান্তে কোনও বিপুল ঐশ্বর্যের ওপর বসে আছ। আর সেই কারণেই তোমার নিরাপত্তা সুতোয় ঝুলছে।

রোজমারি একটা শ্বাস ফেলে বলল, জো, কিছুদিন আগে আমাকে কে যেন ভুল জন্মদিনে একগোছা রক্তগোলাপ পাঠায়। তার ট্যাগে লেখা ছিল, আর আই পি। তোমার কথা তাই আমার বাজে কথা বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু কী সে ঐশ্বর্য জো? বলবে আমাকে?

জো নেতিবাচক মাথা নেড়ে বলল, জানি না। তোমার আশ্চর্য অ্যালয় সম্পর্কেও কিছু জানা নেই আমার। তোমার কারখানা খুঁটিয়ে দেখার জন্য আমার সঙ্গে দু'জন লোক এসেছে। একজন বিশেষজ্ঞ, অন্যজন খুনি।

তার মানে?

জো সামান্য ধরাগলায় বলল, আমি স্বাধীন নই রোজমারি। আমাকে কাজ করতে হচ্ছে ভয় ও হুমকির মধ্যে।

তোমাকে কেউ বাধ্য করছে বলতে চাও?

হ্যাঁ।

কে বাধ্য করছে জো?

একটা করপোরেট বডি।

তারা কারা?

জো আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে কিছু কথা বলার দরকার। শুনবে?

বলো।

যখন তোমাকে বিয়ে করি তখন আমি ছিলাম গুপ্তচর।

রোজমারি চমকে ওঠে, গুপ্তচর!

আমেরিকান সরকারের ফেডারেল ব্যুরোর।

আশ্চর্য!

কিন্তু পরে আমাকে চাকরি ছাড়তে হয়। ব্রুকলিনে আমি একটা দোকান চালাতে শুরু করি। আনা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করি। আনার দুটো বাচ্চা। নিরাপদ জীবন।

আনা কেমন মেয়ে?

ভাল। খুবই ভাল। জন্মসূত্রে রাশিয়ান।

তারপর বলো।

চিরকাল সমান যায় না। আমি নানাভাবে জড়িয়ে পড়ি অপরাধ জগতের সঙ্গে।

কীভাবে?

অত বলবার সময় নেই।

তা হলে বলে যাও।

নানা সূত্রে আমার আয় হত। মোটা আয়। আনা দোকান নিয়ে পড়ে আছে।

আর তুমি?

আমাকে যে কাজটা করতে হয় তা ভাড়াটে সৈন্যের মতো।

খুনখারাপি কি?

ঠিক তা নয়। তবে অবশ্যই আমি যা করে বেড়াই তার অনেক পরিণতি ঘটে মৃত্যুতে। এসব ঠিক বোঝানো যাবে না।

এখন কারা তোমার বস?

অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সংগঠন।

তারা কী চায় জো?

তারা জানতে চায় তোমার কারখানায় আসলে সত্যিই কী জিনিস তৈরি হয়।

আজকাল অনেকেই বোধহয় তা জানতে চাইছে। কিন্তু আমি নিজেই তো জানি না। পৃথিবীতে এই অ্যালয় তৈরির আর কিছু কারখানা আছে। আমি তো একা নই।

তাও জানি। সেসব কারখানাতেও ঘটনা ঘটছে।

জো, আমি কি অজান্তে বিজ্ঞানের বিস্ময় কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি?

জো গম্ভীর হয়ে বলল, সেটা বলতে পারত আদ্রেঁ।

আদ্রেঁ।

হ্যাঁ। যাকে কলকাতায় খুন করা হয়।

আদ্রেঁর কথাও তুমি জানো?

জানি। আদ্রেঁ প্রায় ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল। কিন্তু নিজেই বাঁচল না। কিন্তু সেখানে থেমে গেলেই তো চলবে না।

বুঝেছি।

আমাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করো রোজমারি। আমি তোমার শত্রু নই।

কিন্তু এটা তো শত্রুতাই।

হয়তো তাই। তুমি সাহায্য করলে কোনওভাবে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব। না করলে আমারও কিছুই করার থাকবে না।

অর্থাৎ খুন?

হয়তো তাই।

তুমি আমাকে খুন করবে জো?

আমি করব না। ওসব করার লোক আছে।

রোজমারি মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, তুমি তো খুনি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছ।

জো একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ নিবিড়ভাবে সিগারেট টেনে সে নিজেকে একটু সংযত করে নিল হয়তো। তারপর বলল, আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরও

একজন এসে গেছে।

সে কে?

গোপীনাথ বসু নামে একজন ইন্ডিয়ান। বিশেষজ্ঞ।

গোপীনাথ বসু। সাক্কির?

হ্যাঁ। চেনো?

নামটা শুনেছি।

আদ্রেঁ তার অধীনে কাজ করত।

সে কী চায়?

আমরা যা চাই সেও তাই চায়।

রোজমারি ভ্রু কুঁচকে চুপ করে রইল। মনোজ কিছুদিন যাবৎ খুব গোপীনাথ বসুর কথা বলছে। এমন কথাও বলছে গোপীনাথ বসুকে সে মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা বেতন দিয়েও রাখবে। কথাটা রোজমারি বলল না।

জো বলল, গোপীনাথের কপাল খারাপ।

কেন?

তাকে মরতেই হচ্ছে।

তোমরা মারবে?

আমরা নিমিত্ত মাত্র। ভাড়াটে খুনি পয়সা নিয়ে লাশ নামিয়ে দেয়, ভ্রুক্ষেপও করে না। কিন্তু খুনটা কি সে করে? না রোজমারি। আপাতদৃষ্টিতে খুনিই খুন করে বটে, কিন্তু পিছনে অন্য ছায়া থাকে।

গোপীনাথ বসু এখন কলকাতায় আছে, তুমি ঠিক জানো?

জানি। কালই এসেছে।

ও। কিন্তু তাকে মারবে কেন, আমাদের কারখানার রহস্য সে তো জানে না।

তার কাছে আদ্রেঁর সব কাগজপত্র আছে। গোপীনাথ মস্তিষ্কবান লোক। সে ঠিক ব্যাপারটা ধরে ফেলবে।

তবে তাকেই কেন তোমরা ভাড়া করছ না?

উপায় নেই। সুধাকর দত্ত তার পিছনে আছে।

তার মতলব কী?

সেও আমাদের মতো অ্যালয়ের রহস্য ভেদ করতে চায়।

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে জো।

গাড়িটা ডানদিকে ঘোরাও রোজমারি।

কোথায় যাচ্ছ জো?

কোথাও না। আমি গলির মধ্যে নেমে যাব।

আর আমি?

তুমি ফিরে যাও। আমার কথা শেষ হয়েছে।

তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব স্বস্তিতে নেই। ঠিক বলছি জো?

হ্যাঁ। ঠিকই বলছ।

যারা তোমার মতো বিপজ্জনক জীবনযাপন করে তারা স্বস্তিতে থাকে না জো।

তা তো বটেই। কিন্তু আমি যখন সরকারি চাকরি করতাম তখনও বিপজ্জনক ভাবেই বেঁচে ছিলাম রোজমারি। তবে তখন কোনও গ্লানি ছিল না।

এখন আছে?

হ্যাঁ। এখন মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, একটা পিছল পথ দিয়ে হড়হড় করে একটা অন্ধকার গুহায় নেমে যাচ্ছি। ফেরার উপায় নেই।

কেন নেই জো?

এ হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানে একবার ঢুকে পড়লে আর বেরোনো যায় না। অপরাধ সংগঠনগুলি ভাল টাকা দেয় নোজমারি, কিন্তু তার বদলে তারা চায় শতকরা একশোভাগ আনুগত্য এবং মন্ত্রগুপ্তি। তোমার কাছে আজ যে এসব কথা বলে ফেললাম এর শাস্তি কী জানো?

অনুমান করতে পারছি। কিন্তু বললে কেন জো? না বললেই পারতে।

ওইটেই তো বুড়োবয়সের লক্ষণ। আনাকে তো কিছুই বলি না। বললে ওকে বিপদে ফেলা হবে। বড্ড সরল সোজা স্নেহপ্রবণ মেয়ে। কিন্তু তোমার মতো বুদ্ধিমতী এবং স্বনির্ভর নয়। আজও যদি তুমি আমার বউ থাকতে রোজমারি তা হলে হয়তো জীবনে কয়েকটা ভুল সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হত না। পুরুষের জীবনে বউ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আজ তোমাকে যে এসব কথা বললাম তার আর একটা কারণ, তুমি আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে।

রোজমারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু এতে বিপদ আছে জানলে জানতে চাইতাম না।

বিপদ আর বিপদ। সারা জীবন তো বিপদের মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। জীবন যে কত ক্ষণস্থায়ী তা সংসারী সুখী মানুষরা জানে না। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, বারবার মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ভয়ডর কেটে গেছে। কিন্তু নিজের জন্য ভয় না পেলেও অন্যদের জন্য ভয় হয়।

সেটা কেমন?

আনার জন্য, বাচ্চাদের জন্য, এই এখন তোমার জন্যও একটা অশান্তি ভোগ করছি। ভাগ্যক্রমে তোমার বিপদ ডেকে এনেছি আমিই। কিন্তু কিছু করার ছিল না। ওদের পরিকল্পনা ছিল, তোমার কারখানা সাবোটাজ করবে। সেটা আমি আটকেছি। এমনকী নিজেই এসেছি, যাতে তোমাকে অন্তত প্রাণে বাঁচানো যায়।

রোজমারি গলির মুখে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে শুনছিল চুপ করে। তার হৃদয় দ্রব হয়েছে, চোখ একটু ছলছলে। বলল, আমার জন্য এখনও কি তোমার একটু আবেগ আছে?

আছে রোজমারি।

তা হলে ভিয়েনার কথা তুললে কেন?

তুললাম তোমাকে ভড়কে দেওয়ার জন্য। যাতে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে না পারো।

ভিয়েনায় যা ঘটেছিল তা দুর্ভাগ্যজনক। তার বেশি কিছু নয়।

জো একটু হাসল। মৃদুস্বরে বলল, রোজমারি, আমি কিন্তু গোয়েন্দা। গোয়েন্দাদের চোখ একটু বেশি তীক্ষ্ণ।

কী বলতে চাইছ জো?

জো রোজমারির দিকে একটু চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, তোমার বয়স এখন মধ্য তিরিশ, তবু এখনও কী সুন্দরীই যে আছ।

এসব কথা তুলছ কেন?

আমাদের বিয়ের সময়ে তুমি আরও সুন্দরী ছিলে। আগুনে চেহারা। সেই সময়ে পুরুষ পতঙ্গেরা তোমার দিকে কম আকৃষ্ট হত না। রোজমারি, তুমিও সেটা পছন্দ করতে। শক্তসমর্থ পুরুষদের প্রতি তোমার আকর্ষণ ছিল।

রোজমারি একটু রক্তাভ হয়ে গিয়ে বলল, তুমি কি আমার নৈতিক চরিত্রের পাহারাদার নাকি?

না রোজমারি। তা কেন? তুমি তোমার জীবনকে উপভোগ তো করবেই। কিন্তু গডার্ডকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ে তুমি একটু ভুল করেছিলে। আমাদের সদ্য বিয়ে হয়েছে, আমরা মধুচন্দ্রিমায় গেছি, সেই সময়ে একটা জরুরি কাজে ডাক পেয়ে আমি তোমাকে হোটেলে রেখে মাদ্রিদে গিয়েছিলাম। তোমাকে ফোন করে জানিয়েছিলাম ফিরতে আমার দু’দিন দেরি হবে। ঠিক তো?

রোজমারি মুখটা নামিয়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু তখন আমার খুব একা লেগেছিল।

একা লেগেছিল বলেই কি গডার্ডকে একেবারে শোওয়ার ঘর পর্যন্ত আসতে দিলে?

ওসব পুরনো কথা তুলছ কেন?

কারণ গডার্ডকে খুনের দায়টা আমাকে ঘাড়ে নিতে হয়েছিল রোজমারি।

সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আর সেই ঘটনা থেকেই আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ছাড়াছাড়িরও সূত্রপাত।

তুমি ব্যাপারটা উপেক্ষা করতে পারতে। যৌবন বয়সে সকলেরই ওরকম ঘটনা ঘটতে পারে। খুব বড় অপরাধ তো নয়।

জো হাসল, দেশটা যদি ভারতবর্ষ হত বা তুমি আমি যদি ভারতীয় হতাম তা হলে কিন্তু ওই ঘটনা মস্ত নৈতিক অপরাধ। সেটা আমি বলছি না। তুমি ভুল করেছিলে, কারণ গডার্ড তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমার গোপন তথ্যাবলি হাতানোর চেষ্টা করেছিল।

সেটা আমি জানতাম না।

জানতে না, তাও জানি। কিন্তু ক্ষতি তো হয়েই গিয়েছিল।

তুমি আমাকে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলে বলে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ জো।

সেই কৃতজ্ঞতার খানিকটা ঋণ আজ শোধ দাও রোজমারি।

কী চাও জো?

পরশু দিন তোমার কারখানায় আমরা যাব। আমাকে অবাধ প্রবেশ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে দাও।

রোজমারি একটু ভাবল, মনোজেরও একটা অনুমতি চাই।

তুমিই সব, আমি জানি। মনোজ তো একটা ভেড়া। শোনো রোজমারি, ব্যবস্থা করতে তোমাকে হবেই। নইলে ঘটনাবলি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

তুমি কি এখনও আমার শুভাকাঙ্ক্ষী?

শতকরা একশো ভাগ।

কেন জো?

কে জানে কেন। জীবন বড় রহস্যময়, বড় জটিল। মানুষের মন আরও গূঢ়।

২৪.

ক্লান্ত, অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ রোজমারি যখন বাড়িতে ফিরল তখন রাত ন'টা। মনোজ ফেরেনি। রোজমারি গরম জলে অনেকক্ষণ গা ডুবিয়ে বসে রইল তার শ্বেতপাথরের বাথটাবে। তারপর ঘরোয়া পোশাকে লিভিং রুমে বসে ওয়াইন খেল অনেকটা। সে সাধারণত উত্তেজক পানীয় খায় না। আজ তার মাথাটা গরম, মনটাও খারাপ।

রাত দশটায় সে খানিকটা সুপ আর এক টুকরো মাংস খেয়ে নিজের শোয়ার ঘরে এসে আধশোয়া হয়ে কিছু কাগজপত্র দেখতে লাগল। অফিসের কিছু জরুরি চিঠিপত্র।

মনোজ ফিরল এগারোটায়। রোজমারি এত রাত অবধি জেগে থাকে না। আজ নিঃশব্দে উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে মনোজের ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে বলল, জামাকাপড় ছেড়ে আমার ঘরে এসো। কথা আছে।

মনোজ অবাক হয়ে বলল, কথা!

হ্যাঁ, মাতাল হওনি তো?

আরে না। সামান্য দু'পেগ

তা হলে ঠিক আছে।

মনোজের বেশি সময় লাগল না। মিনিট পনেরোর মাথায় রোজমারির ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসল। সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে বলল, খারাপ খবর নাকি?

আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি গোপীনাথ বসু এখন কলকাতায়।

মনোজ প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলল, কলকাতায়। মাই গড! তার তো বেঁচে থাকারই কথা নয়!

কিন্তু সে বেঁচে আছে।

দু’দুটো ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল যে। আটকেও রেখেছিল কারা যেন। ভুল খবর নয় তো!

না, খবরটা যে দিয়েছে সে ভুল খবর দেওয়ার লোক নয়।

কলকাতায় কোথায় আছে গোপীনাথ?

তা জানি না। খোঁজ করলেই জানা যাবে। এখানে তার আত্মীয়স্বজন আছে।

সোনালি বা সুব্রতকে ট্যাপ করব নাকি?

করতে পারো। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

কেন বলো তো?

গোপীনাথের বিপদ এখনও কাটেনি। তাকে মারবার জন্য একজন খুনিও কলকাতায় এসেছে।

সর্বনাশ! এসব খবর তোমাকে দিল কে?

দিয়েছে একজন। এখন আমি জানতে চাই গোপীনাথকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা কী করতে পারি।

মনোজ একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, পুলিশ প্রোটেকশন ছাড়া আর কিছুই বোধহয় পারি না।

পুলিশকে মোবিলাইজ করা সহজ কাজ নয়। অন্য কিছু ভাবো।

ভাববার সময় কি আছে রোজমারি?

বুঝতে পারছি না। তবে অনুমান করছি গোপীনাথকে প্রোটেকশন দিচ্ছে সুধাকর দত্ত।

সে কে? সেই ইন্টারপোল এজেন্ট নাকি?

সে আসলে কে জানি না। তবে সেই লোকটাই।

তা হলে আমরা তাকে অতিরিক্ত কী সিকিউরিটি দিতে পারি? ইন্টারপোলই তো তাকে পাহারা দিচ্ছে।

রোজমারি বিরক্ত হয়ে ভ্রু কোঁচকাল, বলল, তুমি তো বোকা নও।

এ কথায় অপ্রস্তুত হয়ে মনোজ বলল, কী বলতে চাইছ?

গোপীনাথ বসুকে আমাদের দরকার, ঠিক তো?

হ্যাঁ, ভীষণ দরকার।

তাকে সকলেরই দরকার। সাক্কি তাকে খুঁজছে, ভিকিজ মব তাকে খুঁজছে, আরও লোক তাকে মারার জন্য বা ধরার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের এখন তার পাশে দাঁড়াতে হবে বন্ধুর মতো। ইন্টরপোল তার বন্ধু হলেও তাকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। আমরা পারব।

কিন্তু সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা যাবে কী করে? আমাদের তো ওসব অভিজ্ঞতা নেই। তাকে রাখব কোথায়? পাহারা দেব কীভাবে? সবচেয়ে বড় কথা গোপীনাথ আমাদের বিশ্বাস করবে কেন?

রোজমারি মুখখানা কঠিন করে বলল, মনোজ, তোমাকে নিয়ে মুশকিল কী জানো? তুমি ঠান্ডা মাথায় যুক্তিনির্ভর পরম্পরায় কিছু ভাবতে পারো না।

ওকথা কেন বলছ?

তুমি সুব্রতর কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

সুব্রত! ও হ্যাঁ, সুব্রত গোপীনাথের বন্ধু বটে।

খুব রিলায়েবল বন্ধু। তুমি সুব্রতকে ম্যানুপুলেট করতে না পারলে আমি করব।

লজ্জিত মনোজ বলল, সুব্রতর কথা আমার মনে ছিল না।

আরও একজনকে ভুলে যাচ্ছ।

কে বলল তো!

সোনালি।

সোনালি! সে তো গোপীনাথের প্রসঙ্গই সহ্য করতে পারে না।

হতে পারে। কিন্তু গোপীনাথের বিপদ শুনলে সে হয়তো তাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু গোপীনাথের পিছনে যেরকম ষণ্ডাগুন্ডা লেগেছে তাতে তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে পারি না।

আমি পারি।

কীভাবে পারো?

সেটা তোমাকে এখন বলতে পারছি না। তবে ব্যবস্থা করা যাবে। শু

নেছি মাফিয়ারা ভয়ংকর লোক। সহজে রেহাই দেয় না।

তুমি এখন ঘুমোও গে। কাল সকালে আমাদের এ ব্যাপারে কাজে লাগতে হবে।

মনোজ চলে গেলে রোজমারি ফোন তুলে নিল।

ফোন চারবার বাজবার পর একট ভারী গলা বলল, লুলু হিয়ার।

রোজমারি জার্মান ভাষায় বলল, আমি রোজমারি।

বলো রোজমারি।

একটা কাজ আছে।

কাজ ছাড়া এত রাতে আমাকে তোমার মনে পড়ার কথা নয়।

কাজ ছাড়াও আমি তোমাকে প্রশ্রয় দিই। দিই না?

রোজমারি, আজ রাতে তোমাকে একটা প্রস্তাব দেব?

কী প্রস্তাব।

কাজ ছাড়ো, ব্যাবসায় গুলি মারো, স্বামীটাকে ভুলে যাও, তারপর চলো হাওয়াই দ্বীপে পাকাপাকি বাস করি দু'জনে। সেখানে আমার বাড়ি আছে।

সব জানি লুলু, তোমার মতো ফুর্তির জীবন কাটাতে আমার রুচি হয় না।

কাজ আর কাজের টেনশনে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ রোজমারি।

তাই কী? মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুরেও তো যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

সিঙ্গাপুরটা কোনও জায়গা নয়। হাওয়াই হল সেই জায়গা যাকে মর্তের স্বর্গ বললে ভুল হয় না। ঠিক কি না?

নিষ্কর্মাদের স্বর্গ। কাজের লোকের স্বর্গ অন্যরকম।

তা অবশ্য ঠিক। কাজের লোকদের প্রিয় হল তেলকালির গন্ধ, মেশিনের শব্দ, শ্রমিক আন্দোলন আর টেনশন, ওটাই কি স্বর্গ?

ঠিক তাই।

জীবনটা এভাবে নষ্ট করবে রোজমারি?

নষ্ট হচ্ছে না।

হচ্ছে। ওই মনোজ ক্যাবলাকেই বা তুমি কীভাবে সহ্য করো?

মনোজ ভাল লোক। সৎ, পরিশ্রমী, মস্তিষ্কবান।

শেষ কথাটা কী বললে? মস্তিষ্কবান! হাঃ হাঃ

মনোজ প্রতিভাবান। নিজের কাজটা ভালই বোঝে।

সেটা হতে পারে। মেটালার্জি বুঝলেই কি আর মস্তিষ্কবান হওয়া যায়? তুমি তো ওকে ভালওবাসো না রোজমারি!

নাই বা বাসলাম। আমরা ক'টা মানুষ এ জীবনে সত্যিকারের কাউকে ভালবাসতে পারি বলো তো! হয়তো একজনকেও নয়। কিন্তু তবু কিছু লোকের সঙ্গে পার্টনারশিপে আসতেই হয়। বিবাহিত জীবনও তো একটা করপোরেশন। একটা কোম্পানি পার্টনারশিপ।

ব্যাবসা ছাড়া তুমি কিছু বোঝো না?

তুমি যেমন ফুর্তি ছাড়া কিছু বুঝতে চাও না।

ডার্লিং রোজমারি, আমার বাবা ব্যাবসা করত জানোত।

জানিই তো।

আমার বাবা কত কোটি টাকা করে গেছে তাও তো জানো।

জানি।

আমি মন দিয়ে ব্যাবসা করলে টাকাটা দ্বিগুণ বা দশগুণ হবে।

এবং তুমি সেটা চাও না তাও জানি।

কেন চাই না তাও তোমাকে বলেছি। ওই টাকা ডবল করতে গিয়ে একদিন দেখব আয়ুটাই ফুড়ুত হয়ে গেছে, দুনিয়া হয়ে গেছে ফ্যাকাশে, মন গেছে মরে।

তাও বলেছ, তোমার জীবনদর্শন আমি মানিনি।

মানলে ভাল করতে। আমার বাবা শেষ জীবনে বুড়ো শকুনের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। বড়বাজারের গদিতে হাঁটু উঁচু করে বসে দুই হাঁটুর ফাঁক দিয়ে মুন্ডু বের করে জুলজুল করে চেয়ে থাকতেন। আমার এত হাসি পেত।

এতে হাসি পাওয়ার কী আছে?

দৃশ্যটা দেখলে তোমারও পেত। মানুষের শকুনাকৃতি কতটা নিখুঁত হতে পারে তা দৃশ্যটা দেখলে তুমি আন্দাজও করতে পারবে না। সেই দৃশ্যটাই আমাকে শিখিয়ে দিল, ও জীবন আমার হবে না কখনও।

লুলু, এবার কাজের কথায় এসো।

এগুলো কাজের কথা, রোজমারি। এদেশ আমার ভাল লাগে না, তোমারও ভাল লাগার কথা নয়।

লাগে না।

তা হলে পড়ে আছ কেন?

আমার কারখানা?

বেচে দাও। আমি খদ্দের ঠিক করে দিচ্ছি। না হলে ওই ভেড়া মনোজকে গছিয়ে দিয়ে চলো কেটে পড়ি। হাওয়াই।

লুলু, তোমার অনেক মেয়ে-বন্ধু, আমি জানি।

রোজমারি, নিষ্ঠুর হয়ো না। মেয়ে-বন্ধু থাকা কি দোষের?

তা বলি না। কিন্তু এত সুন্দরী থাকতে আমাকেই বা কেন দরকার হয় তোমার বলো তো!

এর কি কোনও জবাব হয়? আমার বাবা বিয়ে করেছিল একজন সুইডিশ মহিলাকে। তিনি আমার জন্ম দেওয়ার এক বছরের মধ্যে কেটে পড়েন। বাবা আমাকে গভর্নেসের হাতে ফেলে দিয়ে ব্যাবসায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যেন ওটাই তাঁর স্ত্রীর ওপর প্রতিশোধ। স্কুলে পড়াতে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন লন্ডন। তারপর ব্যাবসা শিখতে আমেরিকা। আমি শিখলাম অনেক, কিন্তু কোনওটারই স্বাদ

পেলাম না। আমার মা চলে যাওয়ার পর আমার বাবা নারী-হীন একটা জীবন কাটিয়েছিলেন। বোধহয় প্রকৃতি সেই প্রতিশোধটা আমার ওপর দিয়ে তুলছে। আমার জীবনে অনেক নারী। তবু তুমি আলাদা রোজমারি। তুমি অন্যরকম।

আমি কি এখনও আকর্ষণীয়া?

বটেই তো।

আজ আরও একজন একথা বলেছে।

সে কে? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী?

না, তার নাম জো। জোসেফ ক্লাইন।

ঈশ্বর! সে তোমার প্রাক্তন স্বামী!

হ্যাঁ, তার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

কী চায় সে?

আমাকে চায় না। তবে অন্য কিছু চায়। আর সেজন্যই তোমাকে এত রাতে বিরক্ত করা।

বিরক্ত নই। বলো।

ঘরে কেউ আছে?

লুলু একটু হাসল, আছেও বটে, নেইও বটে।

তার মানে আছে।

আছে। তবে মেয়েটা বুরবক। কোনও ভয় নেই, বলল। জার্মান সে জন্মেও শোনেনি। হ করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

শোনো লুলু। আমার একজন অতিথি আসছে। তাকে একটু ভালরকম প্রোটেকশন দিতে হবে।

কে অতিথি।

আছে একজন।

বিশেষ কেউ?

খুব বিশেষ।

কী ধরনের প্রোটেকশন?

ফুল প্রুফ।

তার কি জীবন সংশয়?

হ্যাঁ। তার পিছনে তিনটে ইন্টারন্যাশনাল গুন্ডার দল লেগে আছে।

ঈশ্বর! সে এখন কোথায়?

কলকাতায়।

নাম-ঠিকানা বলল।

নাম গোপীনাথ বসু। ঠিকানাটা কাল দেব।

লুলু হঠাৎ একটু চুপ করে গেল। তারপর বলল, ঠিক আছে।

পারবে?

পারতেই হবে। তোমার হুকুম।

আমরা তোমার ফি দেব। কিন্তু তোমাকে গ্যারান্টি দিতে হবে।

মানুষ কোনও গ্যারান্টি দিতে পারে না, রোজমারি। তবে আমি যথাসাধ্য করব।

তা হলেই হবে। তোমার ওপর আমার অনেক নির্ভরতা।

ধন্যবাদ রোজমারি। ঠিকানাটা কখন পাব?

কাল বেলা বারোটা নাগাদ। ঠিকানাটা ট্রেস করতে হবে।

ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করব।

ফোনটা রেখে রোজমারি বাতি নেভাল। কিন্তু অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না। গোপীনাথকে কাল থেকে হয়তো নিরাপত্তা দেওয়া যাবে, কিন্তু আজ রাতে সে কতটা নিরাপদ? তার চেয়েও বড় কথা, গোপীনাথকে শুধু নিরাপত্তা দিলেই হবে না, সুধাকর দত্তর থাবা থেকে ওকে বের করতে আনতে হবে। সুধাকর দত্ত নামটা মনে হলেই রোজমারি শক্ত হয়ে যায়। ওরকম ঠান্ডা মাথার রোবট-মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি।

রোজমারি দুটো ট্রাঙ্কুলাইজার খেয়ে আবার শুল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

.

রাত দুটো অবধি জেগে গোপীনাথ তার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে যাবতীয় তথ্যাবলি ভরে ফেলছিল। গত তিনদিন ধরে একটানা কাজ। এ সবই পেপার ওয়ার্ক। এতে কাজ ততটা হবে যতক্ষণ না হাতেকলমে করা যায়।

আদ্রেঁর কাগজপত্রের মধ্যে সে বারবার একটা ব্যক্তিগত ডায়েরির উল্লেখ পাচ্ছে। আদ্রেঁ হয়তো ডায়েরি রাখত। কিন্তু ডায়েরিটা কোথায় তা জানে না সে। সেই ডায়েরিতে কি আদ্রেঁ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লিখে রেখে গেছে? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা সমাধান?

রাত দুটোয় হেলানো চেয়ারে বসে গোপীনাথ চোখ বুজে ভাবতে লাগল। যতদূর মনে পড়ে, আরে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না, অবকাশও পেত না। উদয়াস্ত পড়ে থাকত সাক্কির অফিসে নিজের ঘরখানায়। কাজ আর কাজ। তবু ডায়েরির উল্লেখ যখন আছে তখন সেখানে কিছু থাকবেই। কিন্তু সে ডায়েরি কোথায় কে বলবে?

গোপীনাথ চুপ করে বসে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে তার একটু ঝিমুনি এল।

ঝিমোতে ঝিমোতে যখন বড় ঘুম এসে যাচ্ছিল প্রায়, তখনই সে হঠাৎ চমকে উঠল। মৃদু, খুব মৃদু একটা শব্দ হল না? কেউ যেন সন্তর্পণে লিফটের দরজা খুলল এবং বন্ধ করল?

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা গোপীনাথকে অনেক সতর্ক ও তৎপর করেছে। সে টপ করে উঠল পড়ল এবং দ্রুত পায়ে দরজার স্পাই হোলে গিয়ে চোখ লাগাল।

বাইরের ল্যান্ডিং-এ আলো জ্বলছে না। কেন জ্বলছে না? কেউ কি আলো নিভিয়ে দিল?

গোপীনাথও নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। দরজা লক করা আছে। বিপদ এলেও সময় পাবে গোপীনাথ।

সে রান্নাঘরে গিয়ে একটা বড় মাংস-কাটা ছুরি তুলে নিয়ে এল। আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে এটা কোনও প্রতিরোধ নয়, সে জানে। তবু মরার আগে একটা চেষ্টা করা যাবে। ঘটনাটা একতরফা ঘটতে দেওয়া যায় না।

স্পাই হোলে চোখ রাখল গোপীনাথ। ল্যান্ডিং অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকার যেন অনেক ঘটনার সম্ভাবনায় ভরা।

•

গোপীনাথ বিপজ্জনক জীবন কখনও যাপন করেনি। তার জীবন গবেষণা আর লেখাপড়া নিয়ে। সেখানে মারদাঙ্গা, বিপদআপদ ইত্যাদির উকিঝুঁকি নেই। অন্তত এতকাল ছিল না। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটু নতুন অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রয়োজন। গোপীনাথ ভীত নয় তেমন, কিন্তু উদ্বিগ্ন। কারণ রণকৌশল তার জানা নেই।

স্পাই হোল-এ চোখ রেখে ল্যান্ডিং-এর অন্ধকারে কিছুই দেখতে না পেয়ে সে একটু ভাবল। পৃথিবীর যে-কোনও দরজাই ভঙ্গুর। অভেদ্য দরজা বলে কিছু নেই। সেই দরজাই সবচেয়ে মজবুত যা ভাঙতে বা খুলতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে। ফ্ল্যাটের দরজাটা সাধারণ। এর লক-ও কিছু ভল্টের মতো নয়। কোনও আততায়ী এসে থাকলে এবং সেই আততায়ী প্রশিক্ষিত হয়ে থাকলে দরজাটা ভেদ করতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। আজকাল প্লাস্টিক চার্জও পাওয়া যায়। প্রায় নীরব বিস্ফোরণে যে-কোনও তালা উড়িয়ে দেওয়া যায় চোখের পলকে।

গোপীনাথ একটু ভেবে একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিল। সে খুব সন্তর্পণে দরজার লকটা খুলে ল্যাচ ঘুরিয়ে একটু ফাঁক করে দিল পাল্লাটা। তারপর নিঃশব্দে ঘরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে স্টিলের আলমারিটার পাশে দাঁড়াল। যে-ই এসে থাকুক দরজাটা

খোলা দেখে খুবই অবাক হবে এবং একটু ঘাবড়েও যেতে পারে। গোপীনাথের ডান হাতে ধরা ছুরি। চোখ ঈগলের মতো দরজায় নিবদ্ধ।

প্রথমটায় অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। ঘরের বাতি নেভানো থাকলেও কাঁচের শার্সি দিয়ে নাগরিক আলোর আভা আসছে। তাতে ঘরটা ভালই দেখা যাচ্ছে, একটু আবছা এই যা।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর দরজার পাল্লাটা খুব ধীরে ধীরে ফাঁক হতে লাগল।

প্রায় মিলিমিটারের মাপে। একটা জোরালো টর্চের আলো ঘরটাকে যেন চমকে দিল হঠাৎ। তলোয়ারের মতো এদিক আর ওদিকে দু'-তিনবার চালিত হয়ে অন্ধকারকে যেন ফালা ফালা করে ফেলল।

ঘরে ঢুকল দু'জন। সামনে একজন, দু'পা পিছনে আর-একজন। একটু কুঁজো হয়ে, সতর্ক পায়ে।

গোপীনাথের মনে হল, এবার একটু ডাইভারশন দরকার। সে ছোরাটা তুলল। ভাবল ঘরের অন্য প্রান্তে ছুঁড়ে মারবে, যাতে শব্দ শুনে খুনিরা ওই দিকে যায়। ছোরাটা তুলেও হঠাৎ থেমে গেল সে। বোধহয় ভুল করবে সে এ কাজ করলে। বরং অপেক্ষা করা যাক।

দু'জনের একজন টর্চটা চারদিকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু গোপীনাথ আলমারির আড়ালে থাকায় তাকে দেখতে পেল না।

ঘরটা পেরিয়ে শোয়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ফের টর্চ জ্বালল লোকটা। তারপর চাপা গলায় বলল, ব্যাপারটা কী?

অন্য জন বলল, কী?

মালটি তো নেই দেখছি।

বাথরুমটা দেখ।

আরে দূর, সদর দরজা খোলা ছিল না?

তা ছিল।

শালা ভেগেছে।

তবু খুঁজে দেখা যাক।

দু'জনে ঘরে ঢুকে গেল।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে গোপীনাথ নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়িতে ওপরের দিকে মাঝামাঝি উঠে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে নীচে চেয়ে রইল।

পাঁচ-দশ মিনিট বাদে লোকদুটো বেরিয়ে এল। চারদিকে টর্চটা বারকয়েক ঘুরিয়ে দেখল। তারপর লিফটে উঠে চলে গেল।

দরজাটা খোলাই রেখে গেছে ওরা। গোপীনাথ এসে ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজাটা ফের লক করে আলো জ্বালল। শোয়ার ঘরে এসে দেখল তার সুটকেস হাতড়ানো, মানিব্যাগটা টেবিলের ওপর থেকে হাওয়া, একটা ক্যালকুলেটর, একটা ওয়াকম্যান ইত্যাদি রাখা ছিল বিছানার পাশের টেবিলে। সেগুলো নেই। প্রাণের চেয়ে অবশ্যই এগুলোর দাম বেশি নয়।

কিন্তু সে কতটা নিরাপদ তা গোপীনাথ বুঝতে পারছে না। ওরা কি ফিরে আসবে? এলে কখন, বা কবে? ওদের উদ্দেশ্যই বা কী?

কিছু জিনিস চুরি করলেও ওরা কম্পিউটারটা স্পর্শও করেনি। তাতেই বোঝা যায় ওরা গোপীনাথের গবেষণায় আগ্রহী নয়। সুতরাং খুন ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে।

গোপীনাথ ফ্রিজের ঠান্ডা জল খেল খানিকটা। তারপর ঘরের বাতি নিভিয়ে দরজার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে রইল। ডান হাতে ছুরিটা, যেটা কোনও কাজে লাগেনি। লাগবেও না বোধহয়। তবে গোপীনাথকে হয়তো এক চিমটি আত্মবিশ্বাস ছুরিটা দিচ্ছে।

বাকি রাতটা কোনও উৎপাত হল না। ভোরের দিকে গোপীনাথ একটু তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিল। তবু সূর্যোদয়ের আগেই সে উঠল এবং নীচে নামল। ফ্ল্যাটবাড়ির

দারোয়ানদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

রাত-ডিউটি যার ছিল সে ফটক খুলে একটা টুলের ওপর বসে হাই তুলছিল।

গোপীনাথ তাকে জিজ্ঞেস করল, রাতে আপনার ডিউটি ছিল?

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বলল, জি।

কাল অনেক রাতে দুটো নাগাদ দু'জন লোক এ বাড়িতে ঢুকেছিল কি?

লোকটা একটু ভেবে বলল, বাবুলোগ তো অনেকেই বেশি রাতে ফেরেন।

এ দু'জন বাইরের লোক।

লোকটা আরও একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

কার কাছে যেতে চেয়েছিল।

চারতলার থ্রি ডি ফ্ল্যাটে।

আপনারা কি না জেনেই ছেড়ে দেন?

না, ফোন করতে হয়।

ফোন করেছিলেন?

করেছিলাম।

থ্রি ডি ফ্ল্যাট থেকে কেউ কিছু বলেছিল?

দারোয়ান লোকটা এই জেরায় ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, কিছু গড়বড় হয়েছে কি সাহেব?

সেটা পরে বলছি। আগে আমার কথার জবাব দিন। থ্রি

ডি ফ্ল্যাটে মল্লিকজি থাকেন। খুব ড্রিঙ্ক করেন। ওঁর ঘরে বহোৎ আড্ডা হয়। খানাপিনা হয়। কাল রাতেও পার্টি ছিল। আমি ফোন করতেই মল্লিকজির ঘর

থেকে কে একজন বলল, পাঠিয়ে দাও। আরও দুটো পাপী এসেছে।

আপনি তাই ছেড়ে দিলেন?

জি।

লোক দুটোকে চলে যেতে দেখেছেন?

হ্যাঁ। এক ঘণ্টা পরে তারা চলে যায়।

ঠিক আছে। মল্লিকবাবুর ফ্ল্যাটে কে কে থাকে?

মল্লিকবাবু একাই থাকতেন। আজকাল একজন লেডিও থাকেন।

ওঁর কে হন উনি?

তা জানি না।

ওঁর স্ত্রী নেই?

ডিভোর্স করেছেন।

ও

গোপীনাথ আর কথা বাড়াল। লিফটে চারতলায় উঠে এল। থ্রি ডি ফ্ল্যাটের ডোরবেলটা বেশ কয়েকবার বাজাতে হল তাকে।

দরজা খুললেন একজন মহিলা। নাইটি পরা, চোখে ঘুম, মুখে বিরক্তি।

কী চাই? বেশ ঝাঝালো গলা।

গোপীনাথ ভদ্রমহিলাকে কয়েক সেকেন্ডে জরিপ করে নিল। বয়স মধ্য ত্রিশ। একসময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন। রং টকটকে ফরসা, মুখশ্রী চমৎকার। শুধু অনভিপ্রেত কিছু চর্বি শরীরকে অনেকটাই বেঢপ করে দিয়েছে।

আমি এই ফ্ল্যাটবাড়িতেই থাকি। ওপরে। আমি একটা কথা জানতে এলাম।

ভদ্রমহিলা চোখ কুঁচকে বললেন, কী কথা?

রাত দুটোর সময় আপনাদের ফ্ল্যাটে কোনও গেস্ট এসেছিল কি?

মনে নেই।

প্লিজ, একটু ভেবে বলুন। দেয়ার কুড হ্যাভ বিন এ মার্ডার।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে বললেন, মার্ডার! কে মার্ডার হল?

হয়নি। হতে পারত। রাত দুটো নাগাদ দু'জন লোক এসে এ বাড়িতে ঢুকেছিল। তারা আপনাদের ফ্ল্যাটে আসতে চেয়েছিল। আপনাদের ঘর থেকে কেউ তাদের ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলে।

ভদ্রমহিলা বড় বড় চোখে চেয়েই ছিলেন। বললেন, তারা দু'জন তো আসেনি।

সেটাই স্বাভাবিক। তারা আমার ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছিল।

সর্বনাশ! কেন?

বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল আমাকে খুন করা।

ভদ্রমহিলা ঘরের দরজাটা আরও খুলে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি ভিতরে আসুন, প্লিজ।

গোপীনাথ মৃদু হেসে বলল, না, সেটা আপনাদের ডিস্টার্ব করা হবে। পার্টির পরের সকালটা বিশ্রামই নেয় লোকে।

ওঃ, পার্টি আমাদের রোজই হয়। আসুন, ভাল করে শুনি

গোপীনাথ ভিতরে ঢুকল। সব ফ্ল্যাটই প্রায় একরকম। বিশাল হলঘর, মুখোমুখি শোয়ার ঘর, ডান ধারে রান্নাঘর। এদের ফ্ল্যাটটা অবশ্য খুবই মহার্ঘ আসবাবে সাজানো। কালো টাকার গন্ধ আসছে। সামনের ঘরটা ভুক্তাবশেষ বা বোতল-গেলাসে অগোছালো হবে বলে আশঙ্কা ছিল তার। দেখল, সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো। পার্টির রেশ নেই। তবে লম্বা সোফায় একজন উপুড় হয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ডোন্ট মাইন্ড হিম। বসুন।

গোপীনাথ একটু অস্বস্তি নিয়ে বসল।

একটু কফি খাবেন?

না, ঝামেলার দরকার নেই।

ঝামেলা হবে কেন? আমাদের কাজের লোক আছে। এক মিনিট লাগবে। জাস্ট রিল্যাক্স।

ভদ্রমহিলা কফির কথা বলতে গেলেন। এসেই মুখোমুখি বসে বললেন, এবার একটু বলুন তো, কী হয়েছে।

গোপীনাথ সবটা বলল না। রেখেঢেকে বলল। কাল রাতে তার ফ্ল্যাটে ঢোকার চেষ্টা করেছিল দুটো লোক। শেষ অবধি পারেনি, ইত্যাদি।

ভদ্রমহিলা বিস্ফারিত চোখে সব শুনে বললেন, আজকাল কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে এসব খুব হচ্ছে। আমি তো সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি।

কফির ট্রে ঠেলে নিয়ে এল উর্দিপরা একটা লোক। ঠাটবাট এদের ভালই।

গোপীনাথ কালো কফি পছন্দ করে। এক কাপ ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, ডিস্টার্ব করলাম বলে দুঃখিত।

কিছু ডিস্টার্ব করেননি। আমাকে সকালে উঠতেই হয়। ন'টায় আমার অফিস। আপনি কোথায় কাজ করেন?

গোপীনাথ আনমনে বলল, সাক্কি ইনকরপোরেটেডে।

ভদ্রমহিলা একটু অবাক হয়ে বললেন, সাক্কি? সেই বিখ্যাত সাক্কি কি? কিন্তু তার তো কোনও অফিস এখানে নেই।

না। আমি কাজ করি রোমে।

রোম! ওঃ, আপনি তা হলে এনআরআই?

হ্যাঁ। অনেকদিন।

ভদ্রমহিলা গুছিয়ে বসে বললেন, রোম চমৎকার শহর, না?

হ্যাঁ। ভালই।

আমি দু’বার গেছি।

তাই বুঝি।

আমিও এনআরআই। আমেরিকায় ছিলাম। বছর পাঁচেক চলে এসেছি। ডিভোর্সও হয়ে গেল।

গোপীনাথ বলল, স্যাড।

না আমার কোনও দুঃখ নেই। বেশ আছি। ফ্রি।

তাও বটে। আমি এবার উঠি? আপনি তো অফিসে যাবেন।

হ্যাঁ। এনি ওয়ে, মাঝে মাঝে আসবেন। আমি মানুষ ভালবাসি। এই ফ্ল্যাটে সপ্তাহে দু’দিন পার্টি থাকেই।

গোপীনাথ হাসে, আর বাকি পাঁচ দিন?

পাঁচ দিন আমরা অন্যদের পার্টিতে যাই।

ভদ্রমহিলাও হাসলেন। তারপর ফের বললেন, পার্টিই বাঁচিয়ে রেখেছে, জানেন! একা হলে হাঁফ ধরে যায়।

পার্টির নেশা যে সাংঘাতিক তা গোপীনাথ জানে। বিশেষ করে একা মানুষদের কাছে পার্টি একটা পালানোর জায়গা। একটা আশ্রয়। নিঃসঙ্গতাকে ভুলে থাকবার উপায়।

মাঝে মাঝে আসবেন। কাম নেক্সট স্যাটার ডে।

পার্টি?

হ্যাঁ। প্লিজ।

চেষ্টা করব।

কাম উইথ ইয়োর ওয়াইফ।

সেটা সম্ভব নয়।

ও মা, কেন? উনি বুঝি কনজারভেটিভ?

না। আমরা ডিভোর্স করেছি।

ওঃ, সরি। তা হলে একাই আসবেন।

গোপীনাথ বিদায় নিয়ে চলে এল। এসেই ফোন করল সুব্রতকে।

ঘুম ভেঙেছে?

হ্যাঁ গোপীদা। কী খবর?

খবর ভাল নয়।

কী হয়েছে?

বডিগার্ড দরকার হবে কি না বুঝতে পারছি না।

কেন, কী হল আবার?

আজ একবার আসতে পারবি?

আরে, আজ তো আপনার ওখানে যাওয়ারই প্রোগ্রাম আমার, ভুলে গেছেন?

ওঃ, হ্যাঁ, আজ শনিবার, না?

হ্যাঁ। আজ আমার ছুটি।

তা হলে চলে আয়।

যাচ্ছি। একটু তৈরি হয়ে নিই।

গোপীনাথ ফোন রেখে দিল। ঘণ্টাখানেক বাদে হঠাৎ আবার সুব্রতর ফোন, গোপীদা, আমাদের বস রোজমারি আমাকে ফোন করে আপনার ঠিকানা চাইছে।

কেন?

তা জানি না। বলছে জরুরি দরকার। দেব? না। কিছুতেই না।

২৬-৩০. সুব্রতকে টেলিফোন করার পর

সুব্রতকে টেলিফোন করার পর গোপীনাথ সারা ফ্ল্যাটটা ঘুরে বেড়াল আর ভাবল। এই ফ্ল্যাট বা আর কোথাও সে নিরাপদ নয়। তবু রোমে সে যে বিপদের মধ্যে ছিল এখানে সে ততটা বিপদে হয়তো নেই। কারণ, মাফিয়ারা কলকাতায় এসে তেমন কিছু সুবিধে করতে পারবে না। এটা অচেনা শহর। তাদের ভাড়া করতে হবে কলকাতার খুনিয়াদের। সেইটেই হয়তো তার ভরসা। কলকাতার খুনেরা মাফিয়াদের মতো সংগঠিত নয় এবং হয়তো ততটা বুদ্ধিমানও নয়। কাল রাতে যারা হানা দিয়েছিল তারা তো রীতিমতো বোকা। তবে বারবার বোকা বানানো সহজ হবে না। তবু তার ততটা ভয় করছে না, যতটা রোমে হয়েছিল।

ফ্ল্যাটটা তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না একটাই কারণে। তার ঠিকানাটা কোনও ভাবে প্রতিপক্ষের জানা হয়ে গেছে। তার কি পালানো উচিত?

গোপীনাথ ফ্রিজ খুলে দেখল, খাবারদাবার বিশেষ কিছু নেই। ব্রেকফাস্টের জন্য পাঁউরুটি, মাখন এবং কিছু ফলটল জাতীয় জিনিস দরকার। কফি এবং চাও কিনতে হবে।

গোপীনাথ পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল। আগে সে রাস্তায় হাঁটত ভাবতে ভাবতে। বরাবরই সে একটু চিন্তাশীল এবং অন্যমনস্ক লোক। কিন্তু জীবনে বিপদ শুরু হওয়ার পর তার অন্যমনস্কতা পালিয়েছে, চিন্তাশীলতায় এসেছে নিয়ন্ত্রণ। সে এখন চারপাশকে লক্ষ করে।

দোকান অবশ্য বেশি দূরে নয়। ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে গেলে পর পর কয়েকটা ভাল দোকান। দু'মিনিটের হাঁটাপথ। এই পথটুকু পেরোনোই আজ কত শক্ত আর সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। একটা লাল জামা আর কালো প্যান্ট পরা ছোকরা একটা রোগা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে বার দুই তাকাল। গোপীনাথ উলটে ছেলেটির দিকে এমন কঠিন চোখে তাকাল যে, সত্যযুগ হলে

ছোকরা ভস্মীভূত হয়ে যেত। দু'জন কৃষ্ণভক্ত গেরুয়াধারী সাহেব তাকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত পায়ে। গোপীনাথ খুব ঠাহর করে দেখল তাদের, পিছন থেকে যতটা দেখা যায়।

মাখন পাঁউরুটির দোকান পর্যন্ত আর কিছু ঘটল না বটে, কিন্তু সহজ কাজগুলো যে কত কঠিন হয়ে উঠেছে তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল সে।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে সুব্রত যখন এল তখনও সে সেই কথাটাই বলল।

সুব্রত বলল, কাজ কি আপনার এখানে থাকার? আমার বাড়িতে চলুন।

না রে, আমি এখন বিপজ্জনক মানুষ।

কী যে বলেন। চলুন তো, এমনি লুকিয়ে রাখব যে, কেউ টের পাবে না।

ওরা সব টের পায়।

যাক গে, আমি ভয় খাই না। আপনি চলুন।

ও কথা থাক রে সুব্রত, এখন কাজের কথা বল। রোজমারি আমার ঠিকানা চায় কেন?

স্বার্থেই চায়। তবে মুখে বলছে, আপনাকে সিকিউরিটি দেবে।

কীরকম সিকিউরিটি?

তা জিজ্ঞেস করিনি।

ওর কি কোনও সিকিউরিটি এজেন্সি আছে চেনাজানা?

থাকতেই পারে। ঘ্যামা লোকদের কত কী থাকে।

আমি যে কলকাতায় এসেছি এ খবর রোজমারি পেল কোথায়?

তা তো জানি না।

খোঁজ নে।

নেব। তবে সোমবারের আগে হবে না।

আর একটা কথা। রোজমারির প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হলে আমি ভেবে দেখব।

কেন গোপীদা?

ওর ল্যাবরেটরিটা আমার দরকার।

আপনার বডিগার্ড লাগবে বলছিলেন, সত্যি নাকি?

গোপীনাথ একটু ভেবে বলল, বডিগার্ড ব্যাপারটাই হাস্যকর।

অস্বস্তিকরও। কিন্তু দরকার হলে ব্যবস্থা করতে হবে।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, আফটার এ সেকেন্ড থট, বডিগার্ডের প্রস্তাব বাতিল করছি।

কেন গোপীদা?

বাঙালি বা ভারতীয় বডিগার্ডের ওপর আমার ভরসা নেই। দ্বিতীয় কথা, বডিগার্ড রাখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

কিন্তু আপনার তো বিপদ।

গোপীনাথ চিন্তিত মুখে বলল, বিপদটাও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করিস না। মনে হচ্ছে ক্রাইসিসটা সামলে নিতে পারব।

আপনি রিস্ক নিচ্ছেন গোপীদা।

গোপীনাথ একটু হেসে বলল, একটা নিরাপদ নিশ্চিত জীবন যাপন করার পর এই বিপদের জীবনটা খারাপ লাগছে না কিন্তু। জীবনের একঘেয়ে সাকসেস স্টোরিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। নট ব্যাড।

আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ গোপীদা।

গোপীনাথ শুধু একটু হাসল।

সুব্রত বলল, আপনি সোনালিদির কথা কিছু জানতে চাইলেন না তো!

গোপীনাথের মুখখানা উদাস হয়ে গেল, কী-ই বা জানার আছে! আর জেনে হবেটাই বা কী?

সুব্রত একটু রাগের গলায় বলল, অথচ এই তো কিছুদিন আগে আপনি সোনালিদিকে নিজের বিষয়সম্পত্তি দিয়ে দিতে চাইছিলেন।

তখন উপায় ছিল না। আমার তো উত্তরাধিকারী কেউ নেই। সোনালি একসময়ে তো আমার স্ত্রী ছিল, সেই সুবাদে যা একটু সম্পর্কের ছায়া আছে। তা সে তো রিফিউজই করেছে।

সুব্রত মৃদু স্বরে বলল, সোনালিদি রিফিউজ না করলে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকত না। ভদ্রমহিলার আত্মমর্যাদার বোধ খুব টনটনে।

তা হবে। ওসব আলোচনায় আর লাভ কী? ও আমার অফার রিফিউজ করায় আই ফেল্ট ইনসাল্টেড।

কেন গোপীদা, আপনাকে অপমান করার জন্য তো করেননি। ওঁর আত্মমর্যাদায় লেগেছিল বলে নেননি।

হঠাৎ তুই সোনালির সাউকার হয়ে উঠলি কেন? তোকে কি ও উকিল রেখেছে?

সুব্রত হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, আপনাদের দুজনের মধ্যে কী ঘটেছিল জানি না, কিন্তু আপনাকে বা সোনালিদিকে কাউকেই আমার খারাপ মনে হয় না।

আমিই খারাপ।

কথা এড়িয়ে যাবেন না গোপীদা। কী হয়েছিল বলুন।

গোপীনাথ সামান্য বিরক্ত হল। বলল, এটা কি সেসব কথা বলার সময়? দেখছিস তো কী অবস্থায় আমি আছি।

সুব্রত একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে আপনার এই বিপদের দিনে আপনার একজন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান সঙ্গী দরকার।

গোপীনাথ একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, সেই সঙ্গী কি সোনালি?

নয় কেন?

নয় এই কারণে যে, আমার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে, ব্যস্ততার সময়ে সোনালি আমাকে অপমান করে ছেড়ে চলে এসেছিল। অ্যান্ড শি নেভার লুকড ব্যাক।

কিন্তু কেন এসেছিল গোপীদা?

বোধহয় সে নারীবাদী বা আর কিছু।

আপনি সোনালিদিকে ভাল করে জেনেছেন কি?

চেষ্টা করেছি। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম বোঝার মতো এলেম আমার নেই।

এটা একটা ক্লিশে।

সোনালি তোকে কত করে ফি দিচ্ছে বল তো।

সোনালিদি ফি দেবেন কেন? তিনি কি আপনার সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করার জন্য লালায়িত?

গোপীনাথ হেসে বলল, লালায়িত কথাটা বেশ বলেছিস। না হয় মানলাম সে লালায়িত নয়। কিন্তু তুই হামলা মাচাচ্ছিস কেন?

আপনার কথা ভেবে।

আমার কথা বেশি ভাবিস না। দুঃখ পাবি। আমাকে খরচের খাতায় ধরে রাখ।

সেটা পেরে উঠছি না। ছেলেবেলা থেকে আপনাকে দেখে আসছি। আপনি আমার আইডল ছিলেন।

গোপীনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, তুই আমার ভাল চাস জানি। কিন্তু সোনালির সঙ্গে আমাকে আর জুড়বার চেষ্টা করিস না, কারণ, স্বামী হিসেবে আমি কোনও মেয়েরই যোগ্য নই। মেয়েদের একটা পারিবারিক জীবন চাই, তাদের কিছু সেন্টিমেন্টাল চাহিদাও থাকে, যেটা একেবারেই অন্যায্য নয়। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, ওসব আমার দ্বারা হওয়ার নয়। কিছু মানুষ থাকে যাদের ঘরে সেট করা যায় না, তারা অ্যাডজাস্টমেন্টে আসতে জানেই না।

সুব্রত মৃদু হেসে বলল, যার নিজের সম্পর্কে অ্যাসেসমেন্ট এত ক্লিয়ারকাট সে তো ইচ্ছে করলেই এই অসুবিধেটা টপকে ফেলতে পারে।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পারলাম কই?

একটু চেষ্টা করলে পারতেন না?

গোপীনাথ ম্লান হেসে বলল, তুই হয়তো জানিস না সোনালির সন্দেহবাতিক ছিল সাংঘাতিক। তার ধারণা হয়েছিল আমার সঙ্গে বিভিন্ন মেয়েমানুষের সম্পর্ক আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ইউরোপে একা ব্যাচেলর মানুষ থাকতাম, মহিলাসংসর্গ হয়নি বলি কী করে? কিন্তু সেগুলো প্রাক-বিবাহ যুগে। পরে কাজের চাপে আর নেশায় আমার অন্য সব বোধই চলে যায়।

সোনালিদির সন্দেহ কি অমূলক?

মাথা নেড়ে গোপীনাথ বলল, তাও বলছি না। তবে এ প্রসঙ্গটা বাদ দিলেই ভাল করবি। দেয়ার ওয়াজ এ হেল অফ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংস। আমি কাউকে দোষ দিই না।

সোনালিদি কিন্তু অত্যন্ত রিজার্ভড মহিলা, উইথ পারসোনালিটি।

জানি।

আমার মনে হয় আপনি সোনালিদিকে খুব ভাল করে এখনও জানেন না। তাও হতে পারে। কিন্তু ডোন্ট ট্রাই রিকনসিলিয়েশন। ইট মে হার্ট ইউ। এখন রোজমারি আর মনোজের কথা বল। এরা কেমন লোক?

রোজমারি বুদ্ধিমতী।

আর মনোজ কি গাধা?

তা বলছি না। তবে মনোজ ক্রাইসিস ম্যান নন। বিজনেস ব্রেনও নেই।

খুব স্বাভাবিক। সেটা আমারও নেই।

আর একটা কথা।

বল।

শুভ নামে রোজমারির একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। বাচ্চা ছেলে। সে আমার ঘরে এসে মাঝে মাঝে আড্ডা মারে।

সে কিছু বলেছে?

হ্যাঁ। সে বলেছে রোজমারি নাকি প্রায়ই সিঙ্গাপুরে যায়।

সেখানে কী আছে?

একজন আত্মীয় থাকে। বোধহয় বোনটোন হবে। কিন্তু সেটা কথা নয়। কথা হল, শুভ দেখেছে একটা লোক রোজমারির সঙ্গে একই ফ্লাইটে যায় এবং আসে। কিন্তু রোজমারির চেনা লোক নয়।

বটে!

লোকটা বেঁটে, ফরসা এবং স্বাস্থ্যবান। শুভ তাকে বশ্বের নাম দিয়েছে। লোকটাকে শুভ একদিন ফলোও করে। কিন্তু চিৎপুরের একটা বাড়িতে ঢুকে লোকটা গায়েব হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?

সম্পর্কটা শুভ না জানলেও আমি জানি। আমি কোম্পানির পিআরও। শুভ যে বাড়িটার ঠিকানা দেয় সেই বাড়িতেই লুলু নামে একটা লোক থাকে। লুলু আমাদের কোম্পানির সিকিউরিটির চার্জে আছে। কিন্তু সে কখনও অফিসে আসে না। কোম্পানির অ্যাকাউন্টসে খোঁজ নিয়ে জেনেছি লুলুর নামে একটা বেশ মোটা টাকার বরাদ্দ আছে।

গোপীনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, তার সঙ্গেই বা আমাদের কী সম্পর্ক?

আমাদের নয়। রোজমারিরর।

তুই কি বলতে চাস রোজমারির সঙ্গে ওর এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশন আছে।

ডিডাকশন তাই সাজেস্ট করে।

তাতেও আমাদের কিছু যায়-আসে না।

আমার ধারণা রোজমারি লুলুকেই আপনার সিকিউরিটির ভার দেবে।

দিক না।

সুব্রত মাথা নাড়ল, আমার কিছু হোমওয়ার্ক করা আছে।

সেটা আবার কী?

পুলিশ রেকর্ড।

লুলু কি ক্রিমিন্যাল?

ড্রাগ ট্রাফিকার। জার্মানিতে ওর বেস। বেশির ভাগ ব্যাবসাই বে-আইনি।

সেটা কি রোজমারি জানে না?

বোধহয় না।

রোজমারি কি বোকা?

বোকা নয়। অজ্ঞানতা। লুলু ইজ এ ব্যাড নিউজ।

তা হলে কী করতে বলিস?

সাবধান হতে বলি।

তুই তো সকালেই আমাকে জিজ্ঞেস করছিলি আমার ঠিকানা রোজমারিকে দিবি কি না। তা হলে আবার একথা বলছিস কেন? লুলু যে ব্যাড নিউজ এটা তো তোর জানাই ছিল।

সুব্রত মাথা নেড়ে বলল, না জানা ছিল না। লুলু সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য পুলিশের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের কাছে বলা ছিল। তিনি আমার সম্পর্কে কাকা হন। তিনি ঘণ্টাখানেক আগে আমাকে টেলিফোন করে জানালেন।

লুলুকে তা হলে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না কেন?

প্রমাণাভাব। তা ছাড়া পুলিশ সব ক্রিমিন্যালকে অ্যারেস্ট করেও না, যতক্ষণ না ঘটনা ঘটছে।

গোপীনাথ কাধটা ঝাঁকিয়ে বলল, টোস্ট খাবি? আমার খিদে পেয়েছে।

টোস্ট! এখন এইসব কথার মাঝখানে হঠাৎ টোস্টের কথা কেন?

বিপদ যেমন সত্য, খিদেও তেমন সত্য। কলা আর আপেল আছে, টোস্টের সঙ্গে মন্দ লাগবে না।

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি খান। আমি খেয়ে এসেছি।

গোপীনাথ উঠে গিয়ে টোস্ট সেঁকে মাখন লাগিয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে কলা আর আপেল। খেতে খেতে বলল, লুলু যে বা যা-ই হোক রোজমারির ল্যাবরেটরিতে একটা অ্যাকসেস আমার দরকার।

কেন গোপীদা? কোনও এক্সপেরিমেন্ট করতে চান?

হ্যাঁ। অ্যান্ড এ ভাইট্যাল ওয়ান।

সুব্রত কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, গোপীদা, আঁদ্রে যখন খুন হয়, অর্থাৎ যখন তাকে বিষ দেওয়া হয় তখন আমি স্পটে ছিলাম, জানেন?

গোপীনাথ অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ গোপীদা। আঁদ্রে যখন বিয়ারটা খাচ্ছিল তখন আমি তার দিকেই চেয়ে ছিলাম।

বলিসনি তো!

বলে কী হবে! তখন কি জানতাম যে বিয়ারে বিষ আছে?

কে দিয়েছিল জানিস?

যদি বলি জানি?

জানিস! সত্যিই জানিস?

সুব্রত একটু হাসল।

২৭.

সোমবার দুপুরের দিকে সোনালি রোজমারির ফোন পেল।

সোনালি, একবার আমার ঘরে আসবেন?

সোনালি একটু অবাক হল। সে মনোজের সেক্রেটারি। রোজমারির সঙ্গে তার প্রয়োজন খুবই কম। সে বলল, হ্যাঁ, ম্যাডাম আসছি।

সোনালি একটা গোটা উইং পেরিয়ে আর-একটা উইং-এ রোজমারির দফতরে পৌঁছোতে একটু সময় নিল। এবং এই সময়টুকু সে ভাবল। কয়েকদিন আগে মনোজ সেন তাকে ডেকে গোপীনাথ সম্পর্কে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। তাতে সে মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি। বিরক্ত হয়েছে এবং সেটা প্রকাশও করেছে। রোজমারিও আবার সেই একই প্রসঙ্গ তুলবে নাকি?

রোজমারির ঘরে যখন সে ঢুকল তখন রোজমারির মুখে হাসি এবং আপ্যায়ন। সোনালি এই আন-অফিশিয়াল ভাবভঙ্গি পছন্দ করে না বসদের কাছ থেকে।

রোজমারি পরিষ্কার বাংলায় বলল, বসুন সোনালি।

সোনালি বসল। এবং সে হাসল না।

রোজমারি তবু মুখের হাসিটা বজায় রেখে বলল, আপনাকে কয়েকটা কনফিডেনশিয়াল কথা বলতে চাই, সোনালি।

সোনালি ভ্রু একটু কুঁচকে বলল, কী ব্যাপারে?

আমাদের কারখানার ব্যাপারে।

সোনালির ভ্রু কেঁচকানোই রইল, অফিসের ব্যাপারে! কিন্তু সেটা আমাকে কেন? আমি তো সামান্য একজন কর্মচারী।

রোজমারি তবু হাসিমুখেই বলল, আপনার এই কারখানা সম্পর্কে অনেক কথাই জানা আছে। সুতরাং আপনি আমাদের ঘনিষ্ঠ কর্মচারীদের একজন। আমরা সম্প্রতি কিছু সমস্যায় পড়েছি। আপনি কি শুনবেন?

ঠান্ডা গলায় সোনালি বলল, ইচ্ছে করলে বলুন।

রোজমারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে বসল। তারপর খুব ধীর গলায় বলল, আমরা যে অ্যালয়টা তৈরি করি সেটা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা ছিল। বিভিন্ন অত্যাধুনিক ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যালয়টা দরকার হয়।

জানি ম্যাডাম।

খুব সম্প্রতি এই অ্যালয়টা কোনও কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কারখানাটা অনেকেই কিনে নিতে চেয়েছিল, আমরা দিইনি। এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের ওপর নজর পড়েছে। আমরা বুঝতে পারছি না কী করব। আপনি তো জানেন, আঁদ্রে মারা গেছে এবং ইন্টারপোলের একজন এজেন্ট সুধাকর দত্ত এসে আমাদের যথেষ্ট বিভ্রান্ত করে দিয়ে যায়।

এ সবই আমি জানি ম্যাডাম।

এর একটা রি-অ্যাকশন হয়েছে সাক্কি ইনকরপোরেটেডেও। আপনি হয়তো জানেন না, সেখানকার একটা প্রোজেক্টের চিফ গোপীনাথ বসুকে অপহরণ করা হয় এবং খুন করারও চেষ্টা হয়েছে।

সোনালি চুপ করে রইল। তার বুক কাঁপছিল।

রোজমারি অত্যন্ত নরম গলায় বলল, আমি আপনাদের সম্পর্কের কথা জানি। গোপীনাথ আপনার প্রাক্তন স্বামী।

সোনালি হঠাৎ মুখটা তুলল। তার দুটো চোখ ছলছল করছে এবং নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না সে।

সোনালি বলল, গোপীনাথের কী হয়েছে?

রোজমারি মাথা নেড়ে বলল, যতদূর জানি, এখনও কিছু হয়নি।

সোনালি একটা শ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল।

রোজমারি গলাটা আরও নরম করে বলল, সোনালি, আপনি কি জানেন যে, গোপীনাথের বিপদ এখনও কাটেনি?

আমি কিছুই জানি না। ও কোথায় আছে?

রোজমারি মৃদু স্বরে বলল, বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি গোপীনাথ বসু এখন কলকাতায় রয়েছেন।

ভীষণ চমকে উঠল সোনালি। গত মাসখানেক যাবৎ সে প্রতি মুহূর্তে গোপীনাথের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার আশঙ্কা করছে। ঠিক বটে গোপীনাথ এখন তার কেউ নয়। কিন্তু গোপীনাথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পুরুষ সোনালির জীবনে কখনও আসেনি। হয়তো গোপীনাথই পুরুষ সম্পর্কে তার যাবতীয় আগ্রহকে নষ্ট করে দিয়েছিল। একজন কঠিন, আত্মসর্বস্ব, কাজপাগল মানুষ ছিল গোপীনাথ। স্ত্রী সম্পর্কে যার না ছিল ভাবাবেগ, না ভালবাসা, না কোনও আগ্রহ। নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে সে বরাবর এড়িয়ে গেছে সোনালিকে। বিদেশে একা সোনালির কীভাবে যে দিন কাটত সে-ই জানে। গোপীনাথ সারা পৃথিবী চষে বেড়াত নিজের কাজে। গোপীনাথ সম্পর্কে

আজ সোনালির কোনও ভাবাবেগ নেই ঠিক কথা, কিন্তু একটু স্মৃতি আছে। সুখস্মৃতি না হলেও স্মৃতি। গোপীনাথের করুণ পরিণতি ঘটলে সে দুঃখ পাবে।

সোনালি বলল, কলকাতায়! কবে এল?

খুব সম্প্রতি।

ও। বলে চুপ করে গেল সোনালি।

রোজমারি নরম গলায় বলল, কলকাতায় এলেও যে তিনি রেহাই পাবেন, এমন নয়। আপনি হয়তো জানেন না, বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক মাফিয়া গোষ্ঠী তাকে খুঁজছে।

কেন খুঁজছে?

গোপীনাথ একজন মন্ত বিশেষজ্ঞ। হয়তো আমাদের অ্যালয় সম্পর্কে সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত সত্যভাষণটা তিনিই করতে পারবেন। কিন্তু কেউ কেউ চায় না যে গোপীনাথ সেটা করুন।

তা হলে কী হবে?

রোজমারি অত্যন্ত সমবেদনার গলায় বলল, গোপীনাথকে বাঁচানো দরকার।

সোনালি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু কিছু বলল না।

রোজমারি বলল, আমাদেরও একটু স্বার্থ আছে। আমরাও তার কাছ থেকে সত্যটা জানতে চাই। জানলে আমাদের অ্যালয় অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে।

ও। সোনালির নিস্পৃহ জবাব।

শুনুন সোনালি, স্বার্থ থাকলেও আমরা গোপীনাথের মতো একজন কাজের লোককে হারাতে এমনিতেই চাই না। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত। আপনিও কি তা চান না?

সোনালি অভিভূতের মতো চেয়ে থেকে বলল, আপনি কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন।

আমরা গোপীনাথের ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা জানি না।

জেনে কী করবেন?

তার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করব।

সোনালি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ ব্যাপারে আমি এখনই কিছু বলতে পারি না।

ভেবে বলবেন?

হ্যাঁ, তার আগে ঠিকানাটা উনি দিতে রাজি কি না সেটাও আমার জানা দরকার।

তবে তাই হোক। যদি গোপীনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তা হলে তাকে বলবেন রোজমারি এই প্রস্তাব দিয়েছে যে, তার সিকিউরিটি এবং মাসে এক লক্ষ টাকা বেতন দিতে আমরা প্রস্তুত। তিনি যদি আমার কনসার্নে কাজ করেন তা হলে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করব।

চেষ্টা করব বলতে।

হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকা মাইনে ছাড়াও তার যাবতীয় খরচও আমরা দেব, ধরুন মাসে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো। দয়া করে একথাও বলবেন, বেতন নিয়ে তিনিও তার মতামত দিতে পারেন, আমরা বিবেচনা করতে রাজি আছি।

বলব।

আপনি আজ একটু টেনশনে আছেন। ঠিক আছে আসুন। কাল কথা হবে।

সোনালি সম্পূর্ণ একটা ঘোরের মধ্যে নিজের ঘরে এল। এমনকী যে-লোকটা তার টেবিলের মুখোমুখি বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, প্রথমে তাকে লক্ষ্যই করল না।

সুব্রত বলল, কোথায় গিয়েছিলেন দিদি?

আপনি কখন এলেন?

মিনিট পাঁচেক হবে।

সোনালি নিজের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ নিজেকে সংযত করল। গোপীনাথকে সে ভালবাসে না ঠিকই, কিন্তু উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা তাকে বড্ড কাহিল করে ফেলেছে।

সোনালি বিনা ভূমিকায় বলল, সুব্রতবাবু, আপনার গোপীদা এখন কোথায়?

সুব্রত ভ্রু তুলে বলল, কেন বলুন তো!

আমি জানতে চাই গোপীনাথ এখন কলকাতায় কি না। আপনি জানেন?

সুব্রত একটু চুপ করে থেকে বলল, খবরটা চাপা নেই। অনেকেই জানে। আমিও বলব বলেই আপনার কাছে এসেছি।

তা হলে বলুন।

গোপীদা এখন কলকাতায়।

কেন?

গোপীদাকে রোম থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। অনেক বিপদের ভিতর দিয়ে।

কীরকম বিপদ?

তাকে মারবার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে। বরাতজোরে বেঁচে গেছেন। কিন্তু কলকাতাও তার পক্ষে হট হয়ে উঠছে।

তা হলে কী হবে?

শুধু ভাগ্যের ওপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না।

আমরা কী করতে পারি?

গোপীদা যদি পালিয়ে বা লুকিয়ে থাকতে রাজি হতেন তা হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু হি ইজ এনজয়িং দি ডেনজারস।

সে কী!

সেটাই তো কথা। পরশু দিন ওঁর ফ্ল্যাটে দুটো নোক ঢুকেছিল, উইথ আর্মস।

সোনালি সভয়ে বলল, তারপর?

গোপীদা অ্যালার্ট ছিলেন বলে বেঁচে যান। কিন্তু বারবার এরকম হবে না। সত্যিকারের প্রফেশনাল খুনির পাল্লায় পড়লে মুশকিল আছে।

সোনালি একটু চুপ করে থেকে বলল, রোজমারি ওর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে চায়। চাকরিও দিতে চাইছে। মাসে দেড় লাখ টাকা মাইনে এবং সেটাও নেগোশিয়েবল।

সুব্রত একটু হাসল, জানি।

জানেন?

হ্যাঁ। রোজমারি প্রস্তাবটা আমাকেই প্রথম দেয়।

গোপীনাথ কী বলছে?

গোপীদা রাজি।

রাজি?

হ্যাঁ। তবে রোজমারির সিকিউরিটি সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। লুলু লোকটা ভাল নয়।

লুলু কে?

ম্যাডামের পেয়ারের লোক। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের সিকিউরিটি ইনচার্জ।

ও। লোকটা ভাল নয় কেন?

লুলু মে বি এ ডাবল এজেন্ট। ডাবল এজেন্টদের তো বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো উলটো পার্টির টাকা খেয়ে গোপীদাকে সেই খুন করে বসল।

সোনালি শিহরিত হয়ে বলে উঠল, না না, তা হলে কিছুতেই লুলু নয়।

আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু ম্যাডামের লুলুর প্রতি খুব দুর্বলতা। উনি হয়তো লুলু সম্পর্কে কোনও বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না।

আমি সেকথা রোজমারিকে জানিয়ে দিতে চাই।

কী বলবেন?

বলব, গোপীনাথের সিকিউরিটির ভার আমরা নেব। লুলুকে এর মধ্যে আনা চলবে।

বলে দেখুন তা হলে।

তার আগে গোপীনাথের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

টেলিফোন তুলে নিন না, হাতের কাছেই রয়েছে।

সোনালি মাথা নেড়ে বলল, এখন নয়।

কেন এখন নয়?

আই অ্যাম ফিলিং নার্ভাস।

কেন সোনালিদি? নার্ভাস হওয়ার মতো কী আছে?

বহুকাল সম্পর্ক নেই। হয়তো রি-অ্যাক্ট করবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুব্রত বলল, কেন যে আপনাদের সম্পর্কটা এমন বিষিয়ে গেল কে জানে। অথচ দু’জনেই তো ভাল।

আমি ভাল নই।

কে বলল ভাল নন? আপনি খুব ভাল।

তাই বুঝি?

গোপীদাও ভাল।

সোনালি চুপ করে রইল।

সুব্রত একটু পরে বলল, গোপীদা এখন ফ্ল্যাটেই আছেন। আপনি ফোনটা করুন সোনালিদি।

রোজমারির প্রস্তাবটা ওকে দেব তো!

হ্যাঁ, কিন্তু আমার আর একটা জরুরি কথা আছে।

কী কথা?

আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

তেমন কিছু কথা কি?

হয়তো পছন্দসই হবে না। প্লিজ, রাগ করবেন না।

ঠিক আছে, বলুন।

গোপীদা কীরকম বিপদের মধ্যে আছেন তা তো বুঝতেই পারছেন।

পারছি। হি ইজ বিয়িং হাউন্ডেড।

হ্যাঁ। হাউন্ডেড বাই হার্ডেন্ড ক্রিমিন্যালস।

বুঝলাম।

গোপীদা তবু একা থাকছেন। এই একা থাকাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। লোনলি ম্যান ইজ ইজি টারগেট।

তা হলে কী করতে হবে?

আমি চাই, গোপীদার একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী থাকুক। তাতে দু'জোড়া চোখ দু'জোড়া কান এবং দু'জোড়া হাত থাকবে।

সোনালি অবাক হয়ে বলল, একজন গার্ড রাখলেই তো হয়।

গার্ড! গার্ড কি ততটা অ্যালার্ট হবে? বেতনভুক কর্মচারী কি পারে বুক দিয়ে বাঁচাতে?

তা হলে কে পারবে?

গোপীদার কোনও আপনজন। গোপীদাকে ভালবাসে এমন কেউ। সেটা আপনি।

আমি! বলে হাঁ করে চেয়ে থাকে সোনালি।

আপনিই সোনালিদি। আপনি ছাড়া কারও কথা ভাবাই যায় না। আমি যাচ্ছি। আপনি ফোনটা করুন।

সুব্রত চলে গেল। সোনালি বিস্মিত সর্বস্বান্তের মতো বসে রইল। কী অনায়াসে বলে চলে গেল সুব্রত। কিন্তু কী সাংঘাতিক একটা ঝড় তুলে গেল তার বুকে।

সোনালি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল অভিভূতের মত। তারপর দুর্বল হাতে টেলিফোনটা তুলে ডায়াল করল।

টেলিফোনটা কানে দিয়ে শুনল ওপাশে রিং হচ্ছে।

রিং হয়ে যেতে লাগল, ফোন কেউ ধরল না।

২৮.

ফোনে নো-রিপ্লাই হলে ধরে নিতে হয় যে, লোকটা ফ্ল্যাটে নেই। অথবা ফোনটা খারাপ। ফোন খারাপ থাকার কথা নয়, থাকলে সুব্রত জানত। বাড়ি নেই এটাই ধরে নেওয়া ভাল।

সোনালি তবু একটু উদ্বেগের মধ্যে রইল। লোকটা বিপদের মধ্যে আছে। মারাত্মক বিপদ। একটা কিছু যখন তখন হয়েও যেতে পারে তো! চিন্তাটা সোনালি মাথা থেকে তাড়াতে পারল না। অথচ গোপীনাথের সঙ্গে তার জাগতিক সম্পর্ক শেষ হয়েছে। তাকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে।

সোনালির ডাক এল মনোজের ঘর থেকে, আধ ঘণ্টা বাদে।

মিস সোম, বসুন।

সোনালি বসল।

আপনার সঙ্গে রোজমারি আজ একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গে কথা বলেছে।

হ্যাঁ।

মনোজের মুখটা খুবই ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন। সে গলা খাঁকারি দিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, আমিও এর আগে একদিন প্রসঙ্গটা তুলে আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলাম। তবু কথাটা যে উঠছে তার কারণ দুটো। আমাদের অ্যালয়ের কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন থেকে আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয় কথা, গোপীনাথ বসুর মতো ট্যালেন্টেড লোককে যে-কোনও মূল্যেই বাঁচানো উচিত।

সোনালি মাথা ঠান্ডা রেখে বলল, গোপীনাথ বসুকে সিকিউরিটি দেওয়ার ব্যাপারে কিছু কথা আছে।

কী কথা?

আপনাদের দেওয়া সিকিউরিটি আমাদের পছন্দ নয়।

মনোজ হঠাৎ এ কথায় ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কেন বলুন তো!

লুলু সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই।

মনোজ অবাক হয়ে বলল, লুলু! লুলু আবার কে?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের সিকিউরিটি ইনচার্জ।

মনোজ ভ্রু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড কিছু মনে করার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, লুলু! মাই গড! লুলু মানে তো নওলকিশোর লালা। সে-ই কি আমাদের সিকিউরিটি ইনচার্জ?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয়ের সিকিউরিটি ইনচার্জ কে সেটাও মনোজ জানে না দেখে বিস্মিত সোনালি বলল, হ্যাঁ। কেন, আপনি জানতেন না?

মনোজ একটা অদ্ভুত চোখে সোনালির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ওপর নীচে কয়েকবার মাথা নেড়ে বলল, আঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ। অবশ্যই।

সোনালির স্পষ্ট মনে হল, মনোজ সত্যিই জানত না। এবং জেনে মোটেই খুশি হল না। তার মুখে আচমকা একটা রক্তাভা দেখা গেল।

একটু সময় নিয়ে এই আকস্মিক অপ্রতিভতাকে একটু সামলে নিয়ে মনোজ হেসে বলল, আসলে সবসময়ে সব জিনিস খেয়াল থাকে না। আমি একটু অ্যাকাডেমিক টাইপের। বাস্তববোধ কম। ওসব রোজমারিই দেখে কিনা। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন।

সোনালি খুব শান্ত, দৃঢ় গলায় বলল, আমরা লুলুর কথাই বলছিলাম। সিকিউরিটির ব্যাপারে লুলুকে আমাদের পছন্দ নয়।

মনোজ একটু চুপ করে থেকে বলল, কেন নয় বলবেন?

ওর সম্পর্কে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে।

মনোজ ভ্রু কুঁচকে আরও একটু ভেবে বলল, লুলুর কনসার্নের নাম গ্লোবাল সিকিউরিটি, না?

না তো! ইউনিভার্সাল আই।

ওঃ, তা হবে। নওলকিশোরের অনেক কোম্পানি, অনেক ব্যাবসা। সবকিছুর খবর রাখা অসম্ভব। তা হলে আপনারা কী চান?

গোপীনাথের সিকিউরিটির ভার অন্য কেউ নিক।

মনোজ প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করল না। বলল, বেশ। কিন্তু চাকরির অফারটা?

সেটা উনি রাজি হলে আপনাকে জানাব।

চিন্তিত মনোজ হঠাৎ যেন সবকিছু থেকে খানিকটা দূরে সরে গেল। নিস্পৃহ হয়ে গেল। লুলুর প্রসঙ্গটা কি এতই অরুচিকর ওর কাছে? কেনই বা? সুব্রত বলেছিল, লুলু রোজমারির পেয়ারের লোক। কথাটা কতটা সত্যি! আর সবচেয়ে বড় কথা, লুলু কে? আসলে কে?

মনোজের কাছ থেকে খুব নিচু স্বরে বিদায় নিয়ে চলে এল সোনালি। টেবিলটা চটপট গুছিয়ে নিয়ে সে বেরোবার মুখে আর একবার টেলিফোন করল গোপীনাথকে। রিং বেজে গেল। ফোন কেউ ধরল না।

অন্য দিনের চেয়ে আজ অনেক দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল সোনালি। গোপীনাথের ফোন কেন নো-রিপ্লাই হচ্ছে সেটা তার জানা দরকার। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যখন সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরের দিকে ছুটছিল তখন বাইরে চমৎকার লনের দু'পাশে যে গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে, সেখান থেকে কে যেন অনুচ্চ স্বরে ডাকল, সোনালিদি।

হেলমেট পরা, সুব্রতকে সে প্রথমটায় চিনতে পারেনি। সুব্রত তার মোটর বাইকটাকে পার্কিং লট থেকে বের করে সামনে এনে দাঁড় করাল, উঠুন।

সোনালি এই প্রথম টের পেল তার হাত-পা বশে নেই। সে রীতিমতো কাঁপছে। বলল, আমি পারব না। পড়ে যাব।

উঠুন সোনালিদি। উই মাস্ট রিচ হিম কুইকলি। গত তিন ঘণ্টা ধরে গোপীদার ফোনে নো-রিপ্লাই।

সোনালি সুব্রতর পিছনে উঠে পড়ল। তারপর কীভাবে যে রাস্তাটা পার হল তা সে জানেও না। সম্পূর্ণ হতচেতনা বা আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিল সে। একজন চেনা মানুষ এখন আর স্বামী নয়–তবু তো চেনা। তার মৃত্যুটা কীভাবে নেবে সোনালি।

সুব্রত বাইকটাকে লক করে তার হাত ধরে প্রায় হিঁচড়ে টেনে এনে লিফটে উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

কী হয়েছে সুব্রতবাবু? আপনি এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন?

সোনালিদি, প্রে টু গড।

ওর কি কিছু হয়েছে?

হোক তা আমরা কেউ-ই চাইছি না।

লিফট থামতেই দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে গেল সুব্রত। পিছনে সোনালি।

দরজাটা আধখোলা ছিল। সুব্রত সপাটে সেটাকে খুলে ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। বাইরের ঘরের দৃশ্যটাই বীভৎস। দেওয়াল, দরজা, ডিভান, কম্পিউটার, সোফাসেট সর্বত্র এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর চিহ্ন। মেঝেয় অবধি কোথাও কোথাও চলটা উঠে গেছে। না হোক গোটা ত্রিশ-চল্লিশবার গুলি চালানো হয়েছে এই ঘরে।

সুব্রত শোয়ার ঘরটায় উঁকি দিল। এ ঘরেও কয়েকবার গুলি চলেছে বটে, কিন্তু বেশি নয়। সুব্রত বাথরুম, বারান্দা, আর একখানা ঘর সর্বত্র ঘুরে দেখল। কোথাও লাশ নেই।

সোনালি সুব্রতর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছে। আতঙ্কিত গলায় বলল, এসব কী হয়েছে সুব্রতবাবু?

গুলি চলেছে। কিন্তু কেউ মরেনি। গোপীদা হয় পালিয়েছে, নয় কেউ বা কারা তুলে নিয়ে গেছে।

অ্যাবডাকশন?

হতেও পারে। গোপীদাকে কতবার বললাম আমার বাড়িতে চলে যেতে, কেন যে গেল। সাহস ভাল, কিন্তু অতি-সাহস তো ভাল নয়।

সোনালি ঘাবড়ে গেছে। মুখ শুকনো, ঠোঁট সাদা। তবু যেন ভিতর থেকে কিছু কঠিন হয়েছে সে। চারদিকে চেয়ে বলল, এত গুলি চালাল কেন বলুন তো? মারতে হলে তো একটা-দুটো গুলিই যথেষ্ট।

সেটাই ভাবছি।

সদর দরজার কাছে গিয়ে ঘরটা একবার দেখল সোনালি। তারপর হঠাৎ ডান ধারে কাঁচের শার্সিওলা জানালার দিকটায় গিয়ে বলল, সুব্রতবাবু, এদিকে আসুন।

সুব্রত গেল।

যতদুর মনে হচ্ছে কেউ বাইরে থেকে এই জানালা দিয়ে ভিতরে গুলি করেছে।

সুব্রত অবাক হয়ে বলল, বাইরে থেকে?

হ্যাঁ। ওই দেখুন, বাইরে ভারা বাঁধা আছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বাড়ির এ পাশটায় বাস্তবিক ভারা বাঁধা আছে। সম্ভবত রাজমিস্ত্রি বা রঙের মিস্ত্রিদের কাজ চলছে। তবে আজ কোনও মিস্ত্রি নেই। জানালার কাচগুলি ভাইব্রেশনে ফেটে গেছে। শব্দ হয় এমন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। হলে লোক জমে যেত। কাজ হয়েছে নিঃশব্দে।

সুব্রত বলল, কিন্তু গোপীদা কোথায়?

সোনালি চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কোথাও রক্তের চিহ্ন দেখতে পেল না সে।

সুব্রত জানালা দিয়ে নীচে ঝুঁকে কিছু দেখছিল। হঠাৎ চাপা গলায় বলল, সোনালিদি! এদিকে আসুন।

সোনালি প্রায় ছুটে এল।

কী সুব্রতবাবু?

সুব্রত নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

কী?

নীচে কিছু ঝোঁপঝাড় রয়েছে। বোধহয় এ বাড়ির কিচেন গার্ডেন। দেখতে পাচ্ছেন?

সোনালি ঝুঁকে দেখে বলল, পাচ্ছি।

ভাল করে দেখুন, ঠিক জানালার সোজাসুজি নীচে একটা ঝোঁপের ভিতর থেকে একজোড়া পা বেরিয়ে আছে।

সোনালি মাথা ঘুরে বোধহয় পড়েই যেত। সুব্রত ধরে ফেলে বলল, নার্ভাস হবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখুন।

কার পা? আপনার গোপীদা?

আসুন আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা দেখা দরকার।

কিন্তু যাবে কী করে সোনালি? তার হাত-পা কাঁপছে, বুকে প্রচণ্ড ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট। বলল, সেই দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে?

ভাল করে না দেখে কিছু ধরে নেওয়া কি ভাল? মনে হচ্ছে যার পা দেখা যাচ্ছে সে এই আটতলা থেকেই নীচে পড়ে গেছে।

সোনালি বিবশ গলায় বলল, আটতলা থেকে? তা হলে কি বেঁচে থাকার কথা।

হু নোজ? লেট আস সি। চলুন।

নীচে নেমে গোপীনাথের মৃতদেহ পর্যবেক্ষণের মতো অবস্থা সোনালির নয়। তার শরীর যেন নেই হয়ে গেছে, মাথা সম্পূর্ণ বোধশূন্য। এত বিকল তার কোনওদিন লাগেনি। ভয় নয়, মনটা যেন দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

অবস্থাটা বুঝে সুব্রত একরকম তাকে ধরে ধরেই লিফট পর্যন্ত আনল। লিফটাকে ওপরে আনতে একটু সময় লাগল। সুব্রত চাপা স্বরে বলল, স্বাভাবিক আচরণ করুন। নইলে লোকে সন্দেহ করবে।

নীচে নেমে তারা একজন ছোকরা দারোয়ানকে দেখতে পেল। একটা বাচ্চা চা-ওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে।

সুব্রত গিয়ে বলল, পিছনদিকে বাগানের মধ্যে কেউ পড়ে আছে।

লোকটা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কে পড়ে আছে?

সেটাই দেখা দরকার। আমাদের সঙ্গে এসো।

আপনারা কোন ফ্ল্যাটের মেহেমান?

গোপীনাথ বসু। আটতলা। এসো, সময় নেই।

লোকটা একটা বেঁটে লাঠি হাতে নিয়ে উঠল। পিছনে বাস্তবিকই বিস্তর ঝোঁপঝাড়। ঘনবদ্ধ বাগান। আটতলা থেকে একটা প্রমাণ সাইজের মানুষ পড়ে

যাওয়াতেও যে তেমন শব্দ হয়নি তা দারোয়ানের আচরণেই বোঝা যাচ্ছে। শব্দটা সে শুনতে পায়নি।

মস্ত একটা কামিনী ঝোঁপ ভেদ করে লোকটা পড়েছে। ঝোঁপের মধ্যেই আটকে আছে তার দেহ। শুধু পা দুটো বাইরে। পায়ে বিদেশি দামি জুতো, পরনে ফেডেড জিনসের প্যান্ট, গায়ে একটা জিন্‌সেরই শার্ট।

না, লোকটা গোপীনাথ নয়। এ লোকটা ছোটখাটো, রোগার দিকেই। হাত থেকে একটা স্টেনগান গোছের জিনিস ছিটকে ঝোপেই আটকে আছে।

দারোয়ান চেঁচাল, কে লোকটা?

সুব্রত তাকে ধমক দিয়ে বলল, চেঁচাচ্ছ কেন? পুলিশে খবর দাও।

দারোয়ান বলল, উনি তো ফ্ল্যাটের লোক নন! লোকটার মুখ ভাল করে দেখে নিল সুব্রত। না, এ ফ্ল্যাটের লোক তো নয়ই, এ দেশের লোকও নয়। স্পেন বা দক্ষিণ আমেরিঙ্গর মানুষ। গায়ের রং বাদামি। মোটা গোঁফ আছে।

সোনালি প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে স্থির চোখে লোকটাকে দেখছিল।

সোনালিদি, এবার স্বাভাবিক হোন।

সোনালি মাথা নেড়ে বলল, স্বাভাবিক হব! কী করে বলুন তো! এসব কী হচ্ছে। আপনার গোপীদাই বা কোথায়?

তা জানি না। তবে মনে হচ্ছে এ লোকটাই ভারা বেয়ে উঠে গোপীদাকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তারপর কী হয়েছিল?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

দারোয়ানটা হঠাৎ লোকটার পা ধরে টানাহ্যাঁচড়া করতে যাচ্ছিল। সুব্রত ধমক দিয়ে বলল, ওরকম করবে না, পুলিশ খেপে যাবে।

তা হলে কী করব স্যার?

থানায় খবর দাও। বাড়িতে কারও টেলিফোন নেই? যাও তাড়াতাড়ি।

লোকটা চলে গেল।

আমরা কী করব সুব্রতবাবু?

চলুন, গোপীদার ফ্ল্যাটে গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।

কী যে বলেন!

সোনালিদি, আমাদের যে অপেক্ষা করতেই হবে। চলুন।

তারা আবার ওপরে এল। ফ্ল্যাটে ঢুকল। সোনালি বলল, কফিটা আমি করে আনছি।

সুব্রত চারদিকটা ঘুরে দেখছিল। জবাব দিল না।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই সুব্রত একরকম দৌড়ে গিয়ে সেটা ধরল।

হ্যালো।

একটা সতর্ক সরু গলা বলল, কে?

কাকে চাই?

গোপীনাথ বসু আছেন?

না, নেই।

একটু চুপ থেকে গলাটা হঠাৎ মোটা হয়ে গেল, কে রে, সুব্রত নাকি?

হ্যাঁ, গোপীদা! আপনি বেঁচে আছেন?

আছি। আজকাল বেঁচে থাকাটাই কেমন অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

ফ্ল্যাটে এ কী কাণ্ড হয়ে আছে?

সেইজন্যই একটু গা-ঢাকা দিতে হয়েছে।

কী হয়েছিল বলবেন?

খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। দুপুরে কম্পিউটার নিয়ে বসেছিলাম। কিছু কাজ ছিল। হঠাৎ কী হল জানিস, ঘরের স্বাভাবিক আলোর প্যাটার্নে একটা সূক্ষ্ম চেঞ্জ ঘটল। খুব সূক্ষ্ম। বাঁদিকে চেয়েই দেখলাম, শার্সির বাইরে একটা মাথা উঠে আসছে, একটা নলও যেন দেখতে পেলাম।

তারপর?

বিশ্বাস করবি না সেই ঘটনা। কোথায় দৌড়ে পালাব, তা নয়। আমি সটান মেঝেতে শুয়ে ড্রাই সাঁতার দিয়ে ওই জানালার দিকেই এগিয়ে গেলাম। লোকটা শার্সি দিয়ে ভিতরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছিল।

সর্বনাশ!

আমাকে যখন দেখতে পায় তখন আমি জানালার কাছে পৌঁছে গেছি।

আপনি কি পাগল?

না, আমি বুদ্ধিমান। লোকটা শেষ চেষ্টা করেছিল আমাকে ঝাঁঝরা করে দিতে। আমি শুধু হাত বাড়িয়ে ওকে একটা ধাক্কা দিয়েছি।

এত সাহস ভাল নয় গোপীদা।

লোকটা কি মরে গেছে?

হ্যাঁ। না মরলেও মরবে।

দিস ইজ মাই ফার্স্ট মার্ডার।

এটা মার্ডার নয় গোপীদা। সেলফ ডিফেন্স।

২৯.

যে-কোনও ঘটনারই একটা ধাক্কা আছে। গোপীনাথ ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। একটা লোক–তা সে হোক না আততায়ী–তার হাতেই খুন হয়েছে, এই নগ্ন সত্যটা সে ভোলেই বা কী করে? আত্মরক্ষার্থে খুন যে খুন নয় তাও সে জানে, তবু কি মন তা মানছে?

টেলিফোনে সুব্রতর মোলায়েম গলা বলে যাচ্ছিল, আপনি মোটেই এটাকে হোমিসাইড হিসেবে নেবেন না। আপনি লোকটাকে ধাক্কা না দিলে লোকটা আপনাকে অবশ্যই খুন করত। বুঝেছেন ব্যাপারটা?

বুঝেছি। তবু আমার খুব নার্ভাস লাগছে।

আপনি এখন কোথায় গোপীদা?

একটা পাবলিক কল বুথ থেকে কথা বলছি। গড়িয়াহাটে।

শুনুন, আপনার এখন আর এই ফ্ল্যাটে আসার দরকার নেই। আমার মনে হয়, এখন কিছুদিন অন্যত্র যাওয়াই আপনার পক্ষে ভাল।

দূর বোকা।

কেন, বোকা বলছেন কেন?

লোকটা কোন তলা থেকে পড়েছে, কেন পড়েছে এসব পুলিশের জানা নেই। কিন্তু তদন্তের সময়ে পুলিশ যদি দেখে যে আমি সন্দেহজনকভাবে অনুপস্থিত তা হলে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাতে সুবিধে হবে।

সুব্রত একটু ভেবে বলল, বাঃ বেশ বলেছেন তো! কিন্তু সন্দেহ করার কারণ তো থেকেই যাচ্ছে। আপনার ঘরের দেওয়াল মেঝে সর্বত্র গুলির দাগ, পুলিশ এলে তো জলের মতো বুঝতে পারবে যে, লোকটা কোন ফ্ল্যাটে ঘটনা ঘটাতে এসেছিল। তখন তো আপনাকেই সন্দেহ করবে।

নাও করতে পারে। আমি যদি বলি যে, ঘটনার সময় আমি ঘরে ছিলাম না এবং লোকটা অ্যাক্সিডেন্টলি ভারা থেকে পড়ে গেছে?

পুলিশ বিশ্বাস করবে কি?

করবে। কারণ লোকটা বিদেশি, বাঁশের ভারায় ওঠার অভিজ্ঞতা নেই। তার ওপর লোকটা একটা হাই ইমপ্যাক্ট অটোমেটিক অস্ত্র চালাচ্ছিল। খুবই রিস্ক ছিল কাজটায়।

সুব্রত ফের একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, আপনি না একটু আগেই বলছিলেন যে, আপনি নার্ভাস বোধ করছেন?

করছিই তো।

যে নার্ভাস তার ব্রেন এত চমৎকার কাজ করে কীভাবে?

গোপীনাথ একটু হেসে বলল, মাথা বেচেই তো খাই। আমাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়, সেটা ভুললে চলবে কেন?

যাকগে, তা হলে আপনি ফ্ল্যাটটা ছাড়বেন না?

ফ্ল্যাটটা ছাড়লে এবং গা-ঢাকা দিলে আমি বাঁচব বটে; কিন্তু ঘটনাগুলো আমাদের হাতের বাইরে চলে যাবে। আর বাঁচলেও সেটা হবে সাময়িক। আমার পিছনে যারা লেগেছে তারা খুনের ফেরিওয়ালা। এক-একটা খুনের জন্য যদি বিশেষ ব্যক্তিকে খুনের চুক্তি থাকে–তা হলে বিরাট টাকার লেনদেন হয়, বুঝলি?

বুঝলাম।

তাই ওরা সহজে হাল ছাড়বে না। যেখানেই পালাই, খুঁজে বের করে মারবে। ডেডবডিটা কি ওখানেই পড়ে আছে?

হ্যাঁ। কেউ বুঝতেই পারেনি যে, একটা লোক পড়ে গেছে নীচে। এমনকী দারোয়ানও নয়। সুতরাং আইউইটনেস নেই। না, গোপীদা, আপনি বোধহয় নিরাপদ।

মোটেই নয়।

কেন বলুন তো!

আশপাশে মেলা হাইরাইজ বাড়ি আছে। যেসব বাড়ি থেকে কেউ যে ঘটনাটা দেখেনি তার কী বিশ্বাস আছে? এখনই হয়তো মুখ খুলবে না, কিন্তু সময়মতো

হয়তো বলে দেবে।

ওঃ, আপনি তো ভীষণ সমস্যায় ফেললেন গোপীদা? যা-ই বলছি তাই উড়িয়ে দিচ্ছেন?

ওরে, বিপদে পড়ে এখন যে আমার বাস্তববুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে একটু।

তা হলে কী করবেন?

রিস্ক নিয়ে ওই ফ্ল্যাটেই থাকব। তবে অজুহাতগুলো ভাবতে হবে।

একা থাকবেন?

দোকা থাকার বিপদ আছে। দু'নম্বর লোকটিকে প্রথমত বিশ্বাস করা যাবে না। দ্বিতীয়ত দু'নম্বর লোকটিকে খামোখা বিপদে ফেলা হবে।

কেউ যদি স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুঁকি নেয়?

তুই নিবি আমি জানি। কিন্তু তোর বউ বাচ্চা আছে, তোকে এই বিপদে টেনে আনার চেয়ে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

আমি নই। তবে আমি ছাড়াও কেউ থাকতে পারে।

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কেউ নেই, তুই তো জানিস। এই যে একা হয়ে গেছি, এই একাই এখন আমার অভ্যাস। না রে, তুই আমাকে নিয়ে ভাবিস না।

আমি না ভাবলেও কেউ কেউ ভাবছে।

তুই কি সোনালিকে মিন করছিস? কেন রে? ও মেয়েটার সেন্টুতে খোঁচা দিয়ে কেন এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিবি? ও মতলব ছাড়। সোনালির আমার প্রতি কোনও দুর্বলতা নেই, আমি জানি। আমার দুঃখের আর বিপদের কথা ওকে শুনিয়ে তুই প্রায় ওকে ফোর্স করছিস বলে আমার বিশ্বাস। এ কাজটা ঠিক হচ্ছে না। লিভ সোনালি অ্যালোন।

আপনাকে নিয়ে পারা যায় না। আপনি এত স্টাবার্ন।

শোন না পাগলা, রোজমারি আর মনোজ কী বলছে?

তারা আপনাকে এক লাখ টাকা বেতন এবং ইনসিডেন্টাল এক্সপেন্সের জন্য মাসে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চায়। অবশ্য অফার নেগোশিয়েবল।

গোপীনাথ নাক সিঁটকে বলল, দেড় লাখ মাত্র?

আরে না। আরও উঠবে। প্লাস আপনার সিকিউরিটি।

সিকিউরিটি তো তুই অ্যাকসেপ্ট করতে চাইছিস না। লুলু না কী যেন নাম লোকটার!

হ্যাঁ। আপনি কোম্পানির সিকিউরিটি না নিয়ে নিজস্ব সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে পারেন। খরচ ওঁরা দেবেন।

গুড।

আপনার অফার কী?

এটা গরিব দেশ, খুব বেশি চাওয়া হয়তো ঠিক হবে না।

দেশ গরিব হোক, ওঁরা তো গরিব নন। বছরে কয়েক কোটি ডলার টার্নওভার। আপনি ছাড়বেন কেন?

ঠিক আছে, বেতনটাকে তিনগুণ করে দিতে বল।

তার মানে তিন লাখ?

হ্যাঁ। আর ওই পঞ্চাশ হাজার।

রেটটা চিপ হয়ে গেল না?

আরে না। এটা তো স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা।

গোপীদা আপনি সাক্কিতে কত বেতন পেতেন?

সে অনেক টাকা। আমার হিসেব নেই। তবে ফেবুলাস সামথিং। ব্যাঙ্কে জমা হত। টাকা রোজগারটা আমার কাছে অর্থহীন লাগে এখন। কোনও মানে হয় না। টাকা খরচা করারও তো পথ পাই না।

গরিবদের দিলে পারেন তো।

দূর বোকা? তোর কি ধারণা গরিবদের টাকা বিলিয়ে দিয়ে তাদের উপকার করা যায়? টাকার ব্যবহার গরিবরা জানেই না। উলটোপালটা খরচ করে, মদটদ খায়, ফুর্তি করে। গরিবদের যদি কখনও দিতে হয় দিবি, কিন্তু আন্ডার গাইডেন্স, নইলে ওই টাকা কারও কারও বিপদ ডেকে আনতে পারে।

বুঝলাম। এবার আপনি ফ্ল্যাটে চলে আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি।

আমরা। আমরাটা কে?

আমি আর আমার এক কলিগ।

কলিগকে টেনে এনেছিস কেন?

ইনি ভাল সিকিউরিটির কাজ জানেন বলে এনেছি।

তোকে তো বলেইছি আমার সিকিউরিটি গার্ড লাগবে না।

তবু দেখুন, পছন্দ না হলে ফিরিয়ে দেবেন।

তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। পুলিশ এসেছে? উঁকি মেরে দেখ তো?

এখনও আসেনি গোপীদা।

গুড। আমি আসছি।

গোপীনাথ ফোন রেখে দেওয়ার পর সুব্রত ফোনটা ধীরে নামিয়ে রেখে ফিরে সোনালির বিবর্ণ মুখ দেখতে পেল।

কী বলছিল ও?

গোপীদাকে যতটা ইমপ্র্যাকটিক্যাল ভাবতাম ততটা নন। ক্লিয়ার ব্রেনে ভাবছেন। ডিটেলসে ভাবছেন, দ্যাটস এ গুড সাইন।

সোনালি দুর্বল গলায় বলল, কীসের গুড সাইন বলুন তো! আপনারা কি পাগল হয়ে গেলেন? এরকম ঝাকে ঝাকে গুলি ছুঁড়ে গেছে, আর একটু হলেই তো মরত, গুড সাইন কীসের?

আছে সোনালিদি, আছে। হি ইজ লিভিং ডেনজারাসলি, ঠিক কথা। কিন্তু উনি যে সিচুয়েশনটা সম্পর্কে সচেতন সেটাও তো একটা প্লাস পয়েন্ট।

এসব হেঁয়ালি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সুব্রত একটু হেসে বলল, আসলে বিপদ দেখে আপনি খুব ঘাবড়ে গেছেন, যাওয়ারই কথা, কিন্তু গোপীদা ঘাবড়াননি।

কী হয়েছিল বলল?

লোকটা যখন ভরা বেয়ে ওপরে উঠেছিল তখন গোপীদা কম্পিউটারে কাজ করছিলেন, উনি বললেন, উনি ঘরের আলোয় খুব সূক্ষ্ম একটা চেঞ্জ টের পেয়েছিলেন, বুঝলেন?

বুঝলাম।

না সোনালিদি, বোঝেননি। আরও তলিয়ে ভাবুন। নরম্যালি এত সূক্ষ্ম চেঞ্জ ধরাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বিশেষ করে যখন আপনি খুব মন দিয়ে কোনও কাজ করছেন।

ও, তাই বুঝি?

তার মানে কী জানেন তো! গোপীদার সিক্সথ সেন্স খুব ভাল কাজ করছে। আর সেটাই এই সিচুয়েশনে সবচেয়ে ভাল খবর। ইট উইল সেভ হিম।

সোনালি ভ্রু কুঁচকে বলল, কিন্তু একদিন যদি সিক্সথ সেন্সটা ফেল করে তা হলে কী হবে?

সুব্রত নিপাট ভালমানুষের মতো বলল, সেইজন্যই তো আপনাকে দরকার।

আমাকে। বিস্মিত সোনালি বলল, আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে?

গোপীদার এখন বোধহয় সবচেয়ে প্রয়োজন আপনাকে। নইলে এই ত্রিভুবনে গোপীদার আর কোনও বন্ধু নেই।

কেন, আপনিই তো আছেন।

হ্যাঁ, আমিও গোপীদার খুব বিশ্বস্ত বন্ধু বটে, কিন্তু আমি চব্বিশ ঘন্টার বন্ধু নই।

আপনার গোপীদার কোনও বন্ধু নেই কেন বলুন তো।

যাঁরা জিনিয়াস তারা একটু বন্ধুহীন হন। আসলে ইন্টেলেকচুয়ালি তারা এত হাই যে, সমান মাপের মানুষ পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া ইগো প্রবলেম তো থাকেই।

তবু স্বীকার করবেন না যে, আপনার গোপীদা স্বার্থপর।

সুব্রত সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না সোনালিদি, গোপীদা একজন হেল্পলেস ম্যান। কতটা অসহায় তা হয়তো আপনি জানেন না। এমনিতেই উনি একটু আনসোশ্যাল, সংসারী নন, তার ওপর কাজপাগল। আর এখন তো ঘোরতর বিপদে পড়ে সম্পূর্ণ এক্স কমিউনিকেটেড। উনি চাকরিটা নিতে চাইছেন কেন জানেন, টু বি ইন দি গেম এগেন। চাকরিতে জয়েন করলে বিপদও আছে। হি উইল হ্যাভ টু লিভ অ্যান এক্সপোজড লাইফ, ইজি টারগেট। গোপীদার সত্যিই কোনও বন্ধু নেই সোনালিদি।

সোনালি গম্ভীর হল। চিন্তিতও হয়তো উদ্বিগ্নও। সামান্য ধরা গলায় বলল, তবে চাকরি করতে দিচ্ছেন কেন? বারণ করুন না।

বারণ করার আমি কে? ওঁর ওপর আমার অধিকার সামান্য, তা ছাড়া ওঁর অলটারনেটিভই বা কী? পালিয়ে থাকলেও খুব সুবিধে হবে না, ওঁর পিছনে কারা লেগেছে তা তো বুঝতেই পারছেন। দুনিয়ার সবচেয়ে কৃতবিদ্য খুনিরা। তাও এক তরফ নয়, দুই তরফ, উনিও সেই কথাই বলছিলেন, পালিয়ে থেকে হবেটা কী, বরং ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে।

সোনালি ভাবছিল। ভ্রু কোঁচকানো এবং দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে থেকে। একটু বাদে বলল, আমার কী করা উচিত তা বুঝতে পারছি না।

যদি ইচ্ছে করে তবে গোপীদাকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করতে পারেন।

আপনি তো জানেন, উই আর নো মোর রিলেটেড অ্যাজ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। উই ওয়ার নেভার গুড ফ্রেন্ডস। সত্যি কথা বলতে কী, উই হ্যাড ভেরি লিটল রাপোর্ট। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হত খুবই কম।

আমি গোপীদাকে জানি সোনালিদি, লোকটা ওই রকমই। কাণ্ডজ্ঞানের বেশ অভাব। কিন্তু হোপফুলি হি হ্যাজ চেঞ্জড।

সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।

আচ্ছা, আচ্ছা, লেট হিম কাম।

সোনালি একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমি বরং চলে যাই। আমাকে দেখলে হয়তো খুশি হবে না।

হু নোজ? একটু থেকেই যান।

হয়তো ভাববে আমি রি-এন্ট্রির চেষ্টা করছি।

গোপীদা কি মিনমাইন্ডেড সোনালিদি?

লোকটাকে আমি ভাল চিনি না।

কে কাকে চেনে? চিনতে সময় লাগে।

সোনালি নিরস্ত হল। তারপর কে জানে কেন, রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। হয়তো গোপীনাথ আসার মুহূর্তে সামনে থাকতে চায় না।

বাইরে মোটামুটি অন্ধকার হয়ে আসছে। গোপীনাথ একটু দেরি করছে আসতে। কৌতূহলী সুব্রত জানালার কাছে গিয়ে নীচে তাকাল। হ্যাঁ, পুলিশ এসেছে। কয়েকজন পুলিশ এবং বেশ কিছু কৌতূহলী লোক।

ডোরবেল বাজল। সুব্রত গিয়ে দরজা খুলতেই গোপীনাথের হাসিমুখ দেখা গেল।

কী রে?

আপনার জন্য আমরা ভেবে সারা হচ্ছি আর আপনি দিব্যি হাসিহাসি মুখ করে ঘরে ঢুকছেন?

তবে কি কাদব রে? তবে আমার বোধহয় শোকার্ত মুখ নিয়েই থাকা উচিত। কিন্তু কী হচ্ছে জানিস?

কী হচ্ছে?

আই অ্যাম এনজয়িং দা লাইফ থরোলি। যত ঘটনা ঘটছে ততই ভাল লাগছে। বুঝলি রে পাগলা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি এত ভাল কোনওদিন থাকিনি।

বটে!

একজ্যাক্টলি। ভাবছি পাগল হয়ে গেলাম নাকি!

সুব্রত মাথা নেড়ে বলল, পাগলামি হলে টের পেতাম।

এখন কী করলাম জানিস?

কী করলেন?

নীচে গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দিব্যি ডেডবডিটা দেখলাম। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একটু ঠাট্টা-ইয়ারকিও করলাম। একটুও ঘাবড়ে যাইনি। অথচ লোকটা একটু আগে আমার হাতেই

ফের গোপীদা?

যাকগে। এনি ওয়ে আই অ্যাম নাউ এ ভেরি কনফিডেন্ট ম্যান। মনে হচ্ছে আমার আরও এক জোড়া চোখ, আরও এক জোড়া কান এবং মগজে আরও কিছু ঘিলু কেউ সাপ্লাই দিয়েছে। দাঁড়া, আগে পোশাকটা পালটাই।

গোপীনাথ শিস দিতে দিতে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং কিছুক্ষণ পরে পরিষ্কার একটা সাদা লুঙ্গি আর গেঞ্জি চড়িয়ে বেরিয়ে এল। বলল, মুশকিল কী জানিস, মাঝে মাঝে বড্ড খিদে পায়।

খিদে।

হ্যাঁ। তোর ক্যাটারাররা দু'বেলা সেই মিল সার্ভ করে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু জলখাবার তো দেয় না। ওটা আমাকে বানিয়ে নিতে হয়। কিন্তু সবসময়ে সময় হয় না, খেয়ালও থাকে না। তখন খিদে চেপে জল খেয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে হয়। হ্যাঁ, তা তোর সেই কলিগটি কোথায়? বিদেয় করে দিয়েছিস?

হয়তো বিদেয় হতে চাইবে না।

বটে। কিন্তু তাকে তো আমার দরকার নেই।

কে জানে দরকার আছে কি না। আগে আলাপ তো হোক।

রান্নাঘর থেকে সোনালি বেরিয়ে এল। হাতে একটা ট্রে। তাতে কফির কাপ, টোস্ট ওমলেট এবং কাটা ফল বিভিন্ন প্লেটে সাজানো। কিছু কাজুবাদামও দেখা যাচ্ছিল আলাদা পিরিচে। গোপীনাথের সামনের টেবিলে রেখে যখন দাঁড়াল সামনে, তখন গোপীনাথ যেন ভূত দেখছে। মুখে কথা নেই।

কথা কিছুক্ষণ হারিয়েই গেল যেন সকলের মুখ থেকে।

৩০.

বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থেকে গোপীনাথ খুব স্তিমিত গলায় বলল, তুমি! সোনালি মুখখানা যেন দাতে দাঁত চেপে কঠোর করে বলল, হ্যাঁ আসতে হল।

আমি তো সুব্রতকে বারণই করেছিলাম তোমাকে ডিস্টার্ব করতে। ও কথা শুনল না।

ও আমাকে এনেছে কে বলল?

সুব্রত আনেনি?

আমার ইচ্ছে না হলে কি আনতে পারত।

গোপীনাথ বোধহয় লজ্জা ও সংকোচে মাথা নিচু করে বলল, তুমি নিজের ইচ্ছেয় আমার সঙ্গে দেখা করবে ভাবিনি। আমার বড় অসময়ে এলে।

কীসের অসময়? তুমি কী করেছ?

গোপীনাথ অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কোনও দোষ করেছি বলে তো মনে হয় না। কিন্তু ঘটনার একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছি। আমার কাছাকাছি কেউ থাকুক আমি চাই না। হি অর শি উইল বি ইন মরটাল ডেনজার।

সে তো খানিকটা আঁচ পাচ্ছিই। এরকম সাংঘাতিক অবস্থায় তুমি থাকছ কী করে?

একটু ম্লান হেসে গোপীনাথ বলল, থাকছি আর সাধে? থাকতে হচ্ছে। যাব কোথায়?

অন্তত কিছুদিনের জন্য তো একটু লুকিয়ে থাকা যায়।

মাথা নেড়ে গোপীনাথ বলে, কোথায় লুকোব? যেখানেই যাব সেখানেই ঘটনা ঘটবে। যাদের কাছে যাব তারা বিপদে পড়বে। আমি এখন অচ্ছুৎ। আমার কাছে তোমাদের আসার দরকার নেই। দেখছ তো কী কাণ্ড হয়ে গেল আজ। সাব মেশিনগান দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সোনালি একটু রেগে গিয়ে বলল, একটা কারণ তো থাকবে।

কারণ তো আছেই। আদ্রেঁর রিসার্চ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলছে। সলিড ফুয়েল নিয়ে রিসার্চ। জিনিসটা যদি তৈরি করা যায় তা হলে খুব লাভজনক। তাই কম্পিটিটররা নেমে পড়েছে।

আদ্রেঁর দায় তোমার ঘাড়ে চাপছে কেন?

অনেকের ধারণা, কাজটা হয়তো আমি শেষ করতে পারি। সোনালি, তোমার পাসপোর্টটা কি ভ্যালিড আছে?

কেন থাকবে না? আছে।

ওঃ! বলে গোপীনাথ একটা কাতর শব্দ করল।

কী হল?

গোপীনাথ ফের ম্লান হেসে বলল, আমার তো কোনওকালেই কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু ছিল না। তোমার সঙ্গে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে সেটা ভুলে গিয়ে এখনই একটা

অন্যায্য আবদার করতে যাচ্ছিলাম।

সোনালি ভ্রু কুঁচকে চাপা গলায় বলল, কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

হ্যাঁ হ্যাঁ খাচ্ছি। আয় রে সুব্রত।

সুব্রত কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, আমারও পাসপোর্ট আছে। আমি একবার হংকং গিয়েছিলাম। কোনও কাজ থাকলে বলতে পারেন।

তুই রোম শহরটা চিনিস না, সোনালি চেনে।

রোমে কোনও কাজ আছে?

হ্যাঁ। কিন্তু বিপজ্জনক কাজ।

কী কাজ?

একটা বন্ধ ফ্ল্যাটে ঢুকে একটা জিনিস খুঁজতে হবে।

কী জিনিস?

আদ্রেঁর ডায়েরি।

কোনও ফর্মুলা আছে নাকি?

কী আছে জানি না। তবে ওর পেপার্সে ডায়েরিটার রেফারেন্স আছে বারবার।

কাজটা খুব শক্ত কি?

খুব শক্ত।

তা হলে সোনালিদিকে বলছেন কেন?

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, ঠিক কাজ করিনি। আমার মাথাটা ঠিক নেই কিনা।

সোনালি একটু দূরে সোফায় বসে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, কী ঠিক করেছ, আমার ছোঁয়া কিছু খাবে না?

সেকী!বলে তাড়াতাড়ি কফির কাপ তুলে নিল গোপীনাথ। তারপর বলল, আমার সবকিছুই ডিসকর্ডে চলছে। সংগতিহীন আচরণ। তবে ইন্সটিংক্ট কাজ করছে। ভাল কাজ করছে।

সোনালি বলল, আমাকে অনভিপ্রেত মনে হলে সেটা বলে দাও। তা হলে আমি আর আসব না।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অনভিপ্রেত কেন হবে? তা নয়। তবে তোমাকে আমার কাছে আর আসতে হবে না।

শোনো, তুমি আমাকে সহ্য করতে না পারলে আমি আসব না ঠিকই। কিন্তু যদি বিপদের ভয়ে আমাকে তাড়াতে চাও তা হলে আসব।

কেন সোনালি? তুমি কী করবে এসে?

তা জানি না। পরে ভাবব। সুব্রতবাবু, আপনি আমার বাড়িতে খবরটা দিয়ে দেবেন কি যে, আমি এই ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে আছি এবং হয়তো কয়েকদিন থাকব?

ওঃ সোনালিদি, বাঁচালেন।

গোপীনাথ মুখ গোমড়া করে বলল, তুই যে এত ইডিয়ট তা জানতাম না। মাথার গ্রে সেলগুলো তো একদম ইনঅ্যাক্টিভ দেখছি।

শোনো মিস্টার বোস, আমি থাকছি।

সোনালি, প্লিজ!!

একটা কারণেই থাকছি যে, দুটো মাথা সবসময়েই একটা মাথার চেয়ে বেশি কাজের। তোমাকে বাঁচানো দরকার।

গোপীনাথ কফি খেল। তারপর হঠাৎ টোস্টের প্লেটটা টেনে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল। বলল, অনেকক্ষণ খিদে পেয়েছে। খাইনি।

সোনালি সুব্রতর দিকে চেয়ে বলল, আপনাকে একটু সাহায্য করতে বললে করবেন কী?

করব। বলুন।

আমার কিছু জিনিস চাই। একটা চিরকুট দিচ্ছি, আমার মাকে দেবেন। মা সব গুছিয়ে দেবে। সেটা এখানে আমার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

এটা কোনও কাজ হল? চিরকুটটা লিখে ফেলুন। এনে দিচ্ছি।

গোপীনাথ শুধু বলল, অবাধ্য।

কফি খেয়ে সুব্রত চটপট বেরিয়ে গেল। বলে গেল, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আসছি। ততক্ষণ আপনারা সেটলমেন্টে আসুন।

সুব্রত চলে যাওয়ার পর সোনালি বলল, শোনো, আমি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই এখন আর বিশ্বাস করি না। বিয়ে জিনিসটার ওপর কোনও আস্থা নেই আমার। কিন্তু বন্ধুত্ব জিনিসটাকে মানি। তুমি আমাদের বিয়েটাকে ভুলে গেলে ভাল হয়। আমি আজ বন্ধুর মতোই এসেছি, নট অ্যাজ অ্যান এক্স-ওয়াইফ।

গোপীনাথ হঠাৎ মুখ তুলে সোনালির চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কখনও আমার বন্ধু ছিলে? আমাদের বন্ধুত্বের রিলেশনটাই বা কবে কীভাবে হল?

আমরা একসঙ্গে তো কিছুকাল ছিলাম।

ওই পর্যন্তই। একসঙ্গেও কি ছিলাম?

সেটা তোমার দোষ।

কবুল করছি। আমি তোমাকে কম্পানি দিইনি। আমি বর্বরের মতোই ব্যবহার করেছি। তাই আমরা যেমন স্বামী-স্ত্রী হইনি, তেমন বন্ধুও হয়ে উঠিনি। তাই আজ হঠাৎ তোমার এই বন্ধুর মতো আগমনটা অস্বাভাবিক।

সোনালি খোঁচা খেয়ে লাল হল। তীব্র গলায় বলল, তুমি তো সত্যিই বর্বর। কারও বন্ধুত্ব পাওয়ারও যোগ্য নয়।

গোপীনাথ হিমশীতল গলায় বলল, শোনো আমি বর্বর হলেও আমার কতকগুলো নিজস্ব মর‍্যাল ভ্যালুজ আছে। নিঃসম্পর্কের কোনও মহিলার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সোনালি এ কথায় ছিটকে উঠে দাঁড়াল। তীব্রতর গলায় বলল, তোমার মর‍্যালিটি শুনে আমার হাসি পায়। ইউ ওয়্যার অলওয়েজ এ লায়ার, এ চিট, এ ডিবচ।

ঠান্ডা গলায় গোপীনাথ বলল, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমার ওসব দোষও আছে। যদি জানোই, তা হলে হঠাৎ আজ বন্ধুত্ব পাতাতে এলে কেন?

কেন বলে তোমার মনে হয়?

মে বি ইউ আর আফটার মাই মানি।

উত্তেজিত সোনালি দাতে দাঁত ঘষে বলল, মানি! মানি! লজ্জা করল না বলতে? যখন রোম থেকে সুব্রতকে ফোন করে আমাকে সর্বস্ব দিতে চেয়েছিল তখন কে রিফিউজ করেছিল?

গোপীনাথ তেমনি উত্তেজনাহীন নিষ্ঠুরতায় বলল, মে বি নট মানি, বাট ফর সাম আদার রিজিনস।

হোয়াট আর দোজ রিজিনস?

গোপীনাথ একটা হাই তুলে বলল, সেটা ভাবতে হবে।

তুমি তোমার এত সাহস যে, আমাকে

সোনালি কাঁদত হয়তো। কিন্তু শক্ত হল। তার চোখ থেকে উগ্র ঘৃণা শরাঘাতে জর্জরিত করছিল গোপীনাথকে। সে বলল, তোমার বন্ধুত্বটাকে কেন বিশ্বাস করি না জানো? ওটা অ্যারেঞ্জড বন্ধুত্ব। তোমাকে কেউ শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছে।

অলরাইট, আই অ্যাম লিভিং।

গুড নাইট।

সোনালি প্রায় দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল এবং বেরিয়ে গেল। দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হাসল গোপীনাথ। কৌশলটা যে এত সহজে কাজ করবে তা প্রত্যাশিত ছিল না। আপাতত দুশ্চিন্তা কমল। সোনালি নিরাপদ।

গোপীনাথ চুপচাপ বসে ট্রে-র সমস্ত খাবারগুলো শান্তভাবে খেয়ে নিল। তার খিদে পেয়েছিল, কিন্তু এতক্ষণ টের পায়নি।

খেয়েদেয়ে ট্রে-টা রান্নাঘরে যখন রাখতে গেল গোপীনাথ তখন ডোরবেল বাজল। গোপীনাথ ধীরেসুস্থে গিয়ে দরজা খুলে দেখল, পুলিশ।

স্যার, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

আপনারা কি পুলিশের লোক? তা হলে আমারই আপনাদের কাছে যাওয়ার কথা।

কেন বলুন তো?

জাস্ট লুক অ্যাট মাই রুম।

পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন, মাই গড। ঘটনাটা তা হলে এ ফ্ল্যাটেই ঘটেছে?

দেখতেই তো পাচ্ছেন। ভাগ্যিস আমি ঘটনার সময় ফ্ল্যাটে ছিলাম না! কী কাণ্ড বলুন তো! এসব কি টেররিস্ট গ্রুপটুপের কাজ নাকি মশাই?

তা এখনই বলতে পারি না। লোকটা বিদেশি। তার কাছ থেকেও কিছু জানার উপায় নেই। কারণ লোকটা মারা গেছে। পকেটে কাগজপত্র বা পাসপোর্টও পাওয়া যায়নি। আপনি একবার নীচে গিয়ে লোকটাকে দেখবেন? হয়তো আপনি চিনতে পারেন। আপনাকেই যখন মারতে এসেছিল।

গোপীনাথ শান্ত গলায় বলল, তার দরকার নেই, নীচে ভিড় দেখে আমি স্পটে গিয়ে লোকটাকে দেখেছি। ওকে আমি চিনি না, চেনার কথাও নয়। ওপরে এসে দেখছি এই কাণ্ড।

দু'জন পুলিশ অফিসার ঘরে এসে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখল। জানালার কাছে গিয়ে উকিঝুঁকি দিল। তারপর সোফায় এসে বসে বলল, এবার আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিন দয়া করে।

আমার নাম গোপীনাথ বসু। সায়েন্টিস্ট এবং এনআরআই। রোমে থাকি। সাক্কি ইনকরপোরেটেড নামে কোম্পানিতে চাকরি করি। ডিভোর্সি। কয়েকদিন হল দেশে

এসেছি। আর কী জানতে চান বলুন!

আপনাকে খুন করে কার লাভ হতে পারে?

আমার জানা নেই।

আপনার কোনও শত্রু আছে? দেশে বা বিদেশে?

না মশাই, আমার খুব সাদামাটা লাইফ। ভেরি সিম্পল।

আপনার পাসপোর্টটা দেখাতে পারেন কি?

কেন পারব না? বলে গোপীনাথ উঠে গিয়ে পাসপোর্টটা নিয়ে এসে পুলিশ অফিসারের হাতে দিল। অফিসার সেটা খুঁটিয়ে দেখে সামনের সেন্টার টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, লোকটা বিদেশি বলেই বলছি, রোমে কিছু ঘটনা ঘটেনি তো!

না। কী ঘটনা ঘটবে?

এই ফ্ল্যাট কি আপনার নিজস্ব?

হ্যাঁ। কয়েক বছর আগে কিনেছিলাম।

এখানে কে থাকে?

আমি এলে থাকি। নইলে ফাঁকা তালাবন্ধ পড়ে থাকে।

কেউ থাকে না?

না।

ঠিক আছে। আগে লোকটার আইডেন্টিটি বের করি, তারপর আমরা আবার আসব।

ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

ইতিমধ্যে আপনি, আশা করি, কোথাও যাবেন না!

আমার ছুটি খুব বেশি দিনের নয়। আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করলে ভাল হয়।

চেষ্টা করব স্যার।

দ্বিতীয় পুলিশ অফিসারটি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, আপনি কি সাধারণত এই ঘরেই থাকেন বা কাজ করেন?

হ্যাঁ। কম্পিউটারের সামনে দিনের অনেকটা সময় কাটে আমার।

আমরা ভাবছি, খুনি খালি ঘরে গুলি চালাল কেন। সেটা তো লজিক্যাল নয়।

তা জানি না। এমনও হতে পারে লোকটা তলা ভুল করেছে। তাড়াহুড়ো ছিল বলে ভাল করে ঘরটা দেখেনি।

আমরা সব পসিবিলিটি নিয়েই ভাবব।

পুলিশ যাওয়ার পর গোপীনাথ দরজা বন্ধ করল এবং বেশ আরাম করে পা ছড়িয়ে সোফায় বসে টিভিটা চালু করল। টিভির দিকে অর্থহীন চেয়ে থেকে সে ভাবছিল। মনের ভিতর একটা কেমন ওলটপালট হচ্ছে সোনালিকে দেখার পর থেকে। সোনালি সুন্দরী। কিন্তু মেয়েদের সৌন্দর্য ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর নেই গোপীনাথের। বিদেশে সে সুন্দরী তো কম দেখেনি। আর সুন্দরী বলেই হঠাৎ তার এতকালের ঠান্ডা বুকে ঝড় উঠবে তাও নয়। কিন্তু যেটা তাকে সামান্য হলেও স্পর্শ করেছে তা হল সোনালির এই পাশে এসে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা। এবং এই সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে। গোপীনাথের জীবন শুকনো নিঃসঙ্গ। এই উষরতার মধ্যে একটা যেন একটু জীবনের ছোঁয়া, হঠাৎ যেন অন্য জগতের দরজা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

বোকা সোনালি গোপীনাথের কৌশলটা ধরতে পারেনি। রেগে চলে গেল, অর্থাৎ যা গোপীনাথ চেয়েছিল। এখন গোপীনাথ নিশ্চিন্ত। শত্রু বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে এখন আর তার দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কিছু নেই।

ডোরবেল বাজল আধঘণ্টা বাদে। গোপীনাথ বেড়ালের মতো চকিত পায়ে গিয়ে আই হোলে চোখ রাখল। সুব্রত।

দরজা খুলে বলল, আয়।

সুব্রত গম্ভীর মুখে বলল, সোনালিদিকে নাকি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

হ্যাঁ। একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল। ক্ল্যাশ অব ইগো। আগেও হত।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। সোনালিও আমাকে অপমান করেছে।

সুব্রত ঘরে ঢুকে বলল, চালাকি ছাড়ুন গোপীদা।

চালাকি! চালাকির কথা উঠছে কেন?

আপনি ইচ্ছে করে একটা ঝগড়া পাকিয়ে সোনালিদিকে এখান থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছেন।

ওরে পাগলা, তা নয়।

তাই গোপীদা, আমি জানি।

তা হলে বলি শোন, সোনালির কোনও বিপদ হোক তা আমি চাই না। এই বিপদের মধ্যে কিছুতেই ওকে রাখতে পারি না।

কিন্তু উনি চালাকিটা যে ধরে ফেলেছেন।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ।

সোনালি আড়াল থেকে দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াল। মুখ গম্ভীর।

৩১-৩৬. একটু বেশি রাত অবধি

একটু বেশি রাত অবধিই সুব্রত রয়ে গেল। ক্যাটারার খাবার দিয়ে গেলে তা ভাগ করে খেল তিনজনই। যাওয়ার সময় সুব্রত বলল, গোপীদা, আপনার কি কোনও অস্ত্রশস্ত্র চাই?

গোপীনাথ অবাক হয়ে বলে, অস্ত্র। অস্ত্র দিয়ে কী হবে?

আত্মরক্ষার্থে যদি লাগে।

দুর বোকা। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র লাগে না, বুদ্ধি লাগে।

তবু ভেবে দেখুন আমি একটা পিস্তল দিতে পারি।

কোথায় পাবি?

কলকাতায় পথেঘাটে পাওয়া যায়।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, স্বাভাবিক। অস্ত্র আজকাল সব দেশেই আকছার পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার চাই কি না বলুন।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, না। ইন ফ্যাক্ট একটা পিস্তল এ বাড়িতেই আছে। সেটার কথা আমার মনে ছিল না।

এ বাড়িতে?

হ্যাঁ। তবে সেটা আমার নয়। বোধহয় সুধাকর দত্ত ওটা রেখে গেছে ইচ্ছে করেই।

তা হলে তো হয়েই গেল।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, হল না। অস্ত্র হাতে পেলেই মানুষের একটা হননেচ্ছা জাগে। অস্ত্র জিনিসটার এদিকটার কথা কেউ ভাবে না।

তবু অস্ত্রটা হাতের কাছে রাখবেন। দরকার হলে ব্যবহারও করবেন।

আরও মানুষ মারতে বলছিস?

আরও মানে! আপনি তো এখনও একটাকেও মারেননি।

আজই মেরেছি।

না মারেননি। লোকটা পড়ে মারা গেছে। আপনি কিছুই করেননি।

একটা ধাক্কা দিয়েছিলাম।

ওটা ভুলে যান। ধাক্কা না দিলে ও আপনাকে চালুনির মতো শতছিদ্র করে দিত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপীনাথ বলল, তা দিত।

তা হলে। খামোখা সিমপ্যাথির অপচয় করবেন না।

গোপীনাথ চুপ করে রইল।

টেবিল পরিষ্কার করে সোনালি এসে সোফায় বসতেই হঠাৎ সুব্রত বলল, সোনালিদি, একটা কথা।

কী বলুন তো!

আমি কি আপনাকে বউদি বলে ডাকতে পারি?

সোনালি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, না।

সুব্রত হাসল, আচ্ছা, ডাকব না। বারবার মুখে বউদি ডাকটা এসে যায়। অতি কষ্টে সামলাই।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তোর মতো গবেট দুটো হয় না। সেই বাঙালির বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট আর সম্পর্ক মেনে চলিস এখনও। ওরে পাগলা, দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে।

গুড নাইট গোপীদা। গুড নাইট সোনালিদি।

সুব্রত চলে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে গোপীনাথ এসে সোনালির মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, কী একটা সিদ্ধান্ত নিলে বলো তো! আমার দুশ্চিন্তা বাড়ল বই কমল না।

সোনালি মৃদু কঠিন গলায় বলল, চুপ করো। আমাকে ভাবতে দাও।

কী ভাবছ?

অনেক কিছু। কিন্তু সাজাতে পারছি না। এলোমলো।

গোপীনাথ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সোনালিকে সমর্থন করে বলল, ওটাই কঠিন, কিন্তু সাজানোটাই আসল। না সাজালে চিন্তা শুধু উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। আই ক্যান হেলপ।

তোমাকে হেল্প করতে হবে না। শুয়ে ঘুমোও গে।

তুমি?

আমি রাত জাগব।

পাগল নাকি। তুমি জাগবে কেন? জাগব আমি। আমার মনটা আজ ভাল নেই। প্রাণ বাঁচাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে লোকটাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম। মরে যাবে ভাবিনি। এখন খারাপ লাগছে।

কেন খারাপ লাগবে? তুমি কোনও অন্যায় করোনি। এমনকী ওর মৃত্যুর জন্যও তুমি দায়ী নও। লোকটা মরেছে নিজের দোষে এবং ভুলে।

যাই বলল, আমার মন মানছে না। এ খেলাটা যতদিন চলবে ততদিন হয় মরো না-হয় মারো’ ব্যাপারটাই বহাল থাকবে মনে হচ্ছে। খেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া দরকার।

কীভাবে হবে?

আমি তো আর ওদের নিকেশ করতে পারব না। বোধহয় ওরাই মারবে আমাকে। সেটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাক।

সোনালি ভ্রুকুটি করে বলল, তাই নাকি? হাল ছেড়ে দিলে?

ছাড়িনি। হয়তো ছাড়তাম। কিন্তু তুমি এসে একটু হিসেবের গোলমাল করে দিয়েছ। ভাবতে হচ্ছে।

একটু বিষ মেশানো গলায় সোনালি বলল, আমি বুঝি তোমার গলগ্রহ? আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমার জন্যে চিন্তা না হয় আমিই করব।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, ওটা হল থিয়োরি। প্র্যাকটিক্যাল অন্যরকম। যে খেলাটা শুরু হয়েছে আমি সে খেলাটা একটু খেলেছি। কিন্তু তুমি আনাড়ি। তোমার খুব সাহস আছে। কিন্তু এ খেলায় সাহসের চেয়েও বেশি কিছুর দরকার হবে।

সেটা কী?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি।

আমি কি নির্বোধ বলে তোমার মনে হয়?

না, তুমি বুদ্ধিমতী। কিন্তু সেই বুদ্ধি অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বুদ্ধিটাকে এই বাঁচামরার লড়াইতে প্রয়োগ করার জন্য আবার খানিকটা এক্সারসাইজ দরকার। সময় নেবে। তাই বলি, প্রথম কয়েকটা দিন আমার পরামর্শ নাও। তাতে দু'জনেরই মঙ্গল।

কী করতে বলছ?

আজ বিশ্রাম নাও। প্রথম দিকেই যদি রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়ো তা হলে কাল আর মাথা কাজ করবে না।

আমি ঘুমোব আর তুমি জেগে থাকবে?

না, তাও নয়। আমি প্রথম রাতটা একটু চারদিকে চোখ রাখি। তোমাকে শেষরাতে ডেকে দেব। তখন তোমার পালা। তুমি টায়ার্ডও।

সোনালি বাস্তবিকই ক্লান্ত। একদিনে তার অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে। সে উঠল, ঠিক ডেকে দেবে?

দেব।

কোথায় ঘুমোব?

দুটো বেডরুম আছে। পাশেরটাতে শুয়ে থাকো।

বলেই চমকে উঠে গোপীনাথ বলল, না না, দাঁড়াও।

সোনালি অবাক হয়ে বলে, কী হল?

আমার বুদ্ধি মাঝে মাঝে ফেল করছে। এ বাড়ির দুটো দিকে রং করার জন্য ভারা বাঁধা হয়েছে। ওই বেডরুমটার গায়ে ভারা আছে। এদিকেরটায় নেই। তুমি আমার বেডরুমে শোও।

সোনালি একটা হাই তুলল। তারপর চলে গেল।

ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ রাতে আর ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে হল গোপীনাথের, সে উঠে ফ্ল্যাটের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিল। টর্চ হাতে জানালাগুলোর আশেপাশে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াল। কেউ কোথাও নেই। দারোয়ানদের ওপর কড়া পুলিশি হুকুম জারি হয়েছে, বাইরের উটকো লোককে চট করে ঢুকতে দেবে না। ঢুকলেও যে-ফ্ল্যাটে যেতে চাইবে দারোয়ান সঙ্গে করে সেই ফ্ল্যাটের লোকের সঙ্গে মোকাবেলা করে দেবে। সেদিক দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত। তবু গোপীনাথ জানে, নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ওই সামনের বাড়ির ছাত থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেলের পাল্লার মধ্যেই সে রয়েছে।

দিন দুই আগে সে গোটা চারেক ইংরেজি থ্রিলার কিনেছে। এসব সে কোনওকালে পড়ে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বুদ্ধিতে ধার দিতে এগুলো কিছু পড়া দরকার।

একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে সে বসে গেল পড়তে।

রাত সাড়ে বারোটায় টেলিফোন বেজে উঠতেই ধক করে উঠল তার বুক। এই অসময়ে কে চায় তাকে?

সে রিসিভার তুলে নিয়েও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল।

মৃদুস্বরে বলল, হ্যালো।

ভয় পেলেন নাকি?

চেনা গলা। গোপীনাথ হেসে বলল, অনেকদিন বাদে যে?

হ্যাঁ। একটু ঘুরপাক খেতে হচ্ছিল। কী খবর?

ভাল নয়।

জানি। আজ আপনার ওপর একটা অ্যাটেম্পট হয়েছে তো।

হ্যাঁ। জানলেন কী করে?

আমার দুটো অপদার্থ শাকরেদ আপনার ওপর এখনও নজর রাখছে।

হ্যাঁ তারা অপদার্থই বটে। বিপদের সময়ে কাজে লাগে না।

নজর রাখাটাই কাজ। আর রক্ষা করা? সেই নিরাপত্তা কে কাকে দিতে পারে বলুন। তবে ওরা দুরবিন দিয়ে পুরো ঘটনাই দেখেছে।

দেখেছে! কী আশ্চর্য!

পালা করে ওরা আপনার ফ্ল্যাটটা নজরে রাখে।

তারা থাকে কোথায়?

কাছাকাছি একাট হাইরাইজে। সেখানে একটা ফ্ল্যাট নেওয়া হয়েছে।

ও বাবা। বেশ কোমর বেঁধে নেমেছেন দেখছি।

আপনি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই লোকটাকে এলিমিনেট করেছেন শুনেছি। কংগ্রাচুলেশনস।

লোকটা কে?

তা জানি না। চেহারার বিবরণ থেকে বুঝতে পারছি ও ডিউক।

সে কে?

আপনি চিনবেন না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক।

পাজি।

ভয়ংকর। অসম্ভব সাহসীও। আপনি জোর বেঁচে গেছেন।

কিন্তু কতদিন?

যতদিন পারা যায়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

অ্যাডভারসারিদের যত দেখছি তত মনে হচ্ছে আমার চান্স কম।

কম হলেও আছে। হাফ চান্স থেকেও কি গোল হয় না?

গোপীনাথ হাসল, বেশ বলেন আপনি। স্ত্রী

কে সঙ্গে রেখে কিন্তু ভাল কাজ করেননি।

গোপীনাথ বিষণ্ন হয়ে বলে, জানি। কিন্তু শুনল না।

কেন? ইজ শি ইন লাভ উইথ ইউ ফর দি সেকেন্ড টাইম?

না। দেয়ার ওয়াজ নট ইভন এ ফাস্ট টাইম।

তা হলে?

কেউ ওকে বুঝিয়েছে আমার বিপদের দিনে ওর পাশে থাকা উচিত। সর্ট অফ আত্মত্যাগ।

কে বুঝিয়েছে? সুব্রত?

আপনি কি অন্তর্যামী নাকি মশাই?

সর্ট অফ। আজকাল সে-ই অন্তর্যামী যে ওয়েল ইনফর্মড। আমার নেটওয়ার্ক খুব ভাল।

তাই দেখছি। হ্যাঁ, কাণ্ডটা সুব্রতই করেছে।

শুনুন মশাই, আপনি একজনকে এলিমিনেট করেছেন মাত্র। বাট দেয়ার আর মোর পিপল আফটার ইউ।

অনুমান করছি।

ডোন্ট ডাই লাইক এ হিরো। র‍্যাদার ফাইট লাইক এ কাওয়ার্ড। বাট ডোন্ট ডাই।

বাঁচা-মরা কি আমার হাতে?

খানিকটা। এবং অনেকটা। আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন। আমার লোকেরা আজ সারারাত আপনার ফ্ল্যাটের বাইরেটা স্ক্যান করবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আপনাকে রিং করবে ফোনে।

আর দে রিলায়েবল?

মোর অর লেস।

বাড়ির ভিতরে যদি কেউ ঢুকে থাকে?

ইয়েস দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি। ইউজ দা গান ইফ নিড বি।

আমি জীবনে বন্দুক পিস্তল চালাইনি। ও পারব না।

সব কিছুই একদিন শুরু করতে হয়।

আমি পারব না।

তা হলে জেগে থাকুন। আপনার ওপরতলায় একজন ভদ্রলোক থাকেন। ইউ সেন। চেনেন?

না। কাউকেই চিনি না।

তার ফোন নম্বরটা দিচ্ছি, টুকে নিন।

কেন?

দরজায় কেউ নক করলে আগে তাকে ফোন করবেন।

একে কবে প্ল্যান্ট করলেন এখানে?

আজই।

এত তাড়াতাড়ি?

ফ্ল্যাটটা খালি ছিল। ইউ সেন করিতকর্মা লোক।

ফোন করলে তিনি কী করবেন?

করবেন কিছু। নম্বরটা নিন।

নিচ্ছি।

ফোন নম্বরটা টুকে নিয়ে গোপীনাথ বলল, ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের কিছু নেই। আপনি কারেজিয়াস ম্যান।

এটা কমপ্লিমেন্ট, না ঠাট্টা?

কোনটা মনে হয়?

ঠাট্টা।

শুনুন মশাই, আজ যা কাণ্ড ঘটেছে তাতে আপনার জায়গায় আমি থাকলেও ন্যাজ গুটিয়ে পালাতাম। অত্যধিক সাহস আছে বলেই আপনি এখনও পালাননি।

আমার পালানোর জায়গা নেই।

পালাতে চাইলে জায়গাও হয়ে যেত।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন না।

আপনি আমার শত্রু না বন্ধু?

সুধাকর হেসে উঠল। বলল, কী মনে হয়?

কখনও শত্রু, কখনও বন্ধু। ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

পারবেন। কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

আপনি ভিকিজ মব-এর একটা শাখার প্রধান, ঠিক তো?

ঠিক।

ভিকিজ মব যে মারাত্মক গুণ্ডার দল তা সবাই জানে।

জানারই কথা।

তা হলে তো আপনি ভাল লোক নন।

সুধাকর আবার হাসল, ভাল বলে দাবি করিনি তো।

আবার আপনি ইন্টারপোলের এজেন্ট বলেও শুনি। কোনটা ঠিক?

হয়তো দুটোই ঠিক। হয়তো দুটোই ভুয়ো। আমাকে নিয়ে ভাবছেন কেন?

আপনি এখন কোথা থেকে কথা বলছেন?

রোম থেকে।

রোম?

হ্যাঁ। রোম এবং আদ্রেঁর ফ্ল্যাট থেকে।

মাই গড! আরে ফ্ল্যাট থেকে?

হ্যাঁ। আদ্রেঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিটা খুঁজছি।

সর্বনাশ! সেটা যে আমার ভীষণ দরকার।

জানি। আদ্রেঁর পেপার্সে ডায়েরিটার রেফারে আছে।

সেটা পেয়েছেন?

এখনও নয়। ঝামেলা আছে।

কীসের ঝামেলা?

আদ্রেঁর ফ্ল্যাটে ঠিক এই মুহূর্তে দুটো লাশ পড়ে আছে। সদ্য খুন হওয়া, গা ভাল করে ঠান্ডা হয়নি।

বলেন কী?

এই নিয়ে আদ্রেঁর ফ্ল্যাটে গত দশ দিনে চারটে খুন হল।

কেন এসব হচ্ছে?

লোকে হয়তো ডায়েরিটাকে গুপ্তধনের মর্যাদা দিচ্ছে আর প্রাণ বাজি রেখে সেটা খুঁজতে আসছে।

খুনগুলো করছে কারা?

সিকিউরিটি এজেন্টরা। তারা অবশ্য খুন করছে বাধ্য হয়েই। নইলে তাদেরই খুন হতে হয়।

সিকিউরিটি এজেন্ট? সরকারি কি?

তাও বলতে পারেন।

তারা কি আপনার লোক?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুধাকর বলল, দুঃখের বিষয় তারা আমারই লোক। নিহতরা সকলেই মাফিয়া।

৩২.

সুধাকর দত্ত লোকটা অভদ্রও বটে। জরুরি কথার মাঝখানেই হঠাৎ বলে উঠল, মশাই, আর কথা নয়। দরজায় নক শুনতে পাচ্ছি। গুডবাই।

বলেই ফোনটা কট করে কেটে দিল।

গোপীনাথও ফোনটা রাখল। আদ্রেঁর ডায়েরি বিষয়ে তার আরও খানিকটা জানার ছিল। ঘটনার যা গতি ও প্রকৃতি তাতে ডায়েরিটা এখনই দরকার। সুধাকর যা বলছে তাতে মনে হয়, দুনিয়াসুদ্ধ লোক ডায়েরিটার কথা জানে এবং সবাই প্রাণ বাজি রেখে নেমে পড়েছে সেটা হাতিয়ে নিতে। ডায়েরিটা পাওয়া না গেলে আদ্রেঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করা বোধহয় কঠিন হবে।

ইউ সেন লোকটা কে তাও বুঝতে পারছে না গোপীনাথ। সে ফোনটা তুলে নম্বরটা ডায়াল করল। একবার রিং হতে না হতেই কে যেন ফোনটা তুলে নিল। একটা অত্যন্ত ভারী ও গম্ভীর গলা বলল, বলুন।

আপনি কি ইউ সেন?

হ্যাঁ।

পুরো নামটা কী?

উমাপদ সেন।

আমার বিপদ ঘটলে আপনাকে টেলিফোন করার হুকুম হয়েছে।

আপনার কি এখন কোনও বিপদ ঘটেছে?

না। আমি শুধু ব্যাপারটা যাচাই করছিলাম।

ও

আপনি কি সুধাকর দত্তর লোক?

তাও বলতে পারে।

কী করেন?

এই টুকটাক।

তার মানে, বলতে চান না?

লোকটা চুপ করে রইল।

গোপীনাথ বলল, আমার জানা দরকার আমি বিপদে পড়লে আমাকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট দক্ষতা আপনার আছে কি না।

উমাপদ বলল, গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। তবে যোগ্যতা বা দক্ষতার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমি প্রফেশনাল।

আপনার প্রফেশনটা কী সেটাই জানতে চাইছি।

ধরুন সিকিউরিটি গার্ড।

আপনি কি ব্ল্যাক ক্যাট বা কম্যান্ডো ট্রেনিং নিয়েছেন?

তার চেয়েও বেশি। ট্রেনিং নিয়ে ভাববেন না।

আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। যদি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসেন তা হলে উই মে হ্যাভ কফি টুগেদার। কথাও হবে।

সেটা খুব ওয়াইজ ডিসিশন হবে না মিস্টার বোস।

কেন?

কারণ ইউ আর আন্ডার অবজার্ভেশন। আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা গেলে দি ক্যাট উইল বি আউট অফ দি ব্যাগ। দেখা করার দরকার নেই। আমি আপনাকে চিনি।

কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না।

তার দরকার নেই। আমাকে চিনে গেলে আপনার বরং অসুবিধেই হবে।

সুধাকর দত্ত সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন?

কী জানতে চান?

লোকটা আসলে কে?

উনি নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন।

যা বলেছেন তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

বুঝবার দরকার নেই। উনি তো আপনাকে সাহায্যই করছেন।

তা করছেন। কিন্তু সেটা তো স্বার্থের খাতিরে শত্রুও করে।

শত্রুতা করার আগেই শত্রু বলে ধরে নিচ্ছেন কেন?

আমাকে তো উনি বিনা স্বার্থে রক্ষা করছেন না।

না। স্বার্থ তো থাকতেই পারে। স্বার্থ ছাড়া দুনিয়ায় কিছুই ঘটে না।

আপনি সুধাকর সম্পর্কে আরও একটু স্পেসিফিক হতে পারেন কি?

আমি সামান্যই জানি ওঁকে।

গোপীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না মশাই, আপনার সঙ্গে কথা বলা মানে একটা টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে কথা বলা। যা শেখানো হয়েছে তা ছাড়া আর কিছুই বলবেন না তো!

কথা কম না বললে এই পেশায় টিকে থাকা কঠিন।

আমার ভয় হচ্ছে আমাকে কেন্দ্র করে আরও কিছু খুনখারাপি হবে। আপনি কি জানেন যে, আজ আমার হাতেও…

জানি, জানি। আপনাকে বলতে হবে না। আপনি এখন রেস্ট নিন। গুড নাইট। আর শুনুন ফ্ল্যাটের সব বাতি নিভিয়ে রাখবেন প্লিজ।

এ লোকটাও অভদ্রের মতো কথার মাঝখানে ফোন কেটে দিল।

গোপীনাথ অন্ধকারে বসে তার ঘড়ি দেখল। জ্বলজ্বলে ডায়ালে রাত সাড়ে তিনটে বাজে।

টর্চ নিয়ে সে উঠল। শোয়ার ঘরের দরজা খোলা রেখেই সোনালি ঘুমিয়েছে। এরকমটা হওয়ার কথা নয়। আইনত এবং বিধিমতো তারা এখন সম্পর্কহীন দু'জন যুবক-যুবতী। সোনালির এ কাজটা উচিত হয়নি। আবার হয়তো অন্যদিক দিয়ে দরজা খোলা রাখার দরকার ছিল। বিপদ ঘটলে পরস্পরের কাছে দ্রুত পৌঁছোনোর সুবিধে। দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছুক হাতে টর্চটা বিছানায় ফেলল সে। কিন্তু বিছানায় সোনালি নেই।

অবাক হয়ে গোপীনাথ টর্চটা এধারে ওধারে ঘুরিয়ে ফেলে দেখল। বাথরুমের দরজা সামান্য ফাঁক এবং ভিতরে অন্ধকার।

অনুচ্চ কণ্ঠে গোপীনাথ ডাকল, সোনালি!

কোনও জবাব নেই।

গোপীনাথের বুকটা বিনা কারণেই ধক করে উঠল। কোথায় গেল সোনালি। সে ঘরটা আর একবার ভাল করে দেখে পাশের শোয়ার ঘরে যাওয়ার দরজাটা খুলে টর্চ ফোকাস করতেই সোনালিকে দেখতে পেল। একটা কালো চাপা প্যান্ট আর কালচে কামিজ পরা সোনালি জানালা দিয়ে একটু ঝুঁকে বাইরে কিছু দেখছে।

সোনালি, কী করছ?

সোনালি শরীরের উর্ধ্বাংশ ভিতরে নিয়ে এসে তার দিকে চেয়ে বলল, ঘুম আসেনি। চারদিকটা দেখছি।

গোপীনাথ উদ্বেগের গলায় বলল, ডু ইউ নো দ্যাট ইউ আর কমপ্লিটলি এক্সপোজড টু আউটার ডেনজারস?

কীভাবে?

আশেপাশে হাইরাইজের অভাব নেই। ইচ্ছে করলেই টেলিস্কোপিক রাইফেলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তোমাকে।

কিছু হবে না। অত চিন্তা কোরো না তো।

এ ঘরে এসো সোনালি। ঘুমোও।

আমার ঘুমের কোটা ফুরিয়েছে। এবার তুমি ঘুমোও।

আর তুমি?

আমি পাহারা দেব। গোপীনাথ হতাশায় মাথা নেড়ে বলে, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বড্ড হেডস্ট্রং তো তুমি। বলেছি না, ঠিকমতো না ঘুমোলে তুমি পাহারাটাও ঠিকমতো দিতে পারবে না। অসময়ে ঘুম পেয়ে যাবে। ক্লান্ত লাগবে, দুর্বল লাগবে।

ঘুম না এলে কী করব?

ইউ আর এ প্রবলেম। এমনিতেই আমার সমস্যার অভাব নেই। তার ওপর তুমি!

সোনালি বলল, ফোনে তুমি দু'জনের সঙ্গে কথা বলেছ। একটা কল এসেছিল রোম থেকে। আর একটা কল তুমি করেছ। লোকটা কে?

গোপীনাথ একটু অসন্তোষের গলায় বলল, আড়ি পেতেছিলে নাকি?

আড়ি পাততে হয়নি। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

ও

কফি খাবে?

খাব। কিন্তু তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

কষ্টের কী?

বাকি রাতটা কি জেগেই কাটাবে?

আজ রাতে আমার ঘুম আসবে না।

এরকম করলে কাল তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও। তোমার জন্য আমার বাড়তি টেনশন হচ্ছে।

আমি বাড়ি যাব না।

এটা আমার ওপর জুলুম করা হচ্ছে। লেট মি ফাইট মাই ওন ওয়ার।

তুমি তো একা লড়াই করছ না। তোমাকে অন্যের সাহায্য নিতে হচ্ছে। তা

হচ্ছে। কিন্তু তুমি তো সাহায্যকারী নও। বরং বাধা সৃষ্টি করছ।

বিপ্লবীর জুতো যদি কেউ সেলাই করে দেয় তা হলে সেও বিপ্লবে সাহায্যই করে।

তার মানে?

আই ক্যান হেলপ ইন স্মল ওয়েজ।

কীভাবে?

আই ক্যান মেক দি কফি।

মাই গড। ইউ আর ইমপসিবল।

সোনালি রঙ্গরসিকতার মেয়ে নয়। সে সিরিয়াস টাইপের। এরকম কথাবার্তা সে সহ্যও করতে পারে না। তবু এখন সয়ে নিল।

দশ মিনিট বাদে দু’কাপ কফি নিয়ে দুটো যুযুধান বেড়ালের মতো বাইরের ঘরে মুখোমুখি বসল তারা। ঘরে একটা ফুট লাইট জ্বলছে মাত্র। তার আলোর আভায় দু’জনে দু’জনকে আবছা দেখতে পাচ্ছে মাত্র।

গোপীনাথ হঠাৎ নরম গলায় বলল, গো হোম সোনালি। কাল সকালেই লিভ মি অ্যালোন।

যাব কি যাব না সেই সিদ্ধান্ত আমিই নেব। তোমার হুকুমে নয়।

ইউ আর নট বিয়িং অফ এনি হেলপ।

সেটা তোমার

সোনালি কথাটা শেষ করার আগেই ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার বিকট শব্দের সঙ্গে তীব্র শিস দেওয়ার শব্দ তুলে একটা বুলেট ঘরের ভিতর ছুটে এল।

চেয়ার সমেত উলটে পড়ল গোপীনাথ। কয়েক সেকেন্ডের বিহ্বলতা থেকে সে চকিত পায়ে উঠে দাঁড়াল।

সোনালি!

সোনালি জায়গায় নেই। কফির কাপটা রয়েছে শুধু।

গোপীনাথের বাঁ দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। না, সম্পূর্ণ বেঁচে যায়নি সে। বাঁ কাধ ফুঁড়ে বুলেটটা গেছে। সামনে থেকে পিছনের দিকে। সামান্য কৌণিক হেরফেরে তার গলার নলি ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারত।

আশ্চর্য এই, গোপীনাথের ভয় যেন আরও কমে গেল। মাথা যেন আরও শীতল হয়ে কম্পিউটারের মতো কাজ করতে লাগল। প্রথমেই সে ফুটলাইটটা নিভিয়ে দিল। বাঁ দিকের জামা ক্রমে ভিজে যাচ্ছে আরও। গোপীনাথ বাঁ হাতটা তুলল। তুলতে পারছে এখনও। হাড় ভাঙেনি। ক্ষত শুধু কাঁধের পেশিতেই বলে মনে হচ্ছে।

সোনালি।

অন্ধকারে সোনালি চকিত পায়ে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

কোথায় গিয়েছিলে?

জানালায়। ওই হলুদ বাড়িটার ছাদ থেকে গুলি চালিয়েছে।

দেখেছ?

হ্যাঁ। একটা লোক। তার হাতে রাইফেল। আবছা।

দেখেও জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলে?

বাড়িটা চিনে রাখার দরকার ছিল। এখন চুপ করো।

গোপীনাথ একটা শ্বাস ফেলল।

হঠাৎ সোনালি বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো।

নাথিং মাচ।

তার মানে? তোমার জামা…মাই গড! কী হয়েছে? গুলি লেগেছে নাকি?

চেঁচামেচি কোরো না। সামান্য চোট।

সামান্য। সামান্য। ইউ আর ব্লিডিং লাইক হেল। কোথায় লেগেছে?

কাঁধের চামড়া ঘষে চলে গেছে। সিরিয়াস নয়।

সোনালি দৌড়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে অ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধ আর ব্যান্ডেজ নিয়ে এল। বলল, ড্রেসিং করতে হলে বাতি জ্বালতেই হবে। আমি উন্ডটাও দেখতে চাই।

অবসন্ন গোপীনাথ জামাটা খুলে ফেলে সেটা দিয়েই ক্ষতস্থান চাপা দিয়ে বলল, যা খুশি করো। আজ রাতে আর হামলা হবে বলে মনে হয় না।

বাতি জ্বেলে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সোনালি তার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল। বলল, ডিপ হয়ে কেটেছে। ডাক্তার ডাকতেই হবে।

কাল সকালে দেখা যাবে।

চলো, শুয়ে থাকবে।

গোপীনাথ উঠতে যাচ্ছিল। ফোন বেজে উঠতেই ফোনটা ধরল।

ভারী গম্ভীর গলাটা বলল, সরি মিস্টার বোস। এই অ্যাটাকটার জন্য কিছু করার ছিল।

জানি। আমি কিছু মনে করিনি।

আমি কি আসব? আর ইউ ফিট?

গুলিটা কাঁধে লেগে বেরিয়ে গেছে। চিন্তা করবেন না, আমার স্ত্রী আমাকে অ্যাটেন্ড করছেন।

সরি মিস্টার বোস।

ডোন্ট বদার। এরকম তো হতেই পারে।

একটা কথা বলব?

বলুন।

ইউ আর অ্যান এক্সট্রিমলি কারেজিয়াস ম্যান।

গোপীনাথ একটু হাসল। বলল, মরিয়ার সাহস। ওটাও তেমন ইম্পর্ট্যান্ট কিছু নয়।

কাল সকাল আটটায় একজন ডাক্তার আপনাকে দেখতে আসবেন। ডা. বিনয় দাশগুপ্ত। খুব নামকরা ডাক্তার।

এত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ঠিক করে ফেললেন?

করাই ছিল। আপনার যে-কোনও ইভেনচুয়ালিটির জন্য। পেন কিলার বা কিছু লাগবে?

না। সহ্য করা যাবে।

বাই দেন।

বাই।

সোনালি তাকে দাঁড় করিয়ে বলল, আমার কাঁধে ভর দেবে?

দরকার নেই। সব ঠিক আছে।

অনেকটা রক্ত গেছে। তোমার দুর্বল লাগার কথা।

লাগছে না। আমার হয়তো বাড়তি রক্ত আছে।

তাকে শোয়ার ঘরে এনে শোয়াল সোনালি। জানালার পরদাগুলো ভাল করে টেনে দিয়ে বলল, কাঁচের জানলা খুব বাজে জিনিস।

হ্যাঁ। ফুটলাইট জ্বালানো আমার উচিত হয়নি। ওই আলোতে আমাদের দেখতে পেয়েছে।

এখন তুমি ঘুমোও দয়া করে।

আর তুমি?

আমাকে নিয়ে ভেবো না।

ভাবতে চাইছে কে? ভাবিয়ে তুলছ বলেই ভাবছি।

শোনো, আমি তোমার স্ত্রী নই।

নও-ই তো। হঠাৎ কথাটা উঠছে কেন?

ফোনে কাকে যেন বললে, আমার স্ত্রী আমাকে অ্যাটেন্ড করছেন। কেন বললে।

আত্মরক্ষার্থে বলা। ঘরে বয়সের একজন স্ত্রীলোক, তার একটা লজিক্যাল কারণ থাকবে ত।

সেইজন্যই বললে?

হ্যাঁ।

সত্যি কথাটাই বললে পারতে। ওরা বোধহয় সবই জানে।

তাও ঠিক।

এবার ঘুমোও। ঘুমের ওষুধ খাবে?

না। আমার ঘুম আসবে এমনিতেই। টেনশন নেই।

তুমি খুব ঠান্ডা রক্তের মানুষ।

কেন বলো তো?

গুলি খেলে, অথচ নির্বিকার।

মে বি আই অ্যাম ইকুয়ালি ডেনজারাস।

৩৩.

সুপ্রভাত রোজমারি।

জো। তোমার কী খবর? কই কারখানা দেখতে এলে না তো।

একটা ছোট্ট বাধা হয়েছে।

রোজমারি একটু নিশ্চিন্ত হল। জো তার দলবল নিয়ে কারখানা দেখতে আসুক এটা সে চাইছে না মনেপ্রাণে। সে একটা খাস মোচন করে বলল, তাই বলল। কীসের বাধা?

আমার একজন সঙ্গী মারা গেছে।

একটু অবাক হয়ে রোজমারি বলে, তাই বুঝি? কী করে মারা গেল?

খুব ভাল জানি না। তবে যতদূর মনে হচ্ছে তার হন্তা স্বয়ং গোপীনাথ বসু।

জীবনে এমন অবাক কমই হয়েছে রোজমারি। বলল, গোপীনাথ বসু খুন করেছে?

হ্যাঁ, তাও আবার একজন পেশাদার খুনিকে।

কীভাবে?

আমার কথা রেকর্ড করছ না তো!

না না! কী যে বলো।

তা হলে বলতে পারি। ডিউক একজন পেশাদার খুনি। হাই রেটিং। সে পৃথিবীর সব বড় বড় শহরে খুন করে এসেছে। এ ব্যাপারে তার প্রতিভা ছিল প্রবাদের মতো। তার ব্যর্থতার কথা শোনাই যায় না।

রোজমারি আর একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। গোপীনাথ অন্তত একটা খুনিকে সরিয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

তারপর বলো।

গোপীনাথের ডেরাটা আমরা খুঁজে বের করেছি। দেখলাম গোপীনাথ যেন বিপদকে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়ে বসে আছে। তার বাড়ির দু'দিকে রং করার জন্য বাঁশের সিঁড়ি তৈরি হয়েছে। ডিউক বলল, তার নিউ ইয়র্কে ফিরে যাওয়ার তাড়া আছে, গতকাল বিকেলের প্লেন ধরবে। তাই সে দুপুরেই কাজ হাসিল করবে বলে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। গুলিও চালিয়েছিল। আমরা দুরবিন দিয়ে দেখেছি। কিন্তু গোপীনাথ দৌড়ে এসে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

ব্যস?

হ্যাঁ, ব্যস। খুব সাদামাটা ব্যাপার না?

এত প্রতিভাবান খুনিকে এনেও হল না?

না, কিন্তু শোনো রোজমারি গোপীনাথকে মারতে আমরা শুধু আসিনি। আরও লোক এসেছে। কাল মধ্যরাতে তার ওপর আরও একটা অ্যাটাক হয়। এবার সে বেঁচে যায়নি।

সর্বনাশ! কী হয়েছে লোকটার? মারা গেছে?

না। লোকটার বেড়ালের প্রাণ। আহত বটে, তবে বেঁচে আছে।

সত্যি কথা বলো।

সত্যিই বলছি। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, রাতে গুলি খেয়েও লোকটা আজ ভোর পাঁচটায় কাছাকাছি একটা বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠেছিল?

কেন?

ওই বাড়ি থেকে তাকে গুলি করা হয়। টেলিস্কোপিক রাইফেলে। ছাদে সম্ভবত একটা বুলেটের খোল ছাড়া কিছু পায়নি সে।

জো, এটা কারা করেছে?

তা জানি না, আমরা বিদেশি। এদেশে এত তাড়াতাড়ি তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। আরও কথা আছে।

কী কথা জো?

গোপীনাথ বসুর সঙ্গে একজন মহিলা আছেন। খুব সুন্দরী। সে কে জানো?

না তো!

কে হতে পারে?

কী করে বলব?

আমরা জানতে চাই মহিলাটি কি ওর নিরাপত্তারক্ষী?

এসব আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন জো? আমি তো এখনও গোপীনাথের কলকাতার ঠিকানাটাও জানি না।

ঠিকানা জানলেও লাভ নেই। তুমি গোপীনাথকে বাঁচাতে পারবে না। সে এখন ঘোর বিপদে। কাল মধ্যরাতে যে বা যারা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তারাও

পেশাদার।

জো তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো।

তোমরা আর চেষ্টা কোরো না। গোপীনাথকে ছেড়ে দাও।

রোজামারি, মানুষ মেরে কি আমার আনন্দ হয় বলে তোমার ধারণা? তা নয়। আমরা যাদের হয়ে কাজ করি তাদের হুকুম তামিল করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই।

তুমি কি এতটাই খারাপ হয়ে গেছ জো?

কোনটা খারাপ, কোনটা ভাল, সেটাই তো এখন বিতর্কের বিষয়। পুরনো সব ধারণাকে নতুন করে নেড়েচেড়ে দেখা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সারভাইভ্যালের শর্ত পূরণ করতে গেলে আমাদের পুরনো ধারণা বর্জন করতেই হবে। এটা হল বৌদ্ধিক যুগ, বুদ্ধি যার যত বেশি সে তত ভাল ভাবে বাঁচে। নৈতিকতার কানাকড়ি দাম নেই।

বক্তৃতা দিয়ো না জো। তুমি যা বলছ তা তুমি নিজেও বিশ্বাস করো না।

আগে করতাম না। আজকাল আমার মগজধোলাই হয়ে গেছে। শোনো রোজমারি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম নেই। যে কাজের ভার আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা শেষ করতেই হবে। নইলে বিপদ।

তার মানে তুমি আবার চেষ্টা করবে?

এখনই নয়। কারণ ডিউকের আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের কর্মসূচি ওলটপালট হয়ে গেছে।

কীরকম?

পুলিশ ডিউককে ট্রেস করতে করতে আমাদের খুঁজে বের করবেই। তারপর আমরা পড়ে যাব সাংঘাতিক জটিলতায়। সুতরাং ডিউক মারা যাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিকেলেরই একটা ফ্লাইট ধরে কলকাতা থেকে পালিয়েছি।

কোথায় পালালে?

আপাতত আমস্টারডামে।

এত তাড়াতাড়ি?

এসব কাজে সময় একটা মস্ত বড় জিনিস।

রোজমারি গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলল, তুমি তা হলে কলকাতায় নেই।

না রোজমারি। খুনটা করার পরই আমাদের বিকেলের ফ্লাইট ধরার কথা ছিল। আমরা সেই ফ্লাইটটাই ধরেছি। তবে আমাকে আবার খুব শিগগিরই দেখতে পাবে কলকাতায়।

তুমি ফিরে আসবে!

আসতেই হবে। তবে অন্য নামে, অন্য পাসপোর্টে। সঙ্গে থাকবে আর একজন খুনি, যদি ততদিনে গোপীনাথ আর কারও হাতে খুন হয়ে যায়।

খুন হলে?

তাও আসব। তোমার কারখানার বিষয়ে আমাদের কৌতূহল তো শেষ হয়নি।

শোনো জো ক্লাইন, তোমাদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের কারখানাটা বিক্রিই করে দিতে হবে। অনেক খদ্দের ঘোরাঘুরি করছে। বেচে দিয়ে আমি আর মনোজ ফের জার্মানিতেই ফিরে যাব।

সেটা বোকার মতো কাজ হবে রোজমারি। তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালয় যে একদিন কোটি কোটি ডলার রোজগার করবে এটা তোমার জানা উচিত।

আমার টাকার দরকার নেই। দরকার শান্তিতে বেঁচে থাকার।

তাই কি রোজমারি? তুমি কি শান্তি সত্যিই ভালবাসো?

রোজমারি একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি নিশ্চয়ই আমার অতীত নিয়ে ফের কথা শুরু করবে না।

না। তবে রোজমারি সম্পর্কে আমার একটা পরিষ্কার ধারণা আর হিসেবনিকেশ আছে। সেটা ভুলে যেয়ো না।

কী চাও জো?

চাই, অদূর ভবিষ্যতে আমি গেলে আমাকে সাহায্য কোরো।

তুমি কবে আসবে?

হয়তো পরশু বা তার পরের দিন।

এত তাড়াতাড়ি?

এ কাজে দেরি করা সম্ভব নয়।

ফোন রেখে দিল জো। রোজমারি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ ফের ফোনটা তুলে নিল।

মনোজ।

বলো

সোনালি কি আজ অফিসে এসেছে?

না। কেন বলো তো!

কোনও খবর দিয়েছে?

হ্যাঁ, ফোন করে জানিয়েছে কী যেন জরুরি কাজ, আসতে পারবে না।

তোমার ঘরে কেউ আছে?

হ্যাঁ।

আধঘণ্টা পর আমি যাচ্ছি তোমার ঘরে। ফ্রি থেকো।

ঠিক আছে।

আধঘণ্টা চুপচাপ বসে রইল রোজমারি। ভাবল আর ভাবল। তারপর উঠে ধীর পায়ে করিডর পেরিয়ে লন এবং লন পেরিয়ে মেন বিল্ডিং-এ ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল। সরাসরি মনোজের ঘরে না গিয়ে সে গিয়ে ঢুকল সোনালির ঘরে।

সাজানো ছোট্ট অফিসঘর। কম্পিউটার থেকে শুরু করে সব কিছুই খুব পরিচ্ছন্ন হাতে গুছিয়ে রাখা। রোজমারি সোনালির টেবিলটা একটু ঘটল।

সোনালির চেয়ারে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রোজমারি। বাঙালিরা খুব রোম্যান্টিক জাত। এরা সহজে সম্পর্ক কেটে ফেলতে পারে না। মূল্যবোধ বা আবেগ একটু বেশিই বোধহয়। সোনালি না হলে কেনই বা গোপীনাথকে সঙ্গ দিচ্ছে? জো ক্লাইন গোপীনাথের যে সুন্দরী সঙ্গিনীর কথা বলেছিল তা যে সোনালি ছাড়া কেউ নয়, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা তার খারাপ লাগছে না। এরকমও হয় তা হলে। রোজমারি আপন মনেই। একটু হাসল।

তারপর উঠে পাশের দরজা দিয়ে মনোজের ঘরে ঢুকল সে।

মনোজ তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বলল, কী ব্যাপার?

গোপীনাথের ওপর কাল দু-দু’বার হামলা হয়েছে। দু’বারই রাইফেল চালানো হয় তার ঘরে। সে চোট পেয়েছে।

মনোজ অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলে?

জানলাম। সূত্র বলা যাবে না।

মাথা নেড়ে মনোজ বলল, গোপীনাথ ইজ এ লস্ট কেস।

হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? গোপীনাথ ইজ এ গুড সারভাইভার।

মনোজ মাথা নেড়ে বলে, ওটা কোনও ভরসার কথা নয়।

শোনো, আমার খবর আছে, সোনালি এখন গোপীনাথের কাছে রয়েছে।

বটে! বলে মনোজ খুব বিস্ময় প্রকাশ করল।

গোপীনাথকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

কীভাবে?

তুমি ওর ঠিকানাটা সুব্রতর কাছ থেকে আদায় করো। তারপর চলল, তার সঙ্গে কথা বলি। সবাই মিলে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

কিন্তু তার আগে প্রশ্ন, গোপীনাথ পুলিশের সাহায্য নিচ্ছে না কেন?

বুদ্ধিমান বলেই নিচ্ছে না। পুলিশ তার প্রোটেকশনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারবে বলে তোমার মনে হয়? তুমি সুব্রতকে ডাকো।

মনোজ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে ফোন তুলে সুব্রতকে ডাকল।

সুব্রতর এসে হাজির হতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

বলুন স্যার।

সুব্রত, বিনা ভূমিকায় বলছি, তুমি কি গোপীনাথের ওপর লেটেস্ট হামলার কথা জানো?

সুব্রত গম্ভীর হয়ে বলল, জানি। কাল দুপুরে এবং মধ্যরাতে দু'বার অ্যাটাক হয়েছে।

গোপীনাথ ইজ এ স্টাবোর্ন পার্সন। আমরা তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

সুব্রত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ইট ডিপেন্ডস অন হিম। উনি চাইলেই সেটা সম্ভব।

মনোজ ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, টক টু হিম, প্লিজ!

রোজমারি বাধা দিয়ে বলল, না, আমাদের সামনে নয়। আপনি বরং সোনালির ঘরে যান। ওখান থেকে ফোনটা করুন।

সুব্রত গেল। দু'মিনিট বাদে ফিরে এসে বলল, ইটস ও কে স্যার। এখন তিনটে বাজে। আমাদের চারটের মধ্যে পৌঁছুতে হবে।

.

গোপীনাথের ফ্ল্যাটের সব জানালায় মোটা পরদা টানা। ঘরগুলো প্রায় অন্ধকার। ব্যবস্থাটা করেছে সোনালি। পরদাগুলো ছিল একটা ডিভানের খোলের মধ্যে। সেগুলো বের করে পেলমেটের রডে ভরে এত বড় ফ্ল্যাটে সব কটা জানালা ঢাকা দিতে প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। তার। শুধু তাই নয়, অবাধ্য ও চঞ্চলমতি গোপীনাথকে সামলাতেও হিমশিম খেয়েছে সে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই গোপীনাথ চুপিসারে বেরিয়ে যায়। সোনালি সাড়ে ছ'টায় উঠে তাকে খুঁজে না পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে দারোয়ানের কাছে গিয়ে খোঁজ নেয়। তারা জানায় গোপীনাথ ভোর পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে গেছে। সোনালির তখন রাগে হাত-পা নিশপিশ করছিল লোকটার আক্কেল দেখে। যখন চারদিক থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল আর খুনির চোখ ওকে তাক করছে তখন পাগলটা এমন ন্যালাখ্যাপার মতো বেরিয়ে যায় কোন সাহসে?

যাই হোক, দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে সাড়ে সাতটা নাগাদ গোপীনাথ ফিরল। হাতে বাজারের থলি।

সোনালি রাগে ফেটে পড়ল, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

শান্ত গলায় গোপীনাথ বলল, ক্যাটারারের রান্না বড্ড একঘেয়ে লাগছে। বড্ড রিচও। ভাবছি আজ থেকে আমরা রান্না করে খাব।

চোখ কপালে তুলে সোনালি বলল, সেইজন্য তুমি বাজারে গিয়েছিলে? কেন, বাজার তো আমিও করতে পারতাম।

গোপীনাথ তখন পকেট থেকে একটা কার্তুজের খোল বের করে হাতের তেলোয় মেলে ধরল সোনালির চোখের সামনে। বলল, এটার জন্যও।

কী ওটা?

কার্তুজের খোল। ওই হলুদ বাড়িটার ছাদে পেলাম।

সোনালি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর বলল, তুমি একা গিয়ে ওবাড়ির ছাদে উঠেছিলে?

গোপীনাথ হেসে বলল, ইজি। ওটা একটা থার্ড গ্রেড ভাড়াটে বাড়ি। উঠে গেলাম, কেউ বাধা দিল না।

ধন্যি তোমাকে।

ঘণ্টাখানেক তাদের কথা বন্ধ ছিল। কথা চালু হল, বেলা ন'টায় দু'কাপ গরম কফি সহযোগে। খুব সতর্কতার সঙ্গে।

ব্যথাটা কেমন আছে?

নেই তেমন।

ডাক্তার আসবে। তৈরি থেকো।

হ্যাঁ। আমি আজ রান্না করব।

বাঃ। খুব আহ্লাদ দেখছি।

কিছু করতে ইচ্ছে করছে।

করার অনেক কিছু আছে।

কী করব বলল তো।

সোনালি হাই তুলে বলল, ঘুমোও।

ঘুমোব। এখন ঘুমোব কেন?

তোমার বিশ্রাম দরকার। অনেক ধকল গেছে।

দুর। এসব ঘটনা আমি গায়ে মাখছি না।

যখন ডোরবেল বাজল, অর্থাৎ আরও আধঘণ্টা পর, তখন দরজাটা খুলতে একটু দেরি হল তাদের। কারণ ঘনবদ্ধ আলিঙ্গন ও চুম্বন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না কিছুতেই।

৩৪.

ডোরবেল বেজেই যাচ্ছিল। কিন্তু তারা তবু কেউ উঠল না।

সোনালি গোপীনাথের কপাল থেকে কয়েক গুছি চুল হাত দিয়ে সরিয়ে বলল, ডোরবেল বাজছে, কানে যাচ্ছে না বুঝি?

বাজুক।

সোনালি হাসল, যদি জরুরি দরকারে কেউ এসে থাকে?

ফিরে যাক।

কাছাকাছি, বড্ড কাছাকাছি তাদের মুখ, পরস্পরের শ্বাস মিশে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে।

গোপীনাথ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বলতে গেলে এটাই আমাদের প্রথম প্রেম। তাই না?

তোমার প্রথম, কিন্তু আমার নয়। আমি সেই কবেই তোমাকে ভালবেসে মরেছিলাম। বিয়ের রাতে।

একটু লজ্জা পেয়ে গোপীনাথ বলল, আমি তখন বাডিং সায়েন্টিস্ট। মাথায় যে কত দুশ্চিন্তা। বিয়েটাকে তখন মনে হয়েছিল একটা বাড়তি দায়িত্ব। তোমার মনে আছে বিয়ের পর বউভাতের রাতেই আমাকে জেনেভার প্লেন ধরতে হয়েছিল?

থাকবে না? যা রাগ হয়েছিল।

তখন ওরকমই ছিল আমার জীবন এবং মনোভাবও। হাইলি কম্পিটিটিভ দুনিয়া আর সেই সঙ্গে আমার জেদ। কিন্তু এখন আমি অন্যরকম লোক, না?

মনে তো হচ্ছে।

ডোরবেল থেমে গেছে। দু'জনে দু'জনের দিকে পলকহীন চেয়ে বসে রইল। দুনিয়া মুছে গেছে। বিপদ-আপদ, জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নও থেমে আছে একটু দূরে।

এবার ডোরবেল নয়, টেলিফোন বাজল। টেলিফোনটাকেও উপেক্ষা করল তারা। সোনালির ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে গোপীনাথ বলল, কারা এমন বেরসিক বলো তো!

সোনালি অলস বিহ্বল গলায় বলল, ওরা কাজের লোক।

আমাদের কি আজ আর কিছু করা উচিত?

সোনালি হাসল। তারপর গোপীনাথের দু'খানা হাতের বন্ধন থেকে নিজেকে নরমভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। দাঁড়াও, দেখি কার এত জরুরি দরকার।

টেলিফোন কানে তুলতেই একটা মোলায়েম গলা বলল, এনজয়িং দি লাইফ?

সামান্য হাসিরও শব্দ হল। গা জ্বলে গেল সোনালির। বলল, কে বলুন তো আপনি!

একবার পরিচয় হয়েছিল। আমার নাম সুধাকর দত্ত।

সোনালি একটু থমকে গিয়েছিল। বলল, ও। কী ব্যাপার?

কেমন আছেন বলুন।

ভালই।

আপনি বেশ বুদ্ধিমতী। ঘরের জানালাগুলো মোটা পরদায় ঢেকে দিয়ে ভাল কাজ করেছেন। গোপীনাথবাবু এতটা কেয়ারফুল নন।

উনি তো ভাবনাচিন্তা বেশি করেন।

আপনাদের কি তা হলে ভাব হয়ে গেল? কংগ্রাচুলেশনস।

ধন্যবাদ।

গোপীনাথবাবুকে বলবেন, ডায়েরিটা উদ্ধার করা গেছে।

আপনি ওঁর সঙ্গেই কথা বলুন না।

দিন তা হলে, ইফ হি ইজ নট টেরিবলি বিজি ওয়াইপিং লিপস্টিক ফ্রম হিজ লিপস।

একটু রাঙা হয়ে সোনালি বলল, আমি লিপস্টিক মাখি না। আপনি খুব অসভ্য লোক।

বলেই টেলিফোনটা গোপীনাথের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিয়ে সোনালি চাপা গলায় বলল, কী সব বলছে, এ মা।

গোপীনাথ একটু হাসল। বলল, আমার বউকে লজ্জায় ফেলছেন কেন?

হঠাৎ ও পাশে সুধাকরের গলাটা একটু বিষণ্ণ শোনাল, লজ্জাটা যে এখনও দুনিয়ার আনাচেকানাচে একটু আধটু রয়ে গেছে সেটা ভাবলে বড্ড খুশি হই, বুঝলেন? এই বেহায়া নির্লজ্জ পৃথিবী যত বে-আবরু হচ্ছে তত আমাদের মতো বুড়ো মানুষরা মুষড়ে পড়ছি।

আপনি আবার বুড়ো হলেন কবে?

হচ্ছি মশাই, হচ্ছি। অভিজ্ঞতারও তো একটা বয়স আছে।

বুঝেছি। আপনি এঁচোড়ে পাকছেন।

যা বলেছেন। কিলিয়েই কাঁঠাল পাকানো হচ্ছে। এনিওয়ে, ডায়েরিটা উদ্ধার হয়েছে।

আঃ বাঁচা গেল। কোথায় পাওয়া গেল?

লম্বা ইতিহাস। অত শুনে কাজ নেই। শুধু বলে রাখি, সাতটা খুন এবং গোটা দুই জখমের পর ডায়েরিটা উদ্ধার হয়েছে একটা ব্যাঙ্কের লকার থেকে। সেটাও সহজে হয়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে হয়েছে।

জিনিসটা কবে পাব?

পাবেন কী করে? আধঘণ্টা ধরে ডোরবেল বাজিয়ে এসেছি একটু আগে। অন্য লোক হলে ধরে নিত আপনারা ঘরে নেই। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, আপনারা দুটি বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা হয়তো বহুদিন পর পুনর্মিলিত হওয়ায়

একটা গলা খাঁকারি দিয়ে থামল সুধাকর।

গোপীনাথ একটু হেসে বলল, মোটেই তা নয় দাতাসাহেব। আসলে আপনার চরেরাই আপনাকে জানিয়েছে যে, আমরা ঘরেই আছি।

কীভাবে জানবে? ঘরে যে মোটা পরদা ফেলা।

আপনার অসাধ্য কিছুই নেই। হয়তো কোনও খুদে মাইক্রোফোন কোথাও সেঁটে রেখে গেছেন। দেখতে না পেলেও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

আপনি বুদ্ধিমান।

সে তো বটেই। কোথা থেকে কথা বলছেন?

সেন সাহেবের ঘর থেকে।

এঃ, তা হলে তো আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ডায়ালগ সবই শুনতে পেয়েছেন। ক্লি

য়ার অ্যান্ড লাউড।

প্রাইভেসি বলে আর কিছু রাখলেন না। আমার স্ত্রী লজ্জায় পড়বেন।

আমি আপনাদের শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। ইউ আর এ গুড কাপল। আপনাদের রিকনসিলিয়েশনটা দারুণ লেগেছে।

গোপীনাথ একটু দেখে নিল সোনালি কোথায় আছে। সোনালি এখন রান্নাঘরে, হয়তো চা করছে। সে গলাটা একটু নামিয়ে বলল, রিকনসিলিয়েশনটা ভাল হল কি না কে বলবে দাতাসাহেব? বহু বছর পর আমরা মিলেমিশে গেলাম বটে, কিন্তু তার দায়িত্ব কতটা? যেভাবে ঘাতকরা উঠেপড়ে লেগেছে তাতে যে-কোনওদিন আমি শেষ হয়ে যেতে পারি। যদি তাই হয়, তা হলে এই মিলনটা সোনালির কাছে

দুঃসহ হয়ে থাকবে। হৃদয়বৃত্তির প্রশংসা করছিলেন, কিন্তু এই নির্দয় পৃথিবীতে হৃদয়বৃত্তি একটা বাড়তি অসুবিধে ছাড়া তো কিছুই নয়।

ইউ আর রাইট। তবে একটা কথা আছে।

কী কথা?

জীবন অতীব ক্ষণস্থায়ী। কে কবে কীভাবে মারা যাবে তার ঠিক নেই। এই ক্ষণস্থায়ী আয়ুষ্কালের মধ্যে যদি সামান্য কয়েকটি মুহূর্তও আপনি জীবনের কাছে পেয়ে থাকেন, তাই বা কম কী? আমাদের জীবনে কয়েকটাই মাত্র গোল্ডেন মোমেন্টস আসে, বাদবাকি জীবনটা কাটে তার স্মৃতি রোমন্থন করে। তাই না?

তা বটে।

আচ্ছা, আজ অপরাহ্নে আমরা এত হাইলি ফিলজফিক্যাল হয়ে উঠলাম কেন বলুন তো!

তাই দেখছি।

ওটাই হল বয়সের দোষ। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

আপনি কি ত্রিশ পেরিয়েছেন?

আমি চল্লিশের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে আমাকে একটু ছোকরা ছোকরা লাগে বটে, কিন্তু আই অ্যাম কোয়াইট ওল্ড।

ইউ আর নট এ গুড লায়ার।

আচ্ছা মশাই, নিতান্ত দরাদরিই যদি করতে চান, তা হলে না হয় আরও পাঁচ বছর হেঁটে দিচ্ছি। মে বি আই অ্যাম থার্টি ফাইভ।

বত্রিশের বেশি এক দিনও নয়।

সুধাকর একটু হাসল। তারপর বলল, ও কে দেন। লেট ইট বি থার্টি টু। বাট স্টিল আই অ্যাম ওল্ড।

গোপীনাথ স্মিত একটু হেসে বলল, আমার স্ত্রী সম্ভবত চা করছেন। উড ইউ লাইক টু জয়েন দি টি পার্টি?

নেমন্তন্নের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু উপায় নেই। আপনার সঙ্গে আমাকে যত না দেখা যায় ততই ভাল।

কিন্তু ডায়েরিটা। সেটা কবে পাব?

ডায়েরিটা ফটোকপি করা হচ্ছে।

ও। আমার জানার ছিল, ওতে সত্যিই কোনও ভাইটাল ক্লু আছে কি না।

আমি সায়েন্টিস্ট হলে বলতে পারতাম। তবে অনেক হিজিবিজি আছে, আপনি হয়তো বুঝবেন। আমি লাইনটা কেটে দিচ্ছি। কারণ আপনার ফ্ল্যাটে এখনই অতিথি সমাগম হবে।

পুলিশ নাকি? আজ সকালে তো তারা এসে ঘরময় সার্চ করেছে। ফটোও তুলেছে। জেরায় জেরায় জেরবার করেছে আমাদের। বলে গেছে আবার আসবে।

পুলিশের তো আসারই কথা। তবে এখন পুলিশ নয়, আসছেন রোজমারি আর মনোজ। সঙ্গে সুব্রত। একটা কথা বলে রাখি।

কী কথা?

দে আর বিয়িং শ্যাডোড। কেউ ওঁদের এখানে অনুসরণ করছে।

কে ওদের পিছনে আছে?

সুধাকর উদাস গলায় বলল, কেউ হবে। তবে রোজমারি সম্পর্কে আপনি একটু সাবধান থাকবেন।

কী ধরনের সাবধান?

ভদ্রমহিলা নিজে ততটা খারাপ নন। কিন্তু শি কিপস এ ব্যাড কম্প্যানি। এ ভিকটিম অফ সারকামস্ট্যান্সেস। হয়তো ব্ল্যাকমেলেরও শিকার।

আপনি এত জানলেন কী করে?

আই কিপ এ ট্যাগ অন হার।

আমি ওঁদের কী বলব? ওঁরা হয়তো একটা চাকরি অফার করবেন।

তাও জানি।

চাকরিটা আমি নেব বলে ঠিক করেছি।

কেন নেবেন? ওঁ

দের ল্যাবটা আমার কাজে লাগবে।

ল্যাবটা হয়তো আপনার উপযুক্ত হবে না।

তা হলে?

স্কিপ দি অফার।

তা হলে কাজ এগোবে কী করে?

অন্য উপায় আছে। আপনি কখনও লুলু বলে কারও নাম শুনেছেন?

গোপীনাথ একটু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ।

নামটা মনে রাখবেন।

কেন বলুন তো!

দরকার আছে। কিন্তু আর নয়। দে আর অলমোস্ট অ্যাট ইয়োর ডোর।

সুধাকর ফোনটা কেটে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডোরবেল বেজে উঠল। চায়ের ট্রে নিয়ে রান্নাঘর থেকে আসছিল সোনালি। বলল, দাঁড়াও, আমি খুলব। কে না কে, কে জানে বাবা। হঠাৎ তুমি সামনে যেয়ো না।

গোপীনাথ সোনালির ভয় দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, খুব বীরাঙ্গনা হয়েছ বুঝি। ভয় নেই, রোজমারি আর মনোজ। তোমার বস।

আমার বস কেউ নেই। চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

অবাক গোপীনাথ বলল, কবে ছাড়লে?

মনে মনে ছেড়েছি। কনসার্নটা আমার ভাল লাগছে না। ওরা তোমাকে কাজে লাগাতে চায়।

গোপীনাথ মৃদু হেসে বলে, তা হলে এখন তুমি বেকার?

তা আর হলাম কই? একজনের দেখভাল তো করতে হচ্ছে। আপাতত এটাই চাকরি। গোপীনাথ গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সামনেই সুব্রত। মুখে হাসি, গোপীদা, মনোজবাবু আর রোজমারি এসেছেন দেখা করতে।

পরিচয় আর কুশল বিনিময় করতে করতেই গোপীনাথ দু'জনকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। মনোজ, যে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নয় তা তার মুখের নার্ভাস হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। রোজমারি গড়পরতা জার্মান মেয়েদের মতোই মজবুত গড়নের। মোটামুটি দেখতে ভালই। কিন্তু একটু চাপা উদ্বেগে ভুগছে।

রোজমারি সোনালির হাত ধরে পরিষ্কার বাংলায় বলল, পুনর্মিলন সুখের হোক। আমি ভাবতেই পারিনি কখনও যে, এরকমও হয়। আমি বাঙালি বা ভারতীয় হয়ে জন্মালে বেশ হত।

সোনালি লজ্জায় রাঙা হল।

রোজমারি জার্মান মেয়ে। ভ্যানতারা জানে না। সোজাসুজি গোপীনাথের দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি আমাদের অফারটা নিচ্ছেন মিস্টার বোস?

গোপীনাথ মৃদু হেসে বলল, আপনি আমার ঘরখানা ভাল করে লক্ষ করেছেন কি?

না তো! কেন?

ভাল করে দেখুন। মেঝের চলটা উঠে গেছে, দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে চাপড়া। কেন জানেন? এ ঘরে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে ঝাকে ঝাকে গুলি চালানো

হয়েছে আমাকে মারার জন্য।

রোজমারি সবই দেখল। তারপর বলল, ঈশ্বর! আপনি কি তখন ঘরে ছিলেন?

গোপীনাথ অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল, না ম্যাডাম। থাকলে এতক্ষণে আমি মর্গে শুয়ে আছি।

খুব বেঁচে গেছেন আপনি।

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, বাঁচিনি। এর পরেও আমার ওপর অ্যাটাক হয়েছে। বাঁ কাধটা জখম। বুঝেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু

শুনুন ম্যাডাম, আমার জীবন এতই অনিশ্চিত যে, আমার কাছাকাছি কারও থাকা উচিত নয়। এই মুহূর্তেই যদি বাইরে থেকে কেউ গুলি চালায়, তা হলে আমাদের যে কারও বিপদ হতে পারে।

মনোজের মুখটা একটু ফ্যাকাশে দেখাল। সে বলল, তা হলে তো

গোপীনাথ বলল, আই অ্যাম লিভিং ডেনজারাসলি। শুধু সেই কারণেই আপনাদের লোভনীয় অফার নিতে পারছি না। নিলে আপনাদেরও বিপদ।

রোজমারি বলল, কিন্তু আমরা যদি আপনাকে অন্য কোথাও রাখি, কোনও নিরাপদ জায়গায়?

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, নিরাপদ জায়গা বলতে কিছু নেই। এমনকী আপনারা যে এসেছেন, আপনাদের পিছু পিছুও কেউ এসেছে।

রোজমারি অবাক হয়ে বলে, সে কী কথা! আমাদের পিছু কেউ নেয়নি তো।

মনোজ বলে উঠল, অসম্ভব।

কিন্তু সুব্রত হঠাৎ বলল, অসম্ভব না-ও হতে পারে।

মনোজ বলল, কেন বলো তো! তুমি কাউকে দেখেছ?

মনে হচ্ছে, আমরা যখন অফিস থেকে রওনা হই, তখন একটা নীল মারুতি আমাদের পিছনে ছিল।

কী করে বুঝলে?

ওভারহেড মিররে দেখেছি। তখন কিছু মনে হয়নি। নীল মারুতিটাকে নামবার সময়েও দেখেছি যেন। একটু দূরে থেমে গেল।

মনোজ বলল, লেট আস চেক। চলো।

চলুন। বলে সুব্রত আর মনোজ বেরিয়ে গেল।

রোজমারি একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে কি না তা আপনি কী করে জানলেন?

ইনটুইশন।

ইনটুইশন। শুধু ইনটুইশন?

গোপীনাথ হাসল, না। শুধু ইনটুইশন নয়। ইনফর্মারও।

•

নীল মারুতির অভাব নেই কলকাতায়। বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে মনোজ আর সুব্রত একটু হাঁটতেই একটা নীল মারুতি দেখতে পেল। লক্ষ করল, ভিতরে কেউ নেই।

এটাই কি সুব্রত?

আমি শিয়োর নই। নম্বর প্লেটটা তো দেখে রাখিনি।

তা হলে?

সুব্রত গাড়ির বনেটে হাত রেখে তাপ অনুভব করে ঘাড় নেড়ে বলল, এটা নয় স্যার।

কী করে জানলে?

এটা হলে বনেট গরম থাকত। এটার বনেট ঠান্ডা, তার মানে অনেকক্ষণ পার্ক করা আছে।

কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট ডিডাকশন। চলো, আর একটু এগিয়ে দেখি।

তারা আরও একটু এগোতেই একটা মোড়। ডানধারে আর একটা সরু রাস্তা। সুব্রত থমকে বলল, স্যার!

হ্যাঁ, বলো।

ওই যে।

ডানধারে একটু ভিতরে একটা নীল মারুতি পার্ক করা।

এটাই যে তা কী করে বুঝলে?

বনেটের ওপর বড় করে একটা দুই লেখা আছে, চারধারে একটা সার্কল। সম্ভবত কোনও মোটর র‍্যালিতে পার্টিসিপেট করেছিল। মনে হচ্ছে ওভারহেড মিররে এটা দেখেছি, কিন্তু মনে পড়ছিল না।

গুড, চলো, লেট আস চেক।

ড্রাইভার তার সিটে বসে আছে, দেখতে পাচ্ছেন? বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

মনোজ ভ্রু কুঁচকে বলল, লেট আস টক টু হিম।

কী বলবেন?

জিজ্ঞেস করব কার গাড়ি, এখানে কী করছে।

সুব্রত হাসল, এসব প্রশ্ন করার অধিকার কি আমাদের আছে? হি মে রি-অ্যাক্ট।

মনোজ হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, তাই তো। তা হলে কী করা যাবে।

লাইসেন্স নম্বরটা মুখস্থ করে নিয়েছি। গাড়িটা কার তা হয়তো ট্রেস করা যাবে।

কীভাবে?

আমার এক আত্মীয় পুলিশে কাজ করেন। বিগ শট।

তা হলে কি আমরা ফিরে যাব?

না স্যার। ড্রাইভারকে একটু ক্রস করা যাক। জবাব না দিলেও ক্ষতি নেই। মতলবটা বোঝা যাবে।

মনোজ একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু সুব্রত বেশ গটগট করে এগিয়ে গেল দেখে সেও এগোল।

ড্রাইভারের জানালায় উঁকি দিয়ে সুব্রত হাসিমুখে বলল, গাড়িটা কি আপনার?

ড্রাইভার বেশ একজন শক্তপোক্ত লোক। চোখের দৃষ্টি কঠিন ও স্থির। মোটা গোঁফ, হাতে লোহার বালা, হাস্যহীন মুখ। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। একটু অবাঙালি টানে বলল, কেন, কী দরকার?

আপনি আমাদের ফলো করে এখানে এসেছেন। কেন তা জানতে পারি?

লোকটা খবরের কাগজটা পাশে রেখে বলল, কে কাকে ফলো করেছে? ঝামেলা পাকাতে চান নাকি?

ঝামেলা আপনিই পাকিয়ে তুলছেন। আপনি কি জানেন যে আপনাকে পুলিশে দেওয়া যায়?

লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল, এটা আপনার বাবার রাস্তা? হাল্লা মাচালে বহুৎ ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে। কেটে পড়ুন। ফলোটলো আমি করিনি, আপনাকে চিনিও না। যান, ভাগুন।

মনোজ একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে একটু ভাবের জগতের মানুষ। বিজ্ঞান চিন্তা তার বাস্তববোধকে অনেকখানিই খেয়ে ফেলেছে। তবু কর্তব্যবোধবশে সে এবার এগিয়ে এসে বলল, গাড়িটা কার?

লোকটা মনোজের দিকে তাকিয়ে বলল, তা দিয়ে কী দরকার?

বলবেন না?

কেন বলব?

আপনারা তো ক্রিমিন্যাল।

ক্রিমিন্যাল! বলে লোকটা আচমকা দরজাটা খুলে ফেলল এবং দরজার ধাক্কাতেই মনোজকে ছিটকে ফেলে নেমে এল গাড়ি থেকে। নামতেই বোঝা গেল নোকটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ এবং মোটা কবজি। বেরিয়ে এসেই মনোজকে একটা লাথি কষিয়েই সুব্রতকে ধরে ফেলল জামার বুকের কাছটায়। তারপর বাঁ হাতে চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, শালা, মামদোবাজির আর জায়গা পাওনি।

মনোজ দরজার ধাক্কা আর লাথি দুটোতেই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। জীবনে এরকম মার সে খায়নি। ভোম্বলের মতো পথেই বসে সে হা করে সুব্রতর মার-খাওয়া দেখছিল। লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে সুব্রতর এঁটে ওঠার কথাও নয়। এক-আধবার হাত-পা চালানোর চেষ্টা করে আর একটা চড় খেয়ে সে নেতিয়ে পড়ল।

ভাগ শালা চুহা কোথাকার!

মনোজ উঠে দাঁড়াল। সুব্রত পড়েনি কিন্তু বোমকে গেছে খুব। মনোজ বলল, এনাফ ইজ এনাফ, লেট আস কুইট।

ইয়েস স্যার।

লোকটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিল, যেন খেয়ে ফেলবে। এর সঙ্গে আর বেশিক্ষণ সময় কাটানোটা যে উচিত হবে না, সেটা বুঝে দু'জনেই যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে যাচ্ছে তখনই একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল।

গলির মুখ থেকে একটা লোক এগিয়ে এল। বেশ লম্বাচওড়া চেহারা। এসে তাদের অগ্রাহ্য করে সোজা এসে ড্রাইভারটাকে চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, তারপর ডানহাতে বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা ঘুসি মারল চোয়ালে।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে দৃশ্যটা দেখে মনোজ বলে উঠল, বাঃ, চমৎকার মিস্টার দত্ত। এতক্ষণ যে কোথায় ছিলেন!

ড্রাইভারের অচৈতন্য দেহটাকে বনেটের ওপর উপুড় করে ফেলে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে তাদের দিকে তাকাল সুধাকর। তারপর বলল, কে আপনাদের অ্যাডভেঞ্চারটা করতে বলেছে বলুন তো! কাজের কাজ তো হলই না, উপরন্তু ভন্ডুল হয়ে গেল আমার প্ল্যান।

মনোজ থতমত খেয়ে বলল, এ লোকটা আমাদের ফলো করছিল।

সেটা আমি জানি। এ লোকটা আজ্ঞাবহ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কী যে সব কাণ্ড করেন!

মনোজ অপ্রতিভ হয়ে বলে, আজ্ঞে, আমরা তো জানতাম না। হিট অফ দি মোমেন্টে ব্যাপারটা হয়ে গেছে। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো!

ব্যাপার গুরুতর। সুব্রতবাবু ড্রাইভারের সিটের দরজাটা খুলুন। ভিড় জমে যাচ্ছে। এফেক্টটাকে মিনিমাইজ করতে হবে।

বাস্তবিকই ভিড় জমে যাচ্ছে, অন্তত গোটা দশ-বারো লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

দু-চারজন এসে জিজ্ঞেসও করল, কী হয়েছে দাদা? ছিনতাই পার্টি নাকি?… ডাকাতির কেস?… আপনারা কি সাদা পোশাকের পুলিশ নাকি?

সুধাকর অবশ্য এসব প্রশ্নের জবাব দিল না। ড্রাইভারের সিটে হতচৈতন্য লোকটাকে বসিয়ে দিল। লোকটা ঘাড় লটকে কেতরে রইল।

সুধাকর মনোজের দিকে চেয়ে বলল, এ গাড়ির আসল সওয়ারি কি আর আসবে এখানে? কাণ্ড দেখে সরে পড়বে।

কিন্তু লাইসেন্স নম্বর?

এই না হলে বুদ্ধি? লাইসেন্স নম্বর ধরে ক্রিমিনালদের খুঁজে বের করা যায় কখনও? হয়তো দেখা যাবে, গাড়িটা হয় চোরাই, না হয় ভাড়া করা। যাকগে, যা ঘটে গেছে তার জন্য ভেবে লাভ নেই। লেট আস ক্লিয়ার আউট।

সেই ভাল। নইলে পুলিশের হুজ্জত হতে পারে। বলে মনোজ সুধাকরের পিছু নিল। সঙ্গে সুব্রত।

মিস্টার দত্ত আপনি হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন বলুন তো! মোক্ষম সময়েই এসে পড়েছিলেন বটে। কিন্তু হঠাৎ এখানে এমন সময়ে একজন ইন্টারপোল এজেন্টের তো হাজির হওয়ার কথা নয়।

সুধাকর হাসল, এ জায়গায় আপনারই কি এ সময়ে হাজির হওয়ার কথা! আপনার তো থাকার কথা অফিসে।

ওঃ হ্যাঁ, তাও বটে। আমি এসেছিলাম একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে।

সবই জানি।

জানেন?

না জানার কিছু নেই। গোপীনাথ বসু আপনাদের চাকরিটা নেবেন না, তার কারণ তিনি আজ অথবা কাল ভোরে আমার সঙ্গে কলকাতা ছাড়ছেন।

কোথায় যাচ্ছেন?

ডেস্টিনেশন আমস্টারডাম।

আজ রাতেই?

সম্ভব হলে।

মনোজ একটু গুম হয়ে থেকে বলল, উনি কি ইন্টারপোলের হাতে বন্দি?

তাও বলতে পারেন।

মনোজ নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। আর কথা বাড়াল।

গোপীনাথের বাড়ির সদরের সামনে এসে সুধাকর বলল, গুড বাই।

বাই।

সুধাকর পার্ক করা নীল মারুতিটা দেখিয়ে বলল, ওটা আমার গাড়ি।

সুধাকর গিয়ে গাড়িতে উঠল। তারপর স্টার্ট দিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল।

মনোজ সুব্রতর দিকে চেয়ে বলল, গোটা ব্যাপারটা একটা জিগশ পাজলের মতো। তুমি কিছু বুঝতে পারলে সুব্রত?

না, স্যার।

দু'জনে উপরে উঠে এসে গোপীনাথের ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল রোজমারি। চোখ-মুখ খানিকটা বিস্মিত।

মনোজ ঘরে ঢুকে দেখল, ঘর ফাঁকা।

গোপীনাথ আর মিসেস বোস কোথায় গেলেন?

রোজমারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মিনিট দশেক আগে একটা টেলিফোন এল। গোপীনাথ কল পেয়েই সোনালির সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বললেন। তারপর আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে দু'জনেই বেরিয়ে গেলেন।

কতক্ষণের জন্য?

বললেন তো মিনিট পনেরোর জন্য। সুব্রতর জন্য একটা মেসেজ রেখে গেছেন। বলে গেছেন, সুব্রত এলেই যেন একবার ল্যান্ডিং-এ গিয়ে মিস্টার সেনের জন্য অপেক্ষা করে।

সুব্রত কিছুই বুঝল না। মিস্টার সেন কে তাও সে জানে না। সে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, এই ঘরে নিপুণভাবে একটা রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে। একটা কিছু ঘটবে। সে এখানে অনভিপ্রেত।

সুব্রত ঢোক গিলে বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিস্টার সেন তো! ঠিক আছে।

বলে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। লিফটের জন্য না দাঁড়িয়ে সে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল।

ঘরের মধ্যে মনোজ একটু অস্বস্তি নিয়ে সোফায় বসল।

রোজমারি বলল, তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয়নি তো।

আয়নায় নিজেকে দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার কোট আর জামায় ময়লা লেগে রয়েছে। গালে ধুলোর ছাপ। চুল এলোমেলো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ব্যথা চাপছ।

মনোজ ম্লান হেসে বলল, উই হ্যাভ এ স্মল এনকাউন্টার।

মারপিট?

হ্যাঁ।

ঈশ্বর! কার সঙ্গে?

একটা লোক। গুন্ডা।

মারপিট করতে গেলে কেন?

ওই লোকটা, যে গাড়িটা চালাচ্ছিল সেটাই আমাদের ফলো করে।

ঈশ্বর! সুব্রত যে নীল মারুতির কথা বলছিল?

হ্যাঁ।

কী হচ্ছে বলো তো এসব?

আমি বুঝতে পারছি না রোজমারি।

আমরা কি বিপদের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছি?

হতে পারে।

কিছুদিন আগে আমাকে যখন কেউ ভুল দিনে জন্মদিনের গোলাপ পাঠিয়েছিল তখন থেকেই আমি কেমন অস্বস্তিতে আছি। কিছু একটা হবে। কিন্তু কেন হবে

মনোজ? আমি কী করেছি?

তা তো জানি না। শোনো, গোপীনাথ চাকরিটা নেবে না। সুধাকর দত্ত ওকে নিয়ে আজই আমস্টারডাম রওনা হচ্ছে।

সুধাকর! তাকে তুমি পেলে কোথায়?

বলব।

ডোরবেল বাজতেই রোজমারি গিয়ে দরজা খুলে দিল। তারপর হঠাৎ একটা আর্তনাদের মতো শব্দ করে পিছিয়ে এল ঘরের মধ্যে। মনোজ চমকে চেয়ে দেখল, দরজায় দু'জন লোক দাঁড়ানো। দু'জনেই বিদেশি চেহারার। দু'জনের একজনকে অবশ্য আবছা চেনে মনোজ। লোকটা লুলু, তাদের সিকিউরিটির কর্তা। অন্যজন অচেনা। দু'জনেরই হাতে দুটো পিস্তল জাতীয় জিনিস, নিম্নমুখী হয়ে ঝুলছে।

রোজমারি চেঁচিয়ে উঠল, কী চাও তোমরা?

অচেনা লোকটা রোজমারির দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাজটা শেষ করতে এসেছি রোজমারি।

তোমাদের হাতে বন্দুক কেন জো? লুলু?

জো নামে লোকটা বলল, এটাই কাজ।

তোমার সঙ্গে লুলু কেন?

লুলু আমার বন্ধু। লুলু তোমারও বন্ধু। লুলুর সঙ্গে তোমার মধুর সম্পর্কের কথা তোমার স্বামী না জানলেও আমি জানি রোজমারি।

বাজে কথা বোলো না জো।

জো হাসল, বাজে কথা আমি বলি না। আমার কাছে তোমাদের ঘনিষ্ঠতার ভিডিয়ো ক্যাসেটও আছে। একবার ভেবেছিলাম, ওটা দিয়ে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করি। কিন্তু দুনিয়া এখন অনেক প্রগতিশীল, অনেক পারমিসিভ। আজকাল

স্বামীরা স্ত্রীর ছোটখাটো অবৈধ প্রেম ক্ষমা করে দেয়। তোমার স্বামী তো একটি ভেড়া বই কিছু নয়।

তুমি কি এইজন্য আমাদের ফলো করে এসেছ?

দুর বোকা! তোমাদের জন্য এত পরিশ্রম করব কেন? গোপীনাথ কোথায়? ডাকো।

উনি এখন নেই।

জো আর লুলু চমকে উঠে বলল, মানে? কোথায় গেল?

একটু বাইরে গেছে। এখনই এসে পড়বে। কিন্তু তোমরা কি তাকে খুন করবে জো?

জো অবাক হয়ে বলল, আমরা। আমরা কেন খুন করব?

তা হলে?

ওঁকে খুন করবে তুমি এবং তোমার স্বামী।

কী বলছ জো?

জো ঘড়ি দেখে বলল, গোপীনাথ কোথায় গেছে রোজমারি? সত্য বলো।

লুলু ফ্ল্যাটটা খুঁজে এসে বলল, নেই।

তারপর দরজা খুলে বোধহয় চারদিকটা দেখে এসে বলল, বাইরে বেরোতে পারেনি। আমার লোক নজর রাখছে। অন্য কোনও ফ্ল্যাটে যেতে পারে।

জো বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার এটা দ্বিতীয় ভুল লুলু।

•

জো এবং লুলু পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। জো-র চোখে আগুন ঝরছে, লুলুর চোখে ভয়। সিঁটিয়ে থাকা স্থবিরের মতো রোজমারি দৃশ্যটা দেখল। মনোজের অবস্থা তার চেয়ে কিছুমাত্র ভাল নয়। তবু সে-ই প্রথম কথা বলল। পরিষ্কার জার্মান ভাষায় বলল, এসব কী হচ্ছে?

জো ক্লাইন তার দু'খানা রক্ত-জল-করা চোখে মনোজের দিকে চেয়ে জার্মান ভাষায় বলল, একটা নাটক। শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে প্রধান অভিনেতা আর অভিনেত্রী আপনি আর রোজমারি। কখনও খুনটুন করেছেন মিস্টার সেন?

মনোজ কাপছিল। মাথা নেড়ে বলল, না।

আপনি চিরকাল খুব নিরাপদ জীবন যাপন করে এসেছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

খুন করাটা কোনও ব্যাপারই নয়। বিশেষ করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি করতে হয়।

তার মানে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। গোপীনাথ যেখানেই থাক এ বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি। সে আসবে। আপনাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে। গোপীনাথ বসু ঘরে ঢোকামাত্র দু'জনেই গুলি চালাবেন। আমাদের হাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র দেখছেন তা অত্যন্ত শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয় পিস্তল। চালানো খুব সোজা।

আমরা গোপীনাথকে মারব কেন?

গোপীনাথকে মারবেন আমি আদেশ করছি বলে। মারতেই হবে, কারণ আপনাদের পিছনে আমরা দুটো পিস্তল আপনাদের দিকে তাক করে অপেক্ষা করব। আপনারা যদি গুলি না চালান সে ক্ষেত্রে কাজটা আমাদেরই করতে হবে। তবে তখন আমরা শুধু গোপীনাথকেই মারব না, আপনাদেরও মারব। বুঝেছেন?

আপনি কে?

আমার নাম জো ক্লাইন। রোজমারির প্রাক্তন স্বামী।

ওঃ হ্যাঁ, আপনার কথা শুনেছি বটে। আপনি মার্কিন সরকারের গুপ্তচর ছিলেন।

ছিলাম। এখন নই।

আপনি এ কাজ কেন করছেন?

স্বার্থে করছি মিস্টার সেন। আমরা সামান্য আজ্ঞাবহ মাত্র। কাজ করে টাকা পাই।

শুধু টাকার জন্য?

জো ক্লাইন মাথা নেড়ে বলল, শুধু টাকা নয় মিস্টার সেন। নিউ ইয়র্কে আমার একটি সরল সোজা বউ আছে। আর আছে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা। আমি যাদের আজ্ঞাবহ তাদের হয়ে যদি কাজটা না করি তা হলে তারা প্রথমেই খতম করবে আমার পরিবারটিকে। আমাদের আনুগত্যটাও বাধ্যতামূলক। একরকম পণবন্দি। বুঝেছেন?

মনোজ অবিশ্বাসের গলায় বলল, সত্যি?

এর চেয়ে কঠোর সত্য আর নেই।

খুনটা আমাদের দিয়ে করাতে চান কেন?

কারণ আমরা এখানকার পুলিশি ঝামেলায় জড়াতে চাই না। কোনও চিহ্নও ফেলে যেতে চাই না।

কিন্তু আমরা! আমাদের তো পুলিশে ধরবে!

সেটা আপনাদের শিরঃপীড়ার বিষয়। কিন্তু পুলিশি ঝামেলার চেয়েও আপনার অনেক বেশি দরকার বেঁচে থাকা। তাই নয় কি?

লুলুর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

জো একটু হাসল, পাপীর সঙ্গে পাপীর বন্ধুত্ব একটু তাড়াতাড়ি হয়। মিস্টার সেন, লুলু, আপনি এবং আমি, আমাদের তিনজনের একটা জায়গায় খুব মিল। আমরা তিনজনেই রোজমারির প্রাক্তন বা বর্তমান প্রেমিক।

মনোজ একবার রোজমারির দিকে তাকাল, কিছু বলল না। তবে তার মুখে একটা বিস্বাদের ভাব ফুটে উঠল। একটু বেদনাও।

রোজমারি লুলুর দিকে যে চোখে চেয়ে ছিল তা প্রেমপূর্ণ নয়। ঘেন্নায় ভরা। চাপা গলায় সে শুধু একবার বলল, কুকুর।

লুলুর সুন্দর মুখখানা নির্বিকার রইল। সে শুধু ঠান্ডা গলায় বলল, তোমাকে আমি কুত্তি বলতে পারতাম, কিন্তু বলছি না। তার কারণ এটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের জট ছাড়ানোর সময় নয়, রোজমারি। আমাদের হাতে অনেক বেশি জরুরি কাজ আছে।

রোজমারি হঠাৎ বলল, আমরা তোমাদের আজ্ঞাবহ নই। আমরা ভদ্র ও আইন মোতাবেক জীবনযাপন করি। তোমাদের হুকুমে আমরা নিরপরাধ একজন মানুষকে খুন করতে পারব না। আমরা চলে যাচ্ছি। দয়া করে বাধা দিয়ো না। চলো মনোজ।

মনোজের হাত ধরে একটা টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিলে রোজমারি।

পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে জো বলল, এখনও তুমি ততটা স্বাধীন নও রোজমারি।

তার মানে?

তোমার অতীত আমি ভুলে যাইনি। ভিয়েনায় গডার্ড নামে একটা লোককে তুমি খুন করেছিলে। ভুলে গেছ? তোমাকে বাঁচাতে খুনের দায়টা আমাকে নিজের কাঁধে নিতে হয়েছিল। বানাতে হয়েছিল আষাঢ়ে গল্প। গল্প বানানোর কাজটা বা অপরাধের দৃশ্য সাজানোর ব্যাপারে আমি অতিশয় দক্ষ। আর সেইজন্যই পুলিশকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম। নইলে এতদিনে জেল খেটে তুমি বুড়ি হয়ে যেতে কিংবা মৃত্যুদণ্ডের কবলে পড়তে পারতে।

আমি ভুলিনি। ব্ল্যাকমেল করতে চাও, জো? সুবিধে হবে না। আমি যে-কোনও পরিণতির জন্য তৈরি। কিন্তু তোমার হুকুমে গোপীনাথকে মারা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

জো মনোজের দিকে চেয়ে বলল, আপনারও কি তাই মত মিস্টার সেন? আশা করি, আপনি এই মহিলার মতো অবিবেচক নন। তার কারণ আমার হুকুম তামিল না করলে আপনাদের দুজনকে খুন করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

কেন নেই? আমরা তো চলেই যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, পুলিশকে কিছু বলব না।

জো হাসল, এই কারবারে কথার কোনও দাম নেই। কথা নিতান্তই মূল্যহীন শব্দ মাত্র।

মনোজ রোজমারির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, রোজমারি যা বলছে আমি তা সমর্থন করছি।

আপনার নিজস্ব কোনও বক্তব্য নেই?

না। আমি যে ব্যক্তিত্বহীন তা তো আপনি জানেন।

খুবই দুঃখের ব্যাপার।

রোজমারি মনজের হাত ধরে টেনে দরজার দিকে এক পা এগোতেই জো ক্লাইন মৃদু স্বরে বলল, একসময়ে তোমাকে ভালবাসতাম রোজমারি, সেই ভালবাসার দোহাই, আত্মহত্যা কোরো না।

রোজমারি জোর দিকে চেয়ে দৃঢ় গলায় বলল, জো, তুমি আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছ, তাতেও আমরা তো মরবই। তোমার কথামতো গোপীনাথকে যদি মারি সে ক্ষেত্রে আমরা রেহাই পাব না। পুলিশ ধরবে, বিচার হবে, শাস্তি হবে। নষ্ট হবে আমাদের সব সুনাম। ওভাবে মরার চেয়ে তোমার হাতে যদি গুলি খেয়ে মরি তাতে ক্ষতি কী? এখন মরলেও বিবেক পরিষ্কার থাকবে এই কথা ভেবে যে, একজন নির্দোষ লোককে মারতে হয়নি।

খুব ধীরে ধীরে হস্তধৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি তুলে আনছিল জো। বলল, তোমাদের কে আগে মরতে চাও?

রোজমারি বলল, আমি চাই।

মনোজ বলল, না, আমি।

রোজমারি মনোজকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, প্রহসনের দরকার নেই জো। তুমি পাকা খুনি। দু'জনকেই একসঙ্গে মারো। কে দু'সেকেন্ড আগে গেল, কে দু' সেকেন্ড পরে, তাতে কী আসে যায়?

জো তার পিস্তলটা তুলে ধরে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তোমাদের দু'জনকে মারাটা আমার প্রোগ্রাম নয়। আমার মূল কাজ গোপীনাথকে সরিয়ে দেওয়া। তোমরা মাঝখানে এসে গেছ বলেই সিদ্ধান্তটা নিতে হচ্ছে। কিন্তু এখনই নয়। পিছিয়ে গিয়ে সোফায় বসে থাকো। আগে গোপীনাথ, তারপর তোমরা।

দরজায় একটা নক হতেই লুলু গিয়ে দরজাটা খুলল। একটা লোক চাপা জরুরি গলায় বলল, আসছে।

লুলু বলল, ঠিক আছে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে লুলু জোর দিকে চেয়ে বলল, তৈরি হও।

জো রোজমারির দিকে চেয়ে বলল, ডোরবেল বাজলে দরজাটা খুলে দিতে পারবে কি?

না জো। আমি বরং চেঁচাব। চেঁচিয়ে গোপীনাথকে সাবধান করে দেব।

জো লুলুর দিকে চেয়ে বলল, তা হলে দু'জনকে শোয়ার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। নইলে কাজ পণ্ড হতে পারে।

লুলু অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে এসে প্রায় হ্যাচকা টানে দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর অত্যন্ত কঠিন হাতে দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

জো গিয়ে দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করে রাখল। তারপর পিছিয়ে এসে দু'দিকের দেওয়ালের আড়ালে সরে দাঁড়াল দু'জন। হাতে উদ্যত পিস্তল।

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। তারপর খুব বিনীত কণ্ঠে জার্মান ভাষায় শোনা গেল, শুভ সন্ধ্যা। ভিতরে আসতে পারি?

জো একটা দাতে দাঁত চাপল। তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে লোকটার মুখোমুখি হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল।

বিস্মিত জো?

খুবই।

সুধাকর দত্ত ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখল।

ও দুটি বুঝি শোয়ার ঘরে?

হা দাতা। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

সুধাকর লুলুর দিকে চেয়ে বলল, এই বুঝি লুলু?

হা দাতা। কিন্তু তুমি কী চাও?

সুধাকর দু'জনের দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে বলল, আমি বড্ড পরিশ্রান্ত। কয়েক দিনের বিশ্রাম চাই। আমার কী ইচ্ছে করে জানো? এই শীতের মরসুমে রাঁচি বা হাজারিবাগের কোনও জঙ্গলে নদীর ধারে নির্জন কোনও বাংলোয় কয়েকটা দিন হাঁফ ছেড়ে আসি। কিন্তু কপাল এমনই যে, সেই অবসর কখনওই পাওয়া যায় না।

জো পিস্তল নামিয়ে বলল, গোপীনাথ কোথায় দাতা?

সুধাকর সামনের সোফায় বসে নিরুদ্বেগ গলায় বলল, কাছেই রয়েছে। দরজার বাইরেই।

জো একটা পা বাড়াতেই সুধাকর বলল, নিজের অতীতের সব ট্রেনিং কি ভুলে গেছ জো?

কেন?

দরজার বাইরেটা তোমার পক্ষে নিরাপদ না-ও হতে পারে।

জো সুধাকরের দিকে চেয়ে বলল, আমাকে কি ফাঁদে ফেলেছ?

সুধাকর মাথা নেড়ে বলল, না। কী লাভ তাতে?

জো পিস্তলটা শক্ত হাতে চেপে ধরে বলল, আমি জানতে চাই বাইরে পুলিশ আছে কি।

নেই।

তা হলে কে আছে?

ভিকিজ মব।

কী চাও দাতা? আমাকে মারবে না জেলে দেবে?

সুধাকর দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম করে বসে বলল, আমাকে কী ভাবো তুমি? আমি কি কোনও অবতার না মেসায়া? আমি দুনিয়ার পাপ বিমোচন করতে এসেছি নাকি? ওটা আমার কাজ নয়।

তা হলে আমার কাজে বাধা দিচ্ছ কেন? বাইরে তোমার এজেন্টরাই বা মোতায়েন রয়েছে কেন?

তোমাকে বাড়তি পরিশ্রম থেকে বাঁচাতে।

জো বলল, তার মানে?

গোপীনাথকে মারার দরকার নেই জো। তুমি ফিরে যাও।

জো বিবর্ণ মুখে বলল, দাতা, তুমি কী বলছ জানো? এ কাজটা যদি সমাধা না করতে পারি তা হলে নিউ ইয়র্কে আমার বউ আর দুটো বাচ্চা সাফ হয়ে যাবে। একবার ব্যর্থ হয়েছিলাম বলে আমাকে তারা হুমকি দিয়ে রেখেছে।

সুধাকর একবার আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বল, জানি।

জানো?

জানি জো।

আমি জানতে চাই তুমি গোপীনাথকে আড়াল করছ কি না। করলে তোমার সঙ্গে অনেকগুলো গ্যাংলিডারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আমি সামান্য একজন আজ্ঞাবহ, ভাড়াটে খুনি মাত্র। কিন্তু তারা তো তা নয়।

শোনো জো, ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

ভাবব না। কিন্তু আমার কী হবে দাতা?

তোমার বউ আর বাচ্চাকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তার মানে?

সুধাকর তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে জোর হাতে দিয়ে বলল, এই নম্বরে নিউ ইয়র্কে ফোন করলেই তুমি তোমার বউয়ের গলা পাবে। ফোনটা করো।

জো চিন্তিতভাবে ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ডায়াল করল। মিনিট চারেক বাদে ফোন রেখে সে সুধাকরের দিকে ফিরে বলল, কাল সন্ধেবেলা কয়েকজন বন্দুকধারী আমার বউ আর বাচ্চাদের তুলে এনেছে। তারা আছে হারলেমের একটা বাড়িতে। তুলে আনবার সময় কয়েকজন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সামান্য ধস্তাধস্তিও হয়। তবে গুলি চলেনি। এসব কী হচ্ছে দাতা?

অভিনব কিছু নয় জো। তোমার সংগঠনের লোকেরা তোমার বউ আর বাচ্চাদের ওপর নজর রাখছিল। তুমি এই মিশনে ব্যর্থ হলে তারা শোধ নিত। তুমি ভাল লোক নও জো। কিন্তু তোমার ভিতরে কিছু ভাল এলিমেন্ট ছিল। তোমার ওপর আমার বিন্দুমাত্র করুণা থাকত না, যদি না জানতাম যে তুমি পরিস্থিতির চাপে পড়ে এবং নিতান্ত প্রাণের ভয়ে মাফিয়াদের হয়ে কাজ করতে নেমেছ। তোমার সবচেয়ে দুর্বলতা তোমার পরিবার। বউ আর বাচ্চা। তুমি আদ্যন্ত একজন পারিবারিক মানুষ। পরিবার নিয়ে সুখে থাকা ছাড়া তোমার আর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এই পরিবারমুখী মনোভাবটা আজকাল হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ গুরা তোমার এই সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গাটিকেই আঘাত করেছে। তুমি নিজের পরিবারকে বাঁচাতে যে-কোনও কাজ করতে প্রস্তুত, যদিও তোমার বিবেক তা চায় না। শুধু এই কারণেই তোমার পরিবারকে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দিয়েছি।

জো হাসল, ধন্যবাদ। কিন্তু এ নিরাপত্তা কতদিন? ওরা একদিন আমার নাগাল পাবেই।

সুধাকর মাথা নেড়ে বলল, বিশ্বের পরিস্থিতি দ্রুত পালটে যাচ্ছে জো। নিউ ইয়র্কের ব্রংকস এলাকায় গত পরশু থেকে গ্যাংওয়ার শুরু হয়েছে। তোমার অর্গানাইজেশনের দু’জন বস খুন হয়ে গেছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফানুমি নামে একটা লোক সংগঠনের হাল ধরেছিল পরশু মধ্যরাতে। ফানুমি গতকাল নিউ ইয়র্ক ছেড়ে কোনওরকমে পালিয়ে যায়। সংগঠন আপাতত তিন টুকরো।

তা হলে আমার কী হবে?

সুধাকর মৃদু হেসে বলল, সেটা চিন্তার বিষয়।

চিন্তাটা কে করবে দাতা? আমি তো চিরকাল রোবটের মতো কাজ করে গেছি। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিনি। পশুর জীবন বোধহয় একেই বলে। বাঁচো আর মায়েরা। এ ছাড়া কিছুই শিখিনি। পরিবারটাকে ভালবাসি। কিন্তু তাদের সঙ্গেই বা বছরে কটা দিন কাটাতে পারি?

নতুন একটা জীবন শুরু করো জো।

অসম্ভব! এরা তা করতে দেবে না আমাকে।

পালাও জো। অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাও। চাষবাস করো। ভদ্রজীবনে ফিরে এসো। তোমার বয়স চল্লিশের কোঠায়। এখনও সময় আছে।

লুলু এতক্ষণ একটা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। একটাও কথা বলেনি। ঝুলন্ত হাতে একটা পিস্তল নিম্নমুখী হয়ে আছে। আচমকাই সে একজন দক্ষ অ্যাক্রোব্যাটের মতো দাঁড়ানোর ওপরেই একটা ডিগবাজি খেয়ে জানালার দিকে সরে গিয়ে সটান মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। জাদুকরের মতো ডান হাতটা ঝটিতি উঠে এল ওপরে। পরপর দুটো গুলি চালাল সে। সোডার বোতলের ছিপি খোলার মতো দুটো শব্দ হল শুধু। যাকে লক্ষ্য করে সে গুলি চালিয়েছিল সে সুধাকর। সোফা সমেত সুধাকর উলটে পড়ে গিয়েছিল মেঝেয়।

খুব ধীরে উঠে দাঁড়াল লুলু। ইংরেজিতে বলল, হি ইজ ফিনিশড।

জো তার দিকে তাকিয়ে বলল, এ কাজ করলে কেন লুলু?

সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারটা আমার সহ্য হয় না জো। ও তোমাকে নরম করে ফেলছিল। দাতা আমার বন্ধু ছিল।

লুলু পিস্তলটা জো এর দিকে স্থির রেখে বলল, খুব ধীরে পিস্তলটা মেঝেয় ফেলে দাও জো।

কেন?

তোমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমার পালা।

জো ঈষৎ লাল হয়ে বলল, তুমি আমাকে হুকুম করছ? ভয় দেখাচ্ছ?

ভয় দেখাচ্ছি না। তোমাকে ফাঁকা ভয় দেখাব তেমন বোকা নই। পিস্তলটা ফেলে দাও জো।

জো পিস্তলটা ফেলে দিয়ে বলল, তুমি আকাট বোকা। দাতাকে মেরে চূড়ান্ত আহাম্মকের মতো কাজ করেছ। বাইরে ওর লোকেরা আছে। তাদের তুমি চেনো না, আমি চিনি। ভিকিজ মব। তাদের হাত থেকে তুমি কীভাবে রেহাই পাবে?

লুলু অনুত্তেজিত গলায় বলল, সুধাকর দত্ত ভিকিজ মবকে অনেকদিন ধরেই টুপি পরিয়ে আসছে। আহাম্মক আমি নয়, তুমি। সুধাকর দত্তর আসল পরিচয় তুমি জানো না। সুধাকর ইন্টারপোলের বিগ বস।

ইন্টারপোল! মাই গড!

সুখের কথা, সুধাকর দত্ত ওরফে দাতার মুখোশ খুলে গেছে। ভিকিজ মব ওকে আর তাদের ইউরোপিয়ান শাখার সর্দার বলে মানে না। আমি তাদের হয়েই অপ্রিয় কাজটা করলাম মাত্র। এর জন্য ভাল পয়সা পাওয়া যাবে।

ঈশ্বর! তুমি তা হলে কে লুলু?

একজন নিরীহ ব্যবসায়ী। টাকা আয় করি, ওড়াই। আমি জীবনটা আনন্দের সঙ্গে যাপন করতে ভালবাসি। তোমার মতো আমার কোনও পিছুটান নেই। না পরিবার, না প্রিয়জন। দেওয়ালের দিকে একটু সরে যাও জো। তোমার পিস্তলটা কুড়িয়ে নেওয়া দরকার।

তারপর?

তারপর মানে?

আমাকে নিয়ে কী করতে চাও?

ভয় পেয়ো না জো। তোমাকে নিরস্ত্র করে ছেড়ে দেব। তুমি স্বচ্ছন্দে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তোমাকে মেরে আমাদের লাভ কী? আর একটা মৃতদেহ নিয়ে বরং সমস্যা বাড়বে। সরে যাও জো।

জো পিছিয়ে গেল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল লুলু। পিস্তলটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। একবার তাকাল মেঝের ওপর কাত হয়ে পড়ে থাকা সুধাকরের দিকে। সামান্য ভ্রু কোঁচকাল তার। দুটো গুলি খেয়েও সুধাকরের কোনও রক্তক্ষরণ হয়নি। অথচ হওয়ার কথা। সে পিস্তলটা কুড়োতে নিচু হল। একটু দ্বিধাগ্রস্ত সে। সুধাকরের রক্তক্ষরণ হয়নি কেন?

লুলু নিচু হয়েছিল বটে, কিন্তু আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। একটা ছোট্ট পিড়িং শব্দ, একটা খুদে পিনের মতো জিনিস বিদ্যুতের গতিতে এসে তার বাঁ দিকের রগে বিধে গেল। কুঁজো অবস্থাতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ। তারপর সে ঢলে পড়ল মেঝের ওপর।

সুধাকর কল-টেপা পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল।

জো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, তুমি মরোনি?

সুধাকর একটু হাসল, একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রাইম অপারেটরের কি লুলুর মতো আনাড়ির হাতে মরা শোভা পায় জো?

কিন্তু ও তো গুলিটা ভালই চালিয়েছিল মনে হল।

তা বটে। শার্প শুটার। তবে টাইম আর স্পেসের কতগুলো হিসেব আছে। সূক্ষ্ম হিসেব। তুমি তো জানো।

জো হাসল, ইউ আর এ গুড সারভাইভার। কিন্তু ভিকিজ মব কি তোমাকে শত্রু ভাবছে? তা হলে এখান থেকে বেরোনো আমাদের কঠিন হবে।

ভয় নেই জো। আমি আসলে কে ভিকি জানে। আমরা হাত ধরাধরি করে কাজ করি। কাটা দিয়েই তো কাটা তুলতে হয়। তাই আমি ক্রিমিনালদের সব সময়ে এলিমিনেট করার পক্ষপাতী নই। তারাও কাজে আসে।

ধন্যবাদ। তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

পকেট থেকে একটা সেলুলার ফোন বের করে ডায়ালের পর সংক্ষেপে সুধাকর বলল, চলে আসুন।

পাঁচ মিনিট পর গোপীনাথ আর সোনালি সলজ্জ এবং খানিকটা ভীত মুখে ঘরে ঢুকল। শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল মনোজ আর রোজমারি। ঘরে ঢুকল সুব্রত।

রোজমারির দিকে চেয়ে সুধাকর বলল, খুব বোকার মতো কাজ করেছেন ম্যাডাম। লুলুকে বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয়নি। আপনার কারখানার সাবোটাজের পেছনে লুলু। আন্তর্জাতিক গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়ার পেছনে লুলু। জো-কে কন্ট্রাক্ট দেওয়ার পিছনেও লুলু। চমৎকার মাথা, বিচ্ছিরি চরিত্র এই হল লুলু।

আমি দুঃখিত মিস্টার দত্ত।

আপনার স্বামী হয়তো দুর্বল চিত্ত, কিন্তু উনি মস্তিষ্কবান এবং ভাল লোক। আপনার জীবনে লুলুর মতো লোকের ভূমিকা কী?

আমি বিপদের মুখে পড়ে মনোজকে আজ চিনেছি। সে সত্যিই চমৎকার লোক।

.

বছর দেড়েক বাদে এক সন্ধেবেলা সুইডেনের সোলনা শহরের এক প্রান্তে বিশাল ভেনাস ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টারের ফটক দিয়ে একটি দামি মার্সিডিজ গাড়ি বেরিয়ে এল। চালকের আসনে গোপীনাথ। মুখে কোনও উদ্বেগ নেই। এই ছোট্ট ছিমছাম সুন্দর শহরটি তার খুব পছন্দ। তার চেয়েও পছন্দ ভেনাস ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টারকে। দেড় বছর আগে সে এই কোম্পানিতে যোগ দেয়। কোম্পানি দিয়েছিল প্রভূত বেতন এবং অপার স্বাধীনতা। ভূতের মতো দিনরাত খেটেছিল গোপীনাথ।

এক বছরের মধ্যেই সলিড ফুয়েল তৈরি করা সম্ভব হয়। তবে খরচ পড়েছিল মারাত্মক। পরবর্তী ছ'মাস ধরে চলেছিল বাণিজ্যিক হারে জিনিসটা তৈরির চেষ্টা। দু'মাস আগে সে কাজও সফল হয়েছে অন্তত কুড়িজন বৈজ্ঞানিকের নিরন্তর চেষ্টায়। ভেনাস কিছুদিনের মধ্যেই বহুধা ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিটি বাজারে ছাড়বে।

দ্বিতীয়বার বিদেশে এসে সোনালিকে সেই প্রথমবারের মতোই একাকিত্বের জীবন কাটাতে হয়। গোপীনাথ ভয় পেয়ে বলেছিল, তোমার তো আবার একা লাগছে। আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো!

সোনালি অবাক হয়ে বলেছিল, একা! না এত একা নই। আমার ভিতরে একটা ছোট্ট তুমি আছে। সে সঙ্গ দেয়।

খুব হেসেছিল তারা। সোনালির একা লাগত হয়তো, কিন্তু গোপীনাথের ভবিষ্যৎ শুধু নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভেবেও মেনে নিত। দিনের বেলা যেত মার্কেটিং-এ। কখনও পার্ক বা হ্রদের ধারে গিয়ে বসে থাকত। সাত মাস আগে তাদের ছেলে দীপ্যমানের জন্ম হল। ব্যস, সোনালির সব মন-খারাপ ডানা মেলে উড়ে গেল।

দীপ্যমানের জন্মের প্রায় সমসময়েই শেষ হয়েছিল গোপীনাথের পাহাড়প্রমাণ কাজ। তারপর থেকে সে রোজ ল্যাবরেটরি থেকে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আসে। শহরটা খুব নির্জন। এই নির্জনতা তাদের ভালই লাগে।

গাড়ি চালাতে চালাতে গত দেড় বছরের কথা ভাবছিল গোপীনাথ। দেড় বছর আগে এক সাংঘাতিক মৃত্যুভয়তাড়িত সময়ে যখন বেঁচে থাকার সবটুকু আশা জলাঞ্জলি দিয়েছিল সে, তখন সোনালি যেন একঝলক হাওয়ার মতো তার বুকে একটা বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। ওইভাবেই সোনালির দ্বিতীয় অভিষেক হল তার জীবনে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আজকাল কর্মক্লান্ত দিনের শেষে সোনালির কাছেই তার ফিরতে ইচ্ছে করে। আর দীপ্যমান। হ্যাঁ, অবশ্যই দীপ্যমান।

ছবির মতো সুন্দর বাগানে ঘেরা তাদের দোতলা বাড়িটি। কত যে ফুল চারদিকে ফুটে আছে। ধুলো নেই, ময়লা নেই। শুধু সুগন্ধ। এখন গ্রীষ্মকাল। বড় মনোরম আবহাওয়া।

ছোট্ট একটু হর্নের শব্দ করে গাড়ি পার্ক করল গোপীনাথ। তারপর নামল। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে যখন দরজায় দাঁড়াল তখন তার মুখে হাসি, বুকটা ভরা। সে কি আজ সুখী? সে কতটা সুখী?

দরজাটা খুলে গেল। একটু আনমনা গোপীনাথ ডোরম্যাটে পা মুছে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, দরজার আড়াল থেকে একটা ভারী গলা বলে উঠল, হ্যান্ডস আপ।

গোপীনাথের হৃৎপিণ্ড একটা ডিগবাজি খেল। হাত দুটো ওপরে তুলল সে। আন্দাজ করল, লোকটা তার দু'হাত পিছনে দাঁড়ানো। আচমকা গোপীনাথ সটান উবু হয়ে পিছনের দিকে হাত চালিয়ে লোকটার দুটো পা ধরে হ্যাচকা টান মারল।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল সেকেন্ডের ভগ্নাংশে। দড়াম করে পড়ে গিয়ে লোকটা বাংলায় বলে উঠল, উঃ, এ তো দেখছি গুরুমারা বিদ্যে।

গোপীনাথ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সুধাকরকে মেঝে থেকে তুলে বলল, ইস! লাগেনি তো! ছিঃ ছিঃ, কী কাণ্ড বলুন তো।

সুধাকর হেসে বলল, আই অ্যাম প্লিজড। মাথার কাজ করতে করতে যে রিফ্লেক্স কমে যায়নি তা দেখে খুশি হয়েছি।

কখন এলেন?

ঘন্টা দুই। কফিটফি খেয়েছি। সোনালি আমার জন্য ধোকার ডালনা রান্না করছেন। আর দীপ্যমান আমার নাক কামড়ে দিয়েছে।

খুব হাঃ হাঃ করে হাসল গোপীনাথ। তারপর বলল, আজ থেকে যেতে হবে। অনেক কথা আছে।

সুধাকর মাথা নেড়ে বলল, ডিনারের পরই চলে যাব। কাজ আছে।

এত কী কাজ বলুন তো!

সুধাকর হাসল, দুনিয়ার একটা দিক আপনি দেখতে পান। অন্যান্য দিকগুলি আমাদের মতো লোককে দেখতে হয়। সেখানে দুনিয়ার যত কাদা, নোংরা, যত ক্লেদ।

আবার কবে আসবেন?

চলে আসব। দীপ্যমানকে দেখার পর আমার একটা মায়া জন্মেছে। ইউ আর এ হ্যাপি ম্যান।

কথায়, হাসিতে, খাওয়ায়দাওয়ায় সন্ধেটা চমৎকার কেটে গেল তাদের। পুরনো কথা হল অনেক। রাত আটটায় একটা গাড়ি এল। চলে গেল সুধাকর।

ফাঁকা ঘরে সোনালি আর গোপীনাথ। দীপ্যমান ঘুমোচ্ছে।

সোনালি বলল, বেশ লোকটা, না?

হ্যাঁ, বেশ লোক। ও না বাঁচালে কবে আমি খুন হয়ে যেতাম।

একটু শিউরে উঠে সোনালি তাড়াতাড়ি তার পাশে এসে বসল। গোপীনাথ তাকে এক হাতে বেষ্টন করে বলল, হানিমুনে যাবে? আমরা আজ অবধি যাইনি কিন্তু।

যাঃ, বাচ্চা হওয়ার পর কেউ হানিমুনে যায় বুঝি?

যায় না?

না। তখন হানিমুন ঘরেই করতে হয়।

তাই! বলে অপলক চোখে সোনালির দিকে চেয়ে রইল গোপীনাথ।

তাই। বলে চোখ বুজে ফেলল সোনালি। লজ্জায়।

পদক্ষেপ

১. আপনি একজন বড় স্কলার

পদক্ষেপ— শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আপনি একজন বড় স্কলার, তাই না?

এসব কথা থাক। একগাদা ডিগ্রি কোনও কাজে লাগে না।

কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আমি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখছি।

কেন দেখছেন? ডিগ্রি দিয়ে কিছু হয় না।

আপনি মাধ্যমিকে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে ছিলেন। সাধারণত এই পর্যায়ের রেজাল্ট যারা করে তারা সায়েন্স নিয়ে পড়ে এবং ডাক্তারি বা প্রযুক্তির লাইনে যায়, আপনি তা যাননি। আপনি আর্টস পড়েছেন। কেন বলুন তো?

আমার কলকবজার ব্যাপারও ভাল লাগত না, ডাক্তারিতেও আগ্রহ ছিল না। ইতিহাসে আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল বরাবরই। ইতিহাসে আমি সবসময়ই ভাল নম্বর পেতাম।

ভাল কথা। সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হোক এটা কাম্যও নয়। বিশেষ করে এখন ইঞ্জিনিয়ারদের বাজার পড়তির দিকে। গত কয়েক দশকে নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বহু ছাত্র পাশ করে বেরোনোর ফলে চাকরিতে টান পড়েছে। বিদেশেও তাদের ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে। ডাক্তারদের অবস্থা হয়তো একটু বেটার। কিন্তু নাম না করলে ডাক্তারদের পশার নেই।

আপনি প্রফেশনের কথা ভাবছেন তো! আমি যখন লেখাপড়া করতাম তখন পেশা নিয়ে কিছু ভাবিনি। পড়াশুনো করতাম নেশার মতো। তবে আমি জানতাম

ইতিহাস পড়ে খুব মোটা মাইনের চাকরি পাওয়ার আশা নেই, বড়জোর একটা অধ্যাপনা।

শেষ পর্যন্ত আপনি তাই পেয়েছেন, এতে কি আপনি খুশি?

হ্যাঁ, অখুশি হওয়ার কী আছে বলুন। আমি তো স্বেচ্ছায় আমার বিষয় নির্বাচন করেছি। ভবিষ্যৎ জানাই ছিল।

আপনি তো ল-ও পড়েছেন। যতদূর জানি এলএলবি-তেও আপনি ভালই ফল করেছিলেন।

হ্যাঁ। আমাদের সম্পত্তিঘটিত একটা দীর্ঘস্থায়ী মামলা ছিল। আমরা উকিলের আর আদালতের পিছনে অনেক খরচ করেছি। বাবা আমাকে ল পড়তে বলেন ওই মামলা চালানোর জন্যই।

মামলা কি আপনি চালিয়েছেন?

খানিকটা সাহায্য করেছিলাম বইকী!

মামলাটা আপনারা শেষ পর্যন্ত জিতেও যান।

হ্যাঁ।

তা হলে আপনি ওকালতিও খারাপ করতেন না।

করলে হয়তো ভালই করতাম। কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, আমার ওসব ভাল লাগে না। আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালবাসি। আর আমার প্রিয় বিষয় হল ইতিহাস। কিন্তু আপনি যে কেসটার তদন্ত করছেন তাতে আমার কোয়ালিফিকেশন কোন প্রসঙ্গে আসছে?

নিরুপমবাবু, আমার কাছে যে তথ্যপ্রমাণ আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইতিহাস আপনার প্রিয় বিষয় হলেও অনার্সে আপনি খুব টেনেমেনে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। আর এমএ-তে তাও নয়, সেকেন্ড ক্লাস ফাস্ট।

আপনার তথ্য ভুল নয়, ও দুই পরীক্ষাই আমার খারাপ হয়েছিল। অনার্সের আগে আমি চোখের একটা অসুখে পড়েছিলাম, ডাক্তার সন্দেহ করেছিল রেটিনা

ডিট্যাচমেন্ট, শেষ অবধি অবশ্য তা হয়নি। এমএ পরীক্ষার আগে আমি একটি মেয়ের পাল্লায় পড়ে খানিকটা গোল্লায় গিয়েছিলাম।

মেয়েটির নাম কি স্বপ্না?

আপনি কী করে জানলেন?

জানাই যে আমার কাজ।

তাই দেখছি। আর কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ। আমার অনেক কিছু জানার আছে। স্বপ্না সেন সম্পর্কে যদি একটু ডিটেলস ইনফর্মেশন দিতে পারেন তা হলে ভাল হয়।

স্বপ্না! সে তো অতীত, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রায় দশ-বারো বছর আগে। তখন আমার বোধহয় বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কিংবা আরও একটু কম হতে পারে। এমএ ফার্স্ট ইয়ারে আমার বয়স বোধহয় ছিল একুশ।

হ্যাঁ, তাই ছিল।

স্বপ্নার সঙ্গে তখন আমার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বপ্না খুবই সুন্দরী ছিল। একটা মিষ্টি ঝগড়ার ভিতর দিয়ে আমাদের ভাব হয়। সেটা দ্রুত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে পরিণত হয়।

ঝগড়াটা কী নিয়ে হয়েছিল?

ছেলেমানুষি ব্যাপার। অবশ্য তখন আমরা তো ছেলেমানুষই ছিলাম। আমাদের একটা প্রাচীর পত্রিকা বেরোত। পবিত্র সেন নামে একটি ছেলে হাতে লিখে পনেরো দিন পর পর সেটা আমাদের ক্লাসরুমের করিডরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিত! সেটা সবাই খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তও। তাতে আমি স্বপ্ন নামে একটা কবিতা লিখেছিলাম। স্বপ্না সেটা পড়ে ভীষণ চটে যায়। তার ধারণা হয়েছিল ওটা ওকে নিয়ে লেখা এবং তাই নিয়ে ঝগড়া। রেগে গিয়ে স্বপ্না অধ্যাপকের কাছেও নালিশ করেছিল। যাই হোক, শেষ অবধি মিটমাট হয় এবং ভাবও হয়।

তারপর?

তারপর যা হয় আর কী। কফি হাউস, ময়দান, সিনেমা আর থিয়েটার, আর্ট এগজিবিশন এইসব করে বেড়াতাম দুজনে।

কোনও ফিজিক্যাল সম্পর্ক?

আরে না মশাই, না, দশ-বারো বছর আগে আমাদের নীতিবোধ খানিকটা অবশিষ্ট ছিল। আর আমার মনে হয়, স্বপ্না কোনওদিনই আমাকে সিরিয়াসলি নেয়নি, বড়লোকের মেয়ে এবং বেশ বুদ্ধিমতী, সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে আমি হচ্ছি তার স্টপ গ্যাপ কম্প্যানিয়ন। যথারীতি এমএ পরীক্ষার পরেই সে দুঃখপ্রকাশ করে ভোকাট্টা হয়ে যায়। এখন সে সুইজারল্যান্ডে এক সফল একজিকিউটিভের ঘর করছে। আর সেই প্রেম থেকে বুরবক আমি লাভ করলাম একটা সেকেন্ড ক্লাস এবং খানিকটা তিক্ততা। কিন্তু আপনার তদন্তে স্বপ্নাকে কেন প্রয়োজন হচ্ছে সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।

হয়তো পরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে, আপাতত আমি আপনাকে এরকম কিছু কিছু প্রশ্ন করেই যাব।

কিন্তু কেন?

আপনার সাইকোলজিটা বুঝবার জন্য। স্বপ্নার রিফিউজালের ব্যাপারটা আপনি এখন যেমন ক্যাজুয়ালি বললেন তখনও কি ঠিক এরকম ক্যাজুয়ালি ব্যাপারটা নিয়েছিলেন?

না মশাই, তখন আমার বয়স কম, হৃদয় ভরা আবেগ। তখন তো পাগল হয়ে যেতে বসেছিলাম। মরার কথাও ভেবেছি। মদ খেয়ে দেবদাস হওয়ারও চেষ্টা করেছি। স্বপ্নাকে ছাড়া কী করে বেঁচে থাকব সেটাই তখন প্রশ্ন ছিল।

প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেননি?

হ্যাঁ, তাও ভেবেছি বইকী।

কীরকম প্রতিশোধ? খুন করাটরা?

হ্যাঁ, সে কথাও এক-আধবার মনে হয়েছিল। কিন্তু বেসিক্যালি আমি একজন ভিতু মানুষ। ওসব চিন্তা করতে পারি না। ওরকম ইচ্ছা হলেও পরে তার জন্যে অনুতাপ

হয়।

আপনার কি মনে হয় আপনি খুন করতে অপারগ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। একজন ছটফটে জ্যান্ত মানুষকে খুন করার কথা আমার তো কখনও মনে হয়নি। আমি কোনও ভয়ানক দৃশ্য বা ঘটনা সহ্য করতে পারি না। রক্তপাত দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি।

ঠিক এক মাস আগে বালিগঞ্জ প্লেসে নেহা মজুমদার নামে একটি মেয়ে খুন হয়। পত্র পত্রিকায় তার মৃত্যুর খবর ছাপাও হয়েছিল। মাত্র একুশ বছর বয়স, অত্যন্ত সুন্দরী, মোটামুটি বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, স্মার্ট এবং হবু ফিল্ম স্টার এই মেয়েটির সবে বিয়ে হয়েছিল। হাজব্যান্ড অত্যন্ত প্রসপারাস আইটি ম্যান। বছরে ছয় মাস তাকে বিদেশে থাকতে হয়। বিয়ের পর মাত্র এক বছরের মধ্যেই এই ঘটনা।

সবই জানি। নেহা আমার ছাত্রী ছিল। নেহার মৃত্যুর পর লোকাল পুলিশও আমার কাছে আসে। বোধহয় নেহার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে যে রসালো গল্পটি প্রচলিত আছে তার জন্যই আমাকে জেরা করা হচ্ছে।

রসালো গল্পটা প্রচলিত হল কেন নিরুপমবাবু?

তা কী করে বলব বলুন। লোকে কাদা ভালবাসে। বেশিরভাগ লোকেই তো নিষ্কর্মা, অ্যান্ড আইডল ব্রেন ইজ ডেভিল’স ওয়ার্কশপ।

আপনার ডিভোর্স কতদিন হয়েছে?

ডিভোর্সের রায় এখনও বেরোয়নি। তবে আমার স্ত্রী ডিভোর্স পেয়ে যাবে। মামলা স্ট্রং, আইন তো এখন মেয়েদের পক্ষেই।

মামলায় আপনার উকিল কি আপনি ছিলেন?

না। বরং উলটো। আমার বউ যখন ডিভোর্সের প্রস্তাব দিল তখন আমিই ওকে বলি, কোন কোন পয়েন্টে মামলা করলে ডিভোর্স তাড়াতাড়ি পাবে।

কেন, ডিভোর্সটা কি আপনার কাছেও প্রার্থিত ছিল?

ছিল। যে সম্পর্কটা নেই, তাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে কী লাভ? আমার স্ত্রীর বয়স কম, গানবাজনায় উন্নতি করতে চায়, নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, আমার মতো নীরস লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তার জীবনটা তো নষ্টই হচ্ছিল। আমার বীথিকার জন্যে দুঃখই হয়। আমি ওকে কী দিতে পারতাম বলুন! আমার যথেষ্ট টাকাপয়সা নেই, আমি রূপবান নই, আজকালকার পুরুষদের মতো যথেষ্ট স্মার্ট আর চটপটে নই, আমার ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। উপরন্তু আমি গানের সমঝদার নই, আমার স্ত্রীকে মাঝেমধ্যে রান্নাবান্নাও করতে হত। তার এরকম জীবন ভাল লাগার কথা নয়।

বীথিকাদেবী একজন বেশ নামী ভোকালিস্ট। খেয়াল, ঠুংরি আমিও ভাল বুঝি না। কিন্তু যারা বোঝে তারা বলে, মহিলার ভবিষ্যৎ আছে।

হ্যাঁ, আপনি ভুল শোনেননি। ইদানীং বিভিন্ন প্রেস্টিজিয়াস মিউজিক কনফারেন্সে সে পারফর্ম করছিল। বীথিকার উপার্জনও বেশ ভাল।

আপনার সঙ্গে বীথিকাদেবীর তো প্রেম করেই বিয়ে হয়, তাই না?

হ্যাঁ। নইলে বামুন কায়েতের এমনি বিয়ে এখনও এদেশে হয় না। বীথিকা কায়স্থ বলে আমার পরিবারে ওকে ঠিকমতো গ্রহণও করা হয়নি।

সেজন্যই কি আপনি আলাদা বাসা নিয়ে আছেন?

ঠিক তা নয়, আমার মা বাবা চাকদহে থাকেন। পার্টিশনের পর আমার দাদু ওখানেই বাড়ি করেন। সেই বাড়িতে বাবা আর কাকার পরিবার একসঙ্গে থাকে। অবশ্য পৃথগন্ন। হাঁড়ি আলাদা, বাড়িও বিভক্ত। ওখানে জায়গাও হয় না, আর আমার সুবিধেও হয় না। আমি কলকাতায় বহুকাল ধরেই আছি।

বীথিকাদেবীর সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় কীভাবে হয়?

সেটাও শোনা দরকার বুঝি?

কোনটা যে কখন দরকার হবে কিছুই বুঝি না।

বীথিকা ট্যালেন্টেড মেয়ে হলেও খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নয়। ওর বাবা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একজন অফিসার। ল্যান্ড রিফর্ম দপ্তরে। নদিয়ায় আমাদের কিছু

চাষের জমি ভেস্ট হয়ে যাওয়ায় বাবার নির্দেশে আমি রাইটার্সে যাতায়াত করেছিলাম কিছুদিন। তখনই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়, সেটা একটু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে আসে। আমি ব্যাচেলার শুনে উনি ওঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে একদিন খাইয়েছিলেন। ইনসিডেন্টালি ওঁদের দেশ আমাদের ফরিদপুর জেলাতেই। উনি আমার দাদুকে চিনতেনও। যাই হোক, ওঁদের বাড়িতেই বীথিকার সঙ্গে পরিচয়। শুনে হয়তো অবাক হবেন মাত্র ছয় মাসের পরিচয়েই আমরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই।

বীথিকাদেবীর বাড়ি থেকে আপত্তি ওঠেনি।

না, ওঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

কতদিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

তিন বছর কয়েক মাস।

নেহার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে যা রটেছে তা কি বীথিকাদেবী জানেন?

জানে।

ওটা নিয়ে অশান্তি হয়নি?

অশান্তি বিয়ের পর থেকেই চলছিল। স্ক্যান্ডালটা তাতে ইন্ধন দেয়।

আপনার বিয়ের আগে কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল কি?

আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি আমার সম্পর্কে খুব ভাল হোমওয়ার্ক করে এসেছেন। কাজেই আপনার কাছে হয়তো কিছু লুকোনোর চেষ্টা বৃথা।

হ্যাঁ। আমি ইম্পর্ট্যান্ট সাসপেক্টদের জেরা করার আগে হোমওয়ার্ক সেরে নিই।

সেটা টের পেয়েছি। আমার কোনও লিভ ইন গার্লফ্রেন্ড কখনও ছিল না। আমি কো এডুকেশনে পড়াই বলে কখনও কখনও বিভিন্ন ছাত্রীর সঙ্গে হয়তো একটু আধটু ইন্টিমেসি হয়েছে। কোনও গুরুতর ব্যাপার নয়।

বিয়ের আগে আপনি এই বাসায় একাই থাকতেন?

হ্যাঁ। ছোট এই বৈঠকখানা আর ভিতরে একটা বেশ বড় শোওয়ার ঘর, একটা কিচেন আর টয়লেট নিয়ে এই ফ্ল্যাটে আমি আছি বছর সাতেক। বইপত্রই আমার সাথি।

কাজের লোক?

আছে। ঠিকে। একজন প্রৌঢ়া। পুরনো লোক। সে-ই রেঁধেবেড়ে ঘরদোর সাফ করে দিয়ে যায়। চাবি তার কাছেই থাকে। খুব বিশ্বাসী।

এখনও আছে?

হ্যাঁ। অনেকটা মা-মাসির মতোই হয়ে গেছে।

বুঝেছি। ব্যাক টু বীথিকাদেবী।

আপনি কি বীথিকাকেও জেরা করেছেন?

না। তবে উনি আমার লিস্টে আছেন। খবর নিয়েছি, উনি দিল্লিতে একটা কনফারেন্সে গান গাইতে গেছেন।

হ্যাঁ। রাহুর ছায়া সরে গেছে। বীথিকা এখন আলো ছড়াচ্ছে।

আপনাদের কোনও সন্তান হয়নি।

না।

কেন?

সন্তানধারণের সময় বীথিকার ছিল না। গান নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আপনি তার জন্য কোনও জোরাজুরি করেননি?

না। সন্তানের জন্য তাড়া ছিল না। বীথিকার সময় হলে হবে–এরকমই ধরে নিয়েছিলাম।

এবার নেহা সেনের বিষয়ে দু-চারটি কথা।

শবরবাবু, লোকমুখে আপনি কী শুনেছেন জানি না, নেহার সঙ্গে কিন্তু আমার প্রেম ছিল না।

আপনারা একসঙ্গে খাজুরাহোতে একবার, অজন্তা ইলোরায় একবার এবং রাজগিরে আরও একবার এক্সকারশানে গিয়েছিলেন?

ওরকম তো যেতেই হয়। একসঙ্গে বলতে আমি আর নেহাই তো শুধু নয়, আরও একগাদা ছাত্রছাত্রী ছিল। এক্সকারশান মানে স্পট স্টাডি।

আপনাদের সম্পর্কটা ঠিক কীরকম ছিল?

তেমন কিছুই তো ছিল না মিস্টার দাশগুপ্ত। অধ্যাপনার কাজেও আমার প্রায় আট বছর কেটে গেল। হাজার কয়েক ছাত্রী পার করেছি। অধ্যাপকরা ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম শুরু করলে যে কুল পাওয়া যাবে না।

কথাটা খুব ঠিক। তবু এরকম ঘটনা তো ঘটেও যায়।

ঘটে না বলছি না। কিন্তু খুব কম। এতই কম যে ব্যাপারটা চিন্তার বিষয়ই নয়।

নেহার সঙ্গে তা হলে আপনার কিছুই ছিল না।

না। একটু বাস্তব সত্যগুলোকেও দেখুন মিস্টার দাশগুপ্ত। আমি বত্রিশ বছর বয়স্ক একজন মাঝারি মানের অধ্যাপক। ধুতি পাঞ্জাবি পরে ক্লাস নিই। আমার ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই। আমার মতো সাদামাটা মানুষের প্রতি নেহার কোনও দুর্বলতা থাকাটাই তো অবাস্তব। আর আমি নিজেও প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। অকারণ রোমান্স করতে গিয়ে পা পিছলে পড়বার মতো নির্বোধ নই।

সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু খটকাও যে একটা আছে।

কীসের খটকা?

নেহা আপনার প্রেমে নাই পড়তে পারে। কিন্তু আপনার দিক থেকে একতরফা প্রেম হতে তো বাধা নেই।

আপনি কি বলতে চান আমি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিবাহিতা ছাত্রীকে গলা টিপে মেরেছি? মেরে লাভটা কী হবে বলুন তো? এইজন্যই তো বোধহয় আপনি

জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বপ্নাকে খুন করার ইচ্ছা আমার হত কিনা। সে না হয় বয়স অল্প ছিল, আবেগ বেশি ছিল বলে এক-আধবার ওরকম ইচ্ছে হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু সে বয়সটা তো আমি ছাড়িয়ে এসেছি।

প্রেম কি এত লজিক মেনে হয়?

কম বয়সে লজিক থাকে না, কিন্তু অভিজ্ঞতার পর লজিক আসে। নেহাকে তার বিয়ের পর খুন করাটা কি লজিক্যাল ব্যাপার? নেহা অনেকদিন আগেই আমাকে তার বিয়ের কথা বলেছিল। আমি ওকে অভিনন্দন জানাই। বিয়ের নেমন্তন্নেও আমি গিয়েছিলাম। চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান। নেহার বাবা বোধহয় কোটি টাকার বেশি খরচ করেছিলেন।

তিনি এখন মেয়ের খুনের ব্যাপারে অপরাধীদের ধরার জন্য আরও কোটি টাকা খরচ করতে রাজি। উনি সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য অলরেডি আবেদন করেছেন। মন্ত্রী আমলাদের ধরেছেন। কলকাতার ছয়-সাতজন, প্রাইভেট ডিটেকটিভকেও আসরে নামিয়েছেন।

বাবা হিসেবে করতেই পারেন। বিশেষ করে উনি টাকাওয়ালা বাবা। কিন্তু নেহার মতো একটা ফুটফুটে মেয়েকে খুন করার একটা মোটিভ থাকবে তো। লোকাল থানা থেকে স্পষ্ট করে না হলেও এরকম একটা ইশারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ মশাই, আপনারা না গোয়েন্দা পুলিশ? ঘটে কি একটু বুদ্ধি থাকবে না আপনাদের? স্পষ্ট করে বলুন না, নেহাকে আমি খুন করতে যাব কেন?

শবর একটু হেসে বলল, প্রশ্ন তো আমি করব। আপনি নয়।

কিন্তু মশাই তাতে ব্যাপারটা একতরফা হয়ে যাবে না কি?

ঠিক আছে, তা হলে আপনিই বলুন নেহাকে কে খুন করতে পারে।

আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। নেহা কেমন জীবনযাপন করত, ব্যক্তিগত জীবনে ও কীরকম মেয়ে ছিল তা আমার জানা নেই। অনেক বয়ফ্রেন্ড ছিল জানি। অন্য কারণও থাকতে পারে। আমি কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তা করিনি। খবরটা পেয়ে খুব শকড হয়েছিলাম।

খবর পেয়ে কি আপনি ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন?

না, মার্ডার কেস, নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করছে ভেবে যাইনি। তবে ফোন করেছিলাম। খবর পেলাম ওর হাজব্যান্ড এখানে নেই, বাঙ্গালোরে গেছে। তাকে খবর দেওয়া হয়েছে, সেদিনই আসছে। নেহার বাবাও বিদেশে ছিলেন। তারও খবর পেয়ে সেদিনই আসার কথা।

এসব কথা কে বলল ফোনে?

বোধহয় কাজের মেয়েটেয়েই হবে।

নেহার হাজব্যান্ডকে আপনি চেনেন?

সামান্যই। বিয়ের রাতে পরিচয় হয়েছিল।

কীরকম লেগেছিল?

ভালই তো। চেহারা খুব হ্যান্ডসাম নয়, কিন্তু ঠিক আছে। শুভ্র দাশগুপ্ত খুবই ভাল চাকরি করে বলে শুনেছি। অবিশ্বাস্য নাকি তার বেতন এবং পৈতৃক সম্পত্তিও প্রচুর।

হ্যাঁ, আপনার ইনফর্মেশন নির্ভুল, শুভ দাশগুপ্ত খুবই ব্রাইট ইয়ং ম্যান। ইউ ডোন্ট ফিল জেলাস অ্যাবাউট হিম? ডু ইউ?

নিরুপম করুণ হেসে বলল, আপনারা আমাকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি। শুভ্র আইটি জিনিয়াস বলে আমার জেলাস হওয়ার কী আছে? আমি তো ও লাইনের লোক নই।

বুঝেছি। কিন্তু সামান্য একটা প্রবলেম আছে।

জানি। নেহার ডায়েরি।

হ্যাঁ।

ডায়েরিতে নেহা কী লিখে রেখেছে তা আমি জানি না। যে কেউ ব্যক্তিগত ডায়েরিতে যা খুশি লিখতে পারে। তার জন্য আমার কী দায় বলুন তো?

সে যে আপনার কথাই লিখেছে।

তাও শুনেছি এবং ভীষণ অবাক হয়েছি। আমি ওর ইতিহাসের অধ্যাপক, এ ছাড়া নেহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না।

ছিল নিরুপমবাবু। শেষ যে এক্সকারশনটায় আপনি নেহাকে রাজগিরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ট্রিপে নেহার যাওয়ার কথাই নয়। নেহা তখন পাশ করে বেরিয়ে গেছে।

আমি নেহাকে নিয়ে গেছি কে বলল? আর অধ্যাপক তো আমি একাই ছিলাম না, আরও দু’জন ছিল।

সব জানি। নেহার ওই গ্রুপে থাকার কথা নয়, তবু সে গেল কেমন করে এবং কেন?

ইজি। নেহা যেতে চেয়েছিল এবং নিজের সব খরচ নিজেই বিয়ার করেছিল বলে আপত্তি ওঠেনি।

কেন গিয়েছিল?

সিম্পল ইন্টারেস্ট, হয়তো রাজগির ওর প্রিয় জায়গা।

ঠিক আছে। মেনে নিচ্ছি। কিন্তু খিঁচ থেকে যাচ্ছে।

মুশকিলে ফেললেন। যাই হোক, আমি কারণটা জানি না।

কারণটা হয়তো আপনি।

অত সুন্দরী ধনীকন্যাকে যদি আকর্ষণ করে থাকি তা হলে তো সেটা সাংঘাতিক বাহাদুরি। তাই না? অ্যাম আই অ্যাট্রাক্টিভ? ডোন্ট লাই প্লিজ।

.

আপনি কি নেহা দাশগুপ্তকে চিনতেন?

না।

আপনার ঠিক নীচের ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন।

হ্যাঁ, শুনেছি।

কবে শুনেছেন?

উনি মার্ডার হওয়ার পর।

সেদিন আপনি কি এই ফ্ল্যাটে ছিলেন?

না। আমার কাজটা ঘুরে বেড়ানোর। আমি তখন মুম্বাইতে ছিলাম। তবে সেইদিন রাতেই ফিরে আসি।

আপনার কাজটা ঠিক কী ধরনের?

আমি একটা কালচারাল গ্রুপের সঙ্গে আছি।

ব্যান্ড মিউজিক?

হ্যাঁ।

বাংলা ব্যান্ড?

বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ। তা ছাড়া প্রয়োজনে অন্য ভাষাতেও আমরা প্রোগ্রাম করি।

এই ফ্ল্যাটে আপনি কতদিন আছেন?

আট মাসের একটু বেশি।

এই ফ্ল্যাটের মালিকের নাম বীরেন সানা। তার কাছ থেকে কি ফ্ল্যাটটা আপনি ভাড়া নিয়েছেন?

বলতে পারেন। উনি আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন।

তাতে ওঁর স্বার্থ কী?

জাস্ট আউট অব ফ্রেন্ডশিপ।

মিস্টার সানা একজন পয়সাওয়ালা লোক। বিরাট ব্যাবসা। তাই না?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে একজন পপ গায়িকার বন্ধুত্ব হল কী করে?

উনি আমাদের একজন প্যাট্রন।

আপনি কি কলকাতার মেয়ে মিস আহুজা?

না। কলকাতায় ছেলেবেলা থেকে আছি।

তার মানে কি কলকাতায় আপনারা সেটল করেছেন?

না। আমার বাবা এখানে চাকরি করতেন। আমরা ভাইবোনেরা এখানেই পড়াশোনা করেছি। এখানেই বড় হয়েছি। তারপর রিটায়ার করে বাবা দেশে ফিরে গেছেন। ভাইবোনরা স্ক্যাটার্ড। কলকাতায় আমার কোনও বাসা এখন আর নেই।

কিছু মনে করবেননা, আপনার রোজগার কেমন?

আই অ্যাম স্টিল স্ট্রাগলিং ফর আ ফুটহোল্ড। ব্যান্ড মিউজিক, পপ গান এখনও এ দেশে খুব পপুলার নয়, বাজারটা আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে।

তা হলে আপনার চলে কীসে?

চলে যায়। গানবাজনা নিয়ে থাকতেই আমি বেশি ভালবাসি।

মিস্টার সানার বয়স পঁয়তাল্লিশ বা ছেচল্লিশ। আপনার কত মিস আহুজা?

চব্বিশ। আর ইউ হিন্টিং সামথিং? হ্যাঁ

। মিস্টার সানার সঙ্গে আপনার কোনও রোমান্টিক?

ওসব বোগাস ব্যাপার। রোমান্টিক সম্পর্ক কিছু নেই। তবে টু বি ফ্র্যাঙ্ক, উই হ্যাভ সেক্সুয়াল রিলেশন।

তাই বলুন।

নইলে এত বড় ফ্ল্যাটটা উনি আমাকে ছেড়েই বা দেবেন কেন এবং আমার খরচপত্রই বা চালাবেন কেন?

উনি তো বিবাহিত?

হ্যাঁ। তিন ছেলেমেয়ের বাবা।

তা হলে এই রিলেশনটার কোনও ভবিষ্যৎ নেই?

না। অ্যাবসোলিউটলি নো।

এত খোলাখুলি বলার জন্য ধন্যবাদ।

লুকোনোর কিছু নেই তো।

ঘটনার দিন আপনি তা হলে মুম্বাইতে ছিলেন?

সেইদিনই আমি বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে আসি। ফ্লাইট লেট ছিল। ব্যাগেজ কালেক্ট করে বাড়ি আসতে অনেক রাত হয়ে যায়। প্রায় দশটা। এখানে এসে দেখি চারদিক থমথম করছে।

এই ফ্ল্যাটে আপনি একদম একা থাকেন?

হ্যাঁ, তবে মাঝে মাঝে মিস্টার সানা থাকেন। পার্টি হয়, আমাদের ব্যান্ডের রিহার্সালও হয় মাঝে মাঝে, তবে মোটামুটি একাই থাকি।

কাজের লোক নেই?

না। এই ফ্ল্যাটটা দু'হাজার স্কোয়ার ফুট। এই হলঘরটা ছাড়া বাকিটা ব্যবহার করা হয় না। আর আমি তো রাতটুকুই থাকি। তাই কাজের লোকটোক নেই। একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে মাঝে মাঝে হলঘরটা পরিষ্কার করে নিই, ব্যস।

রান্নাবান্না?

আমি বাইরেই খাই। ফোন করলে হোম সার্ভিস বাড়িতেও খাবার পাঠিয়ে দেয়। নো প্রবলেম। কিন্তু নেহা দাশগুপ্তর মার্ডারের ব্যাপারে আমার তো কিছুই জানা নেই। আমাকে ক্রস করছেন কেন মিস্টার দাশগুপ্ত? আর ইউ রিলেটেড টু হার? আপনিও দাশগুপ্ত, উনিও।

শবর দাশগুপ্ত মৃদু হেসে বলল, না। নেহা দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়তা ছিল না। আমি গোয়েন্দা পুলিশ, আমাদের সবরকম খোঁজখবর নিতে হয়। এখন একটা প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেবেন কি?

কেন দেব না?

নেহা দাশগুপ্তের স্বামী শুভ দাশগুপ্ত। আপনি কি তাকে চেনেন?

চিনি।

কীভাবে?

এই ফ্ল্যাট নিয়ে উনি একটা অবজেকশন দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে বেশ একটা খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

কীরকম?

অবশ্য উনি একা নন। আরও কয়েকজন রেসিডেন্ট জোট পাকিয়ে কমিটিকে অ্যালার্ট করেন। ওঁদের কমপ্লেন ছিল যে, এই ফ্ল্যাটে অবৈধ কাজটাজ হয়। গানবাজনার ফলে ডিস্টার্বেন্স হয়। কমিটি মিস্টার সানাকে ডেকে পাঠায়। খুব হইচই হয়েছিল।

এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

মাস চার-পাঁচ হবে। সেই মিটিং-এ আমাকেও ডেকে পাঠানো হয়।

আপনি কি সেখানে স্বীকার করেছিলেন যে, আপনার সঙ্গে মিস্টার সানার এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশন আছে।

না। তাতে মিস্টার সানা বিপদে পড়তেন। আমি বলেছিলাম যে আমি এই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকি।

কথাটা সবাই বিশ্বাস করেছিল কি?

না। খুব চেঁচামেচি হয়েছিল। শুভ্র দাশগুপ্ত সবচেয়ে বেশি হোস্টাইল ছিলেন।

ব্যাপারটা মিটল কীভাবে?

মেটেনি তো! বীরেন সানাকে বলা হয়েছে আমাকে সরিয়ে দিতে হবে। উনি রাজি হয়েছেন। কমিটি ছয় মাস সময় দিয়েছে।

শুভ্র দাশগুপ্তকে কি আপনি ওই একবারই দেখেছেন?

না। দু-চারবার দেখা হয়েছে।

কীভাবে?

লিফটে, কিংবা ল্যান্ডিং-এ।

শুধু দেখা?

হ্যাঁ।

কোনও কথা হত না?

ওই হাই বা হ্যালো।

উনি কি আপনার প্রতি আর হোস্টাইল ছিলেন না?

না।

সেটা কীভাবে হল? হাউ ডিড ইউ রিকনসাইল?

আমার ওপর পারসোনাল গ্রাজ তত ছিল না। মিস্টার সানার ওপর হয়তো ছিল। তা ছাড়া আমি চলে যাব বলেই হয়তো ওঁর আর রাগ ছিল না।

লোকটিকে আপনার কেমন লাগে?

কিছু খারাপ তো নয়।

এখন একটা কথা। আপনি এখানে যে জীবনযাপন করেন সেটা আপনার মা বাবা অনুমোদন করেন কি?

আমার মা একসময়ে বারসিঙ্গার ছিলেন। মেয়েদের পবিত্রতা নয়, ক্যারিয়ার এবং আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী। তাই মা তেমন তপত্তি করেন না। তিনি বলেন, ইফ আই অ্যাটেন সাকসেস তা হলে আর এসব কথা কেউ মনেও রাখবে না। সাকসেস হল আসল কথা, আর তার জন্য সবকিছুই করা যায়।

বাবারও তাই মত?

না। বাবা প্রাচীনপন্থী। তবে পিউরিটান নন। অ্যাপ্রুভ না করলেও কখনও জোর খাটাননি বা চেঁচামেচি করেননি। চুপচাপ থাকেন। আমার বাবা একজন শান্তিপ্রিয় ঠান্ডা মানুষ।

এবার শুভ্র দাশগুপ্তর কথায় আসা যাক। আপনার সঙ্গে তার হাই-হ্যালোর বেশি কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাই তো বলছেন?

হ্যাঁ।

শুভ্র দাশগুপ্ত মাঝেমাঝেই বাইরে যেতেন। অফিশিয়াল ট্যুর। মুম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, চণ্ডীগড়। আপনিও প্রায় ট্যুরে যান, তাই না?

হ্যাঁ।

এইসব টুরে কখনও কলকাতার বাইরে শুভ্রবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না তো!

একটু ভেবে বলুন।

ভাববার কী আছে বলুন।

মিস কামনা আহুজা, এ প্রশ্নটা শুনে আপনার মুখের ভাব একটু পালটে গেল কিন্তু।

আপনি কী মিন করছেন?

আপনি একজন অত্যন্ত অ্যাট্রাক্টিভ মহিলা। তার ওপর আপনি একজন বাডিং পপ সিঙ্গার, মুক্তমনা, বীরেন সানার সঙ্গে প্রকাশ্যেই অবৈধ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন। আপনার লুকোবার কিছু নেই বলছেন। তবু লুকোতে চাইছেন কেন?

আমি কিছু লুকোচ্ছি না।

লুকোচ্ছেন কামনাদেবী।

না। আপনি ভুল সন্দেহ করছেন।

তাই বুঝি?

ওকে। আপনি কলকাতার কোন কলেজে পড়তেন?

আমরা সব ভাইবোনই একই কলেজে পড়েছি।

সেটা কি…কলেজ?

হ্যাঁ।

আপনি কি আর্টসের ছাত্রী?

হ্যাঁ।

গ্র্যাজুয়েট?

হ্যাঁ। পরে আমি মাস্টার্সও করেছি।

নিরুপম লাহিড়ী কি আপনার মাস্টারমশাই?

হা, উনি ইতিহাস পড়াতেন।

আপনি কি জানেন যে নেহা দাশগুপ্তও ওই কলেজের ছাত্রী?

না। নেহা অন্য ব্যাচের হতে পারে।

তখন উনি নেহা মজুমদার ছিলেন।

না, চিনতাম না।

ভাল করে ভেবে বলছেন তো?

ব্যাচটা দেখলেই তো হয়।

ওসব দেখা হয়ে গেছে। আপনি নেহার পরের বছর পাশ করেন। সুতরাং আপনার ওকে চেনা উচিত। বিশেষ করে উনিও গানবাজনার লোক।

আমি কলেজ লাইফ থেকেই প্রোগ্রাম আর ট্যুর নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কলেজে কামাইও হত খুব, ফলে হয়তো নামটা কানে আসেনি।

রিগার্ডিং নিরুপম লাহিড়ী।

হিস্ট্রি প্রফেসর? তার সম্পর্কে কী বলতে হবে?

লোকটা কেমন?

তা কী করে জানব? আপনাকে তো বললাম আমি খুব নিয়মিত ক্লাস করতাম না।

বলেছেন, অথচ কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, আপনি কলেজের সোশ্যাল ফাংশনে গান গেয়েছেন। ইউনিয়নের অ্যাক্টিভিটিতেও ছিলেন। আপনার হিস্ট্রিতেও অনার্স ছিল, পরে আপনি অনার্স ছেড়ে দিয়ে পাশ কোর্সে পাশ করেন।

হ্যাঁ, এসব ইনফর্মেশন ঠিকই আছে।

নিরুপমবাবু সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না এটা কি হতে পারে?

কী জানব বলুন। ক্লাসে দেখা হত, এইমাত্র। উনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন, বেশ ভাল কণ্ঠস্বর, পড়াতেনও খুব ভাল।

ওঁর সম্পর্কে কোনও রটনা বা কানাঘুষো কানে আসেনি?

তেমন কিছু নয়।

উনি কি একটু মেয়ে-ঘেঁষা ছিলেন?

এবার কামনা একটু মৃদু হাসল, বলল, পুরুষেরা বেশিরভাগই তো তাই। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।

কিন্তু আমাদের ঘামাতে হচ্ছে। নেহা মজুমদারের সঙ্গে ওঁকে জড়িয়ে একটা রটনা আছে, শুনেছেন কি?

না।

একেবারেই না?

আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

কামনাদেবী, আপনি ঠিক মুখ খুলতে চাইছেন না। কেন বলুন তো?

দেখুন, আমি আমার স্ট্রাগল নিয়ে আছি। আমাকে কেরিয়ার তৈরি করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। আমার একটা অ্যামবিশন আছে। তার বাইরে আর কিছু নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় হয় না।

ওটা যুক্তি হল না, হল অজুহাত।

নিরুপমবাবু সম্পর্কে কোনও স্ক্যান্ডাল থাকলে তা কলেজে খোঁজ নিলেই তো জানা যাবে। হোয়াই আর ইউ গ্রিলিং মি?

নেহা কীভাবে খুন হয় আপনি জানেন কি?

টিভিতে সেই রাতেই খবরে ওটা দেখানো হয়েছে। পরদিন খবরের কাগজেও ফাস্ট পেজ-এ ছিল। দুপুরবেলা ফ্ল্যাটে ঢুকে কেউ ওকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে খুন করে।

পুলিশ আপনার কাছে আসেনি?

এসেছিল। আমি প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। ওঁরা স্টেটমেন্ট লিখে নিয়ে চলে গেছেন।

আপনি সেই রাতে একা এই ফ্ল্যাটে ছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার কি সত্যিই এই ফ্ল্যাটে নেহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি?

না। সবই তো আপনাকে বলেছি। আই অ্যাম এ ভেরি বিজি ওয়ার্কিং গার্ল। ফ্ল্যাটে আর কতক্ষণ থাকি? ফিরতে অনেক সময়ে মধ্যরাত হয়ে যায়।

আপনি কখনও চাকরি করেননি?

না, সেই অর্থে করিনি।

তার মানে?

বীরেন সানার ব্যাবসার ব্যাপারে আমি কিন্তু সাহায্য করি। তার জন্য আমাকে অবশ্য অফিসে যেতে হয় না। ওঁর একটা কম্পিউটার এখানে আছে। অন লাইন কিছু অফিস ওয়ার্ক করে দিই। সেইজন্য একটা অ্যালাউন্স পাই।

সেটা কত?

বারো হাজার টাকা।

খুব কম নয় তো? কীরকম কাজ? বে

শিরভাগই করেসপন্ডেস, সেক্রেটারিয়াল ওয়ার্ক।

সানা কি মাত্র বারো হাজার টাকাই দেয়?

কামনা ফের একটু হাসল, তা তো বলিনি, বারো হাজার টাকা একটা ফিক্সড অ্যালাউন্স। তা ছাড়া হি পেইজ মি।

এই জীবনযাপন করতে আপনার ভাল লাগে?

না। কিন্তু এটা তো জাস্ট একটা স্টেপিং স্টোন। দিস ইজ নট দি এন্ড অফ দি রোড। আমি যেদিন সাকসেস পাব সেদিন আর এসব উচ্ছবৃত্তি করব কেন? বীরেন সানার প্রতি আমার কোনও সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট তো নেই।

সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট তবে কার সঙ্গে আছে?

আমার কাজের সঙ্গে, আমার গানের সঙ্গে।

ব্যস?

হ্যাঁ।

কোনও পুরুষমানুষের সঙ্গে নেই?

প্রেমের কথা বলছেন তো! না, ওসব নেই। কম বয়সেই আমাকে শরীর কাজে লাগাতে হয়েছে। বীরেন সানা প্রথম নয়। আমাদের ব্যান্ডের যিনি টপ ম্যান তাকে খুশি করতে হয়েছিল। যাদের শরীর বিলোতে হয় তাদের প্রেম খুব সহজে আসে না।

এত সব দিয়ে যা পেয়েছেন তা কি আপনাকে খুশি করে?

না। আই হ্যাভ মাইলস টু গো। কিন্তু এই যে আপাতত আমি বেশ ভালভাবে বেঁচে আছি, টাকাপয়সার টানাটানি নেই এবং মোটামুটি একটা ব্রাইট ফিউচার দেখতে পাচ্ছি এটাও তো কম নয়।

আপনি কি শিয়োর যে একদিন আপনি খুব বড় পপ গায়িকা হবেন?

আমি তো তাই হতে চাই। না হতে পারলে হয়তো সুইসাইড করব।

আগেই সুইসাইডের কথা ভাবছেন কেন?

আমি প্ল্যান্ড লাইফে বিশ্বাস করি। তাই ওটাও ভেবে রেখেছি। কিন্তু তার আগে আমি আমার নিজের ব্যান্ড ক্রিয়েট করছি। আমার দলে কয়েকটা দারুণ ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়ে এসে গেছে। ব্যান্ড ক্রিয়েট করার জন্য অনেক টাকার দরকার। সেটাই প্রবলেম। আমি সেইজন্য টাকা জমাচ্ছি।

কত টাকার দরকার?

অনেক। মিউজিক্যাল হ্যান্ডস, ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা রিহার্সাল রুম এবং যোগাযোগ। ফান্ডা থাকলে ব্যান্ডকে লোকে ডাকবে কেন বলুন। ট্যালেন্টেড আর্টিস্টরা টাকাও তো অনেক চায়।

তা হলে ওটাই আপনার স্বপ্ন?

প্যাশন, ওটাই আমার প্যাশন।

.

এই ফ্ল্যাটে আপনি কতদিন আছেন?

এক বছরের ওপর।

এটা কি আপনার নিজের ফ্ল্যাট?

না। কোম্পানি লিজ।

আপনার বাড়ির লোকজন?

আমার বাবা-মা কানপুরে থাকেন। চার পুরুষের বাস। আমরা কানপুরের বাঙালি।

তা হলে তো আপনার বাংলা ভুলে যাওয়ার কথা।

হ্যাঁ, এখনও বাংলা লিখতে বা ভাল পড়তে পারি না। তবে মা কলকাতার মেয়ে বলে বলতে পারি।

আপনি কলকাতায় কি চাকরি করতেই এসেছেন?

হ্যাঁ। কানপুরে আমাদের মার্বেল পাথরের ব্যাবসা। সেটাও চার পুরুষের ব্যাবসা। বলতে গেলে আমিই প্রথম চাকরি করতে এসেছি।

কেন? ব্যাবসা ভাল লাগে না?

লাগে। হয়তো শেষ অবধি ব্যাবসাতেই ফিরে যাব। এখনও কিছু ভাবিনি।

কয় ভাইবোন?

আমি এক সন্তান। সেইজন্য কানপুরে ফিরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপনার মা বাবা কেউ আসেননি?

না। মা বাতে পঙ্গু। নড়াচড়াই করতে পারেন না। বাবাও খুব সুস্থ নন, হার্ট পেশেন্ট।

কানপুরে আপনাদের আর কে কে আছে?

অনেকে। চার পুরুষের বসবাস বলে আমাদের সেখানে জ্ঞাতিগুষ্টি অনেক।

একসঙ্গে থাকেন কি?

না। সবাই আলাদা।

নেহা মজুমদারের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয় কতদিন আগে?

এক বছর তিন মাস।

লাভ ম্যারেজ?

না। নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ।

আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন?

কানপুরেই। আইআইটি থেকে পাশ করে বেরোনোর পর বাঙ্গালোর, তারপর ক্যালিফোর্নিয়া।

সিলিকন ভ্যালি?

হ্যাঁ।

কলকাতায় আছেন কতদিন?

বছর দেড়েক।

শুনতে পাই কলকাতায় নাকি টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের প্রসপেক্ট খুব খারাপ। এখানে চাকরির স্কোপও কম বলে বদনাম আছে।

আমি গোটা কলকাতার কথা তো জানি না। তবে আমার কোম্পানি তো সল্ট লেকে বিরাট অফিস করেছে। কাজও তো ভালই হয়। তবে কলকাতা বেসড

হলেও আমাকে সারা ভারতবর্ষেই ঘুরে বেড়াতে হয়।

নেহা মজুমদারের সঙ্গে আপনার বিয়ে এবং সম্পর্কের কথা কিছু বলুন।

ওদের পদবি মজুমদার হলেও ওরা বদ্যি। আসল পদবি সেন। আমাদের ফ্যামিলিতে ওসব খুব মানা হয়। এখনও আমাদের ক্ল্যানে যত ছেলেমেয়ে আছে তাদের অধিকাংশেরই বিয়ে হয়েছে বাঙালি পরিবারে এবং সবর্ণে। নেহার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন আমার মামা জগৎ সেন।

কোন জগৎ সেন? ফিল্ম ডিরেক্টর?

হ্যাঁ। আমার মামাবাড়ি বাগবাজারে।

তারপর বলুন।

বলার কিছু নেই। উইদাউট এনি ফাঁস বিয়েটা হয়ে যায়।

বিয়ের পর নেহাকে স্টাডি করে কিছু বুঝতে পেরেছিলেন?

কী বুঝব? ঠিক কী ব্যাপারে জানতে চান বলুন?

নেহাকে আপনার কেমন মেয়ে বলে মনে হয়েছিল?

বড়লোকের মেয়েরা যেমন হয়।

আপনারাও তো বড়লোক।

সেটা অস্বীকার করছি না। তবে আমাদের পরিবারে সাহেবি কেতা নেই, একটু সাবেক বনেদি ব্যাপার আছে। যেমন এখনও আমাদের বাড়িতে পুজোআচ্চা হয়। আমাদের বাড়ির মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম করে। নেহাদের পরিবার অনেক বেশি আধুনিক।

আপনার সঙ্গে কি বনিবনা হত না?

না না, সেসব কিছু নয়। আমি সব পরিস্থিতিতেই অ্যাডজাস্ট করতে পারি। আমার কোনও অসুবিধা হত না।

আপনাদের মধ্যে ভাবসাব ছিল?

অভাবও কিছু ছিল না।

আপনারা হানিমুন করতে যাননি?

হ্যাঁ। হংকং।

আপনার প্রতি নেহার মনোভাব কীরকম ছিল? ওয়াজ শি ইন লাভ উইথ ইউ?

শুভ্র একটু হাসল। নেহার তো একটা কেরিয়ার ছিল। আপনি বোধহয় সেটা জানেন। শি ওয়াজ ভেরি বিজি ইন হার সোশ্যাল এনগেজমেন্ট। আর আমিও তো বড় একটা এক জায়গায় থাকতাম না। ট্যুরে যেতে হয়।

এইসব ট্যুরে কি নেহাও যেত?

খুব কম। হংকং থেকে ফেরার পর বোধহয় একবার দিল্লি আর একবার মুম্বাই গিয়েছিল। আমার সঙ্গে। তারপর আর যায়নি।

আপনি আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাই আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লাভ রিলেশনটা গ্রো করেছিল কি না।

প্রশ্নটা করেছেন বটে, কিন্তু এককথায় এর জবাব দেওয়া শক্ত। আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে।

সেটা বলুন।

আমার মনে হয় নেগোশিয়েটেড বা লাভ ম্যারেজ যাই হোক না কেন, বিয়ের পর দুজনে যদি দু'জনের জন্য কিছু না করে তা হলে ভালবাসাটা তৈরি হয় না। যেমন মেয়েরা রান্না করবে, ভাত বেড়ে দেবে, ঘরদোর সামলাবে, পুরুষেরা নেবে কেয়ার অ্যান্ড সিকিউরিটি। প্রেম তো শুধু আবেগ নয়,হার্ডশিপ। আমার মা-বাবার মধ্যে তো তাই দেখেছি।

নেহার মধ্যে আপনি আপনার মাকে খুঁজে পাননি তো?

সেটা সম্ভব নয়। নেহা অন্যরকম সোসাইটিতে মানুষ।

এবার মার্ডারের কথাটা।

আপনি তো জানেন, তখন আমি বাইরে ছিলাম।

কোথায়?

বাঙ্গালোর।

কীভাবে খবর পেলেন?

পুলিশ আমার মোবাইল ফোনে ঘটনাটা জানায়।

আপনার রিঅ্যাকশন?

ভেরি শকিং। এরকম তো ঘটবার কথা নয়। অবশ্য নেহার প্রি-ম্যারিটাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

আপনি কি জানেন যে, নেহা ডায়েরি লিখতেন?

না। নেহার সঙ্গে ইদানীং আমার একটু কম দেখা হচ্ছিল। মাত্র দিন দশেক আগে আমি এক মাস ট্যুরের পর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরেছি।

নেহাকে নিয়ে যাননি কেন?

বিয়ের আগে ও বার দুই আমেরিকা ঘুরে এসেছে। ইউরোপ টুর করেছে। আমি এবার ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ও রাজি হয়নি। বলেছে, তুমি একাই যাও। আমেরিকা আমার ভাল লাগে না।

আপনার কি কখনও মনে হয়েছে, আপনার স্ত্রীর কোনও এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশন আছে?

না তো! সেরকম কিছু মনে হয়নি কখনও।

কখনও সন্দেহ হয়নি?

না। আমি সন্দেহপ্রবণ মানুষ নই। তবে একথাও স্বীকার করি, নেহার মতো মেয়ের ওরকম রিলেশন থাকা বিচিত্র নয়। ওরা তো পারমিসিভ সোসাইটির মেয়ে।

যদি জানতে পারতেন যে, আপনার স্ত্রীর প্রেমিক আছে তা হলে কী করতেন?

পরিস্থিতি বুঝে নেগোশিয়েট করতাম। অনেক সময়ে প্রেমটা হয়তো খুব হালকা ধরনের, সিরিয়াস নয়, কারও সঙ্গে সিরিয়াস প্রেম থাকলে নেহা আমাকে বিয়ে করতে যাবেই বা কেন? ওকে তো ধরেবেঁধে বিয়ে দেওয়া হয়নি। স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে।

খুনের ব্যাপারে আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

কাউকেই নয়। এ ব্যাপারটায় আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

এবার আর একটা প্রশ্ন।

বলুন।

কামনা আহুজা নামে কাউকে চেনেন?

হ্যাঁ। আমাদের ঠিক ওপরে থাকে।

কেমন আলাপ?

জাস্ট সুপারফিশিয়াল।

মেয়েটা কেমন বলে মনে হয়?

খুব বেশি কিছু তো জানি না। তবে মেয়েটা ট্র্যাপে পড়ে একজনের উপপত্নী হিসেবে এখানে থাকে। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। মেয়েটা মুচলেকা দিয়েছে চলে যাবে বলে।

মেয়েটি কী করে তা জানেন?

শুনেছি পপ সিঙ্গার।

আপনার সঙ্গে তার কি ইদানীং কিছু ইন্টিমেসি হয়েছিল?

হোয়াট ডু ইউ মিন?

রাগ করার কিছু নেই। ফরগেট ইট। আপনি কি সরাসরি কলকাতা থেকে বাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন?

না। প্রথমে মুম্বাই, তারপর বাঙ্গালোর।

মুম্বাইতে কোথায় ছিলেন?

আমি সবসময়ে তাজ-এ উঠি। কখনও সখনও সান অ্যান্ড স্যান্ডস-এ।

এবার কোথায় ছিলেন?

তাজ।

একা?

হোয়াট ডু ইউ মিন এগেন?

শুধু প্রশ্নটার জবাব দিলেই খুশি হব।

হ্যাঁ একা।

শুভ্রবাবু, আপনি কি অধ্যাপক নিরুপম লাহিড়ীকে চেনেন?

হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর কলেজের অধ্যাপক।

আপনার সঙ্গে কেমন আলাপ?

তেমন কিছু নয়। বিয়ের সময় আলাপ হয়েছিল।

মাত্র একবারের আলাপ। তাও বিয়ের আসরে?

হ্যাঁ। এত সামান্য আলাপে কাউকে মনে রাখা বেশ শক্ত।

তা ঠিক। তবে উনি মাঝে মাঝে ফোন করে কথা বলতেন।

আপনি কি জানেন যে ওঁর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর একটা স্ক্যান্ডাল আছে?

ঠিক জানি না। তবে আপনাকে তো বলেইছি নেহা পারমিসিভ সোসাইটির মেয়ে। আর দ্বিতীয় কথা, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে স্ক্যান্ডাল করাটা মানুষের একটা হ্যাবিট।

আপনি কি ব্যাপারটা বিশ্বাস করেননি?

এখন আর এই প্রশ্ন করে কী লাভ? শি ইজ বিয়ন্ড এভরিথিং।

আর একটা কথা।

বলুন না।

রিগার্ডিং কামনা আহুজা।

হ্যাঁ। কী জানতে চান?

কামনা কি কখনও আপনার সঙ্গে কলকাতার বাইরে দেখা করেছে?

সে কী? কামনা কেন দেখা করবে? মেয়েটার সঙ্গে আমার খুব সামান্যই চেনা। এসব কী বলছেন।

কতগুলো ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্যই প্রশ্ন করতে হয়। আপনি কি জানেন যে কামনা আহুজা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় একই সময়ে একই কলেজে পড়ত?

না তো। তবে তাতেই বা কী?

এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা পরস্পরের চেনা। অথচ কামনা বলছে সে নেহা মজুমদারকে চিনত না। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

হতেই পারে।

কামনা কি কখনও আপনার ফ্ল্যাটে আসেনি?

আমি তো জানি না। কখনও দেখিনি।

আপনি যখন বাইরে যেতেন অর্থাৎ ট্যুরে তখন নেহা কি এই ফ্ল্যাটেই থাকতেন?

সবসময়ে নয়। কখনও থাকত, কখনও বাপের বাড়ি যেত। এ বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না।

আপনার কাজের লোক নেই?

ডোমেস্টিক সারভেন্ট? হ্যাঁ, তা আছে। তবে আমি তাদের চিনি না। হোলটাইম কাউকে রাখা হত না বলেই জানি। এসব নেহার ডিপার্টমেন্ট। যতদূর শুনেছি সকালের দিকে একজন এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যেত।

ব্যস?

হ্যাঁ। আমাদের রান্নাবান্নার ঝামেলা ছিল না। কারণ আমি সকালে একটা সিরিয়াল খেয়ে বেরিয়ে যাই। নেহাও ব্রেকফাস্ট করত না, শুধু ফলের রস খেত। দুপুরে আমি অফিসে লাঞ্চ করতাম। নেহাও বাইরে কোথাও খেয়ে নিত।

রাত্রে?

ডিনার আমরা তো রোজই বাইরে করতাম। কখনও নেহা আর আমি একসঙ্গে। কখনও আলাদা। প্রায়ই কোথাও না কোথাও ডিনারের নেমন্তন্ন থাকতই। আমরা একেবারেই ইন্ডোর পিপল ছিলাম না।

ফ্যামিলি লাইফ ছিল না বলছেন?

অনেকটা তাই। ব্যাপারটা ভাল করে তৈরি হয়নি। হয়তো আরও কিছুদিন পর হত।

এরকম জীবনযাপন করতে কি ভাল লাগে?

তা বলিনি। কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়েও তো নিতে হবে। সকলের লাইফ স্টাইল তো একরকম নয়।

আমি জানতে চাই, আপনি এরকম সিস্টেম পছন্দ করতেন কিনা।

না মিস্টার দাশগুপ্ত। করতাম না।

তবু বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন?

সে তো অ্যাডজাস্ট করতেই হয়।

নেহার বাপের বাড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

খারাপ কিছু নয়। তবে প্রত্যেকেই ব্যস্ত বলে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। মাঝে মাঝে ওঁরা ডিনারে ডাকতেন।

নেহার মৃত্যুর পর সম্পর্কটা কীরকম দাঁড়িয়েছে?

এই তো মাত্র পঁচিশ দিন আগে নেহা মারা গেছে, এর মধ্যে আর সম্পর্কের কী বদল হবে?

আপনি কি জানেন যে, নেহার বাবা ইনভেস্টিগেশনের জন্য প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?

জানি। দু'জন আমার কাছে এসেছিল।

তারা কী বলছে?

কিছু প্রশ্ন করেছিল। আমি যা জানতাম বলেছি।

এবার নেহা সম্পর্কে কয়েকটা কথা।

বলুন।

নেহা কীরকম টাইপের মেয়ে? সেক্সি, কোল্ড, ক্রুয়েল বা অন্যরকম?

ফ্র্যাঙ্কলি নেহা সম্পর্কে আমি তেমন স্টাডি করার সময় পাইনি। শুধু বলি সি ওয়াজ এ বিট প্যাসিভ ইন সেক্স। মনে হত ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে না। মুডি একটু ছিল। ক্রুয়েল কিনা তা বলতে পারব না।

ওর কোন গুণটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করত?

অ্যাট্রাকশন? বলা মুশকিল। তবে আমি ওকে অপছন্দ করতাম না।

ও আপনাকে?

প্যাশনেট ছিল না, তবে আমাকে ঘেন্নাও করত না।

ঝগড়া হত?

কী নিয়ে?

এনিথিং।

না, ঝগড়াও তেমন হয়নি। মাঝেমধ্যে একটু আধটু অল্টারকেশন, দ্যাট মাচ।

মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি খুব আলগা উত্তর দিচ্ছেন।

তা হবে। কী বললে ভাল হয় তা বুঝতে পারছি না।

নেহার মৃত্যুতে আপনার কতখানি শক হয়েছে?

খুব।

কিন্তু আপনি ভেঙে পড়েননি।

না। লোকে বলে আমি শক্ত ধাতের মানুষ।

আপনার বয়স কত?

উনত্রিশ।

লাস্ট ট্রিপে আপনি মুম্বাইতে কতদিন ছিলেন?

চারদিন, না পাঁচদিন।

পাঁচ দিনই তাজ-এ ছিলেন?

হ্যাঁ।

বাঙ্গালোরে কতদিন?

দু’দিন। তারপরই নেহার খবর পেয়ে চলে আসতে হয়।

গত পঁচিশ দিনে আপনি কোনও ট্যুরে গেছেন কি?

হ্যাঁ। লাস্ট উইকে দিল্লি যেতে হয়েছিল।

কোথায় ছিলেন?

মেরিডিয়েনে।

কতদিন?

সাত দিন।

.

আপনি কে বলছেন?

আমি আমার নামটা বলতে চাইছি না।

কেন বলুন তো?

আপনি যদি কথা দেন আমাকে কোনও রকমের ঝামেলায় জড়াবেন না তা হলে বলতে পারি।

সেরকম কথা কি দেওয়া যায়?

আমি যে ভয় পাচ্ছি।

আপনাকে আমার ফোন নম্বর কে দিয়েছে?

আপনি নেহা মার্ডার কেস ইনভেসটিগেট করছেন জেনে আমি লালবাজারে ফোন করে আপনার লাইন পেলাম।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই মার্ডার কেসে আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেন কি?

তা জানি না। তবে আপনাকে দু-একটা ইনফর্মেশন দিতে পারি। সেগুলো আপনার কাজে লাগতেও পারে। আমি কামনা আহুজাকে চিনি।

কীরকম চেনেন?

ভালই চিনি।

এবার বলুন।

আমি আপনাকে যা বলব তা থেকে আপনি আমার আইডেন্টিটি ধরে ফেলবেন। আমাকে আগে কথা দিন যে, আপনি এই কেসে আমাকে ড্র্যাগ করবেন না।

কিন্তু

কথা না দিলে আমি লাইন কেটে দেব।

কথা দিলে যে কথা রাখব তার কি নিশ্চয়তা আছে?

আমি শুনেছি আপনি এক কথার মানুষ। এ ভেরি টাফ ম্যান, এ ভেরি স্টাবোর্ন ম্যান।

ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি।

আমি খুব কাছেই আছি। বিবাদী বাগে। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি আপনার দপ্তরে পৌঁছে যাব। আমার নাম জাহিরা। সিকিউরিটিকে বলে রাখবেন একটু।

ওকে।

ফোনটা রেখে শবর দাশগুপ্ত একটা কাগজে জাহিরা কথাটা লিখে রাখল। তারপর সিকিউরিটির লোককে ফোনে নামটা বলে দিল।

জাহিরা এল সাত মিনিটের মাথায়। একটু মোটাসোটা আহ্লাদি চেহারা। পরনে সবুজ রঙের শালোয়ার কামিজ, মাথার চুল বব করা, মুখে চোখে একটু উদ্বেগের ছাপ।

প্লিজ, আমি কিন্তু এক্সপোজও হতে চাই না মিস্টার দাশগুপ্ত।

ঠিক আছে। বলুন, আগে একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবেন কি?

না, আমি ওসব খাই না। দেখছেন না ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে জল আছে।

কাঁধের চামড়ার ব্যাগ থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল বের করে জল খেল জাহিরা। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। খুব ফরসা।

শবরের দিকে চেয়ে একটু নার্ভাস হাসি হেসে বলল, পরশু কামনার সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিল, আপনি ওকে পুছতাছ করেছেন।

হ্যাঁ।

আপনি ওকে কেন জেরা করেছেন মিস্টার দাশগুপ্ত?

উনি একজন নেবার বলে। ভিকটিমের নেবারদের জেরা করতেই হয়।

দেখুন, কামনা সম্পর্কেই আমি দু-একটা কথা বলতে চাই।

বলুন না।

আমি আর কামনা একই ব্যান্ডে আছি। আমি কম্পোজার।

তা হলে তো কামনাকে ভালই চেনেন?

হ্যাঁ।

কামনার সবই আমি জানি। ও বীরেন সানার সঙ্গে থাকে।

হ্যাঁ।

আপনি হয়তো জানেন না সি ইজ মিলকিং সানা। কামনা ওকে রেগুলার ব্ল্যাকমেল করে।

সেটাই স্বাভাবিক।

আমি অবশ্য একথাটাই বলবার জন্য আসিনি। গত মাসে বাইশ তারিখে আমরা মুম্বাই যাই। আমরা সাধারণত মুম্বাইতে সস্তা হোটেলে উঠি। কারণ আমাদের তেমন পয়সা নেই। আমাদের ব্যান্ড এখনও তেমন দাঁড়ায়নি। কিন্তু আমরা হোটেলে ওঠার পরই কামনা এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকবে বলে চলে যায়। কোথায় যায় তা আমরা জানি না। শুধু বলে গিয়েছিল মহালক্ষ্মীতে থাকবে।

তারপর?

অবশ্য প্রোগ্রামে ঠিকঠাকই চলে আসত। আমরা কিছু সন্দেহ করিনি। কিন্তু একদিন আমি ওকে হোটেল তাজ থেকে বেরোতে দেখি।

তাজ?

হ্যাঁ।

সঙ্গে কেউ ছিল?

না। ও বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ধরল দেখলাম।

আর কিছু?

হ্যাঁ। সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা সাধারণত ট্রেনেই ট্রাভেল করি। কারণ আমাদের পয়সা নেই। ট্রেনে এবং থ্রি টায়ারে। যেদিন আমাদের ফেরার ট্রেন ধরার কথা তার আগের দিন সকালে কামনা আমাদের হোটেলে এসে পিউ নামে একটা মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা প্লেনের টিকিট দিয়ে বলল, পরদিন বিকেলের ফ্লাইটে তার কলকাতায় ফেরার কথা কিন্তু সে কোনও বিশেষ কাজে সেদিনই চলে আসবে। তাই টিকিটটা নিয়ে পিউ যেন প্লেনে চলে যায়। ব্যাপারটা আমরা কেউ জানতাম না।

তা হলে কামনা আগের দিনই চলে এসেছিল?

তাই তো জানি। তবে আমি শিয়োর নই। এই ইনফর্মেশনটা দিয়ে কি আমি কোনও অন্যায় করলাম?

না। আপনাদের ব্যান্ডে অন্যরাও কি এটা জানে?

না। পিউ ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়। কারণ পিউকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলা হয়েছিল। পিউ আমাদের হঠাৎ বলল যে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। মহালক্ষ্মীতে কামনার আত্মীয়ের বাড়িতে দু'দিন গিয়ে থাকবে। ফলে ওর টিকিট ক্যানসেল করা হয়। পরদিন পিউ মালপত্র নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসার পর আফটার দি মার্ডার পিউয়ের বোধহয় একটু অস্বস্তি হতে থাকে। ও আমাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানায়।

আপনাকে কেন?

পিউ আমার খুব বন্ধু।

পিউকে কোথায় পাওয়া যাবে?

সে ভীষণ ভিতু মেয়ে। আমি ওকে বলেছিলাম পুলিশকে জানাতে। শুনে ওর মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নো প্রবলেম। ও বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর মোবাইল ফোনের নম্বর দিচ্ছি। ডায়াল করলে চলে আসবে।

শবর ডায়াল করে বলল, কোনও ভয় নেই, চলে আসুন।

খুব শীর্ণ গলায় পিউ বলল, আসব?

হ্যাঁ।

.

আপনার স্টেটমেন্ট আপনি নিজেই সংশোধন করবেন কি কামনাদেবী?

তার মানে?

মানে খুব সহজ ও সরল। আপনি আমার কাছে যা বলেছেন তার সব সত্যি নয়।

আমি তো সত্যিই বলেছি।

শুভ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে আপনার কতকালের সম্পর্ক?

কামনা চুপ

আপনি না বললেও আমরা তো জানবই। খামোখা পুলিশের টর্চার সহ্য করবেন কেন? আমাদের মেয়ে পুলিশ যথেষ্ট ট্রেনড।

বেশি দিনের নয়।

কতদিনের?

ছয়-সাত মাস।

আর ইউ ইন লাভ?

হ্যাঁ। শুভ্রকে তো নেহা কিছুই দেয়নি।

আপনি দিয়েছেন?

শুভ্রকে আমি সব দিয়েছি। একটা মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষকে যা যা দেওয়া সম্ভব।

শুভ্রবাবু আপনাকে কী দিয়েছেন?

সব।

নেহা কি বাধা দিয়েছিল?

নেহা ওয়াজ আ বিচ।

দোষটা কী?

দোষ? খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমি তো খারাপ, বড়লোকের কেপট হয়ে আছি। কিন্তু সেটা পেটের দায়ে, কেরিয়ারের দায়ে। আর নেহা যা করত তা স্বেচ্ছাচার, শুভ্র বাইরে গেলে ও ওর ওই প্রফেসর নিরুপম লাহিড়ী থেকে শুরু করে এক-একদিন এক একজনের সঙ্গে মেলামেশা করত।

কিন্তু শুভ্রবাবু বলেন উনি নাকি সেক্সি ছিলেন না।

শুভ্র ঠিকই বলে, সি ডিজলাইকড শুভ্র। তাই ফ্রিজিডনেসের ভান করত। আপনি নেহাকে খুব সামান্যই চেনেন।

আপনি মুম্বাইতে শুভ্রবাবুর সঙ্গে তাজ-এ ছিলেন?

ছিলাম।

আর কোথাও?

মোট তিনবার আমরা বাইরে থেকেছি। তিন-চারদিন করে।

এই ফ্ল্যাটে?

কখনও সখনও। আই লাভ হিম।

নেহাকে মারতে হল কেন?

নেহাকে আমি মেরেছি কে বলল। কোনও প্রমাণ আছে?

না।

তা হলে বলছেন কেন?

প্রমাণ পাওয়া যাবে। আপনি স্বীকার না করলে আমার পরিশ্রম বাড়বে, এই যা।

পরিশ্রম করুন। বিনা পরিশ্রমে কেস সলভ হবে বলে ভাবছেন কেন?

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি সাজেশন, পরিশ্রম আমি করব সন্দেহ নেই, কিন্তু যতদিন সলভ না হচ্ছে ততদিন যে আপনাকে পুলিশ কাস্টডিতে থাকতে হবে।

আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন?

অবশ্যই।

শুনুন, নেহার মরা উচিত ছিল, তাই মরেছে, ড্রপ দি কেস।

আমি মনে করি না যে কারও মরা উচিত। আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।

আমি ওকে মারিনি।

কে মেরেছে?

আমি জানি না। জানার কথা নয়।

যদি না বলেন তা হলে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে চার্জ দেবে। শুভ্রবাবুও ফেঁসে যাবেন। দু'জনকেই চালান দেওয়া হবে। বলুন।

কলকাতায় ভরদুপুরে কত ফ্ল্যাটেই তো ডাকাতি হয়, খুন হয়। হয় না?

হা হয়।

এটা তো সেরকম হতে পারে। আপনারা এই অ্যাঙ্গেলটা ভেবেছেন?

লোকাল পুলিশ ভেবেছে, আমাকেও কি তাই ভাবতে বলেন?

হ্যাঁ। কলকাতার পুলিশ তো কত কেসই সলভ করতে পারে না। কত খুনি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, আপনিও কি বিশ্বাস করেন যে, নেহাকে ডাকাতের হাতে মরতে হয়েছে।

করি।

তা হলে আমার কিছু করার থাকবে না। আপনাকে চালান দেওয়া ছাড়া।

কেন, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণের জন্য ব্যস্ত হবেন না।

নেহার বাবা আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছে, না? নইলে পুলিশ এত অ্যাকটিভ হয় না। আপনারা তো করাপ্টেড। সবাই জানে।

খুব মিথ্যে বলেননি। এই সমাজে সর্বস্তরেই করাপশন। কিন্তু সেটা ভেবে সান্ত্বনা পাবেন না। ব্যাপক করাপশনের মধ্যেও দু’-একজন থাকে যারা ইনকরাপটিবল।

আপনি কি তাদের একজন?

কী মনে হয়?

আপনার মতো লোককে আমি ভালই চিনি। নিজেকে আপনি যত খুশি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিন না কেন, আপনি যে নেহার খুনিকে ধরার জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছেন সেটা নিশ্চয়ই বিনা স্বার্থে নয়। শুধু মাইনের টাকায় এত ডেডিকেশন আসে না। মিস্টার পুলিশ, আপনাদের চরিত্র আমার জানা আছে।

জেনেই যখন গেছেন তখন কী আর করা যাবে। আর একথাও ঠিক যে নেহার খুনিকে ধরার জন্য আমি শেষ অবধি যাব।

ঠিক আছে মিস্টার পুলিশ। নেহার খুনিকে কষ্ট করে তবে আপনিই ধরুন। আপনার পরিশ্রম বাঁচাতে তার নাম আমি আপনাকে বলতে যাব না। আর আমি জানিও না, নেহাকে কে খুন করেছে।

আমার পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য নয়, আপনাদের হ্যারাসমেন্ট থেকে বাঁচানোর জন্যই নামটা বলে দেওয়া ভাল।

আই অ্যাম স্যরি মিস্টার দাশগুপ্ত। আপনি আমাকে বারবার ভয় দেখিয়ে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন। আর সেটাই প্রমাণ করে যে আপনি ডিটেকশন করতে জানেন না। গোয়েন্দা পুলিশের কী দুরবস্থা হয়েছে তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে নিজেই খুনিকে খুঁজে বের করুন। আমাকে ডিস্টার্ব করছেন কেন?

এরকম কথার থাপ্পড় বহুকাল খায়নি শবর দাশগুপ্ত। সে মনে মনে মেয়েটিকে বাহবা দিল। মুখে একটু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি আজ যাচ্ছি। পরে হয়তো আবার আসব।

সেটা আপনার খুশি। মানুষকে অকারণে উৎপাত করার লাইসেন্স তো পুলিশের আছেই।

শবর বেরিয়ে এল, লিফট নিল না। সিঁড়ি বেয়ে একটা ফ্লোর নেমে এসে শুভ দাশগুপ্তর দরজার বেল টিপল, বেল অনেকক্ষণ বেজে গেল। কেউ দরজা খুলল না।

ঘড়িটা দেখল শবর। রাত প্রায় দশটা বাজে। এ সময়ে শুভ্র দাশগুপ্তের ফেরার সম্ভাবনা কম। হয়তো ডিনার আছে। হয়তো আর কিছু।

ভাবতে ভাবতে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল শবর। নেহাকে মারা হয়েছিল গলায় ফাঁস দিয়ে। সিল্কের কর্ড। গলায় সিল্কের ফাঁসও পাওয়া গেছে। ঘরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ নেহা সহজে মরতে চায়নি। কাজটা মেয়ে বা পুরুষ যে কেউ করে থাকতে পারে। নেহার পিঠে একটা চটিজুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। খুনি ফাঁসটা ভাল করে টানার জন্য ওকে উপুড় করে ফেলে পিঠে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল। চটির ছাপে কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। খাঁজহীন ছাপ। কোলাপুরি বা চামড়ার সোলের চটি। পুলিশ কুকুর ঘরের মধ্যে ঘুরে লিফট অবধি যায়। নীচে নেমে ফটক অবধি গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দারোয়ানরা কোনও হদিশ দিতে পারেনি। কারণ, দশতলা এই বাড়ির প্রথম চারটে তলায় বেশ কয়েকটা অফিস আছে। প্রচুর লোকের যাতায়াত। দারোয়ানরা কার্যত নিষ্কর্মা বসে থাকে। পুলিশ কুকুর একবারও ওপরের তলায় কামনা আহুজার ফ্ল্যাটে যায়নি।

মোটিভ নিয়ে ভেবেছে শবর। নেহাকে খুন করার জোরালো মোটিভ ভেবে পায়নি। তবে হ্যাঁ, নেহা যে জীবন যাপন করত তাতে হিংসা, ব্যর্থ প্রেম, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ অনেকের অনেকরকম মোটিভ থাকতে পারে। পুলিশের একটা থিয়োরি আছে। কোনও গৃহবধু খুন হলে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে তার স্বামীই অপরাধী। শুভ্রর মোটিভও আছে, কিন্তু ঘটনার সময়ে সে ছিল বাঙ্গালোরে। ভাড়াটে খুনিকে লাগালেও এতদিনে কি একটা গন্ধ অন্তত পাওয়া যেত না? সুতরাং নেহা-হত্যার ধাঁধাটা কাটছে না। শেষ অবধি ব্যর্থ হলে ফের খবরের কাগজে লেখালেখি হবে। যেমনটা রোজই হচ্ছে।

আরও লজ্জায় পড়তে হবে যদি প্রাইভেট গোয়েন্দাদের কেউ রহস্যের সমাধান করে ফেলে, কিংবা সত্যিই যদি সিবিআই নামে। যদিও সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

লিফট নামছিল। দরজা খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে শবর দেখল কামনা দাঁড়িয়ে।

এই যে ম্যাডাম। এত রাতে কোথায় চললেন?

যেখানে আমার খুশি।

সে তো বটেই। তা খুশির জায়গা কোথায়?

এটাও কি তদন্তের মধ্যে পড়ে?

অবশ্যই।

তা হলে আমাকে ফলো করতে হয় আপনার।

শবর হাসল, আপনাকে ফলো করা হয় না বলে মনে করেন নাকি?

একটু অবাক হয়ে কামনা বলল, ফলো করা হয়?

নিশ্চয়ই। আপনি যেখানেই যাবেন আপনার পিছনে আমাদের লোক সবসময়েই ফলো করবে।

সত্যি বলছেন? আপনারা তো ক্রিমিন্যাল।

যা বলেন।

আমি বিশ্বাস করি না।

না করলে করবেন না।

বলুন কাল রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলাম?

ইজি, কাল এবং পরশু দু'দিনই আপনি পার্ক স্ট্রিটে বার-এ গিয়েছিলেন। পরশু রাত আটটা থেকে বারোটা। কাল রাত নটা থেকে সাড়ে দশটা। পরশু আপনি শ্যাম্পেন খেয়েছিলেন। কুণাল সরকার আর শ্যামলী বরাটের সঙ্গে। কাল...

মাই গড!

অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজও আপনাকে ফলো করা হবে।

ইউ বাস্টার্ড!

বটেই তো। পুলিশ খুব খারাপ প্রজাতি। তবে মানুষের তাকে খুব প্রয়োজনও হয় কখনও সখনও।

ল্যান্ডিং-এ লিফট থামতেই নেমে পড়ল শবর। কামনা নামল না।

নামবেন না?

না। আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাচ্ছি।

সেই ভাল।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি সাজেশন। গুড নাইট।

.

রাত বারোটা নাগাদ শবরের টেলিফোন বাজল।

বলুন।

আমি কামনা আহুজা বলছি।

বলুন ম্যাডাম।

আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

না।

অ্যাম আই ডিস্টার্বিং ইউ?

আরে না। বলুন না।

আপনি একবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে পারবেন?

এখন?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

আধঘণ্টা বাদে ফের মুখোমুখি কামনা আহুজা আর শবর দাশগুপ্ত।

মনে হচ্ছে আমি অকারণে বড্ড বেশি দায়িত্ব আর ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। আমি খেটে খাওয়া মানুষ। অকারণে কিছু কমপ্লিকেশনে জড়িয়ে পড়ার মানে হয় না। আর আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে, একজন আমাকে ফাঁসাতে চাইছে।

শবর চুপ করে চেয়ে রইল। প্রশ্ন করল না।

মুম্বাই থেকে কলকাতায় আসার প্ল্যান চেঞ্জ করা এবং এবং ঠিক তারিখে কলকাতায় পৌঁছানো এবং নিজের ফ্ল্যাটে ওইদিন দুপুরে অপেক্ষা করে থাকা সবই আমি একজনের নির্দেশে করেছিলাম। কয়েক ঘণ্টা আগেও তাকে আমি গম্ভীরভাবে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর করছি না।

শবর চুপ।

তার নাম কি আপনাকে বলতে পারি মিস্টার দাশগুপ্ত?

শবর মৃদু একটু হাসল, আপনি বলতে চাইলে বলবেন, বলেছি তো আপনি স্বীকারোক্তি করলে আমার পরিশ্রম বাঁচবে।

আপনি একজন অদ্ভুত মানুষ। এতদিন এত প্রশ্ন করলেন, অথচ যখন আমি কনফেস করতে চাইছি তখন আপনি নির্বিকার।

তার কারণ, নামটা আমি জানি। আপনাকে এই ঘটনার জন্য প্ল্যান্ট করা হয়েছিল।

সেটা আগে বুঝিনি। শুভ্র মুম্বাইতে তাজ হোটেলে আমাকে আমার মুভমেন্টের প্ল্যানটা বলে। কথা ছিল ওইদিন অর্থাৎ যেদিন মার্ডার হয় সেদিন দুপুরের আগেই সে বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসবে এবং বিকেলের ফ্লাইটে আমরা দুজনে সিঙ্গাপুর যাব। শুভ্র আসেনি। দুপুরে সে আমাকে ফোন করে জানায়, কাজে আটকা পড়েছে। রাতে ফিরবে। সিঙ্গাপুর যাওয়া একদিন পিছিয়ে যাবে। এসব

যখন ও বলেছে ঠিক সেই সময়ে বা হয়তো একটু আগে বা পরে নীচের তলায় খুন হয় নেহা।

ছকটা মিলে যাচ্ছে।

আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, আমার শুভ্রকে নিয়ে এখন অস্বস্তি হচ্ছে। অ্যাম আই ইন ডেনজার?

শুভ্র কি ফ্ল্যাটে আছে?

না। এখনও ফেরেনি। খুনটার জন্য আমি কি কোনওভাবে দায়ী?

না। খুন করেছে ভাড়াটে খুনি, টাকা খেয়ে, আপনি দায়ী কেন হবেন?

শুভ্রকে কি আপনারা অ্যারেস্ট করবেন? ও কেন আমাকে ফ্রেম করতে চেয়েছিল বলুন তো? আমাকে মার্ডার স্পটে অপেক্ষা করতে বলা এবং সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখানো, এসব কী বলুন তো?

আপনি অ্যারেস্টেড হয়ে গেলে শুভ্রবাবুকে নিয়ে পুলিশ আর মাথা ঘামাবে না।

তা হলে এখন আমি কী করব?

কাল সকালেই বীরেন সানার ফ্ল্যাট ছেড়ে কোনও বান্ধবীর বাড়িতে চলে যান। এ জায়গাটা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়।

আমার এখন শুভ্রকে বড্ড ভয় করছে।

লিভ এ ক্লিন লাইফ ম্যাডাম। ভয় কীসের?

ভরসা দিচ্ছেন?

দিচ্ছি। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে। গুড নাইট।

গুড নাইট।

শবর দাশগুপ্ত নীচের তলায় নেমে এসে শুভ্র দাশগুপ্তর দরজার বেল টিপল। কেউ দরজা খুলল না।

শবর পকেট থেকে একটা স্কেলিটন চাবি বের করে নিঃশব্দে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকার ঘরে একটা সোফায় বসল চুপ করে। অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

১. ভীষণ ভীষণ ঘেন্না

লোকটাকে আমি ভীষণ ভীষণ ঘেন্না করি।

কেন?

লোকটা একটা নরপশু।

ধারণাটা হল কেন?

কেন আবার! অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

আপনার সঙ্গে ওর বিবাহিত জীবন কতদিনের?

মাত্র সাত দিনের।

মাত্র সাত দিন বাদেই আপনি চলে আসেন?

বিয়ের, মানে ফুলশয্যার পরদিন সকালেই চলে আসার কথা। আসিনি। লোকলজ্জা বাধা হয়েছিল।

লোকটা আপনার ওপর ফিজিক্যাল টর্চার করেছিল কি?

মানে মারধর?

হ্যাঁ।

মারধরের চেয়ে অনেক বেশি।

আপনি কি বলতে চান লোকটার সেক্স একটু বেশি?

একটু বেশি? একটু বেশি বললে কিছুই বলা হয় না।

তা হলে খুব বেশি?

আমি আর কিছু বলতে চাই না। লজ্জার কথা এভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে লোকটা নরপশু, জেনে রাখুন।

বুঝলাম, আপনি তার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন।

হ্যাঁ। আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।

এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

দেড় বছর।

এই দেড় বছরের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি?

ওর সঙ্গে নয়। তবে ওর বাড়ির কেউ কেউ আমার কাছে আজও আসে, খোঁজখবর নেয়। তারা আমার জন্য দুঃখিত।

লোকটির সঙ্গে আপনার শেষ দেখা তা হলে দেড় বছর আগে?

হ্যাঁ।

আপনি ডিভোর্সের মামলা করেননি?

না।

কেন?

ডিভোর্স করেই বা কী হবে বলুন। আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না।

তাই বা কেন?

একবারের অভিজ্ঞতায় আমি এত আতঙ্কিত যে আর ও কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।

আপনি কি ভজনবাবুর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পান?

হ্যাঁ পাই। ওর বাড়ির লোকেরা খারাপ নয়, তারাই একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মাসে মাসে টাকা দিয়ে যায়।

ভজনবাবু নিজেই আসেন টাকা দিতে?

না না। তার অত সাহস নেই। আসে ওর ছোটভাই পূজন।।

আপনি তো চাকরি করেন।

করি।

কোথায়?

আলফা নেটওয়ার্ক-এর মার্কেটিং ডিভিশনে।

সেটা কেমন চাকরি?

ভালই। আমি একজন একজিকিউটিভ।

তা হলে ভজনবাবুর সাহায্য না হলেও চলে?

কেন চলবে না?

আপনার বাপের বাড়ির অবস্থাও তো ভালই দেখছি।

খারাপ নয়। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার, সুরেন্কা ইন্ডাস্ট্রিজের ওয়ার্কস ডিরেক্টর। আমার দাদা আমেরিকায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

ভজনবাবুর সাহায্য তবু আপনি নেন?

কেন নেব না? সে আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছে। তার কিছু ক্ষতিপূরণ তো ওকে করতে হবে।

তা তো বটেই। এবার একটা ডেলিকেট প্রশ্ন।

বলুন।

ইজ হি ক্যাপেবল অফ মার্ডার?

তা কী করে বলব? আমার সঙ্গে পরিচয় তো সামান্য।

আপনি তো ওকে নরপশু বললেন।

তা তো বলেইছি।

আপনার কি মনে হয় লোকটা খুব হিংস্র?

অন্তত একটা ব্যাপারে তো তাই।

একটা ব্যাপার থেকেও তো কিছু আন্দাজ করা যায়।

এবার আমাকে একটু মুশকিলে ফেলেছেন।

কেন বলুন তো।

লোকটাকে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ মনে হয়।

সেটা কেমন?

এমনিতে চুপচাপ, মাথা নিচু করে থাকে।

তাতে কি নিরীহ বলে প্রমাণ হয়?

না। তা হয় না।

তা হলে?

ফুলশয্যার পরদিন সকালে আমার অবস্থা দেখে ওর এক বোন সব কথা বাড়ির লোককে বলে দেয়। ওর বাড়ির লোক ওকে খুব বকাঝকা করেছিল। লোকটা খুব যেন অপরাধবোধে কাতর হয়েছিল। তবে সেটা অভিনয়ও হতে পারে।

আমার জানা দরকার লোকটা খুনটুন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে কি না।

তা জানি না।

এবার একটা কথা বলি।

বলুন।

খুন সবাই করতে পারে না। খুন করার জন্য একটু আলাদা এলেম দরকার হয়। এক ধরনের মানসিকতার।

তা হবে।

এ লোকটার সেই মানসিকতা আছে কি না। আমি সেইটে জানার চেষ্টা করছি।

বলেছি তো, লোকটাকে আমি ভাল করে চিনি না।

একটা কথা।

বলুন।

আপনি একজন শিক্ষিতা মহিলা, আপনার পরিবারও বেশ কালচার্ড। আপনি ভজনবাবুর মতো একজন গ্যারেজ মালিককে বিয়ে করলেন কেন?

গ্যারেজ মালিক হলেও ভজন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। একসময়ে ভাল মোটর তৈরির কারখানায় কাজ করত। তারপর নিজে স্বাধীনভাবে ব্যাবসা শুরু করে। শুনেছি। ওর গ্যারেজে নতুন ডিজাইনের দু-তিনটে গাড়ি তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করেছে।

শুধু সেই কারণ?

আমার বাবা স্বাধীনচিত্ত পুরুষকে খুব পছন্দ করেন।

শুধু প্রফেশনের দিকটা ছাড়া আপনারা আর কিছু দেখেননি?

এটা নেগোসিয়েটেড ম্যারেজ ছিল। আমি বাবার মতে মত দিয়েছিলাম মাত্র। লোকটার যেসব বিবরণ পেয়েছিলাম তাতে খারাপ লাগেনি।

বিয়ের আগে আপনারা পরস্পরকে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার পছন্দ হয়েছিল?

চেহারাটা খারাপ লাগেনি। বিনয়ী ভাবাটাও তো ভালই মনে হয়েছিল।

ওঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে সে তো জানেন।...

হ্যাঁ।

আপনি ওঁর মোটর গ্যারেজে কখনও গেছেন?

না। যাওয়ার মতো সময় তো পাইনি। বিয়ের পরই তো চলে এলাম।

কারখানাটা কোথায় তা জানেন?

শুনেছি, কলকাতার বাইরে বারাসাতের কাছে কোথায় যেন।

হ্যাঁ। খুনের ডিটেলসটা জানেন কি?

না। শুনেছি। একটি মেয়ে খুন হয়েছে।

হ্যাঁ। তার আগে একটা প্রশ্ন।

বলুন।

আপনি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার পর পুলিশে ভজনবাবুর বিরুদ্ধে একটা ডায়েরি করেন।

হ্যাঁ, রাগের মাথায় করেছিলাম।

তাতে কি ওর সেক্সচুয়াল ব্রুটালিটির উল্লেখ ছিল?

ছিল। কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে ডায়েরি করেছিলাম। পরে কেলেঙ্কারির ভয়ে উইথড্র করি।

হ্যাঁ, আমরা তা জানি। পুলিশ ভজনবাবুকে ধরেও আপনার বাবার অনুরোধে এক রাত্তির পরেই ছেড়ে দেয়।

আমরা পারিবারিক দুর্নামের ভয়ে এটা করি।

এই খুনের ঘটনার পর কি আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আপনার কাছে এসেছিল?

না!

খুনটা হয়েছে সাত দিন আগে। এর মধ্যে কেউ আসেনি?

পূজন মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু ঘনঘন নয়। গত সাত দিনে কেউ আসেনি।

এবার একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন।

বলুন।

লজ্জা পাবেন না তো!

লজ্জা পেলে জবাব দেব না।

ভেরি গুড।

প্রশ্নটা কী?

ভজনবাবু যে সেক্সচুয়াল ব্যাপারে স্যাডিস্ট গোছের মানুষ তা আপনার কথা থেকেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন, যার সেক্সচুয়াল আর্জ এত বেশি সে তো নিশ্চয়ই প্রস কোয়ার্টারে যায়।

এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

সমস্যা হল এরকম মানুষেরা নিজেদের সামলে সংযত রাখতে পারে না।

প্রস কোয়ার্টারে গেলে হয়তো যায়। আমি কী করে জানব বলুন।

কোনও হিন্ট পাননি?

ন।

সমস্যা হল, পুলিশ এই অ্যাঙ্গেলটা ভাল করে দেখেছে, কিন্তু ওঁর প্রস কোয়ার্টারে যাওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

প্রস কোয়ার্টারে গেলে ভজনবাবুর বিরুদ্ধে কেসটা আরও শক্ত হত। উনি যে স্যাডিস্ট তা প্রমাণ করার সুযোগ থাকত।

আমি তো বলেইছি লোকটাকে ভাল করে চেনার কোনও সুযোগ আমার হয়নি। যে মেয়েটা খুন হয় সে কি প্রস?

না।

তা হলে এ প্রসঙ্গ কেন?

মেয়েটিকে খুন করার আগে ব্রুটালি রেপ করা হয়।

ওঃ।

ইজ ইট জাস্ট লাইক ভজনবাবু?

কী করে বলব বলুন। আমাকে তো খুন করেনি।

মারধর বা হাত মুচড়ে দেওয়া, গালাগাল করা, এসব?

আমাকে প্লিজ, এসব প্রশ্ন করবেন না। আমার পক্ষে ডিটেলস বলা সম্ভব নয়। রুচিতে বাধে।

সরি। কিন্তু এটা তো জানেন যে, এটা মার্ডার কেস।

হ্যাঁ। কিন্তু আমার পক্ষে এর বেশি বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু কোর্টে যে আপনাকে এসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা হবে।

কোর্টে! কোর্টে কেন আমি যাব?

আপনাকে পুলিশ সাক্ষী হিসেবে ডাকবে।

সে আমি পারব না।

ভয় পাচ্ছেন?

ভয় নয়। এসব বিচ্ছিরি ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আমি কিন্তু কিছু বলতে পারব না।

সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আপনার সাক্ষ্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

কী নির্ভর করছে?

মোটিভ অফ মার্ডার।

আমার ওপর নির্ভর করবে কেন? আমার সঙ্গে লোকটার তো কোনও সম্পর্কই নেই।

সম্পর্ক যে নেই তার কারণটাই তো আমাদের দরকার। ভজনবাবু যে একজন স্যাডিস্ট সেটা প্রমাণ করতে পারলে পুলিশের কাজ সহজ হয়ে যায়।

প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন। খুন যদি ও করে থাকে তো সেটা পুলিশ প্রমাণ করুক। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

পুলিশ তার কাজ করবে। পুলিশকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। মেয়েটা কে?

ভাল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন অনেক আগেই আপনি করতে পারতেন।

আপনি আমাকে এত প্রশ্ন করছেন যে, আমি প্রশ্ন করার সুযোগই পাচ্ছি না।

সরি ম্যাডাম। এসব ঘটনা ঘটলে লোককে বিরক্ত না করে উপায় থাকে না কিনা।

বুঝেছি। এবার বলুন মেয়েটা কে?

একজন টিনএজার। ষোলো-সতেরোর বেশি বয়স নয়। খুব চঞ্চল আর একটু ডানপিটে গোছের মেয়ে। ভজনবাবুর গ্যারেজের পর একটা খেলার মাঠ। মেয়েটার বাড়ি ওই মাঠটা পেরিয়ে। মেয়েটার নাম রিঙ্কু। খুব মড মেয়ে। তার বাবার চিংড়ি মাছের ব্যাবসা আছে। মোটামুটি পয়সাওলা লোক। মেয়েটা একটা সাইকেলে চড়ে পাড়ায় চক্কর দিয়ে বেড়াত। পোশাকও পরত। খুব উগ্র। কখনও শর্টস আর কামিজ। কখনও জিনস আর টি-শার্ট।

কেমন মেয়ে?

যেটুকু জানা যায়, বখাটে টাইপের মেয়ে। বাবা ডিভোর্সি। মা আবার কাকে বিয়ে করে বাইরে কোথাও থাকে। মেয়েটা বাবার কাছে থাকত।

একমাত্র মেয়ে?

হ্যাঁ। বোধহয় খুব আদরেরও দেখতেও খারাপ ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে, মেয়েটার বেশ অ্যাট্রাকটিভ চেহারা ছিল এবং যথারীতি পাড়া-বেপাড়ার ছেলেরা তার পিছনে ঘুরঘুর করত। রিঙ্কুর বদনাম ছিল, সে ছেলেদের সঙ্গে ফ্রিলি মেলামেশা করে। বাবার কোনও শাসন ছিল না। ভদ্রলোক নিজের কাজ নিয়ে হিমশিম খেতেন, মেয়ের দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না।

বাড়িতে আর কেউ নেই?

রিঙ্কুর ঠাকুমা আর দাদু ও বাড়িতে থাকেন। তঁদের থাকা নিয়েই রিঙ্কুর মা আর বাবার মধ্যে বনিবনার অভাব দেখা দেয়। তারপর অশান্তি বেড়ে বেড়ে শেষ অবধি ডিভোর্স।

রিঙ্কুর বাবা আর বিয়ে করেননি?

না। তিনিও আপনার মতোই। বিয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ত হয়েছিল বলে আর বিয়ে করেননি। তা বলে তার বিয়ের বয়স যায়নি। হি ইজ ওনলি ফর্টিফোর।

এবার আমার করণীয় কী বলুন। সাক্ষী দিতে হবে শুনে আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয় কীসের?

সাক্ষীটাক্ষি দিলে তো পাবলিসিটি হবে। পুরনো কথা উঠবে।

তা উঠবে।

সেইটেই ভয় পাচ্ছি। এ ঘটনার সঙ্গে তো আমার কোনও সম্পর্কই নেই। তবু কেন যে আপনারা আমাকে ইনভলভড করতে চাইছেন।

উপায় নেই বলে।

লোকটা কি এখন জেলে?

পুলিশ কাস্টডিতে। আপনি চাইলে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন!

দেখা করব? সে কী কথা! আমি ওর সঙ্গে দেখা করব কেন?

লোকটা আপনার কাছে হয়তো কিছু বলতে পারে।

প্লিজ, আমাকে এসব কাজে জড়াবেন না। আমি ওরা ছায়াও মাড়াতে চাই না।

ম্যাডাম, কাজটা অপ্রীতিকর হলেও আমার কিছু কৌতূহল আছে।

আমি পারব না। মাপ করবেন।

আগে একটু শুনুন। দিন সাতেক আগে ঘটনাটা ঘটে। ভজনবাবুর মোটর গ্যারেজের পাশের মাঠে মেয়েটির ডেডবডি পাওয়া যায় সকালবেলা। মাঠটায় কিছু আগাছার জঙ্গল আছে, তার মধ্যে। মেয়েটি বাড়ি না ফেরায় সারা রাত লোকজন এবং পুলিশও তাকে অনেক খুঁজেছিল। পায়নি।

শুনতেই আমার খারাপ লাগছে। ডেডবডি কথাটা শুনেই আমার মনটা কেমন করে উঠল। আহা, ওইটুকু একটা মেয়েকে মারে কেউ?

মানুষের ভিতরে একটা পশু তো থাকেই। আর সেই পশুটাকে ধরার জন্যই আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

পশুটা কি ওই ভজন?

তাই মনে হচ্ছে।

আপনাদের হাতে প্রমাণ নেই?

একেবারে প্রমাণ ছাড়া তো ভজনকে ধরা হয়নি।

প্রমাণই যদি থাকে তা হলে ওকে শাস্তি দিলেই তো হয়। আমার সাহায্যে কী দরকার?

প্রমাণ আছে, আবার নেইও।

সে আবার কী?

ভজনবাবুর গ্যারেজটা একটু নির্জন জায়গায়। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে গ্যারেজ। অনেক সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতি আছে। ডিজাইনার গাড়ি তৈরি করার জন্য ভজনবাবু কিছু অর্ডার পাচ্ছিলেন। দেশি-বিদেশি গাড়ির মোটর নিয়েও বোধহয় এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। গ্যারেজটা আরও বড় করার জন্য পাশের মাঠটা কেনারাও চেষ্টা করছিলেন।

আমি এতসব জানি না। তবে পুজন বলেছিল ওর গ্যারেজ বড় হচ্ছে।

হ্যাঁ, বেশ বড় গ্যারেজ।

ওর কি অনেক টাকা?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ওরা ছাড়াছাড়ি তো দেড় বছরের?

এক বছর আট মাস।

গত দেড় বছরের মধ্যেই ভজনবাবু অনেক টাকা করেছেন। আর বোধহয় সেই কারণেই লোকটার পিছনে ওখানকার ক্লাব এবং মস্তানেরা লেগে গিয়েছিল। তারা টাকা চাইত, উনি দিতেন না।

এসব আমার জানা ছিল না।

আপনার জানার কথা নয়। তবে মাস ছয়েক আগে ভজনববুর ওপর হামলা হয় এবং উনি কয়েকটা গুন্ডা ছেলের হাতে মার খান!

হ্যাঁ, এরকম একটা কী যেন পূজনের কাছে শুনেছিলাম। বেশি মাথা ঘামাইনি।

ভজনবাবু লোকটি খুব বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাবসাদার নন। তা যদি হতেন তা হলে গুন্ডা মস্তানদের কিছু চান্দা দিয়ে হাতে রাখতে পারতেন। সে পথে না গিয়ে উনি কনফ্রন্টেশনের পন্থা নিয়েছিলেন। এমনিতে নিরীহ হলেও বেশ একগুয়ে আর জেদি। তাই না?

তা তো বটেই।

যাইহোক, এই ঘটনার পর গ্যারেজটা প্রায় উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়। ভজনবাবু আপসরিফা করতে রাজি হননি, টাকাও দেননি। উনি পুলিশকেও হাত করার চেষ্টা করেননি বলে প্রোটেকশনও পাননি।

এতসব জেনে আমার কী হবে?

লোকটার চারিত্রিক আউটলাইনটা আপনার সম্পূর্ণ জানা নেই বলেই বলছি।

তা হলে বলুন।

লোকটা বিপদের ঝুকি নিয়েই ওখানে গ্যারেজ চালাতে লাগলেন। ভজনবাবু একটা রিভলভার কিনেছিলেন। লাইসেন্সও ছিল। আর ওঁর গ্যারেজের কর্মচারীরা–কী জানি কেন–ওঁর খুবই অনুগত। তারাও ওঁকে প্রোটেকশন দিতে লাগল। ফলে গ্যারেজের সঙ্গে লোকালিটির একটা শত্রুতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গ্যারাজে। বার কয়েক বোমা পড়েছে, আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলে অবরোধের চেষ্টাও হয়েছে, তার চেয়ে বড় কথা পলিটিক্যাল প্রেশারও ওর বিরুদ্ধে ছিল। জনসাধারণের অভিযোগ ওই গ্যারেজে চোলাই তৈরি হয়, সমাজবিরোধী কাজ হয় ইত্যাদি।

সত্যিই হত নাকি?

বোধহয় না।

তা হলে আপনি কী বলতে চাইছেন?

বলতে চাইছি ভজনবাবুর শত্রুর অভাব নেই।

সে তো হতেই পারে।

আর শত্রুতা ছিল বলেই ভজনবাবু ইদানীং গ্যারেজেই থাকা শুরু করেছিলেন। গ্যারেজের ভিতরদিকে ওঁর যে অফিসঘরটা আছে সেখানে চৌকি পেতে বিছানা করে নিয়েছিলেন। রান্নাবান্নাও নিজেই করে নিতেন। ওঁর জবানবন্দি অনুসারে গ্যারেজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওঁর গ্যারেজে থাকাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। লোকটাকে সাহসী বলতে হয়। কী বলেন?

আমি কী বলব বলুন। আপনার মনে হলে হতে পারে।

গ্যারেজে দু'জন কর্মচারী রাতে পাহারা দিত। আর ভজনবাবুতো সপ্তাহে চার-পাঁচ দিনই থাকতেন। যেদিন ঘটনোটা ঘটে সেদিনও ভজনবাবু গ্যারেজে ছিলেন।

গার্ডরাও ছিল তো!

দুঃখের বিষয় সেদিন দিবাকর নামে যে কর্মচারীটির গার্ড দেওয়ার কথা ছিল তার মায়ের অসুখ বলে সে আসেনি। ছিল রতন নামে দ্বিতীয় গার্ডটি।

মেয়েটির সঙ্গে কি ভজনের আলাপ ছিল?

ছিল। মেয়েটা প্রায়ই নাকি গ্যারেজে হানা দিত। সে ভজনবাবুকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিতে বলত। এবং ভজনবাবু মাঝেমাঝে রিঙ্কুকে গাড়ি চালানো শেখাতেনও। শোনা যায়, রিঙ্কু ভাল গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিল।

বাঃ, তা হলে আর সন্দেহ কী?

সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নেই। কারণ ঘটনার দিন সন্ধেবেলা গ্যারেজের উলটোদিকের বাড়ির সনাতন মল্লিক দেখেছেন যে, রিঙ্কুর সাইকেলটা গ্যারেজের ফটকের কাছে দাঁড় করানো।

তা হলে তো মিলেই যাচ্ছে।

যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা সন্ধেবেলা ঘটেনি। ঘটেছে একটু বেশি রাতে। অন্তত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাই বলে।

আপনি বড্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলেন শবরবাবু।

হ্যাঁ, ওইটে আমার দোষ। তবে আসল ঘটনা বের করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভাল করে। বুঝিয়ে বলা দরকার মিসেস আচার্য।

আমাকে প্লিজ, মিসেস আচার্য বলবেন না। আমার নাম বিভাবরী ভট্টাচার্য।

জানি। ডিভোর্স করেননি বলে মিসেস আচার্য বলে ফেলেছিলাম।

কোর্টের ডিভোর্স না হলেই কী? আমি মনে মনে তো কবেই। ওকে পরিত্যাগ করেছি।

তা বটে। ডিভোর্সের প্ল্যান আছে কি?

এসব শুনে মনে হচ্ছে, ডিভোর্সটা করে রাখলেই ভাল হত।

তা ঠিক। তবে ডিভোর্স হয়ে থাকলেও আমরা আপনাকে সাক্ষী মানতাম।

উঃ, কী যে মুশকিল!

সরি ম্যাডাম।

আপনি আমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছেন তো শবরবাবু?

পারছি বিভাবেরী দেবী। কিন্তু প্রবলেমটা আমাদের সকলেরই। আপনি এক্সপোজারকে ভয় পাচ্ছেন, কোর্টকাছারিতে যেতে অপছন্দ করছেন, কিন্তু আমাদের যে উপায় নেই।

ঠিক আছে বলুন।

রিকুর সাইকেলটা খুব দামি এবং রেসিং মডেলের। ওরকম দামি সাইকেল ওই অঞ্চলে কারও নেই। সুতরাং ওই লাল রঙের সাইকেলটা সহজেই চোখে পড়ত। বুঝতে পারছেন?

পারছি। সন্ধেবেলা গ্যারেজে সাইকেলটা দাঁড় করানো ছিল।

হ্যাঁ।

তা হলে তো প্রমাণই হয়ে গেল যে, রিঙ্কু ভিতরে ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে তাই।

আবার আপাতদৃষ্টি কেন?

পুলিশের মনটা বড্ড খুঁতখুতে। এই যে ধরুন না। আমার মোটরবাইকটা এখন আপনাদের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো আছে, আর আমি ভিতরে বসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। মোটরবাইকটা যে চেনে সে ওটা দেখে বলতেই পারে যে, শবর দাশগুপ্ত এখন বিভাবরী ভট্টাচার্যের বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে, মোটরবাইকটা আর কেউ টেনে এনে রেখেছে বা আমিই ওটা রেখে দিয়ে বাসে উঠে বাড়ি চলে গেছি। সুতরাং এটাকে ফুল প্রিাফ বলে ধরা যায় না।

আপনারা সোজা জিনিসটাকে প্যাচালো করতে ভালবাসেন।

তা নয়। আসলে দুনিয়ায় সহজ সরলভাবে কিছুই ঘটে না। তা যদি ঘটত তা হলে আমাদের কত পরিশ্রম বেঁচে যেত বলুন।

তা বটে। একটু চা খাবেন? অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলছেন।

কফি হলে হত। বেশিরভাগ বাড়িতেই চা-টা ভাল হয় না।

আপনি ভীষণ ঠোঁটকাটা তো!

খারাপ চা খাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ঠোঁটকাটা হতে হয়েছে।

আচ্ছা, কফিই করে আনছি।

আনুন।

বিভাবরী উঠে যাওয়ার পর শবর ঘরটা আবার দেখল। সচ্ছল পরিবারের বৈঠকখানা যেমন হয় তেমনই সাজানো। সোফাসেট, সেন্টার টেবিল, নিচু বুক কেস, দেয়ালে কিছু ওয়াল ডেকোরেশন। বুক কেসের ওপর কাঠের তৈরি বাঁকুড়ার ঘোড়া। তার পাশে দুটো স্টিল ফ্রেমের ছবি। একটা ছবি বিভাবরীর মা আর বাবার। অন্যটা বোধহয় কম বয়সে বিভাবরী আর তার দাদার।

বিভাবরী কফি এনে বলল, শুধু দুধের কফি। চলবে তো!

শবর একটা চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ।। চিনিটা খুব পারফেক্ট হয়েছে তো। চিনিতেই গণ্ডগোলটা বেশি হয়।

বিভাবরী একটু হেসে বলল, রিঙ্কুর সাইকেলের গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

শবর বিভাবরীর দিকে তাকাল। মেয়েটির চেহারা খুবই ভাল। খুব লম্বা নয়, তেমন ফরাসাও বলা যায় না, কিন্তু মুখখানা খুব ঢলঢলে। চোখ দু'খানা টানা এবং দৃষ্টিটা মায়ায় মাখানো। অ্যাট্রাকটিভ। হ্যাঁ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ।

কী দেখছেন?

ভাবছি আপনার মতো একজন সুন্দরী মহিলার ভাগ্যটা সুন্দর হল না কেন। কী যেন কথায় আছে, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর–না। কী যেন!

বিভাবরী একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, আমি সুন্দরী হলে বলতে হয় আপনি সুন্দরী কথাটার মানেই জানেন না।

তা হতে পারে। তবে যা চোখের পক্ষে স্নিগ্ধকর, তাই আমার সুন্দর বলে মনে হয়। যাকগে।

হ্যাঁ, খুব আনইজি সাবজেক্ট।

যা বলছিলাম। রিঙ্কুর সাইকেল। গ্যারেজে রিঙ্কুর সাইকেলটা সন্ধে থেকেই ছিল। বা তারও আগে থেকে। অন্তত সন্ধে থেকে যে ছিলই তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রিঙ্কুকে কেউ গ্যারেজে ঢুকতে দেখেনি?

খুব ভাল প্রশ্ন। না, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষদর্শীকে পাইনি যে রিঙ্কুকে গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছে। জায়গাটা একটু নির্জন। উলটোদিকে মল্লিকবাবুর বাড়ি, আশেপাশে আর বাড়ি নেই। একাধারে ডোবা, অন্য ধারে একটা বাড়ির ভিত হয়ে পড়ে আছে। লোকজন বিশেষ চলাচল করে না। ভজনবাবুর গ্যারেজেই যা লোকের যাতায়াত। সেদিন রবিবার গ্যারেজ বন্ধ থাকায় লোকজনও ছিল না।

রতন না। কী যেন নাম–সে কী বলে?

রতন ডিউটিতে এসেছিল রাত ন'টা নাগাদ।

সে সাইকেলটা দেখেনি?

দেখেছে। তবে রিঙ্কু ভিতরে ছিল কি না সে জানে না।

কেন, তার তো খোঁজ করা উচিত ছিল।

সে যা বলেছে তা মোটামুটি এরকম, সে রাত ন'টার কিছু পরে গার্ড দিতে আসে। ফটক খোলাইছিল। একটা বাতি মাত্র জ্বলছিল বলে জায়গাটায় আলো আঁধারি ছিল। সে ফটকের কাছে একটা পুরনো গাড়িতে বসে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সাইকেলটা তার নজরে পড়ে। ওদিকে ভজনবাবুর ঘরের দরজা তখন বন্ধ। তার ধারণা হয়েছিল রিঙ্কু ভজনবাবুর ঘরে বসে গল্পটল্প করছে।

ইস লোকটা যদি তখন গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিত তা হলে বোধহয় মেয়েটা বেঁচে যেত।

ধাক্কা না দিলেও সে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাড়িয়েছিল।

ওঃ। তারপর?

সে শুনতে পায়, ভিতরে একটি মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে ভজনবাবুর কথা হচ্ছে। কথা বা তর্কাতর্কি।

তর্কাতর্কি?

হ্যাঁ। অন্তত রতন তাই বলছে।

মেয়েটার গলা তো নিশ্চয়ই তার চেনা।

না চেনার কথা নয়। তবে সেটা যে রিঙ্কুরই গলা এটা সে হলফ করে বলতে পারছে না।

এর পরও কি কোনও সন্দেহ আছে। শবরবাবু?

না, সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সন্দেহ তো প্রমাণ নয়।

সারকামস্টিয়াল এভিডেন্স বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

আছে। আর সেটাই আমাদের তুরুপের তাস।

রতন মেয়েটাকে দেখেনি, ভাল কথা। কিন্তু রেপ এবং খুনের পর লাশটা যখন মাঠে নিয়ে ফেলা হল, তখন তো তার চোখ বুজে থাকার কথা নয়।

বলছি ম্যাডাম। কথাটা খুবই সত্যি। রতন জানিয়েছে, রাত দশটার কিছু পরে ভজনবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে তাকে ডাকেন। রতন খুব কাছাকাছি যাওয়ার আগেই ভজনবাবু তাকে কোকাকোলার ক্যান আনতে পাঠান। ধারে কাছে কোৰ কোলার ক্যান পাওয়া যায় না। তাকে বেশ কিছুটা দুরে যেতে হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ মনিট পরে সে ফিরে এসে ভজনবাবুর দরজায় নক করে। ভজনবাবু দরজা খুলে ক্যানগুলো নেন। তখন ঘরে কেউ থিক্ল না।

তার মানে কী দাঁড়াল?

দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে চারই হয় ম্যাডাম। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ওই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে খুন এবং গুম দুটোই হয়েছিল।

উঃ মাগো! কী সাংঘাতিক লোক।

হ্যাঁ, খুবই সাংঘাতিক লোক। আর এই কথাটাই আপনাকে আদালতে দাড়িয়ে বলতে হবে।

আমাকে না হলেও তো হয়। রতনই তো সাক্ষী আছে।

রতন আমাদের খুব ইস্পার্ট্যান্ট সাক্ষী। কিন্তু তার একটা কথা গোলমেলে।

কোন কথাটা?

যে-মেয়েটার কণ্ঠস্বর সে ভজনবাবুর ঘরের ভিতর শুনতে পেয়েছিল সেটা রিঙ্কুর কি না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

ওটা তো সামান্য ব্যাপার। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, হয়তো তাই গলাটা ভাল শুনতে পায়নি।

সেটা খুব সম্ভব।

ভজনের সঙ্গে রিঙ্কুর কী কথা হচ্ছিল?

শবর একটু হেসে বলে, শুনতে চান? এসব টপ সিক্রেট কি আপনার শোনা উচিত?

উচিত না হলে বলবেন না।

আরে রাগ করছেন কেন? রতন শুনতে পায় মেয়েটা বেশ চিৎকার করেই বলছে, কেন আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না? আপনাকে করতেই হবে। জবাবে ভজনবাবু বেশ উত্তেজিত গলায় বলছিলেন, এসব কী বলছি পাগলের মতো? তোমাকে আমি ওভাবে কখনও ভাবিইনি! তুমি বাড়ি যাও, আমাকে এভাবে বিরক্ত কোরো না। জবাবে মেয়েটা বলছিল, আপনি একটা কাপুরুষ, নপুংসক, আপনার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই, ইত্যাদি। ডিটেলস পুলিশের খাতায় লেখা আছে।

ও বাবা! রিঙ্কু আবার ওকে বিয়েও করতে চেয়েছিল?

চাইতেই পারে। ভজনবাবুর বয়স বোধহয় আঠাশ-উনত্রিশ, তাই না?

ওরকমই।

বয়সের একটু তফাত হত, কিন্তু বিয়ে হতেই পারে।

তা পারে, বিয়েই না হয় করত, মারাল কেন?

সেটাই প্রশ্ন। আপনি বলতে পারেন কেন মারল?

না। কিন্তু ভজন কী বলছে?

ওঁর মুখ থেকে খুব বেশি কথা বের করা যায়নি। উনি বলছেন, সেইদিন সন্ধেবোলা ওঁর ঘরে যে-মেয়েটি ছিল সে রিঙ্কু নয়।

তবে কে?

তা উনি বলতে রাজি নন।

বলবে কী করে? সত্যি কথা বললে তো প্রমাণই হয়ে গেল।

আমাদেরও সন্দেহ মেয়েটা রিঙ্কুই।

এখনও সন্দেহ?

নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত না হলে সন্দেহ কথাটাই ব্যবহার করা ভাল।

সে আপনারা করুন। আমি জানি মেয়েটা রিঙ্কুই।

শবর একটু হাসল, তারপর বলল, ভজনবাবুকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য আপনি যে একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

হব না! একটা মেয়েকে রেপ করে যে খুন করেছে তার কি ফাঁসি হওয়া উচিত নয়?

ফাঁসি বা যাবজ্জীবন যাইহোক, সব সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন না করতে পারলে জজ তো আর সেই হুকুম দেবেন না।

আপনি রিঙ্কুর সাইকেলের কথাটা কি ভুলে যাচ্ছেন?

না, আমি কিছুই ভুলি না, রিফুর সাইকেলটাও একটা মস্ত এভিডেন্স। কিন্তু ভজনবাবু বলছেন, সাইকেলটা যে ওখানে ছিল তা তিনি জানতেন না। সে ব্যাপারে কিছু বলতেও পারেন না।

বেশ কথা তো!

হ্যাঁ। পুলিশ কেস সাজালে ভজনবাবু যে বিপদে পড়বেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেস সাজানোর ব্যাপারে আমাদের ফুল প্রফ হওয়া দরকার।

ফুল প্রফ হওয়ার জন্য আর কী কী দরকার?

ভাল হত। একজন আই উইটনেস পেলে।

গ্যারেজের উলটোদিকে যে-লোকটা থাকে সে কিছু দেখেনি?

না। আরও একটা কথা।

কী কথা?

পুলিশের কুকুর কিন্তু ভজনবাবুর গ্যারেজের দিকে যায়নি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তবে বর্ষাকাল তো এবং সেদিন রাত্রেও বৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই গন্ধের ট্রেলটা মুছে যেতেই পারে।

সে তো পারেই। আমার যেন মনে হচ্ছে আপনি ঘটনাটা সম্পর্কে তেমন নিশ্চিত নন।

আমাকে বলতে পারেন সন্দেহা-পিচাশ।

তাই দেখছি, পুলিশ কি এইরকমই?

না। আমি এইরকম।

তা হলে আপনি ক্রিমিনালদের ধরবেন কী করে?

সবসময়ে যে ক্রিমিনালদের ধরা যায় এমন নয়, অনেক ফাঁকফোকর দিয়ে তারা রেহাই পেয়ে যায়। ওই ফাঁকফোকারগুলোই ভরাট করার চেষ্টা করছি।

আমার তো মনে হচ্ছে, ওটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস।

শবর মৃদু হেসে বলল, হলে তো ভালই হত। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, একটু ভেবে জবাব দেবেন।

নিশ্চয়ই। আমি তো এতক্ষণ কো-অপারেটই করেছি।

হ্যাঁ। আপনি নার্ভাস হননি।

এবার প্রশ্ন করুন।

ফুলশয্যার রাতে ভজনবাবুর যে পরিচয় আপনি পেয়েছিলেন তা খুবই খারাপ এবং ভয়ংকর।

হ্যাঁ।

কিন্তু তারপরও আপনি আরও সাতদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন।

হ্যাঁ।

আপনি কি ভজনবাবুর ঘরেই রাতে থাকতেন? আই মিন, একসঙ্গে?

পাগল নাকি? আমি ওর ঘরে শুতাম। কিন্তু ও চলে যেত ওর ভাই পুজনের ঘরে। বাড়ির লোকেরাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই সাতদিনের কথা কিছু মনে আছে?

কেন থাকবে না? মাত্র তো দেড়-পৌনে দুই বছরের ঘটনা।

সেই অভিজ্ঞতোটা কীরকম? মানে রিগার্ডিং ভজনবাবু।

ও কিন্তু কখনও আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি, এমনকী লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতও না।

ওই সাতদিনে আপনার সঙ্গে ভজনবাবুর কথা হত কি?

না। আমার কাছাকাছি আসত না।

আপনি এই সাতদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন কেন? মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে?

না। প্রবলেমটা মানিয়ে নেওয়ার মতো ছিল না। সাতদিন ছিলাম, শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অনুরোধে। ওর ভাই পূজন। আর বোন দেবারতি আমাকে খুবই ভালবাসত। শ্বশুরমশাই অসুস্থ মানুষ, শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু শাশুড়ি খারাপ ছিলেন না। খুব ভালমানুষ গোছের।

এই সাতদিনে ভজনবাবুর বিশেষ কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে কি?

না।

ভাল করে ভেবে দেখুন। দেয়ার মে বি এ ভাইটাল ফ্যাক্ট।

কিছু মনে পড়ছে না তেমন। তবে

তবে কী? থামলেন কেন?

ও সকালবেলা রোজ পাড়ার কুকুরদের পাউরুটি খাওয়াত।

বাঃ, এই তো একটা কথা জানা গেল। আর কী?

নাঃ, আর কিছু নয়।

২. নমস্কার সনাতনবাবু

নমস্কার সনাতনবাবু।

আরে, আসুন, আসুন। নমস্কার, নমস্কার।

একটু বিরক্ত করতে এলাম।

বিরক্ত কীসের? আপনারা আইনের রক্ষক, আপনাদের একটু সাহায্য করব এ তো সৌভাগ্য।

শবর সনাতনবাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসল।

একটু চা বা কফি?

না, ধন্যবাদ।

ঠান্ডা কিছু খাবেন?

না, না, ব্যস্ত হবেন না, আই অ্যাম অলরাইট।

তারপর বলুন।

ভজনবাবুর সঙ্গে আপনার কেমন পরিচয়?

খুব একটা নয় মশাই। যৎসামান্য। বাড়ির উলটোদিকে একটা গ্যারেজ থাকায় খুবই ডিস্টার্বড হতে হয়। দিনরাত দুমদাম শব্দ হচ্ছে, কলকবজ চলছে, মিস্ত্রিদের হল্লাও আছে।

আপনি কি গ্যারেজটা তুলে দেওয়ার জন্য একটা মামলা করেছিলেন?

ঠিক মামলা নয়। আমার স্ত্রী হার্টের রুগি, জোরালো শব্দ তার পক্ষে ক্ষতিকারক। সেটা জানিয়ে পুলিশে একটা রিপোর্ট করি। ভজনবাবুকে একটা উকিলের চিঠিও দিই।

তার আগে কি ভজনবাবুর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল?

হয়েছিল।

কীরকম কথা?

প্রথমে তো লোকটাকে ভালমানুষ বলেই মনে হয়েছিল। আমি ওঁকে মাঝে মাঝে বলতাম। লোকালিটির মধ্যে গ্যারেজ থাকায় পাড়ার লোকের অসুবিধে হচ্ছে, উনি যেন হাইওয়ের দিকে গ্যারেজটা সরিয়ে নেন।

উনি কী বলতেন?

উচ্চবাচ্য করতেন না। চুপচাপ শুনতেন।

তারপরই ঝগড়া লাগে?

ঝগড়া ঠিক ওর সঙ্গে হয়নি।

তবে কার সঙ্গে?

ভজনবাবুর একজন কর্মচারী আছে, তার নাম রাখাল।

খুব লম্বাচওড়া?

হ্যাঁ সে-ই। ও হচ্ছে ঘাটপুকুরের মস্তান।

ঝগড়া হল কেন?

একদিন দুপুরে ওরা একটা গাড়ির বডি তৈরি করছিল। সে সাংঘাতিক দুমদাম শব্দ। আমার স্ত্রী দুপুরে ঘুমোতে পারেননি, শব্দে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি অফিস থেকে ফিরে ঘটনা শুনে গ্যারেজে যাই। তখন রাখালের সঙ্গে কথা হয়।

কী কথা হল?

আমি বললাম, এরকম চলবে না। রাখালও তেড়া তেড়া জবাব দিচ্ছিল। তারপর ঝগড়ার মতো হল।

তখন কি ভজনবাবু গ্যারেজে ছিলেন?

না।

ঝগড়াটা কতদূর গড়িয়েছিল?

আমরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের সঙ্গে কি ঝগড়ায় পারি? রাখাল আমাকে দেখে নেবে। বলে শাসিয়েছিল।

আপনি কী করলেন?

পাড়ার নাগরিক কমিটিকে জানালাম। তারা পরদিন গিয়ে ভজনবাবুকে ধরল।

ফলাফল কী হয়েছিল?

ভজনবাবু রাখালকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। রাখাল ক্ষমাও চাইল। কিন্তু গ্যারেজের শব্দটার যে সমস্যা ছিল তার তো সমাধান হল না। ভজনবাবু বললেন, আপনারা একটা টাইম বেঁধে দিন, আমরা সেই সময়েই গাড়ির বডির কাজ করব, অন্য সময়ে করব। ব্ল্ম

তা হলে তিনি কো-অপারেট করতেই চেয়েছিলেন।

তা বলতে পারেন। তবে ওটা আই ওয়াশ। গ্যারেজে শব্দ তো সারাদিনই হত। বডির কোজই তো শুধু নয়।

আপনার একটি মেয়ে, তাই না?

হ্যাঁ। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

আপনার জামাই কন্ট্রাক্টর তো!

সবই তো জানেন তা হলে।

জানি। জানাটাই আমাদের কাজ।

সনাতনবাবু, আপ্যায়িতের হাসি হেসে বললেন, আপনারা জানবেন না তো কে জানবো?

আপনার জামাই বিজয়বাবু চাঁপাডালির মোড়ের কাছে থাকে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি চান। আপনার মেয়ে-জামাই আপনার কাছাকাছি কোথাও এসে থাকুক, যাতে বিপদে আপদে তারা আপনাদের দেখাশোনা করতে পারে।

কী আশ্চর্য! হ্যাঁ, তাই। আপনি সত্যিই

দাঁড়ান, কথাটা শেষ করার পর আপনার হয়তো ততটা ভাল লাগবে না।

আরে বলুন না। ভাল না লাগার কী আছে?

আপনি মেয়ে-জামাইয়ের জন্য এ পাড়ায় একটু বড় একটা প্লট খুঁজছেন, তাই তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই।

আপনার জামাই ভজনবাবুর গ্যারেজের জমিটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল। কিন্তু ভজনবাবু জমি বিক্রি করতে রাজি হননি।

আমার জামাই ওকে দুনো টাকা অফার করেছে। তাও রাজি হয়নি। এতে কোনও অপরাধ হয়নি তো!

আরে না। অপরাধ কীসের? তবে ভজনবাবুর গ্যারেজটা তুলে দিতে পারলে আপনার অনেক সুবিধে।

সনাতন চুপ।

এবার ঘটনার দিনের কথা।

বলুন না। কী বলতে হবে। পুলিশকে একদফা বলেছি।

সেদিন রাতে রিঙ্কু খুন হয়।

হ্যাঁ মশাই। কী নৃশংস ব্যাপার। ফুটফুটে মেয়েটা পাড়া দাপিয়ে বেড়াত। তাকে কেউ ওভাবে খুন করে? লোকটার ফাঁসি নয় মশাই, শূলে চড়ানো উচিত ওকে।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু শূলে চড়াতে গেলে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার।

সোজা কেস মশাই। আমরা সবাই জানি।

কী জানেন?

খুন। আর রেপ ওই ভজনই করেছে।

কীভাবে জানলেন?

রিঙ্কুর তো যাতায়াত ছিলই ওর কাছে। সেদিন সন্ধে থেকে আটকে রেখেছিল ঘরে। তারপর রেপ করার পর মেরে ফেলে।

কী করে বুঝলেন? কোনও চিৎকার শুনেছেন?

চিৎকার! না, সেরকম কিছু শুনিনি।

এ জায়গাটা খুব নির্জন। রাতে আরও নির্জন। সামান্য শব্দ হলেও শোনার কথা।

তা ঠিক। তবে আমার ঘরে অনেক রাত অবধি টিভি চলে। আমার শাশুড়ি ইনসোমানিয়ার রুগি। তিনি সন্ধেরাত্তির থেকেই টিভি ছেড়ে বসে থাকেন। টিভির শব্দে

বুঝেছি। রিঙ্কুকে আপনি সেদিন গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছেন?

না, দেখিনি। তবে সাইকেলটা দেখেছি।

সেটা জানি। রিঙ্কু কি খুব ঘনঘন গ্যারেজে আসত?

খুব ঘনঘন। রোজই আসত।

আপনার কি ধারণা মেয়েটা ভজনবাবুর সঙ্গে ইনভলভ্ড ছিল?

মেয়েটা একটু ফস্টিনস্টি করার মতো ছিল। আর ভজনবাবু তো অতি বাজে লোক। শুনেছি। ওর চরিত্রদোষ আছে বলে বউয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

ভজনবাবুর সঙ্গে রিঙ্কুর ঘনিষ্ঠতা কীরকম ছিল জানেন?

গাড়ি চালাতে শেখাত, ঢলাঢ়লিও করত, গ্যারেজে বসে আডডা মারত। তাই নিয়ে অশান্তিও হয়েছে।

কীরকম অশান্তি?

পাড়ার ছেলেরা ভজনবাবুর ওপর কয়েকবারই চড়াও হয়েছে।

কেন?

রিঙ্কুর সঙ্গে ওর। খারাপ সম্পর্ক বলে।

রিঙ্কুর বাবা কি কখনও ভজনবাবুকে কিছু বলেছে?

শচীনন্দন? ও কি একটা মানুষ? সারাদিন তো চিংড়ির ভেড়িতেই পড়ে থাকত। সংসার ভেসে গেলেও খেয়াল করত না। একটু সাবধান হলে মেয়েটা বাঁচত।

রিঙ্কুর সাইকেলটা খুনের পরদিনও গ্যারেজে ছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি কি আগের দিন জানতে পেরেছিলেন যে রিঙ্কুকে পাওয়া যাচ্ছে না?

না। আমার কানে আসেনি।

পাড়ার ছেলেরা যখন জানতই যে রিঙ্কু প্রায়ই ভজনবাবুর গ্যারেজে আসে তখন তারা গ্যারেজে রিঙ্কুর খোঁজ করল না কেন বলুন তো!

জানি না মশাই। ওখানেই তো আগে খোঁজা উচিত ছিল।

রিঙ্কু কি কখনও আপনার বাড়িতে আসত?

না। এ বাড়িতে তার সমবয়সি তো কেউ নেই, কেন আসবে?

ওদের পরিবারকে আপনি কতটা চেনেন?

ভালই চিনি। আমরা কয়েকজন প্রথম এ জায়গায় বাড়িঘর পত্তন করি। শচীনন্দন আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু ভালই আলাপ আছে।

যাতায়াত আছে?

কালেভদ্রে। যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত, সময়টা কোথায়? শচী তো থাকেও না। এখানে। মাছের ভেড়িতে পড়ে থাকে।

সেই রাতে অস্বাভাবিক কোনও চিৎকার বা শব্দ শোনেননি তো!

না মশাই, মনে তো পড়ছে না।

ভাল করে ভেবে দেখুন তো, রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে কোনও সময়ে খুব কুকুর ডাকছিল কি?

সনাতন মল্লিক ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে সোৎসাহে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগারোটার পরে কিছু কুকুর খুব ডাকছিল বটে। তবে তারা কিন্তু রোজই ডাকে। সেদিন হয়তো একটু বেশি ডাকছিল।

আর কোনও অস্বাভাবিক শব্দ?

না, মনে পড়ছে না।

রিঙ্কুর কোনও বিশেষ ছেলেবন্ধু ছিল কি?

সে আমি কী করে জানিব? পাড়ার ছেলেছোঁকরাদের জিজ্ঞেস করুন। ওরা হয়তো বলতে

পারবে।

আপনার কি মনে হয় ভজনবাবু খুন করতে পারেন?

না পারার কী আছে? ও লোক সব পারে।

আপনার স্ত্রীর অসুখটা কি জটিল?

হার্ট প্রবলেম। অ্যানজাইনা।

আপনার শাশুড়ি তো সারা রাত জেগে থাকেন।

হ্যাঁ।

তিনি মধ্যরাতে কোনও শব্দ শুনেছেন কি?

না। পুলিশ তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সেই ভয়ে তিনি মধ্যমগ্রামে তীর বড়মেয়ের বাড়িতে গিয়ে আছেন।

আপনার স্ত্রী বাড়িতে আছেন?

আছেন।

তীকে ডাকুন।

তাকেও জেরা করা হয়েছে।

জানি। আমার দু-একটা প্রশ্ন মাত্র।

ডাকছি।

সনাতনবাবু ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। মধ্যবয়স্কা সাধারণ চেহারার ভদ্রমহিলা। মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে।

মাপ করবেন, আপনি অসুস্থ, তবু বিরক্ত করছি।

অসুস্থতা তেমন কিছু নয়। প্রশ্ন করতে পারেন।

ভজনবাবু কেমন লোক?

ভাল নয়। গ্যারেজটার জন্য আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। ওঁকে বলছি বাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় বাড়ি করতে।

গ্যারেজের শব্দে আপনার অসুবিধে হত, সে তো বুঝলাম। ভজনবাবুকে কতটা চিনতেন?

চিনতাম একটু-আধটু। দেখতাম প্রায়ই।

দেখে কী মনে হত?

মনে আবার কী হবে। চেহারাটা ভাল। একটা মারুতি গাড়ি করে আসা-যাওয়া করত। ইদানীং তো থাকতই এখানে।

কখনও আলাপ হয়নি?

তা হবে না কেন?

কী সূত্রে আলাপ?

আমরা বছর চারেক হল এ বাড়ি করেছি। ভজনবাবু তার বছরখানেক আগে এখানে গ্যারেজ করেন। বাড়ি করার মেটেরিয়াল আমরা ওঁর গ্যারেজেই রাখতাম। তখন ওঁর ব্যাবসা বড় হয়নি।

ওর ক্লায়েন্টরা কীরকম?

ইদানীং তো দেখতাম বেশ বড়লোক মাড়োয়ারিরা আসছে। শুনেছি। ওঁর খদেররা। বেশিরভাগই বড়লোক।

ঘটনার দিনের কথা মনে আছে?

থাকবে না কেন? তবে আমরা কিছু দেখিওনি, শুনিওনি।

রিঙ্কুকে যে সন্ধেবেলা থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ খবর কি জানতেন?

না। আমাদের কেউ বলেনি। রিঙ্কুরা একটু তফাতে থাকে। মাঠের ওপাশে। পাড়াটা আলাদা।

রিকুকে তো চিনতেন!

হ্যাঁ। ছোট থেকে দেখছি। ওর মা যখন এখানে থাকত তখন কয়েকবার গেছি। ওদের বাড়িতে। ওর মা-ও আসত।

মা কেমন মহিলা?

খারাপ তো তেমন কিছু দেখিনি। দেখতে সুন্দর ছিল, আর উগ্র সাজগোজ করত।

আর কিছু?

না। আর কী বলুন!

ভজনবাবু সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন?

না।

রিঙ্কু মেয়েটা কেমন ছিল?

ভাল নয়। বড্ড উড়নচণ্ডী।

সে কি খুব ঘনঘন ভজনবাবুর কাছে আসত?

হ্যাঁ। রোজ। দুজনের তো খুব ভাব ছিল দেখেছি।

কীরকম ভাব?

মাখামাখি ছিল বেশ।

কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?

দু’জনে গাড়ির সিটে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গাড়ি চালাত দেখেছি।

রিঙ্কুর অনেক ছেলেবন্ধু ছিল কি?

ও বাবা, সে অনেক ছিল।

তারা ভজনবাবুকে হিংসে করত না?

করত বোধহয়। গ্যারেজে তো কতবার বোমা পড়ল, হামলা হল। কেন হাঙ্গামা হত কে জানে বাবা!

সেই হামলার লিডারশিপ কে দিত বলতে পারেন?

না। হাঙ্গামা হলে আমরা জানালা দরজা বন্ধ করে দিই। গ্যারেজটার জন্য আমাদের খুব অশান্তি হচ্ছে।

গ্যারেজটা উঠে গেলে কি আপনাদের সুবিধে হয়?

হবে না? খুব হয়। দিন না উঠিয়ে।

ভজনবাবু কনভিকটেড হলে গ্যারেজ উঠেও যেতে পারে।

তাই হোক বাবা। ক’দিন গ্যারেজটা বন্ধ বলে খুব শান্তিতে আছি।

শচীনন্দনবাবু, আপনার শোকটা যে কতখানি তা বুঝতে পারছি। এ সময়ে আপনাকে ডিস্টার্ব করা হয়তো উচিত নয়। আপনার অস্বস্তি হলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করবও না।

শচীনন্দনের বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ হলেও শরীরে অতিরিক্ত চর্বির জন্য বয়স্ক বলে মনে হয়। মাথায় টাকা। প্রচুর কেঁদেছেন বলে চোখ দুটো এখনও রক্তিম। মুখে গভীর শোকের ছাপ। দৃষ্টিতে শূন্যতা। মাথা নেড়ে শচীনন্দন বলল, না, কোনও অসুবিধে হবে না। কী জানতে চান বলুন।

আপনার ডিভোর্স কতদিন হয়েছে?

বছর সাত-আট।

ডিভোর্সের কারণটা কী?

আমার মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে এ ব্যাপারের কী সম্পর্ক?

হয়তো সম্পর্ক নেই। ইচ্ছে না হলে বলার দরকার নেই।

শচীনন্দন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট, আমার স্ত্রী শ্যামলী আর একজন লোকের প্রেমে পড়েছিল।

লোকটা কে?

শুনেছি। ওর পূর্বপ্রণয়ী। তার নাম সুজিত।

তারা এখন কোথায় থাকেন?

কানপুর।

রিঙ্কুর খবর তাঁকে দেওয়া হয়েছে কি?

হ্যাঁ। শ্যামলী তো তিন-চার দিন হল চলেও এসেছে। এই বাড়িতেই আছে।

ওঁর হাজব্যান্ডও এসেছেন কি?

না। ওর এ পক্ষের দুটো মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

ডিভোর্সের পর উনি রিঙ্কুর কাস্টডি চাননি?

না। বোধহয় সুজিতের ইচ্ছে ছিল না।

শুনেছি আপনি রিঙ্কুর দেখাশোনা করার সময় পেতেন না।

ঠিকই শুনেছেন। আমার ব্যাবসাটা বড়। মাছের ব্যাবসা। একা মানুষ, সামাল দিতে হিমশিম খাই। তবে রিঙ্কুর দেখাশোনা আমার মা আর বাবাই করেন। ঝি-চাকরের অভাব নেই।

শ্যামলীদেবীর সঙ্গে কি আপনার বাবা-মা’র বনিবনা ছিল না?

না। আজকালকার মেয়েরা শ্বশুর-শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মা-বাবাকে

ডিভোর্সের কারণ সেটাই নয় তো?

সেটা অপ্রধান কারণ। আমি শ্যামলীর জন্য আর একটা বাড়ি করে দিচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাবেন বাড়িটা খানিকটা হয়ে পড়ে আছে। বলেছিলাম, কাছাকাছি আলাদা থাকে, তা হলে খিটিমিটিও লাগবে না, সম্পর্কটাও ভাল থাকবে ও রাজি ছিল। কাজেই ডিভোর্সের কারণ আমার মা-বাবা হতে পারে না।

বুঝলাম। রিঙ্কু সম্পর্কে আপনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন?

মেয়েটা চঞ্চল ছিল। ডাকাবুকোও।

অবাধ্য ছিল কি?

একটু ছিল।

আপনাকে কেমন ভালবাসত?

খুব। বলেই শচীনন্দন দুহাতে মুখ ঢেকে রইল। কান্না চাপার চেষ্টা করতে লাগল।

শবর চুপ করে বসে রইল।

মিনিট কয়েক পরে ধাতস্থ হয়ে শচীনন্দন বলল, ওর সম্পর্কে পাড়ায় দুর্নাম শুনবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, রিঙ্কু খারাপ ছিল না। আদর পেয়ে পেয়ে একটু স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছিল মাত্র।

এরকম হতেই পারে। আপনি কি জানেন ভজনবাবুর সঙ্গে ওর কীরকম রিলেশন ছিল?

কী করে বলব? ভজন মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসত। একটু গভীর আর চুপচাপ মানুষ। আমার ওকে খারাপ লাগত না।

রিঙ্কু কি কখনও বাড়ির কাউকে জানিয়েছিল যে ও ভজনবাবুকে বিয়ে করতে চায়?

না, সেরকমভাবে কিছু জানায়নি। তবে–

তবে কী?

আমার মায়ের কাছে ও প্রায়ই ভজনবাবুর গল্প করত।

কীরকম গল্প?

ভজনকে যে ও খুব পছন্দ করে সেই কথাই বলত।

পছন্দটা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি না জানেন?

শচীনন্দন একটু থিতামত খেয়ে বলল, আমি মাকে ডাকছি। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

শচীনন্দন গিয়ে তাঁর মাকে ডেকে আনলেন। মায়ের সঙ্গে ছেলের মুখশ্রীর অদ্ভুত মিল। মা অবশ্য রোগা মানুষ, বয়স মধ্য ষাট। মুখে গভীর শোক থিম ধরে আছে।

মাসিমা কিছু মনে করবেন না।

না বাবা, বিলো।

ভজনবাবুর সঙ্গে রিঙ্কুর সম্পর্ক কেমন ছিল?

কী করে বলব? খারাপ কিছু তো মনে হয়নি।

ভজনবাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

তাকেও খারাপ লাগেনি। মিশুকে ছিল না। এই যা।

রিকু কি তাকে ভালবাসত বলে মনে হয়? মানে রিঙ্কুর কথায় তেমন কিছু ধরা যেত কি?

শচীনন্দনের মা মাথা নেড়ে বললেন, বলতে পারব না বাবা। আজকালকার মেয়েদের কি অত সহজে বোঝা যায়? তা ছাড়া রিঙ্কুর বয়সটাই বা কী বলো! বুদ্ধিশুদ্ধি তো ছিল না।

রিঙ্কু কি বোকা ছিল?

তাও নয়। লেখাপড়ায় বেশ মাথা, কথাবার্তায় চৌখস, আবার আগুপিছু না ভেবে হুটহাট এক-একটা কাজ করে বসত।

কিছু মনে করবেন না, ভজনবাবুছাড়া আর কোনও ছেলের প্রতি ওর সফটনেস ছিল কি?

ওসব জানি না বাবা। তবে ছেলেছোঁকরাদের সঙ্গে মিশত। খুব।

শচীনন্দন বলল, এসব জেনে আর কী হবে? খুনি তো ধরাই পড়ে গেছে।

সেটা ঠিক। তবে আমাদের কেস সাজাতে হলে সবরকম সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে নিতে হবে। কোনওখানে ফাঁক থাকলে সেই রন্ধ্র দিয়ে দোষী পার পেয়ে যায়।

পার পেয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ ছাড়লেও এ পাড়ার লোক ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

মৃদু হেসে শবর বলল, হ্যাঁ, জনগণের আদালতে তো সেরকমই হয়। শচীনন্দনবাবু, ভজনবাবুর গ্যারেজে বারিকয়েক হামলা হয়েছে। কেন জানেন?

চাঁদার জন্য। ব্যাবসা করলে বেকার ভাতা না দিয়ে রেহাই নেই। সেটা নিয়েই গণ্ডগোল। ও তো মারও খেয়েছে।

কে মেরেছিল?

হাবু আর জগুর দল।

আর কারও সঙ্গে ভজনবাবুর শত্রুতা ছিল কি?

গ্যারেজটার জন্য পাড়ার লোকেদের অসুবিধে হচ্ছিল। আরও কী কী সব যেন, অত ডিটেলসে জানি না। তবে অশান্তি ছিলই।

ভজনবাবুকি একটু মারকুট্টা একরোখা লোক?

তা বোধহয় একটু আছে।

ব্যক্তিগতভাবে আপনি কি মনে করেন যে ভজনবাবুই আপনার মেয়েকে ওরকম নৃশংসভাবে মেরেছে?

শচীনন্দন অনেকক্ষণ ভাবলা। খুব চিন্তিত। তারপর মৃদু গলায় বলল, আর কে মারবে?

সম্ভাবনার কথা বলছি।

আপনারা কি আর কাউকে সন্দেহ করছেন?

আরে না।

আমার মেয়েকে মেরে কার কী লাভ বলুন! রিঙ্কু হয়তো দুষ্ট একটু ছিল, কিন্তু এত বড় শাস্তি ওর হল কেন? মেয়েটা আমার–

শচীনন্দন হঠাৎ কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

মা এসে ছেলেকে দুহাতে ধরে বলল, ওকে এবার রেহাই দাও বাবা। গত আটদিন ধরে ওর যে কী অবস্থা।

ঠিক আছে মাসিমা।

আপনি কি তদন্তের ব্যাপারে কথা বলবেন?

শ্যামলী নামক মহিলাটির মুখে শোক ও রাগের মাখামাখি লক্ষ করল শবর। রাগটাই বেশি। বেশ সুন্দর ঢলঢলে মুখশ্রীতে একটু কাঠিন্যও আছে। গভীরভাবে শবরের দিকে চেয়ে বলল, আপনাদের উচিত রিঙ্কুর বাবাকেও অ্যারেস্ট করা।

কে?

কেন সেটা আবার জিজ্ঞেস করছেন? ব্যাবসা-ব্যাবসা করে স্বার্থপর লোকটা মেয়েটার দিকে একটু নজরও রাখল না! ও যদি মানুষ হত তা হলে মেয়েটার এরকম পরিণতি হত বলে ভাবেন?

আপনি একটু শান্ত হন।

শান্ত হব? কী ভেবেছেন আপনারা? খুনির ফাঁসি হোক, একশোবার হোক, কিন্তু যার অবহেলার ফলে আমার ফুলের মতো মেয়েটা মরল সে কেন রেহাই পাবে?

ঠিক কথা। সে প্রশ্ন আপনাকে আমারও করতে ইচ্ছে করছে।

তার মানে?

আপনি যখন শচীনন্দনবাবুকে ছেড়ে চলে যান। তখন রিঙ্কু মাইনর। আপনি ইচ্ছে করলেই তো মেয়েকে নিয়ে যেতে পারতেন। নেননি কেন?

নিইনি বলেই মেয়েটাকে অবহেলা করা হবে? শুধু আমারই তো মেয়ে নয়, ওরও তো!

এটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। আমি জানতে চাই, আপনি মেয়েকে নেননি কেন?

মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে শ্যামলী বলল, আমার অসুবিধে ছিল।

কীরকম অসুবিধে?

এ প্রশ্নের জবাব কি দিতেই হবে?

না দিলেও কিছু করার নেই। ইচ্ছে না হলে বলবেন না।

আমার সেকেন্ড হাজব্যান্ড রাজি ছিল না।

আপনি কানপুরে থাকেন?

হ্যাঁ।

অত দূর থেকে মেয়ের খবর কীভাবে নিতেন?

চিঠি লিখে।

শচীনন্দনবাবুকে চিঠি লিখতেন?

না।

তা হলে?

পাড়া-প্রতিবেশীদের লিখতাম।

পাটিকুলারলি কাকে?

সে আছে। রিঙ্কু একটু বড় হওয়ার পর ওকেই লিখতাম।

রিঙ্কু জবাব দিত?

হ্যাঁ।

সে কি আপনার জন্য ফিল করত?

নিশ্চয়ই।

আপনার ডিভোর্স কতদিন হয়েছে?

আট বছর।

রিঙ্কুকে আপনি কত বছর দেখেননি?

চার বছর আগে এসে দেখে গেছি।

চার বছর লম্বা সময়। মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হত না?

হবে না। সবসময়ে তো। ওর কথা ভাবতাম। কিন্তু ওখানে আমার নিজস্ব একটা ব্যাবসা আছে।

কীসের ব্যাবসা?

বাচ্চাদের ড্রেস তৈরির ব্যাবসা।

টাকা কে দিয়েছিল?

সুজিত-মানে আমার হাজব্যান্ড।

উনি কি আপনার আগের চেনা?

হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকে।

ওকেই আগে বিয়ে করলেন না কেন?

সেটা দিয়ে এই তদন্তে কী দরকার?

কখন কোনটা কাজে লাগে তার ঠিক কী?

বিয়ে করিনি বাধা ছিল বলে।

কীসের বাধা?

আমার বাবা রাজি ছিলেন না।

কেন, জাতের বাধা ছিল?

না।

তবে?

সুজিতকে আমার বাবা পছন্দ করতেন না।

আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

না।

ঠিক আছে, আমি আপনার আর সময় নষ্ট করব না।

লোকটার ফাঁসি কবে হবে?

কার ফাঁসি?

ওই লোকটার। যে আমার মেয়েকে খুন করেছে!

ফাঁসি দেওয়ার মালিক আমি নই।

ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেবেন?

কেন?

আইনের ফাঁক দিয়ে হয়তো বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার হাতে ছেড়ে দিন।

কী করবেন?

খুন করব।

শবর হাসল, লোকটাকে কেউই পছন্দ করে না দেখছি।

পছন্দ করার কথা নাকি? রেপ আর খুন দুটোর জন্য তো আর দু'বার ফাঁসি হবে না। আমার হাতে ছেড়ে দিলে আমি আগে একটা একটা করে ওর চোখ ওপড়াব, জিব টেনে ছিঁড়ব, পুরুষাঙ্গ কাটব…

দাঁড়ান, অতি উত্তেজিত হবেন না। অপরাধ এখনও প্রমাণ হয়নি।

সেটা আপনাদের ইন এফিসিয়েন্সির জন্য হয়নি। অত বড় একটা অন্যায় করল আর আপনারা এখনও প্রমাণই করতে পারলেন না।

আমরা অযোগ্য হতেই পারি। কিন্তু তবু এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা ভাল নয়।

সেইজন্যই তো বলছি, ওকে না হয় জামিনেই ছেড়ে দিন কয়েকদিনের জন্য।

ওকে মারলে আমাদের যে আপনাকে ধরতে হবে।

ধরবেন। মরতেও রাজি।

আপনি অযথা রেগে যাচ্ছেন।

অযথা? আপনার মেয়ে আছে?

থাকার কথা নয়। আমি বিয়ে করিনি।

তা হলে বুঝবেন কী করে?

মেয়ের বাবা নাই বলে কি আপনাদের দুঃখের কারণটা বুঝতে পারব না?

ওর গ্যারেজটায় আমি আগুন লাগাব।

শবর শুধু হাসল।

শ্যামলী বলল, আচ্ছা, ওর সঙ্গে লক আপ-এ গিয়ে দেখা করতে দেবেন?

দেখা করতে চান?

খুব চাই। দরকার হলে ঘুষ দেব।

ঘুষ দিতে হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব।

সত্যি করবেন?

করব।

থ্যাঙ্ক ইউ।

৩. ছবিটা কার

ছবিটা কার মিস্টার দাশগুপ্ত?

রিঙ্কু নামে একটা মেয়ের।

ও, সেই বারাসাতের মার্ডার কেসটা না?

হ্যাঁ, ছবিটা কেমন দেখছেন?

মেয়েটা তো দেখতে স্মার্ট অ্যান্ড লাভলি।

আর কিছু? একটু দুষ্ট ছিল বোধহয়?

হ্যাঁ, তা ছিল।

আচ্ছা দাশগুপ্ত, এটা তো রাজ্য পুলিশের ব্যাপার, আপনি কেন ওদের কেসে ফেঁসে যাচ্ছেন? ইউ আর গোয়িং আউট অব ইয়োর বাউন্ডস টু হেলপ দেম, তাই না?

শবর একটু হাসল, হ্যাঁ মিস্টার ঘোষাল, ব্যাপারটা তাই।

এই এক্সট্রা দায়িত্ব নিলেন কেন? মেয়েটা কি আপনার চেনা?

না মশাই, আমি ফ্যাক খাটছি। বলতে পারেন।

কিন্তু কেন?

রজাতদার জন্য।

রজাতদা মানে? ডিআইজি রাজত গুপ্ত?

হ্যাঁ।

আপনাদের বদ্যিতে বদ্যিতে বেশ ভাব, তাই না?

শবর হাসল, ঠিকই বলেছেন। বদ্যিরা অপেক্ষাকৃত স্মল কমিউনিটি, আর একটু বোধহয় ক্ল্যানিশও।

রজতবাবু নিশ্চয়ই আপনার আত্মীয় হন?

দূর সম্পর্কের।

ওই তো, বদ্যিরা সবাই সবার আত্মীয়, আর এ মেয়েটা কি রজতবাবুর কেউ হয়?

না।

তা হলে ওঁর ইন্টারেস্ট কীসের?

ইন্টারেস্ট কেন তা আমি জানি না। আই ওয়াজ আসকড টু হেলপি।

সবই জানেন মশাই, বলবেন না।

শবর হাসল।

ছবিটা স্টাডি করছেন কেন?

ছবি অনেক সময় অনেক কথা বলে।

কেসটা কি খুব জটিল? মার্ডারারকে তো ধরেছেন।

আমি ধরিনি। লোকাল পুলিশ ধরেছে। সময়মতো না ধরলে লোকটা গণপিটুনিতেই খুন হয়ে যেত।

লোকে আজকাল বড্ড বেশি আইন হাতে নিচ্ছে।

হ্যাঁ। তার জন্য ওভার অল পরিবেশটাই দায়ী। লোকে পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে। আইনের ওপর বিশ্বাস নেই, দেশে চোর ডাকাত খুনিও তো বাড়ছে।

হুঁ। লোকটার এগেনস্টে কেস দেওয়া হয়েছে?

না, তবে কেস জোরালো। প্রমাণ হয়ে যাবে।

তা হলে আর ভাবনা কী? কেস তো সোজা।

তা ঠিক, কিন্তু লোকটার কনফেশন বের করা গেল না।

তার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

শবর একটু আনমনা চোখে ঘোষালের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, মানুষ কতটা পেনি সহ্য করতে পারে বলুন তো! আপনি তো এ বিষয়ে স্টাডি করেছেন।

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

কারণ আছে।

বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের বিভিন্ন সহ্যশক্তি। চিনাদের একটু বেশি সহ্যশক্তি আছে। ট্রাইবালদের মধ্যেও ফিজিক্যাল পেন সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশি। কেন বলুন তো!

এই মার্ডার কেসের সাসপেক্ট ভজন আচার্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণরা নাকি খুব বেশি ব্যথা সইতে পারে না! মহাভারতে কী একটা গল্প আছে না?

হ্যাঁ, সেই বজকীটের দংশনের গল্প তো! ব্রাহ্মণরা বোধহয় পেনি সহ্য করার খুব বেশি সক্ষমতা রাখে না।

এ লোকটা তা হলে একসেপশন।

তার মানে?

দিস ম্যান ওয়াজ ব্রুটালি মলড বাই দি পাবলিক দ্যাট ডে। কিন্তু হি কেপ্ট হিজ কুল কম্পোজার। ইনজুরি ছিল মারাত্মক, তবু কোনওরকম এক্সপ্রেশন ছিল না।

হাবু বলে একটা গুন্ডা আছে ওখানে। সে আর লোকাল মস্তানেরাও ওকে বার দুই মেরেছে। একবার প্রচণ্ডভাবে, রড পাঞ্চ সবই ব্যবহার করা হয়। হাবু আমাকে বলেছে, ভজন অতি মার খেয়েও গ্যারাজের মুখে দাঁড়িয়ে তাদের আটকেছে। যেদিন ডেডবডি পাওয়া গেল সেদিনও হাটুরে মার খায় লোকটা। হাসপাতালে দিতে হয়েছিল।

হিরো নাকি?

না, হিরো বলা যায় না। তবে অদ্ভুত।

আর পুলিশের থার্ড ডিগ্রি?

হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছিলাম। খুনের আগের রাতে ওর গ্যারেজের ঘরে একটা মেয়ে ছিল। স্ট্রং সাসপিশন, মেয়েটা রিঙ্কু, কিন্তু ভজন আচার্যিকে দিয়ে সেটা বলানো যায়নি। গত কিছুদিনের মধ্যে লোকটাকে বার কয়েক ইনহিউম্যান টর্চার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু লোকটার যেন ফিজিক্যাল সেন্স বলে কিছু নেই। এরকম কি হতে পারে?

কারও কারও সহ্যের ক্ষমতা খুব বেশি থাকতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছেন?

বুঝতে পারছি না।

যতদূর শুনেছিলাম, আপনাদের হাতে প্রমাণ সব এসে গেছে।

হ্যাঁ। লোকটা রেহাই পাবে না। আপনি বোধহয় জানেন না, লোকটা আবার স্যাডিস্ট। অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং।

ওর স্ত্রী বলেন, লোকটার সেক্স খুব উগ্র এবং ভায়োলেন্ট, শি লেফট হিম ফর দ্যাট।

মাই গড!

রিঙ্কুকে খুন করার পিছনে এই স্যাডিজম ছাড়া আর কোনও মোটিভ পাচ্ছি না।

কেন, রেপ!

হ্যাঁ, রেপ। কিন্তু লোকটার অত সেক্স সত্ত্বেও সে প্রস কোয়ার্টারে যেত না কেন বলুন তো!

মে বি হি হ্যাড স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ড। হাফ গেরস্তও তো আছে। তাদের তো প্রস কোয়াটারে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া রেড লাইট এরিয়া তো বিশাল এবং সংখ্যাও কম নয়। সব কি খুঁজে দেখা সম্ভব?

তা ঠিক, সম্ভাব্য জায়গাগুলিতেই খোঁজ করা হয়েছে।

আপনি এত ব্রড অ্যাঙ্গেলে ভাবছেন কেন?

শবর মাথা নেড়ে বলল, ভাববার কোনও মানে হয় না।

এবার ঘোষালও একটু হাসল, মিস্টার দাশগুপ্ত, আমি আপনাকে চিনি। আপনার কোথাও একটা খিঁচ থেকে যাচ্ছে।

না, খিঁচ নয়। একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

ভজন রেপ করে রিঙ্কুকে মার্ডার করল। কিন্তু তারপর সে স্পটে রয়ে গেল কেন? ও তো রাতেই কলকাতায় চলে আসতে পারত।

ইজি। কলকাতায় পালিয়ে এলে ওর ওপর সন্দেহ আরও বাড়ত। হয়তো ভেবেছিল, ভালমানুষটি সেজে থাকলে লোকে সন্দেহ করবে না।

হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। সেটাই সম্ভব।

আপনার কোনও জায়গায় গ্যাপ আছে বলে মনে হচ্ছে কি?

শবর একটু চিন্তিতভাবে বলল, না, ঠিক তা নয়। গ্যাপ কিছু নেই। কিন্তু কেসটা বড্ড সোজা আর সরল।

তা তো হতেই পারে। আমাদের দেশের ক্রিমিন্যালরা তো আর মাথা বেশি খাটায় না। তাদের বেশির ভাগ কাজই মোটা দাগের। আপনি অত ভাবছেন কেন?

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাবছি। একটা কথা।

কী বলুন তো!

ভজন আচার্যি রোজ সকালে পাড়ার কুকুরদের ডেকে পাউরুটি খাওয়াত। কলকাতাতেও, বারাসতেও।

সো হোয়াট? হি লাভড ডগাস। এ তো হতেই পারে।

কলকাতায় একবার একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে ঠ্যাং ভাঙে। তাকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি করে ভেটারনারি হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ভাল করে এনেছিলেন ভজনবাবু। উনি এসপিসিএ-র মেম্বার এবং অ্যানিমাল লাভার।

ঘোষাল একটু থমকাল, তারপর বলল, তা হলে তো ভাবতে হচ্ছে। অ্যানিমাল লাভাররা হোমিসাইড করতে পারবে না তা নয়। সপ্লিট পারসোনালিটি হতে পারে। তবে ইটস এ পয়েন্ট টু পান্ডার। কেসটা ডিটেলসে বলবেন?

শবর বলল।

রিঙ্কুর ছবিটা ভাল করে দেখে ঘোষাল বলল, হাউ ওল্ড ওয়াজ সি? সিক্সটিন?

হ্যাঁ।

ও কি ভজনবাবুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?

হ্যাঁ।

তা হলে একটু ভাবতে হচ্ছে। পুলিশ কি এই অ্যাঙ্গেলটা দেখেনি?

লোকাল পুলিশ এত দেখতে চাইছে না। তাদের কাছে এটা একটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। ভজন আচার্যি কনভিকটেড হলে তারা বাহবা পাবে। একটা সলভড মার্ডার কেসকে কে কাঁচিয়ে দিতে চায় বলুন।

ঘোষাল একটু হেসে বলল, তা তো বটেই। আপনি কী করতে চান?

বুঝতে পারছি না।

রিঙ্কুর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখেছেন?

হ্যাঁ।

স্টমাকে কিছু পাওয়া গেছে?

কী পাওয়া যাবে?

ধরুন অ্যালকোহল।

হ্যাঁ।

বয়ফ্রেন্ডদের ক্রস করেছেন?

দু’জনকে। দু’জনেরই ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে। কেউই সেই রাতে বারাসাতে ছিল না। একজন শিলিগুড়ি গিয়েছিল দু’দিন আগে। অন্য জন আগের দিন মামাবাড়ি কোন্নগর।

আর কেউ?

না।

আচ্ছা, ডাক্তারি রিপোর্টে রোপ-এর রিপোর্টটা কীরকম? সিঙ্গল রেপ না গ্যাং রেপ?

সিঙ্গেল।

ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল?

অ্যাপারেন্টলি।

ওয়াজ ইট হার ফাস্ট টাইম?

হ্যাঁ, মেয়েটা উড়নচণ্ডী হলেও সেক্সটা আগে হয়নি।

আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, তবু বলি, মেয়েটা নখ দিয়ে কাউকে খামচে দিয়েছিল কি না বা রেপিস্টের লালা বা লোম বা চুল কিছু পাওয়া গেছে কি না তা দেখেছেন?

হ্যাঁ। নখে দু-একটা হিউম্যান টিসু পাওয়া গেছে।

ভজনের সঙ্গে মিলেছে?

মেলানোর চেষ্টা হচ্ছে। স্টিল আন্ডার প্রসেস। তবে আমি যতদূর জানি, লোকাল পুলিশ আমাকে মুখে বললেও কাজে টিসু পরীক্ষা করা হচ্ছে না। ওরা এত ডিপে যাবেই বা কেন?

অর্থাৎ ভজনকে ওরা ঝোলাবেই?

হ্যাঁ।

দেন লেট দেম। হ্যাঙ হিম।

তাই তো দিচ্ছি মিস্টার ঘোষাল। লোকটা হয়তো সত্যিই কাণ্ডটা করেছে কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে ব্যাপারটা প্রমাণ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছে জিঙ্গসটা একজন ভাঙলেও ভাঙতে পারে। কিন্তু সেই বিশেষ একজন খুবই স্টাবোর্ন।

কে লোকটা?

ওর স্ত্রী।

কীভাবে? ওঁর স্ত্রী তো ওঁকে ঘেন্না করে শুনলাম।

হ্যাঁ তা করে।

তা হলে?

ভজনবাবু তার স্ত্রীকে ঘেন্না করেন না।

তা হলে কী দাঁড়াল?

ডিফিকাল্ট ব্যাপার।

ভজনবাবুর্তার স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেন?

তেমন কিছু নয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁর স্ত্রী কেন চলে গেলেন? ভজন সংক্ষেপে বলেছেন, আমার দোষে। শত চাপাচাপিতেও দোষটা অবশ্য কবুল করেননি। স্ত্রীর প্রতি অ্যাটিচুড কেমন তা জিজ্ঞেস করায় বলেছেন, ও ভাল মেয়ে, আমি খারাপ।

ব্যস?

হ্যাঁ।

তা হলে ওঁর স্ত্রী কী করবেন?

ভজনবাবুকে ঘিরে একটা রহস্য রয়েছে। ওঁর ওই চুপচাপ থাকা, জেদি মনোভাব আর মার খাওয়ার ক্ষমতা আমাকে সমস্যায় ফেলেছে।

তাই তো দেখছি।

আমি যদি বিভাবরীকে রাজি করাতে পারতাম এবং উনি যদি লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলতেন তা হলে একটা কিছু বেরিয়ে আসতে পারত।

এটা কী করে বলছেন?

জাস্ট এ হানচ।

ও।

আরও একজন মহিলা ভজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

তিনি কে?

রিঙ্কুর মা। শ্যামলী।

তিনি কেন দেখা করবেন?

বোধহয় ভজনবাবুকে নিজের হাতে খুন করতে চান।

আপনি রাজি হয়েছেন নাকি?

হয়েছি।

কেন?

ভজনবাবুকে শক দেওয়ার কোনও চেষ্টাই আমি ছাড়ছি না।

ও। আপনি সবসময়ে ডেনজার নিয়ে খেলা করেন।

অ্যান্ড হোয়াই নটী?

ঘোষাল হাসল, ইটস ওকে ইফ ইট পেজ। কিন্তু এসব তো পণ্ডশ্রম।

মনে হচ্ছে তাই।

বাই দি বাই, রেপ করার সময় যদি রিঙ্কু ভজনবাবুকে বাধা দিয়ে থাকে তা হলে ভজনবাবুর গালে বা গলায় বা পিঠে বা হাতে নখের দাগ থাকার কথা।

নিশ্চয়ই। তবে গণপ্রহারে ভজনবাবুর সারা শরীর এমনই ক্ষতবিক্ষত ছিল যে রিঙ্কুর নখের দাগের মতো সূক্ষ্ম জিনিস খোঁজা খড়ের গাদায় ছুচ খোঁজার সামিল।

তাও তো বটে।

আরও একটা কথা।

কী বলুন তো!

রিঙ্কু যদি ভজনের প্রেমেই পড়ে থাকে তা হলে সেক্সের সময় বাধা দেবে কেন?

কিন্তু আপনিই তো বললেন যে ভজন ভায়োলেন্ট লাভার।

হ্যাঁ।

সেক্ষেত্রে বাধা দিতে পারেই।

সেটা ঠিক। তবু সব দিক ভেবে দেখতে হচ্ছে।

চার্জশিট তো নিশ্চয়ই ফাইল করা হয়নি?

না।

ভজনবাবু উকিল নিয়েছেন?

হ্যাঁ। ওর পরিবার জামিন চেয়েছে।

এখন আপনার অ্যাঙ্গেল অফ থটটা কী?

মাথা নেড়ে শবর বলল, আই অ্যাম ইন কনফিউশন।

শবর দাশগুপ্তর মুখে এ কথা শুনব বলে ভাবিনি।

শবর মৃদু হেসে বলল, ঘটনাবলি নয়, আমাকে কনফিউজ করছে লোকটা। ভজন আচার্য।

লোকটাকে কি আপনার ক্রিমিন্যাল বলে মনে হচ্ছে না?

তা বলছি না। হতেই পারে।

রজাতদা আসলে কী চাইছেন বলুন তো!

রজাতদা ভেঙে কিছু বলেননি। তিনি আমাকে শুধু বলেছেন, এ কেসটায় আমার একটা পারসোনাল ইন্টারেস্ট আছে। তুমি প্যারালেল ইনভেস্টিগেশন করো। আমি লোকাল থানাকে বলে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে কো-অপারেট করতে।

ওঁর ইন্টারেস্টটা কোন দিকে তা বুঝতে পেরেছেন? ভিকটিম না। সাসপেক্ট?

সম্ভবত সাসপেক্ট।

মাই গড! তাই আপনি মুশকিলে পড়েছেন।

অনেকটা তাই। ছবিটা আবার দেখুন তো দাদা।

ঘোষাল রঙিন ছবিটা তুলে নিয়ে দেখল। গায়ে একটা পোলকা ডটওলা টিলা কামিজ, পরনে নীল জিনস, একখানা সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো, পিছনে একটা মাঠ। মেয়েটার মুখে একটু হাসি।

কিছু মনে হয়?

না। ছবি তো স্থির জিনিস। একটা এক্সপ্রেশন মাত্র। এ থেকে কী বোঝা যাবে বলুন!

ইজ শি সেক্সি?

টিন এজাররা সবাই বয়সের গুণেই অ্যাট্রাকটিভ। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

আমি মহিলাদের ব্যাপারে একটু অনভিজ্ঞ, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

অনভিজ্ঞ থাকার দরকারটা কী? বয়স তো বোধহয় একত্রিশ-বত্রিশ হল।

ওরকমই।

তা হলে টোপরটা এবেলা পরে ফেললেই তো হয়।

ঘোষালদা, নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন। বছর খানেক আগেও আপনি ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন।

হ্যাঁ দাশগুপ্ত, সেবার আপনি আমার পাশে না দাড়ালে মরতে হত।

ফ্যামিলি লাইফকে আমি একটু ভয় পাই।

ভয়ও আছে, ভরসাও আছে।

আমার এরকমই ভাল লাগে। সিঙ্গল, অ্যাকটিভ, ফ্রি।

দাঁড়ান। আমার বউকে আপনার পেছনে লাগাব। সে খুব ভাল ঘটকী।

সর্বনাশ! আমি ওর কাছে যাব। একটা রেপিস্ট, খুনির কাছে আমি যাব কেন শবরবাবু? আমার তো ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।

জানি, সব জানি। আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই।

কী সেটা?

সেদিন রাতে উনি সত্যিই রিঙ্কুর সঙ্গে কথা বলছিলেন কি না।

অবভিয়াসলি রিঙ্কু। আর কে হবে!

মানছি। কিন্তু তবু সন্দেহের কোনও অঙ্কুর আমি রাখতে চাইছি না।

এটা আপনার বাড়াবাড়ি।

কোনও কিছুই বাড়াবাড়ি নয়। সত্যের শিকড়ে পৌঁছানো সবসময়েই কঠিন।

সত্যকে আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না।

সত্য হলে অবশ্যই স্বীকার করব।

কিন্তু আমাকে টানাটানি করছেন কেন?

জেরা বা রুটিন প্রশ্ন করে ভজনবাবুর কাছ থেকে কিছুতেই কথাটা বের করা যাচ্ছে না। আপনি হয়তো জানেন না লোকটার সহ্যশক্তি অসীম। আমি কাউকে এত ফিজিক্যাল টর্চার সহ্য করার পরও এত শান্ত থাকতে দেখিনি।

তাতে কী হ'ল?

লোকটাকে ক্র্যাকডাউন করাটাই আমার স্বার্থ। কেসটার যা অবস্থা ভজনরাবুর রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি ওঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি না।

লোকটার ফাঁসি হোক কি যাবজ্জীবন আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু লোকটার কাছ থেকে কথাটা বের করা যGদ ন্দ্মা 6দঙন্ম?

এটা কি আপনার জেদ বা প্রেস্টিজ ইসু?

না একেবারেই তা নয়।

মেয়েটা যে রিঙ্কুই তা আপনার মনে হচ্ছে না কেন?

মনে হচ্ছে। আবার হচ্ছেও না।

বড্ড হেঁয়ালি করেন। আপনি। আমার তো মনে হচ্ছে ভজন আপনাকে ঘুষ দিয়েছে।

শবর হাসল, মনে রাখবেন ভজনবাবু গুল্ডা বদমাশদের হাতে মার খেয়েও তাদের চাদা দেননি। ঘুষ দেওয়ার লোক নন।

আমাকে কী করতে হবে?

জাস্ট মিট হিম।

মিট করে কথাটথা বলতে হবে তো!

তা হবে।

কী বলব। তখন?

যেমন মনে হয় বলবেন! প্রম্পট করার বা শিখে পড়ে যাওয়ার দরকার নেই।

আমি যে ওর ওপর ভীষণ রেগেও আছি।

তা থাকুন না। কী যায় আসে তাতে?

কোন লাইনে কথা বলতে হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

নানা ধরনের কথা হতে পারে। বুদ্ধি খাটিয়ে বলবেন। বলার চেয়েও শোনাটা বেশি জরুরি।

ও আমাকে সব বলবে কেন?

উনি কারও সঙ্গেই কথা বলছেন না বিশেষ। আপনার সঙ্গেও না বলতে পারেন। তবে আমার একটা ধারণা, উনি আপনার ওপর টর্চার করেছেন বলেই একটু অপরাধবোধ থাকতে পারে।

নরপশুদের অনুতাপ থাকে না। রিঙ্কুকে মেরে কি ও অনুতপ্ত?

এ প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আপনি লোকটাকে দেখে বুঝতে চেষ্টা করুন।

আমার কী দরকার?

দরকারটা তো আপনার নয়, আমার।

আপনি আমাকে বড্ড মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা, একটা শর্তে দেখা করব।

কী শর্ত?

আমি আপনার কথা মানছি, বদলে আমাকে সাক্ষী হওয়া থেকে রেহাই দেবেন।

শর্তটা বেশ কঠিন। আমি চেষ্টা করব।

আপনি কি জানেন যে আপনি খুব নাছোড়বান্দা লোক?

জানি। আমার কাজটাই আমাকে আনপপুলার করে তোলে।

আমি কিন্তু আপনাকে ডিজলাইক করিনি। বরং আপনি হেটো মেঠো পুলিশের মতো নন বলে ফ্রিলি কথাও বলেছি।

তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কবে যেতে হবে?

আজ এবং এখনই।

আমার যে ভয় করছে।

ভয় কী? লোকটা শোওয়ার ঘরে নরপশু হলেও এমনিতে এ সিক ম্যান।

তবু নার্ভাস লাগছে।

আমি কাছাকাছি থাকব।

গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা হবে তো!

শবর হেসে বলল, আপনি চাইলে তাই হবে। তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে যদি চিন্তিত না হন তা হলে আমার ইচ্ছে আপনাদের দেখাটা হোক পুলিশ কাস্টডির বাইরে কোথাও।

সে কী। পুলিশ ওকে ছেড়ে দেবে?

আইনত ছাড়বে না। তবে আমার আন্ডারটেকিং-এ ছাড়বে। চলুন।

ঠিক আছে। সব রিস্ক কিন্তু আপনার।

নিশ্চয়ই।

আপনার খুব আত্মবিশ্বাস, তাই না?

না মিস ভট্টাচার্য, আত্মবিশ্বাস নয়। শুধু লজিক্যাল।

ঠিক আছে চলুন। আমি পোশাকটা পালটে আসছি। গাড়ি আছে?

আছে। পুলিশের জিপ।

ওতেই হবে।

শবর যখন বিভাবরীকে নিয়ে বেরোল তখন বেলা দুটো। পথে বিভাবরী তেমন কথাটথা বলল না। শবর জিজ্ঞেস করল, স্টিল ফিলিং নার্ভাস?

হ্যাঁ।

ওর প্রতি আপনার ঘেন্নার ভাবটা এখনও আছে?

থাকবে না? আমি ভুলতে পারি না।

আপনাদের দেখা হবে।

আপনি খুব রিস্ক নিচ্ছেন। কিন্তু। থানাই ভাল ছিল। আমি সেফ ফিল করতাম।

আপনি সেফটি নিয়ে ভাববেন না। ইউ উইল বি সেফ।

বিভাবরী চুপ করে রইল।

৪. বড়লোকের বাগানবাড়ি

শবর যে বাড়িটায় নিয়ে এল বিভাবরীকে, তা যে বড়লোকের বাগানবাড়ি তা দেখলেই বোঝা যায়। চারদিকে অনেকটা জমিতে ভারী সুন্দর নিবিড় গাছপালা। সামনে ফুলের বাগান। এই বর্ষাকালের শেষেও বাগানে ফুলের অভাব নেই। বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ির সামনে একটা মনোরম বারান্দা। তারপর ঘর টর।

এটা কার বাড়ি শবরবাবু?

একজন বড়লোকের। কেউ থাকে না। ফাঁকা পড়ে থাকে। শুধু মালি আছে।

জিপটা একেবারে বারান্দার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। শবর জিপ থেকে নেমে বলল, আসুন।

কেউ নেই তো এখানে দেখছি।

আসবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

ভিতরে ঢুকে বিভাবরী চারদিকে চেয়ে দেখল। বৈঠকখানাটা কী সুন্দর করে যে সাজানো! বেশি আসবাব নেই। কিন্তু, রুচির পরিচয় আছে।

এখানে নয়, ভিতরের ডাইনিং হল-এ।

বিভাবরী বলল, ঠিক আছে।

ডাইনিং হলটাও দারুণ সাজানো। গ্লাস টপ মস্ত খাবার টেবিল ঘিরে গদি আঁটা চেয়ার। ভারী নরম। এয়ার কন্ডিশনার চলছে বলে ভ্যাপিসা গরম থেকে এসে ভারী আরাম বোধ করল। বিভাবরী। চারদিক নিস্তব্ধ।

কী খাবেন? চা, কফি বা কোল্ড ড্রিঙ্ক?

জল খাব। আর কিছু নয়।

একজন পরিচ্ছন্ন পরিচারক ট্রে-তে একটা টাম্বলার। আর ঝকঝকে কাচের গেলাস এনে রাখল সামনে। বিভাবরী খানিকটা জল খেয়ে বুঝল তার তেষ্টাটা নার্ভাসনেসের। বারবার তেষ্টা পাবে।

শবর তাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, আমি বা আর কেউ আর আসব। না। ঘাবড়াবেন না। জাস্ট ফেস হিমা অ্যান্ড টকা।

বিভাবরী একটু হাসবার চেষ্টা করল, পারল না।

খাওয়ার ঘরের পিছন দিককার দেয়াল জুড়ে বিশাল চওড়া চওড়া জানালা দিয়ে পিছনের সবুজ বাগান আর গাছপালার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। শুধুই সবুজ যেন ছেয়ে আছে চারদিক ঘরে বাইরের প্রাকৃতিক আলো আসছে। আজও একটু মেঘলা বলে ঘরের আলোটার তীব্রতা নেই।

বিভাবরী বারবার ঘড়ি দেখছে। এক একটা মিনিট যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। বিভাবরী টোক গিলছে বারবার। একটু করে জল খাচ্ছে। ভাবছে লোকটাকে যে কী বলবে। মাথাটা এত তালগোল পাকিয়ে আছে যে, সে কথা বলতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাড়াচ্ছে।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় বৈঠকখানার দিককার ফ্লাশ ডোর খুলে দু’জন পুলিশ ঢুকল। ঢুকে দরজার দু’দিকে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড বাদে ক্রাচে ভর দিয়ে যে লোকটা অতি কষ্টে ঘরে ঢুকাল তাকে দেখে চেনার উপায় নেই যে, এ লোকটা সেই ভজন আচার্য। মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ, গালে স্টিকিং প্লাস্টার, পায়ে প্লাস্টার, ঠোঁট দুটো নীল হয়ে ফুলে আছে, একটা চোখ ও ব্যান্ডেজে ঢাকা। এত অবাক হল বিভাবরী যে বলার নয়।

ভজন ঘরে ঢুকতেই পুলিশ দু’জন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

ভজন দরজার কাছেই খানিকক্ষণ দাড়িয়ে রইল। হাফাচ্ছে। তার পর দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে এল।

বিভাবরীর হয়তো উচিত ছিল উঠে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে ওকে বসতে সাহায্য করা। কিন্তু ভজনের অবস্থা দেখে এমনই ঘাবড়ে গেছে বিভাবরী যে, সে নড়তেও পারল না।

ভজন খুব শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটা ক্রচ পড়ে গেল ঠনঠন করে। সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য নিচু হওয়ার ক্ষমতাও নেই লোকটার। ভারসাম্যহীন শরীরে কোনওরকমে চেয়ারের পিছনটা ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে। চেয়ার নিয়ে উলটেই পড়ে যেত, কিন্তু সেটা বুকে কোনওরকমে আটকাল। তারপর অতি কষ্টে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ মাথাটা নুইয়ে শুধু শ্বাস নিতে লাগল। বড় বড় শ্বাস। কথা বলার মতো অবস্থাই নয়। লোকটার যে এ দশা হয়েছে তা একবারও বলেনি। শবর। কে এই অবস্থা করল? পুলিশ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে লোকটার দিকে চেয়ে রইল বিভাবরী। গত তেরো-চোঁদ দিন দাড়ি কামায়নি বলে মুখটা দাড়িতে ঢাকা। গোঁফ নেমে ওপরের ঠোঁট আড়াল করেছে।

বিভাবরী খুব ধীরে উঠে গিয়ে মেঝে থেকে ক্রাচটা তুলে অন্য ক্রাচটার পাশে টেবিলের গায়ে হেলিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসে ক্ষীণ গলায় বলল, জল খাবে?

লোকটা মৃদু মাথা নেড়ে জানাল, খাবে না।

এ দশা করল কে? পুলিশ।

ভজন একবার তার ক্লান্ত মুখখানা তুলে বিভাবরীর দিকে তাকাল। হাঁ করা মুখে এখনও শ্বাস নিচ্ছে প্রবলভাবে। ফের মাথাটা যেন ঝুলে পড়ল আপনা থেকেই। কথা বলার মতো অবস্থায় এখনও আসেনি।

বিভাবরীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। এ লোকটাকে সে ঘেন্না করে এসেছে এতদিন, আজ বড্ড দুঃখ হচ্ছে। মানুষের এরকম দুর্দশা দেখলে কারই বা না হবে। শবর কি তাকে ইচ্ছে করেই এই ঘটনার কথা বলেনি?

প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ ঘরে ভজনের শ্বাসযন্ত্রের শব্দ হল। তারপর একটু কমে এল হাঁফধরা ভাবটা। মাথা নিচু করেই বসে রইল। ভজন।।

একটু জল খাও এবার।

ভজন ফের মাথা নাড়ল, খাবে না।

এ দশা কে করেছে তোমার?

ভজন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাঙা গলায় বলল, সবাই।

সবাই বলতে?

ভজন ফের চুপ করে থেকে আরও মৃদু গলায় বলল, সবাই।

এরপর ভজনের শরীরটা হঠাৎ একটু কেঁপে কেঁপে উঠল। কাঁদছে নাকি? কান্নার মানুষ তো নয়। বিস্মিত বিভাবরী পলকহীন চেয়ে রইল।

কাঁপুনিটা কমে গেল। ভজন মুখ তুলল না।

তোমাকে কি পাবলিকও মেরেছে?

ভজন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

পুলিশও?

ভজন মাথা নাড়া দিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

রিঙ্কুকে কি তুমি খুন করেছ?

ভজন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাত্র। জবাব দিল না।

বললেন না?

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে থেকে ভজন ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, বলে কী লাভ?

লাভ নেই?

ভজন মাথা নেড়ে না জানাল। তারপর অনেকক্ষণ বাদে মাথা নিচু অবস্থাতেই বিড়বিড় করে আপনমনে বলল, কতবার তো বলেছি। কেউ বিশ্বাস করে না।

বিভাবরী কী বলবে ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল, রিঙ্কু তোমার কাছে সেই রাতে এসেছিল কেন? বিয়ের প্রস্তাব দিতে?

ভজনের রি-অ্যাকশন হচ্ছে অনেক দেরিতে হয়তো মাথায় বেশ জোরালো চোট পেয়েছে, রিফ্লেক্স কাজ করছে না। সময় নিচ্ছে। অনেকক্ষণ বাদে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

রিঙ্কু নয়?

না।

তা হলে কে?

ভজন একটা হিঙ্কার মতো শব্দ করল। টেবিলের ওপর মাথাটা নামিয়ে যেন একটু ঘুমিয়ে নিতে লাগল। এই অবস্থায় কেন যে লোকটাকে এতদূর টেনে আনল শবর, কেন যে তাকে বসোল ওর মুখোমুখি। বিভাবরী উঠে। ভজনের কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?

ভজন একটু কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা তুলল। রক্তজবার মতো লাল ডানচোখটা দিয়ে বিভাবরীকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, না, ঠিক আছে।

একে কি ঠিক থাকা বলে?

ভজন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে অতি মৃদু স্বরে বলল, আরও হবে। আরও কত হবে। এ তো কিছু নয়।

আর কী হবে তোমার?

ভজন ধীরে ধীরে চোখের জল আর লালায় মাখামাখি বীভৎস মুখটা তুলল। লাল চোখে চেয়ে সেই ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এখনও মরিনি যে! মারবে না?

আমি জানতে চাই তুমি সত্যিই রেপ আর খুন করেছ কি না।

ভজন ইহাফধরা গলায় শুধু বলল, কী লাভ বলে? বিশ্বাস করবে না কেউ।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইছি। সত্যি কথাটা বলে আমাকে।

ভজন মাথা নেড়ে শুধু না জানাল। তার পর কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে হঠাৎ ধীরে ধীরে মুখ তুলে বিভাবরীর দিকে চাইল। দু'খানা কম্পিত হাত তুলে করজোড় করে রইল কিছুক্ষণ। দুটো হাত থারথার করে কাঁপছে।

ওরকম করছ কেন?

ভজন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে। প্রায় অশ্রুত গলায় বলল, ক্ষমা... ক্ষমা...

দু'খানা ক্রাচের দিকে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল ভজন। উঠবে।

বিভাবরী গিয়ে ক্রাচ দু'খানা এগিয়ে দিল। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা শক্ত সমর্থ শরীরটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। থারথার করে কপিছে শরীর। তিনবারের চেষ্টায় উঠল। ভজন। দুবগলে ক্রাচ।

বিভাবরী গিয়ে দরজা খুলে সেপাইদের ডাকল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় যেন ভজনের কষ্ট হচ্ছিল অনেক বেশি। দু'জন সেপাই না ধরলে শুধু ক্রাচে ভর করে বেরতে পারত না সে।

পিছন থেকে অপলক চোখে চেয়ে ছিল বিভাবরী। এরকমভাবে কেউ কাউকে মারে? মানুষ এত নৃশংস? চোখে জল আসছিল তার, আবার একই সঙ্গে রাগে আগুন হয়ে যাচ্ছিল মাথা।

ভজন বেরিয়ে যাওয়ার পর বিভাবরী তার শরীরের কাঁপুনি আর দুর্বলতা টের পেল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। হাফ ধরে যাচ্ছে।

দেখা হল ম্যাডাম?

বিভাবরী চোখ তুলে চেয়ে শবরকে দেখে বলল, আপনাদের নামে মামলা করা উচিত।

শবর হাসল, করুন না।

পুলিশ কেন মারবে? মারা তো বে-আইনি।

অবশ্যই। কিন্তু ভজনবাবুর বেশির ভাগ চোট পাবলিকের উপহার, পুলিশের নয়।

তাদের কেন ধরা হল না?

ক’জনকে ধরা যাবে বলুন। গোটা লোকালিটিটাই তো ইনভলভড।

ছিঃ শবরবাবু।

শবর একটু হাসল আবার। বলল, পাবলিকের হয়ে আপনার ধিক্কারটা আমি ঘাড়ে নিচ্ছি। ম্যাডাম। সরি। এক্সট্রিমলি সরি।

আপনি আমাকে ওর এই অবস্থার কথা বলেননি কেন?

শোনার চেয়ে দেখা অনেক বেশি এফেকটিভ। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিভাবরী উঠল। শরীর ও মনের একটা বিকলতা টের পাচ্ছে সে। পা দুটো ভারী। মাথাটা একটু একটু টলছে। জিপে বসে সে বলল, আপনার কি এখন কোনও জরুরি কাজ আছে?

না তো!

তা হলে আমি ওর গ্যারেজটা দেখতে চাই।

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু দেখে কী করবেন?

এমনি। কৌতূহল।

ঠিক আছে ম্যাডাম। এনিথিং ইউ সে।

গ্যারেজটা একটু প্রত্যন্ত জায়গায়। ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর, ফাঁকা জমি, ঝোপজঙ্গল, পুকুর।

বাঁ ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া বেশ বড় একটা জায়গা। ফটকের সামনে দু’জন সেপাই গাড়ির একখানা সিট পেতে বসে আছে। তাদের দেখে উঠে দাড়াল।

এটাই ভজনবাবুর গ্যারেজ।

ভিতরে ঢোকা যাবে?

কেন নয়?

শবরের ইশারায় সেপাইরা ফটকের তালা খুলে দিল। বিকল মোটর গাড়ি, নানা যন্ত্রাংশ, তেল কালি, হাইড্রলিক প্রেস পেরিয়ে শেষ প্রান্তে ভজনের ঘর। সেপাইরা দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

আসুন ম্যাডাম।

ঘরে একটা সরু চৌকিতে সাধারণ বিছানা পাতা রয়েছে। একাধারে চেয়ার-টেবিল। বইয়ের র‍্যাকে প্রচুর টেকনিক্যাল বই, কিছু পেপারব্যাক উপন্যাস, কিছু ম্যাগাজিন। বা ধারে মেঝের ওপর একটা বায়োগ্যাসের উনুন। কিছু বাসনপত্র।

বসুন ম্যাডাম।

বিভাবরী চেয়ারে বসল। তারপর ঘরটা ভাল করে দেখল। কিছুই দেখার মতো নয়। একজন পুরুষমানুষের ঘর।

শবর বলল, সম্ভবত আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন সেই চেয়ারেই রিঙ্কু বসে ছিল সেই রাতে।

কী করে বুঝলেন?

প্রবাবিলিটির কথা বলছি।

কিন্তু মেয়েটা যে রিঙ্কুই তা কী করে বুঝলেন?

আপনার কী মনে হয়?

ও তো বলছে রিঙ্কু নয়।

তা হলে কে হতে পারে ম্যাডাম?

কী করে বলব? আপনি বলতে পারেন না?

শবর মৃদু একটু হাসল। বলল, রিঙ্কু হতেই পারে। রিঙ্কু তো ভজনবাবুকে ভালবাসত বলেই মনে হয়।

আপনি কিছু লুকোচ্ছেন।

শবর ফের হাসল, আপাতত কিছু লুকোনোই থাক।

আচ্ছা, ভজনের সঙ্গে আমার কী কথা হল তা তো আপনি জানতে চাইলেন না।

শবর মৃদু মৃদু হাসি হাসছিল। বলল, পরে জেনে নেওয়া যাবে।

তার মানে আপনার জানার কৌতূহল মিটে গেছে?

তা নয়। ভজনবাবু এখন খুব বেশি কথা বলার মতো মুডে নেই। সেটা জানি বলেই অনুমান করছি আপনাদের মধ্যে খুব বেশি কথা হয়নি। কিন্তু

কিন্তু কী?

আপনার অমত না থাকলে কয়েক দিন পর আপনি আর একবার ওঁর সঙ্গে মিট করুন।

করবেন?

করব।

থ্যাঙ্ক ইউ। হিনিডস এ সিমপ্যাথেটিক হিয়ারিং।

তার মানে?

ওঁর মনটা অদ্ভুত। জোর করলে বা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে উনি ভিতরকার কপাট বন্ধ করে দেন। কোনো কনফেশনই তখন আদায় করা যায় না। কিন্তু এই কেসটার জন্ট খুলতে হলে ওঁর মুখ খোলানো দরকার। আমরা যেটা পারছি না সেটা আপনি হয়তো পারতেও পারেন।

চেষ্টা করব।

কাইন্ড অফ ইউ।

এবার কি আমরা উঠিব?

হ্যাঁ ম্যাডাম। চলুন।

ফেরার সময় বিভাবরী তেমন কথা বলছিল না। খুব ভাবছিল। আজ সে বড্ড নাড়া খেয়েছে ভজনকে দেখে। লোকটাকে তার আর ঘেন্না হচ্ছে না, কিন্তু ঘেন্না হচ্ছে তাদের যারা ওকে ওরকমভাবে মেরেছে।

শবরবাবু।

বলুন।

আমার মনে হয় না ভজন। এ কাজ করেছে।

কী করে বুঝলেন?

যেভাবে আপনিও বুঝেছেন।

আমি কী বুঝেছি?

আপনিও বুঝেছেন বা অনুমান করেন যে ও খুন বা রেপ করেনি।

কী সর্বনাশ! এ যে গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি।

আমি জানি।

৫. একটু কথা আছে

রতন তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বলুন স্যার।

মার্ডারের আগের রাতে তুমি শুনেছিলে ভজনবাবু একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।

হ্যাঁ স্যার।

তুমি কি বলতে পারো দু'জনের মধ্যে কে কাকে আপনি করে বা তুমি করে বলছিল?

স্যার, পুলিশকে তো বলেছি।

ব্যাপারটা খুব ইম্পার্ট্যান্ট। ভাল করে ভেবে বলো।

এই রে! এত খুনখারাপি মারদাঙ্গায় মাথাটাই কেমন গুলিয়ে গেছে স্যার।

সেই জন্যেই বলছি ভাল করে ভেবে বলতে। অনেক সময়ে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর স্মৃতিটা পরিষ্কার হয়। যখন তুমি জবানবন্দি দিয়েছিলে তখন তুমি ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থায় ছিলো।

ঠিক স্যার।

এবার শান্ত মাথায় ভেবে বলো।

দু'মিনিট সময় দেবেন। স্যার? চোখ বুজে একটু ভাবব।

দুই পাঁচ যত মিনিট খুশি সময় নাও। তবু আসল কথাটা বলো।

রতন দু’মিনিটের বেশি ভাবল না। চোখ খুলে এক গাল হেসে বলল, মনে পড়েছে স্যার। মেয়েটা বাবুকে তুমি করে বলছিল, বাবু আপনি করে বলছিল।

আরও ভেবে বলো।

না স্যার মনে পড়ে গেছে।

তুমি কিন্তু পুলিশের কাছে উলটোটাই বলেছিলো।

তা হতেই পারে স্যার। তখন যা অবস্থা। বাবুর ফাঁসি হলে তো চাকরিটাও গেল স্যার। বাবু লোকটা খারাপ ছিলেন না।

ফাঁসি নাও হতে পারে।

একটু উজ্জ্বল হয়ে রতন বলল, তবে কি বাবু ছাড়া পাবেন?

সেটা তোমার ওপরেও খানিকটা নির্ভর করছে।

কী বলতে হবে বলুন।

সেই রাতে তুমি গ্যারেজের কাছাকাছি কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ স্যার। সামনে নয় ঠিক, ওই পশ্চিম দিকে একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড় করানো ছিল। ডার্ক কালার।

আর কিছু?

না স্যার। গ্যারেজে এসেছে কিনা ভেবে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে, গ্যারেজে এসেছ নাকি? লোকটা বলল, না, সওয়ারি আছে।

প্রাইভেট গাড়ি?

এ মার্কা গাড়ি স্যার, ওরা ভাড়া খাটে।

গাড়িটা কখন দেখলে?

ডিউটিতে আসার সময়। তারপর যখন বাবুর জন্য কোক নিয়ে এলাম তখন গাড়িটা চলে গেছে।

বাঃ, ভেরি গুড।

আর কিছু বলতে হবে স্যার?

তুমি কি জানো তোমার বাবুকে বারাসতে গ্যারেজ খুলতে কে সাহায্য করেছে?

সেটা ভাল জানি না। তবে শুনেছি বাবুর এক বন্ধু।

তার নাম জানো?

সুবীর টুবির হবে। অত মেমরি নেই স্যার।

সুজিত হতে পারে কি?

রাখাল জানে। ও পুরনো লোক।

রিঙ্কুকে কখনও মাতাল অবস্থায় দেখেছ?

না তো স্যার।

কখনও দেখোনি? ভাল করে ভেবে বলো।

না স্যার। রিঙ্কুর বন্ধুরা হয়তো খেত।

তারা কারা?

অনেক ছিল। ইদানীং

বলেই থেমে গেল। রতন।

থামলে কেন?

বলতে ভয় পচ্ছি স্যার। কথা ফাস হলে আমার জান চলে যাবে।

ফাস হবে না। বলো।

ইদানীং রিঙ্কু হাবু জগুদের সঙ্গে ঘুরত। ওরা খুব খচ্চর।

ওদের সঙ্গে মিশত কেন?

বলতে পারব না স্যার। তবে রিঙ্কু একদিন গ্যারেজে গাড়ির বনেটে বসে কুল খেতে খেতে বলেছিল, তোমাদের গ্যারেজে আর কেউ কখনও হামলা করবে না দেখো। আমি হাবু আর জগুকে হাত করেছি।

তুমি কী বললে?

আমি বললাম, খবরদার ওদের খপ্পরে যেয়ো না! তোমাকে শেষ করে দেবে।

রিঙ্কু কী বলল?

হাসল, পাত্তা দিল না। রিঙ্কু স্যার, কারও কথা শুনত না। বাবুর সঙ্গে বিয়েটা হলে বেঁচে যেত।

বিয়ে! বিয়ের কথা উঠেছিল নাকি?

না স্যার। আমার মনে হত, দু'জনকে যেন মানায়।

কেন মনে হত?

কী জানি কেন মনে হত।

রিঙ্কু কি ভজনবাবুকে ভালবাসত বলে তোমার মনে হয়?

হ্যাঁ স্যার, খুব মনে হয়। রিঙ্কু মাঝে মাঝে বাবুর জন্য খাবার নিয়ে আসত, বই আনত, আর বাবুর কাছে এলেই খুব হাসিখুশি থাকত।

আর ভজনবাবু?

বাবু তো স্যার, সবসময়ে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সবসময়েই নানা চিন্তা। বাবু রিঙ্কুকে মাঝে মাঝে বকুনিও দিত।

কীরকম?

বলত, আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করছ, কেন, পড়াশুনো করোগে যাও। কিংবা বলত, এত উড়নচণ্ডী হলে জীবনে কষ্ট পাবে। এইসব আর কী।

ভজনবাবুর কাছে আর কোনও মেয়ে আসত কি?

গাড়ি সারাতে অনেকে আসত।

তারা ছাড়া?

না। স্যার, বাবুর মেয়েছেলের দোষ তেমন ছিল না।

তোমার বাবুকি ঘন ঘন ট্যুরে যেত?

মাঝে মাঝে যেত স্যার।

ঠিক আছে।

কত বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয় শ্যামলীদেবী?

কেন বলুন তো! এসবও কি তদন্তে দরকার হচ্ছে নাকি?

কে জানে কখন কোনটার দরকার পড়ে। বলতে না চাইলে অবশ্য—

আমার বিয়ে হয়। ষোলো বছর বয়সে।

এত কম বয়সে? দেখতে সুন্দর ছিলাম বলে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব পছন্দ করে ফেলেছিলেন। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হয়ে গেল। আর ওইটেই আমার জীবনের সর্বনাশের মূল।

সর্বনাশ কেন?

ষোলোতে বিয়ে, সতেরোয় মেয়ের মা, এই সুন্দর বয়সটা টেরই পেলাম না। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো! সাধে কি এদের ওপর এত রাগ আমার!

সুজিতবাবুর সঙ্গে আপনার চেনা কত দিনের?

প্রায় জন্ম থেকে। ও আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

আপনি কবে ওর প্রেমে পড়েন?

এসব জেনে কী হবে আপনার?

প্লীজ

আপনার কথাবার্তা পুলিশের মতো নয়, আর আপনি বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। সেজন্য বোধহয় আপনি একজন বিপজ্জনক লোক। তবু আমি আপনাকে খুব একটা অপছন্দ করছি না। তাই বলছি, আমাদের শৈশব প্রেম।

আপনি সুজিতকে কখনও প্রেমের কথা জানিয়েছেন?

জানানোর কী? আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবেসেই বড় হয়েছি।

বিয়ের সময় কী রি-অ্যাকশন হল সুজিতবাবুর?

কী আর হবে? ও তো তখন সতেরো বছরের বাচ্চা ছেলে। সবে কলেজে ঢুকেছে। ওর পক্ষে কি আমাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল?

আপনি?

আমি! আমি কেঁদে বিছানা ভাসিয়েছি। কিন্তু রুখে দাড়ানোর মতো মন তখনও তৈরি হয়নি।

আপনি কি ভজনবাবুকে চেনেন?

শ্যামলী হঠাৎ স্থির চোখে চেয়ে বলল, হঠাৎ এ কথা কেন?

বলতে আপত্তি আছে কি?

ওকে কি আমার চেনার কথা?

বলা তো যায় না।

আমি আট বছর আগে চলে গেছি, ও তখন এখানে আসেনি।

সেটা জানি। যে জমিতে ভজনবাবুর গ্যারেজ তার মালিক ছিলেন সুজিতবাবুর কাকা বরুণ গুণ।

তা হতে পারে।

খবর হল, সুজিতবাবুই ভজন আচার্যকে জমিটা কিনতে সাহায্য করেন।

আমি অত জানি না।

সুজিতবাবু ও ভজনবাবুর মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব ছিল।

আমি সেসবের খবর রাখি না।

ভজনবাবু কানপুরে আপনাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছেন।

শ্যামলী স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কিছু বলবেন না?

শ্যামলী একটুও না ঘাবড়ে তার দিকে সপাটে চেয়ে বলল, যদি তাই হয় তাতেই বা কী হল?

কী থেকে যে কী হয় কে বলতে পারে?

ভজনকে আমি চিনতাম। এবার কি ফাঁসি দেবেন আমাকে?

না। ফাঁসির দড়ি ভজনবাবুর জন্যই থাক। আপনি তো ওকে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলেন।

এখনও চাই।

যদি ভজনবাবু নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন?

তবুও–

বলেই থমকে গেল শ্যামলী। সুর পালটে বলল, তা হলে অন্য কথা। কিন্তু ও ছাড়া আর কেউ কালপ্রিট নয়।

ঠিক জানেন?

জানি।

খুনের রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

তার মানে?

কৌতূহল।

শ্যামলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কলকাতায়। তিলজলায় আমাদের একটা ফ্ল্যাট আছে।

রিঙ্কুর মৃত্যুর খবর কখন কীভাবে পেলেন?

প্রথমে খবরের কাগজে। তারপর টেলিগ্রাম পেয়ে কানপুর থেকে সুজিতও টেলিফোন করে।

আপনি তবু দু'দিন পরে বারাসতে এলেন কেন? মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও কি মা দেরি করতে পারে?

পারে, যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কোয়াইট পসিবল। এবং খুব সম্ভব। আপনি যে কলকাতায় আছেন তা শচীনবাবুকে জানাতে চাননি। আপনি ডিভোর্সি স্বামীর বাড়িতে উঠলেন কেন?

তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?

তা নয়, তবু প্রোটোকলে আটকায় হয়তো।

বারাসতে আমার ওঠার জায়গা নেই। বাপের বাড়ি বা সুজিতের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া এ বাড়িটা বিরাট বড়, নীচের তলার এই পোরশনটা আমার জন্য আলাদা করে করা হয়েছিল, বাড়ির অশান্তি এড়ানোর জন্য।

বুঝেছি। একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার।

কী বলুন তো!

রিঙ্কুর পেটে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে।

কে বলল?

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট। একটু ডিলেইড রিপোর্ট।

তার মানে কী? কেউ ওকে মদ খাইয়ে রেপ করেছিল?

সেরকমই অনুমান।

ও।

ভজনবাবু মদ খান না।

ওতে কিছু প্রমাণিত হয় না।

ভজনবাবুর ফাঁসিটা দেখছি একটা পপুলার ডিমান্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কোন শালা রে? কোন শুয়োরের বাচ্চা?

পুলিশ। দরজা খোলো।

ফোট শালা পুলিশ। ফোট বাঞ্চোৎ, খানকির ছেলে।

সঙ্গে মদন নামে যে সেপাইটা ছিল সে চাপা গলায় বলল, স্যার, এ ডেনজারাস ছেলে। মদ খেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ফোর্স না নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। চলুন, ফোর্স নিয়ে আসি।

না। মদন। গন্ধ পেলে পাখি উড়ে যাবে।

ঘর থেকে জঘন্য খিস্তি ভেসে আসছিল।

শবর কাঠের দরজাটায় একটা লাথি মারল। তাতে বোম ফাটার মতো একটা আওয়াজ করে দরজার তলার দিককার প্যানেলটা কিছু অংশ ফেটে গেল।

বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার রাত। শব্দ শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে ‘কে কে’ আওয়াজ উঠল। দু-একটা দরজা খুলে টর্চ মারল কেউ কেউ।

স্যার, এ পাড়া কিন্তু খারাপ। অ্যান্টিসোশ্যালদের ডেন। সবাই ঘিরে ফেললে বিপদ

হবে।

শবর নিস্পৃহ গলায় বলল, কিছু হবে না। ভয় পেয়ো না। এই সাহস নিয়ে পুলিশে চাকরি করো কী করে?

ভিতরের খিস্তি বন্ধ হয়েছে। এবার দরজার কাছ থেকে একটা মেয়ে গলা প্রশ্ন করল, কে?

দরজাটা খুলুন।

কেন খুলব?

তা হলে সরে দাড়ান। দরজা ভাঙা হবে।

হাবু বাড়ি নেই।

শবরের দ্বিতীয় লাথিতে দরজার খিল আর ছিটিকিনি উড়ে গেল। দরজাটা পটাৎ করে। খুলে হাঁ হতেই টর্চ হাতে ভিতরে ঢুকল শবর।

সামনেই একটা মেয়ে। বয়স বেশি নয়, উনিশ-কুড়ি।

তুমি কে?

আমি শেফালি, হাবুর বোন। দাদা বাড়ি নেই।

পথ ছাড়ো।

শবর তড়িৎ পায়ে দু'খানা ঘর ডিঙিয়ে উঠোনে নামল। উঠোনের পিছনে খোলা জমি। শবর মুখ ফিরিয়ে মদনকে বলল, ঘরটা সার্চ করো। ও পালিয়েছে, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

ঠিক আছে স্যার।

শবর তার হোমওয়ার্ক করেই এসেছে। হাবুর সবরকম ঠেক তারা জানা। জমিটা পেরিয়ে সে ডান দিকের একটা কাঁচা রাস্তায় উঠে এল। রাস্তা পেরিয়ে রেললাইন। লাইন পার হয়ে সে একটা নাবালে নেমে স্বাভাবিক পদক্ষেপে হঁটিতে লাগল।

পাঁচু হালদারের বাড়িটা একতলা। সামনে ঘাসজমি আছে। সেটা পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল শবর।

পাঁচু এবার পার্টির নমিনেশন পেয়েছে। ভোটে দাড়াবে। ক্ষমতাশালী লোক।

ভিতরে পাঁচুর গলা পাওয়া যাচ্ছিল, তা তুই এখানে এলি কেন?

কোথায় যাব?

বৃন্দাবনের কাছে চলে যা পিছন দিয়ে। পালা।

অত হুড়ো দিচ্ছেন কেন? যাচ্ছি। পুলিশ কি আর আপনার বাড়িতে আসবে?

যত্ত সব ঝামেলা। এখন গিয়ে গা-ঢাকা দে, কাল সকালে দেখা যাবে।

ফালতু আমার ওপর হামলা করছে পাঁচুদা।

এখন যা। কাল সকালে দেখব। যা।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল পিছন দিকে।

পিছনে আধা জংলা পতিত জমি। কয়েকটা বড় গাছ। বৃষ্টি পড়ছিল। হাবু ছুটছিল প্রাণপণে। মাটি পিছিল, বিপজ্জনক, পেটে মদের গ্যাঁজলা, ঠিক ব্যালান্স নেই শরীরের।

পিছন থেকে ছায়ামূর্তিটা কখন এগিয়ে এল সে বুঝতেই পারেনি। একটা মজবুত হাত তার কাঁধের কাছে জামাটা চেপে ধরল। তারপর একটা প্রবল ঝাঁকুনি। আপনা থেকেই প্যান্টের পকেটে হাত চলে গিয়েছিল হাবুর। রিভলভারটা ধরেও ফেলেছিল। কিন্তু বের করতে পারল না। তার আগেই একটা বিদ্যুৎগতির ঘুসি তাকে শুইয়ে দিল।

মিনিট দশেক পরে দু’জনে বৃষ্টির মধ্যেই মুখোমুখি বসা। মাটির ওপরেই। জলকাদা থিকথিক করছে। ভিজে কুম্পুস হয়ে যাচ্ছে দু’জন।

শবর শান্ত গলায় বলল, বল।

কী বলব? ও আমাদের কাছে আসত। বন্ধুত্ব করতে চাইত। আমরা কী করব?

বন্ধুত্ব করতে চাইত কেন?

ও চাইত যাতে আমরা ভজন আচার্যর পিছনে না লাগি।

ওর ইন্টারেস্ট কী?

কী আবার। মহব্বত।

বুঝেছি। বলো।

ঘুরেফিরে আসছিল। বারবার আসত।

টাকা পয়সা দিত?

না।

তোমরা ওকে কিডন্যাপ করে বাপের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কথা ভেবেছিলে?

না। ওটা আমাদের লাইন নয়।

বলো।

আমার ওকে ভাল লাগত। ওকে চাইতাম। পুরুষচাটা মেয়েছেলে তো।

বুঝেছি। আগে বাড়ো।

মদ খেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই দিন বিকেলে ও গ্যারেজের কাছে আমাকে থাকতে বলেছিল।

কেন?

সেদিন ওর পাঁচুদার কাছে যাওয়ার কথা ছিল।

সেটাই বা কেন?

গ্যারেজ নিয়ে লোকালিটিতে ঝামেলা হচ্ছে তার একটা মিটমাটের জন্য।

সেটা কি ভজনবাবু জানতেন?

বোধহয় না। ভজনবাবু ত্যাঁদোড় লোক, অন্যের সাহায্য নেবে না। মেয়েটাকে পাত্তা দিত না, কিন্তু মেয়েটা ওর জন্য পাগল ছিল।

আগে বাড়ো।

আমি স্কুটার নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওখানে ছিলাম। রিঙ্কু সাইকেলে এসে গ্যারেজে সাইকেলটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমার স্কুটারে ওঠে।

কেউ তোমাদের দেখেনি?

বোধহয় না। গ্যারেজ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে বাঁয়ে একটা জংলা জমি দেখেছেন তো। ওটা দিয়ে শর্টকাট হয়।

রিঙ্কুকে মদ খাওয়াল কে?

ও নিজেই খেতে চাইল। আমার কাছে ছিল একটা বোতল।

ও খেত নাকি মাঝে মাঝে?

হ্যাঁ। ইদানীং খেত।

কোথায় খেলে?

ওই জঙ্গলে বসে।

পাচুবাবুর বাড়িতে যাওনি?

পাঁচুদা সেদিন ছিলেন না। কলকাতায় গিয়েছিলেন।

সেটা রিঙ্কু জানত?

না। আমি ওকে খুব চাইছিলাম।

কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

ওখানেই–

রিঙ্কু বাধা দেয়নি?

হ্যাঁ। খুব চেঁচিয়ে ছিল, খিমচে দিয়েছিল। কিন্তু তখন আমি পাগল।

কখন মারলে?

প্রথমে মারিনি। ওখানে বসে বসে ঘণ্টা দুই-তিন দু'জনে ড্রিঙ্ক করি। অনেক কথা হয়।

প্রেমের কথা?

ওইরকমই সব। ও আমাকে বলছিল যে ও ভজনবাবুকে ভালবাসে, তাই কিছু করার নেই। তবে আমার কথা ওর মনে থাকবে–এইসব।

আগে বাড়ো। কখন রেপ করেছিলে?

রাত ন’টা সাড়ে ন’টা হবে। যখন চেঁচাল তখন মুখ চাপা দিতে হয়েছিল।

আগে বাড়ো।

ও বলেছিল সবকিছু বলে দেবে সবাইকে। আমি ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন শালা আমিও তো মাতাল। কী কথায় কী কথা হল মাথায় কীরকম রক্ত চড়ে গেল।

গলা টিপে?

তাই হবে মনে হয়। কী করেছি। খেয়াল নেই। ওখানে বসে আরও মদ খেলাম। রাত একটা নাগাদ বৃষ্টি নামল। তখন নিয়ে গিয়ে মাঠটায় ফেললাম।

লাশটা সরালে কেন?

মনে হয়েছিল ওখানে পুলিশের কুকুর আমার গন্ধ পাবে। মদের বোতলটাও অন্ধকারে কোথায় ছুড়ে ফেলেছিলাম। মনে হল, বোতল পেলে সর্বনাশ।

পুলিশের কাছে কনফেস করবে?

না করলে?

শোনো হাবু, কনফেস করলে তোমার সাজা হবে। যদি বাইচান্স তুমি ছাড়া পেয়ে যাও তা হলেও আমার হাত থেকে বাঁচবে না। আর কনফেস যদি না করো তা হলেও বাঁচবে না। আমি তোমাকে মারবই।

যদি সাজা হয়?

তা হলে আমার কিছু আর করার থাকবে না।

আমাকে রাতটা ভাবতে দিন।

শবর হাসল, পালাবে না পাঁচুবাবুর বাড়ি যাবে? যা-ই করো, আমার হাত থেকে রেহাই নেই। শুনে রাখো, আমার চেয়ে বড় গুন্ড এখনও জন্মায়নি। থানায় চলো।

এখনই।

হ্যাঁ। পাঁচুবাবু যদি তোমাকে ছাড়ানোর জন্য কাল সকালে থানায় আসে তা হলে তাকে বোলো, আমার হাতে র্তার নির্ঘাত মৃত্যু। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উনি আপনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছিলেন।

খুব ভাল। চলো।

সময় দেবেন না একটু?

না। যা বললাম মনে রেখো।

৬. অন্যরকম দেখাচ্ছে

আপনাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেন বলুন তো?

কীরকম?

স্যাড অ্যান্ড ক্রেস্টফলেন। মনে হচ্ছে কান্নাকাটিও করেছেন।

আপনি আমার এত বড় ক্ষতিটা কেন করলেন শবরবাবু?

ক্ষতি। সে কী! আমি কী করলাম?

মানুষটাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। দিব্যি ছিলাম। কেন আপনি আমাকে ওর কাছে নিয়ে গেলেন?

ম্যাডাম, রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া তো কিছু নয়।

ক'দিন ধরে আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না, সবসময়ে কেমন অস্থির অস্থির লাগছে।

কেন?

ওরকম মারা-খাওয়া চেহারা, ওরকম ভেঙে-পড়া, আর হাতজোড় করে ওই ক্ষমা চাওয়া–কী করে ভুলি! কতবার ইচ্ছে হয়েছে একাই গিয়ে দেখা করি, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করি, কিংবা কী যে সব মাথামুণ্ডু ভেবেছি।

এবং কেঁদেছেন!

হ্যাঁ।

কান্নার কী আছে?

বেশ করেছি। কেঁদেছি যে কেউ কাঁদবে।

শবর হাসল, আর কী হল বলুন। কোনও সিদ্ধান্তে এলেন?

কী সিদ্ধান্তে আসব? আপনাদের মামলা কতদূর?

শেষের দিকে।

তার মানে কী। চার্জশিট দেওয়া হয়ে গেছে?

চার্জশিট তৈরি হচ্ছে।

তা হলে ওর রেহাই নেই।

না। উনি রেহাই পেলেই বা আপনার কী?

তা ঠিক। কিন্তু–

কিন্তু কী?

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

তা তো হতেই পারে। কিন্তু তা বলে তো একজন ক্রিমিন্যালকে ক্ষমা করা যায় না।

ক্ষমা না হয় না-ই করলেন। অপরাধ করে থাকলে শাস্তি হোক। কিন্তু ওরকমভাবে মারে কেউ?

মানছি মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো মরেই যেত। ভজন আচার্য খুব শক্ত ধাতুতে গড়া। হান্ড্রেড পারসন।

স্বাস্থ্য ভাল বলে বলছেন?

না। স্বাস্থ্যের চেয়েও মজবুত ওর মন। এ কারেজিয়াস ম্যান।

কী লাভ আর তাতে?

লাভ নেই। অবশ্য।

কী পানিশমেন্ট হবে ওর বলুন তো! ফাঁসি?

যাবজ্জীবনও হতে পারে।

যাবজ্জীবন তো চৌদ্দো বছর, তাই না?

হ্যাঁ। তবে ভাল বিহেভ করলে মেয়াদ কিছু কমে যায়।

কত কমবে?

চার-পাঁচ বছরও হতে পারে।

তাও তো দশ বছর। কম কী?

হ্যাঁ। জীবনের সবচেয়ে প্রসপারাস সময়টায় দশ বছর আটক থাকাটা দুঃখজনক।

ওর দোষ কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে?

কিছু ফাঁক তো থাকবেই। তবে প্রমাণ হয়ে যাবে।

আমি ঠিক করেছি, আপনারা আমাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকলে আমি ওর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলব না।

সে কী ম্যাডাম! আপনি যে ইম্পট্যান্ট উইটনেস।

সেজন্যই আমি উলটো কথা বলব।

কী মুশকিল। আপনার সঙ্গে ওঁর মিট করানোটাই যে ভুল হল।

মিট করালেন কেন? আমার যে কী সর্বনাশ করলেন।

লোকটাকে কি ক্রিমিনাল মনে হয়নি। আপনার?

তা বলছি না।

তা হলে কী বলছেন ম্যাডাম?

কী বলছি তা আমিও জানি না। সেই মেয়েটা কি রিঙ্কু?

কোন মেয়েটা?

রতন যার কথা শুনতে পেয়েছিল ওর ঘরে।

ডাউটফুল।

তা হলে একটা লুপ হোল তো আছে।

তা আছে। আমি জিপ নিয়ে এসেছি। আজ যাবেন?

হঠাৎ মুখখানা উজ্জ্বল হল বিভাবরীর। বলল, হ্যাঁ। আমাকে দু'মিনিট সময় দিন।

দু'মিনিট মাত্র! অত তাড়া নেই। মেয়েদের সাজতে একটু সময় লাগে জানি। টেক ইয়োর টাইম, আমি বসছি।

সাজব! সাজব কেন? জাস্ট পোশাকটা পালটে আসছি।

দু'মিনিটই লাগল। মুখে পাউডারটুকুও না ছুইয়ে বেরিয়ে এল বিভাবরী, চলুন।

জিপে শবর বলল, আপনার ভিসিবল চেঞ্জ হয়েছে।

হয়েছে, আমিও তা জানি।

দ্যাটস গুড।

ও এখন কেমন আছে?

বেটার। মাচ বেটার।

ওর যদি যাবজজীবন হয় তা হলে গ্যারেজীটার কী হবে?

আপনাদের যখন ডিভোর্স হয়নি তখন ওই গ্যারেজের ওপর আপনারও অধিকার আছে।

যাঃ।

আইন তো তাই বলে।

আমি গ্যারেজ নিয়ে কী করব? গাড়ির কিছুই জানি না।

তা হলে বেচে দিতে পারেন। অনেক খিদের আছে। ভাল দামও পাবেন।

পাগল! ও অত সাধ করে গ্যারেজ করেছিল, বেচব কেন?

সেও ঠিক কথা। তা হলে বেচবেন না।

ও কি আমার কথা কিছু বলেছে?

হ্যাঁ।

কী বলেছে?

আপনাকে এই নোংরা মোকদ্দমায় টেনে আনার জন্য ভজনবাবু আমাদের ওপর একটু অসন্তুষ্ট।

ও।

উনি হয়তো আপনাকে এখনও ভালবাসেন।

কী যে বলেন!

ভুলও বলে থাকতে পারি। আমি তো শুখা মানুষ।

আমি ভাবছি ও রিঙ্কুকে রিফিউজ করল কেন। আর রিফিউজ করে রেপই বা করবে কেন, খুনই বা করবে কেন?

আপনিই বলুন।

আপনারা ভাল করে তদন্ত করেননি।

আপনার ইন্সটিংক্ট কী বলে?

বলে এটা অসম্ভব ব্যাপার।

আজ উনি অনেকটাই সুস্থ। ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

আমার কাছে বলবে কেন?

কেন তার কোনও কারণ নেই। হয়তো বলবেন।

আমি কিন্তু আদালতে কিছু বলব না ওর বিরুদ্ধে।

মুশকিল।

কিছুতেই বলব না।

তা হলে তো সাক্ষী হিসেবে আপনাকে বাদ দিতে হয়।

তা কেন দেবেন? আমারও তো বক্তব্য আছে।

আপনি যে মামলা কাঁচিয়ে দেবেন।

দেবই তো।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি কি ভজনবাবুর প্রতি সফট হয়ে পড়ছেন?

আমি সিমপ্যাথেটিক। ওকে আমার ক্রিমিন্যাল মনে হচ্ছে না।

লজিকটা কী?

ওই তো বললাম, যে ওকে বিয়ে করতে চায় তাকে ও হঠাৎ রেপ করতে যাবে কেন?

গুড লজিক। কিন্তু এমন তো হতে পারে সেই রাতের মেয়েটা রিঙ্কু ছিল না।

হতে পারে। আপনারা ঠিকমতো তদন্ত করলেন না যে!

শবর একটু হাসল।

ভজন ধীরে ধীরে তার ম্লান, করুণ, ব্যথাতুর মুখখানা তুলল।

কষ্ট পেয়ো না। আমার বুদ্ধির দোষ।

তোমার দোষ? নাকি পুলিশ মিথ্যে করে সাজিয়েছে?

মিথ্যেটা তো সত্যি হয়নি।

তার মানে?

পুলিশ খুনিকে ধরেছে।

কী বলছ?

হাবু বলে ছেলেটা।

কই, আমাকে শবরবাবু কিছু বলেননি তো!

ভজন একটু হাসল, সারপ্রাইজ দিতে ভালবাসেন বোধহয়।

ভজনের দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিভাবরী উত্তেজিত গলায় বলল, সত্যি বলছি? সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বিভাবরী। টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইল ভজন। কী করবে বুঝতে পারল না।

ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল শবর।

ম্যাডাম, দি ড্রামা ইজ ওভার।

চোখের জলে মাখামাখি মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টি হেনে বিভাবরী বলল, আপনি কেন বলেননি। আমাকে?

আপনি একজন অ্যান্টিরোমান্টিক লোককে বিয়ে করেছেন দেখছি। এই সময়ে এর তো কিছু রোমান্টিক অ্যাডভানসেস করার সুযোগ ছিল। কিন্তু দেখুন কেমন পাথরের মতো বসে আছেন।

বিভাবরী বেঁঝে উঠে বলল, এরকমই ভাল।

ভজনবাবুরিলিজ হয়ে গেছেন। এবার চলুন মিস ভট্টাচার্য।

থাক আর ইয়ারকি করতে হবে না।

কীসের ইয়ারকি?

আপনি আমাকে এখন থেকে মিসেস আচার্য বলে ডাকতে পারেন।

বিকেলের মৃত্যু

০১. সাহেবরা বলে লাঞ্চ, কেরানিরা বলে টিফিন

সাহেবরা বলে লাঞ্চ, কেরানিরা বলে টিফিন। সে যাই হোক, ঠিক দুপুরবেলা একটু আলগা সময় পাওয়া যায়। এই সময়টা বসে বসে শশা, ছোলাসেদ্ধ আর টোস্ট খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না লীনার। তার সিট ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। সাহেবের সেক্রেটারি হওয়ার অনেক ঝামেলা। বেশিক্ষণ দুরে, আউট অফ ইয়ারশট থাকার নিয়ম নেই, সব সময়েই একটা কঁটাওয়ালা চেয়ারে বসে থাকার মতো।

লীনা ঘড়ি দেখে টিফিন-টাইম শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে সবে তার স্টেনলেস স্টিলের টিফিন-বাক্সটা খুলেছে, এমন সময় ইন্টারকম বাজল।

সাহেবের গলা, একটু আসুন তো।

লীনা উঠে সুইং-ডোর খুলে ঢুকল। সাহেবের ঘরটা বিশাল বড়। দেয়াল থেকে দেয়াল অবধি মেজে জোড়া নরম মেজেন্টা রঙের কার্পেট। ইংরিজি এল অক্ষরের ছাদে মস্ত একটা টেবিল। ওপাশে গাঢ় সবুজ রঙের বড় রিভলভিং চেয়ার।

কিন্তু সাহেব অর্থাৎ ববি রায় অর্থাৎ কোম্পানির একনম্বর ইলেকট্রনিক ম্যাজিসিয়ান এবং দুনম্বর টপ বস চেয়ারে বসা অবস্থায় নেই। রোগা, কালো, মোটামুটি ছোটখাটো চেহাবার অস্থিরচিত্ত লোকটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। বাইরে বিশেষ কিছু দেখার নেই। এয়ার কন্ডিশনের জন্য কাচে আঁটা জানালা। ওপাশে একটা সরু রাস্তার পরিসর, তারপর আবার বাড়ি। বাড়ি আর বাড়িতে চারদিক কণ্টকিত এই মিডলটন স্ট্রিটে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকার মানেই হয় না।

ইয়েস স্যার।

ববি রায় ফিরে তাকালেন। সকাল থেকে এই অবধি বার চারেক দেখা হয়েছে। চারবারের কোনওবারই মুখে মেঘ ছিল না। এখন আছে। ববি রায় হচ্ছেন সেই মানুষ, যাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে তার কাজ, তার কম্পিউটার ও অন্যান্য অত্যাশ্চর্য যন্ত্রপাতি, তিনি এতই খ্যাতিমান যে তাকে একবার লন্ডন থেকে একরকম কিডন্যাপ করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ববি রায়ের যেতে হয় আমেরিকা থেকে শুরু করে চিন-জাপান অবধি। কখনও শিখতে, কখনও শেখাতে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ববি রায় নিশ্চয়ই কোম্পানির কাছ থেকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা বেতন বাবদ পান, আরও কয়েক লক্ষ টাকা কোম্পানি হাসিমুখে বহন করে টুর বাবদ। ববি রায় বোধহয় আজও ভেবে ঠিক করতে পারেননি যে, এত টাকা দিয়ে তিনি প্রকৃতই কী করবেন। কোম্পানি তাঁকে লবণ হ্রদে বিশাল বাড়ি করে দিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য গাড়ি এবং দিন-রাতের জন্য দু'জন শফার, কলকাতার সর্বোত্তম নার্সিং হোমে পুরো পরিবারের কোম্পানির খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের বিল, গাড়ি সারানোর খরচ কিছুই ববি রায়ের পকেট থেকে যায় না। কোম্পানি তাকে শুধু দেয় আর দেয়। কোম্পানি বোকা নয়। ববি রায়ও কোম্পানিকে তেমন কিছু দেন যা কোটি কোটি টাকার দরজা খুলে দিচ্ছে, উন্মোচিত করছে নতুন নতুন দিগন্ত।

দ্বিতীয়বার লীনাকে বলতে হল, স্যার, কিছু বলছিলেন?

বসুন।–গলাটা গম্ভীর।

লীনা অবাক হল। তাকে কখনও ববি রায় বসতে বলেননি।

লোকটার জন্ম ফরাসি দেশে, ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার বাবার সূত্রে। জীবনের প্রথম বিশটা বছর কেটেছে বিদেশে। সুতরাং লোকটা যে ভাল বাংলা জানবে না এটা বলাই বাহুল্য। ববি রায় কদাচিৎ মাতৃভাষা বলেন। এবং বলেন অনেকটা সাহেবদের বাংলা বলার মতোই।

বস হিসেবে লোকটা ভাল না মন্দ তা আজও বুঝতে পারেনি লীনা। মাত্র তিন মাস আগে সে এই অতি বৃহৎ মাল্টি-ন্যাশনালে বরাতের জোরে চাকরিটা পেয়ে গেছে। তবে তিন মাসে সে এটা লক্ষ করেছে যে, ববি রায়ের তাকে খুব কমই প্রয়োজন হয়। ববি বছরে বার দশেক বিদেশে যান। ববি রায় ডিকটেশন দেওয়া পছন্দ করেন না। নিজের কাজ ছাড়া বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে লোকটি নিতান্তই অজ্ঞ। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই বিপুল পড়াশুনোর চাপে লোকটির ইলুপ্তি ঘটতে

চলেছে। প্রবল রকম অন্যমনস্ক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা চোখে পড়ে, তা হল লোকটার এক অবিরল অস্থিরতা। লীনা দেখেছে, লোকটা কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে বার বার উঠে পড়েন, টেবিলের উপর রাখা ছাইদানি, পেনসিল বক্স, এটা ওটা বার বার এধার ওধার করেন, বার বার চুলে। হাত বোলান, নিজের কান টানেন, নাকের ডগাটা মুঠো করে চেপে ধরেন। এত দায়িত্বশীল এবং উচ্চ পদে আসীন কোনও মানুষের পক্ষে এই অস্থিরতা একটু বেমানান।

এখন ববি রায়কে আরও একটু অস্থির দেখাচ্ছিল। লীনাকে বসতে বলে তিনি চেয়ারের পিছনে অনেকটা পরিসর জুড়ে চঞ্চল এবং দ্রুত পায়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে দু'হাতের মুঠোয় মাথার চুলগুলো চেপে ধরলেন। সিলিং-এর দিকে চোখ।

লীনার মনে হল, এই চঞ্চলমতি লোকটি এইভাবেই চুল টেনে টেনে নিজের মাথায় প্রায় টাক ফেলে দিয়েছেন।

হঠাৎ ববি রায় লীনার দিকে তাকিয়ে অতিশয় বিরক্তির গলায় প্রশ্ন করলেন, হোয়াই গার্লস?

লীনা একেবারে ভোম্বল হয়ে চেয়ে রইল। লোকটা বলে কী রে?

এবার লীনার ফোঁস করার মতো অবস্থা হল। লোকটা বোধহয় তাকে এবং মহিলা সমাজকে অপমান করতে চায়। সে মেরুদণ্ড সোজা করে এবং মুখটা যথেষ্ট ওপরে তুলে বলল, আই ফাইন্ড মেন মোর ডিসগাস্টিং মিস্টার রয়। প্লিজ ওয়াচ হোয়াট ইউ সে।

ববি রায় তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। লীনার কথাটা বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে হল না। কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং অস্বচ্ছন্দ বাংলা বললেন, আপনার মেয়ে হওয়ার কী দরকার ছিল? আঁ! হোয়াই আই অলওয়েজ গেট এ গার্ল অ্যাজ সেক্রেটারি?

এরকম প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে লীনা খুব দুরূহ কল্পনাতেও তা আন্দাজ করতে পারে না। এত অবাক হল সে যে জুতসই দূরের কথা, কোনও জবাবই দিতে পারল না।

ববি রায় আচমকা লীনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং পিছন ফিরে সোজা জানালা বরাবর হেঁটে যেতে যেতে বললেন, ইট গিভস মি ক্রিপস হোয়েনএভার দেয়ার ইজ এ গার্ল ডুয়িং মেনস জব।

লীনা এবার যথেষ্ট উত্তপ্ত হল এবং সপাটে বলল, ইউ আর এ মেল-শৌভিনিস্ট। ইউ আর এ-এ…

ববি রায়কের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের প্রস্তরমূর্তির মতো। মিনিটখানেক শব্দহীন।

লীনা উঠতে যাচ্ছিল। লোকটাকে তার এত খারাপ লাগছে!

প্রস্তরমূর্তির থেকে আচমকাই লোকটা ফের স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন। কী যেন বিড় বিড় করে বকছেন, শোনা যাচ্ছে না। পৃথিবীর মহিলাদের উদ্দেশে কটুকাটব্য নয় লে? হয়তো খুবই অশ্লীল সব শব্দ! লীনা কণ্টকিত হল রাগে ক্ষোভে এবং অপমানে।

এখন কি তারও উচিত পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ পুরুষজাতির উদ্দেশে বিড়বিড় করে কটুকাটব্য করা? কী করবে লীনা? এই অপমানের একটা পালটি নেওয়া যে একান্তই দরকার।

ববি আবার অতি দ্রুত পায়ে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলটার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টক করে একটা সুইচ টিপলেন। টেবিলের ওই অংশটায় একটা ভিডিয়ো ইউনিট লুকোনো আছে, লীনা জানে। কমপিউটারের সঙ্গে যুক্ত এই ইউনিটটা বিস্তর তথ্যে ভরা আছে। কিন্তু ববি কী চাইছেন তা লীনা বুঝতে পারছে না।

স্প্রিং-এ ভর দিয়ে খুদে ইউনিটটা ডুবুরির মতো উঠে এল ওপরে।

ববি অতি দ্রুত অভ্যস্ত আঙুলে চাবি টিপলেন। পরদায় ঝিক করে ফুটে উঠল একটা ফটো। নীচে নাম, লীনা ভট্টাচার্য। আবার চাবি টিপলেন ববি। পরদায় হরেক নম্বর আর অক্ষর ফুটে উঠতে লাগল যার মাথামুন্ডু লীনা কিছুই জানে না। সম্ভবত কোড।

ববি ভ্রু কুঁচকে খুব বিরক্তির চোখে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে ছিলেন। কী দেখলেন উনিই জানেন। তবে মুখখানা দেখে মনে হল, যা দেখলেন তাতে মোটেই খুশি হলেন না।

অপমানের বোধ লীনার প্রবল। কারও বায়োডাটা বা ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস তার সামনেই চেক করা কতদূর অভদ্রতা এই লোকটা তাও জানে না। কিংবা ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করতে চাইছে লোকটা!

ববি রায় সুইচ টিপে ভিডিয়ো বন্ধ করে দিলেন এবং সেটা আবার ডুবে গেল টেবিলের তলায়। ববি রায় মাথা নেড়ে বললেন, দেখা যাচ্ছে একমাত্র মোটরগাড়ি চালাতে জানা ছাড়া আপনি আর তেমন কিছুই জানেন না।

এই নতুন দিক থেকে আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না লীনা। আজ লোকটার হল কী? মাথা-টাথা গন্ডগোল হয়ে যায়নি তো! এইসব উইজার্ডরা পাগলামির সীমানাতেই বাস করে।

প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেক সময়েই পাগলামির লক্ষণ ভীষণ প্রকট।

কিন্তু কথা হল, লোকটার এত বড় বড় কাজ থাকতে হঠাৎ লীনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার পড়ল?

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির করল। প্রতি-আক্রমণ করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন নিজেকে সংহত, একমুখী ও গনগনে করে তোলা। লীনা একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, মিস্টার বস,

কিন্তু ববি তার কথা শোনার জন্য মোটেই আগ্রহী নন। তিনি উদভ্রান্তের মতো ফের জানালা কাছে চলে গেলেন। হাতটা ওখান থেকেই তুলে লীনাকে চুপ থাকবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর পুরো এক মিনিট নীরবতা পালন করে রে দাঁড়ালেন।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, গাড়ি চালানোর রেকর্ডও আপনার খুব খারাপ। গত এক বছরে তিনটে পেনাল্টি। ভোর ব্যাড। আপনার দাদা একজন এক্স-কনভিক্ট। ইউ লাভ পোয়েট্রি অ্যান্ড মিউজিক। দ্যাটস অফুল। হরিবল। ইউ হ্যাভ ইমোশন্যাল ইনভলভমেন্ট উইথ এ ভ্যাগাবন্ড।

পর পর বজ্রাঘাত হলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি স্তম্ভিত হত না লীনা। তার সমস্ত শরীরটা যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল অপমানে। এমনকী সে মুখ পর্যন্ত খুলতে পারছে না। মনে হচ্ছে, লক জ।

ববি চড়াই পাখির মতো চঞ্চল পায়ে ফের জানালার কাছে চলে গেলেন।

লীনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে সে বলল, ইউ আর এ স্কাউন্ড্রেল মিস্টার রয়। এ ডাউনরাইট স্কাউন্ড্রেল। আই অ্যাম লিভিং।

ববি রায় কথাটা শুনতে পেলেন বলে মনেই হল না। কোনও বৈলক্ষণ নেই। প্রস্তরমূর্তির মতো আবার নীরবতা।

লীনার শরীর এত কাঁপছিল যে, দরজা অবধি যেতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহ হচ্ছে।

ভারী দরজাটা খুলে লীনা প্রায় টলে পড়ে গেল নিজের চেয়ারে বসে খানিকক্ষণ দম নিল। শরীর জ্বলছে, বুক জ্বলছে, মাথা জ্বলছে। কিছুক্ষণ সে কিছু ভাবতে পারল না। টাইপরাইটারে একটা রিপোর্ট অর্ধেক টাইপ করা ছিল। সেটা টেনে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল লীনা। নতুন দুটো কাগজ কার্বন দিয়ে লোড করল। ইস্তফাপত্র।

কী-লোর্ডে আঙুল তুলতে গিয়েও থমকে গেল লীনা। কী বলছিল লোকটা? গাড়ি চালানোতে তিনবার পেনাল্টি? দাদা এক্স-কনভিক্ট? কবিতা ও গানের প্রতি আসক্তি? একজন ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে

প্রেম?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এসব খবর একে কে দিয়েছে। পুলিশও তো এত কিছুর খোঁজ নেয় না কোনও সরকারি কর্মচারীর! এ লোকটা জানল কী করে?

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল লীনা। কী করবে? গিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরবে? কী করে জানলেন আপনি এত কথা? আর কেনই বা?

ইন্টারকমটা পি করে বেজে উঠল। লীনা ঘৃণার সঙ্গে তাকাল টেলিফোনটার দিকে। ববি রায় আর কী চায়? আরও অপমানের কিছু বাকি আছে নাকি?

লীনা একবার ভাবল ফোনটা ধরবে না। তারপর ধরল। অত্যন্ত খর গলায় সে বলল, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। আই অ্যাম লিভিং।

ববি রায় কিছু বললেন না প্রথমে। নীরবতা। গিমিক?

লীনা টেলিফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ববি রায়ের গলা শোনা গেল, একবার ভিতরে আসুন।

না। যথেষ্ট হয়েছে।

খুব ক্লান্ত গলায় ববি বললেন, গার্লস আর সেম এভরিহোয়ার। নেভার সিরিয়াস। অলওয়েজ ইমোশন্যাল।

আপনি মেয়েদের কিছুই জানেন না।

হতে পারে। কিন্তু কথাটা জরুরি। খুব জরুরি।

আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

প্লিজ।

লীনা ঝাং করে ফোনটা রেখে দিল। একবার ভাবল, যাবে না। তারপর মনে হল, শেষবারের মতো দেখেই যায় ব্যাপারটা।

ববি রায়ের ঘরে ঢুকে লীনা দেখল, প্রশান্ত মুখে লোকটা চেয়ারে বসে আছে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। কিন্তু অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা কিছু বলার আগেই লীনা বলল, আপনার কম্পিউটারে আমার সম্পর্কে কয়েকটা ভুল ইনফরমেশন ফিফড করা আছে। প্রয়োজন মনে করলে শুধরে নেবেন। প্রথম কথা, আমি মিসেস নই, মিস। আমার দাদা এক্সকনভিক্ট নন, পোলিটিক্যাল প্রিজনার ছিলেন। আর ভ্যাগাবন্ড

ববি রায় হাত তুলে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন লীনাকে। তারপর বললেন, ইররেলেভেন্ট।

আমি জানতাম না যে, আপনারা আমার পিছনে স্পাইং করেছেন। জানলে কখনও এই কোম্পানিতে জয়েন করতাম না।

ববি রায় অত্যন্ত উদাসীন চোখে চেয়ে ছিলেন লীনার দিকে। বোঝা যাচ্ছিল, লীনার কথা তিনি আদৌ শুনছেন না।

আচমকা লীনার কথার মাঝখানে ববি রায় বলে উঠলেন, ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ ম্যানস জব।

তার মানে?

ববি রায় নির্বিকারভাবে সামনের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু আর তো সম্ভব নয়। সময় এত কম! আপনি একটা কাজ করবেন মিস্টার রয়?

উঃ?

আপনি ইমিডিয়েটলি কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে দেখা করুন। ইউ আর নট উইদিন ইয়োরসেলফ।

ববি রায় লীনার দিকে খুব তাচ্ছিলোর সঙ্গে চেয়ে বললেন, না, অত সময় নেই। টাইম ইজ দি মেইন ফ্যাক্টর। দে উইল স্ট্রাইক এনি মোমেন্ট নাউ। নো ওয়ে। নাথিং ডুয়িং।

ইউ হ্যাভ গন আউট অফ ইয়োর রকার।

ববি রায় মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে লীনার কথাটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর আকস্মিকভাবে বললেন, মিসেস ভট্টাচারিয়া—

লীনার প্রতিবাদে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল। তবু সে কণ্ঠ সংযত রেখে বলল, মিসেস নয়, মিস।

মে বি, মিস ভট্টাচারিয়া, আপনি কি বিশ্বাসযোগ্য?

লীনা ডান হাতে কপালটা চেপে ধরে বলল, ওঃ, ইউ আর হরিবল। প্র

শ্নটা খুবই গুরুতর। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?

লীনা বাঙ্গ করে বলল, আপনার কম্পিউটার কী বলে?

কম্পিউটার বলছে, ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ ম্যানস জব।

হোয়াট জব?

আপনি মোটরবাইক চালাতে জানেন?

না।

ক্যান ইউ রান ফাস্ট?

জানি না।

আপনি কি সাহসী?

আপনার কম্পিউটারকে এসব জিজ্ঞেস করুন।

কম্পিউটারের ওপর রাগ করে লাভ নেই। কাজটা জরুরি। আপনি পারবেন?

লীনার রাগটা পড়ে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হল, ববি রায় তাকে সত্যিই কিছু বলতে চাইছেন। কাজটা হয়তো-বা জরুরিও।

লীনা ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল, আপনি সংকেতে কথা বললে আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

ববি রায় কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে লীনার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এখানে নয়। উই মে মিট সামহোয়ার আউটসাইড দিস অফিস।

তার মানে?

ববি রায় টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসে বললেন, ওরা এ ঘরে দুটো বাগ’ বসিয়ে রেখেছিল।

বাঘ?

বাঘ! আরে না। বাগ মানে স্পাইং মাইক্রোফোন। ইলেকট্রনিক।

ওঃ।

আমি দুটো রিমুভ করেছি। কিন্তু আরও দু’-একটা থাকতে পারে। এখানে কথা হবে না।

লীনা ভয়ে বলল, কারা বসিয়েছিল?

জানি না। তবে দে নো দেয়ার জব।

আমাকে কী করতে হবে তা হলে?

একটা জায়গা ঠিক করুন। আজ বিকেল পাঁচটার পর–

না। আমার থিয়েটারের টিকিট কাটা আছে।

ববি থমকে গেলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর মানুষটার মুখে এক আশ্চর্য হাসি ফুটল। ববিকে কখনও কোনও দিন হাসতে দেখেনি লীনা। সে অবাক হয়ে দেখল, লোকটার হাসি চমৎকার। নিষ্পাপ, সরল।

পরমুহূর্তেই হাসিটা সরিয়ে নিলেন ববি। খুব শান্ত গলায় বললেন, যাবেন। আফটার দি ফিউনারেল।

তার মানে?

আজকের থিয়েটারটা আপনাকে স্কিপ করতে অনুরোধ করছি। যে-কোনও সময়েই ওরা আমাকে খুন করবে। সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমি অনেকদিন ধরেই এসব বিপদ নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু দেয়ার ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইমিডিয়েটলি আফটার মাই ডেথ।

লীনা এত ভয় খেয়ে গেল যে চোখের পাতা ফেলতে পারল না। লোকটা কি সত্যিই পাগল?

ববি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে বলুন তো! না, দাঁড়ান। এ ঘরে কথা বলাই ভাল। আপনি একটা কাজ করুন। আমাকে আপনার চেনা জানা কারও ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে দিন, আর আপনি সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। এখন আড়াইটে বাজে। আমি আপনাকে সাড়ে তিনটে নাগাদ ফোন করব।

ব্যাপারটা একটু ড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে না তো?

হচ্ছে। রিয়াল লাইফ ড্রামা। কিন্তু সময় নষ্ট করবেন না। যান।

লীলা উঠল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার রেজিগনেশন লেটারটা–?

ববি রায় আবার হাসলেন। বললেন, আই অ্যাম রাইটিং মাই ডেথ সেনটেন্স।

লীনা বেরিয়ে এল। ব্যাগ গুছিয়ে নিল। তারপর টেলিফোন নম্বরটা একটা চিরকুটে লিখে যখন ববির ঘরে ঢুকল তখন ববি টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন।

মিস্টার রায়।

ববি মাথা তুললেন না। শুধু হাতটা বাড়ালেন। ভুতুড়ে ভঙ্গি।

লীনা চিরকুটটা হাতে দিতেই হাতটা মুঠো হয়ে গেল।

লীনা করিডোরে বেরিয়ে এল। দু’ধারে বড় অফিসারদের চেম্বার। লাল কার্পেটে মোড়া করিডোর ফাঁকা। দু’-একজন বেয়ারাকে এধার-ওধার করতে দেখা যাচ্ছে। পিতলের টবে বাহারি গাছ।

কেমন গা শিরশির করল লীনার। লিফটে নেমে সে একটা ট্যাক্সি নিল। তারপর সোজা হাজির হল তার বাড়িতে। টেলিফোনের কাছাকাছি চেয়ার টেনে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফোনটা এল ঘণ্টাখানেক পর।

মিসেস ভট্টাচারিয়া—

মিসেস নয়, মিস।

কোথায় মিট করব বলুন তো!

রাস্তায়। গড়িয়াহাট রোড আর মেফেয়ার রোডের জংশনে। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

গুড। ভেরি গুড। পাঁচটায় তা হলে?

হ্যাঁ।

লীনার মনে পড়ল, ববি যখন হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিয়েছিলেন তখন হাতটা একটু কাঁপছিল।

০২. বাড়িটা এত ফাঁকা

বাড়িটা এত ফাঁকা, এত ধু ধু ফাঁকা যে লীনার কাপ ডিশ ছুড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করে।

বেসিনে গিয়ে সে দু'হাত ভরে জল নিয়ে চোখে মুখে প্রবল ঝটকা দিচ্ছিল। মাথাটা ভোম হয়ে আছে, কান জ্বালা করছে, মনটা কাঁদো কাঁদো করছে। কোনও মানে হয় এর?

লোকটা যে বিটকেল রকমের পাগল তাতে সন্দেহ আছে কোনও? লীনাকে ভয়-টয় খাইয়ে একটা ম্যাসকুলিন আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছে না তো? না কি প্র্যাকটিক্যাল জোক? রঙ্গ-রসিকতার ধারে কাছে বাস করে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু ববি রায় যে একটু চন্দ্রাহত তাতে সন্দেহ নেই।

লীনাদের বাড়িটা দোতলা। গোটা আষ্টেক ঘর। একটু বাগান আছে। এ বাড়িতে প্রাণী বলতে তারা এখন তিনজন। মা, বাবা আর লীনা। দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না। শুধু রাখাল আর বৈষ্ণবী। তারাই কেয়ারটেকার, তারাই ঝি চাকর, রাঁধুনি। বয়স্কা স্বামী-স্ত্রী, নিঃসন্তান। একতলার পিছন দিকের একখানা ঘরে তারা নিঃশব্দে থাকে। ডাকলে আসে, নইলে আসে না। নিয়ম করে দেওয়া আছে।

শরৎ শেষ হয়ে এল। দুপুরেও আজকাল গরম নেই। রাত্রে একটু শীত পড়ে আর উত্তর দিক থেকে হাওয়া দেয়। লীনা মস্ত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল, ঘাড় মুছল। ঠান্ডা জলের প্রতিক্রিয়ায় গা একটু শিরশির করছে।

ঘড়িতে পৌনে চারটে। পাঁচটার সময় ববি রায়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থিয়েটার শুরু হবে সাড়ে ছ'টায়। দেড় ঘণ্টা সময় হাতে থাকছে। তা হলে পাগলা ববি কেন তাকে থিয়েটার বাদ দিতে বলছে?

কে জানে বাবা, লীনা কিছু বুঝতে পারছে না।

দোলন এসে অ্যাকাডেমিতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে তার জন্য। দোলনের ফোন নেই। দোলনকে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। সিমলের মোড়ে গদাইয়ের চায়ের দোকানে খবর দিয়ে রাখলে সেই খবর দোলন পায়। কিন্তু এখন সেই সিমলে অবধি ঠ্যাঙাবে কে? একটা গাড়ি থাকলেও না হয় হত।

গাড়ি যে নেই এমনও নয়। দু'-দুখানা গাড়ি তাদের। পুরনো অ্যাম্বাসাডারটা তো ছিলই। সম্প্রতি মারুতিটা এসেছে। কিন্তু সে দু'খানা তার মা আর বাবার। দুজনেই জবরদস্ত কাজের লোক। লীনার একদা বিপ্লবী দাদা বিপ্লব করতে না-পেরে টাকা রোজগারে মন দিয়েছিল। ভাল ইঞ্জিনিয়ার সে ছিলই। ব্যাবসা করতে নেমেই টুকটাক নানা যোগাযোগে এত দ্রুত বড়লোক হতে লাগল যে, এ বাড়িতে বাপ আর ছেলের মধ্যে শুরু হয়ে গেল চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সোরাব-রুস্তম। তারপর দাদা বিয়ে করল, বিশাল বাড়ি হাঁকড়াল এবং বাপ-মা-বোনকে টা-টা গুডবাই করে চলে গেল। দাদার বোধহয় তিন-চারখানা গাড়ি। একদা-বিপ্লবীকে এখন পেয়েছে এক সাংঘাতিক টাকার নেশা। হিংস্র, একবোখা, কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্থোপার্জন। সেই ভয়ংকরী আকর্ষণের কাছে দুনিয়ার আর সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন তো দুরের কথা, নিজের বউ-বাচ্চার প্রতিও তার কোনও খেয়াল নেই। বিশাল বিশাল কনস্ট্রাকশনের কাজ নিয়ে কলকাতা থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত পাড়ি দিচ্ছে। দেশ-বিদেশ ঘুরছে পাগলের মতো। বিপ্লবী দাদাকে পাগলের মতো ভালবাসত লীনা, কিন্তু এই দাদাকে সে চেনেই না।

দাদার কাছে গাড়ি চাইলেই পাওয়া যাবে। লীনা জানে। কিন্তু চাওয়ার উপায় নেই। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র করবে। কী করে যে দোলনকে একটা খবর দেওয়া যায়! ট্যাক্সির কোনও ভরসা নেই। আর উত্তর কলকাতায় যা জ্যাম! এখন বেরোলে পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে কি না সন্দেহ।

লীনা এক কাপ চা খেল। তারপর হলঘরের ডিভানে শুয়ে একখানা ইংরিজি থ্রিলার পড়ার চেষ্টা করল। হল না।

বাড়িটা বড্ড খাঁ খাঁ করছে। যতদিন দাদা ছিল এত ফাঁকা লাগত না। এ বাড়ির লোকেরা শুধু টাকা চেনে। শুধু টাকা। তার বাবারও ওই এক নেশা। দিন রাত টাকা রোজগার করে যাচ্ছে। তারও মস্ত ব্যাবসা কেমিক্যালসের। মা পর্যন্ত বসে নেই। মেয়েদের জন্য একটা এক্সকুসিভ ইংরিজি ম্যাগাজিন বের করেছে। তাই নিয়ে ঘোরর ব্যস্ত।

এদের কারও সঙ্গেই সম্পর্ক রচনা করে তুলতে পারেনি লীনা। ছেলেবেলা থেকেই সে এই ব্যস্ত মা বাবার কাছে অবহেলিত। নিজের মনে সে বড় হয়েছে। ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও যে কতখানি শুন্যতা একজনকে ঘিরে থাকতে পারে তা লীনার চেয়ে বেশি আর কে জানে? এমনকী ওই যে ভ্যাগাবন্ড দোলন, সেও এই শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে না। গরিবের ছেলে বলে নানা কমপ্লেকস আছে। হয়তো মনে মনে লীনাকে একটু ভয়ও পায়। বেচারা!

লীনা চাকরি নিয়েছে টাকার প্রয়োজনে তো নয়। এই আট ঘরের ফাঁকা বাড়ি তাকে হানাবাড়ির মতো তাড়া করে দিন রাত। সকাল-সন্ধে মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয় দেখা না-হওয়ার মতোই। দু'জনেই নিজের চিন্তায় আত্মমগ্ন, বিরক্ত, অ্যালুফ। সামান্য কিছু কথাবার্তা হয় ভদ্রতাবশে। যে যার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে বাস করে। লীনা ইচ্ছে করলে বাবার কোম্পানিতে, দাদার কনসার্নে বা মায়ের ম্যাগাজিনে চাকরি করতে পারত। ইচ্ছে করেই করেনি। গোমড়ামুখো মা-বাবার সংশ্রবের চেয়ে অচেনা বস বরং ভাল।

কপাল খারাপ। লীনা এমন একজনকে বস হিসেবে পেল, যে শুধু গোমড়ামুখোই নয়, পাগলও।

ওয়ার্ডরোব খুলে লীনা ড্রেস পছন্দ করছিল। দেশি, বিদেশি অজস্র পোশাক তার। সে অবশ্য আজকাল তাঁতের শাড়িই বেশি পছন্দ করে।

বেছে-গুছে আজ সে জিনস আর কামিজই বেশি পছন্দ করল।

সাজতে লীনার বিশেষ সময় লাগে না। মোটামুটি সুন্দরী সে। রূপটান সে মোটেই ব্যবহার করে। মুখে একটু ঘাম-তেল ভাব থাকলে তার মুখশ্রী ভাল ফোটে, এটা সে জানে। পায়ে একজোড়া রবার সোলের সোয়েডের জুতো পরে নিল। গয়না সে কখনওই পরে না, ঘড়ি পরে শুধু।

হাতে পনেরো মিনিট সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়বে লীনা। ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে হেঁটে যেতে দশ মিনিটের মতো লাগবে। সে একটু আস্তে হাঁটবে বরং।

ব্যাগ থেকে একটা চুয়িংগাম বের করে মুখে পুরে নিল লীনা। কাঁধে ব্যাগ। বেরোবার জন্য ঘড়িটা দেখে নিল। আরও দু'মিনিট। বুকটা কি একটু কাঁপছে?

দুর্বলতা বা নার্ভাসনেস দূর করতে সবচেয়ে ভাল উপায় হল একটু ব্রিদিং করা। তারপর শবাসন। শরীর ফিট রাখতে লীনাকে অনেক যোগব্যায়াম আর ফ্রি হ্যান্ড করতে হয়েছে। এখনও করে।

লীনা বাইরের ঘরে সোফায় পা তুলে পদ্মাসনে বসে গেল। কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে ব্রিদিং করে নিল। ঠিক দুমিনিট।

বাইরে রোদের তেজ মরে এসেছে। বেলা গুটিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। লীনা কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হাতে দোলাতে দোলাতে হাঁটতে লাগল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে লীনা গঁড়াল। এ তার চেনা জায়গা। গোটা অঞ্চলটাই তার চেনা। ছোট থেকে এইখানেই সে বড় হয়েছে।

লীনা দাঁড়িয়ে রইল। সময় বয়ে যেতে লাগল। টিকটিক টিকটিক।

পাঁচটা।... পাঁচটা দুই।... পাঁচটা পাঁচ।... পাঁচটা দশ। পাঁচটা পনেরো।

লীনা ঘড়ি দেখল। না, তার কোনও দায় নেই অপেক্ষা করার। সময় ববি দিয়েছিলেন। ববি কথা রাখেননি।

সুতরাং লীনা এখন যেখানে খুশি যেতে পারে।

থিয়েটার সাড়ে ছ'টায়। হাতে এখনও অনেক সময় আছে। লীনা ফিরে গিয়ে বাড়ি থেকে কিছু একটা খেয়ে আসতে পারে। খিদে পাচ্ছে।

লীনা ফিরল। নির্জন রাস্তাটা ধরে সামান্য ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। পিছনে বড় রাস্তা থেকে যে কালো গাড়িটা মোড় নিল সেটাকে লক্ষ করার কোনও কারণ ছিল না লীনার।

মসৃণ গতিতে সমান্তরাল ছুটে এল গাড়িটা। নিঃশব্দে।

লীনা কিছু বুঝবার আগেই প্রকাণ্ড বিদেশি গাড়িটার সামনের দরজা খুলে গেল। একটা হাত বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এসে লীনার ডান কবজিটা চেপে ধরল। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই চকিত আকর্ষণে তাকে টেনে নিল ভিতরে।

আঁ-আঁ-আঁ—

চেঁচাবেন না। প্লিজ।

আ-আপনি?

লীনা তালগোল পাকানো অবস্থা থেকে শরীরটাকে যখন সোজা ও সহজ করল গাড়িটা আবার বাঁয়ে ফিরে অন্য রাস্তা ধরেছে। স্টিয়ারিং হুইলে এক এবং অদ্বিতীয় সেই পাগল। ববি রায়।

এর মানে কি মিস্টার রায়?

প্রিকশন।

তার মানে?

আমি কি মানে-বই?

তার মানে?

আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার এত কম কেন?

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপনার আই-কিউ কেন জিরো?

ববি রায় গাড়িটায় বিপজ্জনক গতি সঞ্চার করে বললেন, আইনস্টাইনের আই-কিউ কত ছিল জানেন?

না।

আমিও জানি না। তবে মনে হয় জিরোই। জিনিয়াসদের আই-কিউ দরকার হয় না। আই-কিউ দরকার হয় তাদের, যারা কুইজ কনটেস্টে নামে।

আপনি কি জিনিয়াস?

অকপটে বলতে গেলে বলতেই হয় আমার মাথার দাম আছে। এ কস্টলি ‘হেড মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনার মাথায়–

মিসেস নয়, মিস।

ওই একই হল। আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার খুব কম।

আপনি গাড়ি থামান। আমি নেমে যাব।

ববি রায় জবাব দিলেন না! পাত্তাও দিলেন না। পার্ক সার্কাসের পার্ক ঘুরে গিয়ে ডানধারে একটা রাস্তা ধরলেন। নির্জন রাস্তা।

কোথায় যাচ্ছেন?— লীনা রায় চেঁচিয়ে উঠল।

বয়ফ্রেন্ড।

তার মানে?

বয়ফ্রেন্ড মানে দরকার নেই। কিন্তু বানানটা দরকার। বি ও ওয়াই এফ আর আই ই এন ডি। কটা অক্ষর হল?

মাই গড! আপনি কি সত্যিই পাগল?

ঠিক নটা অক্ষর আছে। কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের ঘর আটটা। সুতরাং আপনাকে একটা অক্ষর ড্রপ করতে হবে। ফ্রেন্ড-এর আই অক্ষরটা বাদ দিন। শুধু এফ আর ই এন ডি হলেই চলবে।

তার মানে?

আপনি কি ফাটা রেকর্ড? তার মানে তার মানে করে যাচ্ছেন কেন? একটু চুপ করে সিচুয়েশনটা মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করুন।

লীনা চোখ বুজে কম্পিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চাপা স্বরে বলল, আই হেট ইউ।

ধন্যবাদ। কিন্তু বানানটা শিখে নিন। বয়ফ্রেন্ড ঠিক যেমনটি বললাম।

লীনা সোজা হয়ে বসে বলল, আমি জানতে চাই, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

ববি রায় তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন, আপনি কম্পিউটার অপারেট করতে পারেন?

জানি না।

নো প্রবলেম। বলে ববি রায় তার হাওয়াই শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ওটা কী?

এটাতে হিন্ট দেওয়া আছে। কম্পিউটার চালু করে প্রথমে কোডটা ফিড করবেন। তারপর ইনফরমেশন ডিমান্ড করবেন।

আমি পারব না।

পারতেই হবে। পারতেই হবে। পারতেই—

মিস্টার রায়, আমি আপনার স্লেভ নই। আপনার আচরণ বর্বরদের মতো। আপনি–

ভেরি ইজি। কম্পিউটার ইন ফ্যাক্ট একটা ট্রেইন্ড বাঁদরেও অপারেট করতে পারে। যদিও আপনার গ্রে-ম্যাটার কম, তবু এ কাজটায় তেমন ব্রেন-ওয়ার্কের দরকারও নেই।

মিস্টার রায়—

ঠিক সাত দিন বাদে কোডটা বদলাতে হবে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। সাত দিনের মাথায়—

মিস্টার রায়, গাড়ি থামান! আমি নেমে যাব।

এবার ববি রায় লীনার দিকে তাকালেন। ভ্রু একটু ওপরে তুলে বললেন, সামনেই ইস্টার্ন বাইপাস। এ জায়গা থেকে ফিরে যাওয়ার কোনও কনভেয়ান্স নেই।

তা হোক। কলকাতায় আমার একা চলাফেরা করে অভ্যাস আছে।

ববি রায় নীরবে গাড়িটা চালাতে লাগলেন। বিশ্রী এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। অত্যন্ত ঘিঞ্জি বস্তি এবং ননাংরা পরিবেশের ভিতর দিয়ে প্রকাণ্ড গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলেছে। কিন্তু ভিতরটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত আর গদি নরম বলে তেমন কষ্ট হচ্ছে না লীনার।

ববি রায় বেশ কিছুক্ষণ বাদে বললেন, আমি একটু বাদেই নামব। আপনি এই গাড়িটা নিয়ে ফিরে যাবেন।

লীনা চমকে উঠে বলল, গাড়ি নিয়ে?

কেন, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন!

জানি, কিন্তু আমি কেন গাড়ি নিয়ে ফিরব?

এ গাড়িটা আপনার নামে অফিসের লগবুকে আজ থেকে অ্যালট করা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

ববি রায় নির্বিকার মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, গাড়িটা পছন্দ নয়?

উঃ, আমি কি পাগল হয়ে যাব?

এটা বেশ ভাল গাড়ি মিসেস ভট্টাচারিয়া, খুব ভাল গাড়ি। তেলের খরচ কোম্পানি দেবে। চিন্তা করবেন না।

লীনার মাথা এতই তালগোল পাকিয়ে গেছে যে, সে এবার 'মিসেস ভট্টাচারিয়া' শুনেও আপত্তি করতে পারল না। আসলে সে কথাই বলতে পারল না।

ববি রায় ইস্টার্ন বাইপাসে গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরালেন। চওড়া ফাঁকা মসৃণ রাস্তা। দিনান্তের ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিকের চরাচর। কুয়াশা জমে উঠেছে চারদিকে।

লীনা দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

ববি রায় মাথা নাড়লেন, ওভাবে খোলে না। সুইচ আছে মিম ভট্টাচারিয়া। কিন্তু ওসব শিখে নিতে খুব বেশি গ্রে-ম্যাটারের দরকার হবে না। এই যে, এইখানে সুইচ, চারটে দরজার জন্য চারটে সুইচ।

ওঃ, মাই গড।

এত ভগবানকে ডাকছেন কেন বলুন তো! এখনও কিন্তু আপনি তেমন বিপদে পড়েননি।

তার মানে?

ববি রায় এবার হাসলেন। লীনা এই স্বল্প আলোতেও দেখল, এই রোগা খ্যাপাটে কালো লোকটার হাসিটা ভীষণ রকমের ভাল।

ববি রায় হাসিটা মুছে নিয়ে বললেন, তবে বিপদে পড়বেন। হয়তো বেশ মারাত্মক বিপদেই, নিজের কোনও দোষ না-থাকা সত্ত্বেও।

তার মানে?

ওঃ, আপনার আজ একটা কথাতেই পিন আটকে গেছে। তার মানে' ছাড়া অন্য কোনও ডায়ালগ কি মাথায় আসছে না?

না। আমি এসবের মানে জানতে চাই।

অত কথা বলার যে সময় নেই আমার। আমার সময় বড্ড কম। খুন হয়ে যাওয়ার আগে আমাকে তাড়াতাড়ি আমার সব কিছু গুটিয়ে নিতে হবে।

আপনি কেবল খুন-খুন করছেন কেন?

ববি রায় একটা প্রকাণ্ড শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি রোমান্টিক বাঙালির মতো মৃত্যুচিন্তা করি না মিসেস ভট্টাচারিয়া—

মিসেস নয়, মিস–

ইররেলেভেন্ট। বয়ফ্রেন্ড মনে থাকবে?

না থাকার কী আছে! আর ফর ইয়োর ইনফরমেশন আমি কম্পিউটারের একটা কোর্স করেছিলাম। আমার বায়োডাটায় সে কথ, লেখা ছিল।

তা হলে তো আপনার আই-কিউ বেশ হাই! অ্যাঁ!

লীনা রাগে চিড়বিড় করল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

ববি রায় বললেন, এ গাড়িটা নিয়ে এখন থেকে অফিসে যাবেন। সেফ গাড়ি। কাচগুলো বুলেট-প্রুফ।

বাড়িতে কী বলব?

বলবেন, অফিস থেকে গাড়িটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে। সেটা মিথ্যেও নয়।

আর কী করতে হবে?

ববি রায় হাসলেন, আপনি তো কবিতা লেখেন! আমার ওপর একটা এপিটাফ লিখবেন। কেমন?

০৩. ববি রায় যেখানে গাড়িটা থামালেন

ববি রায় যেখানে গাড়িটা থামালেন সে জায়গাটা লীনার চেনা। ডান ধারে ওই দেখা যাচ্ছে যুবভারতী স্টেডিয়াম, ছড়ানো-ছিটানো লোকালয়।

ববি রায় বললেন, রাস্তাঘাট তো আপনি ভালই চেনেন। গাড়ি নিয়ে একা ফিরে যেতে পারবেন তো!

পারব। কিন্তু—

কিন্তু, ৩বে, তার মানে, এই সব শব্দগুলোকে বর্জন করতে হবে। এ দেশের লোকেদের কোনও কাজই এগোতে চায় না ওই সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর ভয়ের দরুন।

লীনা ফুঁসে উঠে বলল, আপনি যে একটা ইচ্ছেমতো মিস্ত্রি তৈরি করছেন না, তা কী করে বুঝব? মিস্ত্রি তৈরি করব? কেন, ববি রায়ের কি এতই বাড়তি সময় আছে?

সেটাই বুঝতে পারছি না।

ববি রায় মাথা নেড়ে বললেন, মিষ্ট্রি হয়তো একটা তৈরি হয়েছে, তবে সেটা আমি তৈরি করিনি।

লীনা গলায় যথেষ্ট রাগ পুষে রেখে বলল, তা হলে শেষ অবধি আমাকে করতে হবে কী? একটা কোডেড ইনফরমেশন কম্পিউটার কি করা তো?

ববি রায় মাথা নাড়লেন, না। ইনফরমেশনটা কিল করতে হবে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবেই।

‘তার মানে’ বলতে গিয়েও লীনা নিজেকে সামলে নিল।

ববি রায় বললেন, আমার মৃত্যু কোথায় কীভাবে হতে পারে তা তো আপনার জানার কথা নয়। আমি হাইডিং—হাইডিং মানে কী বলুন তো?

আত্মগোপন করা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা সহজ বাংলাও আছে না! গা-ঢাকা না কী যেন!

আছে।

আমি গা-ঢাকা দিচ্ছি। অফিস পুরোপুরি আপনার হাতে। বি কেয়ারফুল।

এইটুকু বলেই ববি রায় সুইচ টিপলেন, ড্রাইভারের দিককার দরজা খুলে গেল, ববি রায় নেমে দাঁড়ালেন। দরজা বন্ধ করার আগে লীনার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে বললেন, এ গাড়ির অটোমেটিক গিয়ার। পুরোপুরি ইলেকট্রনিক। স্মদ ড্রাইভ।

কিন্তু আপনি কথাটা শেষ করেননি।

কোন কথাটা?

ঠিক কখন আমাকে কম্পিউটার ইনফরমেশন কি করতে হবে।

ওঃ ঠিক খবর পেয়ে যাবেন। মৃত্যুকে লুকোনো যায় না। চলি।

লীনা রাগে বিস্ময়ে দেখল, লোকটা দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে চোখের পলকে কোথায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তা গাড়ির ভেতর থেকে ভাল বুঝতেই পারল না লীনা।

এই বেশ বড়সড় অটোমেটিক অচেনা গাড়িটাই বা কেন জগদ্দলের মতো চাপিয়ে গেল তার ঘাড়ে তাই বা কে বলবে!

এই নির্জন রাস্তায় বসে চিন্তাভাবনা করা এবং সময় কাটানো বিপজ্জনক। লীনা ড্রাইভারের সিটে বসল, গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করতে লাগল। হচ্ছিল না, বুকটা কাঁপছে লীনার।

আচমকাই তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে একটি পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, ও ডারলিং, ইউ ফরগট দা কী।

অভিভূত লীনার কয়েক সেকেন্ড লাগল ব্যাপারটা বুঝতে, কিন্তু কথা-বলা গাড়ির কথা সে শুনেছে, মনে পড়ল।

ড্যাশবোর্ডে প্রায় একটা জেট প্লেনের টার্মিনালের মতো নানারকম আলোর নিশানা। অস্কৃত গোটা কুড়ি ডায়াল। খুঁজে-পেতে চাবিটা বের করল লীনা।

গাড়ি চমৎকার শব্দহীন স্টার্ট নিল। তারপর অতি মসৃণ গতিতে ছুটতে শুরু করল।

মাঝে মাঝে সেই মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ বলতে লাগল, ডারলিং ডোন্ট ফরগেট দি গিয়ার, টাইম টু চেঞ্জ… ওঃ সুইট সুইট ডারলিং, ইউ ক্যান হ্যান্ডেল এ কার… নাউ ডোন্ট প্রেস দি ব্রেক সো হার্ড, ইট গিভস মি এ ব্যাড জোল্ট… উড ইউ লাইক সাম মিউজিক লাভ? প্রেস দি ব্লু বাটন…।

এই বকাবাজ কণ্ঠটিকে বন্ধ করার উপায় জানা নেই লীনার, সে দাঁতে সাঁত টিপে যতদূর সম্ভব গতিতে গাড়িটা চালাতে লাগল। এখনও সময় আছে। অ্যাকাডেমিতে গিয়ে দোলনকে ধরা যাবে।

মোলায়েম দাড়ি, মধ্যম দীর্ঘ, ছিপছিপে, প্যান্ট আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা কাঁধে ঝোলাব্যাগ। অ্যাকাডেমির ফটকের ভিতরে উদাসীন মুখ নিয়ে দোলন দাঁড়িয়ে।

গাড়িটা পার্ক করে দরজা খুলে নামতে যাবে, পুরুষকণ্ঠটি বলে উঠল, লাভ, ইউ হ্যাভ ফরগটন দি কী।

লীনা চাবিটা ড্যাশবোর্ড থেকে খুলে নিল। রিংএ দুটো চাবি, একটা দরজার।

দোলন।

দোলন গোল গোল চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, আরিব্বাস? তুমি এ গাড়ি কোথায় পেলে?

অফিস দিয়েছে।

বেড়ে অফিস তো? ঘ্যাম গাড়ি।

শো শুরু হতে আর বাকি নেই। চলো।

দোলন অনিচ্ছের সঙ্গে গাড়িটা থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, অফিস তোমাকে গাড়ি দেয়?

দিল তো!

তুমি তো শুনেছি মিস্টার রায়ের অফিস-সেক্রেটারি। সেক্রেটারিরা কি গাড়ি পায় লীনা? তার ওপর ওরকম দুর্দান্ত গাড়ি?

লীনা হেসে বলল, এমনিতে দেয়নি, অনেক ব্যাপার আছে। পরে বলব।

দু'জনে বাগানের ভিতর দিয়ে হল-এর দিকে হাঁটছিল, হঠাৎ দোলন বলল, তুমি আমার পক্ষে বড্ড বড় লীনা, বড্ড হাই।

তুমি এত কমপ্লেক্সে ভোগো কেন? বলছি তো সব বুঝিয়ে বলব, শুনলে দেখবে, আমি এখনও একজন নিতান্তই ছাপোষা সেক্রেটারি মাত্র।

দোলন জবাব দিল না। নাটক দেখার সময় ও কোনও কথা বলল না। কাটা হয়ে বসে রইল।

নাটক শেষ হলে লীনা বলল, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দোলন প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ওই গাড়ি নিয়ে উত্তর কলকাতায়? মাপ করো লীনা। ঢের বাস আছে, চলে যাব।

উঃ, তুমি যে কী প্রিমিটিভ না! আচ্ছা, অন্তত এসপ্লানেড পর্যন্ত তো চলো।

গাঁইগুই করে দোলন রাজি হল।

কিন্তু গাড়িতে উঠতেই বিপত্তি। চাবিটা সবে ঢুকিয়েছে লীনা, গাড়ি অমনি বলে উঠল, আই সি ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড ডারলিং।

দোলন প্রায় বসা-অবস্থাতেই লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করল, এ কী? কে?

লীনা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, ভয় পেয়ো না। এসব ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস। আমেরিকান বড়লোকদের জন্য জাপান বানায়।

দোলন নির্বাক বিস্ময়ে বসে রইল।

পুরুষকণ্ঠ ভারী অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করল, ইজ ইট এ বয়ফ্রেন্ড ডারলিং? গুড ইভনিং বয়ফ্রেন্ড। হ্যাভ এ নাইস টাইম।

লীনার পরিষ্কার মনে আছে ববি রায় যতক্ষণ গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তখন কণ্ঠস্বরটি স্তব্ধ ছিল। ববি নেমে যাওয়ার সময়ে বোধহয় দুষ্টুমিটুকু করে গেছেন।

বয়ফ্রেন্ড কথাটা দু'বার ধাক্কা দিল লীনাকে, বয়ফ্রেন্ড! যদি ববি রায় মারা যায় তা হলে—

লীনা, এ গাড়ি সত্যি তোমাকে অফিস থেকে দিয়েছে?

বললাম তো! বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। তবে তুমি খুব বিগ বিগ ব্যাপারের মধ্যে চলে গেছ বলে মনে হচ্ছে।

না, দোলন। বিগ ব্যাপার নয়। তবে আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। তোমাকে একদিন সব বলব।

কী দরকার লীনা? কথার মাঝখানে হঠাৎ পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, হোয়াট ইজ ইয়োর বার্থ-ডে বয়ফ্রেন্ড?

দোলন হঠাৎ লীনার হাত চেপে ধরে বলল, আমার মনে হচ্ছে গাড়ির পিছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে। আলোটা জ্বালো তো।

লীনা একটু চমকে উঠল এ কথায়। খুঁজে-পেতে আলোর বোতামটা পেয়েও গেল।

না, পিছনের সিটে কেউ নেই। একদম ফাঁকা।

লীনা লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, এমন ভয় পাইয়ে দাও না মাঝে মাঝে!

তোমার গাড়ি আমার জন্মদিন জিজ্ঞেস করছে কেন?

না হয় করলই, তাতে তোমার পিছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে বলে মনে হল কেন?

কেন মনে হল? কারণ আমার জন্মদিন আজ। সন্দেহ হচ্ছিল, আমার চেনা কোনও বন্ধুবান্ধবকে তুমি গাড়িতে লুকিয়ে এনেছ যে আড়াল থেকে রসিকতা করে যাচ্ছে।

আজ? হিয়ার ইজ মিউজিক ফর ইউ বয়ফ্রেন্ড।

'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' বাজতে লাগল লুকনো স্পিকারে। দোলন বাক্যহারা হয়ে গেল।

লীনা কিন্তু ভ্রু কুঁচকে ভাবছিল। দোলনের জন্মদিন কবে যে তা সে নিজেও এতকাল জানত না। সুতরাং এই গাড়ির ইলেকট্রনিক মগজেরও জানবার কথা নয়। তবে কি কোনও সংকেত? বার্থ ডে? ক'টা অক্ষর হচ্ছে? ঠিক আটটা, কম্পিউটারের আটটা ঘর, পরবর্তী কোড।

তোমার বস কেমন লীনা?

কেমন? কেন, ভালই।

মানে কত বয়স-টয়স?

আর ইউ জেলাস?

আরে না, বলোই না!

পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে।

ম্যারেড?

কী করে জানব?

খুব স্মার্ট না?

লীনা হেসে ফেলল, ইউ আর রিয়েলি জেলাস। শোনো তোমাকে একটা কথা বলি। ববি রায় বিশ্ববিখ্যাত লোক। ইলেকট্রনিক উইজার্ড। আমি কেন, পৃথিবীর কোনও মেয়ের দিকেই মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় লোকটার নেই। যদি ম্যারেড হয়ে থাকে তবে ওর স্ত্রীর মতো হতভাগিনী কমই আছে।

বুঝলাম।

লোকটা দেখতে কেমন জানতে চাও? লম্বায় তোমার চেয়ে অন্তত দু'ইঞ্চি কম। কালো, রোগা, ছটফটে। দেখলে মনেই হবে না যে লোকটা জিনিয়াস।

এসপ্লানেড এসে গেল। দোলন কেমন স্বপ্নেখিতের মতো নামল। লীনার দিকে একবার তাকিয়ে হাতখানা একবার তুলে দায়সারা বিদায় জানিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।

আগামীকাল লীনার অফিসে যাওয়ার কথা আগে থেকেই হয়ে আছে দোলনের। কাল লীনা মাইনে পাবে। দু'জনের সন্ধের খাবারটা পার্ক স্ট্রিটে খাওয়ার কথা।

নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এল লীনা। শুধু সারাক্ষণ ওই পুরুষকণ্ঠের টীকা-টিপ্পনী সয়ে যেতে হল। কাল সকালে চেষ্টা করে দেখবে কীভাবে ওটা বন্ধ করা যায়।

বাড়িতে দুটো গ্যারেজ। গাড়িটা সুতরাং গাড়ি-বারান্দার একধারে রাখতে হল লীনাকে।

যখন ঘরে এল লীনা তখন হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি এসে শরীরে ভর করল। একটা দিনে কত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে গেল। কোনও মানে হয়? এখনও মনে হচ্ছে বোধহয় স্বপ্ন।

খাওয়ার টেবিলে লীনার সঙ্গে তার বাবার দেখা হতেই কুঞ্চনসহ প্রশ্ন, তুমি কার গাড়ি নিয়ে এসেছ?

অফিসের।

অফিস তোমাকে গাড়ি দিচ্ছে কেন?

একটা জরুরি কাজে কিছু ঘোরাঘুরি করতে হবে, তাই।

তা বলে এত দামি গাড়ি?

লীনা বিরক্তির গলায় বলল, গাড়িটা তো আর দান করেনি, ধার দিয়েছে।

কেন? অ্যাম্বাসাডার ফিয়াট মারুতি, এসবও তো ছিল।

আমি অত জানি না, দিয়েছে ব্যবহার করছি।

বাবা একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার দাদার হয়তো এরকম গাড়ি আছে। তুমি তার কাছ থেকে–

লীনা প্লেট ছেড়ে উঠে বলল, সন্দেহ হলে খোঁজ নিতে পারো, তবে ওটা দাদার গাড়ি নয়।

তোমার বস ববি রায়কে আমি কাল টেলিফোনে জিজ্ঞেস করব।

কোরো।

ঠিক আছে। খেয়ে নাও।

লীনা বৈষ্ণবীর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে এসো।

মা অন্যধার থেকে মেয়ের দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, তোমার রাগ করা উচিত নয়। এত বড় একটা আধুনিক গাড়ি অফিস থেকে তোমাকে দেবে কেন?

ইউ আর জেলাস।

লীনা সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে বসেই খেল লীনা। বৈষ্ণবী এঁটোকাঁটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সে তার ব্যাগ খুলে কার্ডটা বের করল। ববি রায়ের দেওয়া। কম্পিউটার ক্রিয়াশীল করার কিছু সংকেত, ববি রায়ের ছাপা ফোন নম্বর ইত্যাদি।

কার্ডটা ওলটাতেই চমকে গেল লীনা, শুধু চমকাল না, তার সারা শরীর রাগে রি রি করে কাঁপতে লাগল। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল মুখ-চোখ। সে অত্যন্ত জ্বালাভরা

চোখে চেয়ে ছিল ডটপেনে লেখা একটা লাইনের দিকে, আই লাভ ইউ।

না, এর একটা বিহিত করা দরকার। দাঁতে দাঁত পিষে লীনা গিয়ে লিভিংরুমে টেলিফোনটা এক ঝটকায় তুলে ক্রুদ্ধ আঙুলে ববি রায়ের নম্বর ডায়াল করল।

ওপাশ থেকে একটা নিরাসক্ত গলা বলে উঠল, ববি রায় ইজ নট হোম…ববি রায় ইজ নট হোম।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, দেন হোয়ার ইজ হি?

উদাসীন গলা বলেই চলল, ববি রায় ইজ নট হোম… ববি রায় ইজ নট হোম…

আই হেট হিম।

ববি রায় ইজ নট হোম।

লীনা একটু থমকাল। সে যতদূর জানে, এ দেশে এখনও টেলিফোনে রেকর্ডেড মেসেজ-এর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ববি রায়ের বাড়ির টেলিফোনে রেকর্ডেড মেসেজই শোনা যাচ্ছে। অবশ্য ইলেকট্রনিকসের জাদুকরের পক্ষে এসব তো ছেলেখেলা।

লীনা ঘরে ফিরে এল এবং ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোল।

পরদিন সকালে যখন অফিসে বেরোতে যাবে লীনা, তখন দিনের আলোয় গাড়িটা ভাল করে দেখল সে। জাপানি গাড়ি। এর কত লাখ টাকা দাম তা লীনা জানে না। কিন্তু এত দামি গাড়ি তার হাতে এত অনায়াসে ছেড়ে দেওয়াটারও মানে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে লীনা, চাবিটা ঘোরানো মাত্র সেই মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, গুড মর্নিং ডারলিং, আই লাভ ইউ।

অসহ্য! লীনা পাগলের মতো যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করল, গলাটাকে বন্ধ করার জন্য, পারল না।

তারপর চুপ করে বসে রাগে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর মাথার মধ্যে যেন খট করে একটা আলো জ্বলে উঠল। তাই তো, আই লাভ ইউ, এটা তো প্রেমের বার্তা নয়। আই লাভ ইউ-তে যে মোট আটটা অক্ষর।

লীনা একাই একটু হাসল। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। গাড়ি ছাড়ল সে।

অফিসে এসে নিজের ঘরখানায় বসে একটু কাগজপত্র গুছিয়ে নিল সে। তারপর উঠে ববি রায়ের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

ঢুকেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল সে।

একটা লম্বা চেহারার যুবক শিস দিতে দিতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছে, খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গি।

লীনা হঠাৎ ধমকে উঠল, হু আর ইউ?

যুবকটিও ভীষণ চমকে উঠল। শুধু চমকালই না, সটান দুটো হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল, যেন কেউ তার দিকে পিস্তল তাক করেছে। তারপর হাত দুটো নামিয়ে বলল, ও, আপনার তো পিস্তল নেই দেখছি।

০৪. বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন লীনা

বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন লীনা রাগের গলায় বলল, না, আমার পিস্তল নেই। কিন্তু আপনি কে? এ ঘরে

আপনার কী দরকার?

ছেলেটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, পিস্তল আমারও নেই। কিন্তু আমার যা কাজ তাতে একটা পিস্তল থাকলে ভাল হত। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

লীনা অবাক হয়ে ছেলেটাকে ভাল করে দেখল। বয়স পঁচিশের মধ্যেই। ছিপছিপে খেলোয়াড়োচিত মেদহীন চেহারা। তবে বুদ্ধির বিশেষ ছাপ নেই মুখে। মুখশ্রী বেশ ভাল। পরনে জিনস আর একটা সাদা কুর্তা।

লীনা টেবিল থেকে ইন্টারকম টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, আপনি যে-ই হোন, ট্রেসপাসার। আমি অফিস সিকিউরিটিকে ফোন করছি। যা বলার তাদের কাছে বলবেন।

প্লিজ! কথাটা শুনুন।

কী কথা?

আমি ট্রেসপাসার ঠিকই, কিন্তু আমার কোনও খারাপ মতলব ছিল না।

লীনা ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনি অফিসের টপ সিকিউরিটি জোনে ঢুকেছেন। আপনি এ ঘরে ঢুকে সার্চ করছিলেন। আপনাকে পুলিশে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

ছেলেটা একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে কাহিল গলায় বলল, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর কাজ করতেই যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল!

লীনা ভ্রু কুঁচকেই ছিল। গম্ভীর গলায় বলল, কী কাজ?

বলাটা কি ঠিক হবে?

তা হলে সিকিউরিটিকে ডাকতেই হয়।

বলছি বলছি। কিন্তু প্লিজ, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

লীনা ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, যা বলার সংক্ষেপে বলুন।

ছেলেটা রীতিমতো ঘামছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, আমি একজন লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

শুনেছি। তারপর?

আমার অফিসটা ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায়।

লীনা একটা প্যাড টেনে চট করে নোট করে নিতে লাগল।

প্রায় এক বছর হল অফিস খুলে বসে আছি। মক্কেল জোটে না। বেকার মানুষ, কী আর করব! তবে বুঝতে পারছিলাম এ দেশে ডিটেকটিভদের ভাত নেই। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ডিটেকটিভ হওয়ার বড় শখ ছিল। গাদা গাদা গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে–

আপনার জীবনটা সংক্ষেপ করে কাজের কথায় আসুন।

আসছি। বলছিলাম যে, অনেকদিন কাজকর্ম কিছু জোটেনি। হঠাৎ কাল সকালে অফিসে এসে একখানা খাম পেলাম। ভিতরে পাঁচটা একশো টাকার নোট। আমার নিজস্ব কোনও বেয়ারা বা অফিস বয় নেই। একজন ভাগের বেয়ারা জল-চা এনে দেয়। কে যে খামটা কখন রেখে গেছে তা সে বলতে পারল না।

খামের ওপর আপনার নাম লেখা ছিল?

ছিল। টাইপ করা।

তারপর?

কাল বিকেলের দিকে একটা ফোন এল। আমার নিজস্ব ফোনও নেই। পাশে একটা সাপ্লায়ারের অফিস আছে, তাদের ফোন। ফোন ধরতেই একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল, টাকাটা পেয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু কিসের টাকা? লোকটা বলল, আরও টাকা রোজগার করতে চান? বললাম, চাই। লোকটা তখন বলল, তা হলে একটা ঠিকানা দিচ্ছি। সেখানে কাল সকাল ন'টার মধ্যে চলে যাবেন। ববি রাষ নামে একজনকে খুব নিখুঁতভাবে খুন করতে হবে।

লীনার হাত থেকে ডটপেনটা খসে পড়ে গেল।

ছেলেটা আবার রুমালে কপাল মুছল। একটু কাঁপা গলায় বলল, ম্যাডাম, সবটা আগে শুনুন।

লীনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বলুন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এ কাজ আমি পারব না। লোকটা বলল, পারতে হবে। নইলে বিপদে পড়বেন। কাজটা খুব সোজা। ন'টা থেকে দশটা অবধি ববি রায় একা থাকে। তার সেক্রেটারি আসে দশটায়। ঘরে ঢোকবার সময় দরজায় নক করবেন না। সোজা ঢুকে পড়বেন। তখন ববি রায় নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে কোনও কাজ করবে। আপনাকে লক্ষও করবে না। ববি রায়, বাস্তব জগতে কমই থাকে। একখানা ভাল ড্যাগার নিয়ে যাবেন, দুদিকে ধারওয়ালা। পেটে বা বুকে পুশ করবেন। বডিটা ডেস্কের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবেন। হাতে অবশ্যই দস্তানা পরে নেবেন।

আপনি রাজি হলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, না। রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু লোকটা বলল, কাজটা আপনি করবেন বলে ধরে নিয়ে আমরা অলরেডি পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। টেবিলে ফিরে গিয়ে আপনি টাকাটা পেয়ে যাবেন। বলেই ফোনটা কেটে দিল।

পেয়েছিলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, পেয়েছিলাম। সাদা খামে কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা। বেয়ারা এবারও বলতে পারেনি খামটা কে রেখে গেল। বলা সম্ভবও নয়। ও বাড়িতে পায়রার খোপের মতো রাশি রাশি অফিস, হাজার লোকের আনাগোনা।

টাকাটা পেয়ে আপনি কী ঠিক করলেন?

কী ঠিক করব? আমি জীবনে কখনও খুনখারাপি করিনি। মিস্টার রায়কে খুন করার জন্য আমাকে কেন লাগানো হল আমি তাও বুঝতে পারছি না। তবে আমার কৌতূহল হয়েছিল। খুব কৌতূহল। আমি ঠিক করলাম, আজ এসে ববি রায়ের সঙ্গে দেখা করে যাব। লোকটা কে বা কী, কেন ওকে খুন করার জন্য এত টাকা কেউ খরচ করতে চাইছে তা জানার জন্যই আজ আমি এসেছিলাম। এসে শুনলাম উনি নেই। তাই–

তাই তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লেন?

ছেলেটা একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, ওই একটা কাজ আমি খুব ভাল পারি। মশামাছির মতো যে-কোনও জায়গায় ঢুকে যেতে পারি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না।

বুঝলাম। কিন্তু এ ঘরে আপনি কী খুঁজছিলেন?

ওটা আমার একটা মুদ্রাদোষ। যেখানেই যাই সেখানেই কাগজপত্র নথি খুঁজে দেখা আমার স্বভাব। কী যে খুঁজছি তা ভাল করে জানিও না।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করছি না।

অবিশ্বাস্যই বটে। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই আমার কার্ড দেখুন। খোঁজখবর নিন। আমি জেনুইন ইন্দ্রজিৎ সেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

আপনি অপেক্ষা করুন। সিকিউরিটি এসে আপনাকে সার্চ করবে।

সার্চ! সে তো আপনিই করতে পারেন। এই দেখুন না! বলে ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পকেটের সামান্য কয়েকটা জিনিস বের করে টেবিলে রাখল। মানিব্যাগ, চাবি, রুমাল, নামের কার্ড, ডটপেন, আতস কাচ আর অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ।

এ ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। আপনি দেখতে পারেন খুঁজে।

পুরুষমানুষের বডি সার্চ করা মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়।

তা অবশ্য ঠিক। তবে আমাকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন না।

লীনা বিশ্বাস করল না। ইন্দ্রজিতের কার্ডে ছাপা ফোন নম্বরে ডায়াল করল।

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স।

লীনা শুনতে পেল একটা বেশ ভিড়াক্রান্ত অফিসের গণ্ডগোল ভেসে আসছে ফোনে। সে একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মিস্টার ইন্দ্রজিৎ সেনকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

ধরুন, দেখছি।

লীনা ফোন ধরে রইল।

একটু বাদেই গলাটা বলল, না এখনও আসেনি। কিছু বলতে হবে?

না, ধন্যবাদ। আপনাদের অফিসটা কত নম্বর ধর্মতলায়?

ত্রিশ নম্বর।

ধন্যবাদ।

লীনা ফোনটা রেখে দিল।

ইন্দ্রজিৎ তার দিকে চোরের মতো চেয়ে ছিল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, বিশ্বাস করলেন?

না। ওই ফোন নম্বরে হয়তো আপনার লোকই বসে আছে। অথবা ইন্দ্রজিৎ সেনের নাম ভাঁড়িয়ে আপনি অন্য কেউ হতে পারেন।

ছেলেটা বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। হয়ও।

লীনা মৃদু একটু হেসে বলল, তা হলে আমার এখন কী করা উচিত?

উচিত পুলিশে দেওয়া। কিন্তু আমি তো কিছুই লুকোইনি। ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে এখন আমার অফিসে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। সেখানে অন্তত একশোলোক আমাকে জেনুইন ইন্দ্রজিৎ সেন বলে আইডেনটিফাই করতে পারবে।

নিতান্তই ছা-পোষা চেহারার এই লোকটাকে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে হল না লীনার। তবে সে একে একেবারে ছেড়েও দেবে না। লীনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। আমি পরে খোঁজ নেব। আপনি আসুন।

লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই লীনা সিকিউরিটিকে ফোন করল, ববি রায়ের সেক্রেটারি বলছি। জিনস আর সাদা কামিজ পরা একজন বছর পঁচিশের লোক এইমাত্র বেরিয়ে গেল। তাকে আটকান। সার্চ হিম, ক্রস একজামিন হিম প্রপারলি। আইডেনটিফাই করুন। ভেরি আর্জেন্ট।

লীনা উঠে দরজাটা লক করল। তারপর সুইচ টিপে ভিডিয়ো ইউনিটটা বের করে আনল গুপ্ত চেম্বার থেকে। তারপর কোড দিল, বয়ফ্রেন্ড।

পরদায় ফুটে উঠল, নো অ্যাকসেস। ট্রাই সেকেন্ড কোড।

লীনা চাবি টিপল, বার্থ ডে।

পরদায় ফুটল, নো অ্যাকসেস। ট্রাই থার্ড কোড।

লীনা আবার কোড দিল, আই লাভ ইউ।

পরদায় ফুটে উঠল, কনগ্রাচুলেশনস, ইউ হ্যাভ ডান ইট।

এর মানে কী কিছুই বুঝতে পারল না লীনা। দাঁতে দাঁত চেপে রাগে সে ফুঁসতে লাগল। ববি রায় কোনও প্র্যাকটিক্যাল জোক করে গেছেন কি?

নো অ্যাকসেস! লীনা টপ করে লেখাটা মুছে চাবি টিপল, নো অ্যাকসেস।

পরদায় ফুটে উঠল, দ্যাটস ক্লেভার অফ ইউ মিসেস ভট্টাচারিয়া!

লীনা দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বলল, ও গড। লোকটা কী ভীষণ পাজি।

স্কাউন্ড্রেল! স্কাউন্ড্রেল!

ভিডিয়ো ইউনিটটা আবার যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে লীনা ববি রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের চেম্বারে বসল। ভাবতে লাগল। মাথাটা গরম। কান ঝাঁ ঝা করছে।

ফোনটা বাজতেই তুলে নিল লীনা, হ্যালো।

সিকিউরিটি বলছি। লোকটার নাম ইন্দ্রজিৎ সেন। সার্চ করে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। বাড়ি পাইকপাড়ায়, অফিস ধর্মতলায়। লোকটার বিরুদ্ধে কোনও স্পেসিফিক চার্জ থাকলে বলুন, পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেব।

নেই। ওকে ছেড়ে দিন।

লীনা কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে রইল। তারপর উঠে আবার ববি রায়ের ঘরে ঢুকল। দরজা লক করে ভিডিয়ো ইউনিট নিয়ে বসে গেল। বয়ফ্রেন্ড। বার্থ ডে। আই লাভ ইউ। নো অ্যাকসেস।

পরপর একই উত্তর দিয়ে গেল যন্ত্র।

শেষ উত্তরটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লীনা, দ্যাটস ক্লেভার অফ ইউ মিসেস ভট্টাচারিয়া।

একটু বিদ্রুপ আর তাচ্ছিল্য মেশানো মন্তব্যটা বিছের হুলের মতো বিধে রইল লীনার মনের মধ্যে। হামবাগ, ইনসোলেন্ট, মেগালোম্যানিয়াক।

বেশ কিছু চিঠিপত্র টাইপ এবং কয়েকটা মেসেজ পাঠানোর ছিল লীনার। বসে বসে চুপচাপ কাজ করে গেল। টিফিন খেল। এরই ফাঁকে একবার অ্যাকাউন্টসে ফোন করল। যে-কোনও অফিসারের গতিবিধি অ্যাকাউন্টসই দিতে পারে। ওদের কাছে সকলের টিকি বাঁধা।

মিস্টার রায় কি কলকাতায় নেই? উনি আমার জন্য কোনও মেসেজ রেখে যাননি।

হ্যাঁ, উনি আজ ভোরের ফ্লাইটে বম্বে গেছেন। তারপর ইউরোপে যাচ্ছেন আজ রাতে।

ইউরোপে কোথায়?

প্রথমে প্যারিস, তারপর আরও অনেক জায়গায়।

ধনাবাদ।

লীনা আরও কিছুক্ষণ কাজ করল। এক ফাঁকে ক্যাশ-কাউন্টার থেকে বেতন নিয়ে এল।

পাঁচটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট তখন রিসেপশন থেকে ফোন এল, দোলন এসেছে। অপেক্ষা করছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লীনা। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

বেরোতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক ফোনটা এল।

হ্যাল্লো।

হ্যালো, আমি মিস লীনা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিই লীনা। বলুন।

আপনি ইন্দ্রজিৎ সেনকে চেনেন?

কে ইন্দ্রজিৎ?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ সেন?

ওঃ হ্যাঁ। স্মল টাইম প্রাইভেট আই। কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি ওর পাশের অফিসে কাজ করি। ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স। আমি ওর বন্ধু। আজ দুপুরে অফিসে এসে ও আমাকে বলল, ওর যদি কিছু হয় তা হলে যেন আপনাকে একটা খবর দিই।

লীনা একটু শিহরিত হল, কী হয়েছে?

ইন্দ্র মারা গেছে।

হ্যাঁ।

দুপুরে কেউ এসে স্ট্যাব করে গেছে। দরজার তলা দিয়ে করিডোরে রক্ত গড়িয়ে আসায় আমরা টের পাই।

লীনার হাত কাঁপছিল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই বেঁচে নেই?

না। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। পুলিশ এসে একটু আগে ডেডবডি নিয়ে গেল। আপনি কি ওর কেউ হন?

না।

গলাটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, আপনার সঙ্গে কোনও ইন্টিমেসি ছিল না?

মোটেও না। আজ সকালে মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ।

ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। এগারোটা নাগাদ অফিসে এসে ও আমাকে করিডোরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলে, আমার একটা বিপদ ঘটতে পারে। শোনো, যদি আমার কিছু হয় তা হলে এই চিরকুটে যার নাম আর ফোন নম্বর দেওয়া আছে তাকে একটা খবর দিয়ো। বোলো, উনি যেন আমার অফিসে একবার আসেন। কিন্তু কেন? আমি তো ওকে ভাল করে চিনতামও না।

জানি না, ম্যাডাম। তবে ও এমনভাবে কথাটা বলেছিল যাতে মনে হয়, আপনি ওর খুব কাছের কেউ। যাকগে, আপনি কি আসতে পারবেন?

লীনা অতি দ্রুত ভাবতে লাগল। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারল না।

লোকটা নিজেই আবার বলল, শুনুন ম্যাডাম। আমি অফিসে সাড়ে ছ'টা অবধি থাকব। সাড়ে পাঁচটার পর অফিসে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। ইন্দ্রজিতের

ঘর পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অফিসের রেকর্ড-রুমের ভিতর দিয়ে ওর ঘরে যাওয়ার একটা ছোট ফোকব রয়েছে। পুলিশ ওটা দেখতে পায়নি।

কিন্তু আমি গিয়ে কী হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

সে আপনি ঠিক করবেন। ইন্দ্রজিৎ আমার খুব বন্ধু ছিল। ওর শেষ অনুরোধ রাখতে আমি এই রিস্কটুকু নিতে পারি। যদি আপনি চান তা হলে ওর ঘরে ঢুকবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।

ঠিক আছে। তবে জানিয়ে রাখলাম, আমি সাড়ে ছ'টা অবধি অফিসে থাকব। আমার নাম দুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

লীনা ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইল। এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সত্যিই মারা গেছে লোকটা? খুন!

লীনা টান হয়ে বসে কিছুক্ষণ নীরবে ব্রিদিং করল। তারপর উঠে পড়ল।

রিসেপশনে দোলন চোর-চোর মুখ করে বসে আছে। এই অফিসের ফান্ডা একটু বেশি। দোলন যখনই আসে তখনই অস্বস্তি বোধ করে। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে সবসময়েই কাতর হয়ে থাকে। দোলন। ওই গহ্বর থেকে ওকে আজও টেনে বের করতে পারেনি লীনা।

দু'জনে নীরবে বেরিয়ে এল। বাইরে রোদ মরে আসছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে একটু।

দোলন।

উঁ!

একটা জায়গায় যাবে?

কোথায়?

ধর্মতলা স্ট্রিটের একটা অফিসে।

ধর্মতলায় আবার তোমার কী কাজ?

লীনা মাথা নেড়ে বলল, কী যে কাজ তা জানি না। কিন্তু চলোই না। তুমি থাকলে ভাল হবে।

আজ আমাদের কী প্রোগ্রাম ছিল, লীনা?

গঙ্গার ধারে বেড়ানো, পার্ক স্ট্রিটে ডিনার।

সেগুলো কি বাতিল করছ?

আরে না, বাতিল করব কেন? ধর্মতলায় আমার কয়েক মিনিটের কাজ। তুমি গাড়িতে বসে থেকো। আমি চট করে ঘুরে আসব।

তোমার ওই ভুতুড়ে গাড়িতে একা বসে থাকব! ও বাবা!

চাবি খুলে নিলে গাড়ি কোনও কথা বলবে না। ভয় নেই।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলা খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধে হল না লীনার। বাড়িটা পুরনো। ভারী ঘিঞ্জি। সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ঊর্ধ্বপানে।

তিনতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে লীনা ঘড়ি দেখল। পৌনে ছটা। বেশির ভাগ অফিসই বন্ধ। করিডোর নির্জন। শুধু শেষ প্রান্তে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে সাইনবোর্ড। ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স। তার আগে আর-একখানা ঘর। তার বাইরে টুলের ওপর একজন পুলিশ বসে আছে। পুলিশ দেখে একটু সাহস হল লীনার।

লীনা দরজায় দাঁড়াতেই একটা লোক চমকে মুখ তুলে তাকাল। বয়স বেশি নয়। ইন্দ্রজিতের মতোই। স্বাস্থ্যহীন, রুগ্ন চেহারা। মুখখানায় গভীর বিষাদ।

আপনিই কি মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আসুন।–লোকটা উঠে দাঁড়াল।

লীনা ঘরে ঢুকে চারদিকটা দেখল। চেয়ার-টেবিলে ছয়লাপ। অনেক স্টিলের আলমারি। অফিস-টফিস যেমন হয় আর কী!

লোকটা একটু ভীত গলায় বলল, ধরা পড়লে আমার জেল হয়ে যাবে, তবু ইন্দ্রর কথাটা ফেলতে পারছি না। আসুন, রেকর্ড-রুম ওই পিছন দিকে।

লীনার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। না জেনেশুনে সে বোকার মতো কোনও ফাঁদে পা দিচ্ছে তো!

লোকটা অফিসের চেয়ার টেবিল আলমারি ক্যাবিনেট ইত্যাদির ফাঁক দিয়ে গোলক ধাঁধার মতো পথে লীনাকে একদম পিছন দিকে আর-একটা ঘরে এনে হাজির করল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বলল, এই ঘর।

লীনা অবাক হয়ে দেখল, একটা বদ্ধ কুঠুরি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি শুধু স্টিলের তাক। আর তাতে রাশি-রাশি ফাইলপত্র।

আসুন। বলে লোকটা দুটো তাকের মাঝখানে সরু ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর খুব সাবধানে কাঠের পার্টিশান থেকে একখানা পাটা সরিয়ে আনল।

এই দরজা। যাবেন ভিতরে? ভয় করছে না তো! আমার কিন্তু করছে।

লীনা অবিশ্বাসের চোখে ফাঁকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ডেডবডি তো ভিতরে নেই।

না। তবে রক্ত আছে। মেঝেময়।

ও বাবা!

মিস ভট্টাচার্য, আমি বলি কি আপনি তবু একবার ভিতরটা ঘুরে আসুন। মনে হয় আপনাকে খুব জরুরি কিছু জানানোর ছিল ওর।

লীনা চোখ বুজে কিছুক্ষণ দম ধরে রইল। তারপর ফাঁকটা দিয়ে ইন্দ্রজিতের অফিসে ঢুকল। ছোট্ট একখানা ঘর। ছয় বাই আট হতে পারে। লীনাদের বাথরুমও এর চেয়ে ঢের বড়। ঘরে একখানা ডেস্ক আর একটা স্টিলের আলমারি।

পিছন থেকে দুর্গাচরণ ফিসফিস করে বলল, সাবধানে পা ফেলবেন।

লীনা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরে একটা গা-গুলোনো গন্ধ।

প্লিজ, কোনও শব্দ করবেন না। ডেস্কের নীচের ড্রয়ারে একটা লেজার বই আছে। ওর যা কিছু ইনফরমেশন ওটাতেই থাকত।

লীনা নিঃশব্দে ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটা খুলল। লেজার বইটা বের করে আনল। দুর্গাচরণের রেকর্ড-রুমে ফিরে এসে পাতা ওলটাতে লাগল।

দুর্গাচরণ পাশেই দাঁড়িয়ে। তার শ্বাস কাঁপছে, হাত কাঁপছে।

লেজার বইটা একরকম ফাঁকা। প্রথম পাতাতেই একটা এন্ট্রি। জনৈক বি রায়ের কাছ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচশো টাকা পাওয়া গেছে। পর পর বি রায়ের নামে আরও কয়েকটা এন্ট্রি।

দুর্গাচরণ বলল, বি রায় ছিলেন, বলতে গেলে, ইন্দ্রজিতের একমাত্র মক্কেল।

বি রায় কে?

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলল, চিনি না! কখনও দেখিনি। তবে পুরো নাম ববি রায়।

ববি রায়!–লীনা অবাক গলায় প্রতিধ্বনি করল।

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলল, সম্ভবত লীনা ভট্টাচার্য নামে কোনও এক মহিলার পেছনে গোয়েন্দাগিরির জন্য ববি রায় ওকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

মাই গড!

বোধহয় আপনিই!লীনা জবাব দিতে পারল না।

০৫. দুর্গাচরণ হাত বাড়িয়ে

দুর্গাচরণ হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে বলল, মনে হয় এই ইনফরমেশনটুকু আপনাকে জানানোর জনাই ইন্দ্র আপনাকে একবার এখানে আসতে বলেছিল।

লীনা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, কিন্তু আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগানোর মানে কী?

তা তো জানি না। তবে ইন্দ্র প্রায়ই বল, ববির অতি বিপজ্জনক লোক। তার সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হয়।

বিপজ্জনক? কতখানি বিপজ্জনক?

দুর্গাচরণ খাতটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, এর ওপর আমাদের হাতের ছাপ থেকে যাওয়াটা উচিত হবে না। দাঁড়ান, আমি এটা জায়গামতো রেখে হাসি।

ফোকর দিয়ে দুর্গাচরণ ইন্দ্রজিতের ঘরে ঢুকে গেল। লীনা টের পেল, তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, রাগে-উত্তেজনা। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে তত ইনফরমেশন তা হলে এভাবেই সংগ্রহ করেছিল বলি রায়। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

দুর্গাচরণ ফিরে এসে তক্তা দিয়ে ফাঁকটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, মিস ভট্টাচার্য।

কে বলুন তো?

আমার সন্দেহ হচ্ছে ইন্দর মৃত্যুর সঙ্গে ববি রায়ের একটা যোগ আছে। ইন্দ্রজিতের তো বরি ৰায় ছাড়া কোনও মক্কেল ছিল না।

কিন্তু উনি তে বললো. বণি রায়কে, করার জন্য ওঁকে পাঠানো হয়েছিল।

দুর্গাচরণ মৃদু একটু হেসে বলল, হতেও পারে, না-ও হতে পারে! ডিটেকটিভরা সত্যি কথা কমই বলে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছিল। বাইরের অফিস-ঘরটায় এসে লীনা করিডোরটার দিকে সভয়ে তাকাল। পুলিশ এসে বসে ঢুলছে।

আমি যাচ্ছি।

আসুন, দরকার হলে যোগাযোগ করবেন।

লীনা করিডোর পার হয়ে লম্বা সিড়ি ধীর পায়ে ভেঙে নেমে এল।

অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে দোলন গাড়িতে বসে আছে।

কী হয়েছে লীনা? তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

লীনা স্টিয়ারিং-এ বসে দুহাতে মুখ ঢাকল। অবরুদ্ধ কান্নাটাকে কিছুতেই আর আটকাতে পারল না।

কাঁদছ কেন? কী হয়েছে।

লীনা জবাব দিল না।

দোলনের একবার ইচ্ছে হল ওর পিঠে হাত রাখে। হাতটা তুলেও আবার সংবরণ করে নিল। মনে হল, কাজটা ঠিক হবে না।

লীনা, কী হয়েছে বলবে না?

প্রাণপণে কান্না গিলতে গিলতে লীনা বলল, তোমাকে একদিন সবই বলব, দোলন। তবে আজ নয়।

কেউ তোমাকে অপমান করেনি তো, লীনা?

লীনা চোখ দুটো রুমালে মুছে নিয়ে বলল, করেছে, ভীষণ অপমান করেছে। কিন্তু আই শ্যাল টিচ হিম এ গুড লেসন।

দোলন একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি যখন ভিতরে গিয়েছিলে তখন এখানেও একটা ঘটনা ঘটেছে।

কী ঘটেছে?

আমি চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছিলাম হঠাৎ কাচের শার্সিতে একটা লোক টোকা দিল। আমি সুইচ টিপে দরজাটা একটু যাক করতে লোকটা বলল, ওইখানে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে একটু ডেকে দিতে বললেন।

সর্বনাশ! তুমি কী করলে?

আমি ভাবলাম নির্ঘাত তুমিই ডাকছ। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এগিয়ে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করে যাইনি, কারণ খুলতে তো জানি না।

তারপর কী হল?

এদিক-ওদিক খুঁজে তোমাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখলাম, লোকটা খোলা দরজা দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে কী করছে। আমি ছুটে আসতে না আসতেই লোকটা পট করে পালিয়ে গেল।

কোথায় পালাল?

ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেল!

কীরকম চেহারা? বলা মুশকিল। মাঝারি হাইট, মাঝারি স্বাস্থ্য। মু

খটা ফেল দেখলে চিনতে পারবে?

একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ভাল করে লক্ষ করিনি।

উঃ, দোলন! তুমি যে কী ভীষণ ভুলো মনের মানুষ!

দোলন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, কিন্তু চুবি করার মতো তো গাড়িতে কিছু ছিল না।

লীনা গাড়ি স্টার্ট দিল। ভিড়াক্রান্ত ধর্মতলা স্ট্রিট এড়িয়ে সূরেন ব্যানার্জি রোড হয়ে ময়দানের ভিতরে নিয়ে এল গাড়ি।

হঠাৎ গাড়ির লুকোনো স্পিকার থেকে পুরুষের সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মিরর, মিরর, হোয়াট ডু ইউ সি?

লীনা চমকে উঠল, তারপর রিয়ারভিউ আয়নার দিকে তাকাল, কিছুই দেখতে পেল না তেমন। রাজ্যের গাড়ি তাড়া করে আসছে।

পুরুষকণ্ঠ উদাস গলায় একটা বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার একখানা ভাঙা লাইন আবৃত্তি করল, দি মিরর ক্র্যাকড ফ্রম সাইড টু সাইড, দি কার্স ইজ আপন মি ক্রাইড দি লেডি অফ শ্যালট…

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, অসহ্য।

তোমার গাড়ি একটু পাগল আছে, লীনা।

পাগল নয়, শয়তান।

পুরুষকণ্ঠ: কান্ট ইউ ড্রাইভ এ বিট ফাস্টার ডারলিং? ফাস্টার?… টেক ইট লাভ…

মিরর! ড্রাইভ ফাস্টার! এর অর্থ কী? লীনা রিয়ারভিউতে একবার চকিতে দেখে নিল। একখানা মারুতি, দুটো অ্যাম্বাসাডার খুব কাছাকাছি তার পিছনে রয়েছে। তার বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি? করলেই বা তা গাড়ির ইলেকট্রনিক মগজ কী করে জানতে পারবে?

লীনার মাথা আবার গুলিয়ে গেল। একটা ট্র্যাফিক সিগন্যালে থেমে আবার যখন গাড়ি চালাল সে তখন স্পিড বাড়িয়ে দিল।

দ্যাটস ও কে ডারলিং! ইউ রান সুইট!… ওঃ ইউ আর ড্রাইভিং রিয়াল ফাস্ট ডারলিং! কিপ ইট আপ…

গঙ্গার ধার বরাবর একটু নির্জন জায়গা দেখে গাড়িটা দাড় করাল লীনা। তারপর দোলনের দিকে তাকাল।

দোলন তার দিকেই চেয়ে ছিল। বলল, কী ব্যাপার বলো তো!

লীনা মাথা নাড়ল, কিছু বুঝতে পারছি না।

দোলন চিন্তিত মুখে বলল, একটা কালো মারুতি কিন্তু সেই থেকে আমাদের পিছু নিয়ে এসেছে।

ঠিক দেখেছ?

ঠিকই দেখেছি। কিন্তু এখানে এসে আর সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

লীনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তবু বুঝতে পারছি না। যদি কেউ ফলো করেই থাকে তা হলে গাড়িটা তা বুঝতে পারবে কী করে?

জানি না। এখন চলো, খোলা হাওয়ায় একটু বসি। তোমার খুব বেশি টেনশন যাচ্ছে।

সকালবেলা যখন সিকিউরিটি ব্যারিয়ার পার হচ্ছিলেন ববি রায় তখন সিকিউরিটি চেক নামক প্রহসনটি তার কাছে সময়ের এক নির্বোধ অপচয় বলে মনে হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন আগে লন্ডন থেকে রোম যাওয়ার পথে যখন তাঁদের প্লেনটি আকাশপথে ছিনতাই করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও ববি রায় দেখেছিলেন, সিকিউরিটি চেক ব্যাপারটার কত ফাঁক-ফোকর থাকে।

হিথরোর শক্ত বেড়া পার হয়ে চার ইহুদি যুবক সশস্ত্র উঠেছিল প্লেনে। খুব বিনীতভাবেই তারা হাইজ্যাক করেছিল বিমানটি, কোনও বাচালতা নয়, চারজন চার জায়গায় উঠে দাঁড়াল, হাতে উজি সাব-মেশিনগান। কাউকে ভয় দেখাযনি, চেঁচামেচি করেনি, গম্ভীর মুখে শুধু কোন পথে যেতে হবে তা বিমানসেবিকা মারফত জানিয়ে দিয়েছিল পাইলটকে।

নির্দিষ্ট জায়গায় প্লেন নামল। চার ইহুদি যুবক কোনও অন্যায় দাবি দাওয়া করল না। শুধু একজন যাত্রীকে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে প্লেনটিকে মুক্তি দিয়ে দিল। সেই যাত্রী ছিলেন ববি রায়।

সেই থেকে প্লেনে ওঠার সময় প্রতিবার সিকিউরিটি চেক-এর সময় তাঁর হাসি পায়।

আজ যখন সিকিউরিটির অফিসার তার অ্যাটাচি কেসটা খুলে দেখেটেখে ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন ববি রায় তাকে খুব সহৃদয়ভাবে বললেন, ওর লুকোনো একটা চেম্বার আছে, সেটা দেখলেন না?

অফিসার হাঁ, লুকনো চেম্বার?

ববি রায় অ্যাটাচি কেসটা নিজের কাছে টেনে এনে হাতলের কাছ বরাবর একটা বোতামে চাপ দিয়ে তলাটা আলগা করে দেখালেন।

অফিসার আমতা-আমতা করে বলল, কী আছে এতে?

বলি রায় একটা চকোলেট বার করে দেখালেন, নিতান্তই একটা চকোলেট বার, তবে ইচ্ছে করলে ডিজম্যান্টল করা সাব-মেশিনগান বা লিভলবার বা গ্রেনেড অনায়াসে নেওয়া যায়। হয়তো কেউ নিয়েছে, হয়তো রোজই নেয়।

অফিসার খুবই বিপন্ন মুখে চেয়ে থেকে বলল, অ্যাঁ মানে— আচ্ছা, আমরা এর পর থেকে আরও সাবধান হন।

বিরক্ত বরি বা অ্যাটাচিটা ছেড়ে দিলেন। শরীর যখন সার্চ করা হল তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্তি সঙ্গে লক্ষ করলেন, এরা তার জুতোজোড়া লক্ষই করল না।

ভালই হল। জুতোর নকন হিল-এর মধ্যে রয়েছে পৌনে চার ইঞ্চি মাপের একটা লিলিপুট পিস্তল। দুটো অতিরিক্ত গুলির ম্যাগাজিন।

লাউঞ্জে বসে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বলি রায় যাত্রীদের লক্ষ করতে লাগলেন। তাকে যে আগাগোড়া অনুসরণ করা এবং নজরে রাখা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই বলি রায়ের। যারা তাঁকে নজরে রাখছে, তারা নিতান্তই খুনে। এদের কোনও স্বাজাত্যভিমান বা দেশপ্রেম নেই, ভাড়াটে খুনে মাত্র। এরা

হয়তো ববি রায়কে বাগে পাওয়ার জন্য একটা প্লেনকে হাইজ্যাক করবে না। কিন্তু সাবধানের মার নেই।

যাত্রীদের সংখ্যা অনেক। সকলকে সমানভাবে লক্ষ করা সম্ভব নয়। গোটা লাউঞ্জটাকে কয়েকটা কাল্পনিক জোন-এ ভাগ করে নিলেন ববি। তারপর জোন ধরে ধরে লোকগুলোকে লক্ষ করে যেতে লাগলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর দুটো লোককে চিহ্নিত করলেন ববি রায়। দুজনেই শীতের জ্যাকেট পরেছে। পরনে চাপা ট্রাউজার। কাঁধে একজনের স্যাচেল ব্যাগ। অন্যজনের হাতে একটা ডাক্তারি কেস।

লোকদুটো তার দিকে একবারও তাকায়নি।

প্লেনে ওঠার সময় বলি বা লোকদুটির পিছনে রইলেন। কোথায় বসে, তা দেখতে হবে।

বিশাল এয়ারবাসে কোনও লোকের হদিশ ল'খা খুবই শক্ত। তার ওপর আজকাল প্লেনে ফার্স্ট ক্লাস তার অর্ডিনারি ক্লাস তালাদা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ববি রায়ের টিকিট কোর্স ক্লাসের। নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকবার আগে ববি রায় হোঁচট খাওয়ার ভান করে একটু সময় নিলেন। লোক দুটো প্লেনের বাঁ ধারে পনেরো নম্বর রো-র জানালার দিকের সিট নিয়েছে বলে মনে হল।

ববি রায় উদ্বিগ্ন হলেন না। এর আগেও বহুবার তিনি বিপদে পড়েছেন। একাধিকবার তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হয়েছে। প্যারিসে এক টেররিস্ট দলের জন্য একবার তাকে আগুনে-বোমাও বানিয়ে দিতে হয়েছিল পিস্তলের মুখে বসে। ছেলেগুলো খুবই বোকা, তারা বুঝতে পারেনি, বোমা তৈরি হয়ে গেলে সেটা বলি বা তাদের ওপরই ব্যবহার করতে পারেন।

এক কাপ কফি খেয়ে ববি রায় বোম্বে পর্যন্ত টানা ঘুমোলো। সকালের ফ্লাইট ধরতে সেই মাঝরাতে উঠে পড়তে হয়েছে।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল অবধি কোনও ঘটনা ঘটবে না, এটা ববি রায় জানতেন। ট্যাক্সিতে ববি এত জুতোর ফাঁপা হিল থেকে লিলিপুটটাকে বের করে পকেটে রাখলেন।

একবার আন্তর্জাতিক বিমানে উঠে পড়লে তার অনুসরণকারীরা বোধহয় তার নাগাল পাবে না। যা কিছু তারা করে প্লেনে ওঠার আগেই। ফাইভ স্টার হোটেলের নির্জন সুইট এসব কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই।

ববি রায় তাঁর নির্দিষ্ট হোটেলে আগে থেকে বুক করা ঘরে চেক-ইন করলেন। গরম জলে ভাল করে স্নান করালে, ব্রেকফাস্ট খেলেন। খবরের কাগজে চোখ বোলালেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সমূদ্রও দেখলেন। সবচেয়ে বেশি লক্ষ করলেন, নীচের ব্যালকনিটায় কেউ নেই।

তারপর খুব ধীরে-সুস্থে পোশাক পরলেন। অ্যাটাচি কেস ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই। দরকারও হয় না। প্যারিসে তার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সবই আছে সেখানে।

কিন্তু এই অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বেরোলে অনুসরণকারীদের সন্দেহ হতে পারে যে তিনি হোটেল ছেড়ে পালাচ্ছেন। ববি রায়ের যতদূর ধারণা, তার অনুসরণকারীরা এই ফ্লোরে ঘর নিয়েছে। অপেক্ষা করছে। লক্ষ রাখছে।

কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন ববি।

আমার দুই বন্ধুর এই হোটেলে চেক-ইন করার কথা। কেউ কি করেছে এর মধ্যে?

বেয়ারা মাথা নাড়ল, দু’জন সাহেব পঁচিশ নম্বর ঘরে এসেছেন। মিস্টার মেহেরা আর মিস্টার সিং।

ববি রায় উজ্জ্বল হয়ে বললেন, ওরাই, ঠিক আছে।

কোনও খবর দিতে হবে, স্যার?

না। আমি নিজেই যাচ্ছি।

বেয়ারা চলে গেলে ববি রায় উঠে আটাচি কেসটা খুলে আর-একটা গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থেকে খুব সরু নাইলনের দড়ি বের করলেন। অ্যাটাচি কেসটা দড়িতে ঝুলিয়ে ব্যালকনি থেকে খুব সাবধানে নামিয়ে দিলেন নীচের ব্যালকনিতে।

তারপর শিস দিতে দিতে দরজা খুলে বেরোলেন। পচিশ নম্বর ডানদিকে, সিঁড়ির মুখেই। ববি জানেন।

পঁচিশ নম্বরের দরজাটা যে সামান্য ফাঁক তা লক্ষ কবলেন ববি রায়। ভাল, খুব ভাল। ওরা দেখছে, ববি রায় খালি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং এখনই পিছু নেওয়ার দরকার নেই। শিকারকে তত ফিরে আসতেই হবে।

লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে তবু ববি আয়ের শিরশির করছিল। যদি এইসব রাফ স্বভাবের খুনি সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার চালায় এখন?

না, অত মোটা দাগের কাজ করবে না। করিডোরে ব্যস্ত বেয়ারদের আনাগোনা রয়েছে। ওরা অপেক্ষা করবে।

লিফটে ঢুকে ববি রায় নীচের তলার পূহঁচ টিপলেন, লিট থামতেই চকিত পায়ে নেমে পড়লেন। পকেট থেকে একটা স্কেলিটন চাবি বের করে একটা স্যুইটের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন।

এবং তারপরই বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। ঘরে লোক আছে। বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। শোওয়ার ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে। অথচ বারান্দায় তার অ্যাটাচি কেস। কিন্তু ভাববার সময় নেই। ববি রায় সাবধানে শাওয়ার ঘরের দরজাটা সামান্য খুললেন।

ঘুম জড়ানো গলায় এক বাপ তার ছেলের সঙ্গে কড়া ভাষায় কথা বলছে।

ববি রায় দরজায় নক করলেন।

হু ইজ ইট?

হোটেল ইন্সপেক্টর, স্যার। ইজ এভরিথিং ক্লিন?

ইয়াঃ।

লেট মি সি স্যার? মে আই কাম ইন?

কাম ইন।

ববি রায় ঘরে ঢুকলেন। চারদিকটা দেখলেন, ব্যালকনিতে গিয়ে দ্রুত দড়িটা খুলে পকেটে রাখলেন। অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে চলে এলেন।

ইটস ওকে, স্যার। থ্যাংক ইউ।

অঃ রাইট।

ববি রায় বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন নাচে। হোটেলের বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলেন।

হোটেলের বিলটা দেওয়া হল না। সেটা পরে পাঠালেও চলবে। আপাতত ভিন্ন একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার।

থ্রি স্টার একটা হোটেলে এসে উঠলেন ববি রায়। একটু ভিড় বেশি। তা হলেও অসুবিধে কিছু নেই। তিনি সব অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারেন।

দরজা লক করে ববি রায় পোশাক ছাড়লেন। তারপর ঘুমোলেন দুপুর অবধি।

ধীরেসুস্থে লাঞ্চ খেলেন হোটেলের রেস্তোরাঁয়, ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তিনি কি নিরাপদ? তিনি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? তা হলে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কেন?

ববি রায় বিশাল রেস্তোরার চারদিকে একবার হেলাভরে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

তারপর আবার যথেষ্ট ক্ষুধার্তের মতোই খেতে লাগলেন নিশ্চিন্তে।

না, ববি রায় তাঁর দু’জন অনুসরণকারীকে বোকা বানালেও সব বিপদ ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। বোধ হয় ফাইভ স্টার হোটেলের লবিতে ওদের লোক ছিল। হদিশ পেয়েছে।

বাঁ দিকে চারটে টেবিলের দূরত্বে বসে আছে দুজন। সেই দু’জন।

০৬. খাওয়া শেষ করে ববি রায় উঠলেন

খাওয়া শেষ করে ববি রায় উঠলেন, অতিশয় ধীর-স্থির এবং রিল্যাক্সড দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু ববি রায়ের ভিতরে যে কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্কটি আছে তা ঝড়ের বেগে কাজ করে যাচ্ছিল।

লবিতে বা বাইরে ওদের নজরদার আছে। সুতরাং হোটেলের বাইরে ওদের মোকাবেলা করা শক্ত হবে। তার চেয়ে হোটেলের ভিতরেই একটা ফয়সালা করে নেওয়া ভাল। নাছোড় এ দুটি লোককে না ছাড়ালে চলবে না।

খুব ধীর পায়ে গুনগুন করে বিদেশি গান গাইতে গাইতে ববি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন, ঘর খুললেন, দরজা বন্ধ করলেন, তারপর দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এসব কাজে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার হয়।

কিন্তু প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও কিছুই ঘটল না।

ববি রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দরজা খুলে বেরোলেন। করিডোর ফাঁকা! আততায়ীদের চিহ্নও নেই।

তা হলে?

ববি ধীর পায়ে হোটেল থেকে বেরোলেন। বোম্বেতে তার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আছে। একবার ফোন করলেই সাগ্রহে তারা তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে! পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তিনি পেয়ে যেতে পারেন! ববি রায় যে এক মূল্যবান মস্তিষ্ক এ কথা আজ কে না জানে! কিন্তু ববি রায় এও জানেন যে, ওভাবে কেবল বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু কে বা কারা তাঁর পিছু নিয়েছে, কেনই বা, এসব কোনও দিনই জানা যাবে না। বিপদের বীজ থেকেই যাবে।

বোম্বে শহরে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ। ববি ট্যাক্সি নিলেন। কোথায় যাবেন তা কিছু ঠিক করতে পারলেন না, চক্কর দিতে দিতে অবশেষে মেবিন ড্রাইভে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে নামলেন। সমুদ্র তার চিরকালের প্রিয়। সমুদ্র তাঁর মাথাকে পরিষ্কার করে দেয়, তাকে চনমনে করে তোলে।

ফুটপাথ থেকে লাফ দিয়ে বাঁধের ওপর উঠে পড়লেন ববি রায়। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ভূখণ্ড। সেই আক্রোশে সমুদ্র ফুঁসে উঠে লক্ষ ফণায় ছছাবল মারছে অবিরাম। তলায় রাশি-রাশি কংক্রিটের টুকরো ফেলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রবল তাড়নায় সমুদ্রের আছড়ে পড়া জল তীক্ষ্ণধার লক্ষ বিন্দু হয়ে ছুটে আসছে ওপরে। খরশান ফোয়ারার মতো, বাত্যাতাড়িত বৃষ্টির মতো ভিজিয়ে দিচ্ছে পথচারীকে।

ববি রায় সামান্য ভিজে গেলেন। জল ঘুরছে, দোল খাচ্ছে, ফেনিল হয়ে যাচ্ছে অবিরল পরিশ্রমে। তবু বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই।

বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে চারপাশে। ববি রায় যতদূর লক্ষ করলেন, তার পিছু নেয়নি কেউ। কিন্তু ববি রায় জানেন, নজর ঠিকই রাখা হয়েছে তার ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধ শেষ হয়ে গেল। সামনেই চমৎকার একটি সি-বিচ। এই অবেলাতেও কত লোক স্নান করছে। বড় বড় ছেলেরা নির্লজ্জ ল্যাংটো হয়ে ঢেউয়ের মধ্যে দৌড়োচ্ছে। উড়ছে রঙিন বল। বড় বড় বর্ণালি ছাতার তলায় ঠান্ডা পানীয় নিয়ে বসে আছে মেয়ে এবং পুরুষ।

ববি রায় একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসলেন। একটা ঠান্ডা পানীয় নিলেন। তারপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে প্রায় সব কিছুই ভুলে গেলেন।

পানীয়টি শেষ হয়ে গেল এক সময়ে। ববি রায় ঘড়ি দেখলেন। তাড়া নেই। উঠলেন।

চড়া রোদ এবং তপ্ত বালিয়াড়ি থেকে উঠে আসা কম্পমান তাপে একটু ঝাপসা লাগল। তবু ববি রায় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলেন একটু দুরে আর-একটা ছাতার তলা থেকে দু’জন লোক উঠে পড়ল। এরা সেই দু’জন নয়, তবু এরাও মৃত্যুর প্রতিনিধি। ববি রায় জানেন।

পিছনের টেবিলে আরও একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। ববি রায় তাকে লক্ষ করেননি। একটি মিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল, হিঃ, নিড এ কম্প্যানিয়ন?

ববি রায় ফিরে মেয়েটিকে দেখলেন। নিম্নাঙ্গে একটা সাদা হাফপ্যান্ট গোছের, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা টিশার্ট, নীল সাদা আড়াআড়ি স্ট্রাইপের। দুটি উন্নত স্তন গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। মেয়েটি ফরসা, বোধহীন লোল হাসি তার মুখে, চোখে লোভ। নইলে এক ধরনের সৌন্দর্যও ছিল। দেখতে তেমন খারাপ নয়। কোমরের চওড়া বেল্টে একটা পেতলের অক্ষর নজরে পড়ল ববির, সি। বয়কাট চুল হাওয়ায় আলুথালু।

ববি একটু শিস দিলেন, তারপর বললেন, কাম অন।

সব মানুষই কি নয় কম্পিউটারের মতো? কিছু ডাটা ফিড করা থাকে। সেই মতো চলে, যেমন ওই ভাড়াটে খুনিরা, তেমনি এই কলগার্লটি।

তিনি নিজে?

কে জানে, তিনি নিজেও হয়তো তাই।

বাড়ানো হাতে কোমরটা পেয়ে গেলেন ববি। শরীরটা যথেষ্ট নমনীয়, যথেষ্ট শক্তি রাখে। বয়সটাও ওর ফেবারে। কিছুতেই কুড়ির ওপর নয়।

তৃষ্ণার্ত গলায় মেয়েটি বলল, লেট আস হ্যাভ এ ড্রিংক ফাস্ট, আই অ্যাম থার্স্টি।

আই নো।

মালাবার হিলসের দিকে অনির্দেশ্য হাত তুলে মেয়েটি বলল, আই হ্যাভ এ জয়েন্ট ওভার দেয়ার। হেইল এ ক্যাব।

ববি রায় এসবই জানেন, কোনও বার-এ যাবে। খদ্দেরের পয়সায় মদ খাবে। ডিনার খেতে চাইবে। নিয়ে যাবে নিজস্ব ঘরে। পকেট ফাঁকা করে ছেড়ে দেবে। রুটিন।

ববি এসবে অভ্যস্ত নন, কিন্তু মেয়েটাকে কভার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্তত একটা ডাইভারশন।

ট্যাক্সি সামনেই ছিল, দু'জনে উঠতেই মেয়েটি ঝুঁকে চাপা স্বরে ড্রাইভারকে একটা নির্দেশ দিল। ববি রায় সেটা চেষ্টা করেও শুনতে পেলেন না। সমুদ্র গজরাচ্ছে, হুড়হুড়িয়ে বইছে হাওয়া।

ববি হেলান দিয়ে আরাম করেই বসলেন। সর্বদাই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয় বর্তমান নিয়ে। তার ভাবাবেগ বলে কোনও বস্তু নেই, ভয় তাঁর ভিতরে তেমনভাবে কাজ করে না, তাঁর ভিতরে কাজ করে অঞ্চ এবং কেবলমাত্র অঙ্ক।

ছোট কিয়াট গাড়িটা যখন গুড়গুড় করে চলছে তখন মেয়েটা ববির একটা হাত মুঠো করে ধরল। ববি বাধা দিলেন না দিতে ইচ্ছে হল না বলেই, তবে হাতখানার ভাষা অনুভূতির ভিতর দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নরম ও উষ্ণ হাতখানা কি আগ্রহী? না কি ভীত? দ্বিধাগ্রস্ত?

তোমার নাম কী?

চিকা।

নামটা তো বেশ ভালই।

তোমার নাম?

ববি।

হাতটাকে আরও একটু নিবিড়ভাবে চেপে ধরলেন ববি! হাতটা কি তাকে কোনও তথ্য দিচ্ছে? দেওয়ারই কথা। পৃথিবীর সব জিনিসই সর্বদা কিছু না কিছু তথ্য দেবেই। শুধু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তা বুঝে ওঠাই যা শক্ত।

গাড়িটা মালাবার হিলস বেয়ে উঠছে। অতি চমৎকার দৃশ্য চারদিকে। অত্যন্ত অভিজাত, নিরিবিলি, খোলামেলা।

ববি চিকার দিকে ঘুরে তাকালেন, এসব কাজের পক্ষে তোমার বয়স বড্ড কম। চিকা সামান্য চমকে উঠল কি? বলির দিকে চেয়ে অকপট বিস্ময়ে বলল, কোন সব কাজ?

ববি স্বগতোক্তির মতো বললেন, মেয়েদের যে কতভাবে ব্যবহার করে মানুষ! শুধু জন্মানোর দোযে মেয়েদের কত না কষ্ট!

বড্ড এলোমেলো হাওয়া, ঢেউয়ের শব্দ। চিকা বোধহয় ববির কথা ভাল শুনতে পেল না। কিন্তু ববির দুঃখিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু অনুমান করে নিল। ঝুঁকে প্রায় ববির গালে শাস ফেলে বলল, তুমি কি দুঃখী মায়? বউ ছেড়ে, বুঝি? রাহা, বড় ছেড়ে গেলে প্রথম-প্রথম বড় কষ্ট হয়।

ববি মৃদু হেসে বললেন, ইউ আর এ থটরিডার।

একটা নাল ফিয়াট পিছু নিয়েছে তা বিয়ারভিউ আয়নায় দেখেছেন ববি।

চিকা এক ঘন হয়ে বসল। ববি নিজে পারফিউম মাখেন না কখনও। কিন্তু ফরাসি দেশে তিনি পারফিউমের নানা বিচিত্র ব্যবহারের কথা জানেন। কিছু পারফিউম আছে যা কামোত্তেজক। এই মেয়েটির শরীর থেকে ঠিক কেমই কোনও গন্ধ আসছিল, যা নাসারন্ধ্রকে স্ফীত করে এবং রক্তকণিকায় একটা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে দেয়, দ্রুত করে দেয় হৃদস্পন্দন।

চিকা তাঁর কাঁধে মাথা রাখতেই ববি রায় মৃদু স্বরে বললেন, ইউ আর ইন ডেঞ্জার মাই ডিয়ার। মেয়েটি চকিতে মাথা তুলল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট?

মেয়েটিকে বালিকাই বলা যায়। এখনও শরীর ততটা পুরন্ত নয়। চোখে-মুখে এখনও পাপের ছায়া গাঢ় হয়ে বসেনি। জীবনটা এখনও এর কাছে নিতান্তই খেলা-খেলা একটা ব্যাপার। যদিও এই বয়সেই পেশাদার এবং সাহসিনী হয়ে উঠেছে তবু ববির ইচ্ছে হল না এবে কভার হিসেবে ব্যবহার করতে।

ববি ওর হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, আই অ্যাম নট এ গুড পিক, মাই ডিয়ার। এরপর যখন খদ্দের ধরবে একটু দেখেশুনে ধোরো।

মেয়েটি রাগ না। অবাক হয়ে বলল, “কি পাগল? তোমাকে তো আমার অনেকক্ষণ ধরেই ভাল লাগছিল। কেমন দুঃখী, একা, মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম তোমার বড় পালিয়ে গেছে। তখনই আমার মনে হল, তোমার জন্য কিছু করতে হবে। আমরা একসঙ্গে মাতাল হব, নাচব, ফুর্তি করব। এর মধ্যে বিপদের কী আছে?

ট্যাক্সি ধীর হয়ে এল। তারপর একটা ঝা-চকচকে বার কাম রেস্তোরাঁর সামনে থামল। ববি রায় দেখলেন, এ হচ্ছে একেবারে নষ্টভ্রষ্ট ছোঁড়াছুঁড়িদের বেলেল্লাপনা করার মতো জায়গা। একটা নির্জন গলির মধ্যে।

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে ববি মেয়েটির হাতে হাত ধরে ঢুকে গেলেন ভিতরে। নীল ফিয়ার্টটা নিশ্চিত থেমেছে কাছেপিঠে। ববি রায় ঘাড় ঘোরালেন না। আলো এত মৃদু যে, বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকলে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার বলে মনে হয়। মেয়েটি হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে ববিকে কিছুক্ষণ হাতড়াতে হত চারদিকে।

কোণে একটা ফাঁকা একটেরে কিউবিকল। মেয়েটি খুব কাছ ঘেঁষে শরীরে শরীর লাগিয়ে বসল। রেস্তোরাঁয় খদ্দের নেই বললেই হয়।

কী খাবে? পুরুষেরা তো হুইস্কিই খায়। আমি খাব ভোদকা।

ববি শুধু বললেন, এনিথিং ইউ সে।

কাচের দরজাটা ঠেলে দু’জন লোক ঘরে ঢুকল! চারদিকে তাকাল। তারপর আবছা অন্ধকারে কোথাও বসে গেল।

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, ইটস এ ম্যাড জয়েন্ট। রাতের দিকে এ জায়গাটা একেবারে ক্রেজি হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এ হচ্ছে যৌবনের জায়গা। আমার মতে বুড়োদের নয়।

মেয়েটি ববির গালে একটা ঠোনা দিয়ে বলল, তুমি মোটেই বুড়ো নও। বোসো, আমি টয়লেট থেকে আসছি।

চিকা উঠে যেতেই ববি রায় দুটো জিনিস লক্ষ করলেন। চিকা তার হ্যান্ডব্যাগ সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেটা স্বাভাবিকও হতে পারে। মেয়েদের অনেক সাজগোজের জিনিসও হ্যান্ডব্যাগে থাকে। দ্বিতীয়ত চিকা ড্রিংকসের অর্ডার দিয়ে যায়নি। টয়লেট কোনদিকে তা ববি রায় জানেন না, চিকা গেল ডানদিকে। বাইরে বেরোনোর দরজা ওইদিকেই।

ববি রায় পরিস্থিতিটা বুঝে নিলেন চাখের পলকে। ঠিক কম্পিউটারের মতোই। জিন এই রেস্তোরা তার কবরখানা হয়ে উঠতে পারে, যদি সতর্ক না হন তিনি।

ববি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আর এৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, পিছনের কিউবিকলে একটা নড়াচড়ার শব্দ হল। ববি কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ঘুরে মুখোমুখি হলেন দুটো লোকের।

এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ মাত্র সময় পাওয়া যায় এসব ক্ষেত্রে। এই চকিত মুহূর্তেই ববি রায় বুঝে নিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আদ্যন্ত পেশাদার, নিরাবেগ, অভিজ্ঞ খুনি।

কিন্তু তারা আক্রমণ করার আগেই যে ববি রায় আক্রমণ করবেন এটা বোধহয় ওরা ভাবতেও পারেনি। আর সেই বিস্ময়ের সুযোগটাই নিলেন ববি রায়।

তাঁর বুটের ডগা যখন প্রথম খুনির হাঁটুতে খটাং করে গিয়ে লাগল তখন হাড় ভাঙার নির্ভুল শব্দ পেলেন ববি রায়।

ওয়াঃ–বলে লোকটা ভেঙে পড়তে-না-পড়তেই দ্বিতীয় লোকটির দিকে লাফিয়ে উঠে বাইসাইকেল চালানোর মতো পা দু’খানাকে শূন্যে তুলে লাফিয়ে যে লাথিটা চালালেন সেটা এড়ানোর কোনও নিয়মই জানা ছিল। লোকটার। এত দ্রুত কেউ পা বা হাত চালাতে পারে তা এ দেশের পেশাদাররাও বোধহয় এখনও ভেবে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় লোকটা শব্দ করল না। পিষ্ট ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে কার্পেটে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

প্রথম লোকটা হাঁটু চেপে বসা অবস্থায় এক অদ্ভুত ভয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ববির দিকে। ববি একটু ঝুঁকে হাতের কানা দিয়ে তার মাথায় মারলেন। লোকটা ঢলে পড়ে গেল।

কয়েকজন বেয়ারা কিছু আন্দাজ করে এগিয়ে আসছিল এদিকে। ববি দাঁড়ালেন না, চোখ-সওয়া অন্ধকারে কয়েকটা টেবিল তফাতে সরে গেলেন।

টয়লেটের দরজায় দাঁড়িয়ে চিকা, ঘটনাস্থলের দিকে চেয়ে ছিল। এখোল না।

ববি রায় দরজার কাছ বরাবর এগিয়ে গেলেন। একবার ফিরে তাকালেন। কেউ তাকে লক্ষ করছে কি? করুক, এখন আর ক্ষতি নেই।

ববি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সেই ট্যাক্সিটা এখনও অপেক্ষা করছে। ববি রায় পিছনের দরজা খুলে ভিতরে উঠে বসলেন।

চলো।

ট্যাক্সি চলতে লাগল। ববি রায় তিক্ততার সঙ্গে ভাবলেন, এইভাবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়? এই শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা এবং অবিরল দ্বৈরথ এটা কোনও ভদ্রলোকের জীবন নয়।

আপাতত পিছনে কোনও উদ্বেগজনক ছায়া নেই। কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিরাপদ। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নয়।

মেরিন ড্রাইভে ট্যাক্সি বদলালেন ববি। তারপর হোটেলে ফিরলেন।

এখানে নিশ্চয়ই আরও দুটি ছায়া তার জন্য অপেক্ষা করছে!

করুক, ববি রায় তাদের সময় দেবেন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। ববি ঘরে ঢুকবার আগে সামান্য দ্বিধা করলেন। দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে একটু অপেক্ষা করলেন। কিছু ঘটল না।

ঘরে ঢুকে আলোগুলো জ্বেলে দিলেন, কেউ নেই।

অ্যাটাচি কেসটা গুছিয়ে নিলেন ববি। তারপর রিসেপশনে এসে বিল মেটালেন।

পাঁচতারা হোটেলটায় যখন নিজের ঘরে ফিরে এলেন ববি তখন রাত প্রায় ন'টা।

রাত সাড়ে ন'টায় লীনার ঘরের ফোন বেজে উঠল।

হ্যাল্লো।—একটি আহ্লাদিত কণ্ঠ বোম্বাই থেকে বলে উঠল, কেমন আছেন মিসেস ভট্টাচারিয়া? গাড়ি কেমন চলছে?

এত অবাক হল লীনা যে কথাই জোগাল না মুখে।

শুনুন মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমার ফরেন ট্রিপটা বোধহয় ক্যানসেল করতে হচ্ছে। কিন্তু এখনও আমার ফেরার উপায় নেই।

লীনার সমস্ত শরীর রাগে বিদ্বেষে ক্ষোভে ঠকঠক করে কাঁপছিল। চাপা হিংস্র স্বরে সে বলল, ইউ… ইউ স্কাউন্ড্রেল, আপনি ওকে খুন করলেন? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

কাকে খুন করলাম মিসেস ভট্টাচারিয়া?

আপনি জানেন না?

মিসেস ভট্টাচারিয়া, যাকে রোজই দু-চারটে করে খুনখারাপি করতে হয় তার পক্ষে সব ক'জন ভিকটিমকে মনে রাখা কি শক্ত নয়?

ওঃ, ইউ আর হোপলেস!

এখন, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিন। মনে করুন, আপনি একজন কম্পিউটার। তথ্য ছাড়া আপনার মধ্যে কোনও আবেগ বিদ্বেষ ক্ষোভ কিছুই নেই। শুধু তথ্যটি দিন মিসেস ভট্টাচারিয়া। কে খুন হল?

আপনি তাকে ভালই চেনেন। আপনি তাকে আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন গোয়েন্দাগিরির জন্য। আপনি তাকে—

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনি কি কুইজ মাস্টার? অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে মাস্টার হয় কি না আমি জানি না। মেইড বা মিস্ট্রেস হবে হয়তো। বাইদি বাই, আপনি ইন্দ্রজিতের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

সে খুন হয়েছে?

হয়েছে এবং তাকে খুন করেছেন আপনি।

ববি বিনা উত্তেজনায় বললেন, আপনি তার ডেডবডি দেখেছেন?

না, কিন্তু সবাই দেখেছে। তার অফিসে এখনও রক্ত পড়ে আছে।

খুনটা কখন হল?

বিকেলে। কা

জটা আমার পক্ষে একটু শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া।

তার মানে?

আপনি যে কেন সব কথারই এত মানে জানতে চান! কাজটা বেশ শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া, কারণ বম্বে থেকে কলকাতায় কাউকে খুন করার মতো ডিভাইস আমার মতো জিনিয়াসও আজ অবধি তৈরি করতে পারেনি।

আপনি বোম্বে থেকে কথা বলছেন?

হ্যাঁ মিসেস ভট্টাচারিয়া, বিশ্বাস না হয় আপনি লাইন কেটে দিয়ে কলব্যাক করতে পারেন।

আপনি সত্যিই বোম্বেতে?

হ্যাঁ। এবার ঘটনাটা একটু সংক্ষেপে বলুন তো, ফ্রিলগুলো বাদ দেবেন। চোখের জল, আহা-উহু, সেন্টিমেন্ট এসব কোনও কাজের জিনিস নয়। টেলিফোনের বিল বাড়বে।

আপনি... আপনি একটা...

তিন সেকেন্ড পার হয়ে গেল মিসেস ভট্টাচারিয়া।

মিসেস নয়। মিস...

আরও দু’ সেকেন্ড...

আপনি এরকম কেন বলুন তো?

আরও তিন সেকেন্ড...

০৭. লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল

লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, উইল ইউ প্লিজ স্টপ কাউন্টিং মিস্টার রায়?

কাউন্টিং হেল্পস, ইউ নো। সবকিছুই কাউন্ট করা ভাল। নাউ, আউট উইথ ইয়োর স্টোরি।

লীনা ভিতরকার দুর্দম রাগটাকে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল, চোখ বুজে এবং ভীষণ জোরে টেলিফোনটা চেপে ধরে। সবেগে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, অল রাইট। বলছি।

লীনা বলল এবং ওপাশে ববি রায় একটি শব্দ না করে শুনে গেলেন। শব্দহীন ফোনে কথা বলতে বলতে লীনার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, লাইন কেটে গেল নাকি!

শুনছেন?

শুনছি। বলে যান।

বিবরণ শেষ হওয়ার পর ববি রায় বললেন, লোকটার মরা উচিত ছিল অনেক আগেই। এ ডাউনরাইট স্কাউন্ড্রেল। সেই খাতাটা এখন কোথায় বলতে পারেন?

কেন?

খাতাটার জন্য কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে।

দ্যাট উইল ড্র এ লট অফ গুড টু ইউ। লোকটাকে আপনি আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন কেন তা জানতে পারি?

ওনলি অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট, মিসেস ভট্টাচারিয়া। আমার সেক্রেটারি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানার দরকার ছিল।

আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার মধ্যে কোন অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে মিস্টার নোজি পারকার?

আমি আপনার পার্সোনাল লাইফে ইন্টারেস্টেড নই মিসেস ভট্টাচারিয়া। ইন ফ্যাক্ট আপনার পাসোনাল লাইফটা খুবই ডাল, ড্রাব, আড্রামাটিক এবং শেমফুল।

ইউ… ইউ…

কিন্তু আপনার লাইফটা হঠাৎ একটা ড্রামাটিক টার্ন নিতে পারে মিসেস ভট্টাচারিয়া। ড্রামাটিক অ্যান্ড ডেঞ্জারাস। আপনার সেই রোমিওটি কোথায়? তার যদি অন্য কোনও কাজ না জুটে গিয়ে থাকে, ইফ হি ইজ স্টিল এ ভ্যাগাবন্ড, তা হলে ওকে আপনার বডিগার্ড হিসেবে ইউজ করুন না কেন! নিতান্ত কাওয়াড়রাও প্রেমে পড়লে অনেক সাহনের কাজ করে ফেলে।

কথায় আছে অধিক শোকে পাথর। লীনার এখন সেই অবস্থা। এইসব গা-জ্বালানো কথায় সে যতখানি রাগবার বেগেছে। আরও রেগে যাওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব! প্রত্যেক মানুষেরই তো একটা বয়লিং পয়েন্ট থাকে, তারপরে আর গরম হওয়া তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং লীনা পাথর হয়ে এল। এবং খুব শান্ত হিমেল গলায় বলল, হোয়াই শুড আই নিড এ বডিগার্ড?

বিজ ইউ আর ইন মরটাল ডেঞ্জার, মাই ডিয়ার।

ড্রপ দি ডিয়ার বিট। তানি আপনার একটি কথাও বাস করছি না। আমি আজই রিজাইন। কবছি, এক্ষুনি।

তাতেই কি বাঁচবেন?

আপনার মতে অভদ্র, বর্বরের সঙ্গে কাজ করতে আমি ঘেন্না করি। আপনি আমাকে ভয় দেখানোর ছেলেমানুষি চেষ্টা করছেন। আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

আর কয়েক সেকেন্ড পরে থাকুন এবং শুনুন প্লিজ।

আমি আপনার কোনও ব্যাপারেই থাকতে চাই না। আপনি আমাকে একগাদা ভুল কোড দিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে মজা করেছেন। ইয়ারকির একটা শেষ থাকা উচিত মিস্টার রায়।

তিন মিনিটের ওয়ার্নিং হল এবং ববি এক্সটেনশন চেয়ে নিলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ভুল কোড নয়। দেয়ার ইজ এ কোড অলরাইট। তবে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে বের করতে হবে। একটু মাথা খাটাতে হয় মিসেস ভট্টাচারিয়া, একটু মাথা খাটালেই...

ঝপাং করে টেলিফোন রেখে দিল লীনা। তারপর রাগে ক্ষোভে আক্রোশে একা একা ফুঁসতে লাগল।

ফোনটা রেখে ববি রায় একটু কাঁধ ঝাঁকালেন।

পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, কাজটা ভাল হচ্ছে না স্যার।

ববি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি যে চিংড়ি মাছটা খাচ্ছ তার দাম কত জানো?

না স্যার।

আমিও জানি না। কিন্তু দেড়শো টাকার কম হবে না।

ও বাবা! বাকিটুকু কি খাব স্যার? দাম শুনে যে ভারী লজ্জা হচ্ছে।

ববি রায় চিন্তিতভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, শুধু কি চিংড়ি? চিকেন ছিল না? রুমালি রোটি? চিকেন অ্যাসপ্যারাগাস স্যুপ?

ভারী লজ্জা করছে স্যার।

করছে তো?

করছে।

তা হলে আমি যা বলি না করি তা মুখ বুজে মেনে নেবে। বুঝলে?

ইন্দ্রজিৎ সেন চিংড়ির আর-একটা টুকরো মুখে দিয়ে বলল, মেনে না নিয়ে উপায় কী? তবু বলছি মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করছেন না। আপনার মর‍্যালে একটু লাগা উচিত ছিল।

ফের?

ভেবে দেখুন স্যার, আপনার আডভারসারিরা মোটেই সুবিপের লোক নয়। তারা ইনফরমেশনের জন্য খুন অবধি করতে পারে।

কাউকে না কাউকে তো বিপদে পড়তেই হবে। সবাইকে বাঁচিয়ে কি চলা যায়?

তবু উনি আফটার অল একজন মহিলা।

আমার কাছে মহিলাও যা, পুরুষও। ওনলি পার্সন।

আপনি কিন্তু স্যার, একটু জুয়েল-হাটেড আছেন। ওই যে ফোনে বললেন, আমার অনেক আগেই মরা উচিত ছিল এটা থেকেই বোঝা যায় আপনার মায়া-দা নেই।

ইন্দ্রজিৎ, ইউ আর স্টিল ইটিং দ্যাট চিংড়ি। টেস্টফুল, হেলথ গিভিং, কস্টলি। তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ নেই?

আমি চিংড়িটার আর কোনও স্বাদ পাচ্ছি না স্যার।

তোমার মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না ইন্দ্রজিৎ! মনে হচ্ছে, ইউ আর ইম্‌মেনসলি এনজয়িং ইয়োর মিল।

ইন্দ্রজিৎ আর-একটা টুকরো মুখে চিবোতে চিবোতে চিবোতে বলল, এদের রান্না যে ভীষণ ভাল স্যার। এনজয় করতে চাইছি না, তবু খাওয়াটা থামাতে পারছি না। ক্যালকাটা টু বম্বে ফ্লাইটে কিছুই খাওয়াল না স্যার। শুধু দু'খানা প্লাস্টিকে মোড়া বিস্কুট আর কফি। বড্ড খিদেও পেয়েছিল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স যে কী কেপ্পন হয়ে গেছে কী বলব স্যার! তাই খিদের মুখেই খাচ্ছি। তবে স্বাদ অনেকটাই কম লাগছে স্যার।

ববি বায় ভ্রু কুঁচকে ইন্দ্রজিতে দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, ইজ শি স্মার্ট?

বেশ স্মার্ট।

তুমি মার্ডারটা যেভাবে সাজিয়েছ তা কি ফলপ্রুফ?

ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, পৃথিবীতে কিছুই ফুল না স্যার।

মেয়েটা সন্দেহ করবে না তো?

এখনও তো করেনি। কিন্তু আমার খুন হওয়াটা কে সাজাতে হল সেটাই তো বুঝতে পারছি না, স্যার।

তোমার খুব বেশি বুঝবার দরকার কী?

তা অবশ্য ঠিক স্যার। তবে সকালে যে আমি লীনা দেবীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু পুরোপুরি আমার দোষ নয় স্যার। উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিসে এসে পড়েছিলেন।

সেইজন্যই তোমার খুন হওয়াটা দরকার ছিল হাঁদাবাম।

কিন্তু খাতাটা ওকে দেখালেন কেন স্যার? ব্যাপাবটা ফাঁস হয়ে গেল যে, আমিই ওর পিছনে স্পাইং করছি।

সেটারও দরকার ছিল। তুমি বুঝবে না। খাচ্ছ খাও।

ইন্দ্রজিৎ চিংড়ি শেষ করে পুডিং খেতে খেতে বলল, কাজটা ঠিক হল না স্যার।

কোন কাজটা?

মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা।

ইন্দ্রজিৎ, তুমি একটা সত্যি কথা বলবে?

বরাবরই বলে আসছি।

তুমি মেয়েটার প্রেমে পড়োনি তো?

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে বলল, এদের পুডিংটা রাজা। ওফ, কী স্বাদ!

আর ইউ ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল?

ইন্দ্রজিৎ চোখ নামিয়ে বলল, মেয়েটার চোখ দুটো ভারী ভাল। বু

ঝেছি।

ববি রায় কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ক্রাইসিসটা যদি কাটে, তা হলে ইউ মে গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট গার্ল।

থ্যাংক ইউ স্যার।

কিন্তু ক্রাইসিসটা কাটবে কী করে? ববি রায় আবার চিন্তিতভাবে ঘরজোড়া নরম কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে বললেন, আমি মৃত্যুকে এড়াতে পারি না আর। কিছুতেই না। জাল অনেক ছড়িয়ে পাতা হয়েছে। শোনো ইন্দ্রজিৎ…

বলুন স্যার।

আমার মৃত্যুর আগে ইনফরমেশনটা কিল করা চলবে না। কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা কি করতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?

পারছি স্যার।

ভুল করলে চলবে না ইন্দ্রজিৎ।

ভুল হবে না স্যার।

আমাকে খুন করার পর মেয়েটাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করতে পারে। অন্তত দে উইল পাম্প হার ফর ইনফরমেশন টেক কেয়ার ইন্দ্রজিৎ। মেয়েটা যেন খামোখা না মরে।

কিন্তু আপনি কখন খুন হবেন স্যার?

ববি রায় অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন। জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে চেয়ে বললেন, ওই যে সব দূরে দূরে বাড়ি রয়েছে, ওখান থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল তাক করে গুলি চালানো হতে পারে।

ও বাবা!

ববি রায় ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার খাবারে বিষ মেশানো হতে পারে।

মাই গড!

ইন ফ্যাক্ট, ইন্দ্রজিৎ, তুমি এতক্ষণ ধরে যেসব সুস্বাদু খাবার খেলে তার মধ্যে সায়ানাইড থাকলে আমি অবাক হব না।

ইন্দ্রজিৎ করুণ মুখ করে বলল, স্যার, এইভাবেই কি প্রতিশোধ নিচ্ছেন! খাইয়ে, তারপর ভয় দেখিয়ে?

ববি রায় আনমনে পায়চারি করতে করতে বললেন, আরও কতরকম পথ খোলা আছে ওদের কাছে। শুধু সময়টা জানতে পারলে ভাল হত।

হ্যাঁ স্যার। আমাদেরও কত কাজের সুবিধে হয়ে যায় তা হলে। একটা কথা বলব সার?

বলো।

ডিটেকটিভদের রিভলভার বা পিস্তল না থাকলে ভাল দেখায় না।

তুমি আমার পিস্তলটা চেয়েছিলে, না?

হ্যাঁ সার। যদি মরেই যান তা হলে পিস্তলটা অন্তত…

তোমার তো লাইসেন্স নেই ইন্দ্রজিৎ।

থাক। ওটা আমি লুকিয়ে রাখব।

আমার মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করো, ইন্দ্রজিৎ।

তাতে কী লাভ স্যার? আপনি মরলে পুলিশ ডেডবডি সার্চ করে ওটা নিয়ে যাবে।

এবার কাকে ক্রুয়েল-হার্টেড মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ?

আপনাকেই স্যার।

কেন?

যে নিজের মৃত্যুটাকেও ওরকম হেলাফেলা করে তার মতো নিষ্ঠুর আর কে আছে?

তুমি আঁচিয়ে এসো, ইন্দ্রজিৎ।

যাচ্ছি স্যার। একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনার গলায় ওই অদ্ভুত সোনার চেনটা কেন স্যার?

ওটা চেন নয়।

তা হলে?

স্যাক্রেড থ্রেড। পৈতে।

তার মানে?

ছেলেবেলায় আমার একবার পেতে দেওয়া হয়েছিল। মা বলেছিল, এ ছেলে তোত পৈতে গলায় রাখবে না, ছিঁড়ে গেলে ফেলে দেবে। তাই সোনার পৈতে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে আছে। কিন্তু আর সময় নেই ইন্দ্রজিৎ, আমাদের এবার উঠতে হচ্ছে।

বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিয়ে এল লীনা। তারপর স্টিরিয়োতে গান শুনল বহুক্ষণ। ইংরিজি, রবীন্দ্রসংগীত, সরোদ।

অস্থিরতা তবু কমল না।

সে ডাল, ড্রাব, আনড্রামাটিক এবং শেমফুল জীবন যাপন করে? সে এতই সস্তা? এত খেলে? লোকটা তাকে ভাবে কী?

ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল খেল লানা। তারপর পেপারব্যাক থ্রিলার খুলে বসল। কোনও লাভ নেই এসব করে, সে জানে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো এখন অসম্ভব।

বই রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল লীনা। বেশ ঠান্ডা লাগছে। গায়ের গরম চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সে! ভুতুড়ে নিস্তব্ধ বাড়িতে সে একা জেগে। কোনও মানে হয় না।

ববি রায়? ববি রায়কে সে এতটুকু সহ্য করতে পারছে না। ওই বাফুন, ওই ক্লাউন, ওই বর্বরটাকে আর সহ্য করা সম্ভবও নয় তার পক্ষে। বলে কিনা, তার মরটাল ডেঞ্জার আসছে!

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল লীনা। মাথার ভিতরে টিক টিক করে উঠল। আজ বিকেলে কি তাকে সত্যিই কেউ অনুসরণ করেছিল? যদি করে থাকে, কেন? কেনই বা খুন হল ইন্দ্রজিৎ সেন?

এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।

কিন্তু জবাব তো একটা লীনার চাই।

ঘরে এসে লীনা টেবলল্যাম্প জ্বেলে বসে গেল। একটা কাগজে পূর্বাপর ঘটনাবলী সে সাজিয়ে লিখতে লাগল। বড্ড অ্যাবরাপ্ট। হঠাৎ করে ববি বায়ের তাকে ডেকে পাঠানো এবং তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই অস্বাভাবিক এবং দ্রুতগতি। কিন্তু একটা প্যাটার্ন কি ফুটে উঠছে?

সে ববি রায়ের দেওয়া কোডগুলো পরপর লিখল। বয়ফ্রেন্ড থেকে শুরু করে বার্থ ডে, আই লাভ ইউ। পারমুটেশন কম্বিনেশা করতে বলেছিল লোক্টা! কী ছাই পারমুটেশন কম্বিনেশন করবে সে? এর কোনও মানে হয়?

তবে লীনা বুঝতে পারল, রহস্য যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তা আছে ওই কম্পিউটারের গর্ভেই। কিন্তু সঠিক কোড না পেলে কম্পিউটার তো মুখ খুলবে না।

তা হলে?

টেবিলের ওপর হাতে মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত লীনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে টের পেল, দাড় টনটন করছে, হাত ঝনঝন করছে।

নিয়মমাফিক ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম আর আসন করে সে খুব গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

সাজগোজ সেরে আজ অনেক আগেই অফিসে বেরিয়ে পড়ল সে।

ববি রায়ের ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজা লক করল লীনা। তারপর কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে এস।

রয় লাভ।

নো অ্যাকসেস।

দাঁতে দাঁত টিপে ভাবতে লাগল লীনা। বয়ফ্রেন্ড। আই লাভ ইউ। বার্থ ডে। কী বদমাশ লোকটা। কী অসভ্য! এ মা! বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আই লাভ ইউ করে তারপর বার্থ ডে মানে বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সংকেত! ছিঃ ছিঃ।

আনমনে লীনা কিছুক্ষণ বসে রইল। লোকটা কি পারভার্ট?

সারা সকাল নানারকম কম্বিনেশন করে দেখল লীনা। কম্পিউটার কোনও সংকেতই দিতে পারল না।

তা হলে কি চিট করেছে লোকটা? তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে?

ববি রায়ের ঘরে অনেকবার টেলিফোন বাজল। সুভদ্র সেক্রেটারির মতো লীনাকে কোকিলকণ্ঠ নজনকে জানাতে হল যে উনি আউট অব স্টেশন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

বিকেলের দিকে আজও আসবে দোলন।

তারা বেড়াবে। কোথাও যাবে। সিনেমা দেখবে গ্রোবে।

কিন্তু রোম্যান্টিক বিকেলটা টানছিল না আজ লীনাকে! টানছিল বলি রায়ের ভিডিয়ো ইউনিট। তার কোড।

কিন্তু কোড আর কিছু বাকি নেই।

লীনার মাথাটা একটু পাগল-পাগল লাগছিল শেষ দিকে। ভিডিয়ো ইউনিটটার দিকে চেয়ে সে বলল, আই হেট ইউ, আই হেট ইউ ববি রায়।

বিদ্যুৎচমক! ববি রায়! আট অক্ষর।

লীনা দ্রুত চাবি টিপল। ববি রায়।

ভিডিয়ো ইউনিটে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল।

লীনা অবাক হয়ে দেখল, ইংরিজি অক্ষরে লেখা, বম্বে রোড ধরে ঠিক পঁচিশ মাইল চলে যাও। বাঁদিকে একটা মেটে রাস্তা। গাড়ি যায়। তিন মাইল। একটা বাড়ি। নাম নীল মঞ্জিল। খুব সাবধান। রিপিট, খুব সাবধান। কেউ যেন তোমাকে অনুসরণ না করে। এই মেসেজটা এক্ষুনি কি করে দাও, প্লিজ।

লীনা মুখস্থ করে নিয়ে, মেসেজটা কিল করে ভিডিয়ো ইউনিট বন্ধ করল।

দোলন এসেছে। রিসেপশন থেকে ফোনে জানাল।

০৮. ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ

ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার?

মালাবার হিলসের দিকে। একটা বার কাম রেস্টুরেন্টে।

বোম্বাই প্রহিবিটেড শহর, স্যার। এখানে বার কাম রেস্টুরেন্ট নেই।

আছে। প্রাইভেটলি আছে। যেখানে যাচ্ছি সেটা খুবই প্রাইভেট জয়েন্ট। হয়তো আমাদের ঢুকতে দেবে না।

তা হলে কী করবেন?

তোমাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি কেন হাঁদারাম? বুদ্ধি খাঁটিয়ে এসব সমস্যার সমাধান করার জন্যই তো?

তা বটে। কিন্তু কাজের আগে ওরকম ফাঁসির খাওয়া খাওয়ালেন, এখন যে শরীর আইটাই করছে, ঘুমও পাচ্ছে।

খাওয়ালাম মানে? জোর করে খাইয়েছি নাকি? তুমিই তো এসে প্রথম কথাটাই বললে, স্যার, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। জাহাজ পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারি। বলোনি?

বলেছি। খিদেও পেয়েছিল। তখন তো স্যার জানতাম না যে খাওয়ার পর আবার কপালে দুঃখ আছে।

বেশি খাও কেন ইন্দ্রজিৎ? বাঙালিরা বড্ড বেশি খায়, তাই কাজ করতে পারে না।

ইন্দ্রজিৎ অমায়িক গলায় বলল, গরিবের তো ওটাই দোষ স্যার, মাগনা খাবার পেলেই দেদার খায়। তবে ভাববেন না স্যার, পারব। ওখানে কি মারপিট হবে? তা হলে অবশ্য…

তোমার মারপিটের ধাত নয় ইন্দ্রজিৎ। আমি জানি। কিন্তু বিপদ ঘটলে অন্তত দৌড়ে পালাতে হতে পারে।

সেটা পেরে যাব। পালানোটা আমার ধাতে খুব সয়।

ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে বসলেন। অনেক রাত হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ ফাঁকা। হু হু করছে হাওয়া আর সমুদ্রের কল্লোল। গাড়ি অতি দ্রুত পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল।

কত দুরে-স্যার?

বেশি দূরে নয়। নার্ভাস লাগছে না তো ইন্দ্রজিৎ?

না স্যার। তবে আপনার মোডাস অপারেন্ডিটা বুঝতে পারছি না।

আগে থেকে বুঝবার দরকার কী?

আমার ভূমিকাটা কী হবে?

তোমার ভূমিকা খুব সাধারণ। যদি কিছু হয় তা হলে তুমি পালাবে এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পুলিশে একটা খবর দেবে। মিসেস ভট্টাচারিয়াকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে।

উনি মিসেস নয় স্যার, মিস।

অল দি সেম।

একটু ঝুঁকে ববি ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিলেন। গাড়ি বাঁক নিল। একটু বাদে যেখানে ববি গাড়িটা দাঁড় করালেন সে জায়গাটা রেস্টুরেন্টের সম্মুখ নয় বটে, কিন্তু সেখান থেকে রেস্টুরেন্টটার দরজা দেখা যায়। দিনের বেলায় যেমন ঝা-চকচকে লেগেছিল এখন সেরকম লাগছে না। বাইরে আলোর কোনও খেলা নেই,

উজ্জ্বলতা নেই। বরং যেন একটু বেশি অন্ধকারই লাগছিল, একটিমাত্র বালকের আলোয়।

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ববি রায় নামলেন।

এসো ইন্দ্রজিৎ।

দু'জনে দ্রুত পায়ে এগোল। কয়েকটা নিঝুম গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। গাড়ির চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ মোটরবাইক আর স্কুটার। রাস্তায় কোনও লোকই নেই।

রেস্টুরেন্টের দরজা আঁট করে বন্ধ। একজন গরিলার মতো চেহারার লোক দরজার পাশে অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো, পাথরের মূর্তির মতো।

শান্তভাবে, একটু ঝুঁকে উর্দিপরা একটা হাত বাড়িয়ে গরিলা তাদের বাধা দিল। খুবই নিম্ন, কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল, ভিতরে যাওয়া বারণ। তোমরা কী চাও?

গরিলা ইংরিজি বলে, তবে ভাঙা ভাঙা এবং ভুলে ভরা। তবে ভঙ্গিটা বুঝিয়ে দেয় যে, ইংরেজির জন্য নয়, তাকে রাখা হয়েছে আরও গুরুতর কাজের জন্য।

ববি রায় ভারী অমায়িক হেসে বললেন, কাস্টমার। হোয়াট কাস্টমার? গো অ্যাওয়ে।

ববি রায় পকেটে হাত দিলেন। একখানা ভাঁজ করা পঞ্চাশ টাকার নোট প্রস্তুত ছিল। গরিলার হাতে সেটা চোখের পলকে চালান হয়ে গেল।

গরিলা ভ্রু কুঁচকে বলল, নো কিডিং।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ধরল গরিলা। উদ্দণ্ড নাচ-গান চেঁচামেচির শব্দ তেড়ে এল ভিতর থেকে। কানের পরদায় ধাক্কা দিল উন্মত্ত ড্রামের আওয়াজ। দু'জনে টুক করে ঢুকে গেল ভিতরে।

ধোঁয়া, শব্দ, ক্যালেডিয়োস্কোপিক আলোর খেলায় যৌবনের প্রলাপ সমস্ত ঘরটাকে, যেন ভেঙেচুরে ফেলছে। পায়ের তলায় সুস্পষ্ট ভূমিকম্প। চোখ জ্বালা করে, মাথা পাগল-পাগল লাগে। অন্ধকার ও আলোর এমনই পাগলা সমন্বয় এবং

দ্রুত অপস্রিয়মাণ নানা রং যে ভিতরটায় প্রকৃতই কী হচ্ছে তা বোঝা যায় না। তবে মেঝের অনেকটা পরিসর ফাঁকা করে তৈরি হয়েছে নাচের জায়গা। সেখানে ভুতুড়ে অবয়বের বহু মেয়ে আর পুরুষের শরীর বাজনার আদেশে সঞ্চালিত হচ্ছে বহু ভাঙ্গমায়।

ইন্দ্রজিৎ প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কানে এল ববি রায়ের কঠিন স্বর, চলে এসো, সময় নেই।

কোথায় স্যার?

কাম অন। আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট গার্ল।

ইন্দ্রজিৎ আর শব্দ করল না। ববি রায়ের পিছু পিছু এগোতে লাগল। গাঁজা, চণ্ডু, চরস, মদ কী নেই এখানে? নেশার জগৎ যেন কোল পেতে বসে আছে।

ববি রায় নৃত্যপর নর-নারীর ভিতর দিয়ে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সোজ কথায়, তাঁকেও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে নেচে নিতে হচ্ছিল। ইন্দ্রজিৎ অতটা পেরে উঠছিল না। তার আর ববি রায়ের মাঝখানে দোল-খাওয়া স্কুল-খাওয়া নানা শরীর এসে পড়ছে। কখনও মেয়ে, কখনও পুরুষ, কখনও জোড়া।

হাঁফাতে হাঁফাতে ইন্দ্রজিৎ বলল, স্যার, আমি যে আপনার মতো নাচতে জানি না, এগোব কী

করে?

ববি রায় তার দিকে দৃকপাত না করে বললেন, সামটাইম উই ডোন্ট ড্যান্স ইন্দ্রজিৎ, বাট উই আর মেড টু ড্যান্স। তোমাকে নাচতে হবে না, ধাক্কা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলে এসো। দে ওন্ট মাইন্ড।

নাচের ফ্লোরটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন ববি। আর সঙ্গে সঙ্গেই একজন বিশাল চেহারার যুবক তড়িৎগতিতে এসে তার একটা হাত ধরে ফেলল শক্ত পাঞ্জায়, ওয়েট এ মোমেন্ট প্লিজ, আর ইউ এ মেম্বার? দিস প্লেস ইজ ওপেন ফর পাবলিক ওনলি আপ টু সেভেন পি এম। আফটার সেভেন ইটস এর মেম্বারস ওনলি।

ববি রায় চিন্তিত মুখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে খুব ভদ্র গলায় বললেন, না, আমি মেম্বার নই। তবে আমার এক বন্ধু আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করেছিল। তার নাম চিকা।

দৈত্যাকার যুবকটি কি একটু ধন্দে পড়ে গেল? সামান্য একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে মাথা নেড়ে বলল, চিনি না। কে চিকা?

খুব সুন্দর একটি মেয়ে।

চিকা বলে কেউ এখানে নেই।

ববি রায় অত্যন্ত অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তার সঙ্গে যে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। রোম্যান্টিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

যুবকটি ববি রায়কে ক্রূর চোখে অপাঙ্গে দেখে জরিপ করে নিচ্ছিল। হঠাৎ বলল, এখানে তুমি ঢুকলে কী করে?

চিকা বলেছিল, ডোরম্যানকে ঘুষ দিলে ঢোকা যায়।

মাই গড, ইউ ব্রাইবড দা ডোরম্যান?

আই ডিড। ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

কোথায়?

এদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার একটা চোরা পথ আছে। ডোন্ট স্পয়েল দা শশা। গেট আউট অফ হিয়ার।

ইন্দ্রজিৎ পিছন থেকে একটু কাঁপা গলায় বলল, তাই চলুন, স্যার।

ববি রায় ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে খুব শীতল গলায় ইংরেজিতে বললেন, যাও, আমাদের ফোর্সকে সিগনাল দাও। তারা এবার ঢুকে পড়ুক।

এ কথায় যুবকটি যেন হঠাৎ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। ববির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বিবর্ণ মুখে বলল, তুমি পুলিশের লোক? কিন্তু… কিন্তু আমরা তো প্রাইভেট। পুলিশকে আমরা কখনও ফাকি দিই না…

ববি একটা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, যাও ইন্দ্রজিৎ, ডেকে আনো।

যুবকটি টপ করে এগিয়ে এসে ইন্দ্রজিতের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, জাস্ট এ মোমেন্ট। চিকাকে তোমাদের কী দরকার?

ববি রায় হিম-শীতল গলায় বললেন, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস, মিস্টার হাসলার। গিভ মি হার হোয়ার অ্যাবাউটস।

দেন হোট? উইল ইউ লিভ?

আই শ্যাল।

কাম উইথ মি।

যুবকটি ঘরের শেষ প্রান্তে একটি কাউন্টারের পিছনে একখানা কাচে ঢাকা ঘরে তাদের নিয়ে গেল। কাচের ঘর বলেই বাইরের শব্দ ভেতরে ঢোকে না।

যুবকটি দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ববির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বলল, তোমার আইডেনটিটি কার্ড দেখাও।

ববি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে তাকে সম্মোহিত করার অক্ষম একটা চেষ্টা করতে করতে পকেটে হাত দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। সে জানে, ববি রায়ের ডান পকেটে রিভলভার থাকে। সে আরও জানে, ববি রায় যখন-তখন যা-খুশি করে ফেলতে পারেন। লোকটার হার্ট বলে কিছু নেই।

কিন্তু চোখ খুলে ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে দেখল, ববি রায় একটা আইডেনটিটি কার্ড যুবকটির নাকের ডগায় খুলে ধরে আছেন। তারপর সেটাকে পকেটে পুরে বললেন, ড্রাগ জয়েন্ট বাস্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। চিকার বিরুদ্ধেও অভিযোগ কিছু নেই। সে আমাকে একটা ব্যাপারে একটুখানি সাহায্য করবে। ব্যস।

যুবকটি অবিশ্বাসের চোখে ববি রায়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর টেবিল থেকে একটা প্যাড নিয়ে দ্রুত হাতে একটা ঠিকানা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ববি রায়ের হাতে দিয়ে বলল, নাউ গেট আউট। প্লিজ।

ববি রায় নির্লজ্জের মতো যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আর ডোরম্যানকে যে ঘুষটা দিতে হয়েছে সেটার কী হবে?

যুবকটি দ্বিরুক্তি করল না, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকাটা দিয়ে দিল।

ববি রায় চলে আসতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। যুবকটি তখনও সন্দেহকুটিল চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। ববি রায় অমায়িকভাবেই বললেন, আমি জানি, তুমি চিকাকে এখন টেলিফোন করে সাবধান করে দেবে। আমি হয়তো এই ঠিকানায় গিয়ে ওকে পাব না। কিন্তু মনে রেখো, আই ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক। আই শ্যাল বি ব্যাক বিফোর লং।

এই হুমকিতে কতদূর কাজ হল কে জানে। তবে যুবকটি কোনও জবাব দিল না। যেমন চেয়ে ছিল তেমনই অপলক চেয়ে রইল। তার পাথুরে দৃষ্টিতে কোনও ভাবের প্রকাশ নেই। খুনিদের দৃষ্টিতে থাকেও না।

ট্যাক্সিওয়ালা ঘুমোচ্ছিল। ববি রায় তাকে মৃদু স্বরে ডেকে জাগালেন। মোটা টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সিওয়ালা যদৃচ্ছ যাওয়ার করে রাজি হয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, অব কাঁহা সাব?

বান্দ্রা।

ট্যাক্সি চলল। ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।

স্যার, আমিও কি আপনার মতো একটু ঘুমিয়ে নেব?

আমি ঘুমোচ্ছি না, ইন্দ্রজিৎ। সহজে আমার ঘুম আসে না।

আমার আসছে।

তুমি ঘুমোও।

ইন্দ্রজিৎ একটা হাই তুলে বলল, স্যার, আপনি কি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন না?

না। মনে রেখো, এখন আমার পালানোর পথ নেই। এয়ারপোর্টের রাস্তায় ওরা অ্যামবুশ করবে। হোটেলের ঘরে হানা দেবে। রাস্তায় আক্রমণ করবে। আমার এখন একটাই পথ খোলা। ওরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই ওদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

আপনি আমাকে বলছিলেন যে, এরা ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া গ্রুপ। এরা একা কাজ করে না। এদের অর্গানাইজেশন বিরাট। তা হলে আপনি একা কী করবেন, স্যার?

বোকা ছেলে! আমি যে কিছু করতে পারব তা তো বলিনি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে বলে করে যাচ্ছি। বাংলায় কী একটা কথা আছে না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

আছে স্যার। কিন্তু আপনার কি বাঁচবার কোনও আশাই নেই?

মনে তো হচ্ছে না। ইন্ডিয়ান মাফিয়ারা ততটা এফিসিয়েন্ট নয়। অর্গানাইজেশনও দুর্বল। তাই আমি এখনও বেঁচেবর্তে আছি। আর শুধু মারলেই তো হবে না। আমার কাছ থেকে একটা ইনফরমেশনও যে ওদের বের করে নিতে হবে।

তা হলে আপনার কোনও আশাই নেই দেখছি।

ঠিকই দেখছ।

তা হলে এইবেলা রিভলভারটা আমার কাছে দিয়ে দিন না! দরকার হলে আমিই চালিয়ে দেব গুলি।

তোমাদের বাংলায় আরও একটা কথা আছে ইন্দ্রজিৎ, বাঁদরের হাতে খন্তা।

আছে স্যার।

তোমার হাতে রিভলভারও যা, বাঁদরের হাতে খন্তাও তাই।

তা হলে একটু ঘুমোই স্যার! শরীরটা টি ঢিস করছে। একটা কথা স্যার, আপনি লোকটাকে একটা আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়েছিলেন। ওটা কিসের কার্ড?

ববি রায় প্রশ্নটার জবাব দিলেন না। ইন্দ্রজিৎ হতাশ হয়ে চোখ বুজল। ট্যাক্সি যখন বান্দ্রায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তখন দেড়টা বেজে গেছে। পাড়া নিঃঝুম।

মস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ববি আর ইন্দ্রজিৎ একটু স্তব্ধ হয়ে রইল।

এবার স্যার?

শাট আপ। এসো।

ববি রায় কাগজটা খুলে আবার দেখলেন। চিকন মেহেতা। লালওয়ানি অ্যাপার্টমেন্টস। সাততলা।

লিফটে উঠে ববি রায় বললেন, চিকা রেডি আছে, বুঝলে ইন্দ্রজিৎ?

থাকবেই তো স্যার। আপনার সঙ্গে অত ভাব-ভালবাসা।

ইয়ারকি কোরো না ইন্দ্রজিৎ। বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছ, এটা মনে রেখো। চিকাকে ওরা অ্যালার্ট করেছে। দারোয়ান যখন রাত দেড়টায় কাউকে ঢুকতে দেয় তখন বুঝতে হবে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। ঘুমটা ঝেড়ে ফেলে অ্যালার্ট হও।

লিফট সাততলা উঠে এল নিঃশব্দে। ববি রায় এবং ইন্দ্রজিৎ নেমে এল। করিডোর নানা দিকে চলে গেছে। ববি রায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিলেন।

বাঁদিকে করিডোরটা গিয়ে দুটো দিকে মোড় নিয়েছে। ডান দিকে চিকা ওরফে চিকনের ফ্ল্যাট।

বোম্বেতে এখন এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া কত স্যার?

আকাশপ্রমাণ।

তা হলে মহিলা বেশ মালদার বলতে হবে।

তা বটে।

ববি ডোরবেল-এ আঙুল রাখলেন।

দু'বার বাজাবার পর ভিতর থেকে ঘুম-জড়ানো মেয়েলি গলা শোনা গেল, হু ইজ ইট?

এ ফ্রেন্ড। ববি।

হু ইজ ববি?

এ কাস্টমার, ম্যাডাম। ওয়েলদি কাস্টমার।

শীট! আই শ্যাল কল দা পলিস।

ডোন্ট বদার। দিস ইজ পলিস। ওপেন আপ।

ভিতরটা একটা চুপ মেরে রইল।

তারপর চিকা বলল, কী চাও? আমি তো কিছু করিনি।

তা হলে ভয় কী? দরজা খোলো। আমার কয়েকটা কথা আছে। ওয়েট, লেট মি ড্রেস।

একটু বাদে দরজা খুলে যখন চিকা দেখা দিল তখন তার চোখে ভয়, বিস্ময়, ঘুম তিনটেরই চিহ্ন রয়েছে।

ববি চাপা স্বরে ইন্দ্রজিৎকে বললেন, বিশ্বাস কোরো না। বোম্বে দিল্লি এখন অভিনয়ে কলকাতার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এ মেয়েটি দারুণ অভিনেত্রী।

মেয়েটি দারুণ সুন্দরীও স্যার।

চিকা ববির দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, উই মেট ইন দা ইভনিং, ইজনট ইট?

রাইট। কাম ইন। হোয়াই ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড!

আমার এই বন্ধু একেবারেই জলঘট। ভয় নেই।

চিকার ফ্ল্যাট অসাধারণ সুন্দর। নরম একটা ঘোমটা পরানো আলোতেও দামি আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তা কোটিপতিদের ঘরে থাকে।

ববি রায় বসলেন। ইন্দ্রজিৎও।

তারপর ববি রায় বললেন, নাউ টক বিজনেস।

০৯. সোফায় একগুচ্ছ ফুল

চিকা সোফায় একগুচ্ছ ফুলের মতো এলিয়ে বসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হোয়াট বিজনেস?

ববি চিকার দিকে চেয়ে তাকেও সম্মোহিত করার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বললেন, ওরা কে?

কারা?

যারা আমাদের সি-বিচ থেকে ফলো করেছিল?

কারা ফলো করেছিল?

দু'জন লোক।

আমি জানি না, শুধু জানি, তুমি আমাকে ডিচ করে পালিয়ে গিয়েছিলে।

মিস চিকন মেহেতা, আমি জানি তোমাকে ওরা আমাকে ডাইভার্ট করার জন্য কাজে লাগিয়েছিল মাত্র। তুমি ওদের দলের কেউ নও।

চিকা তার রোবটা একটু ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আমাকে কেউ কাজে লাগায়নি। চিকা অত চিপ নয়।

টক সেন্স চিকা, আমি তোমাকে এখনই তুলে থানায় নিয়ে যেতে পারি।

পারো না, তুমি পুলিশের লোক নও।

ববি যে তর্কযুদ্ধে এঁটে উঠছেন না, এটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ ফিসফিস করে বলল, আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা বের করুন না স্যার, রিভলভারটাও।

চুপ করো বন্ধু।

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে গেল। কিন্তু সেটা ধমক খেয়ে নয়, চোখের কোনা দিয়ে সে একটা খুব শব্দহীন সঞ্চার টের পেল। দক্ষ ডিটেকটিভের মতোই চমকে না উঠে খুব ধীরে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, চিকার বেডরুমের দরজা খুলে গেল। অন্ধকার ঘর থেকে দুটো আবছায়া মূর্তি দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়াল।

স্যার।

আঃ ইন্দ্রজিৎ!

দয়া করে ঘাড়টা একটু ঘোরাবেন স্যার? বিপদ গভীর।

ববি তাকে আমল না-দিয়ে চিকার দিকে চেয়ে বললেন, কী করে বুঝলে যে আমি পুলিশ নই?

জবাবটা চিকা দিল না, কিন্তু জবাবটা এল ববি রায়ের পিছন থেকে। পরিষ্কার ইংরেজিতে।

আমরা জানি মিস্টার রায়।

দু’জন লোকের একজন খুব ধীর পায়ে বেরোনোর দরজার দিকে সরে গেল। অন্যজন চিকার পিছুনে গিয়ে দাঁড়াল। দু’জনেরই একটা করে হাত পকেটে।

ববি বিরক্তির চোখে পর্যায়ক্রমে দু’জনের দিকে তাকালেন। তারপর হতাশ গলায় বললেন, এবা তো তারা নয়, যারা আমাকে সি-বিচ থেকে ফলো করেছিল।

চিকার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা মৃদু হেসে বলল, তাদের পক্ষে হসপিটালের বিছানা ছেড়ে এখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না মিস্টার রায়। দু’জনেরই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর।

ববি রায় বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, ওরা নভিস, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা নও।

না, মিস্টার রায়, আমরা সম্পূর্ণ পেশাদার। উই নো আওয়ার বিজনেস।

ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে খুব আয়েস করে বসলেন। বললেন, দেন টক বিজনেস।

চিকা উঠল। খুব লীলায়িত ভঙ্গিতে শরীরের সমস্ত উঁচুনিচু জায়গাগুলিকে খেলিয়ে আড়ামোড়া ভাঙল। একটা মিষ্টি হাই তুলে বলল, কারও ড্রিংকস চাই?

কেউ জবাব দিল না।

শুধু ইন্দ্রজিৎ চাপা গলায় বলল, স্যার মাগনা একটু ব্র্যান্ডি মেরে নেব? শুনেছি ব্র্যান্ডি খুব বলকারক। নার্ভাসনেসও কেটে যায় ব্র্যান্ডিতে।

না ইন্দ্রজিৎ, তোমাকে খুব নরমাল থাকতে হবে।

তা হলে একটা সিগারেট ধরাই?

ওরা ধরাতে দেবে না। পকেটে হাত দিলেই গুলি চালাবে। ও বাবা! তা হলে দরকার কী? স্মোকিং আমি চিরতরেই ছেড়ে দিচ্ছি স্যার।

ববি লোকটার দিকে চেয়ে ছিল। চিকা ববির দিকে অর্থপূর্ণ একটু হাসি আর কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে যেন ভেসে ভেসে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

চিকার পরিত্যক্ত জায়গায় লোকটা বসল। তারপর বলল, দু'খানা হাত এমনভাবে রাখো যাতে সবসময় দেখা যায়। হঠাৎ কোনও মুভমেন্ট কোরো না। বি ভেরি কেয়ারফুল, উই আর নার্ভাস পিপল।

ববি শান্ত স্বরে বললেন, জানি, আই নো এভরিথিং অফ দিস ট্রেড। নাউ টক বিজনেস, তোমার নাম কী?

কল মি বস।

ববি হঠাৎ ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, শোনো ইন্দ্রজিৎ, যতদূর মনে হচ্ছে এরা বাংলা জানে না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার। তাই বলে রাখছি, যা-ই ঘটুক না কেন তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে।

পালাব? সেই কপাল করে এসেছি স্যার? দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে খোলা রিভলভার।

জানি ইন্দ্রজিৎ। একটা সময় আসবে যখন দু'জনকেই আমি আমার দিকে ডাইভার্ট করতে পারব। যদি পারি তা হলে তুমি খুব সামান্য সময় পাবে পালানোর, কয়েক সেকেন্ড মাত্র। পালিয়ে কোনও হোটেলে গিয়ে উঠবে। তারপর মিসেস ভট্টাচারিয়াকে ফোন করবে।

মিসেস নয় স্যার, মিস।

একই কথা। যেটা ভাইটালি ইম্পর্ট্যান্ট তা হল মেসেজটাকে কিল করা।

কিন্তু কোডটা স্যার?

আমার নাম। নামটাই কোড। আর একটা কথা। পালাতে পারলে কাল সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যেয়ো। লুক আফটার মিসেস ভট্টাচারিয়া। শি ইজ ইন ডেনজার।

বস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার চমৎকার সাহেবি উচ্চারণের ইংরেজিতে বলল, নিজেদের মধ্যে কথা বলে লাভ নেই, সময় নষ্ট হচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ লোকটাকে খুব ভাল করে জরিপ করে নিয়ে মাথা নেড়ে বাংলায় বলল, আপনি পারবেন না স্যার, লোকটার চেহারা দেখেছেন? হাইট ছ'ফুট এক ইঞ্চি তো হবেই। কাঁধ দু'খানা ওয়েট-লিফটারের মতো, হাত দু'খানা বক্সারের, পেটে কোনও চর্বি নেই।

তার চেয়েও খারাপ ওর চোখ দুখানা, ইন্দ্রজিৎ। চোখের দিকে তাকাও, পাক্কা খুনির চোখ।

দু'জনেরই স্যার। দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকেও একবার দেখুন।

দু'জনকেই দেখা হয়ে গেছে। চুপ করো।

বস ভ্রু কুঁচকে পর্যায়ক্রমে দু’জনকে দেখে নিচ্ছিল। তারপর ববির দিকে চেয়ে বলল, প্রথমে তুমি ওঠো, দেওয়ালের কাছে চলে যাও, দু’হাত উপরে তুলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

ববি বাধ্য ছেলের মতো উঠলেন এবং নির্দেশমতো দাঁড়ালেন।

বস তার স্যাঙাতের দিকে চেয়ে বলল, ফ্রিস্ক হিম।

দ্বিতীয় লোকটা অত্যন্ত দক্ষ ও অভ্যস্ত হাতে ববির পকেট-টকেট হাতড়ে দেখল, তেমন কিছু নেই।

তোমার লিলিপুট পিস্তলটা কোথায়?

হোটেলে ফেলে এসেছি।

বস একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। বোসো। ওই দ্বিতীয় লোকটি কে?

আমার সঙ্গী।

বস এবার ইন্দ্রজিৎকেও অনুরূপ নির্দেশ দিল। তার কাছে অবশ্য একটা পকেট-নাইফ পাওয়া গেল। একটা রবার হোস-এর টুকরোও, দ্বিতীয়টা মানুষকে ছোটখাটো আঘাত করার পক্ষে চমৎকার। মাথায় মারলে যে-কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখবে।

বস ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল, এবার কাজের কথা মিস্টার রায়। আমরা কোডটা চাই।

কিসের কোড?

বস হাসল, তুমি শান্তি চাও, না যুদ্ধ চাও?

স্বাধীনতা চাই। আমাদের ছেড়ে দাও।

কথায় কথা বাড়ে। তুমিও অ্যামেচার নও মিস্টার রায়। তোমার অতীত নিয়ে আমরা অনেক রিসার্চ করেছি। ইলেকট্রনিকসে তুমি বিশ্বের পয়লা দশজনের মধ্যে একজন। তুমি যে-কোনও রাডারকে ইলেকট্রনিক তন্তুজাল দিয়ে আচ্ছন্ন

আর অকেজো করে দিতে পারো, তুমি যে-কোনও সুপার কমপিউটারের মাইক্রোচিপ বানাবার ক্ষমতা রাখো, তার চেয়েও বড় কথা, তুমি যে ক্রাইটন যন্ত্র বানানোর ক্ষমতা রাখো তা হাজার মাইলের মধ্যে যে-কোনও পরমাণু বোমাকে তার নিজের বেস-এই বিস্ফোরিত করতে পারে। তুমি অতিশয় বিপজ্জনক লোক মিস্টার রায়।

ববি রায় একবার ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি একটি বেসরকারি মাল্টিন্যাশনালের সামান্য কর্মচারী মাত্র। ইলেকট্রনিকসে আমার কিছু হাতযশ আছে ঠিকই, কিন্তু তুমি যা জেনেছ তা হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি। একসময়ে আমি ইলেকট্রনিকস নিয়ে অনেক খেলা খেলেছি বটে, কিন্তু এখন কেবলমাত্র চাকরি করি। চাকরির বাইরে কিছু নয়।

চাকরিটা তোমার ক্যামোফ্লেজ মিস্টার রায়। আমরা সব জানি।

তোমরা আসলে কারা?

আমরা চটে গেলে তোমার শত্রু, খুশি থাকলে তোমার বন্ধু। যুদ্ধ চাও, না শান্তি চাও?

তোমরা কি ভারতীয় মাফিয়া?

বলতে পারো।

তোমাদের বস কে?

জেনে লাভ কী? আমাদের বস অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি তার টিকিরও নাগাল পাবে না। তুমি কি আজেবাজে কথা বলে সময় কাটাতে চাইছ? লাভ নেই। আমরা তোমাদের দুজনকে অজ্ঞান করে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। আমাদের ডেরা খুব ভাল জায়গায় নয় মিস্টার রায়। সেখানে একটা টরচারিং চেম্বারও আছে।

থাকাই স্বাভাবিক। কোডটা বললে কি আমরা মুক্তি পাব?

আমরা অত বোকা নই। কোডটা বলার পর আমরা কলকাতায় আমাদের এজেন্টকে জানাব। সে কোডটা ফিড করবে এবং কমপিউটারের মেসেজ নিয়ে

ভেরিফাই করবে। এ কাজে সময় লাগে মিস্টার রায়। ততদিন তুমি আর তোমার বন্ধু আমাদের মহামান্য অতিথি।

এই ফ্ল্যাটেই কি আমরা থাকব?

না, তোমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

ভাল ব্যবস্থা কি? বাথরুম পরিষ্কার? ঘরে কার্পেট এবং টিভি আছে তো? রাঁধুনি কেমন? আমার এই বন্ধু খুব পেটুক।

লোকটা হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, তুমি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছ মিস্টার রায়। আমরা তোমাকে আর সময় দিতে পারব না।

ববি রায় চাপা স্বরে বললেন, ইন্দ্রজিৎ তৈরি হও।

বস উঠে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ববি রায় বসা অবস্থা থেকে হঠাৎ মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন। সোফা ও সেন্টার টেবিলের মাঝখানকার সংকীর্ণ পরিসরে।

ইন্দ্রজিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কারণ জীবনে আর কখনও কোনও লোককে সে ডাঙায় সাঁতার কাটতে দেখেনি। আর কী নিখুঁত স্ট্রোক আর গতি! ববি রায় যে ডাঙায় এমন অসাধারণ সাঁতার দিতে পারেন কে জানত? কার্পেটের ওপর পড়েই তিনি চোখের পলকে মেঝের অনেকটা পেরিয়ে গিয়ে বসের গোড়ালিতে কী একটা কারুকাজ করলেন। বস চেঁচিয়ে উঠে এক পায়ে লাফাতে লাগল।

দরজার পাহারাদার নাঙ্গা পিস্তল হাতে ছুটে আসতেই উত্তেজিত ইন্দ্রজিৎ এক লাফে দরজায়।

পালাতে সে সত্যিই ওস্তাদ। দরজাটা খুলে বেরিয়ে যেতে তার কি এক ন্যানো সেকেন্ডও লেগেছে? আলোর গতিবেগকেও কি হার মানায়নি?

ববি রায় যদি ডাঙায় সাঁতার কাটতে পারেন তো ইন্দ্রজিৎও পারে সিঁড়িতে স্কি করতে। বাস্তবিকই সাততলা উঁচু থেকে অতগুলো সিঁড়ি সে একজন সুদক্ষ স্কিবাজের মতোই পেরিয়ে এল।

একতলায় নেমে সে বোকার মতো তাড়াহুড়ো করল না। এসব বাড়িতে দারোয়ানরা সারা রাত চৌকি দেয়। সুতরাং সে খুব শান্তভাবে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

সে জানে, ববি এতক্ষণে খুন হয়ে গেছেন। তবে খুন হওয়ার আগে খুনিদের বিস্তর নাকাল করেছেন নিশ্চিত। বহুত ঝামেলাবাজ লোক।

কিন্তু ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে হল, ববি যদি কোডটা ওদের না বলে থাকেন তা হলে হয়তো এখুনি খুন হবেন না। পরে হবেন।

যাই হোক, আপাতত খুনিরা ইন্দ্রজিতের পিছু নেয়নি, দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেবে।

ইন্দ্রজিৎ একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল, একটা হোটেলে পৌঁছে যেতে তার বিশেষ সময় লাগল না। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে গেল কলকাতার লাইন। লীনার ঘরে টেলিফোন বাজার নির্ভুল শব্দ হচ্ছে।

তিনবার বাজতেই ওপাশ থেকে মেয়েলি গলা বলে উঠল, হ্যালো!

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ, কে বলছেন?

আমি ববি রায়ের এক বন্ধু।

বন্ধু! কী ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার ভাল নয় মিস ভট্টাচার্য।

ওঁর কি কিছু হয়েছে?

উনি গভীর বিপদে পড়েছেন।

মারা গেছেন কি?

দৃশ্যটা আমি চোখে দেখে আসিনি। তবে বিশেষ বাকিও নেই। উনি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন। কোডটা হল ববি রায়। মেসেজটা এক্ষুনি কি করা দরকার। পারবেন?

আপনার নামটি কী বলুন তো?

আমার নাম? আসল নাম, না ছদ্মনাম জানতে চান? আসল নামটা এখন বলা যাবে না মিস ভট্টাচার্য। তবে ছদ্মনামটা হল— দাঁড়ান, একটু ভেবে বলি— আমার ছদ্মনামটা হল মহেন্দ্র সিং।

আপনারা দুজনেই কি জোকার? গলাটা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?

টেলিফোনে তো সকলের গলাই একরকম লাগে।

মোটেই নয়। যাক গে, ববি রায়ের সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হবে?

ভগবান জানেন।

কারা ওঁকে মারার চেষ্টা করছে?

জানি না, তবে আপনিও সাবধান থাকবেন। আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন মিস ভট্টাচার্য। ববি রায় অত্যন্ত খারাপ লোক, জেনেশুনে একজন মহিলাকে এরকম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কাপুরুষের কাজ।

দেখা হলে ববি রায়কেও কথাটা বলবেন। হি ইজ এ কাওয়ার্ড।

বলব ম্যাডাম। কিন্তু কোডটার কী হবে? মেসেজটা যে কিল করা দরকার।

ববি রায়কে এ কথাও বলবেন যে আফটার এ লং ওয়াইল্ড গুজ চেজ কোডটা আমিই ভেবে বার করি। ওই মেগালোম্যানিয়াকটা যে নিজের নামটাকেই কোড় হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল।

আপনি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী!

ওকে এ কথাটাও বলে দেবেন যে মেসেজটা আজ বিকেলেই আমি কি করে দিয়েছি।

থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এর জন্য ববি রায় নরকে বসেও আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

ওর আশীর্বাদে আমার দরকার নেই। লেট হিম গো টু হেল।

হি ইজ গোয়িং ম্যাডাম। এতক্ষণে....

লীনা সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

আজ তার ঘুম আসেনি। চোখের পাতা সে এক করতে পারছে না বিছানায় শোওয়ার পর থেকেই।

মাঝরাতের এই ভুতুড়ে টেলিফোনে ঘুমের সামান্য রেশটাও কেটে গেল।

উঠে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, ঠান্ডা বাতাসের হিলিবিলি অনুভব করল শরীরে। অনেকক্ষণ। ববি রায় কি তা হলে মারাই গেছেন? সত্যি?

কেউ মরলে তার কি দুঃখ পাওয়া উচিত নয়? যাই হোক, লোকটা তার কোনও ক্ষতি তো করেনি। একটু-আধটু অপমান করেছে মাত্র। তার জন্য কি লোকটার মৃত্যুতে নির্বিকার থাকা সম্ভব?

কম্পিউটারের রহস্যময় মেসেজটির কথা ভাবছিল লীনা, কোথায় সেই বোম্বে রোড, কোথায় কোন ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরের নীল মঞ্জিল? কার দায় পড়েছে সেখানে যাওয়ার?

লীনা দেখছিল রাস্তায় কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। রোজই থাকে। গ্যারাজের অভাবে কত লোক রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখে।

কিন্তু হঠাৎ লীনার মনে হল, একটা গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে একটা সিগারেটের আগুন ধিইয়ে উঠল।

লীনার শরীর শিউরে উঠল হঠাৎ।

১০. শেষ রাতে লীনার ঘুম হল

শেষ রাতে লীনার ঘুম হল বটে, কিন্তু সেই ঘুম দুঃস্বপ্নে ভরা, যন্ত্রণায় আকীর্ণ। বহুবার চটকা ভেঙে চমকে জেগে গেল সে। আবার অস্বস্তিকর তন্দ্রা এল! শেষ অবধি পাঁচটার সময় বিছানা ছাড়ল সে। কিছুক্ষণ আসন আর খালি হাতের ব্যায়াম করল। কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করল শাওয়ারের নীচে সঁড়িয়ে।

তবু চনমনে হল না সে। মনটা কেন যেন ভীষণ ভার। আজ নড়তে চড়তে ইচ্ছে করছে না।

খুব কড়া কালো কফি খেল সে দু'কাপ। গরমে জিব পুড়ে গেল, কিন্তু কফির কোনও শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারল না সে।

একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ে চটি গলিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফটকের কাছে এল। কাল রাতে যে-গাড়িটাকে দেখা গিয়েছিল সেটা যে কোনটা, তা দিনের আলোয় চিনতে পারল না, ছোট গাড়ি, সম্ভবত ফিয়াট। এর বেশি আর কিছুই আন্দাজ করা যায়নি বারান্দা থেকে।

অবশ্য লীনার মনে হল, সে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। মধ্যরাতে কত লোক কত কাজে বেরোয়। সেরকম কিছুই হবে। মহেন্দ্র সিং নামক জোকারটি অবশ্য তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। সেরকম সতর্কবাণী কি ববি রায় কিছু কম উচ্চারণ করেছে?

ববি রায়। এই চারটি অক্ষর ভাবতে আজ ভারী কষ্ট হল লীনার। যেসব পুরুষেরা মেয়েদের দাবিয়ে চলে, যাদের পৌরুষের অহংকার হিমালয়-প্রমাণ, যারা অতিশয় একদেশদর্শী সেইসব পুরুষ শৌভেনিস্টদেরই একজন হলেন ববি রায়। তবু লোকটাকে যদি সত্যিই কেউ খুন করে থাকে তবে আরও অনেক রাত্রি ধরেই লীনা ঘুমোতে পারবে না। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবে।

বাড়িতে থাকতে ভাল লাগছিল না লীনার। আজ সে সময় হওয়ার অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে বলে তৈরি হয়ে নিল।

আজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে বহুকাল বাদে তার মা বলল, লীনা ডিয়ার, তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে কেন? বেশি ডায়েটিং করছ নাকি?

এ কথা শুনে লীনা ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করল। যা হোক, তার মা তা হলে তাকে লক্ষ করেছে। তবে খুশি হল না লীনা, বলল, থ্যাংক ইউ ফর টেলিং।

তাদের বাড়িতে বাঁধানো বঙ্কিম, বাঁধানো রবীন্দ্রনাথ, বাঁধানো শরৎচন্দ্র আছে, তবু তাদের পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই। এ বাড়িতে কারও অসুখ হলে সেবা করতে নার্স আসে বা নার্সিং হোম-এ যেতে হয়। কারও কোনও ব্যক্তিগত সমসা বা সংকট দেখা দিলে তা শুনবার মতো সময় কারও নেই। সবাই এত স্বাধীন ও সম্পর্কহীন যে লীনার মনে হয় সে মরে গেলে এ বাড়ির কেউ কাদবে কি না।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়ার আগে লীনা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ববি রায়। চারটি অক্ষর আবার মনে বিষাদ এনে দিল আজ।

গাড়িটার জটিল প্যানেলের দিকে আনমনে চেয়ে রইল লীনা, বোধহয় বোয়িং ৭৬৭-এর প্যানেলও এরকমই। এত যন্ত্রপাতি, এত বেশি গ্যাজেটস একটা মোটরগাড়িতে যে কী দরকার!

গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা কোনওদিন খোলেনি লীনা। কী আছে ওটার মধ্যে?

লীনা অলস হাতে খোলার চেষ্টা করল। খুলল না, ওপরে একটা লাল বোম রয়েছে। সেটায় চাপ দিল লীনা, তবু খুলল না।

চিন্তিতভাবে একটু চেয়ে রইল সে। এই বুদ্ধিমান গাড়িটার সঙ্গে তার একটা সখ্য গড়ে উঠেছে ঠিকই। যদিও গাড়িটা পুরুষের গলায় কথা বলে, তবু প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জকে মহিলা ভাবতেই ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে লীনাকে। এ গাড়িটা সুতরাং মেয়েই। এই সখীর সব রহস্য লীনা ভেদ করেনি বটে, কিন্তু আজ এই গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা তাকে টানল। ববি রায় কি একবার বলেছিলেন যে, ওর মধ্যে একটা রিভলভার বা পিস্তল আছে? ঠিক মনে পড়ল না।

একটু নিচু হয়ে প্যানেলের তলাটা দেখল লীনা। নানা রঙের নানারকম সুইচ। গোটা চারেক হাতলের মতো বস্তু। কোনটা টানলে বা টিপলে কোন বিপত্তি ঘটে কে জানে!

লীনা গ্লাভস কম্পার্টমেন্টের তলায় সুইচের মতো একটা জিনিস চেপে ধরল আঙুল দিয়ে। প্রথমটায় কিছুই ঘটল না, তারপর হঠাৎ শ্বাস ফেলার মতো একটা শব্দ হয়ে, আস্তে করে ঢাকনাটা খুলে গেল।

ছোট্ট একটা বাক্সের মতো ফোকর, ভিতরে মৃদু একটা আলো জ্বলছে। লীনা উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে একটা প্ল্যাস্টিকের ম্যাটের ওপর ঠান্ডা একটা সুন্দর পিস্তল শুয়ে আছে। পাশে একটা প্যাকেটগোছের জিনিস।

লীনা পিস্তল-বন্দুক ভালই চেনে। তার বাবার আছে, মায়ের আছে, দাদার আছে। এক সময়ে লীনা নিজেও শুটিং প্র্যাকটিস করেছে কিছুকাল। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা সে বের করে আনল।

বেশ ভারী, ৩২ বোরের পিস্তল। ক্রিপের ভিতর দিয়ে গুলির ক্লিপ লোড করতে হয়। দুটো অতিরিক্ত ক্লিপও রয়েছে ভিতরে। প্যাকেটের মধ্যে লীনা সে-দুটোও বের করে এনে দেখল। আর দেখতে গিয়ে পেয়ে গেল একটা চিরকুট। একটা প্যাকেটের মধ্যে সযত্নে ভাজ করে রাখা।

চিরকুটটা সামান্য কাঁপা-হাতে খুলল লীনা। ববি রায়ের হাতের লেখা অতিশয় জঘন্য। পাঠোদ্ধার করাই মুশকিল। ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন সাধারণত এইরকম অবোধ্যভাবে লেখা হয়ে থাকে, যা কম্পাউন্ডার ছাড়া আর কেউ বোঝে না!

লীনা অতিকষ্টে প্রথম বাক্যটা পড়ল, এবং তার গা রি-রি করে উঠল রাগে। লেখা: মিসেস ভট্টাচারিয়া, ইফ ইউ আর নট অ্যান ইডিয়ট অ্যাজ আই হ্যাভ অ্যান্টিসিপেটেড দেন ইউ উইল ফাইন্ড দিস নোট উইদাউট মাচ ট্রাবল।

রাগের চোটে চিরকুটটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল লীনা, তারপর মনে পড়ল, ববি বোধহয় বেঁচে নেই। যদি লোকটা মরেই গিয়ে থাকে তবে খামোখা রাগ করার মানে হয় না।

লীনা চিরকুটটা তার ব্যাগে পুরল। পিস্তল এবং গুলির ক্যাপ আবার যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

অফিসে পৌঁছে লীনা আগে সমস্ত মেসেজগুলো চেক করল। কয়েকটা চিঠিপত্র ফাইল করল। কিছুক্ষণ টাইপ করতে হল। কয়েকটা ফোনের জবাব দিয়ে দিল, তারপর ববির ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দিল সে।

চিরকুটটা বের করে আলোর নীচে ধরল সে। অনেকক্ষণ সময় লাগল বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে চিরকুটটার পাঠোদ্ধার করতে পারল। ইংরিজিতে প্রথম বাক্যটার পবে লেখা; আপনি যদি কোডটা পেয়ে থাকেন তবে নীল মঞ্জিলের কথা জেনে গেছেন। যদি না পেয়ে থাকেন তবে ধরে নিতে হবে আমার বরাত খারাপ। আর, আমার বরাত যদি ততদূর ভাল হয়েই থাকে, অর্থাৎ আপনি যদি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কোডটা আবিষ্কার করে ফেলে থাকেন তবে বাকি কাজটাও দয়া করে করবেন। মনে রাখবেন, অপারেশন নীল মঞ্জিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরও মনে রাখবেন, মোটেই ইয়ারকি করছি না, আমার মৃত্যুর পর আপনার বিপদ বেড়ে যাবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার ওপরেই ওদের নজর থাকবে বেশি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর... ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। আপনার মস্তিষ্ক যথেষ্ট উন্নতমানের নয়, জানি, তবু নীল মঞ্জিলের জন্য আপনাকে বেছে নেওয়া ছাড়া আমার বিকল্প ছিল না। আপনি নির্বোধ বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে যদি আবার ভিতুও হয়ে থাকেন, তবে ববি রায়ের আর কী করার থাকতে পারে? এই নোটটা অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলবেন।

লীনা চিরকুটটা পোড়াল বটে, কিন্তু তার আগে রাগে আক্রোশে সেটাকে ছিঁড়ে কুচিকুচি করল। মস্ত ছাইদানের ভিতর সেগুলোকে রেখে একজন বেয়ারার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে এনে তাতে আগুন দিল। আর বিড়বিড় করে বলল, গো টু হেল! গো টু হেল! আই হেট ইউ! আই হেট ইউ!

কিন্তু রাগ জিনিসটা বহুক্ষণ পুষে রাখা যায় না। তা একসময়ে প্রশমিত হয় এবং অবসাদ আসে।

নিজের চৌখুপি ঘরটায় চুপচাপ বসে থেকে লীনা রাতের অনিদ্রা আর রাগের পরবর্তী অবসাদে ঝুম হয়ে বসে রইল। নীল মঞ্জিলের জন্য ওই হামবাগটা তাকে বেছে নিয়েছে! ইস, কী আম্বা! উনি বললেই লীনাকে সব কিছু করতে হবে নাকি? লীনা কি ওঁর ক্রীতদাসী? সে দশটা-পাঁচটা চাকরি করে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

রোজকার মতোই দোলন এল বিকেল পাঁচটায়, লীনা নেমে এল নীচে। দু'জনে গাড়িতে চেপে বসল।

লীনা, আজও তুমি ভীষণ গম্ভীর।

গম্ভীর থাকার কারণ ঘটেছে, দোলন।

ঘটেছে নয়, ঘটে আছে। তোমার গাম্ভীর্যটা প্রায় পার্মানেন্ট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজকাল তোমার কাছে আসতে ভয় করে।

তাই বুঝি! ঠিক আছে, চাকরিটা আগে ছেড়ে দিই তখন দেখবে আমি কেমন হাসিখুশি।

চাকরির জনাই কি তুমি গম্ভীর? এই যে শুনলাম, তোমার রগচটা বস এখন কলকাতায় নেই!

নেই, কিন্তু না থেকেও আছে। ইন ফ্যাক্ট আমার বস হয়তো এখন ইহলোকেই নেই।

দোলন একটু চমকে উঠে বলল, বলো কী?

খবরটা এখনও অথেনটিক নয়।

উড়ো খবর। তাহলে কী হবে লীনা?

কী করে বলব?

তোমার চাকরিও কি যাবে?

তা কেন? আমি কি ববি রায়ের চাকরি করি? আমি কোম্পানির এমপ্লয়ি। পুরনো বসের জায়গায় নতুন একজন আসবে।

তাহলে তুমি গম্ভীর কেন? ববি রায় তো তোমাকে খুব অপমান করতেন শুনি, সে বিদেয় হয়ে থাকলে তো ভালই।

চুপ করো তো বুদ্ধ! গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলতে নেই।

তা বটে।

লীনার চোখ জ্বালা করছিল। বুকটা এখনও ভার।

নকল দাড়িগোঁফ যে এত খারাপ জিনিস তা জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের। আঠা যত শুকোচ্ছে তত টেনে ধরছে মুখের চামড়া। চুলকোচ্ছেও ভীষণ। তা ছাড়া এইসব দাড়িগোঁফের মেটিরিয়ালও নিশ্চয়ই ভাল নয়। বিশ্রী বোটকা গন্ধ আসছে। দুর্গাচরণ বলছিল, এইসব দাড়িগোঁফ সংগ্রহ করা হয় মৃতদের দাড়িগোঁফ থেকে। দুর্গাচরণটা মহা ফক্কড়।

গোঁফের একটা চুল নাকে বারবার ঢুকে যাচ্ছে। কয়েকবার হ্যাঁচ্ছো হয়েছে ইন্দ্রজিতের। পাগড়িটা মাথায় এঁটে দিয়ে দুর্গাচরণ বলেছিল, শোন বুদ্ধু, কোনও শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়িতে উঠবি না। তোর ছদ্মবেশটা শিখদের মতো হলেও তুই তো আর ওদের ভাষা জানিস না, বিপদে পড়ে যাবি।

খুবই সময়োচিত উপদেশ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কপাল খারাপ হলে আর কী করা যাবে। গোটা পাঁচেক ট্যাক্সি ট্রাই করার পর যেটা তার নির্দেশ মতো যদৃচ্ছ যেতে রাজি হল সেই ড্রাইভারটা শিখ। বেশ বুড়ো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি। সাদা পাগড়ি, চোখে চশমা।

পাঞ্জাবি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

ইন্দ্রজিৎ ইংরেজিতে বলল, লং টুর। মেনি প্লেসেস।

ড্রাইভার কথাটা ভাল বুঝল না। শুধু বলল, অংরেজি?

এরপর আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেনি বুড়ো। তবে সারাক্ষণ রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে সন্দেহাকুল চোখে তার দিকে নজর রাখছিল।

লীনার অফিসের সামনে বেলা সাড়ে চারটে থেকে ট্যাক্সি দাড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। সেই ফাঁকে বুড়ো স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিল খানিক। বাঁচোয়া।

ইন্দ্রজিৎ একবার ভাবল, ববি যদি মরেই গিয়ে থাকেন তাহলে আর এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার কী? তারপর ভাবল ববি রায় তাকে এই কাজের

জন্য কঁড়িখানেক টাকা দিয়েছেন। গত ছ' মাস ধরে ওই লোকটার দৌলতেই সে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। মরে গিয়ে থাকলেও লোকটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবাটা তার উচিত হবে না।

পাঁচটার পর লীনা গাড়ি নিয়ে বেরোতেই ইন্দ্রজিৎ বুড়োকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, ফলো দ্যাট কার।

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, কেন?

আঃ ডোন্ট টক।

বুড়ো বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই গাড়ি ছাড়ল। আপনমনেই বকবক করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ যতটুকু বুঝল, বুড়ো বলছে, অন্য ছোকরার সঙ্গে ছোকরির মহব্বত আছে তো তোমার কী বাপু? দুনিয়াতে কি ছোকরির অভাব? আর ও গাড়িওয়ালি ছোকরি তোমাকে পাত্তা দেবেই বা কেন?

ইন্দ্রজিতের কান লাল হয়ে গেল।

কলকাতা শহরে কোনও গাড়ির পিছু নেওয়া যে কী ঝামেলার কাজ, তা আর বলার নয়। জ্যামে গাড়ি আটকাচ্ছে, ঠেলাগাড়ি, রিকশা উজবুক মানুষ এসে ক্ষণে ক্ষণে গতি ব্যাহত করছে। বুড়োটা তেমন গা করছে না। সব মিলিয়ে একটা কেলো। তদুপরি লীনার গাড়িটা অতিশয় মসৃণ দ্রুতগতির গাড়ি।

তবু শেষ পর্যন্ত লেগে রইল ইন্দ্রজিৎ।

ওরা গঙ্গার ঘাটে নেমে ঘাসের ওপর বসল। ইন্দ্রজিতের ইচ্ছে ছিল, ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার মধ্যে বসে থেকে ওদের ওপর নজর রাখা।

কিন্তু বুড়োটা এ রকম অনিশ্চয় সওয়ারিরি হাতে আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। রীতিমতো খিচিয়ে উঠে বলল, ভাড়া মিটিয়ে দাও, তারপর মোকরির পিছা করো। আমি বাহাত্তুরে বুড়ো এইসব চ্যাংড়ামিব মধ্যে নেই।

অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে ইন্দ্রজিৎ গাড়লের মতো নেমে পড়ল।

ববি রায় তার ওপর লীনার রক্ষণাবেক্ষণের ভারই শুধু দেননি, এমন কথাও বলেছেন যে, সে ইচ্ছে করলে লীনার সঙ্গে প্রেম করতে পারে।

মেয়েটা দেখতে আগুন। কিন্তু বাধা হল, ওই ছোকরাটা। নিতান্তই অনুপযুক্ত সঙ্গী। কিন্তু মেয়েরা যখন একবার কাউকে পছন্দ করে বসে তখন তাদের গোঁ হয় সাংঘাতিক।

একটু দূরত্ব রেখে ইন্দ্রজিৎও ঘাসের ওপর বসল। তার পরনে স্যুট। বসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর ঠান্ডা পড়ায় ঘাসে একটু ভেজা ভাব। অন্ধকার নামছে। কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে। এই ওয়েদারে গঙ্গার ঘাটে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো উন্মত্তরা ছাড়া আর কে বসে থাকবে?

ইন্দ্রজিতের যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে আজ। ভোরবেলা প্লেন ধরতে সেই রাত থাকতে উঠতে হয়েছে। কলকাতায় পৌঁছতে যথেষ্ট বেলা হয়েছে, প্লেন লেট করায়। কুয়াশা ছিল বলে সময়মতো প্লেন নামতে পারেনি। ফলে, এখন ইন্দ্রজিতের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

লোকটাকে দেখেছ লীনা?

দেখেছি।

কী মতলব বলো তো!

বুঝতে পারছি না। তবে ওর দিকে তাকিয়ো না।

লোকটা কি বিপজ্জনক?

হতে পারে। তুমি বোসো। আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ লীনা?

গাড়ি থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসছি।

লীনা দ্রুত পায়ে গিয়ে গাড়িতে ঢুকল। তারপর গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে পিস্তলটা বের করে আনল। আঁচলে ঢাকা দিয়ে পিস্তলটা নিয়ে এসে দোলনের পাশে বসে পড়ে বলল, এবার তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

লোকটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, ও এখানে কী করছে।

তার মানে?

যাও না। ভয় নেই। আমার কাছে পিওল আছে।

পিস্তল!— বলে করে রইল দোলন।

ঠিক এই সময়ে একজন লম্বা ভদ্র চেহারার তরুণ কোথা থেকে এসে গেল। লীনার দিকে তাকিয়ে বলল, এনি ট্রাবল ম্যাডাম? আই অ্যাম হিয়ার টু হেলপ ইউ।

১১. পরাজয় স্বীকার

ববি রায় জানেন কখন, ঠিক কখন পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়। ইন্দ্রজিৎকে পালানোর সময় দেওয়ার জন্য যে ডাইভারশনের দরকার ছিল তার চেয়ে অনেকটাই বেশি হয়ে গেল। বস-এর গোড়ালিতে হাতের কানা দিয়ে যে ক্যারাটে চপ বসিয়েছিলেন ববি রায় তাতে যে লোকটার পায়ের হাড় ভেঙে যাবে তা কে জানত!

বস যখন জান্তব একটা চিৎকার করতে করতে সারা ঘর এক পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তার বুন্ধু অ্যাসিস্ট্যান্ট খুবই বশংবদ পায়ে এগিয়ে এল। হয়তো বা বস-এর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ববি রায়কে ছিঁড়ে ফেলবার সদিচ্ছা নিয়েই।

হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তা চালানো বারণ বলে লোকটা রিভলভারটা উলটে নিয়ে বাঁট দিয়ে মারল মাথায়। লাগলে ববি রায়ের খুলি চৌচির হত। কিন্তু ববি কার্পেটে শোয়া অবস্থাতেই লোকটার হাতে অনায়াসে লাথি চালিয়ে রিভলভারটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

ভারতীয় গুন্ডারা আজ অবধি সত্যিকারের পেশাদার হল না। শুধু মোটা দাগের কাজ ছাড়া তারা কিছুই জানে না। বস-এর এই সহকারীটি আড়েদিঘে ববির দেড়া, গায়ে যথেষ্ট পেশী এবং মোটা হাড়ের সমাবেশ। রীতিমতো ভীতি উৎপাদক চেহারা। ঘুসিটুসি নিশ্চয়ই ভাল চালায়।

ববি পর পর তার তিনটে ঘুসি কাটিয়ে দিলেন শুধুমাত্র মাথাটা এদিক সেদিক চটপট সরিয়ে। যে-কোনও শিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধাই জানে যে, প্রতিপক্ষের ঘুসি কাটাতে হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ সময়ে, চোখের পলকে। পর পর তিনটে ঘুসি হাওয়ায় ভেসে যাওয়ায় লোকটা এমন বেসামাল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল যে ববি তাকে উলটে মায়াভরে মাত্র একটি

ঘুসি মারলেন। লোকটা পাহাড় ভাঙার শব্দ করে, মেঝে কঁপিয়ে, চেয়ার টেবিল নিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। আর তখন বস নিজের গোড়ালি চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে অবিশ্বাসের চোখে ববিকে দেখছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে ববি রায় বুঝলেন, তিনি জয়ী। তবু নিজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, এটা যা ঘটল তা অনেকটা যাত্রা-থিয়েটারের মতো ব্যাপার। তার প্রতিপক্ষ ভালই জানে যে সাতঘাটের জল খাওয়া ববি রায়কে মাত্র দুটো গুন্ডা দিয়ে টিট করা যাবে না। সুতরাং রি-ইনফোর্সমেন্ট তারা রাখবেই। কিন্তু তারা কোথায় ওত পেতে আছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

ববি বস-এর দিকে চেয়ে ইংরিজিতে বললেন, এ খেলার একটা নিয়ম আছে, বস।

কী নিয়ম?

আমি তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে পারি না। তুমি সচেতন অবস্থায় থাকলে টেলিফোনে সাহায্য চাইতে পারো বা আমার পিছনে লোক লাগাতে পারো। এ খেলার নিয়ম হচ্ছে, হয় প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলো, না হয় তো অজ্ঞান করে দাও।

লোকটা অতিশয় কাতর মুখ করে বলল, আমার নড়বার সাধ্যই নেই। গোড়ালি ভেঙে গেছে।

ববি একটা রিভলভার তুলে নিলেন। বললেন, তবু নিয়ম। মাথার পিছনে ছোট্ট একটা চাটি। তারপর তুমি অনেকক্ষণ ঘুমোবে।

নাঃ! প্লিজ।

ববি মৃদু একটু হাসলেন। নিয়ম মানে না এ কেমন খেলোয়াড়?

মাথার খুলিতে মারা একটা আর্ট। অপটিমামের একটু বেশি হলেই কংকাশন। মারতে হয় ওজন কবে, খুব মেপে, খুব সাবধানে।

বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে দেখছিল। লক্ষ করছিল ববির সমস্ত নড়াচড়া। মৃদু স্বরে সে হঠাৎ বলল, লাভ নেই মিটার রায়। আমাকে মাবলেও আমাদের জাল কেটে বেরোনো অসম্ভব।

ববি অত্যন্ত সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন, আমি জানি। শুধু জানি না তোমরা কিসের কোড আমার কাছে চাও।

বস অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উঠে একটা সোফায় বসল। তারপর বলল, আমেরিকা থেকে তুমি একটা যন্ত্র চুরি করেছিলে।

ববি রায় অবাক হয়ে বললেন, কিসের যন্ত্র?

ক্রাইটন।

ববি মাথা নাড়লেন, খবরটা ভুল।

বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে নিরীক্ষণ করে বলল, খবরটা ভুল ঠিকই। তুমি যন্ত্রটা চুরি করোনি, কিন্তু তার নো-হাউ জেনে নিয়েছিলে।

ববি উদাস গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ক্রাইটনের মতো সফিস্টিকেটেড জিনিস তৈরি করতে কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে জানো? আর কতজন হাইলি-কোয়ালিফায়েড লোক?

বস মাথা নাড়ল, আমি বিজ্ঞানের লোক নই।

জানি। বিজ্ঞানের লোকেরা ওরকম বোকার মতো কথা বলে না।

কিন্তু তোমার কাছে আলট্রাসোনিক ক্রাইটন যে আছে তা আমরা ঠিকই জানি।

ভুল জানো। ভারতবর্ষে এমন কোনও কারখানা নেই যেখানে ক্রাইটন তৈরি করা যায়। আর শোনো বোকা, ক্রাইটনের বিশেষণ হিসেবে কখনও আলট্রাসোনিক কথাটা ব্যবহার করা যায় না।

বস গনগনে চোখে চেয়ে বলল, তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ?

মা, তোমার মতো গাড়লেরা কতটা বিজ্ঞান জানে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমার প্রভু বা প্রভুরা বোধকরি তোমার মতোই গাড়ল, যদি না তারা আমেরিকান বা ফরাসি হয়ে থাকে।

সেটা যা-ই হোক, আমরা শুধু জানঙে চাই, ক্রাইটনটা কোথায় আছে।

প্রথম কথা, ক্রাইটন নেই। দ্বিতীয় কথা, থাকলেও জেনে তোমাদের লাভ নেই। বাঁদরের কাছে টাইপরাইটার যা, তোমাদের কাছে ক্রাইটনও তাই।

শোনো বায়, তোমার সেক্রেটারি মিস ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরবন্দি। চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর নজব রাখা হচ্ছে। আমরা একদিন না একদিন তাকে ক্র্যাক করবই।

ববি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লাথিত গলায় বললেন, তাকে নজরবন্দি করে কী হবে? তোমরা কি ভালো ববি রায় সামান্য বেতনভুক তার এক কর্মচারীর কাছে ক্রাইটনের খবর দেবে? ববি রায় তার সেক্রেটারিদের তত বিশ্বাস করে না।

তবু আমরা তাকে ক্র্যাক করবই, যদি তোমাকে না পারি।

ববি এবার ঘড়ি দেখে বললেন, তোমাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আর নয়। এবার তোমাকে আমি ঘুম পাড়াব। তারপর আমার কয়েকটা কাজ আছে।

বস এই সময়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ববি খুব হিসেব-নিকেশ করে তার অপটিমাম শক্তিতে রিভলভারের বঁটটা বসিয়ে দিলেন বস-এর মাথায়। বস যথারীতি কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল মেঝেয়।

ববি দ্রুত পকেট সার্চ করলেন। কোনও কাগজপত্র নেই। তার স্যাঙাতের পকেটও পরিষ্কার। ববি গিয়ে চিকার ঘরের দরজা খুললেন।

ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে।

ববি ঘরটা ভাল করে দেখলেন। কোনও ইন্টিরিয়র ডেকরেটারকে দিয়ে সাজানো হয়েছে। ছবির মতো ঘর। ওয়ার্ডরোবটা খুলে ববি দেখলেন, ভিতরে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটা দামি ড্রেস হ্যাঙারে ঝুলছে। দরজার ওপরে একটা ডার্টবোর্ডে লক্ষ করলেন ববি, মাঝখানের বৃত্তে অন্তত পাচটি ডার্ট বিধে আছে। চিকা যে চমৎকার লক্ষ্যভেদী তাতে সন্দেহ নেই। একটা ওয়াইন ক্যাবিনেটে বিদেশি মদের এলাহি আয়োজন। এমনকী এক বোতল রয়্যাল স্যালুট অবধি রয়েছে।

ববি ওয়াইন ক্যাবিনেটের ঢাকনাটা বন্ধ করলেন। আর ঠিক সেই সময়েই বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল। ববি চোখ বুজে ফেললেন। একেবারে নগ্ন মেয়েমানুষ দেখতে তার অ্যালার্জি আছে।

চিকা গুনগুন করে গান গাইছিল। কী গান তা বুঝলেন না ববি। বোধহয় কোনও উষ্ণ বিদেশি পপ গান।

চিকা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখনও সে ঘরের অতিশয় মৃদু আলোয় ববি রায়কে লক্ষ করেনি। সুতরাং ববিকেই জানান দিতে হল।

মৃদু স্বরে ববি বললেন, পুট অন সামথিং মাই ডিয়ার।

চিকা আতঙ্কিত আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়াল। চোখে দুঃস্বপ্নের অবিশ্বাস। মুখ হাঁ।

ববি ফের ইংরেজিতে বললেন, যা তোক একটা কিছু পরো হে সুন্দরী। আমাদের মেলা কথা আছে। মেলা কাজ।

চিকা চোখের পলকে একটা রোব পরে নিল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এটা কী করে সম্ভব? তোমার তো এতক্ষণে–

ববি মৃদু হেসে বললেন, বলো। থামলে কেন?

বিস্ময়টা আস্তে আস্তে মুছে গেল চিকার চোখ থেকে। একটু মদির হাসল সে। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, সুপারম্যান।

ববি রায় দেখছিলেন, মেয়েটি কী দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। তার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল।

চিকা তার বিছানায় বসে অগোছালো চুল দু'হাতে পাট করতে করতে বলল, আমি জানতাম তুমি ওদের হারিয়ে দিলেও দিতে পারো।

ওরা কারা?

চিকা ঠোঁট উলটে বলল, রাফিয়ানস।

তোমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী?

চিকা তার রোবটা খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে ঈষৎ উন্মোচিত করে দিয়ে বলল, কিছু না। এইসব গুন্ডা বদমাশরা মাঝে মাঝে আমাদের কাজে লাগায় মাত্র।

তুমি ওদের চেনো?

চিকা তার বক্ষদেশ এবং পায়ের অনেকখানি অনাবৃত করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বলল, শুধু একজনকে। বস।

বস আসলে কে?

গ্যাং লিডার। বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল বস শাসন করে। তুমি যদি ওকে মেরে ফেলে থাকো তাহলে তোমার লাশ সমুদ্রে ভাসবে।

আমি অকারণে খুন করি না। ওরা আমার কাছে কী চায়?

আমি জানি না। ওরা একটা কোড-এর কথা বলছিল।

আর কিছু নয়?

চিকা মৃদু হাসল। তারপর বলল, সুপাবম্যান, চিকা কি একেবারেই ফ্যালনা? তোমার কি একটুও ইচ্ছে করছে না চিকার মধ্যে ডুবে যেতে? কিংবা তুমি হোমোসেকসুয়াল নও তো!

না চিকা। আমি হোমোসেকসুয়াল নই। কিন্তু যে লোকটিকে প্রাণের ভয়ে কাটা হয়ে থাকতে হচ্ছে তার কাছে সুন্দরী মেয়ের শরীর অগ্রাধিকার পায় না।

আজ রাতে আমার শরীরের অতিথি হয়ে দেখো, মৃত্যুভয় তুচ্ছ মনে হবে।

চিকা রোবটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খুলে ফেলল।

ববি চোখ বুজলেন। বললেন, ডোন্ট মেক মি হেট ইউ চিকা। আমি ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখতে পারি না।

চিকা রোবটা আবার গায়ে দিয়ে বলল, বুঝেছি। তুমি চাও পোশাকটা নিজের হাতে খুলতে।

ঠিক তাই।

তাহলে খোলো সুপারম্যান।

বলে চিকা এগিয়ে এল।

বাইরের ঘরে দরজাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং একটি দৈত্যাকার যুবক দরজা জুড়ে দাঁড়াল। চোখে প্রখর দৃষ্টি। মুখখানা লাল টকটকে।

চিকা!

চিকা চোখের পলকে ববি রায়ের কাছ থেকে তিন হাত ছিটকে সরে গেল।

মোট চারজন ঢুকল। একে একে।

নিঃশব্দে।

ববি রায় নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি জানেন, কোন সময়ে তার হার হয়েছে। পরাজয়। এই হচ্ছে পরাজয়।

তবু চারজন সশস্ত্র লোকও ববির যথার্থ প্রতিপক্ষ নয়। ইতিপূর্বে সংখ্যাধিক প্রতিপক্ষের হাত থেকে বহুবার তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু ববি লক্ষ করলেন, চিকা তার বিছানার পাশের ছোট্ট বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা বাক্স থেকে একটা ডার্ট তুলে নিল। চিকার হাতটা ওপরে উঠল এবং এত দ্রুত নিক্ষেপ করল জিনিসটা যে হাতখানাকে ক্ষণেকের জন্য মনে হল ওয়াশ-এর ছবি।

ববি দ্রুত ঘুরে গেলেন। কিন্তু তবু এড়ানো গেল না। ডার্ট-এর তীক্ষ্ণ মুখ এসে গভীরভাবে গেঁথে গেল বাঁ কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে। ছিটকে গেল রক্তবিন্দু। ববি সামান্য একটা শব্দ করলেন।

তারপরই মাথায় একটা তীব্র আঘাত।

চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। ববি রায় জানেন, কখন পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।

ওয়ান টু ওয়ান হলে ইন্দ্রজিৎ ভয় খায় না। সে লড়তে প্রস্তুত। প্রতিপক্ষ যদি একা হয়, তবে সে যত বলশালীই হোক, তার হাত এড়ানো শক্ত নয়। বিশেষ করে

পালানোর প্রতিভা ইন্দ্রজিতের সত্যিই সাংঘাতিক। বলশালী লোকেরা, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করেছে, তেমন জোরে দৌড়তে পারে না।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিস্ময় অন্যত্র। সে দিব্যি গঙ্গার ঘাটে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লীনা ও দোলনকে নজরে রাখছিল এবং তাদের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে তার মনে হল লীনা আর দোলন ছোকরা অকারণে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপরই লীনা গিয়ে ফস করে গাড়ি থেকে কী একটা নিয়ে এল। আর তার পরই একটা ঢ্যাঙা পালোয়ানের আবির্ভাব।

কোনও মানে হয় এর? কথা নেই বার্তা নেই ছোকরাটা এসেই ইন্দ্রজিতের দামি কোটের কলারটা ধরে হ্যাঁচকা টানে পঁড় করিয়ে দিল। কবজির কী সাংঘাতিক জোর!

এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ?

ইন্দ্রজিৎ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরই দিল। তবে চিঁ চিঁ করে। ইংরিজিতে।

গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।

খুব জোর একটা নাড়া দিয়ে ছোকরা বলল, হাওয়া খাচ্ছ না আর কিছু!

ডান হাতে পটাং করে একটা চড় কশাল ছোকরা। আর তাতে চোখে লাল নীল তারা দেখতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। ওয়ান টু ওয়ান বটে, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ যে একাই এতজন তা আগে জানা ছিল ইন্দ্রজিতের।

ববিকে সে বহুবার অনুরোধ করেছে দু’-একটা প্যাঁচ-পয়জার শেখানোর জন্য। কিন্তু কাজপাগল লোকটা শেখায়নি। ববি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট। দুর্দান্ত বক্সারও ছিল একসময়ে। ছোটখাটো চেহারা বলে মালুম হয় না, কত বড় বড় দৈত্য-দানবকে কাত করতে পারে।

কিন্তু ববির কথা মনে হতেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল ইন্দ্রজিৎ। ছোরার হাতে ইঁদুরকলে ধরা অবস্থাতেই সে হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ছোকরার তলপেটে চালিয়ে দিল।

কাজ হল চমৎকার। ছোকরা তাকে এক মুহূর্তের জন্য আলগা করে দিল।

ইন্দ্রজিৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটতে লাগল।

কিন্তু রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা ট্যাক্সি ঘঁস করে এসে একদম সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

ক্যা! ভাগ রহে হো? বেওকুফ!

ইন্দ্রজিৎ দেখল, সেই বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালা। স্বজাতি এক শিখ যুবকের এরকম হেনস্তা দেখে বীরের জাত সর্দারজির ক্ষোভ হয়ে থাকবে। সিটের তলা থেকে একটা কৃপাণ বের করে বুড়ো নেমে এল। বয়স সত্তর হলে কী হয়, তেজ যুবকের চেয়ে বেশি।

কিন্তু ততক্ষণে লীনা, দোলন আর যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়েছে।

ইন্দ্রজিৎ চট করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

বুড়ো সর্দারজি মুক্ত কৃপাণটি পাশে রেখে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে বলল, পিছা করু?

হাঁ।

সর্দারজি তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল, তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ছুকরির তো বহুত এলেম দেখছি। এক ছুকরির পিছনে তিন-তিনজন বেওকুফ! আরে গবেট, মেয়েমানুষের মধ্যে আছেটা কী? মাংসের ডেলা ছাড়া আর কী পাও তোমরা?

এই দার্শনিক মন্তব্যসমূহে মাথা নেড়ে এবং হু হাঁ করে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার আছে ইন্দ্রজিতের?

প্রশ্ন হল, ছোকরাটা কে? হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটলই বা কেন?

***

অন্য গাড়িতে লীনা, দোলন আর ছেলেটা পাশাপাশি বসে।

লীনা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

সাদা পোশাকের পুলিশ। আমরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।

কেন নিয়েছিল তা বলতে পারেন?

না। তবে—

তবে?

না, তেমন কিছু নয়।

আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ম্যাডাম। পুলিশকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ঠিকই, কিন্তু পুলিশ কতটা হেল্পফুল তা তারা জানে না বলেই।

লীনা অমায়িক হেসে বলল, বোধহয় লোকটা আমার প্রেমে পড়েছে।

চৌরঙ্গীতে ছেলেটা নেমে গেল।

১২. একটা সিদ্ধান্ত

লীনা আজ রাত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছিল। প্রথম কথায় নীল মঞ্জিল বলে আর একটা বিপজ্জনক কানামাছি খেলায় সে নামবে কি না। নামলেও তার ভূমিকা কী হবে?

দ্বিতীয় চিন্তা হল, ববি রায় আদৌ মরেছেন কি না। মহেন্দ্র সিং লোকটাই বা আসলে কে? কম্পিউটারের কোড হিসেবে কতগুলো ভুল কথা তাকে কেন শিখিয়ে গিয়েছিলেন ববি? রিভলভারটা সত্যিই তার কাজে লাগবে কি না। গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ-আবির্ভূত সেই যুবক সত্যিই কি সাদা পোশাকের পুলিশ?

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু একটারও সদুত্তর পাওয়ার কোনও উপায় তার নেই। ববি রায়ের বাড়িতে সে অনেকবার টেলিফোন করেছে। কেউ ধরেনি। অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ববি রায়ের বাড়িতে কেউ থাকে না। তার কোনও পরিবার পরিজন নেই। দু'জন দারোয়ান আছে, তারা ফোন ধরে না, বাড়ি তালাবন্ধ বলে। অফিস থেকে সে আরও জেনেছে, ববি ট্যুরে গেছেন, এর চেয়ে বেশি অফিস আর কিছু জানে না।

বাড়িতে লীনার কোনও আপনজন নেই। দাদা খানিকটা ছিল, এখন দাদাও ভয়ংকর রকমের পর।

তবু দাদাকেও ফোন করেছিল লীনা। তার দাদা দীর্ঘদিন পশ্চিম এশিয়া সফর করে সদ্য ফিরেছে। কিন্তু সন্ধের পর দাদা আর স্বাভাবিক থাকে না। সম্পূর্ণ মাতাল গলায় কথা বলতে শুরু করায় বিরক্ত লীনা ফোনটা রেখে দিল। আজকাল সন্ধের পর সফল পুরুষদের প্রায় কাউকেই স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। এত মদ খেয়ে কী যে হয়।

আজ বিকেলে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে আসার পর সে আর দোলন কিছুক্ষণ একটা রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা মেরেছে। তখন লীনা নীল মঞ্জিলের কথা তুলেছিল। দোলন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছে, তোমার বস যদি মারা গিয়েই থাকেন তবে কেন একটা ডেড ইস্যুকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছ?

আমার মন কী বলছে জানো? ববি মারা যাননি।

কী করে বুঝলে? সিক্সথ সেন্স?

বলতে পারো।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই।

কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।

তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু রিস্ক কতটা?

কী করে জানব?

তা হলে ওটা ভুলে যাও লীনা।

তুমি কি ভিতু দোলন?

অবশ্যই। নীল মঞ্জিল হয়তো তোমার বস-এর বাগানবাড়ি। তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে…

ছিঃ দোলন। ববি পাগল ঠিকই, কিন্তু ওরকম নন। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, ববি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না। কথায় কথায় অপমানও করেন। লোকটাকে সেইজন্যই আমি এত অপছন্দ করি।

আচ্ছা, আচ্ছা, মানছি তোমার বস খুব সাধু ব্রহ্মচারী মানুষ। কিন্তু তা বলে নীল মঞ্জিল যে খুব নিরাপদ জায়গা এটা মনে করারও কারণ নেই।

লীনা দোলনের কথাটা চুপ করে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার মনে সেই থেকে একটা অস্বস্তি কাটার মতো বিঁধে আছে। অফিসের বাইরে কোনও কাজ করতেই

ববি তাকে বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু লোকটার স্পর্ধিত নির্দেশের মধ্যেও যেন একটা অসহায় আর্তি আছে।

তার মা আর বাবার পার্টি থাকায় আজ একাই ডিনার খেল লীনা। ডিনার সে প্রায় কিছুই খায় না। একটুখানি সুইট কর্ন-সুপ আর আধখানা রুটি। হাসিহীন বৈষ্ণবী খাবারের তদারকি করছিল।

এই নিরানন্দ বাড়ি মাঝে মাঝে লীনার হাঁফ ধরিয়ে দেয়। তার বিপুল স্বাধীনতা আছে, সেকথা ঠিক, কিন্তু এত অনাদর এবং এত ঠান্ডা সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী যন্ত্রণার।

ঘরে এসে স্টিরিয়ো চালিয়ে দিল লীনা। কিছুক্ষণ ঝইঝমাঝম বাজনার সঙ্গে একা একা নাচল ঘরময়।

তবু কেন যে মনটায় এত অস্বস্তি, এত জ্বালা, কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে তার। কী যেন একটা গোলমাল হচ্ছে।

হঠাৎ বৈষ্ণবী এসে দরজার কাছ থেকে ডাকল, দিদিমণি।

লীনা ঈষৎ কঠিন হয়ে বলল, কী বলছ?

তোমার একটা চিঠি এসেছিল আজ। টেলিফোনের টেবিলে রাখা ছিল। দেখলাম তুমি নাওনি। এই নাও।

লীনা চিঠিটা নিল। খামের ওপর অতিশয় জঘন্য হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেই কেঁপে উঠল লীনা। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ।

বৈষ্ণবী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল লীনা। বোম্বের শীলমোহর অস্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু হস্তাক্ষর কার তা তো লীনা জানে।

বিবশ হাতে খামের মুখটা ছিড়ল সে। একটা ডায়েরির ছেড়া পাতায় সম্বোধনহীন কয়েকটা লাইন। প্রায় অবোধ্য। তবু হাতের লেখাটা খানিকটা চেনা বলে কষ্ট করেও পড়ে ফেলল লীনা।

ইংরেজিতে লেখা : হয়তো এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। নীল মঞ্জিলে আপনি আবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। তেমন বিপদ বুঝলে লাল বোতামটা টিপে দেবেন। মাত্র তিন মিনিট সময় থাকবে হাতে। মাত্র তিন মিনিট, অন্তত তিনশো মিটার দূরে সরে যেতে হবে ওর মধ্যে। পারবেন?

কোনও মানেই হয় না এই বার্তাটির। কিন্তু কাগজটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লীনার চোখ হঠাৎ জ্বালা করে জল এল।

গভীর রাত অবধি আজকাল তার ঘুম আসে না। কিন্তু হাতের কাছে ঘুমের ওষুধ থাকা সত্ত্বেও সে কখনও তা খায় না।

আজও সে জেগে থেকে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ। ফটক খোলার আওয়াজ। তার মা আর বাবা সামান্য বেসামাল অবস্থায় ফিরল। সিঁড়িতে দু'জনে উঠল তর্ক করতে করতে।

তার বাবা রীতিমতো চেঁচিয়ে বলল, সুব্রত ইজ আ নাইস গাই।

তার মা বলল, ওঃ নোঃ! হি ইজ আ স্কাউন্ড্রেল।

লীনা ব্যাপারটা জানে। সুব্রত নামে একটি সফল মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে বাবা আগ্রহী। সুব্রত নিজেও আগ্রহী লীনাকে বিয়ে করতে। বহুবার এ বাড়িতে হানা দিয়েছে লোকটা। খারাপ নয়, কিন্তু এত বেশি ড্রিংক করে যে, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়াই মুশকিল।

আজ সুব্রতর কথা ভাবতে হাসি পেল লীনার। সুব্রত বড়লোক বাপের ছেলে। হাইলি কানেকটেড। তাদের সঙ্গে একটা কলাবোরেশনের চেষ্টায় আছে লীনার বাবা। বিয়ে হলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু লীনা সুব্রতকে বিয়ে করবে কেন? তার তো কখনও আগ্রহই হয়নি।

লীনা দোলনের কথা ভাবতে লাগল। দোলন একদিন মস্ত বড় মানুষ হবে, এটা লীনার স্থির বিশ্বাস। তার চেয়েও বড় কথা, দোলন হবে তার বশংবদ। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তাদের মধ্যে কখনওই হবে না। লীনাকে দোলন এখন থেকেই ভয় পায়।

অস্থির হয়ে লীনা উঠল। তার বাবা আর মায়ের আলাদা আলাদা ঘর নিঝুম হয়ে গেছে। সারা বাড়িটাই এখন ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ।

লীনা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আজও রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি। লীনা চেয়ে রইল, যদি কোনও গাড়িতে আজও সিগারেটের আগুন দেখা যায়!

সিগারেটের আগুন দেখা গেল না বটে, কিন্তু লীনার হঠাৎ মনে হল, একটা ছোট গাড়ির মধ্যে যেন সামান্য নড়াচড়া। কেউ আছে এবং জেগে বসে আছে।

লীনা সামান্য কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে চলে এল।

তাকে অকারণে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন ববি। হয়তো ঘটনাগুলি ক্রমে বিপদের আকার ধারণ করবে। কিন্তু লীনা কিছুতেই আজ ববির ওপর রাগ করতে পারল না।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে। এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে সে কি সুখী? এর চেয়ে একটু বিপদের মধ্যে নেমে পড়া যে অনেক বেশি কাম্য।

সে নীল মঞ্জিল রহস্য ভেদ করতে যাবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল লীনা।

পরদিন অফিসে যথাসময়ে পৌঁছে লীনা অবাক হয়ে দেখল, তার জন্য রিসেপশনে সেই লম্বা চেহারার ছিপছিপে সাদা পোশাকের পুলিশ ছোকরাটি অপেক্ষা করছে।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

লীনা বুঝতে না পেরে বলল, কেন বলুন তো?

আমি জানতে এসেছিলাম যে, সেই লোকটা আর আপনার পিছু নিয়েছে কি না। আপনি ইনসিকিওরড ফিল করছেন না তো?

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কী করে?

ছোকরা মৃদু হেসে বলল, আমি পুলিশে কাজ করি, ভুলে যাচ্ছেন কেন? পুলিশকে সব খবরই রাখতে হয়।

লীনা একটু কঠিন গলায় বলল, একটা সামান্য ঘটনার জন্য আপনার এতটা কষ্ট স্বীকার করারও দরকার ছিল না। পুলিশের কি আর কাজ নেই?

ছোকরা তবু দমল না। হাসিটা দিব্যি মুখে ঝুলিয়ে রেখে বলল, এটাও তো কাজ।

লীনা বলল, ধন্যবাদ। আমাকে কেউ আর ফলো করছে না। নিজের নিরাপত্তা আমি নিজেই দেখতে পারি।

এই বলে লীনা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল লিফটের দিকে। ভ্রু কোঁচকানো, মাথায় দুশ্চিন্তা।

ছোকরাটা এগিয়ে এসে ডাকল, মিস ভট্টাচার্য, একটা কথা।

আবার কী কথা?

কিছু মনে কববেন না, গতকাল আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছিলাম।

লীনা সাদা হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না তো।

আপনি জিনিসটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

লীনা নিজেকে সামলে নিতে পারল। বলল, আঁচলের আড়ালে কী ছিল তা বোঝা অত সহজ নয়। আপনি ভুল দেখেছেন।

ছেলেটা খুব অমায়িক গলায় বলল, আমি কোনও অভিযোগ নিয়ে আসিনি। শুধু জানতে এসেছি ওই পিস্তলটার জন্য আপনার লাইসেন্স আছে কি না। ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে আমরা একটু বেশি সেনসিটিভ।

আমার কাছে কোনও পিস্তল ছিল না।

ছেলেটা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, পিস্তলটা আপনি আঁচলের আড়াল থেকে অত্যন্ত কৌশলে আপনার হাতব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন। সেটা হয়তো এখনও আপনার হাতব্যাগেই আছে।

লীনা জানে, আছে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারী। ব্যাগটা অবহেলায় একটু দুলিয়ে লীনা মধুর করে হেসে বলল, থাকলে আছে। আপনার আর কিছু বলার না থাকলে এবার আমি আমার ঘরে যাব; আমার দেরি হয়ে গেছে।

ছেলেটা সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, আমি যদি আপনি হতাম তা হলে পিস্তলটা পুলিশকে হ্যান্ডওভার করে দিতাম। একটা পিস্তলের জন্য আপনাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে।

লীনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

অটোমেটিক লিফটে ঢুকে সুইচ টিপে দিল লীনা। ছোকরার মুখের ওপর দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে লীনা ব্যাগ খুলে পিস্তলটা বের করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একেবারে নতুন ঝকঝকে পিস্তলটা দেখতেও ভারী সুন্দর। এই বিপজ্জনক জিনিসটা ববি কেন তাকে দিয়ে গেলেন তাও বুঝতে পারছিল না লীনা। এতই কি বিপদ ঘটবে তার?

ববির নামে এক পাহাড় চিঠি এসেছে। সেগুলো খুলে যথাযথ ফাইল করতে লাগল লীনা। ফোন আসতে লাগল একের পর এক। ব্যস্ততার মধ্যে লীনার অনেকটা সময় কেটে গেল।

দুপুরে লাঞ্চ ব্রেক-এর সময় আবার ফোন এল।

হ্যাল্লো।

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আমি মহেন্দ্র সিং।

কে মহেন্দ্র সিং?

আমি ববি রায়ের সেই বন্ধু যে আপনাকে বোম্বে থেকে ফোন করেছিল। মনে আছে?

লীনা দাঁতে ঠোঁট টিপে ধরল। ববির বন্ধু। তারপর বলল, হ্যাঁ, মনে আছে। মহেন্দ্র সিং আপনার ছদ্মনাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি খুবই বিপন্ন।

তার মানে?

বলছি। কি কথাটা ফোনে বলা যায় না। আপনার সঙ্গে কি একা দেখা করা সম্ভব?

লীনা সতর্ক হয়ে বলল, আপনি কি কোথাও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছেন?

যদি বলি তাই?

তা সম্ভব নয়।

আমি খুব নিরীহ লোক।

আপনি কেমন তা জেনে আমার লাভ নেই। দেখা করতে হলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন বা বাড়িতে। অন্য কোথাও নয়।

মহেন্দ্র সিং যেন একটু হতাশ হল। স্তিমিত গলায় বলল, তাহলে আপনাকে ফোনেই একটু সাবধান করে দিই। আপনার অফিসে যে ছোকরাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে খুব সুবিধের লোক নয়।

এ কথায় লীনা অবাক হল। তারপর রেগে গেল। বলল, তার মানে কি আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন

রাগ করবেন না মিস ভট্টাচার্য, আপনার ওপর নজর রাখতে স্বর্গত ববি রায় আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন। অন্তত আরও দিন সাতেক কাজটা আমাকে করতেই হবে। তারপর অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। স্বর্গত ববি রায় তো আর পেমেন্ট করতে পারবেন না, ফলে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।

ববি রায় কি সত্যিই মারা গেছেন?

আমি তার লাশ দেখিনি। কিন্তু যাদের খপ্পরে পড়েছেন তাদের হাত থেকে সুপারম্যানদেরও রেহাই নেই।

লীনা কথা বলতে পারল না, আজ তার সত্যিই ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে। কষ্টটা কিসের তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না সে।

মিস ভট্টাচার্য।

বলুন।

ববি রায় অতিশয় খারাপ লোক।

আপনি তার কেমন বন্ধু?

নামমাত্র।

আমার তো মনে হয় আপনিও খুব খারাপ।

যে আজ্ঞে। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

পারেন।

ওই ছোকরা আপনার কাছে কী চায়?

তা জেনে আপনার কী হবে?

ছোকরাকে একটু জরিপ করা দরকার।

লীনা একটু ভেবে নিয়ে বলল, ছেলেটা বলছে যে ও পুলিশে চাকরি করে।

মোটেই বিশ্বাস করবেন না যেন।

করছি না। আমি তত বোকা নই।

আর কী চায়?

জানি না, তবে মনে হয় আপনার মতো এই ছোকরাও আমার ওপর নজর রাখছে। আমার ওপর। নজর রাখার লোকের অভাব নেই দেখছি।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি একটু সাবধান হবেন।

ধন্যবাদ। আমি যথেষ্ট সাবধানি।

আমি অবশ্য পিছনে আছি।

না থাকলেও ক্ষতি নেই।

লীনা ফোন রেখে দিল।

নীল মঞ্জিলে অভিযান করতে হলে এইসব নজরদারদের এড়ানো ভীষণ দরকার। লীনা ভাবতে বসল।

কাল শনিবার অফিস ছুটি। লীনা কালই নীল মঞ্জিলে যাবে।

১৩. গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা

গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো। অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতার ঘোরলাগা আলো। ববি সংজ্ঞাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখনও তার ভিতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল। না হলে

সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে?

যে জেগে ছিল সেই কি তার বিকল্প সত্তা, যাকে তিনি বহুবার অনুভব করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময়? ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাকবেল্ট ববি যখনই তাঁর ইন বা সহনশীলতার অভ্যাস করেছেন, যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমগ্র শক্তিকে করতে চেয়েছেন একীভূত, তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের দেহ থেকে? যে-দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যাসই তাকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে। সে তাঁরই ওই বিকল্প সত্তা। ইন মানেই নম্রতা, জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া, সমস্ত কঠিন আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায়। শেষ অবধি কোনও আঘাতই আর আহত করে না। গায়ে ছুঁচ ফোটালেও নিচ্ছিদ্র থেকে যায় ত্বক। বড় অল্প দিনের অল্পায়াস সাধনা তো নয়। ইন আর ইয়ান-এর সেই সমন্বয় বহুদিন ধরে, গভীর অধ্যবসায়ে অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাকবেল্টকে।

ববির জ্ঞান ফিরল। টান টান হয়ে উঠল তার চেতনা। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো। ববি নিঃঝুম হয়ে পড়ে থেকে তাঁর ইয়ানকে খুঁচিয়ে তুললেন। দেহ ও মন। দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটি জায়গায়, মস্তিষ্কে।

প্রথম প্রশ্ন: তিনি কোথায়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: তিনি কতটা আহত?

তৃতীয় প্রশ্ন: তার পরিস্থিতি কতটা খারাপ?

চতুর্থ প্রশ্ন: কতদূর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায়?

পঞ্চম প্রশ্ন: কতদূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন?

প্রশ্ন আরও আছে। অনেক প্রশ্ন। তবে সেগুলো আপাতত মুলতুবি থাকতে পারে।

তবে এক বছর আগে একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি। জেট ল্যাগ এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই। প্যারিসে সদ্য নিজের ছোট ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে জানুয়ারির শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন। এমন সময় লোকটা এল। দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ববি অবাক। বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন। গায়ে প্রচুর গরম জামা সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে। কথা বলতে পারছিলেন না। এমনকী নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত না। ববি তাকে ধরে এনে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন। সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একপাত্র কফিও।

ভদ্রলোক কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন, পকেট থেকে একটা হোমিয়োপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেলে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন, আমার নাম রবীশ ঘোষ।

রবীশ ঘোষ নামটা ববি রায়ের স্মৃতিতে কোনও তরঙ্গ তুলল না। এ নাম তিনি শোনেননি।

রবীশ বললেন, আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি।

বলুন কী করতে পারি?

রবীশ কোটের পকেট থেকে তার পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বললেন, এছাড়া আমার একটা আইডেনটিটি কার্ডও আছে। যদি চান—

ববি পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত?

একাশিতে পড়েছি।

ববি ঠান্ডা গলায় বললেন, এই বয়সে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা। আপনাকে অবশ্য যাট-টাটের বেশি মনে হয় না।

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, না, একাশিই। আমি এ দেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে। এখন চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না। প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন। তবু আসতে হয়েছে। গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনার জন্যই। চারদিকে বরফ আর বরফ, বেরোতে পারি না।

দরকারটা কি এতটাই জরুরি?

সাংঘাতিক জরুরি।

আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন, এখানে কখনও দীর্ঘদিন ছিলেন?

বহুদিন। একটানা পনেরো বছর।

আমি কিছুটা বাংলা জানি। আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন।

রবীশ তৎক্ষণাৎ বাংলায় বললেন, সেটাই নিরাপদ। আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ডকারখানার কথা জানেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার, টেলিফোন লিংক ইত্যাদি ছাড়াও এরা আর একটা কাজ করে। গোয়েন্দাগিরি।

ববি বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কথা তো আজকাল বাচ্চারাও জানে। স্যাটেলাইটরা গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে।

রবীশ হাসলেন, বয়সের দোষ, মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি। আপনি জানবেন না তো কে জানবে? কথা হল, আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু-একটা স্যাটেলাইট আছে। ভূসমলয় স্যাটেলাইট। অর্থাৎ

ববি হাত তুলে বললেন, বুঝতে পারছি। বলুন।

কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটের নেই। তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপগ্রহগুলি থেকে ইনফরমেশন

সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে।

ববি কিছুক্ষণ খুব স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে তো চুরি?

রবীশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, চুরি নয়। চোরের ওপর বাটপাড়ি। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি বর্গফুট জায়গার ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলি অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে। এক স্যাটেলাইট থেকে আর এক স্যাটেলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে, যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটারিং করে চলেছেন দিনরাত। আপনি তো জানেন, ঘাসের নীচে পড়ে থাকা একটি ছুঁচের খবরও এই সব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না।

সে কথা ঠিক।

আমাদের উপগ্রহের সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদেরও কিছু ইনফরমেশন দরকার। নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার। ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপনে সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন? কাজটা খুব শক্ত আমি জানি। ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েভ-লেংথে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের তো অতিকায় এবং সুপারসেনসিটিভ ডিস্ক অ্যান্টেনা নেই। মনিটারিং সিস্টেমও প্রিমিটিভ। দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করেছি একটা কোনও উপায় আবিষ্কার করতে। একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না। কিন্তু শেষরক্ষা হয়তো হবে না। আমার বয়স একাশি, আমি দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছি। আর তাই আপনার কাছে আসা।

আমার কাছে কেন?

রবীশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন, আমি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের জগতের খবর সবই রাখি। আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই। আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশড পেপার পড়েছি। পড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভিতরে আছে, আমি জানি। ইলেকট্রনিক্স আমারও

বিষয়। কলকাতার কাছেই একটা গোপন জায়গায় আমি একটি মনিটরিং সেন্টার তৈরি করেছিলাম। পুরোপুরি ক্যামোফ্লেজড এরিয়া।

আপনাদের সরকার এসব জানেন?

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারের একান্ত বিশ্বাসভাজন। সরকার আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন না, আমরা সেটা পছন্দ করি না বলেই। কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন।

বুঝেছি। তারপর বলুন।

মুশকিল হল, এতকাল আমার দু'জন সহকর্মী ছিল। আমাদের কোনও সিকিউরিটি গার্ড ছিল না। শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে। ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয়। আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না ওখানে। এক-একজন আট ঘণ্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম। কেউ অ্যাবসেন্ট হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হত। একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। মাথায় গুলি, হাতে ধরা নিজের রিভলভার, পরিষ্কার আত্মহত্যা। অথচ আত্মহত্যা করার কোনও স্পষ্ট কারণ ছিল না। সুখী মানুষ, বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার। তবে তার স্ত্রী বলল, মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে, কথামতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। ওই টেনশন সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে পারেনি। তাই নিজে মরে ছেলেকে চিরকালের মতো নিরাপদ করে দিয়ে গেল।

আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী?

সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার সন্দেহ, সেও ওরকমই কোনও বিপদে পড়েছিল। তার ছেলেমেয়ে আছে।

আর আপনি?

আমার কেউ নেই। ব্যাচেলর।

আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি?

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা। মরতে আমার ভয় নেই। শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রোজেক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। যাতে আর কারও হাতে না পড়ে তার জন্য প্রোজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি রেখেছি। কিন্তু সেটা তো চরম ব্যবস্থা।

আপনার প্রস্তাবটা কী?

যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং ঘাটতিটুকু আপনি পূরণ করে দেন। হয়তো বছরখানেক লাগবে। তারপর আপনি আবার আপনার স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন। আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই হাই নয়। আমাদের দেশ গরিব। আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক, তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি, আপনি বাঙালিও। আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এতদুর ছুটে এসেছি।

ববি রায় রাজি হননি। বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন। আবার। আর একাশি বছর বয়স্ক তদগতচিত্ত এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের ভিতরে কোনও চালাকি আর ছলচাতুরি নেই বলে ববি রায়ের লোকটার প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল।

তারপর একদিন রাজি হলেন। দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধ কী এমন কলকবজা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির লকিং ডিভাইস ববির অজানা নয়। তার ধুরন্ধর মস্তিষ্ক এই সব রহস্যকে জলের মতো পরিষ্কার করে নিতে পারে। কিন্তু মাথা দিয়েই সব হয় না। চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। চাই নো-হাউ। চাই সহকারী।

রবীশ তাকে অনুরোধ করেছিলেন অন্য কোনও চাকরি বা কাজের ছুতোয় যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন। সেটা কোনও সমস্যাই হল না। কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি মাল্টিন্যাশনালে ববি চাকরি নিলেন। ববির মতো তোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি চমৎকৃত হল, বর্তে গেল। তাকে স্থাপন করা হল কোম্পানির প্রায় মাথায়।

রবীশ তাকে দমদমে রিসিভ করেননি। স্বাভাবিক সতর্কতা, দেখা করেছিলেন সাত দিন পর। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের

দুনম্বর কোচে। দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আরও সাত দিন পর, বালি-দুর্গাপুরের এক বাড়িতে। তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে, নানা আঘাটা ঘুরে, সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধূলো দেওয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে, রবীশ তাকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে।

বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঃঝুম বাড়ি। ধারে কাছে লোকালয় নামমাত্র। বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি। চারদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রিক ফেনসিং। ফটকে অটো লক। গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবাহী সরু তার পেতে বখা। আছে বিচিত্র অ্যালার্ম এবং মিনি-মাইন। আছে বুবি ট্র্যাপ। কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা, বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এ মুখো হয় না।

এ সবই রবীশের কাছে শুনল ববি রায়।

নীল মঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি। সম্ভবত কোনও ধনবান ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। ছাদে নানা রকমের অ্যান্টেনা। ভূগর্ভের ঘরে মনিটরিং সেন্টার।

ববি সবই দেখলেন। অতিশয় মনোযোগ দিয়ে। খুব খুশি হলেন, এমন বলা যায় না। তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মিস্টার ঘোষ, আমি অতিমানব নই, আমার অতিমস্তিষ্কও নেই। তবে আপনার কাজ দেখে মনে ইচ্ছে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এমন হতেও পারে, কিছুদিন চিন্তাভাবনা করলে আমি আপনার এইসব ডিভাইসকে খানিকটা ইমপ্রুভও করতে পারি। বিদেশি উপগ্রহকে পেনিট্রেট করা হয়তোবা সম্ভবও হবে। কিন্তু আপনি কীরকম ইনফরমেশন চান?

সবরকম। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল, কার অস্ত্রভাণ্ডারে কত রকম অস্ত্র জমা হচ্ছে। বিশেষ করে পরমাণু বোমা।

ববি হেসেছিলেন, জেনে কী হবে?

রবীশ তাঁর সেই অসামান্য হাসিটি হেসে বললেন, ববি, আমি আপনার সম্পর্কে অনেক জানি।

কী জানেন?

আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো-হাউ জানেন। ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে-কোনও পরমাণু ওয়ারহেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে। যদি এ দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফোরিত করে দিতে পারে তার বেস-এ।

পারে, কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে।

জানি। আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব। আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার। যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনও ইঙ্গিত পাই যে, আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে।

ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন। রবীশ অনেকটাই ভেবেছেন, বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি।

কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে নীল মঞ্জিলে। প্রতিবারই বিচিত্র ঘুরপথে, কখনও ছদ্মবেশেও।

একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এত সতর্কতার কারণ কী? সিকিউরিটি? আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলে ফেলেছে।

রবীশ খুব বিষণ্ন মুখে অধোবদন হলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, না, মুখ খুলবার উপায় তার নেই।

তার মানে?

হি ডায়েড এ ন্যাচারাল ডেথ। অবশ্য অ্যারেঞ্জড ন্যাচারাল ডেথ।

ববি মাথা নাড়লেন। বললেন, গুড, দ্যাটস গুড।

এ কেয়ার্ড ম্যান ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস।

মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবীশের ফোন আসবার কথা ছিল, এল না, ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই ফোন করলেন।

একটা ভারী গলা জবাব দিল, কাকে চাই?

রবীশ ঘোষ।

আপনি কে?

ওঁর এক বন্ধু।

রবীশ ঘোষ মারা গেছেন।

কীভাবে?

এ কেস অফ মার্ডার। আপনার—

পরিচয় ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

রবীশ! সৌম্য, কর্মপ্রাণ রবীশ। ববির ভাবাবেগহীন মনেও চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালবাসা।

আপাতত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর প্রতিটি হাত ও পা আলাদা আলাদা ভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা। নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই।

এরা জানে কীরকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয়।

ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন। হাত-পায়ে এতটুকু টান দিলেন না। সামান্য শক্তিক্ষয়ও নিরর্থক। শরীর তার বশীভূত। মন তার বশীভূত। শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয়।

ববি চুপ করে পড়ে রইলেন। একটা চৌকো ঘর, অন্ধকার। বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে। ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে।

ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। মন, একীভূত হও, শরীর বশীভূত হও। জাগো জেন।

১৪. বিকেলের ম্লান আলোয়

বিকেলের ম্লান আলোয় রবীশের মৃত্যুনীল মুখ দেখেছিলেন ববি। একাশি বছরের তদগত বৃদ্ধকে মৃত্যুতেও প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল। যখন তাকে গুলি করা হয় তখন বোধহয় নিজের জানালার ধারের আরামকেদারায় বসে রবীশ আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। আততায়ীরা যখন ঘরে ঢোকে তখনও রবীশ বোধহয় পালানোর চেষ্টা করেননি। জানতেন পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তা শান্তচিত্তে গ্রহণ করাই ভাল। তবে রবীশ যে প্রতিরোধ করেননি তা নয়। আরামকেদারার ধারে তার ঝুলে পড়া হাত থেকে একটা ছোট রিভলভার খসে পড়েছিল মেঝেয়। বিপদের মধ্যে কাল কাটাতে হত বলেই বোধহয় অস্ত্রটা সব সময়ে সঙ্গে রাখতেন কিন্তু ব্যবহার করার অবকাশ পাননি।

এ সবই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন ববি। আর পুলিশ তাঁকে অজস্র জেরা করে যাচ্ছিল তিনি কে, রবীশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ইত্যাদি। পুলিশ যে ঝামেলা করবে তা তিনি জানতেন, তবু রবীশের মৃতদেহটি একবার স্বচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

দিন দুই বাদে আর একবার গেলেন রবি। একটু রাতের দিকে। রবীশের ঘরের তালা একটা স্কেলিটন কী দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, তাঁর জন্য রবীশ কোনও বার্তা রেখে গেছেন কি না। অবশেষে পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা পকেট-টেপরেকর্ডারে ক্যাসেটটা লোড করা ছিল। প্রথমে দু’ মিনিট একটা কনসার্ট বাজল। তারপর রবীশের গলা পাওয়া গেল। ফরাসি ভাষায় বললেন, ববি, আপনাকে ওরা আবিষ্কার করবেই। সাবধান।

রবীশের মৃত্যুর পরই ববি বুঝলেন, তিনি ভারমুক্ত। নীল মঞ্জিলের বাকি কাজ করার দায় তার নয়। তিনি এবার এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন। বিদেশে অনেক বড় প্রোজেক্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি জানতেন, চব্বিশ ঘন্টা তার ওপর কেউ নজর রাখছে। তাই তিনি লীনাকে…।

ববি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছেন কাঠের পাটাতনে। যন্ত্রণার এখন কোনও স্থিরবিন্দু নেই। ববি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরীরে। অপেক্ষা করছেন। কাঠের উদোম পাটাতনটা যথেষ্ট কর্কশ। ববির প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু অসম্ভব সহনশক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখছেন ববি। কবজি ও পা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বাঁধা। একটু নড়লেই তার বসে যাবে মাংসের গভীরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল কি? ঘরে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ল। ববি দেখলেন একটা মস্ত বড় গুদাম ঘরের মতো ঘর। একধারে চটে মোড়া অনেক প্যাকিং বাক্স।

একটা লোক এগিয়ে এল কাছে।

ববি চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

লোকটা নিচু হয়ে তাঁকে একটু দেখল। চোখের পাতা ধরে টেনে পরীক্ষা করল চোখের মণি। তারপর স্মেলিং সেন্ট-এর একটা শিশি ধরল নাকের সামনে।

ববি একটু শিউরে উঠে চোখ মেললেন।

সামনে দৈত্যাকার সেই যুবক। ভারতীয়দের গড়পড়তা চেহারা এরকম সাধারণত হয় না। ছেলেটা সম্ভবত বাস্কেটবল বা ওই জাতীয় কিছু খেলত। চমৎকার আঁট শরীরের বাঁধুনি।

ববি চোখ চাইতেই ছেলেটা বলল, সরি।

সরি?

ছেলেটা ইংরেজিতে বলল, তুমি বিখ্যাত লোক। তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে এনেছ!

তোমরা আমার কাছে কী চাও?

একটা ঠিকানা। আর একটা কোড।

কেন চাও?

আমরা প্রোজেক্টটা ধ্বংস করে দেব।

কেন করবে?

ববি, আপনার এতে স্বার্থ কী? আপনি কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন নিজেকে? আপনি বলে দিন, আমরা আপনাকে সসম্মানে প্লেনে তুলে দেব। আপনি প্যারিসে চলে যাবেন।

ববি সামান্য একটু ভ্রু তুলে বললেন, এতই সহজ?

আপনার ক্ষতি করে আমাদের লাভ কী?

ববি গম্ভীরভাবে বললেন, প্রোজেক্টটা ধ্বংস করলেও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আবার তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ছেলেটা একটু চিন্তিতভাবে ববির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ববি, আপনার সেক্রেটারি লীনা ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরে রয়েছেন। আজ হোক, কাল হোক, তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের পক্ষে প্রোজেক্টটা নষ্ট করে দেওয়া শক্ত হবে না।

ববি সামান্য ক্লান্ত স্বরে বললেন, তোমরা শুধু প্রোজেক্টটা ধ্বংস করতে চাইলে এত কষ্ট স্বীকার করতে না। তোমরা ওর সিক্রেটটাও চাও।

যুবকটির মুখে কখনও হাসি দেখা যায় না। সর্বদাই যেন চিন্তান্বিত। মাথা নেড়ে বলল, আমি কোনও সিক্রেটের কথা জানি না।

তুমি ক্রীড়নক মাত্র। যারা জানবার তারা ঠিকই জানে।

যুবকটি ধীর স্বরে বলল, ববি রায়, প্রাণ বাঁচানোর একটা শেষ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করছ। আমার পর যারা তোমাকে অনুরোধ করতে আসবে তারা ইতর লোক, প্রায় পশু।

ববি মৃদু স্বরে বলল, ওদের আসতে দাও।

যেমন তোমার ইচ্ছা।

যুবকটি চলে গেল।

ববি উপুড় হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শোয়া অবস্থায় বুঝতে পারছিলেন, এই রকম ল্যাবরেটরির মরা ব্যাঙের মতো পড়ে থেকে কিছুই করা সম্ভব নয়। অন্তত একটা হাতও যদি মুক্ত করা যেত।

দরজা দিয়ে দু'জন ঢুকেছে। এগিয়ে আসছে।

ববি চোখ বুজলেন! ইন আর ইয়ান। ইন আর ইয়ান। শরীর ও মন বশীভূত হও। এক হও। এ দেহ সমস্ত আঘাত সহ্য করতে পারে। জল যেমন পারে। বাতাস যেমন পারে।

ববি এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে ধ্যানস্থ হলেন।

চেতনার একটা মৃদু আলো শুধু জ্বলে রইল তার ভিতরে।

রবারের হোস-এর ছোট্ট টুকরো দিয়ে ওরা মারছে। চটাস চটাস শব্দ হচ্ছে পিঠে, পায়ে, সর্বাঙ্গে। যেখানে লাগছে সেখানেই যেন আগুনের হলকা স্পর্শ করে যাচ্ছে।

জাগ্রত হও, জেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে ঝড় বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে।

দুটো লোক থামল।

ববি চোখ মেললেন, হয়ে গেল?

লোকদুটো অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল ববির দিকে। তাদের অভিজ্ঞতায়, এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। সাধারণত এরকম মারের পর লোকে গ্যাঁজলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী হল। দুটো মজবুত চেহারার নৃশংস প্রকৃতির লোক কেসের থেকে খুলে আনল নিরেট রবারের ভারী মুগুর। যাকে ইংরেজিতে 'কশ' বলে।

এবার ববি নিজের শরীরের ঢাকের বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। দুম দুম।

কতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল না কে বলবে? যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন ববি টের পেলেন, তার হাত ও পায়ের বাঁধন খোলা। তবে এখনও তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কাঠের তক্তার ওপর।

শরীরটা যেন আর তার নয়। এত অবশ, অসাড়, দুর্বল লাগছিল নিজেকে যে, চোখের পাতাটুকু খোলা পর্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। কিন্তু এরা ভুল করছে। ববিকে ওরা চেনে না। শরীরই যে সব মানুষের শেষ নয়, শরীরকে ছিন্নভিন্ন করলেও যে কোনও কোনও মানুষকে ভেঙে ফেলা যায় না, সেই জ্ঞান এদের নেই।

ববি কোনও বোকামি করলেন না। হঠাৎ উঠে বসলেন না বা হাত-পা ছুড়লেন না যন্ত্রণায়। তিনি শুধু উপুড় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যথা বুঝে কাত হয়ে শুলেন। হাত পা ও সমস্ত শরীরকে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ফেলে রাখলেন। যতদূর মনে হচ্ছে কোনও হাড় ভাঙেনি। ভাঙলে বমির ভাব হত, চোখে কুয়াশা দেখতেন। তবে শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেছে সেটাও হাড় ভাঙার চেয়ে কম নয়।

চমৎকার কাজ করছে তাঁর মাথা। ববি নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে শুধু মাথাটাকে চালনা করলেন। বৃদ্ধ রবীশ ও তার দুই সহকর্মী যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করেও সবটা পারেননি। রবীশ বৃদ্ধ হলেও কঠিন ঝুনো মানুষ। নীল মঞ্জিল তারই মস্তিষ্কের ফসল। তার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কোনও তথ্য বের করা সম্ভব ছিল না। তার অন্য দুই সহকর্মীকে ববি চেনেন না। সম্ভবত তাদের কেউ কোথাও অসাবধানে মুখ খুলেছিলেন।

নীল মঞ্জিলের ঠিকানা এখনও প্রতিপক্ষ জানে না জেনেও বিশেষ লাভ নেই। সেখানকার সুপার কম্পিউটার বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বেড়াজাল ভেদ করে প্রকৃত তথ্য জানা খুবই কঠিন, তবু যদি কোনও বিশেষজ্ঞকে ওরা কাজে লাগায় তবে একদিন হয়তোবা নীল মঞ্জিলের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব না-ও হতে পারে। আজ অবধি কেউ বৃহৎ শক্তির অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের গর্ভ থেকে তথ্য চুরি করতে পারেনি। রবীশ সেই কাজে বহুদূর এগিয়েছেন। তাঁকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ববি। এর মধ্যে ববিকে বহুবার বিদেশে যেতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোপনে আমদানি করতে। এ কাজে ববি খুবই অভ্যস্ত। কখনও নিজে, কখনও আন্তর্জাতিক চোরাই চালানদারদের মাধ্যমে জিনিস এসেছে। কিছু বেসরকারি শিপিং কোম্পানি টাকার বিনিময়ে ববিকে সাহায্য করেছে। প্রত্যেকটা পর্যায়ে কাজ বার বার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে নথিবদ্ধ

করার পর তা সাইফারে লিপিবদ্ধ করেছেন রবীশ। কম্পিউটারে জটিল কোডের আবছায়ায় নির্বাসিত করেছেন তাদের। সবটা ববিও জানেন না।

কিন্তু জানতে হবে। রবীশের মৃত্যু-ম্লান মুখচ্ছবি ববির চোখের সামনে আজও অম্লান ভেসে ওঠে। একাশি বছর বয়সেও মানুষ কতখানি সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ! কতখানি শক্ত! বিকেলের ছাইরঙা আলোয় রবীশের উপবিষ্ট মৃতদেহ তার নিজের জয়ই ঘোষণা করছিল ভারী বিনয়ের সঙ্গে।

ববি খুব ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। লক্ষ করলেন, এই পাষণ্ডেরা তাঁকে এখনও পুরোপুরি মারতে চায় না বলেই বোধ হয় একটা নাঙ্গা টেবিলের ওপর এক জগ জল আর একটি ঢাকা থালি রেখে গেছে।

রবি প্রথমে কাঁপা দুর্বল হাতে জগটা তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন।

পিঠ আর পায়ের চামড়া ফেটে চিরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ফুলে আছে ক্ষতবিক্ষত শরীর। তবু ববি টের পেলেন, তার খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে। সম্ভবত গত ষোলো-সতেরো ঘন্টা তিনি কিছুই খাননি।

খুবই দুর্বল হাতে খাবারের ঢাকনাটা খুললেন ববি। কোনও হোটেল থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণির থালি। দু'মুঠো ভাত, দু'খানা রুটি, দু'-তিনটে সবজি আর সামান্য দই।

ববি খুব ধীরে ধীরে খেলেন।

তারপর উঠে দুর্বল পায়ে সামান্য কয়েক পা হাঁটলেন। বুঝলেন, চোট সাংঘাতিক। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন বিদ্যুৎ-শিখার মতো তীব্র যন্ত্রণা লক লক করে উঠছে।

ববি বসে হাঁফাতে লাগলেন। জল আর খাবারের ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ চললে হয়তো সবল বোধ করবেন।

কাঠের পাটাতনটার ওপর ফের শুয়ে পড়লেন। এবার সংজ্ঞাহীনতা নয়, প্রগাঢ় ঘুমে চোখ আঠা হয়ে লেগে এল।

ঘুম ভাঙল সামান্য একটা শব্দে। সম্ভবত রাত গভীর হয়েছে। গুদামের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার।

ববি উঠে বসলেন। পায়ের দিকে দরজাটা কি খুলে যাচ্ছে? কেউ ঢুকছে?

ববি তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিলেন চোখের পলকে। এরা যদি তাকে আবার বাঁধে মুশকিল হবে। তিনি অন্ধকারেই তক্তা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আন্দাজে এগোতে লাগলেন।

দরজাটা বেশ বড়। দুটো বিশাল কাঠের পাল্লা। একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন লোক একটা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল। বিশাল গুদামঘরের অবশ্য সামান্যই আলোকিত হল তাতে। লোকটার অন্য হাতে একটা লোহার পাঞ্চ। ববি বেয়াদপি করলে পাঞ্চ চালাবে।

ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এল লোকটা তক্তার দিকে। তারপর জায়গাটা শূন্য দেখে থমকাল। চকিতে ঘুরে লণ্ঠনের আলোয় ববিকে খুঁজবার চেষ্টা করল।

তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রবল আঘাতে লণ্ঠনসমেত চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল।

ববির পা অত্যন্ত দুর্বল, ব্যথাতুর। তাতে একরকম ভালই হয়েছে। যে কারাটে কিকটা ববি মেরেছেন লোকটার মাথায় সেটা সবল পায়ে মারলে লোকটার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত।

ববি হাতড়ে হাতড়ে লোকটার কাছে গেলেন। তাঁর নিজের পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। ববি নিপুণ হাতে লোকটার গা থেকে ট্রাউজার্স আর হাওয়াই শার্ট খুলে নিলেন। পা থেকে চটিও। ববির গায়ে একটু ঢোলা হবে কিন্তু আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।

ট্রাউজারের পকেটে কিছু টাকা আছে। আর আছে একটা দেশলাই।

হাই মেহদি! হোয়াটস দ্য ম্যাটার?

দরজাটা খুলে সেই দৈত্যাকার যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা তীব্র আলোর টর্চবাতি। আলোটা সোজা এসে পড়েছে মেঝেতে শয়ান লোকটার ওপর।

দরজার পাল্লার আড়াল থেকে ববি হাতটা তুললেন।

মাত্র একবারই চপ করে একটা শব্দ হল। বিশাল দৈত্য কুঠার-ছিন্ন মস্ত গাছের মতো ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

ববি টর্চটা কুড়িয়ে নিলেন। কাজে লাগবে।

দৈত্যের পকেট থেকে ববি রায় এক বান্ডিল নোট পেয়ে গেলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা। আর দুটো জিনিসও পেলেন। গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আর গাড়ির চাবি।

বাইরে বেরিয়ে ববি চারদিকটা সতর্ক চোখে দেখলেন। জায়গাটা একটা মস্ত গো-ডাউন এলাকা। শুনশান নির্জন। রাস্তাঘাট নোংরা। প্রচুর লরি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিয়াট গাড়িটা সামনেই দাঁড় করানো। দরজায় লক নেই। ববি উঠলেন। স্টার্ট দেওয়ার আগে জায়গাটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন একটু। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

অন্তত মাইলখানেক দুরে আসবার পর ববি চওড়া রাস্তা পেয়ে গেলেন। যথেষ্ট চনমনে বোধ করছেন ববি। তবে সর্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও বিষিয়ে ওঠা ক্ষতস্থান তো সহজে ভুলবার নয়।

ববি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন আরও মাইল তিনেক যাওয়ার পর। একটা নার্সিং হোম।

গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

রিসেপশনে যে ঘটনাটা বানিয়ে বললেন ববি, তা চমৎকার। তিনি জুয়ার আড্ডায় গুন্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলেন। প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন। চিকিৎসা দরকার।

রিসেপশনের ক্লার্কটি সখেদে বলল, নো বেড স্যার।

ববি অত্যন্ত অবহেলায় ভাঁজ করা দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রাখলেন, ইয়োরস। আই নিড ট্রিটমেন্ট, রেস্ট, স্লিপ… প্লিজ…।

লোকটা নরম হল।

আধঘণ্টার মধ্যেই চমৎকার ছোট্ট একটা কেবিন পেয়ে গেলেন ববি। একজন নার্স এসে তাঁর ক্ষতস্থানে ওষুধ দিল। ইনজেকশন করল। এক কাপ কড়া কফিও চাইলেন ববি। পেয়ে গেলেন। তারপর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লেন অক্লেশে!

খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল ববির। আরও অনেকক্ষণ তার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, তিনি জানেন। দরকার ওষুধ এবং পথ্যেরও। কিন্তু অত সময় তার হাতে নেই।

খুব ভোরবেলা লীনার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। আসলে ঘুম নয়। চটকা। লীনার ঘুম হচ্ছে না আজকাল। বার বাব দুঃস্বপ্ন দেখে, আর ঘুম ভেঙে যায়।

হ্যালো।

বহুদূর থেকে একটা ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা বলল, আই ওয়ান্ট মিসেস ভট্টাচারিয়া।

লীনা ইংরেজিতে বলল, আমাব মা এখন ঘুমোচ্ছন। আপনি কে বলুন তো?

আমি লীনা ভট্টাচারিয়াকেই চাইছি।

আমিই লীনা।

মিসেস ভট্টাচারিয়া! আর ইউ ইন ওয়ান পিস? থ্যাংক গড!

হঠাৎ সর্বাঙ্গ এমন কাঁটা দিয়ে উঠল লীনার। এ কি মৃত্যুর পরপার থেকে আসা টেলিফোন? এও কি সম্ভব?

গলায় কী যে আটকাল লীনার, কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না। শুধু একটা অস্ফুট ফোঁপানি তার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমি... আমি একটু উন্ডেড। খুব বেশি নয়। কিন্তু একটু সময় লাগবে রিকভার করতে। অ্যাট লিস্ট আরও চব্বিশ ঘণ্টা। আই অ্যাম ইন এ ব্যাড শেপ।

আর ইউ অ্যালাইভ? রিয়েলি তালাইভ?

ভেরি মাচ।

১৫. গলায় আনন্দের কাঁপন

লীনা কিছুতেই, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, তার গলায় আনন্দের কাঁপনটিকে থামাতে পারল না। গাঢ় শ্বাস ফেলে বলল, কী হয়েছিল আপনার? কোনও অ্যাক্সিডেন্ট?

না, মিসেস ভট্টাচারিয়া। এ সিম্পল কেস অফ প্রহার।

কারা আপনাকে মারল, আর কেন?

পয়সা পেলে তারা সবাইকেই মারে। প্রফেশনাল ঠ্যাঙাড়ে। মারাঠি ভাষায় যাদের বলা হয় দাদা। দাদা মানে জানেন?

জানি, দাদা মানে গুন্ডা।

কলকাতাতেও দাদা আছে মিসেস ভট্টাচারিয়া। আপনি কোনও রিমোট জায়গায় কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যান।

কেন, বলুন তো! পালানোর মতো কী হয়েছে?

ইউ আর ইন ডেঞ্জার, চাইল্ড।

ড্রপ দি চাইল্ড বিট। আমি কাউকে ভয় পাই না।

বোকা-সাহস দিয়ে কিছু হয় না মিসেস ভট্টাচারিয়া। ট্যাক্টফুল হতে হয়।

আপনি আমাকে বোকা ভেবে কি স্যাডিস্ট আনন্দ পান? জেনে রাখুন, আপনি আমার চেয়ে বেশি চালাক নন।

ববির দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনে ভেসে এল। আরও স্তিমিত গলায় ববি বললেন, চালাকিতে আমি বরং আপনার চেয়ে কিছু খাটোই হব। কিন্তু আমার অ্যানিম্যাল

ইন্সটিংক্ট খুব প্রবল। তাই মরতে মরতে আমি বার বার বেঁচে যাই। আপনার ওই ইটিংক্টটা নেই।

থাকার কথাও নয় মিস্টার বস।

আপনাদের অনেক কিছু নেই মিসেস ভট্টাচারিয়া। তাই আপনি অত্যন্ত ইজি টারগেট। ওরা যদি আপনাকে ক্রাশ করে তা হলে আমার কী আর ক্ষতিবৃদ্ধি বলুন! আমি চাইলেই আর একজন স্মার্ট এফিসিয়েন্ট সেক্রেটারি পেয়ে যাব। কিন্তু ক্ষতিটা হবে যদি আপনার কাছ থেকে ওরা এন এম-র হদিশটা পেয়ে যায়। তাই বলছি, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিন।

এন এম? সেটা আবার কী?

আর একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, বুঝতে পারবেন। আপনি যে ব্রেনলেস এ কথা আমি বলছি না। গ্রে-ম্যাটার কিছু কম, এই যা। কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুও যদি অ্যাক্টিভেট করা যায় তা হলে একজন মোটামুটি বোকাকে দিয়েও কাজ চলতে পারে। আপনি যদি এই গ্রে-ম্যাটারগুলোকে…

ওঃ, ইউ আর হরিবল। এন এম মানে কি নীল মঞ্জিল? আমি আজই যে সেখানে যাচ্ছি!

ববি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান করুন যেন কেউ আপনার টেলিফোনে ট্যাপ করে থাকে। দয়া করে এন এম-এর কথা ভুলে যান, ওর ত্রিসীমানায় আপনার যাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু কেন?

ইউ আর আন্ডার অবজারভেশন মাই ডিয়ার। স্ক্যাম কিড, স্ক্র্যাম।

একটু তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে বসে রইল লীনা। হাতে বোবা টেলিফোন। ববি লাইন কেটে দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ বাদে বিবশ হাতে টেলিফোনটা ক্র্যাডলে রাখল লীনা। তারপর সারা শরীরে এক গভীর অবসাদ নিয়ে উঠল। আজ একটু অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে ছিল তার। নীল মঞ্জিল নামক

জায়গাটিকে আবিষ্কার করতে যাবে। ববি সেই প্রস্তাবে জল ঢেলে দিলেন।

জল ঢেলে দিলেন আরও অনেক কিছুর ওপর। ববি বেঁচে আছেন জেনে যে আবেগটা থরথরিয়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে, লোকটা মার খেয়েছে শুনে যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল, সবই ভেসে গেল সেই জলে।

মার খেয়েছে ঠিক হয়েছে। খাওয়াই উচিত ওরকম অসভ্য লোকের।

কথা ছিল আজ তার সঙ্গে দোলনও যাবে। ঠিক ন'টায় দোলন আসবে। তারপর একসঙ্গে বেরোনোর কথা।

প্রোগ্রামটা পালটাতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে তারা?

লীনা আর শুতে গেল না। দাঁত মাজল, ব্যায়াম করল, স্নান করল।

বেলা ন'টার একটু আগেই চোব-চোর মুখে ভয়ে ভয়ে ফটক পেরিয়ে দোলনকে ঢুকতে দেখল লীনা। সে তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তেরছা হয়ে আসা কবোষ্ণ রোদ গায়ে শুষে নিচ্ছে। দোলনের হাবভাব দেখে হেসে ফেলল। গোবেচারা আর কাকে বলে!

এসো দোলন, ব্রেকফাস্ট খাওনি তো?

খেয়েছি।

বাঃ, আর আমি যে তোমার জন্যই বসে আছি না-খেয়ে! কী খেয়েছ?

ওঃ, সেসব মিডলক্লাস ব্রেকফাস্ট। আবার খাওয়া যায়।

বাঁচালে। শোনো, আজ আমাদের সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে না।

দোলনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হচ্ছে না! কেন বলো তো?

আমার বস বারণ করেছে।

বসটা কে? ববি তো পটল তুলেছেন।

মোটেই না। বেঁচে আছে।

বাঁচা গেল। কেউ মরেছে-টরেছে শুনলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লীনার। দোকান খুলতে যাচ্ছেন বলে মা খুব ব্যস্ত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে প্রোটিন বিস্কুট আর ওটমিল খাচ্ছিলেন।

মা, এই যে দোলন!

কে বলো তো?

আমার বন্ধু।

ওঃ, দ্যাট চ্যাপ! বসুন আপনি। আজ তো সময় নেই, অন্যদিন ভাল করে আলাপ হবে।

এই বলে খাবার একরকম অর্ধসমাপ্ত রেখে মিসেস ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন।

দোলন সপ্রতিভ হয়ে বলল, আমাকে উনি তেমন পছন্দ করলেন না কিন্তু।

জানি। তোমার বেশি লোকের পছন্দসই হওয়ার দরকারও নেই। একজন পছন্দ করলেই যথেষ্ট।

সেও কি করে?

সন্দেহ হচ্ছে?

একটু সন্দেহ থেকেই যায় লীনা। তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে।

আই হেট দিস সেট আপ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো! চলল, বেরিয়ে পড়ি। আজ চমৎকার রোদ উঠেছে। চনচনে শীত। এরকম দিনে একদম নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু'জনেই উঠে পড়ল।

গাড়িটা নেবে লীনা?

নিশ্চয়ই। গাড়ি ছাড়া মজা কিসের? তবে অন্য গাড়ি। ফিয়াট। বাবা দিল্লি গেছে, বাবার গাড়িটাই নিচ্ছি।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে আনল লীনা। দোলন আর সে পাশাপাশি বসল। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

তুমি কখনও বারুইপুর গেছ?

বহুবার। আমার এক পিসি থাকে যে।

চলো তা হলে পিসিকে টারগেট করি আজ।

চলো, বহুকাল পিসিকে দেখতে যাইনি। বারুইপুর দারুণ জায়গা।

দক্ষিণের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল লীনা। ক্রমে গড়িয়া-টড়িয়া পেরিয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চারধারে।

লীনা!

কী?

একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে আমাদের। দেখেছ?

তো! ওই কালো গাড়িটা? মনে হচ্ছে পন্টিয়াক।

অনেকক্ষণ ধরে দেখছি।

দাঁড়াও, আমাদেরই ফলো করছে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখি। সামনে একটা ডাইভারশন দেখা যাচ্ছে না?

ওটা কাঁচা রাস্তা। কোথায় গেছে ঠিক নেই।

তবু দেখা যাক। আমরা তো বেশি দূর যাব না। একটু গিয়েই ফিরে আসব।

বলতে বলতে লীনা গাড়িটাকে ডানধারের রাস্তায় নামিয়ে দিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা নামল বটে, কিন্তু তারপরই খটাং একটা শব্দ হল পিছনে। হু-উস করে হাওয়া বেরিয়ে গেল ডানদিকের চাকা থেকে।

লীনা! কী হচ্ছে বলো তো!

সামওয়ান ইজ শুটিং অ্যাট আস।

তা হলে মাথা নামিয়ে বোসো। ওঃ বাবা, এরকম বিপদে জীবনে পড়িনি।

লীনা তার হ্যান্ডব্যাগটা খুলে পিস্তলটা বের করে নিয়ে বলল, সেভ ইয়োর লাইফ ইন ইয়োর ওন ওয়ে। আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।

লীনা এক ঝটকায় দরজাটা খুলে নেমে পড়ল। আজ তার পরনে স্লাক্স আর কামিজ, তাই চটপট নড়াচড়া করতে পারছিল সে। দরজাটা খোলা রেখে তার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে সে পিস্তল তুলল।

মাত্র হাত দশেক দূরে পন্টিয়াকটা বড় রাস্তায় থেমে আছে। দু'জন লোক অত্যন্ত আমিরি চালে নেমে এল গাড়ি থেকে। পরনে দু'জনেরই গাঢ় রঙের প্যান্ট আর ফুলহাতা সোয়েটার। দু'জনেই নিরস্ত্র।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, আই অ্যাম গোয়িং টু শুট ইউ রাসক্যালস।

দুজনেই ওপরে হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে বলল, ডোন্ট শুট প্লিজ। উই ওয়ান্ট টু টক।

একজনকে চিনতে পারল লীনা। সেই সাদা পোশাকের পুলিশ।

কী চান আপনারা?

আমরা শুধু আপনার পিস্তলটা বাজেয়াপ্ত করতে চাই। আর কিছু নয়।

সেটা সম্ভব নয়। আর এগোলে আমি গুলি চালাব।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি গুলি চালাবেন না। পুলিশকে গুলি করা সাংঘাতিক অপরাধ।

আপনারা পুলিশ নন। ইমপস্টার।

আমরা যথার্থই পুলিশ। আই ডি-র লোক।

তার প্রমাণ কী?

আমাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখবেন?

ওখান থেকে ছুড়ে দিন। কাছে আসবেন না।

একজন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লীনার দিকে ছুড়ে দিল।

রোদে একটা ঝকঝকে বিভ্রম তুলে কার্ডটা ছুটে এল লীনার দিকে। তারপর লীনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা পটকা ফাটবার মতো আওয়াজ হল। সামান্য একটু ধোঁয়া এবং অদ্ভুত গন্ধ।

লীনা কেমন যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল। নড়তে পারল না।

পরমুহূর্তেই দু’টি লোক কাছে এসে দাঁড়াল তার। একজন পিস্তল কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে। অন্যজন ভারী মায়াভরে লীনাকে পরে দাড় করাল।

যে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছিল সে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দোলনের দিকে তাকাল।

দোলনের অবস্থা সত্যিই লজ্জাজনক। সে ফিয়াটের সামনের সিটের স্বল্প পরিসর ফাঁকের মধ্যে উবু হয়ে বসে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে।

বেরিয়ে আসুন।

দোলন কাতরস্বরে বলল, আমি তো কিছু করিনি।

লোকটি খুব মোলায়েম গলায় বলল, না। আপনি কিছুই করেননি। সেইজন্য আপনাকে আমরা ধরছিও না। বেরিয়ে আসুন।

দোলন বেরিয়ে এল।

লোকটা দোলনের কাঁধে একটা হাত রাখল। মৃদু হেসে বলল, এ ব্রেভ ম্যান, কোয়াইট এ ব্লেড ম্যান।

তারপরই লোকটার ডান হাত দোলনের নাকের কাছে একটা চমৎকার জ্যাব মারল। নক-আউট জ্যাব। মুষ্টিযোদ্ধারাও যা সামাল দিতে পারে না দোলন তা কী করে সামলাবে?

সামনের সিটেই পড়ে গেল দোলন। চিৎপাত হয়ে।

লোকটা দরজাটা বন্ধ করে দিল। কাছাকাছি লোকজন বিশেষ নেই। যারা আছে তারা বেশ দূরে।

দু'জন লোক লীনাকে একরকম বহন করে নিয়ে এল পন্টিয়াকে। গাড়িটা এর মধ্যে কলকাতার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা উঠতেই তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে ছ'-সাত মিনিটের বেশি লাগেনি।

বেশিক্ষণ নয়, মিনিট দশেক বাদেই লীনার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে দেখল প্রকাণ্ড গাড়ির পেছনের সিটে অস্বস্তিকর রকমের নরম ও গভীর গদিতে সে বসে আছে। দু'পাশে দু'জন শক্ত সমর্থ পুরুষ।

লীনা হঠাৎ একটা ঝটকা মেরে উঠে পড়ার চেষ্টা করল, বাঁচাও! বাঁচাও!

দু'জন লোক পাথরের মতো বসে রইল দু'পাশে। বাধা দিল না।

কিন্তু লীনা কিছু করতেও পারল না। তার কোমর একটা সিট বেল্ট-এ আটকানো।

আপনারা কী চান?

সেই সাদা পোশাকের ছদ্ম-পুলিশ বলল, আমরা নীল মঞ্জিল যেতে চাই মিস ভট্টাচার্য। আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আজ আপনার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল।

আমি ও-নাম জন্মেও শুনিনি।

শুনেছেন মিস ভট্টাচার্য। আজ সকালে ববি রায়ের সঙ্গে আপনার টেলিফোনে যেসব কথা হয়েছে তা টেপ করা আছে আমাদের কাছে।

আপনারা আমার টেলিফোন ট্যাপ করেছিলেন?

না করে উপায় কী? ববি রায়কে আমরা বাগে আনতে পারিনি বটে, কিন্তু আমাদের সেখানে যেতেই হবে।

আমি পথ চিনি না।

মিস ভট্টাচার্য, মেয়েদের নানারকম অসুবিধে আছে। আপনি নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে চান না।

আমি আপনাদের ভয় পাই না। আমি চেঁচাব।

লাভ নেই। এ গাড়ি সাউন্ডপ্রুফ। বাইরে থেকে ওয়ান-ওয়ে গ্লাস দিয়ে গাড়ির ভিতরে কিছু দেখাও যায় না। আপনি বুদ্ধিমতী, কেন চেঁচিয়ে শক্তিক্ষয় করবেন?

আপনি পুলিশ নন।

না হলেই বা। আপনার কী যায় আসে? ববি রায়ের সিক্রেট নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন? দোলন! দোলনের কী হল?

কিছু হয়নি। চিন্তা করবেন না। তবে বলে রাখি ও লোকটা কিন্তু আপনার বিপদে বাঁচাতে আসেনি।

লীনা এত বিপদের মধ্যেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পুরুষরা সবাই সমান।

১৬. একটা ট্র্যাংক কল

গার্লস আর ইডিয়টস। ডাউনরাইট ইডিয়টস। দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে ববি আর একটা ট্র্যাংক কল করলেন। আবারও কলকাতায় এবং ডিম্যান্ড কল।

ইন্দ্রজিতের ঘুম-ঘুম গলা পাওয়া গেল একটু বাদে, হ্যাল্লো।

শোনো ইন্দ্রজিৎ, দেয়ার ইজ এ গুড নিউজ ফর ইউ। আমি এইমাত্র আবিষ্কার করেছি যে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গাড়ল নও, সম্ভবত তোমার চেয়েও গাড়ল আছে। অন্তত দেয়ার ইজ এ কিন কমপিটিশন। এবং সে একটি মেয়ে।

ইন্দ্রজিতের ঘুম চড়াক করে কেটে গেল। প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল টেলিফোনে, আপনি? আপনি বেঁচে আছেন স্যার? মাইরি, ভূত নন তো!

আমি ভূত হলে তোমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার। শোনো, আমাকে আর এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার প্লেন ধরতে হবে। তবু হয়তো সময়মতো পৌঁছোতে পারব না। ইন দা মিন টাইম তুমি যার কাছে বোকামিতে হেরে গেছ তার বাড়ি চলে যাও। শি হ্যাজ বাঙ্গলড় এভরিথিং।

কে স্যার? লীনা?

ওঃ ইউ আর রাইট। থ্যাংক ইউ। যতদূর মনে হয়েছে মিসেস ভট্টাচারিয়া বিপাকে পড়বেন। ভদ্রমহিলাকে ফেস করার দরকার নেই। জাস্ট ফলো হার।

ফলো! ও বাবা, আমার যে গাড়ি নেই।

তোমার অনেক কিছুই নেই ইন্দ্রজিৎ, আমি জানি। কিন্তু গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। টাকা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যা বলছি করো।

বিপদটা কি খুব সিরিয়াস স্যার? আমার কিন্তু সেই ভাইট্যাল জিনিসটাও নেই।

কোনটা? বুদ্ধি? বুদ্ধির দরকার নেই গাড়ল, দরকার শুধু বুলডগের মতো টেনাসিটি আর অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট।

বুদ্ধি নয় স্যার। ভাইট্যাল জিনিসটা হল রিভলভার।

তোমার না থাকলেও চলবে। মিসেস ভট্টাচারিয়ার আছে। সময় নেই, ছাড়ছি।

একটা কথা স্যার। উনি কিন্তু মিসেস নন, মিস…

ববি ফোন রেখে দিলেন। আর চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম পেলে বড় ভাল হত। কিন্তু কপালে নেই।

ববি নার্সিং হোমের চার্জ মিটিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। তিরবেগে গাড়ি চলল এয়ারপোর্টের দিকে।

বোম্বে থেকে ভায়া নাগপুর কলকাতার ফ্লাইটে যথেষ্ট ভিড় হয়। ববি সম্ভবত জায়গা পাবেন না। স্বাভাবিকভাবে পাবেন না, কিন্তু অস্বাভাবিক পন্থায় পেয়ে যেতেও পারেন।

নিজের শারীরিক কষ্টের দিকটা ততটা বোধ করতে পারছেন না ববি। সম্ভবত পেথিডিন ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া এখনও রয়েছে। আর রয়েছে তীব্র উদ্বেগ। মেয়েটা যে কেন নীল মঞ্জিলের কথাটা ফোনে বলে দিল। ওর টেলিফোন ট্যাপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে ববি নিশ্চিত। ঘুমন্ত বোম্বের রাস্তায় পোড়া রবারের গন্ধ ছড়িয়ে ববি রায় ফিয়াটটাকে শুধু ওড়াতে বাকি রাখলেন।

এয়ারপোর্ট। ববি জানেন, এই ফ্লাইটটা গন্ডগোলের। এই ফ্লাইটে এমন দু’একজন থাকতেও পারে যারা ববিকে বিশেষ পছন্দ করবে না।

ববি সুতরাং সহজ পথে গেলেন না। লাউঞ্জের ভিড়াক্রান্ত অঞ্চলটা এড়িয়ে তিনি একটু একা রইলেন। লক্ষ রাখলেন এম্বার্কেশন টিকিটের কাউন্টারে। জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন। কাউন্টার খুলতে এখনও হয়তো মিনিট দশ-বারো দেরি আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ববিকে। হঠাৎ দেখা গেল সেই দৈত্যাকার যুবক এবং আর একজন আধা সাহেব গোছের লোক হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টারের দিকে গেল।

ববি জানেন ওদেরও টিকিট নেই। ওরা চেষ্টা করবে শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটবার। যদি অবশ্য অন্যরকম বন্দোবস্ত থেকে থাকে।

ববির দ্বিতীয় ধারণাই সত্য। দু'জনে লাইনে দাঁড়াল। হাতে টিকিট।

আনন্দে হাতে হাত ঘষে ববি ইংরিজিতে বললেন, চমৎকার।

পাশ থেকে একজন বুড়োমতো বিদেশি লোক হঠাৎ ধমকের স্বরে ইংরিজিতে বলে উঠল, কী চমৎকার? আঁ! চমত্তারটা আবার কী? ইটস এ লাউজি কান্ট্রি, ইটস এ লাউজি এয়ারলাইনস অ্যান্ড ইউ আর লাউজি পিপল। জানো প্লেন আজও আধ ঘণ্টা লেট!

দ্যাটস এ গুড নিউজ।

ববি স্থানত্যাগ করলেন।

দৈত্যাকার যুবকটির কাঁধে যখন আলতো করে টোকা দিলেন ববি তখনও জানতেন না প্রতিক্রিয়াটা এরকম হবে। লোকটা ফিরে ববির দিকে তাকিয়ে প্রথমে স্ট্যাচু হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তারপর তার চোয়ালটা ঝুলে পড়ল নীচে।

ববি চাপা গলায় বললেন, একটা আপসরফায় আসবে? আমি মারদাঙ্গা এবং হিরোইকস একদম পছন্দ করি না।

দৈত্য এবং তার সঙ্গী কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর দৈত্য দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কীরকম আপসরফা?

কথাটা একটু আড়ালে হলে ভাল হয়। সাপোজ ইউ গো টু দি ইউরিন্যালস?

দৈত্যটা একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, কোনও চালাকি করলে তুমি খুব বিপদে পড়বে।

ববি মুখখানা করুণ করে বললেন, দি অডস আর ভেরি মাচ এগেইনস্ট মি।

তুমি কাল রাতে আমার পকেট থেকে—

ববি মাথা নেড়ে বললেন, জানি, জানি, আমি টাকাটাও ফেরত দিতে চাই।

দৈত্যটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, চলো।

এ সময়টায় ইউরিন্যাল ফাঁকাই থাকে। তিনজন যখন ঢুকল তখন মাত্র একজন উটকো লোক প্রাতঃকৃত্য সারছিল। সে বেরিয়ে যেতেই দৈত্যটা হঠাৎ প্রকাণ্ড থাবায় ববির বাঁ কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এবার বলল বাছাধন!

দ্বিতীয়জনের হাতে যেন জাদুবলে দেখা দিল একটা রিভলভার।

ববি রায় অত্যন্ত খুশির হাসি হাসলেন। এরকমই তো চাই। ঠিক এইরকমই তো চাই।

দৈত্যকে হাতে রেখে ববি প্রথম রিভলভারওয়ালার ঠিকানা নিলেন, তার বাঁ পা নব্বই ডিগ্রি উঠে গেল সমকোণে এবং শরীরকে একটি তৈলাক্ত দণ্ডের উপর ঘুরিয়ে অপ্রত্যাশিত ক্যারাটে কিকটি সংযুক্ত করে দিলেন আততায়ীর মাথায়। এত দ্রুত যে কিছু ঘটতে পারে তা লোকটা কল্পনাও করেনি কখনও। তার রিভলভার গিয়ে সিলিং-এ ধাক্কা খেয়ে খটাস করে মেঝেয় পড়ল এবং তারও আগে লোকটা নিজের ভগ্নস্তূপ হয়ে ঝরে পড়ল মেঝেয়।

দৈত্যটা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ববি তাকে আদেশ করলেন, লোকটাকে তুলে পায়খানার মধ্যে ভরে দাও। কুইক…

কিন্তু দৈত্য তখনও এই অশরীরী কাণ্ডটাকে মাথায় নিতে পারেনি। তাই অবাক হয়ে ববির দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না।

কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় ববির হাতে নেই। তিনি খুবই দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর ওয়ালজ নাচের মুদ্রায় প্রায় শত মাইল বেগে তিন ফুট এগিয়ে গিয়ে ঘুসিটা চালালেন দৈত্যের থুতনিতে।

ভূমিকম্প এবং মহীরুহ পতনের শব্দ সৃষ্টি করে দৈত্য পড়ে গেল।

ববি তার টিকিটটা কুড়িয়ে নিলেন। আর দু'জনকে হেঁচড়ে নিয়ে দুটি ছোট ঘরে ভরে দিলেন।

ভাগ্য ভালই ববির। যে মিনিট তিনেক সময় ব্যয় হল তার মধ্যে কেউ ইউরিন্যালে ঢোকেনি।

রিভলভারটা ববি তুলে নিলেন বটে, কিন্তু পকেটে ভরলেন না। আর একটি ছোট ঘরে সেটি কমোডের মধ্যে নিক্ষেপ করে বেরিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ালেন।

যে ওজনের মার দিয়েছেন দু'জনকে তাতে ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে চেতনা ফেরার কথা নয়। অবশ্য কপাল খারাপ হলে কত কী তো ঘটতে পারে।

ঘটল না অবশ্য। এম্বাকেশন কার্ড নিয়ে ববি রায় গিয়ে এক কাপ কফি খেলেন। ইউরিন্যালটা একবার দেখে এলেন। দুটি ছোট ঘর এখনও বন্ধ, কোনও অঘটন ঘটেনি।

একটু বাদেই সিকিউরিটি চেক-এর ঘোষণা শুনতে পেলেন ববি। তার ঢোলা পোশাক এবং কামানো চিবুক বোধহয় সিকিউরিটির লোকেরা বিশেষ পছন্দ করল না। কিন্তু ববির পকেটে টাকা আর রুমাল ছাড়া কিছু নেই দেখে ছেড়ে দিল।

প্লেন আকাশে উড়বার পর ববি স্বস্তি বোধ করলেন। ক্ষুধার্তের মতো খেলেন ব্রেকফাস্ট এবং নাগপুরের আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

কলকাতায় যখন প্লেন নামল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সোয়া এগারোটা। কত কী ঘটে যেতে পারে এব মধ্যে, কত কী...।

ববি লীনার নম্বর ডায়াল করলেন। বাড়ি নেই।

ববি তাড়াহুড়ো করলেন না। আগে দাড়ি কামালেন, দাঁত মাজলেন, তারপর জীবাণুনাশক মিশিয়ে গরম জলে স্নান করলেন। তটস্থ বাবুর্চি চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিল। অম্লানবদনে ববি দ্বিতীয়বার প্রাতরাশ সারলেন। সারাদিন খাওয়া হয় কি না হয় কে জানে!

দু'-একটা ছোটখাটো জিনিস পকেটে আর হাতব্যাগে পুরে নিলেন ববি। তারপর তোক্সওয়াগনটা বের করলেন গ্যারাজ থেকে।

এমন সময় একটা অ্যাম্বাসাডার এসে বাড়ির সামনে থামল এবং অতিশয় উত্তেজিত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে এল ইন্দ্রজিৎ। তার দুটো চোখ বড় বড়, মুখখানা লাল।

স্যার!

বলো ইন্দ্রজিৎ।

আপনি এসে গেছেন! বাঁচালেন। ব্যাড নিউজ স্যার, ভেরি ব্যাড নিউজ।

ববি চোখ ছোট করে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ইজ শি কিল্ড?

কোনও সন্দেহ নেই।

কী হয়েছে সংক্ষেপে বলল।

আপনার ফোন পেয়েই আমি আমার এক চেনা গ্যারাজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করি। পার ডে আড়াইশো টাকা প্লাস তেল আর মবিল...

ওটা বাদ দাও, তারপর বলো।

মিস ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে ঠিক সাতটায় হাজির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। উইদাউট ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড উইদাউট ইভন এ প্রপার কাপ অফ টি...

কাট দি ব্রেকফাস্ট।

ওঃ আপনি তো আবার অন্যের খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, বলছিলাম, ঠিক ন'টায় ওই ছেলেটি আসে, দোলন। মিস ভট্টাচার্য আর দোলন একটা ফিয়াট নিয়ে বেরোয় ন'টা চল্লিশ নাগাদ। এবং একটা পন্টিয়াক গাড়ি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ফলো করতে শুরু করে।

তুমি কী করলে?

আমিও পন্টিয়াকটাকে ফলো করতে থাকি তবে একটু ডিসট্যান্স রেখে। আপনি তো জানেনেই স্যার যে আমার রিভলভার নেই।

তারপর কী হল?

গড়িয়া ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল যাওয়ার পর মিস ভট্টাচার্য কেন কে জানে, গাড়িটা হঠাৎ একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই পন্টিয়াক থেকে গুলি ছুটল। পিছনের একটা টায়ার ফেঁসে গিয়েছিল। আর লীনা–কী বলব স্যার–ঝাঁসীর রানি, রানি ভবানী, জোয়ান অব আর্ক, দেবী চৌধুরানি ছেঁকে তৈরি মেয়ে স্যার।

কী করল সে?

গাড়ি থেকে নেমে এসে পিস্তল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালাতে লাগল।

মাই গড।

একটু দূরে ছিলাম তাই ঠিক বলতে পারব না ব্যাপারটা কী হয়েছিল। তবে একটু বাদেই দেখলাম গুন্ডাদের গুলিতে মেয়েটা পড়ে গেল…

ননসেন্স! ওকে গুলি করবে কেন গাড়লেরা? ওকে মারলে তো সবই গন্ডগোল হয়ে যাবে।

আগেই বলেছি স্যার, আমি একটু দূরে ছিলাম। খুব স্পষ্ট করে দেখিনি। তবে মনে হল মেয়েটা উন্ডেড। গুন্ডারা গিয়ে ওকে ধরে গাড়িতে তুলে হাওয়া।

কোনদিকে গেল তারা?

আমি ফলো করিনি স্যার। দোলন নামে সেই ছোকরাকে গুন্ডারা ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল। আমি দোলনকে রেসকিউ করি। কিন্তু তার কাছ থেকে তেমন কোনও ইনফরমেশন পাইনি। ছোকরাটা আমার চেয়েও কাওয়ার্ড।

হুঁ। তোমার চেয়ে বোকা এবং তোমার চেয়েও কাওয়ার্ড যে আছে তা আমার জানা ছিল না। এনিওয়ে লীনাকে কোথায় নিয়ে গেছে তার খানিকটা আন্দাজ আমার আছে। গাড়িতে ওঠো। ইউ আর গোয়িং ফর এ রাইড।

স্যার, একটা কথা।

কী কথা?

গোলাগুলি চলবে নাকি?

চলতে পারে।

তা হলে আমার হাতেও একটা অস্ত্র থাকা দরকার।

না, বুন্ধু! তোমার হাতে অস্ত্র দেওয়া মানে আমার নিজের বিপদ ডেকে আনা।

আমি কোনওদিন বন্দুক পিস্তল হাতে পর্যন্ত নিতে পারিনি।

ভালই করেছ।

ববি গাড়ি ছাড়লেন। সল্টলেকের রাস্তায় গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল।

স্যার।

বলো।

গাড়িটা মাটির দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছেন?

চুপ করে বসে থাকো।

এ গাড়িতে সিটবেল্ট থাকা উচিত ছিল।

আছে, লাগিয়ে নাও।

ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলল, আমি নাস্তিক ছিলাম। কিন্তু এখন আর নই। মা কালী বাবা মহাদেব, রক্ষা করো!

ববি ঘুরপথ নিলেন না। সহজ এবং সবচেয়ে শর্টকাট ধরে তীব্রগতিতে এগোতে লাগলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সেতু পার হয়ে বোম্বে রোডে এসে পড়লেন।

স্যার।

বলো।

আপনি কি–?

কী? বললে আপনি রেগে যাবেন না তো স্যার?

তা হলে বোলো না।

বলছিলাম আপনি কি বাই এনি চান্স ওই মেয়েটিকে একটু পছন্দ করেন?

ববি দু-দুটো লরিকে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ টালমাটাল হয়ে আবার সামলে নিয়ে বলল, গুলিতে নয় আমরা মরব অ্যাকসিডেন্টে। স্যার একটু সামলে—

তুমি কিছু বলছিলে ইন্দ্রজিৎ?

বললেও তা উথড্র করে নিচ্ছি, স্যার।

শোনো, গার্লস আর ইডিয়টস। এই মেয়েটি যদি পর্বতপ্রমাণ বোকা না হত তা হলে আমাদের এইভাবে আজ নাকাল হতে হত না। মেয়েটা হয়তো মরবে, কিন্তু তার আগে একটা মস্ত সর্বনাশ করে দিয়ে যাবে।

ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয়ের লোক, স্যার।

হ্যাঁ। আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।

তাই দেখছি।

সেই ছোকরাটার কী হল? দোলন না কে যেন।

হোপলেস কেস স্যার। ছোকরাকে আমি এসপ্লানেড অবধি একটা লিফট দিয়েছিলাম। ছোকরাটা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আমাকে একটা থ্যাংক ইউ অবধি বলল না।

সেটাই স্বাভাবিক, ইন্দ্রজিৎ। বাঙালিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ভীষণ কমে যাচ্ছে। একদিন হয়তো দেখা যাবে বাঙালি মাত্রই মেয়েছেলে। কেউ শাড়ি পরে, কেউ বা প্যান্ট শার্ট বা ধুতি পাঞ্জাবি। বাট বেসিক্যালি সবাই স্বভাবে চরিত্রে মেয়েছেলে।

আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার, সামনে একটা পেট্রলট্যাংকার… ওরে বাবা…

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে ফেলল। একটা প্রবল বাতাসের ঝাপটা আর গাড়িতে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি টের পেল সে। তারপর চোখ খুলে দেখল, পরিষ্কার রাস্তায় গাড়ি মসৃণ ছুটছে।

আপনি কি মোটরকার জাম্পিং জানেন স্যার? ট্যাংকারটাকে কাটালেন কী করে?

কাটালাম দু’চাকায় ভর করে। পিছনের ডানদিকের চাকা রাস্তায় ছিল না।

মা কালী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!

আচমকাই বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ডাইভারশনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তাটা এক সময় পাকা ছিল, এখন খানাখন্দে ভরা।

ইন্দ্রজিৎ।

স্যার।

বাতাসে পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছ?

ইন্দ্রজিৎ বাতাস কে বলল, না।

আমি পাচ্ছি। ওরা এই পথেই গেছে।

লীনাকে যেখানে আনা হল সেই জায়গাটা লীনা চিনতে পারল না। তবে নিশ্চয়ই খিদিরপুর ডক-এর কাছাকাছি কোনও অঞ্চল। লীনা জাহাজের ভো শুনতে পেল একবার।

ঘিঞ্জি একটা নোংরা বসতি ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িটা একটা মস্ত পুরনো বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়ল। নিশ্চয়ই এককালে জমিদারবাড়ি ছিল। এখনও পাথরের পরি আর ফোয়ারা রয়েছে। বাগানে প্রচুরডালিয়া ফুটে আছে।

গাড়িবারান্দার তলায় গাড়িটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল।

ছদ্ম-পুলিশ যুবকটি বলল, এরপর থেকে আর আমাদের কিছুই করার থাকল না মিস ভট্টাচার্য।

তার মানে?

১৭. নীল মঞ্জিলের ঠিকানা

আপনি যদি আমাদের নীল মঞ্জিলের ঠিকানা দিয়ে দিতেন তা হলে আমরা আপনাকে রিলিজ করে দিতে পারতাম। কিন্তু খামোখা জেদ ধরে থেকে আপনি নিজের বিপদ ডেকে আনলেন।

লোকটা নেমে দাঁড়াল। একটা রূঢ় পুরুষালি হাত এসে লীনাকে প্রায় এ্যাচকা টানে নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। লীনা নিজেকে সামলাতে পারল না। গাড়ির দরজায় হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল রাস্তার পাথরে। হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গেল কি না কে জানে! লীনা ব্যথায় কাতরে উঠল, উঃ মাগো!

কিন্তু সেই আর্তনাদে কান দেওয়ার মতো কেউ তো ছিল না। পুরুষালি হাতটাই তার বাহু সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ফের দাড় করাল। এবার লোকটাকে দেখতে পেল লীনা। যাঁড়ের মতো মোটা ঘাড় আর মাঠের মতো চওড়া বুকওয়ালা এক বিদেশি। গায়ে একটা লাল টকটকে টি-শার্ট, পরনে কালচে ট্রাউজার্স। তার হাতে জাহাজের ছবিওয়ালা উল্কি।

লোকটা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, কাম অন, মিট ডেভিড।

লোকটা কি জাহাজি? হলেও হতে পারে। লীনা জাহাজি বিশেষ দেখেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, রাসক্যাল, মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো না?

লোকটা ঝকঝকে দাঁত আর গোলাপি মাড়ি বের করে হেসে বলল, আই অ্যাম এ হোমোসেক্সয়াল। আই ডোন্ট বদার ফর গার্লস। বাট দেয়ার আর আদারস হু উইল লাইক ইউ ইন বেড... কাম অন...

প্রায় হেঁচড়ে লীনাকে সিঁড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে দাড় করিয়ে দিল লোকটা।

ছোট একখানা ঘর। ঘরে বিশেষ কোনও আয়োজনও নেই। শুধু একখানা কাঠের সস্তা টেবিল এবং তার দু'ধারে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। ওপাশের চেয়ারে একজন লোক বসে আছে। এই পরিবেশে লোকটা নিতান্তই বেমানান। তার কারণ লোকটার চেহারা দার্শনিকের মতো। গায়ের ফরসা সাহেবি রং রোদে-জলে তামাটে মেরে গেছে। মাথার চুল পাতলা। চোখের নীল তারা দুটির ভিতরে এক সুদুর অন্যমনস্কতা রয়েছে। লম্বা মুখ। শরীরটা মেদহীন এবং একটু রোগাই। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই।

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইংরিজিতে বলল, গ্ল্যাড টু সি ইউ, মিস। প্লিজ বি সিটেড।

এই পর্যন্ত চমৎকার। লীনা লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে কি না তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল। সে হাত বাড়াল। তবে চেয়ারে বসে ইংরিজিতে বলল, তোমরা কী চাও? কেন আমাকে ধরে এনেছ?

লোকটা একটু চিন্তিতভাবে লীনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আর ইউ ইন লাভ উইথ ববি রায়?

এ কথায় কেন যেন হঠাৎ কঁ করে উঠল লীনার মুখ নাক কান। সে ঝামরে উঠে বলল, না, কখনও নয়। আই হেট হিম।

লোকটা তবু চিন্তিতভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আনমনে একটু মাথা নেড়ে অত্যন্ত ভদ্র, নরম এবং প্রায় বিষণ্ণ গলায় কবিতা পাঠের মতো করে ইংরিজিতে বলল, ববি রায় অত্যন্ত, আবার বলছি, অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। সব মেয়েরই উচিত তার সংস্রব থেকে দূরে থাকা এবং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু কেন?

ববিই কি আপনাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়নি?

দিয়েছে। লোকটা পাষণ্ড।

ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম। শুধু তাই নয়, ববি একজন চোর, খুনি ও আন্তর্জাতিক গুন্ডা। ববি চোরাই চালানদারদের সর্দার। আমি জানি, ববি একজন বিশ্ববিখ্যাত ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্টও বটে। কিন্তু সেসব বিদ্যা সে লাগায় গোয়েন্দাগিরিতে এবং খারাপ কাজে। সে তার মস্তিষ্ক বিক্রি করে বড়লোক হতে চায়। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র আছে যারা ববিকে মারার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার দিতে চায়। ববিকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মিস ভট্টা… ভট্টা…

লীনা বলল, লীনা উইল ডু।

লোকটা হেসে বলল, লীনা, ববি যে সিক্রেটটা তার কম্পিউটারে লুকিয়ে রেখেছিল সেটা তুমিই কিল করেছ। কিন্তু তাতে আমাদের দরকার নেই। সিক্রেটটা তুমি জানো। তুমি জানো নীল মঞ্জিলটা ঠিক কোথায়। যদি দয়া করে ঠিকানাটা বলে দাও, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সেখানে কী আছে?

লোকটা গম্ভীর বিষণ্ন দৃষ্টিতে লীনার দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমরা তাও সঠিক জানি না। কিন্তু ববি রায়কে টার্মিনেট করার একটা চুক্তি আমরা নিয়েছি।

টার্মিনেট!–বলে লীনা লোকটার দিকে চেয়ে রইল। তার বুকে তো কই সেতারের ঝংকার বেজে উঠল না। বরং ববির নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আনমনা, ব্যস্তবাগীশ ববি, নারীবিদ্বেষী ববি, ঠোঁটকাটা ববি। তাকে এরা মেরে ফেলবে?

লোকটা খুব মনোযোগ দিয়ে লীনার মুখের ভাব পাঠ করে নিচ্ছিল। মৃদু হেসে বলল, অবশ্য সেটা আজই হবে। ববি কী করেছে জানো? বোম্বেতে সে আমাদের অন্তত পাঁচ জন লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আমাদের সবরকম প্রতিরোধ ভেঙে পালিয়েছে। বোম্বে এয়ারপোর্টে আমার এক বন্ধুকে আজ সকালেই সে এমন মার মেরেছে যে, লোকটা মারা গেছে সেরিব্রাল হেমারেজে। ববি এখনও পলাতক। আমরা তাকে ভীষণভাবে চাই মিস লীনা। কিন্তু ববির সঙ্গে পরে আমাদের বকেয়া চুকিয়ে নেব। তার আগে তার সাধের নীল মঞ্জিলটা আমরা ধবংস করে দিতে চাই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, নীল মঞ্জিলে কী আছে?

লোকটা আবার একটা শ্বাস ফেলে বলল, ববি সেখানে পৃথিবীর মহত্তম সর্বনাশের আয়োজন করছে। শোনো মিস লীনা, সব টেকনিক্যাল জারগন তুমি বুঝবে না। তোমাকে শুধু জানাতে চাই যে, ববি আজ সকালে বোম্বে টু ক্যালকাটা ফ্লাইটটা অ্যাভেল করেছে। আমাদের লোক চব্বিশ ঘণ্টা ববির বাড়ির ওপর নজর রাখছিল। মাত্র আধঘণ্টা আগে সে আমাদের টেলিফোনে জানিয়েছে যে, ববি তার বাড়িতে পৌঁছে গেছে। আমাদের ধারণা সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নীল মঞ্জিলে যাবে। আর সেখানেই আমরা আজ ববি রায়কে পৃথিবী থেকে মুছে দেব।

তা হলে তোমরা ববি রায়কেই কেন ফলো করছ না?

তার কারণ, সেখানে আমাদের মাত্র একজন লোক মোতায়েন আছে। তার পক্ষে ববি রায়ের সঙ্গে পাল্লা টানা অসম্ভব। হয় ববি তাকে খুন করবে, না হলে চোখে ধুলো দেবে। ববিকে আমরা খুব ভাল চিনি, মিস লীনা। তা ছাড়া আমরা ববির আগেই নীল মঞ্জিলে পৌছোতে চাই।

লীনা ঠোঁট কামড়াল। ববি কলকাতায়। সেই ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা আজ ভোর রাতেই তো টেলিফোনে শুনেছিল লীনা। লোকটা ছিল নার্সিং হোমে। দারুণ রকমের জখম। তা হলে কোন মন্ত্রবলে লোকটা পৌঁছে গেল কলকাতায়?

মিস লীনা, আমাদের হাতে কিন্তু বিশেষ সময় নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীনা। আর যাই হোক, এদের হাতে নোকটাকে মরতে দেওয়া যায় না।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, বলব না।

মিস লীনা, তুমি ববি রায়ের প্রেমে পড়োনি তো? তোমাকে দেখে তত বোকা কিন্তু মনে হয় না।

আবার ঝাঁ ঝা করে উঠল লীনার নাক মুখ কান। রক্তোচ্ছাসে ভেসে যেতে লাগল শরীর। সে চোখ বুজল। দাঁতে দাঁত চাপল। তারপর বলল, না।

তা হলে ববির প্রতি তুমি এত দুর্বল কেন? আমি তো তোমাকে বলেছি যে, ববি একজন চোর, গুন্ডা, তার কোনও নীতিবোধ নেই, সে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, জানি না কেন। তবে বলব না।

মিস লীনা, আমি অকারণে কঠোর হতে চাই না। আমরা মরিয়া মানুষ, তোমার সাহায্য চাইছি।

লীনা লোকটার দিকে তাকাল। দার্শনিকের মতো ভাবাল ও সুন্দর মুখশ্রী-বিশিষ্ট এই বিদেশিকে তার খারাপ লাগছিল না। ভদ্র, নম্র কণ্ঠস্বর, চোখের চাউনিতে কিছু ধূসরতা। কিন্তু এটাও ওর সত্য। পরিচয় নয়। ছদ্ম-দার্শনিকতার অভ্যন্তরে কোনো রয়েছে ভাড়াটে সৈন্যের উদাসীন হননেচ্ছা। মানুষ মারা বা মশা মারার মধ্যে কোনও তফাত নেই এর কাছে।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না।

মিস লীনা বিশ্বাস করো, আমাদের হাতে সত্যিই সময় নেই।

আমি বলব না।

মিস লীনা, আর একবার ভাবো।

না, না, না—

তা হলে দুঃখের সঙ্গে তোমাকে কিন্তু পশুর হাতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তারা পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে। নারীমাংসলোভী, কামুক, বর্বর।

লীনা আপাদমস্তক শিউরে উঠে বলল, না—

উপায় নেই মিস লীনা। মুখ তোমাকে খুলতেই হবে।

লোকটা একটা বেল টিপল। আর মুহূর্তের মধ্যে সেই লাল গেঞ্জি পরা লোকটা এসে লীনার পাশে দাঁড়াল। তারপর লীনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তাকে একটা ডল পুতুলের মতো তুলে নিল দু'হাতে।

লীনা আর্ত চিৎকার করল বটে কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। এরকম প্রকাণ্ড মানুষ সে জীবনেও দেখেনি। কোনও মানুষের শরীরে যে এরকম সাংঘাতিক জোর থাকতে পারে তাও সে কখনও কল্পনা করেনি।

লোকটা তাকে একটা ঘরে এনে ছেড়ে দিল। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর একটা মাট পাতা। ছ'জন দানবীয় চেহারার লোক শুধুমাত্র খাটো প্যান্ট পরে অপেক্ষা করছে ছ'টা টিনের চেয়ারে।

লোকটা লীনাকে কিছু বুঝতেই দিল না। চোখের পলকে তার কামিজ ছিঁড়ে ফেলল কাগজের মতো, ছিঁড়ে ফেলে দিল চুড়িদারের পায়জামা। শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরা লীনা উন্মাদের দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখল।

কী হবে? আমার কী হবে? কী করবে এরা?

ছ'টা লোক উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। লাল গেঞ্জিওয়ালা লোকটা লীনার কানের কাছে শাস ফেলে বলল, আমি হোমোসেক্সুয়াল না হলে...

পিঠে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল লীনা। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই একটা প্রকাণ্ড হাঁটু চেপে বসল তার কোমরে। একটা হ্যাঁচকা টানে উড়ে গেল ব্রা।

লীনা চেঁচিয়ে উঠল, বলছি! বলছি! প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দাও।

হয়তো তবু ছাড়ত না। এদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু তো নেই। কিন্তু ঠিক এই সময়ে দার্শনিক লোকটা এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। একটা হাত ওপরে তুলে বলল, ড্রেস হার।

লোকগুলো কলের পুতুলের মতো সরে গেল আবার। ছেঁড়া পোশাকটাই কুড়িয়ে নিল লীনা। দু'চোখে অবিরল অশ্রু বিসর্জন করতে করতে, ফুঁসতে ফুঁসতে সে পোশাক পরল।

চলো, মিস লীনা। সময় নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রকাণ্ড পন্টিয়াকটা লীনার নির্দেশমতো ছুটতে শুরু করল। উন্মাদের মতো গতিবেগ। লীনার দু'ধারে এবার দুজন। সেই দার্শনিক আর লাল

গেঞ্জি। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে সেই দু’জন, যারা তাকে ধরে এনেছে।

বোম্বে রোড ধরে কতটা যেতে হবে তা কম্পিউটারের বাণী উদ্ধৃত করে বলে গেল লীনা। পাকা ড্রাইভার সুনির্দিষ্ট একটা জায়গায় এসে বাঁ ধারে একটা ভাঙা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চারদিকে গাছপালা, লোকালয়হীন পোভড়া জায়গা।

দার্শনিক খুনি হঠাৎ বলে উঠল, ওই তো!

সামনে একটা বাগানঘেরা বাড়ি। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপর বৈদ্যুতিক তারের বেড়া। ফটকে অটো-লক।

গাড়ি ফটকের সামনে থামতে দার্শনিক লোকটা নামল। ফটকটা দেখে নিয়ে একটু চিন্তিত মুখে গাড়িতে ফিরে এসে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে অতিশয় দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল।

লাল গেঞ্জি নেমে লাগেজ বুট খুলে একটা অ্যাটাচি কেস বের করে আনল। লীনা গাড়িতে বসেই দেখল, দার্শনিক লোকটা অ্যাটাচি খুলে ছোটখাটো নানা যন্ত্রপাতি বের করে ফটকের ওপর কী একটু কারসাজি করল। একটু বাদেই ফটক খুলে গেল হাঁ হয়ে।

খুব ধীরে ধীরে গাড়িটা ঢুকে পড়ল বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে। ফটকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

তারপর যা ঘটল তা সাধারণত মিলিটারি অপারেশনেই দেখা যায়। অত্যন্ত তৎপর লোকগুলো চটপট কয়েকটা সাব-মেশিনগান নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল প্রস্তুত হয়ে।

দার্শনিক লোকটা গাড়ির দরজা খুলে বলল, এসো মিস লীনা।

মানসিক বিপর্যয়টা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি লীনা। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। এই নারীজন্মকে সে ধিক্কার দিচ্ছিল মনে মনে। সে মরতে ভয় পেত না, কিন্তু যে শাস্তি তাকে দিতে চেয়েছিল তা যে মৃত্যুরও অধিক। শুধু মেয়ে বলেই এরা তাকে এভাবে ভেঙে ফেলতে পারল। নইলে পারত না।

লীনা টলমলে পায়ে নামল। চারদিকে পরিষ্কার রোদ। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। শান্ত, নির্জন, নিরীহ পরিবেশ। কিন্তু একটু বাদেই এখানে ঘটবে রক্তপাত, বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে বারুদের গন্ধ..

বাড়ির সদর দরজাটাই বিচিত্র। একটি ইস্পাতের মোটা পাত আর তার গায়ে একটা স্লট। কয়েকটা অত্যন্ত খুদে আলপিনের মাথার মতো বোতাম রয়েছে স্লটের নীচে।

মিস লীনা, এটা একটা ইলেকট্রনিক দরজা। তুমি কি কোড জানো?

না। আমি আর কিছু জানি না।

জানো মিস লীনা। তুমি কয়েকটা কোড জানো। এই যে পিনহেড দেখছ এটাতে কোড ফিড করা যায়। বলো মিস লীনা।

লীনা অসহায়ভাবে চারদিকে একবার তাকাল। তারপর কে জানে কেন তার চোখ ভরে জল এল। চোখ বুজে ফেলতেই নেমে এল সেই অশ্রুর ধারা। সে চাপা স্বরে শুধু একটাই কোড উচ্চারণ করল, আই লাভ ইউ।

লোকটা দ্রুত হাতে বোতাম টিপে গেল একটার পর একটা।

আশ্চর্যের বিষয় স্টিলের দরজাটা নিঃশব্দে বলবিয়ারিং-এর খাঁজের ওপর দিয়ে সরে গেল।

এসো মিস লীনা। তুমি আরও কোড জানো। এখানে সব কোডই কাজে লাগবে।

লীনা ঘরে ঢুকল। প্রথম ঘরটায় অন্তত চারটে ভিডিয়ো ইউনিট। তার সামনে রয়েছে চাবির বোর্ড। কিন্তু কেউ নেই কোথাও।

লোকটা লীনার দিকে চেয়ে বলল, ভেরি আপটুডেট, ভেরি সফিস্টিকেটেড।

কী?

তুমি সুপার কম্পিউটারের কথা জানো?

শুনেছি।

এ সব হল তারই কাছাকাছি জিনিস। ববি ইজ এ জিনিয়াস। কিন্তু জিনিয়াস যদি বিপথগামী হয় তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

তোমরা ববিকে মারবে কেন? তোমরা নীল মঞ্জিল ভেঙে দাও, কিন্তু ওকে মারবে কেন?

ওকে মারতেই হবে মিস লীনা। ওকে মারার জন্য আমি সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছি।

কিন্তু কেন?

কারণ, ববির মৃত্যু চায় পৃথিবীর কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্র। আমি তাদের প্রতিনিধি মাত্র।

শোনো, ববির অনেক দোষ জানি। কিন্তু কাউকে মেরে ফেলা কি ভাল?

মিস লীনা, তুমি ববির প্রেমে পড়োনি তো?

না, না, কখনওই নয়।

বলল লীনা। তবু কেন যে তার মুখ চোখ কান সব ফের আঁ আঁ করে উঠল। কেন যে রক্তের স্রোত পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে লাগল ধমনীতে ধমনীতে।

সেগুন গাছ তুমি চেনো ইন্দ্রজিৎ?

সেগুন! সে আর শক্ত কী? চেনো? বাঃ, বলো তো ওই গাছটা কী গাছ?

অফকোর্স সেগুন।

বাঃ, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেন জানো ইন্দ্রজিৎ? এ দেশে গাড়লেরাই উন্নতি করে, বুদ্ধিমানেরা মার খায়।

তা বটে স্যার, কিন্তু আমি তেমন নিরেট গাড়ল নই। আমার মনে হচ্ছে গাছ নিয়ে আপনার কিছু ভাব এসেছে। কবিতা লেখার পক্ষে অবশ্য সেগুন বেশ জুতসই

শব্দ। বেগুন দিয়ে মেলে, লেগুন দিয়ে মেলে।

তবু এ গাছটা সেগুন নয়, শাল।

স্যার, এই অসময়ে আপনি আমাকে বটানি বোঝাচ্ছেন কেন?

বটানি নয়, স্ট্র্যাটেজি। যতদূর অনুমান, শত্রুপক্ষ নীল মঞ্জিল পেনিট্রেট করেছে এবং কয়েকটা সাব-মেশিনগান আমাদের স্বাগতম জানাতে প্রস্তুত। সুতরাং ঢোকার আগে শত্রুপক্ষের অবস্থান জেনে নেওয়া ভাল। তুমি গাছ বাইতে পারো ইন্দ্রজিৎ?

আমি স্যার, কলকাতার ছেলে, গাছ পাব কোথায় যে বাইব?

তাও বটে। তা হলে গাড়িতেই বসে থাকো। আমি ওই সেগুন গাছটায় একটু উঠব। কিন্তু গ্লাসটা দাও তো।

ববি দূরবিনটা বুকে ঝুলিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাস্তার পাশে দাড় করানো ভোক্সওয়াগনটায় চুপ করে বসে রইল ইন্দ্রজিৎ। যেদিকে ববি গেলেন সেদিকে প্রায় নির্নিমেষ চেয়ে রইল সে।

হঠাৎ তার মনে হল ওপর থেকে ঝপ করে জঙ্গলের মধ্যে কী একটা পড়ে গেল। সম্ভবত ববির দূরবিন। ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে জিনিসটার কাছে ছুটে গেল। ঘন বুক সমান ঘাসের মধ্যে অবশ্য কিছু দেখতে পেল না। তাই ওপর দিকে তাকিয়ে চাপা জরুরি গলায় ডাকল, স্যার! স্যার! আপনার দূরবিনটা যে পড়ে গেছে, সেটা টের পেয়েছেন?

ববিকে সে ডালপালার ফাঁক দিয়ে আবছা ভাবে দেখতেও পাচ্ছে। লোকটা ওপরে উঠছে। খুব বেশিদূর ওঠেনি। দুরবিনটা নিয়ে না গেলে লোকটা কিছুই দেখতে পাবে না ওপর থেকে।

সে আবার ডাকল, স্যার! স্যার! থামুন। আপনি ভুল করছেন।

ববি থামলেন। তারপর ডালপালার কিছু শব্দ হল। উৎকণ্ঠিত উর্ধ্বমুখ ইন্দ্রজিৎ সহসা দেখতে পেল, একটা কেঁদো মদ্দা হনুমান তার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ সভয়ে বলল, সরি স্যার। থুড়ি, শুধু সরি।

হনুমানটা একটু দাঁত খিচিয়ে আবার গাছে উঠতে লাগল। ঘাস জঙ্গলের মধ্যে একটা শুকনো ডাল খুঁজে পেল ইন্দ্রজিৎ। দুরবিন নয়, হোঁতকা হনুমানটার চাপে ডালটা ভেঙে পড়েছিল।

ইন্দ্রজিতের অনুমান ভুল হল বটে, কিন্তু খুব বেশি ভুল নয়। কারণ মদ্দা হনুমানটা জীবনে এমন প্রতিদ্বন্দ্বী আর দেখেনি। ফুট বিশেক ওপরে ওঠার পর সে পাশের সেগুন গাছে হুবহু তারই মতো দ্রুত ও অনায়াস ভঙ্গিতে আর-একজনকেও গাছ বাইতে দেখল। এবং আশ্চর্যের কথা, প্রতিদ্বন্দ্বী হনুমান নয়, মানুষ। এবং আরও আশ্চর্যের কথা, লোকটা বিড় বিড় করে বলছিল, নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরবে… ওঃ বাবা কিছুতেই তাকাব না।

বাস্তবিকই ববির প্রচণ্ড ভার্টিগো। দোতলা থেকেও ববি নীচের দিকে তাকাতে পারেন না।

দুরদর্শী রবীশ পঁচিশ ফুট ওপরে সেগুন গাছের তিনটি মজবুত ডাল জুড়ে একটি মাচান বেঁধেছিলেন। সম্পূর্ণ আড়াল করা চমৎকার ওয়াচ টাওয়ার। এখানে বসে বাড়িটা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

ভার্টিগোয় আক্রান্ত ববি প্রায় চোখ বুজে মাচানের ওপর উঠে এলেন। হাঁফটাফ তার সহজে ধরে। কিন্তু কালকের ওই অমানুষিক মারের ব্যথা এখনও দাঁত বসিয়ে আছে সর্বাঙ্গের কালশিটেয়। ববি মাচানে বসে প্রথমেই পকেট থেকে সিরিঞ্জ আর একটা পেথিডিনের অ্যাম্পুল বার করলেন। তারপর বাঁ হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধটা চালিয়ে দিলেন ভিতরে। এখন ব্যথাটাকে না মারলে তিনি যুঝতে পারবেন না, অবশ্য যদি লড়াইটা’ইতিমধ্যে হেরে না গিয়ে থাকেন।

দুরবিনটা চোখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন ববি। তার অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবীক্ষণেও শুধু একটা মস্ত পন্টিয়াক গাড়ি ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। ববি তাড়াহুড়ো করলেন না। ওত পেতে বসে রইলেন। যদিও সময় বয়ে যাচ্ছে তবু অন্য উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পর একটা ঝোপের আড়াল থেকে একজনকে বেরিয়ে আর-একটা ঝোপের আড়ালে যেতে দেখতে পেলেন ববি। তারপর একটা পেয়ারা গাছের

ডালে আর একজনকে আবিষ্কার করা গেল। ছাদের রেলিং-এর আড়ালে আর-একজন। চতুর্থজন ফটকের পাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়ানো। প্রত্যেকের হাতেই উজি সাব-মেশিনগান। আর কাউকে দেখা গেল না। একটা পন্টিয়াক গাড়িতে এর বেশি লোক আনা সম্ভবও নয়। পঞ্চম জন নিশ্চয়ই লীনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

ববি প্রায় চোখ বুজে নেমে এলেন।

ইন্দ্রজিৎ!

স্যার, এসে গেছেন তা হলে? আমি ভাবছিলাম আপনি টারজানের মতো লতা ধরে ঝুল খেয়ে অলরেডি ভিতরে পৌঁছে গেলেন বুঝি!

শোনো ইন্দ্রজিৎ, চার-চারটে সাব-মেশিনগানকে এড়ানো বিশেষ রকমের শক্ত কাজ।

ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বলল, বিশেষ বিপজ্জনকও।

আমাদের গাড়িটা অবশ্য সম্পূর্ণ বুলেটপ্রুফ। আমরা ইচ্ছে করলে ওদের অগ্রাহ্য করে ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু ওরা গুলি চালালে যে লোকটা লীনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সে সতর্ক হয়ে যাবে। সে লীনাকে তখন ব্যবহার করবে হোস্টেজ হিসেবে।

তা হলে কী করবেন স্যার?

আমি ভাবছি, কী করে শব্দটা এড়ানো যায়। একটিও গুলির শব্দ হলে চলবে না।

না স্যার, গুলি জিনিসটা ভালও নয়।

তুমি টারজানের কথা বলছিলে না?

বলেছিলাম স্যার, তবে উইথড্র করে নিচ্ছি।

উঁহু, উইথড্র করার কিছু নেই। টারজানের মতো ঢুকে লাভ নেই। আমাদের ঢুকতে হবে ইঁদুরের মতো। বাড়ির পিছন দিকে একটা নালা আছে। বড় নর্দমা, এসো, ওটা দিয়েই ঢুকতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ গাড়ি থেকে নামল। বলল, আপনার সঙ্গে কাজকারবার করা মানেই প্রাণ হাতে করে চলা। আমার বউ থাকলে আজই বিধবা হত।

না, ইন্দ্রজিৎ তোমার বউ চিরকুমারীই থেকে যাবে। এসো। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই।

নর্দমা দিয়ে যে আমি কখনও কোথাও ঢুকিনি স্যার।

প্রয়োজনে ডিটেকটিভদের ছুঁচের ফুটো দিয়েও ঢুকতে হয়। গর্দভ, এটা নোংরা নর্দমা নয়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছিল। বাড়ির পিছন দিকটায় অসমান জংলা জমি। কাঁটাঝোপ। বিছুটি বন। ভারী নির্জন। গাঁয়ের গোরুরাও এদিকে চরতে আসে না।

বাড়ির পিছন দিকে এসে একটা বুক সমান ঘাসজঙ্গলে ঢুকলেন ববি। পিছনে ইন্দ্রজিৎ। নর্দমার মুখটা জঙ্গলে একরকম ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ববি হিপ পকেট থেকে একটা ভাজকরা ছুরি বের করে ঝপাঝপ কিছু ঘাস কেটে মুখটা পরিষ্কার করলেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল, কিন্তু স্যার, নর্দমার মুখে যে শিক লাগান। ঢুকবেন কী করে?

ববি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোটের পকেট থেকে ছোট্ট প্লায়ারের মতো একটা যন্ত্র বের করলেন। জং ধরা শিক সেই যন্ত্রের দাঁতে চোখের পলকে কুড়ুক ফড়ুক করে কেটে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে ববি ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে ইন্দ্রজিৎ।

সামনে বিস্তর ঝোপঝাড়ের দুর্ভেদ্য আড়াল। ববি তারই ফাঁক দিয়ে সামনেটা নিরীক্ষণ করে নিলেন! চাপা গলায় বললেন, ইন্দ্রজিৎ, পিছনের দিকে দু'ধারে দু'জন পাহারা দিচ্ছে। একজনকে আমি কাবু করতে পারব। অন্যজনকে তুমি পারবে?

না স্যার। এমন ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো বলছেন, যেন কাজটা একেবারে জলভাত।

তুমি কি কাওয়ার্ড ইন্দ্রজিৎ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সাব-মেশিনগানওয়ালা লোকের সঙ্গে খালি হাতে পাল্লা টানতে গেলে আমি চূড়ান্ত কাওয়ার্ড।

ববি সামান্য ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে লোকদুটোকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ, এই সুযোগ। একজন রাউন্ড দিতে আড়ালে গেল।

দেখতে পাচ্ছি স্যার। কিন্তু–

ববি ব্যস্ত গলায় বললেন, শোনো ইন্দ্রজিৎ, এই বাগানে ইলেকট্রনিক বার্গলার অ্যালার্মের তার পাতা আছে। কোনও তার ছুঁয়ো না। সাবধান।

ববি ঘাসজঙ্গলে ডুব দিলেন। আর তারপর ইন্দ্রজিৎ শুধু বাতাসের হিলিবিলির মতো একটা ঢেউ দেখতে পেল তৃণভূমিতে। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন ববি। লোকটার এই অন্যায্য সাহস দেখে ইন্দ্রজিৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অস্ত্রধারী লোকটা তার দিকে তাকাল।

ইন্দ্রজিৎ নড়বার আগেই কুইক-ফায়ার অস্ত্রটিতে ঝাঝরা ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারত। লোকটা সাব-মেশিনগানটা তুলেও ছিল। কিন্তু তারও আগে ঝোপের আড়াল থেকে একটা বাজপাখি যেন উড়ে গেল লোকটার দিকে।

কী হল, তা বুঝতেও পারল না ইন্দ্রজিৎ। শুধু দেখল, অস্ত্রধারী চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে এবং ববি তাকে টেনে ঘাসজঙ্গলের দিকে নিয়ে আসছেন।

দ্বিতীয় পাহারাদারকে ববি নিলেন অত্যন্ত গাঁইয়ার মতো। লোকটা রাউন্ড সেরে ফিরে আসছিল। ববি ঝোপের আড়াল থেকে হাত তুললেন। হাতে একখানা আধলা ইট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভীষিকা ফাস্ট বোলারের মতোই ইটখানাকে ছুড়লেন ববি। লোকটার কপালটা কেটে হাঁ হয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে শান্ত হয়ে গেল লোকটা। ববি তাকেও ঘাসজঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে ডাকলেন। ‘

আপনি স্যার, অমিতাভ বচ্চন ধর্মেন্দ্র আর মিঠুনের ককটেল।

তারা কারা?

আমাদের ন্যাশানাল হিরো।

তাই নাকি?

আপনার মধ্যে একটু বুস লি-রও টাচ আছে।

ধন্যবাদ। এখন চলল। আরও দুটোকে ম্যানেজ করতে হবে। তাদের মধ্যে একটা আস্ত একখানা গরিলা।

আপনি আগে চলুন স্যার। একটা কথা। দুটো সাব-মেশিনগানের একটা কি আমি নিতে পারি?

ভয় পাচ্ছ ইন্দ্রজিৎ?

স্যার, আপনাকে সম্মান দিচ্ছি। সাব-মেশিনগান তুমি স্পর্শ করবে না। ওসব ভদ্রলোকের অস্ত্র নয়। এসো। ববি ধীরে ধীরে এগোলেন। দেয়াল ঘেঁষে।

যে লোকটার চেহারা সত্যিই গরিলার মতো, সে দু'খানা থামের মত পা দু'দিকে ছড়িয়ে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়ানো।

ববি হঠাৎ অনুচ্চ একটি শিস দিলেন। লোকটা বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াল। তারপর অবিকল একই দ্রুততায় তুলল তার অস্ত্র।

ববির অস্ত্র নেই কিন্তু তিনি নিজেই এক অস্ত্র। প্রথম একখানা আধলা ইট মারলেন ববি। তারপর শরীরটিকে কুণ্ডলীকৃত স্প্রিং-এর মতোই তিনি পাক খাইয়ে ছুড়ে দিলেন। এবং সোজা গিয়ে পড়লেন লোকটার বিশাল বুকের ওপর।

জীবনে এরকম অসম লড়াই দেখেনি ইন্দ্রজিৎ। বেশ লিলিপুটের সঙ্গে বডিংন্যাগের লড়াই। কিন্তু কে দানব এবং কে বামন, তা লড়াই দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, ববি লোকটার ঘাড় এক হাতে ধরে অন্য হাতে তাকে ঠেলে বৃত্তাকারে দৌড় করাচ্ছেন নিজের চারধারে। এ দৃশ্য পঞ্চাশ টাকা টিকিট কেটেও দেখা যাবে না। ইন্দ্রজিৎ প্রাণভরে দেখতে লাগল।

তারপর ববি লোকটাকে হঠাৎ ছেড়ে দিলেন। লোকটা কেমন যেন টলতে লাগল। ববি এরপর লড়াইটা শেষ করলেন থুতনিতে খুব সযত্ন-রচিত একখানা ঘুসি মেরে। দানবটা ভূমিশয্যা নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ছিল। ঘুসিখানা খেয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে উপুড় হয়ে আউট হল।

ববি ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ছাদে আর একজন আছে। কিন্তু আপাতত তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। নাউ, এন্টার দা ড্রাগন।

এ বাড়িতে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য একটা গর্ভগৃহ ছিলই। সেই পাতাল-ঘরটিকে একটি সুপ্রসর মনিটারিং কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন রবীশ। অত্যন্ত সুরক্ষিত, অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর। অন্তত পঞ্চাশটা টার্মিনাল। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির একটি জটিল ধাঁধা।

টার্মিনালগুলির সামনে বসে আছে লোকটা। একটার পর একটা চাবি টিপছে, নব ঘোরাচ্ছে, আর ভিডিয়োতে ভেসে উঠছে নানা ছবি। শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর। নানা রঙের প্যাটার্ন ফুটে উঠছে ভিডিয়ো ইউনিটগুলিতে। অকস্মাৎ দৃশ্যমান হল একটা বিপুলায়তন গিরিখাত। দ্রুত সরে গেল। দেখা গেল অস্পষ্ট একটা ভূখণ্ড। লোকটা একটা চাবি টিপতেই ছবিটা স্থির হল। ফের একটা কলকাঠি নাড়তেই ছবিটা দ্রুত জুম করে এগিয়ে এল। তারপর অত্যন্ত খুঁটিনাটি সব জিনিস দেখা যেতে লাগল। একটা মস্ত গম্বুজওয়ালা বাড়ি, চারদিকে শস্যক্ষেত্র।

লোকটা ফিরে তাকাল লীনার দিকে। তারপর গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল, মাই গড!

লীনা সভয়ে চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

লোকটার চোখে পাগলের মতো দৃষ্টি। সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে সে বলল, দে হ্যাভ পেনিট্রেটেড দা স্যাটেলাইটস!

লীনা এর জবাবে কী বলতে পারে? বিশেষত তাকে তো কোনও প্রশ্নও করা হয়নি।

লোকটা স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, মার্কিন এবং রুশ স্যাটেলাইটগুলো যা দেখছে তার সবই হুবহু ফুটে উঠছে টার্মিনালে! এ কি বিশ্বাসযোগ্য? মিস লীনা, ববি রায়ের আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। আই প্রোনাউন্স হিম গিল্টি অফ ইন্টারন্যাশনাল এসপিয়োনেজ, ডাবল এজেন্টিং অ্যান্ড ব্রিচ অফ ফেইথ। হিজ ওনলি পানিশমেন্ট ইজ ডেথ…

জল্লাদের কাজটা কি তুমিই করবে?

ঘরে বজ্রপাত হলেও এর চেয়ে বেশি চমকাত না লীনা। ইস্পাতের দরজাটা আধো খোলা। দরজায় ববি। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে মুখোমুখি তাকাল ববির দিকে।

ববি রায়।

হ্যাঁ।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তুমি ববি রায় নও। আমি হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখছি।

দেখছ। ববি রায় তো দুঃস্বপ্নই। তুমি একটু আগেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ, আমি সেটা শুনেছি। তোমার পিছনে কারা আছে এবং তুমিই বা কে?

লোকটা মুখে কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তার ডান হাতখানা আকস্মিকভাবে ওপরে উঠল এবং একটি বিদ্যুৎশিখার মতো কিছু ছুটে গেল হাত থেকে।

ববি প্রিং-এর পুতুলের মতো মেঝেয় বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এরকমভাবে কোনও মানুষের শরীর যে ক্রিয়া করতে পারে, তা জানা ছিল না লীনার। লোকটা কি আসলে মানুষ নয়? রোবট?

ফ্লাইং নাইফটা স্টিলের দরজায় লেগে খটাস করে মেঝেয় পড়ল।

ববি অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, যাকে মারার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়, তাকে মারতে পারাটাও কঠিন কাজ।

লোকটা সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্তের মতো ববি দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানতাম তুমি বিপজ্জনক। পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি হাইটের ববি রায় যে ধুরন্ধর লোক তা আমাকে জানানো হয়েছে। মিস্টার রায়, বাইরে আমার চারজন সশস্ত্র পাহারাদার ছিল, তাদের চোখ তুমি এড়ালে কী করে?

ববি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চোখ এড়াব সেরকম কপাল করে কি আমি জন্মেছি? আমি ততটা ভাগ্যবান নই। চারজনের মধ্যে তিনজনের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে।

লোকটা হাঁ করে চেয়ে রইল ববির দিকে। তারপর বলল, কিন্তু জোয়েল? ওই দানব যে হেভিওয়েট বক্সার!

ববি মাথা নাড়লেন, দুঃখিত। একজন হেভিওয়েট বক্সারকে এতটা অপমান করা আমার ঠিক হয়নি।

লোকটা মাথা নাড়ল, বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না। এর মধ্যে কোনও একটা চালাকি আছে।

বলতে বলতে লোকটা ঠেলে রিভলভিং চেয়ারটা সরিয়ে দিল।

ববি, আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি। আর খুন আমাকে করতেই হবে… আমি জন দি টেরর।

ববি নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠান্ডা গলাতেই বললেন, আমি তোমাকে চিনি ডার্টি জন। মানবসমাজের পক্ষে তুমি এক নোংরা আবর্জনা। তুমি প্রতিভাবান খুনি ছাড়া আর কিছু নও।

জন খুব ধীরে এগিয়ে গেল।

ততোধিক ধীরে ববি এগোলেন। ববি জানেন, জন আর পাঁচজনের মতো নয়। শরীর ও মনের ওপর তারও নিয়ন্ত্রণ সাংঘাতিক। মানুষ তখনই লড়াই জেতে যখন শরীর ও মন দুইকেই সে একত্রিত করতে পারে। তখন নিজেই সে এক ভয়াবহ অস্ত্র। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অজেয়। ইন আর ইয়ান। ইয়ান আর ইন।

লীনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, শুনুন বস। প্লিজ। আপনাকে ও মেরে ফেলবে।

ক্ষুরধার নিষ্পলক চোখে ববি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনি ঘরের বাইরে যান। ইন্দ্রজিৎ আপনাকে ওপরে নিয়ে যাবে।

আমি আপনাকে মরতে দিতে পারি না।

আমি অমর।

কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে লীনা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। একটু বাদে বুঝল, পরিসর তৈরি করার জন্য জন তাকে সরিয়ে দিয়েছে মাত্র।

ববি ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। জন তার কারাটে কিকটি চালিয়ে দিল ববির কোমরে।

বেড়ালের মতো শুন্যে লাফিয়ে উঠলেন ববি। আর মাটিতে পড়ার আগেই পা বিদ্যুতের বেগে নেমে এল জনের মুখে।

কিন্তু জন অন্তত চার ফুট বাঁয়ে সরে গেছে ততক্ষণে। ববি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার হাতের কানার কোপটি বসাল ববির ঘাড়ে।

কী চমৎকার ভারসাম্য লোকটার শরীরে! ববি একটা ডিগবাজি খেয়ে চলে গেলেন পিছনে।

১৮. ক্ষতবিক্ষত শরীরে ববি

ক্ষতবিক্ষত শরীরে ববি অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে শারীরিক ও মানসিক লড়াই চালিয়েছেন। প্রতিপক্ষদের মধ্যে বিবেকহীন দৈত্য ও পেশাদার খুনির সংখ্যাই প্রবল। এতক্ষণ যে বেঁচে আছেন ববি, তা কেবল দৈবের বশে। কিন্তু আস্তে আস্তে ববির ক্ষতমুখগুলি বিষিয়ে উঠছে। কেটে যাচ্ছে ওষুধের ক্রিয়া। ববির রিফ্লেক্স ভাল কাজ করছে না। চোখে মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখছেন।

প্রতিপক্ষ শুধু প্রবলই নয়, এ পর্যন্ত সর্বোত্তম। লড়াইটা জেতা ববির পক্ষে সাংঘাতিক প্রয়োজন। সুস্থ থাকলে কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন ববির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন বাড়তি জল ঢুকে পড়েছে। হাত তুলতে, পা তুলতে দেড়গুণ-দ্বিগুণ সময় লাগছে। পিঠ থেকে একটা ব্যথা উরু অবধি অবশ করে দিচ্ছে। মাথার ভিতরে প্রবল যন্ত্রণা। আর এ লড়াই লড়তে হচ্ছে শূন্যে লাফিয়ে, জমিতে পড়ে, শরীরে চূড়ান্ত ভারসাম্যের ওপর। এক চুল, এক পলের এদিক ওদিক হলেই একটি হাই পাওয়ার কিক বা কারাটে চপ খেয়ে চোখ ওলটাতে হবে।

প্রায় পনেরো মিনিট কেউ কাউকে ছুঁতে পারল না। লড়াই রইল সমান-সমান। কিন্তু আসলে সমান-সমান নয়। ববি যে আস্তে আস্তে নিজের শরীরের কাছে হার মানছেন তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন। আর সেটা বুঝতে পারছিল তার বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষও। ট্রাংক কল-এ সে জানতে পেবেছে ববি ওয়্যারহাউসে কী পরিমাণ পিটুনি গ্রহণ করেছেন তার শরীরে। সারা রাত ঘুম বলতে গেলে হয়নি। প্রতিপক্ষ এয়ারপোর্টের ঘটনাও জানে। সে জানে, ববিকে এই বাড়ির ভূগর্ভের ঘরে আসতে তিন-তিনটে সাব-মেশিনগানধারী গুন্ডার মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার মধ্যে একজন হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা। সুতরাং লোকটা ববিকে যতখানি পারে পরিশ্রান্ত করে তুলছিল। লোকটার নিজের রিফ্লেক্স চমৎকার। নড়াচড়া বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন। তাই আহত পরিশ্রান্ত ববিকে সে আক্রমণের পর আক্রমণ রচনা করতে দিয়ে নিজেকে বারবার চকিতে সরিয়ে নিচ্ছিল।

ববি বুঝলেন, এভাবে পারা যাবে না। লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ববি হঠাৎ বৃত্তটা ভেঙে এবং এ লড়াইয়ের নিয়মের তোয়াক্কা না করে আচমকাই সোজা সরল পথে লোকটার কোমর লক্ষ করে জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়লেন।

চমৎকার হালকা ও চকিত লাফ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই আকস্মিক দিক পরিবর্তনের ফলে লোকটা দিশাহারা হয়ে যেত। নিশ্চিত পরাজয় লেখা ছিল তার কপালে।

কিন্তু ভাগ্য মন্দ ববির। লোকটা ববির ওই বিভীষণ আক্রমণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল চিতাবাঘের তৎপরতায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত এক খোলা হাতের কোপ বসিয়ে দিল ববির মাথায়। হাতের কানার সেই দুর্দান্ত মার ববির মাথার খুলিতে ফেটে পড়ল। ববির চোখের সামনে সহসা ফুলঝুরির মতো আলোর বিন্দু নাচতে লাগল। অসাড় অবসন্ন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে ববিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে দেখল। তারপর মুখ তুলে লীনার দিকে চাইল। ফিসফিস করে বলল, এ লোকটা মানুষ না অতিমানুষ তা কি তুমি জানো মিস লীনা?

লীনা অরুদ্ধ স্বরে বলল, মানুষ। একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তুমি জানো না। তুমি জানো না এ লোকটা বম্বেতে আমার গ্যাং-এর হাতে ধরা পড়ার পর যে মার খেয়েছে তা দশটা লোককে ভাগ করে দিলেও তারা বোধহয় সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না। এ লোকটা আহত অবস্থায় আমার দু'জন অত্যন্ত শক্ত সমর্থ লোককে ঘায়েল করে পালায়। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এ লোকটা আমার তিনজন সশস্ত্র সঙ্গীকে হারিয়ে এবং সম্ভবত অজ্ঞান বা হত্যা করে আমার পিছু নিয়েছে। তিনজনের মধ্যে একজন যে হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা তা তার চেহারা দেখে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। এর পরেও যেভাবে আমার সঙ্গে লড়ছিল তাতে যে-কোনও সময়ে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। এ লোকটা মানুষ নয়, মিস লীনা।

লীনা কোনও জবাব দিল না। টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে থরথর করে কাঁপছিল। এই ভীষণ পুরুষালি জীবন-মরণ লড়াই সে তো জন্মেও দেখেনি। এত হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর কিছু তার অভিজ্ঞতায় নেই। তার অস্তিত্ব আজ নাড়া খেয়ে গেছে ভীষণ।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের চারদিকে কী যেন একটু খুঁজল আপনমনে। লীনার দিকে দৃকপাতও করল না। কিন্তু লীনা তাকে লক্ষ করছিল। লোকটা দেয়ালে একটু উঁচুতে ডিং মেরে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কী যেন একটা অনুভব করল। লীনা লক্ষ করল, দেয়ালের গায়ে একটা লাল বোতাম।

লোকটা নিচু হয়ে মেঝের ওপর কিছু খুঁজল। তারপর একটা হাতলের মতো জিনিস ধরে টানতেই ম্যানহোলের ঢাকনার মতো একটা চৌকো ঢাকনা খুলে এল। লোকটা একটা টর্চ বের করে ভিতরটা দেখে নিল। নামল না। ঢাকনাটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে ভিডিয়োগুলো সব অফ করে দিল।

লীনা ধীরে ধীরে ববির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। নাড়ি চলছে। একটু ক্ষীণ। শ্বসটা যেন অনিয়মিত।

লোকটা লীনার দিকে ফিরে বলল, মিস লীনা, কোনও মহিলার সামনে তার ভালবাসার লোককে আমি খুন করতে চাই না।

লীনা জলভরা চোখ তুলল। চারদিকটা যেন ভাঙাচোরা। লোকটা যেন আবছা এক সিল্যুট।

লোকটা বলল, কিন্তু এই কাজটা করার জন্যই আমাকে কয়েক হাজার মাইল আসতে হয়েছে। আর এ কাজটায় ইনভলভড় লক্ষ লক্ষ টাকা। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ববির মতো বিশাল মানুষের মৃত্যুও হবে মহান। ওই যে দেয়ালে লাল বোতামটা দেখছ ওটা হল এই বাড়ির সুইসাইড কোড। বোধহয় দুমিনিটের ফিউজ আছে। আমার মনে হয়, তুমি ওকে ছেড়ে পালাবে না। যেমন তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যেতে হবে মিস লীনা। ওই লাল বোতামটা টিপে দিলেই আমার মিশন শেষ।

লীনার লাল বোতামের কথা মনে পড়ল। তেমন বিপদ বুঝলে লীনাকেই বোতামটা টিপতে বলেছিলেন ববি রায় তাঁর চিঠিতে।

লীনা আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল, প্লিজ প্লিজ! আমাদের চলে যেতে দিন।

মিস লীনা, তুমি চলে যেতে পারো। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। ববিকে একা তার মহান মৃত্যু বরণ করতে দাও। সে তার নিজের সৃষ্টির সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চেয়ে সুন্দর আর কীই বা হতে পারে! আর তুমিও যদি ওর সঙ্গে সঙ্গে মহৎ হতে চাও তা হলে তো আমার কিছু করার। নেই।

মনুষ্যত্ব বলে কি কিছু নেই?

আছে মিস লীনা, আমি জানি আছে। কিন্তু আমাদের মতো মানুষ, যাদের বেঁচে থাকা মানেই প্রতি পদে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা, তাদের কাছে ও ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমরা মনুষ্যত্ব মানে বুঝি, হয় বাঁচো, না হয় মরো। তুমি বেশ ভাল মেয়ে লীনা, দেখতেও চমৎকার। এমন একটা সুন্দর মেয়ের এরকম পরিণতি আমি চাই না। কিন্তু কিছু করার নেই। গুড বাই…

লীনা কিছু বলার আগেই লোকটা চকিতে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে এক লাফে দরজায় পৌঁছেই চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল লীনা। এভাবে মরবে ববি? এরকমভাবে কি ওকে মরতে দেওয়া যায়? ওর কত ভুল যে শুধরে দেওয়ার আছে লীনার

ক'মিনিটের ফিউজ? লোকটা বলল, দু'মিনিট, ববিও সেরকমই যেন কিছু জানিয়েছিল তাকে। মাত্র দুমিনিট। লাল বোতামটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভে চলে গেছে সংকেত। যেখানে অপেক্ষারত এক শক্তিশালী বিস্ফোরক হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে উৎকর্ণ হয়েছে। তার কানে সংকেতটা পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্লু-উ-উ-ম-ম-ম্-ম্…

লীনা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হাতলটা খুঁজল। ওই ঢাকনার তলাতেই রয়েছে সেই উৎকর্ণ বিস্ফোরক। লীনাকে তা অকেজো করতেই হবে। হাতলটা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে। লীনা তার লম্বা নখ ঢুকিয়ে দিল খাঁজে। তারপর খুঁটে তুলবার চেষ্টা করল। নখটা উলটে গিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। লীনা গ্রাহ্যও করল না।

হাতলটা উঠে এল ঠিকই। কোলাপসিবল হাতল, মেঝেয় মিশে থাকে, বোঝাও যায় না। হাতলটা ধরে টানতেই ঢাকনাটা সরে এল। হালকা ফাইবারের তৈরি জিনিস, ভারী নয়। আলগা ঢাকনাটা তুলে দূরে ছুড়ে ফেলল লীনা। তারপর গর্তটার মধ্যে নেমে পড়ল।

ঠিক এ সময়ে একজোড়া পা দৌড়ে এল ঘরে।

মিস ভট্টাচারিয়া, আপনি কী করছেন?

লীনা লোকটার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, আপনি ববির বন্ধু না শত্রু?

বন্ধু, ভীষণ বন্ধু! আমি ইন্দ্রজিৎ সেন, প্রাইভেট আই।

তা হলে ছুরি কঁচি যা আছে দিন। ভীষণ দরকার।

এই যে নিন। ছুরি আমার সবসময়ে থাকে। শুধু রিভলভার…

লীনা যে গর্তে নামল তা মোটেই গভীর নয়। তার কাঁধ অবধি বড় জোর। নীচে একটা জটিল যন্ত্র। অনেক তার। অনেক স্ক্রু এবং বল্টু। কী করবে লীনা? সে পাগলের মতো একটার পর একটা তার কেটে ফেলতে লাগল ছুরি দিয়ে।

ঠিক পনেরো সেকেন্ডে ওপরে উঠে এল জন। দরজার বাইরে পা দিয়েই সে দেখল, বিশাল দানবটার সংজ্ঞা ফিরেছে। উঠে বসবার চেষ্টা করছে ঘাসের ওপর।

জন গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। সময় নেই। একদম সময় নেই।

দানবটা উঠে বসল। মাথায় হাত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল, সে কোথায় এবং তার কী হয়েছে। আর তখনই সে জনকে দেখতে পেল গাড়ির জানালায়।

জন! এই জন!

জন একটু ইতস্তত করল। তারপর কী ভেবে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিল।

জন! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

জনের সময় নেই। অ্যাকসেলেটরে পা দাবিয়ে দিল সে।

দানবটা আচমকাই কুড়িয়ে নিল তার কারবাইন। তারপর নলটা ঘুরিয়ে আধ সেকেন্ডের একটা বা চালু করল। কানে তালা দেওয়ার মতো বাতাসে তরঙ্গ তুলে এক ঝাক গুলি গিয়ে উড়িয়ে দিল পিছনের দুটো টায়ার।

জন নেমে এল গাড়ি থেকে, বোকা! গাধা! হোঁতকা!

জনের ডান হাতটা একবার মাত্র একবারই অতি দ্রুত আন্দোলিত হল। বাতাসে শিস আর রোদে ঝলক তুলে গ্লোয়িং নাইফটা ছুটে এল। দানবটা কিছু বুঝে উঠবার আগেই সেটা আমূল, বাঁট পর্যন্ত গেঁথে গেল বাঁ দিকের বুকে। ঠিক যেখানে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

লোকটা অবিশ্বাসের চোখে একবার নিজের বুকের দিকে তাকাল।

জন হরিণের পায়ে দৌড়োচ্ছে। পালাবে? দানবটা তার কারবাইন বিবশ হাতে তুলল। লক্ষ্য স্থির নেই, এমনকী চোখেও সে ভাল দেখছে না। তবু ট্রিগার চেপে ধরল সে।

ট্যাট ট্যাট ট্যাট… রা রা রা রা রা করে উজাড় হয়ে যেতে লাগল সাব-মেশিনগান।

সেই ঝাঁকবাঁধা গুলির তোড়ে জন প্রায় দু'-আধখানা হয়ে গেল। উড়ে গেল তার হাতের একটা আঙুল, শরীরের নানা অংশ ছিটকে পড়ল নানাদিকে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই সে বিভক্ত হয়ে গেল শতধা। যখন মাটিতে পড়ল তার অনেক আগেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

দানবটা কয়েকবার হেঁচকি তুলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আট্রা গুড বয়। ইউ নেভার ডিচ এ ফ্রেন্ড… ওকে?

তারপর দানবটা চোখ বুজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আর শ্বাস নিতে পারল না।

দৃশ্যটা দেখল একজন। যে ছাদে ছিল। দুটো সাহেবকে একে অন্যের হাতে খুন হয়ে যেতে দেখে সে আর অপেক্ষা করল না। নেমে এল।

মৃত দুই সাহেবের পকেটে হাত দিয়ে সে দুটো ওয়ালেট বের করে নিল। বেশ পুরুষ্টু ওয়ালেট। তারপর হাতের অস্ত্রটা একটা ঝোলায় পুরে নিয়ে সে দ্রুত ফটক পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘স্যার, স্যার…’ বলে কে যেন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল।

গভীর ঘোরের মধ্যেও সেই ডাকটা ববির কানে পৌঁছোল। খুব ক্ষীণভাবে।

স্যার, আমরা মরে যাচ্ছি… আমরা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি স্যার, যে আগ্নেয়গিরি এখুনি ইরাপ্ট করবে।

ববির ঘোরটা কাটল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি ‘ওঃ’ বলে কাতর একটা আওয়াজ করলেন। মুখের ওপর একটা চেনা মুখ ঝুলে আছে। ইন্দ্রজিৎ। এত বড় বড় চোখ ইন্দ্রজিতের।

ববি দুর্বল গলায় বললেন, কী বলছ?

রেড বাটন প্রেস করে বদমাশটা পালিয়েছে এক মিনিট হয়ে গেল। কিছু করুন স্যার। দিদিমণি সব তার কেটে ফেলেছেন।

ববি এবার চমকে জেগে উঠলেন, ডেটোনেটর অ্যাক্টিভ! সর্বনাশ! কিন্তু আমি যে —

আপনি উঠবেন না। শুধু বলুন কী করতে হবে?

ববি দেখতে পেলেন, মেঝের চৌকো গর্তের মধ্যে নেমে পাগলের মতো তার কেটে কেটে ওপরে জড়ো করছে লীনা।

ববি চেঁচিয়ে বললেন, লীনা!

লীনা পাগলের মতো চোখে ফিরে তাকাল।

ববি শান্ত স্বরে বললেন, এক্সপ্লোসিভের মাথায় একটা নীল বোতাম আছে। সেটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে প্যাঁচ খুলে টান দিলেই একটা সরু ডার্ট বেরিয়ে আসবে।

তাড়াতাড়ি করুন।

ববির দিকে চেয়েই লীনা শান্ত হল। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছিল, আর পাঁচ সেকেন্ড... চার সেকেন্ড... তিন সেকেন্ড... দুই সেকেন্ড...

লীনা নীল বোতামটা তার ওড়না দিয়ে চেপে ধরে বাঁ দিকে প্রাণপণে মোচড় দিচ্ছিল। একটু ধীরে ঘুরছিল পাঁচ। বড় শক্ত।

আর এক সেকেন্ড...

লীনা একটা টান দিয়ে ডার্টটা বের করে ফেলল।

ইন্দ্রজিৎ কানে আঙুল দিয়ে চোখ বুজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু বলল, জিরো...

লীনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গর্তটার মধ্যেই।

ইন্দ্রজিৎ কান থেকে হাত নামাল, ঘড়ি দেখল, তারপর দু'হাত তুলে চেঁচাতে লাগল, জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, জয় বাবা মহাদেব... স্যার, আমি যদিও নাস্তিক, কিন্তু ফর দি টাইম বিয়িং... জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, হর হর মহাদেব...

ববি দু'বার উঠবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তার শরীরের গভীর ক্ষতগুলি টাটিয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে স্নায়ুতন্তুজাল। বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে।

তৃতীয়বার উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ববি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

বাঘিনীর মতো উঠে এসে লীনা উপুড় হয়ে পড়ল ববির ওপর। না, শ্বাস চলছে, নাড়ি চলছে। তবে বড় দ্রুত। ববির গায়ে হাত রেখে লীনা বুঝল, অন্তত একশো দুই তিন ডিগ্রি জ্বর।

অবস্থাগতিক দেখে ইন্দ্রজিৎও ববির কাছে হাঁটু গেড়ে বসল, কেমন বুঝছেন?

এখনই কোনও নার্সিং হোম-এ নেওয়া দরকার।

নো প্রবলেম। চলুন ধরাধরি করে ওপরে তুলি। আমাদের গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করা আছে। আমি চট করে নিয়ে আসব গিয়ে।

দু'জনে একরকম চ্যাংদোলা করে ববিকে ধীরে ধীরে ওপরে নিয়ে এল।

দরজার বাইরে পা দিয়েই যে দৃশ্যটা দেখল দু'জনে তাতে লীনা একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে চোখ ঢাকল। আর ইন্দ্রজিৎ এমন হা হয়ে গেল যে বলার নয়।

লীনার চিৎকারেই বোধহয় ববির জ্ঞান দ্বিতীয়বার ফিরল। ওরা বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছিল তাঁকে। তিনি এবার ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। দু'টি রক্তাক্ত দেহ অনেকটা তফাতে পড়ে আছে। এই দৃশ্যটাই সম্ভবত ববির ভিতরে কিছু উদ্দীপনা সঞ্চার করে দিল। তিনি দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

লীনা তখনও চোখ ঢেকে কাঁপছে, টলছে।

ববি অনুচ্চ স্বরে বললেন, লীনা, এরা দুজন বেঁচে থাকলে আমাদের কারও শান্তি থাকত না। এ দেশের সরকারেরও নয়। যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে।

লীনা চোখ থেকে হাত সরিয়ে ববির দিকে তাকাল। চোখ ভরা জল। হঠাৎ এই অবস্থাতেও সে একটু হাসল, আমার নামটা তা হলে মনে পড়েছে আপনার!

ববি চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, পড়েছে। আর ভুলব না।

ইন্দ্রজিৎ বিস্ময় কাটিয়ে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল।

ববি মাথা নেড়ে বললেন, এখনই নয়। যাও ইন্দ্রজিৎ, ছাদটা দেখে এসো। ওখানে একজন স্নাইপার মজুত ছিল। যদিও আমার ধারণা সে পালিয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ দৌড়ে ওপরে গেল তারপর ফিরে এসে বলল, কেউ নেই স্যার।

পিছনের বাগানে যে দু'জন পড়ে আছে তাদের একটু খবর নাও। যদি জ্ঞান না-ফিরে থাকে তবে হাত আর পা বেঁধে সেলার-এ ঢুকিয়ে দরজায় তালা দাও।

এসব কাজে ইন্দ্রজিৎ খুবই পাকা এবং নির্ভরযোগ্য। দু'জন সংজ্ঞাহীন লোককে বেঁধে মাটির নীচে একটা অতিরিক্ত ঘরে বন্ধ করে আসতে তার সব মিলিয়ে পঁচিশ মিনিট লাগল।

ববি কলকাতায় এক্স-সার্ভিসমেনদের একটা সিকিউরিটি এজেন্সিকে ফোন করলেন। তারা এসে নীল মঞ্জিলের নিরাপত্তার ভার নেবে এবং দু'জন বন্দিকে তুলে দেবে পুলিশের হাতে। পুলিশকেও তারাই নিয়ে আসবে এখানে।

ববি আর-একটা ফোন করলেন। ট্রাংক কল। দিল্লির প্রতিরক্ষা দফতরে।

লীনা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনার এখনই মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার। কলকাতা অনেক দূর। কেন সময় নষ্ট করছেন? আপনার পিঠের জামা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

ববি লীনার দিকে ঘুম-ঘুম ক্লান্ত চোখে চেয়ে বললেন, ওরা নীল মঞ্জিলের সমস্ত ভার আমাকে দিতে চাইছে।

বিরক্ত লীনা বলল, ওসব পরে শুনব। এখন চলুন।

ববি ধীরে ধীরে হেঁটে গাড়িতে এসে উঠলেন। পিছনের সিটে লীনা তার পাশে বসল। ইন্দ্রজিৎ গাড়ি ছেড়ে দিল।

ববি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ধীরে ধীরে টলতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ রিয়ারভিউ মিররে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল। বলল, শুয়ে পড়ুন স্যার। আপনাকে সাংঘাতিক সিক দেখাচ্ছে। দিদিমণির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ুন। আমি তাকাব না।

রিয়ারভিউ মিররটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রজিৎ।

ববির উপায় ছিল না। শরীরটা আপনা থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল লীনার কোলে।

লীনার শরীরে একটা বিদ্যুৎ বহুক্ষণ ধরে বয়ে যেতে লাগল। শিউরে শিউরে উঠল গা। তারপর ধীরে ধীরে এক প্রগাঢ় মায়ায় সে ববির মুখে হাত বুলিয়ে দিল।

ববি নিস্তেজ গলায় বললেন, কিন্তু ওই যে ভ্যাগাবন্ড— তার কী হবে?

লীনা ফিসফিস করে বলল, দোলন? উই ওয়ার নেভার ইন লাভ। আমরা শুধু গত এক বছর ধরে পরস্পরের প্রেমে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি মাত্র। কিছু হয়নি। আমরা পারিনি।

আর এবার?

লীনা শিহরিত হল মাত্র। তারপর বলল, আমি কিন্তু আর মিসেস ভট্টাচারিয়া নই।

ববি হাসলেন। তারপর বললেন, হাউ অ্যাবাউট মিসেস রায়?

মারীচ

১. আপনি তো বাহাদুর লোক দেখছি

মারীচ – **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়**

আপনি তো বাহাদুর লোক দেখছি।

কেমন করে দেখলেন?

আপনার বায়োডাটা বলছে আপনি এক সময়ে বোম্বের ফিমে কিছুদিন স্টান্টম্যানের কাজ করেছিলেন।

ওটা বাহাদুরির ব্যাপার নয়। পেটের দায়।

কী ধরনের স্টান্টম্যান ছিলেন আপনি?

মোটরবাইক আর কিছু লাফ ঝাঁপ। টাকার জন্য করতে হত, তবে টাকাও তেমন কিছু রোজগার করতে পারিনি। কিন্তু আমার তো বায়োডাটা নেই। ছিল না, আপনি পেলেন কী করে?

বায়োডাটাটি তৈরি করেছে পুলিশ। বিস্তর খোঁজখবর করে।

তার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? আই অ্যাম নট এ ক্রিমিন্যাল।

ক্রিমিন্যাল কিনা সেটা তদন্তের পর বোঝা যাবে। আপনি বোম্বে থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকা। এবং সেটা বোধহয় আইনকে ফাঁকি দিয়েই।

না। আইনকে ফাঁকি দিয়ে নয়। আমি বোম্বেতে থাকার সময় একটা জাহাজের চাকরি পেয়ে যাই। খালাসির কাজ। সেটা আইনসম্মতই ছিল।

কিন্তু আমেরিকার নিউ ইয়র্কে যখন জাহাজটা প্রায় বছরখানেক পরে ভিড়েছিল তখন বোধহয় খুব আইনসম্মত পদ্ধতিতে আপনি জাহাজ থেকে পালাননি।

সেটা বৈধ ছিল না বটে। তাই ওয়াজ এ ডেজার্টার। আমার বহুঁকালের ইচ্ছে ছিল আমেরিকায় গিয়ে সেক্স করব।

আপনি আমেরিকায় বেশ কিছুদিন বড় বড় ট্রাক চালাতেন। তাই না?

হ্যাঁ, আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন খুব কষ্ট গেছে। নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছিল। শেষে একটা গ্যারাজে জুটে গিয়েছিলাম হেলপার হিসেবে। সেখানেই ওইসব সুপার ট্রাক চালানো শিখে যাই।

অ্যামনেস্টির সুবাদে আপনি মার্কিন নাগরিকত্বও পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমার জীবন খুব বিচিত্র।

তাই দেখছি। আমেরিকায় আপনার ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ছিল কি?

না।

ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ।

সুব্রত বকশি আমাদের জানিয়েছেন আপনি সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। এবং আপনার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ ছিল।

চার্জ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা স্রেফ আমাকে প্যাঁচে ফেলা ছাড়া কিছু নয়।

যে মেয়েটি খুন হয়েছিল তার নাম কি জুলি?

হ্যাঁ, জুলিয়া।

আপনার স্ত্রী না গার্লফ্রেন্ড?

স্ত্রী নয়, আমি বিয়ে করিনি।

তা হলে গার্লফ্রেন্ড?

বলতে পারেন। তাকে খুন করেছিল একটা একস্ট্রিমিস্ট গ্রুপ। জুলি এক সময়ে ওই গ্রুপের একজন মেম্বার ছিল। তখন বোধহয় টাকাপয়সা নিয়ে কোনও প্রবলেম হয়েছিল।

যাকগে, আমি ওই পয়েন্টে স্টিক করতে চাইছি না।

ধন্যবাদ।

আপনি বছরখানেক আগে দেশে ফিরে এসেছেন। তাই তো?

হ্যাঁ, এক বছর এক মাস।

কেন বলুন তো? আপনার তো ওখানেই সেক্স করার ইচ্ছে ছিল। এখনও আপনার মার্কিন নাগরিকত্ব বহাল রয়েছে।

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমেরিকার মোহ আর আমার নেই।

বাঃ, চমৎকার। কিন্তু মোহটা হঠাৎ কেটে গেল কেন?

শুধু টাকা রোজগার করাটা কারও জীবনের লক্ষ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

আপনি কি একজন দার্শনিক?

আজ্ঞে না। আমি দর্শনশাস্ত্র পড়িনি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাই আমাকে খানিকটা দার্শনিক করেছে।

বাঃ বেশ। কিন্তু এটাও কি সত্যি যে আমেরিকায় আপনি বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি!

এটা কোন সূত্রে জানলেন?

আমাদের মার্কিন সোর্স জানিয়েছেন যে, দীর্ঘদিন ট্রাক চালানো এবং ফিলাডেলফিয়ায় একটা দোকান করার চেষ্টা, এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি এসব করে আপনাকে পেট চালাতে হয়েছে।

আমি এসব করেছি ঠিকই। তবে অর্ডারটা উলটোপালটা হয়ে গেছে। এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি ছিল আমার প্রথম দিককার চেষ্টা। তারপর দোকানঘর। তারপর ট্রাক চালানো।

আর কিছু?

হ্যাঁ, আমি মিউজিক গ্রুপে ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়েছি, হোটেলে আসার-এর চাকরি করেছি। শেষ অবধি আমি একটা ব্যাবসা শুরু করি।

সেটা কি একটা জাপানি কোম্পানির সঙ্গে?

আপনি তো সবই জানেন। হ্যাঁ, একটা জাপানি কোম্পানি আমাকে একটা ফ্রানচাইজি দিয়েছিল। সুব্রত বকশির সঙ্গে আমার সেই সূত্রেই ভাব হয়।

তারপর?

আপনি যখন সবই জানেন তখন আর নতুন করে কী বলব?

মানুষ যত কথা বলে ততই আমাদের কাজের সুবিধে হয়।

তা হয়তো হয়। কিন্তু আমাকে ঝুটমুট হয়রান করছেন। সুব্রত বকশি আমাকে পছন্দ করেন না বলেই তিনি আপনাদের নানারকম ইনফর্মেশন দিয়েছেন হয়তো।

সুব্রত বকশির সঙ্গে কি আপনার এক সময়ে খুব বন্ধুত্ব ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি ওই জাপানি কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন।

তা হলে উনি তো আপনার উপকারই করেছেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

তারপর কী হল? আপনি ওর সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। নয় কি? ব্যা

পারটা ওরকমভাবে বললে আমাকে লম্পট বলে ধরে নিতে কি আপনার সুবিধে হয়?

আপনি কি লম্পট নন বলে দাবি করছেন?

আমি স্বভাবগতভাবে অবশ্যই লম্পট নই।

তা হলে মিসেস অরুণিমা বকশির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীরকম ছিল? প্লেটোনিক?

সম্পর্কটার জন্য আমাকে দায়ী করা অন্যায় হবে।

খুলে বলুন।

অরুণিমা বকশি সুন্দরী হলেও তরুণী নন। আমার পক্ষে মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন। তবে মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি।

সো হোয়াট?

আপনাকে এ সম্পর্কটা মনে রাখতে বলছি।

বলতে হবে না। অরুণিমা বকশির ডেট অফ বার্থ আমরা জানি। তার বয়স উনচল্লিশ। আপনার বয়স ত্রিশ। ঠিক তো?

হ্যাঁ।

আপনি কি মনে করেন যে, ত্রিশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে উনচল্লিশ বছরের এক মহিলার প্রেম হওয়া সম্ভব নয়?

তা হতেই পারে। আজকাল নানারকম রিলেশন তৈরি হচ্ছে।

আপনার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?

সুব্রত বকশি আমাকে বিজনেসের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। নিউ ইয়র্কে তিনি আমার অফিসেরও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি থাকতেন কুইনসে। আমাকে প্রায়ই বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেন। মিসেস বকশিও আমাকে বেশ পছন্দ করতেন।

কী ধরনের পছন্দ?

আমি গেলে খুশি হতেন, লক্ষ করেছি।

তারপর?

দু-তিন মাসের মাথায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন।

সেটা কীরকম ঘনিষ্ঠতা? ফিজিক্যাল?

হ্যাঁ।

আপনিও রাজি হয়ে গেলেন?

আমার উপায় ছিল না। মিসেস বকশিই আসলে কোম্পানি চালাতেন। তার ইচ্ছেতেই সব হত। সুব্রতবাবু ছিলেন ফ্রন্ট মাত্র।

তার মানে আপনি মিসেস বকশিকে খুশি করার জন্যই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন?

আমেরিকায় ফিজিক্যাল রিলেশনটা জলভাত। মিসেস বকশি বাঙালি হলেও ওঁরা দুই পুরুষের আমেরিকান। উনি মার্কিন মেইনস্ট্রিমের মানুষ। বাংলা ভাল বলতেও পারতেন না। কোনও সংস্কারও মানতেন না।

এ ব্যাখ্যা তো আপনার।

আপনি তো আমার ব্যাখ্যাই শুনতে চাইছেন।

ঠিক কথা। বলুন। আপনার ভার্সানটাই শোনা যাক।

আমি আমার ভার্সানটাই বলতে পারি, তা থেকে ডিডাকশন যা করার তা আপনি করবেন। আমার মনে হয় মিসেস বকশি সেই সময়ে সুব্রতবাবুর ওপর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে উনি একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

লিভিং টুগেদার?

হ্যাঁ, আমি রাজি হইনি।

রাজি না হওয়ার কারণটা কী?

আমি ওঁর প্রতি আসক্ত ছিলাম না। জীবিকার প্রয়োজনেই ওঁকে খুশি করার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনাকে তো মোটেই ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে না মশাই।

আমি ভাল লোক বলে দাবি করছি না। তবে আমি ভীষণ রকমের খারাপ লোকও নই। প্র্যাকটিক্যাল। জীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাকে নানারকম আপসরফা করতে হয়েছে।

তাই দেখছি। তা হলে আপনার ব্যাবসা মিসেস বকশির কল্যাণে বেশ ভালই চলছিল?

মোটামুটি। মিসেস বকশি আমাকে ব্যবহার করতেন বটে, তা বলে উনি খুব দরাজ হাতের মহিলা ছিলেন না। খুব হিসেবিই ছিলেন।

তাতে তো আপনার ক্ষতি হয়নি। কারণ আপনি তো আর ওঁদের কর্মচারী ছিলেন না, কোলাবরেটর ছিলেন মাত্র। মিসেস বকশি কৃপণ হলেই বা আপনার ক্ষতি কী?

ঠিক কথা। আপাত দৃষ্টিতে আমার ওপর ওঁর কোনও ফিনানসিয়াল কন্ট্রোল থাকার কথা নয়। কিন্তু মিসেস বকশিকে চিনলে আপনার ধারণা পালটে যেত। উনি আমার কাছ থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট হারে কমিশন নিতেন।

আমেরিকায় ওসব হয় নাকি?

কেন হবে না? সেটা তো আর সাধুর দেশ নয়।

মিসেস বকশি কি সুন্দরী ছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

না। তবে নিয়মিত ব্যায়াম ট্যায়াম করে নিজেকে ট্রিম রাখতেন।

মিসেস বকশির সঙ্গে তার হাজব্যান্ডের রিলেশন কীরকম ছিল?

ঝামেলাহীন। দু'জনেই বেশ কুল কাস্টমার। ওঁদের বাড়িতে বা র‍্যানচে যখন গেছি তখন দু'জনকে বেশ ইন্টিমেট বলেই ধারণা হত। ঝগড়া-টগড়া শুনিনি। সুব্রতবাবু

তার স্ত্রীর অনুগত ছিলেন বলেই মনে হত।

সুব্রতবাবুর কি এক্সট্রা ম্যারিটাল কোনও রিলেশন ছিল?

থাকলেও আমি জানি না। আমি নিজের কাজকারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

মিসেস বকশির সঙ্গে আপনার রিলেশনটা সুব্রতবাবু কি টের পাননি?

টের না পাওয়ার কথা নয়। আমার ধারণা সুব্রতবাবু সবই জানতেন।

কীভাবে বুঝলেন?

অন্তত দু'বার উনি আমাকে ওঁর বাড়িতে খুবই অদ্ভুত সময়ে দেখতে পান। তা ছাড়া মিসেস বকশির সঙ্গে উইক এন্ড কাটাতেও আমি কয়েকবার বাইরে গেছি। সুব্রতদার তখন হয়তো কোনও টুর থাকত। কিন্তু টের না পাওয়ার কথা নয়। ওসব উইক এন্ডেও ওঁদের মধ্যে টেলিফোনে কথা হত।

তা হলে ব্যাপারটা খোলাখুলিই হত বলছেন?

হ্যাঁ, অন্তত আমার তাই ধারণা।

আপনি বেশ ফ্র্যাঙ্ক লোক, তাই না। কোনও লুকোছাপা নেই।

আমার জীবনটাই যে ওরকম। লজ্জাশরমের বালাই নেই।

ভাল কথা। আপনি একসময়ে আমেরিকার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, তাই তো।

হ্যাঁ, আমার আর ভাল লাগছিল না।

এই ভাল না লাগার কারণ কি মিসেস বকশি?

উনিও।

নাকি জনা?

জনা আর আমাকে নিয়ে যা রটনা হয়েছে তার অর্ধেক সত্য।

অর্ধ সত্য নয় তো!

অর্ধ সত্য মানে হাফ ট্রুথ। না, তা নয়।

খুলে বলুন।

জনা সুব্রতদার ছোট বোন। বয়স কুড়ি টুড়ি হবে। সে পড়াশুনো করতে আমেরিকা গিয়েছিল।

এবং গিয়েই আপনার প্রেমে পড়ে গেল তো!

ঠিক তাই।

আপনি মেয়েদের কি খুব সহজেই অ্যাট্রাক্ট করেন?

আমি কিন্তু করি না। আমার কী করার আছে বলুন ইফ দে ফল ফর মি।

ঠিক কথা, আপনার চেহারাটা অবশ্য খুবই ভাল, বেশ হি-ম্যানের মতো। জনার সঙ্গেও কি আপনার ফিজিক্যাল

না-না, ছিঃ, ও কথা বলবেন না।

তা হলে?

জনা রোমান্টিক মেয়ে। সেক্সি টাইপের নয়।

আপনারা তা হলে প্রেমে পড়ে গেলেন?

ওই তো বললাম, অর্ধেকটা সত্য। জনা প্রেমে পড়ল, কিন্তু আমার তো এত ভাবাবেগ নেই। আমি পোড়-খাওয়া, কাঠখোট্টা মানুষ। জীবনে মহিলা সঙ্গিনীর অভাব কখনও ঘটেনি। চেহারাটাই সেইজন্য খানিকটা দায়ী। প্রেমে পড়ার মতো মনটাই আর আমার নেই। কিন্তু জনা পড়েছিল, স্বীকার করছি।

তাই নিয়েই কি অশান্তি?

হ্যাঁ। মিসেস বকশি জনাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। এবং আমার ওপরেও আধিপত্য বাড়িয়ে দেন।

সেটা কীরকম?

আমাকে খুবই চোখে চোখে রাখতেন এবং থ্রেট করতেন।

জনা কতদূর এগিয়েছিল?

ফোন করত। রোম্যান্টিক কথাবার্তা বলত, প্রেমে পড়লে যেমনটা বলে আর কী?

আপনি কি প্রশ্রয় দিতেন?

দিতাম। মেয়েদের আমি সহজে চটাই না।

আপনি বেশ বুদ্ধিমান মানুষ।

বুদ্ধি না হলে কি আমার চলে?

এবার মিসেস বকশির খুনের ঘটনায় আসি।

আমার যা বলার তো বলেছি।

আবার বলুন।

খুনের দিন সকালে আমি মিসেস বকশির সঙ্গে ওঁর আয়রন সাইড রোডের বাড়িতে দেখা করি। উনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শনিবার ছিল।

কী কথাবার্তা হয়েছিল?

উনি আমার উপর ভীষণ রেগে ছিলেন।

রাগের কারণ?

সেটাও বলেছি, হঠাৎ আমেরিকা থেকে চলে আসা এবং ওঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা হল একটা কারণ। আরও একটা কারণ হল জনা। আমি চলে আসায়

জনাও নাকি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করা হয়।

খুনটা হয়েছিল দুপুরে।

খবরের কাগজে তাই তো পড়েছি।

খুনটা আপনি করেননি?

কেন করব সেটা তো বলবেন! মিসেস বকশির সঙ্গে আর আমার বিজনেস রিলেশন

ছিল না। দেশে ফিরে আসি। একে-একে তিনটে ট্রেলার কিনি এবং গত আট মাসে আমার ব্যাবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। মিসেস বকশির প্রতি আমার কোনও সেন্টিমেন্টও নেই। খুন করতে যাব কেন?

মিসেস বকশি কি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করেছিলেন?

ব্ল্যাকমেল করার ব্যাপারটা আপনাদের মাথায় কে ঢোকাল কে জানে! আমি তো খোলামেলা মানুষ। যা করেছি তা স্বীকার করি। লুকোনোর তো কিছু নেই আমার। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার মতো গুপ্ত কিছুই থাকতে পারে না।

কিন্তু ভাইস ভার্সা। আপনি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেননি তো!

আজ্ঞে, সেটাও পুলিশ বলছে। কিন্তু তারা এখনও কোনও সূত্র পাচ্ছে না। আমি বলি কী, একটু স্ট্রং হান ছাড়া আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করাটা কিন্তু হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে।

আপনার পক্ষে মিসেস বকশির গুপ্ত খবর জানা কি অসম্ভব?

মিসেস বকশি স্ট্রং মাইন্ডেড মহিলা। ওঁর গুপ্ত ব্যাপার বলতে আমার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন। তিনি সেটা গোপন করতে যাবেন কোন দুঃখে? সুব্রতদাকে তো ওঁর কোনও ভয় ছিল না। বরং সুব্রতদাই ওঁকে ভয় পেতেন।

আপনার অ্যালিবাই স্ট্রং নয়।

জানি। কিন্তু সেটাই তো কোনও প্রমাণ হতে পারে না।

মিহিরবাবু, আপনি কিন্তু পুলিশকে যথেষ্ট হেল্প করছেন না।

হেলপ করার দায় কী বলুন। আপনার পুলিশের লোক যদি আমাকে অকারণে হ্যারাস আর থ্রেট না করত তা হলে আমি নিশ্চয়ই হেল্প করতাম। ইন্সপেক্টর নাগ একজন অভদ্র লোক। তিনি আমাকে প্রথম ইন্টেবোগেশনের সময়ে একটা থাপ্পড় মেরেছেন। আর কুৎসিত গালাগালের তো হিসেব নেই। ওঁরা ধরেই নিয়েছেন খুনটা আমিই করেছি, এখন কনফেস করে ফেললেই হয়।

মিস্টার নাগের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

কেন, নাগসাহেবের হয়ে আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? আর ক্ষমা চাওয়াটাও অর্থহীন। লোকটাকে দেখেই মনে হয় রাফিয়ান টাইপ। দরকার হলেই ফের চড়-থাপ্পড় মেরে বসবে। আপনি কাজ উদ্ধারের জন্য ক্ষমা চাইছেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই।

জনাদেবী সম্পর্কে যদি কিছু জিজ্ঞেস করি?

জনা সম্পর্কে যা বলার তো বলেইছি।

আপনি বলেছেন জনাদেবী সম্পর্কে আপনি ইন্টারেস্টেড নন।

হ্যাঁ, এবং সেটা সত্যি কথা। মেয়েদের নিয়ে রোমান্টিক চিন্তা করার সময় আমার হাতে নেই।

জনাদেবী কি এখনও আপনার প্রতি দুর্বল?

তা জানি না। তবে মাঝে মাঝে চিঠি দেয়, ফোনও করে।

আপনি চিঠির জবাব দেন না?

দিই, দেব না কেন? তবে তাতে ভালবাসার কথা থাকে না।

জনাদেবীর চিঠিতে কি ভালবাসার কথা থাকে?

খুব থাকে। তবে সেসব হচ্ছে শ্যাম্পেনের ফেনার মতো, ওর মধ্যে বস্তু বিশেষ থাকে।

আপনি তো দেখছি নর-নারীর প্রেমে বিশ্বাসী নন।

আপনাকে তো বলেছি, আমি খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ। দেশে ফিরে আসার পর আমাকে নতুন করে আবার জীবন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। নেপাল, ভুটান, আসাম, পাঞ্জাব জুড়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চাই?

স্বচ্ছন্দে।

আপনার মা-বাবা? বাবা রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার, সামান্য পেনশন পান। মা বরাবর হাউস ওয়াইফ, দু'জনেই নানারকম অসুখে ভুগছেন। আমার দুই দাদা আছেন। একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট–তাঁর প্রচুর পয়সা। তিনি আলাদা হয়ে গেছেন। মেজ দাদাও আলাদা। তিনি চাকরি করেন দিল্লির একটি ইংরেজি পত্রিকায়। মোটামুটি এই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি।

মা বাবাকে কে দেখে?

কেউ দেখে না। মা-বাবা দুজনেই এখনও পরস্পরের দেখাশোনা করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আমি তাঁদের কাছেই থাকি বটে, কিন্তু কাজের চাপে তাদের ওপর বিশেষ নজর দিতে পারি না। কিন্তু এসব জানতে চাইছেন কেন? এগুলো তো আপনার কেসে ইরালেভ্যান্ট।

আমি আসলে আপনাকে অফ গার্ড ধরতে চাইছি। অসতর্ক মনে যদি হঠাৎ কিছু রিল্যাভেন্ট বলে ফেলেন।

মিহির একটু হেসে বলে, আপনার কি এখনও ধারণা যে, আমি সত্য গোপন করছি?

অফ কোর্স! আপনার চোখে-মুখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আপনি সত্যি কথা বলছেন। অন্তত সব সময়ে নয়।

কী যে বলেন শবরবাবু! গোপন করার মতো কিছুই নেই আমার।

এমনও হতে পারে যে, আপনি ইচ্ছে করে গোপন করছেন না। হয়তো যেটা সামান্য কোনও ঘটনা যা হয়তো কোনও একটা কথা বা আচরণ, যেটাকে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না, অথচ সেটা তদন্তের পক্ষে খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিহির বলে, আমি থ্রিলার পড়ি, এক সময়ে আমেরিকায় লং ডিসট্যান্স ড্রাইভের পর মোটেলে সময় কাটানোর জন্য পড়তাম। কাজেই আপনি যা বলছেন তা বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু আপাতত কিছুই তেমন মনে পড়ছে না আমার। পড়লে জানাব।

ধন্যবাদ, বাই দি বাই, জনাদেবী দেখতে কেমন তা বলবেন?

অবাক হয়ে মিহির বলে, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি, কৌতূহল মাত্র।

মৃদু হেসে মিহির বলল, এ যাবৎ যে কজন পুলিশের লোক দেখেছি তার মধ্যে আপনাকেই ইন্টেলিজেন্ট বলে মনে হয়েছে। ফালতু প্রশ্ন করার লোক আপনি নন। তবে মেয়েদের রূপের ব্যাপারে আমার মতামতকে গুরুত্ব দেবেন না। আমার সৌন্দর্য বিচারের চোখ নেই। আমার একটা খুড়তুতো বোন আছে, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। সে বলে, দুখুদা, তুই কিন্তু তোর পাত্রী দেখতে যাস না, তা হলে একেবারে কেলোর কীর্তি হবে।

শবর মৃদু হেসে বলল, তা হোক। তবু আপনার জাজমেন্টটাই আমি জানতে আগ্রহী।

জনা হল গুঁড়ি গুডি টাইপ। শুনেছি খুব ভাল ছাত্রী। যাদবপুর থেকে এম টেক-এ ফাস্ট ক্লাস পেয়েছিল। ভাল ছাত্রীরা যেমন দেখতে হয় জনা ঠিক তেমনি চোখে ভারী চশমা, মুখ গম্ভীর, হাসিঠাট্টা নেই, কথাবার্তা কম, রং একটু ফ্যাকাশে, স্বাস্থ্য রোগা এবং মুখটা রসকষহীন।

বাঃ, এই তো চমৎকার বিবরণ দিলেন। কে বলল আপনার বিচারকের চোখ নেই?

কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন? থ্যাঙ্ক ইউ।

এবার বলি, জনা কেমন টাইপের মেয়ে? ডেসপারেট? রাগী? টেম্পারমেন্টাল? মুডি? না কি ঠান্ডা ভালমানুষ?

বোঝা মুশকিল। ওর এক্সপ্রেশন নেই তেমন। তা ছাড়া আমি ওকে স্টাডি করিনি কখনও। কথাটথা বলতাম ঠিকই, তবে মনোযোগ দিইনি।

সুব্রত বকশি কি তার বোনেরই মতো?

না-না, সুব্রতদা অন্যরকম। দারুণ স্মার্ট, আড্ডাবাজ, বুদ্ধিমান, ডাউন টু আর্থ ম্যান। বেশ ভাল স্কলারও বটে। শুধু ওঁর দাম্পত্য সম্পর্কটাই গোলমেলে।

কীরকম গোলমাল?

সেটাও তো বলেছি আপনাকে।

আবারও না হয় বলুন।

উনি ওঁর স্ত্রীকে খুব তোয়াজ করতেন, খুবই খাতির করতেন, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হত স্ত্রীকে উনি মোটেই ভালবাসেন না।

বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখেছেন কি?

ঠিক সেভাবে বলা যায় না। তবে অরুণিমা বকশি যে আমার সঙ্গে ইনভলভড এটা জেনেও ওঁর কোনও ভাবান্তর ছিল না। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে স্বামীর তো স্বাভাবিকভাবেই রি-অ্যাক্ট করা উচিত, তাই না?

উনি নপুংসক নন তো!

মিহির হেসে ফেলে বলল, তা তো আমার জানা নেই।

মিসেস বকশি তার স্বামীর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য আপনার কাছে করেননি?

না। ওই ব্যাপারে উনি খুব রিজার্ভড ছিলেন। ওঁর স্বামী ইমপোটেন্ট কিনা তা আমাকে বলবার লোক উনি নন। আমাদের ইন্টিম্যাসিটা শুধু ফিজিক্যাল লেভেলেই ছিল, হৃদয়ঘটিত নয়।

তা হলে উনি জনাকে হিংসে করতেন কেন?

ফিজিক্যাল পজেশনও তো একটা পজেশন। উনি ওটাও ছাড়তে চাননি।

ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গটা থাক। এবার মিসেস বকশির মৃত্যুর প্রসঙ্গে আসি। উনি মারা যাওয়ায় আপনি কি দুঃখ পেয়েছেন?

যে কারও মৃত্যুই দুঃখজনক।

আপনি আপনার কথা বলুন।

হ্যাঁ, আই ফেল্ট স্যাড।

কে ওঁকে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?

নো আইডিয়া। পুলিশ যে কতবার কতভাবে এ প্রশ্ন করেছে তার হিসেব নেই।

জানি, পুলিশকে একই প্রশ্ন বারবার করতেই হয়।

উইথ থার্ড ডিগ্রি?

শবর দাশগুপ্ত ম্লান একটু হেসে বলল, পুলিশের কাজ তো ভাল কাজ নয়। অপরাধী আর অপরাধ যে কত জটিল আর কুটিল তা যদি জানতেন তা হলে রাগ করতেন না।

পুলিশের কাজ কীরকম এবং কাদের নিয়ে তা আমি খানিকটা জানি। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট হতে পুলিশের বাধা কোথায় বলুন তো! আপনাদের ওই মিস্টার নাগের কথাই ধরুন, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ উনি ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলেন! যেন মারের চোটেই আমি স্বীকারোক্তিটা করে ফেলব। আমি ওঁকে উলটে মারলে কী হত জানেন?

জানি। আপনি ফিজিক্যালি একজন স্ট্রং ম্যান। হয়তো ক্যারাটে জানেন।

ক্যারাটে জানি বলেই রক্ষে। আমরা ক্যারাটের সঙ্গে ধৈর্য ও স্থৈর্যও শিখেছি। কাজেই চরম প্রয়োজন ছাড়া কাউকে মারি না। মার্শাল আর্ট তো মারপিট নয়, ওটা একটা ধরন।

জানি। তবে আমি তো নাগ নই, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করিনি।

আপনার কথা আলাদা। আপনি শুধু ভাল ব্যবহারই করেননি, অকারণ হাজতবাসের হাত থেকেও মুক্তি দিয়েছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ, আশা করি আপনি কো-অপারেট করবেন।

করব। আপনার মোডাস অপারেন্ডি খুবই বাস্তবসম্মত এবং লজিক্যাল। মিসেস বকশির খুনিকে ধরতে যদি পারেন তা হলে আমি খুশিই হব। কিন্তু মুশকিল হল আমার কাছে তেমন কোনও তথ্য নেই যা আপনার সাহায্যে আসতে পারে।

ধন্যবাদ। মিসেস বকশি কীভাবে খুন হন তা তো আপনি জানেনই।

হ্যাঁ, গলা টিপে ওঁকে খুন করা হয়েছিল।

ওঁর বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন সকাল আটটা বেজে পনেরো মিনিটে। ঠিক তো?

দু’-এক মিনিট এদিক-সেদিক হতে পারে। তবে মোটামুটি সোয়া আটটাই ধরে নিতে পারেন।

বাড়িতে গিয়ে কী দেখলেন?

বিশাল বাড়ি, বিরাট কম্পাউন্ডও, মিসেস বকশিদের ফ্যামিলি বনেদি বড়লোক। আয়রন সাইড রোডের মতো ঘ্যাম জায়গায় ওরকম বাড়ির দাম কয়েক কোটি টাকা।

সে তো বটেই।

বাড়ি দেখেই আমি ট্যারা হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি, একজন দারোয়ান আর একটা চাকর সেই বাড়ি মেনটেন করে।

ঠিকই শুনেছেন। তারপর বলুন, সকাল সোয়া আটটায় পৌঁছে আপনি কী দেখেছিলেন?

নাথিং অফ এনি ইমপর্টেন্স। ফটক দিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ান আটকাল। তার কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থাকে। সেটা দেখে ছেড়ে দিল। আমি দু'-এক মিনিট দাঁড়িয়ে বাগানটা দেখলাম। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকলাম। একজন চাকর এসে স্লিপ লিখিয়ে নিয়ে ভিতরে গেল। দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই মিসেস বকশি এসে ঘরে ঢুকলেন।

ডিসক্রাইব হার। ওঁকে কীরকম মুড আর পোশাকে দেখলেন?

গায়ে একটা কিমোনো ছিল। গাঢ় বেগুনি রঙের ওপর একটা ড্রাগন আঁকা। মনে হল খটি জাপানি জিনিস। এ তো গেল পোশাক। আর মুড একটু অফ ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

চাকরবাকরদের সামনেই?

চাকরটা বোধহয় তখন বেরিয়ে গিয়েছিল। ঠিক লক্ষ করিনি। তবে কে দেখল না-দেখল উনি তার পরোয়া করতেন না।

আপনার কি মনে হয় না যে উনি আপনার প্রতি ইমোশনালি অ্যাটাচড ছিলেন।

সেদিনই প্রথম মনে হল, মে বি শি ইজ সিরিয়াসলি ইন লাভ উইথ মি।

আগে মনে হয়নি?

ইমোশনের চেয়ে ওঁর বোধহয় সেক্সয়াল আর্জটাই বেশি ছিল বলে মনে হত।

উনি আপনাকে চিঠিপত্র লিখতেন না?

হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে লিখতেন।

লাভ লেটার?

ঠিক লাভ লেটার বলা যায় না। আমি হঠাৎ আমেরিকার কারবার গুটিয়ে চলে আসায় উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ওঁর ধারণা ছিল আমি ওঁকে বিট্রে করেছি।

আপনি হঠাৎ চলে এলেন কেন?

হঠাৎ করে আসিনি। মাস দুই ধরে ধীরে ধীরে কাজকারবার গুটিয়ে তৈরি হয়েই এসেছি। তবে ব্যাপারটা সুব্রতদা বা তার স্ত্রীকে জানাইনি।

জানাননি কেন?

আমার বিশ্বাস ওঁরা বাগড়া দিতেন। বিশেষ করে মিসেস বকশি।

ওঁদের তো সন্তান নেই, না?

না। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি, হঠাৎ মনে হল।

ওঁরা অবশ্য অ্যাডপ্ট করার কথা ভাবছিলেন।

অ্যাডপ্ট কি শেষপর্যন্ত করেছেন?

যতদূর জানি, না।

সুব্রতবাবুর বয়স এখন কত? আপনারা তো তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আপনারাই তো সেটা জানবেন।

আমি এই কেসটা সদ্য হাতে নিয়েছি। সুব্রতবাবু তার আগেই আমেরিকায় ফিরে গেছেন। ওঁর বায়োডাটা এখনও আমার স্টাডি করা হয়নি।

পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে।

বিয়ে করার বয়স আছে বলছেন।

নিশ্চয়ই। ও দেশে এখনও অনেকে এই বয়সে প্রথম বিয়ে করে।

আপনি কি সত্যিই জানেন না সুব্রতবাবুর কোনও প্রেমিকা বা বান্ধবী আছে কিনা।

সত্যিই জানি না।

থাকা কি সম্ভব?

থাকতেই পারে। কোয়াইট নরমাল।

হ্যাঁ, তারপর অরুণিমা বকশির সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার ঘটনাটা বলুন।

উনি আমাকে এমব্রেস করলেন, বলেছি তো।

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ একটু ইমোশনাল কথাবার্তাও বললেন, তার মধ্যে প্রেমের কথাই ছিল, ওঃ আই লাভ ইউ সো মাচ! আই মিস ইউ সো মাচ! ওঃ ডিয়ারেস্ট, ওঃ ডার্লিং, ওঃ সুইটহার্ট! এইসব আর কী।

আপনার রিঅ্যাকশন কী হল?

খুব একটা কিছু নয়। বরং বছরখানেক বাদে ফের এইসব আমার খারাপই লাগছিল। ভদ্রমহিলার জন্য একটু দুঃখও হচ্ছিল।

এনি সেক্স?

বি সেনসিবল মিস্টার দাশগুপ্ত। ইট ওয়াজ আর্লি ইন দি মর্নিং এবং আমাদের আগের রিলেশনটাও তখন ছিল না, অন্তত আমি এখন একদম আলাদা মানুষ।

ওকে, ওকে। ঝগড়া হল কেন?

ঝগড়া। না ঝগড়া হয়নি। ঝগড়া হতে দুটো পক্ষ লাগে। আমি সম্পূর্ণ প্যাসিভ ছিলাম। উনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

উত্তেজিত হলেন কেন?

উনি পুরনো কথা তুলে আবার আমাদের আগের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন, আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করতে থাকেন, এমনকী সুব্রতদাকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেছিলেন। দেখলাম ভদ্রমহিলা আমার জন্য বেশ পাগল হয়ে উঠেছেন। খুব ডেসপারেট, অথচ আমি ওঁকে কুল ক্যালকুলেটিং অ্যান্ড ক্রুয়েল টাইপের বলে জানতাম। বেহিসেবি হওয়ার মতো মহিলা উনি ছিলেন না।

আপনি ওঁর প্রস্তাবে সায় দেননি বোধহয়?

দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমার জীবনের ধারা পালটে গেছে। তা ছাড়া, আপনাকে তো বলেইছি আমি ওঁর প্রতি কখনও অ্যাট্রাকটেড ছিলাম না, উনি আমাকে ব্যবহার করেছেন, আমিও নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছি লাইক এ গিগোলো, তার বেশি কিছু নয়।

সেদিন কি ওঁর প্রস্তাবে আপনি রেগে গিয়েছিলেন?

একটুও না। বলেছি তো, ভদ্রমহিলার জন্য আমার করুণা হচ্ছিল, আমি খুব শান্তভাবে ওঁকে বোঝনোর চেষ্টা করছিলাম, লজিক্যালি, কিন্তু উনি ক্রমশ রেগে উঠছিলেন, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন।

রেগে গিয়ে উনি কী করলেন?

চেঁচামেচি করলেন, কাঁদলেন, আমাকে যা খুশি বলে অপমান করলেন, আমি কিছুই গায়ে মাখিনি।

বাড়িতে কজন ঝি-চাকর ছিল বলে আপনার অনুমান?

খুব বেশি নয়। দারোয়ান আর একজন চাকরকেই আমি দেখেছি।

কোনও মহিলা?

না, কারও কোথাও সাড়াশব্দও পাইনি।

বাই দি বাই, আপনি সেদিন কীসে করে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন?

আমার একটা গাড়ি আছে।

নিজে চালান?

তা তো বটেই।

কী গাড়ি আপনার?

হুন্ডাই।

মিসেস বকশি কি আপনাকে মারধর করেছিলেন?

উত্তেজনার বশে উনি আমাকে একটা চড় মারেন এবং গালে খিমচে দেন। পুলিশ সেই দাগ থেকে ধারণা করে নেয় যে, আমি যখন ওঁকে গলা টিপে মারছিলাম তখন নাকি উনি আত্মরক্ষার জন্য আমাকে খিমচে দিয়েছিলেন, পুলিশ খুব সরল পথে চলতে চায়, তাই না?

ব্যাপারটাকে আপনিই বা জটিল ভাবছেন কেন?

আমি জটিল ভাবছি না, আপনারা যত সরল সিদ্ধান্তে আসছেন আমার পক্ষে পরিস্থিতি ততই জটিল হয়ে উঠছে। এই যে আপনি আমাকে তলব করে লালবাজারে টেনে এনেছেন তাতে আমার কত জরুরি কাজ পণ্ড হচ্ছে তা কি জানেন?

কেসটা খুনের, তাই আমাদের একটু সিরিয়াস হতে হয়েছে। তার ওপর সুব্রত বকশির কিছু পাওয়ারফুল কানেকশান আছে বলে আমাদের ওপর প্রেশার আসছে। যদিও আপনার একটু হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তবু একটু বিয়ার করুন, আপনাকে হয়তো আরও ইন্টারোগেট করা হবে। আপনি ওঁর সঙ্গে কতক্ষণ ছিলেন?

খুব বেশি হলে ঘণ্টা খানেক।

তার বেশি নয়?

না, বরং দু’-চার মিনিট কমই হবে।

যখন আপনি চলে আসেন তখন কি মিসেস বকশি শান্ত ছিলেন? মানে প্যাসিফয়েড হয়েছিলেন কি?

না। উই পার্টেড উইথ এ বিটার নোট। শি ওয়াজ আপসেট।

আর আপনি?

আমি খুবই হেলপলেস ফিল করেছিলাম। মিসেস বকশির মতো কঠিন মানুষ যে এতটা ইমোশনাল হতে পারেন সে ধারণা আমার ছিল না। এ যেন মিসেস বকশি নয়, অন্য কেউ। যেন বয়ঃসন্ধির কিশোরী। সাধারণত কম বয়সে প্রথম প্রেমে দাগা খেয়ে মেয়েরা ওরকম ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মিসেস বকশির মতো প্র্যাকটিক্যাল ডাউন টু আর্থ সেনসিবল মহিলাদের এরকম হওয়ার কথা নয়।

আপনার কি মনে হয় উনি অভিনয় করছিলেন?

না, একেবারেই না। অভিনয় করবেন কেন?

আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য।

না-না মিস্টার দাশগুপ্ত, অভিনয় হতেই পারে না, অভিনয় হলে ঠিকই ধরতে পারতাম।

তা হলে এই নতুন রূপের মিসেস বকশিকে দেখে আপনি ইমপ্রেসড?

তা এক রকম বলতে পারেন।

আপনি কি একটুও সফট হয়ে পড়েননি?

সফট কথাটার যদি বাঁকা অর্থ না ধরেন তবে বলতে পারি, হ্যাঁ, ওঁর প্রতি সহানুভূতিও হচ্ছিল। কিন্তু আমি একজন ওয়েদারবিটুন ম্যান, বয়স ত্রিশ হলেও অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া মানুষ। সহানুভূতি হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা কোনও দুর্বলতা নয়। ওঁকে আর প্রশ্রয় দেওয়া বা ওঁর কুক্ষিগত হয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

খুনটা কখন হয় তা কি আপনি জানেন?

আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছি। দুপুর দুটো-আড়াইটে নাগাদ।

সে সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?

সেও পুলিশকে বলেছি, তারা আমার কথা বিশ্বাস করছে না।

তবু আর একবার বলুন। আমি হয়তো বিশ্বাস করতেও পারি।

দুপুর একটা-দেড়টা থেকে বিকেল চারটে অবধি আমি আমার একটা ট্রাকের মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম।

কোথায়?

বেলতলায় আমার ট্রেলারগুলো রাখার জন্য আমি একটা জমি লিজ নিয়েছি। ছোটখাটো সারাইয়ের কাজও হয়। সেদিন আমি নিজেই আমার ট্রাকের একটা জখম চাকা মেরামত করছিলাম। খুব পরিশ্রান্ত হওয়ায় ড্রাইভারের কেবিনে উঠে শুয়ে পড়ি।

কোনও সাক্ষী আছে?

না।

আপনার গ্যারেজ পাহারা দেয় কে?

ওয়াচম্যান আছে।

ওয়াচম্যান আপনাকে দেখেনি?

সেদিন ওয়াচম্যান ছুটি নিয়েছিল। ভোররাতে তার মা মারা যায়। ফলে কেউ ছিল না। ওয়াচম্যানকে পুলিশ জেরাও করেছে।

জানি। মিসেস বকশির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গেলেন?

ডোভার লেনে আমার অফিসে। সেদিন আমার দম ফেলার সময় ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে বেলতলায় যাই।

আপনার অ্যালিবাই কিন্তু দুর্বল।

কান্ট হেলপ ইট। এবার কি আমি যেতে পারি?

পারেন। আসুন।

২. এই বাড়ির কাজের লোক

তুমি এই বাড়ির কাজের লোক ভিখু?

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতদিন হল এ বাড়িতে কাজ করছ?

প্রায় দশ বছর।

বাড়ি কোথায়?

ছাপরা জেলা।

এ বাড়িতে কীভাবে কাজে ঢুকলে?

আমার কাকা এ-বাড়িতে কাজ করত। কাকা এখন দোকান করে। আমাকে কাকা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

তুমি তো বেশ ভাল বাংলা বলো!

আমি তো জন্ম থেকেই কলকাতায় আছি। এখানেই মানুষ।

এ বাড়িতে তোমার কাজ কী?

এ বাড়িতে তো কেউ থাকে না। আমার কাজ ঘরদোর বিছানা-টিছানা সব পরিষ্কার রাখা। বছরে একবার মেমসাহেব আসেন, তখন তাঁর দেখভাল করতে হয়।

মেমসাহেবের বাপের বাড়ির লোকেরা কোথায়?

মেমসাহেবের তো কেউ নেই। বড় মালিক আর মালকিনও এখানে থাকতেন না। আমেরিকায় থাকতেন। সেখানেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে দু’জনেই মারা যান। এ বাড়িও বিক্রির চেষ্টা চলছে।

তোমাকে কত মাইনে দেওয়া হয়?

আড়াই হাজার টাকা।

বাড়ির কাজের লোকের পক্ষে মাইনেটা তো ভালই, কী বলো?

না সাহেব, এ টাকায় সংসার চালানো মুশকিল।

তোমার সংসারে কে আছে?

আমার বউ আর চার ছেলেমেয়ে। দুই বেটা, দুই বেটি।

এ বাড়িতেই থাকো?

না সাহেব। ফ্যামিলি নিয়ে এ বাড়িতে থাকার হুকুম নেই। আমার পরিবার থাকে তিলজলায়, একটা বস্তিতে।

তোমার চলে কী করে?

আমার বউও কাজ করে। বাড়ির কাজ।

ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকার হুকুম নেই কেন? এ বাড়িতে তো আউট হাউস আছে এবং সেগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে।

বাচ্চাকাচ্চা থাকলে বাড়ি নোংরা করবে, বাগানের গাছপালা ছিড়বে বলেই হুকুম নেই। তা ছাড়া অনেকে বাড়ি দখল-টখল করে নেয়।

এ বাড়িতে তো অনেক দামি জিনিস রয়েছে দেখছি। তোমাকে কি মেমসাহেব খুব বিশ্বাস করতেন?

তা জানি না। তবে থানায় আমার নাম ঠিকানা ফটো সব রেকর্ড করা আছে। কোনও জিনিস চুরি গেলে পুলিশ তো আমাদেরই ধরবে।

এবার ঘটনার দিনের কথা বলো।

ঘটনার দিন সকালে মেমসাহেব আমাকে ডেকে বলে দিলেন, একজন বাবু দেখা করতে আসবেন, ঘরদোর যেন ফিটফাট থাকে।

ঘরদোর তো ফিটফাটই আছে দেখছি।

হা সাহেব। এ বাড়ি সবসময়ে ফিটফাট থাকে। তবু মেমসাহেব বললেন বলে আমি আরও একটু ঝাড়পোঁছ করলাম।

মেমসাহেব কীরকম লোক ছিলেন বলে তোমার মনে হয়?

ভাল লোক ছিলেন।

কীরকম ভাল?

ঝুট ঝামেলা কিছু করতেন না। চুপচাপ থাকতেন।

রাগী মানুষ ছিলেন কি?

বেয়াদবি বরদাস্ত করতেন না। আমাদের খুব ফিটফাট থাকতে হত, নোংরা দেখলে রেগে যেতেন।

কাজে খুশি হলে বখশিশ দিতেন নাকি?

না। বখশিশ দিতেন না।

উনি কি কৃপণ ছিলেন?

না সাহেব। কিন্তু বখশিশ দিতেন না।

তোমাদের মাসের মাইনে কে দিত?

সতুবাবু। মেমসাহেবে সম্পর্কে দাদা। নিউ আলিপুরে থাকেন।

সতুবাবু কি প্রতি মাসে নিজে এসে টাকা দিয়ে যেতেন?

না। আমরা গিয়ে নিয়ে আসতাম।

সতুবাবুই কি এ বাড়ির দেখাশোনা করতেন?

হ্যাঁ। তবে উনি খুব একটা আসতেন না। ইদানীং এক পোমোটার বাবুকে নিয়ে মাঝে মাঝে এসে মাপ জোক করাতেন।

প্রোমোটারকে চেনো?

ঘোষবাবু। শুনেছি বড় প্রোমোটার।

তাঁর সঙ্গে তোমাদের কোনও কথাবার্তা হয়েছে?

না সাহেব। উনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন কেন?

এবার ঘটনার দিনের কথা বলো। সেই বাবুটি কখন এলেন?

আটটার পর।

চেহারা কেমন?

লম্বা-চওড়া চেহারা। হিরোর মতো।

দেখে কীরকম মনে হল?

আমি ভেবেছিলাম ফিল্মস্টার হবেন বোধহয়।

মেমসাহেবের সঙ্গে তাঁর কী কথাবার্তা হল জানো?

না সাহেব।

মেমসাহেব কি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন?

তা হতে পারে সাহেব। আমি ওসব দেখিনি।

উনি কতক্ষণ ছিলেন?

এক ঘন্টার মতো হবে। একটু কমও হতে পারে।

তুমি কি কফি বা চা দিয়েছিলে?

মেমসাহেব বলেছিলেন যেন কথাবার্তার সময় ওঁদের ডিস্টার্ব না করি। তাই আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর ভিতরে যাইনি। তবে দরজার কাছেই ছিলাম, যদি ডাকেন তা হলে যেন শুনতে পাই।

ভিতরে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা শুনতে পেয়েছিলে?

মেমসাহেব রাগারাগি করছিলেন, তবে আমি ইংরেজি জানি না বলে কথা কিছু বুঝতে পারিনি।

মেমসাহেব কি কান্নাকাটিও করেছিলেন?

হ্যাঁ। বাবুটি চলে যাওয়ার পর মেমসাহেব খুব আপসেট ছিলেন।

তুমি কি একেবারেই ইংরিজি জানো না? এই যে বললে আপসেট।

দুটো-একটা শব্দ জানি সাহেব।

সেরকম কোনও শব্দ মনে করতে পারো?

মেমসাহেব একবার বাস্টার্ড বলে গাল দিয়েছিলেন, মনে আছে।

ব্যস?

হ্যাঁ। আর কিছু মনে নেই।

বাবুটি যখন বেরিয়ে যায় তখন তাকে দেখেছ?

না সাহেব, আমি ভিতর দিকের দরজার পাশে ছিলাম। বাবু সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি জানো যে মেমসাহেব বাবুটিকে চড় মারেন?

জানি সাহেব, শব্দ শুনেছি।

আর কিছু?

দারোয়ান বলরাম বলেছিল বাবুর বাঁ-গাল থেকে রক্ত পড়ছিল। বাবু রুমাল দিয়ে গাল চেপে গিয়ে গাড়িতে ওঠেন।

মেমসাহেবকে তারপর কেমন দেখলে?

উনি খুব আপসেট ছিলেন। ইংরিজিতে কী সব বলতে বলতে দোতলায় উঠে গেলেন।

উনি সেদিন দুপুরে লাঞ্চ করেছিলেন কি?

না সাহেব আমি বেলা সাড়ে বারোটায় ওঁর দরজায় নক করি।

উনি সাড়া দেননি?

হ্যাঁ, দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কিছু খাব না। দুধ থাকলে এক গেলাস ঠান্ডা দুধ দিতে বললেন।

দুধটা খেয়েছিলেন কি?

হ্যাঁ সাহেব।

তারপর কী করলেন?

ঘরে চুপচাপ শুয়েছিলেন বলে মনে হয়।

খুনটা ক’টার সময় হয় তুমি তো জানো।

হ্যাঁ সাহেব, পুলিশের কাছে শুনেছি। বেলা দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে।

তুমি তখন কোথায় ছিলে এবং কেন তা পরিষ্কার করে বলো। পু

লিশকে সব বলেছি সাহেব। কিছু লুকোইনি। বেলা দেড়টা নাগাদ একটা ফোন আসে।

ফোন কি মেমসাহেব ধরতেন না?

না। মেমসাহেব ফোন ধরতেন না। কোনও জরুরি ফোন থাকলে আমি কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে ওঁকে দিতাম।

সব ফোন তুমিই ধরো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার বলো।

ফোনে একটা লোক আমাকে বলল, ভিখুচাচা তোমার ছেলে অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়েছে। খুব গহেরা জখম। আমরা তাকে পি জি হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তুমি এখনই চলে এসো।

গলাটা কার তা চিনতে পেরেছিলে?

না।

জিগ্যেস করোনি?

হ্যাঁ। বলল, আরে আমি তোমার পাড়ার ছেলে রামু। তাড়াতাড়ি চলে এসো। বহুত ইমার্জেন্সি। আমার মাথার ঠিক ছিল না সাহেব। আমি দৌড়ে গিয়ে মেমসাহেবকে বললাম। উনি ছুটি দিয়ে দিলেন। আমি পাগলের মতো হাসপাতালে ছুটলাম। গিয়ে দেখি ওখানে আমার ছেলের নামে কাউকে ভরতি করা হয়নি। তখন ছুটলাম বাড়িতে। গিয়ে দেখি আমার বউ ঘুমোচ্ছ। তাকে ডেকে তুলে সব বললাম। তারপর ছুটলাম ছেলের ইস্কুলে। গিয়ে দেখি, ছেলে ঠিক আছে, কিছু হয়নি।

কখন ফিরলে?

বেলা চারটে হবে।

এসে কী দেখলে?

চারটের সময় মেমসাহেবকে রোজ কফি দিই। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে কফি করে দোতলায় উঠে দরজা নক করতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা রয়েছে। বাইরে থেকে বললাম, কফি এনেছি। মেমসাহেব সাড়া দিলেন না। ভাবলাম ঘুমোচ্ছন। পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেমসাহেবের বডি অর্ধেকটা বিছানায় আর অর্ধেকটা নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে। মাথা নীচের দিকে।

ঠিক আছে। বাকিটা আমরা জানি। পুলিশ তোমাকে কী বলেছে?

সাহেব, পুলিশ আমাদের খুব হয়রান করেছে। চড় থাপ্পড় মেরেছে। কিন্তু আমি বা বলরাম আমরা মেমসাহেবকে খুন করতে যাব কেন বলুন! আমরাই তো তা হলে ভাতে মরব।

ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়েছিল বলে মনে হয়?

ঘরের জিনিসপত্র সবই আমি চিনি। সেসব কিছু চুরি যায়নি। তবে মেমসাহেবের ব্যাগ বা সুটকেস থেকে কিছু চুরি গিয়ে থাকলে তা বলতে পারব না। মেমসাহেবের জিনিস তো আমি ধরতাম না।

এবার যা জিগ্যেস করব খুব ভেবেচিন্তে তার জবাব দেবে।

বলুন সাহেব।

মাসখানেক আগে মেমসাহেব যখন এলেন তখন কি একাই এসেছিলেন?

হ্যাঁ সাহেব। মেমসাহেবের ফ্লাইট দেরিতে এসেছিল। আমার ওপর হুকুম ছিল সব রেডি রাখতে।

উনি কখন আসেন?

সন্ধেবেলা। সতুবাবু ওঁকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসেন।

সতুবাবু ছাড়া আর কেউ ছিল না?

না সাহেব।

সুব্রতবাবু কবে আসেন?

ছোটসাহেব তো মেমসাহেব মারা যাওয়ার পরে আসেন, খবর পেয়ে।

এসে উনি কী করলেন?

উনি এ বাড়িতে ওঠেননি। কলকাতায় ওঁর বাড়ি আছে, সেখানে উঠেছিলেন।

সুব্রতবাবু কি কখনও এ বাড়িতে উঠতেন না?

বেশিরভাগ সময়ে মেমসাহেব একাই আসতেন। ছোট সাহেবকে আমি খুব একটা দেখিনি।

ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো। গিয়ে পাঁচ মিনিট পর বলরামকে পাঠিয়ে দাও।

ভিখু চলে যাওয়ার পর টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে শবর উঠল। এটাই ছিল মিসেস বকশির শোওয়ার ঘর! খাঁটি আবলুশ কাঠের বিশাল একটা খাট, যার মাথার দিকটা সিংহাসনের মতো কাজ করা। দেরাজ আলমারি সবই একই কাঠের এবং ঝকমক করছে। তাদের পালিশ।

আসবাবগুলো সেকেলে, ভারী এবং অতিশয় মূল্যবান। ঘরে ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেটটাও পুরনো বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ির স্থাপত্যও আধুনিক নয়। পুরনো ব্রিটিশ আমলের প্যালেসের আদলে তৈরি। ঘরটা বিশাল, লাগোয়া দক্ষিণের বারান্দাটিও চমৎকার সোফাসেট দিয়ে সাজানো। আধুনিক জিনিস বলতে শুধু এয়ারকুলার লাগানো আছে ঘরে। শোওয়ার ঘরের একপাশে নিচু ক্যাবিনেটের ওপর দুটো বড় সুটকেস। আমেরিকায় তৈরি। সন্ট লাগেজ। কালচে রঙের সুটকেস দুটোই আটকে সিল করে দিয়ে গেছে পুলিশ। সুটকেস দুটো খোলার অধিকার আছে শবরের, কিন্তু সে খুলল না।

আসব স্যার?

এসো।

মধ্যবয়সি মজবুত চেহারার বলরাম শঙ্কিত মুখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

তুমিই তো দারোয়ান?

হ্যাঁ স্যার।

কতদিন কাজ করছ এ বাড়িতে?

কুড়ি বছর।

বাড়ির মালিককে তো তা হলে ভালই চেনো।

মাথা নেড়ে বলরাম বলে, না স্যার। মালিকরা কেউ তো এখানে থাকতেন না। ওঁরা অনেক বছর আমেরিকায়, দিদিমণির জন্মও তো হয়েছে ওখানেই। আমি ফাঁকা বাড়ি সামলে রাখতাম।

তোমার কাজ তা হলে কী?

কাজ বলতে কিছুই নেই। শুধু বসে থাকা।

কত মাইনে পাও?

আড়াই হাজার।

মাইনে তো ভালই।

যে আজ্ঞে, আমি একা লোক, চলে যায়।

একা কেন, পরিবার কোথায়?

আমি বিয়ে করিনি স্যার। মা বাবা মারা গেছেন। কেউ বিশেষ নেইও।

তুমি এ বাড়িতেই থাকো? হ্যাঁ

স্যার। গেট-এর পাশেই আমার ঘর। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি।

খুনের দিন সকালবেলা যে ভদ্রলোক এসেছিল তাকে মনে আছে?

হ্যাঁ স্যার। ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

দিদিমণির কি অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত?

না। বাড়িতে বেশি লোক আসত না।

লোকটা এসে কী করল?

নাম বলল, আমি খাতা খুলে মিলিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। এক ঘণ্টা পর উনি চলে যান।

তখন তুমি কী লক্ষ করেছিলে?

বাবুর বাঁ-গাল কেটে গিয়েছিল। রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছিলেন।

তোমার কী মনে হল তখন?

কিছু ঝামেলা হয়ে থাকবে। ভিখুকে জিগ্যেস করেছিলাম। ভিখু বলল দু'জনে ঝগড়া হয়েছিল, দিদিমণি বাবুকে খিমচে দেন।

সুব্রতবাবু কি এ-বাড়িতে আসত না?

খুব কম স্যার। দিদিমণির বিয়ে হয়েছে ষোলো-সতেরো বছর। দু-তিনবারের বেশি জামাইবাবুকে দেখিনি ভাল করে।

দিদিমণি কি প্রতি বছর নিয়ম করে দেশে আসতেন?

না স্যার। এক-দুই বছর বাদও যেত। শুনছিলাম এ বাড়ি বিক্রি করে দিদিমণি এবার আমেরিকাতেই থাকবেন, দেশের পাট চুকিয়ে। এখন যে কী হবে তা বুঝতে পারছি না। চাকরিটা তো যাবেই। বুড়ো বয়সে খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে।

টাকাপয়সা জমাওনি?

কিছু জমিয়েছি স্যার, পোস্টঅফিসে আছে। কিন্তু সেই সামান্য টাকায় কি জীবন কাটবে? টাকার দাম তত কমে যাচ্ছে, কতদিন বাঁচব তার ঠিক কী?

তোমার শরীর তো মজবুত, এখনও খাটতে পারো।

যে আজ্ঞে। কিন্তু লোকে কাজই দিতে চায় না।

চেষ্টা করছ নাকি?

সতুবাবু কয়েকমাস আগেই বলে দিয়েছেন যে, বাড়ি বিক্রির চেষ্টা হচ্ছে, আমি যেন অন্য ব্যবস্থা দেখে নিই। তাই একটু-আধটু চেষ্টা করেছি।

খুনের সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?

থানায়। ঝুটমুট আমাকে হয়রান করা হল স্যার। বেলা একটা হবে তখন। একজন সার্জেন্ট মোটরবাইক চেপে এসে বলল, থানার বড়বাবু নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, এখনই যেতে হবে।

কেন ডেকেছে তা বলেনি?

বলল, কেন ডেকেছে জানি না, তবে বলে দিয়েছে যেতে না চাইলে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে। বলেই চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দিদিমণিকে বললাম। দিদিমণি তখন বিছানায় শোয়া। হাত নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও।

দিদিমণি কি তখন কাঁদছিলেন?

ঠিক বুঝতে পারিনি। হতেও পারে। গলাটা ভারী লাগছিল।

তারপর বলো।

থানায় গেলাম, তা সেপাই আটকাল। কিছুতেই বড়বাবুর কাছে যেতে দেবে না। তখন বললাম বড়বাবুই ডেকে পাঠিয়েছেন। অনেক তত্ত্ব তালাসের পর বড়বাবুর ঘর দেখিয়ে দিল। গিয়ে যখন নামটাম বললাম বড়বাবু কিছুই বুঝতে পারেন না। যখন বললাম সার্জেন্ট গিয়ে এত্তেলা দিয়েছে তখন বড়বাবু বললেন, তা হলে সিরিয়াস কেসই হবে। আর একজন অফিসারকে ডেকে বললেন, এর একটা স্টেটমেন্ট নিন তো, মনে হচ্ছে সিরিয়াস কেস। তা সেই অফিসার আমাকে আর-একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল, ধুস, একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে বোধহয়। বলে নামধাম নিয়ে ছেড়ে দিল।

তখন কটা বাজে?

তা তিনটে-সাড়ে তিনটে হবে।

গেট ততক্ষণ খোলা ছিল?

তালা ছিল না। তবে ফটকে আগল দিয়ে গিয়েছিলাম।

দিদিমণি যে খুন হয়েছে তা কখন বুঝলে?

সাড়ে চারটে নাগাদ ভিখু এসে বলল।

কী করলে তখন?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমরা গরিব মানুষ স্যার, বিশেষ লেখাপড়াও জানি না, কী থেকে কী হয় ভেবে আমরা সহজেই ভয় পাই। একবার তো ভেবেছিলাম পালিয়ে যাব। তারপর মনে হল হিতে বিপরীত হবে। তাই পুলিশে খবর দিই। পুলিশ স্যার, আমাদেরই ধরে নিয়ে গেল। তারপর অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর সতুবাবু গিয়ে ছাড়িয়ে আনেন।

দিদিমণি কীভাবে খুন হয়েছেন জানো?

কেউ গলা টিপে খুন করে গেছে। যে গলা টিপেছে তার হাতে নাকি দস্তানা ছিল।

ঠিক কথা। আর কিছু বলতে পারো?

কী বলব স্যার?

তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

না স্যার, কাকে সন্দেহ করব?

দিদিমণি খুন হওয়ার আগে এ-বাড়ির সামনে দিয়ে কোনও একজন বা দু'জন লোককে বারবার যাতায়াত করতে দেখেছ? কিংবা কোনও অচেনা লোক কি গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেয়েছে?

এ তো বড়লোকদের পাড়া স্যার। লোকের যাতায়াত কম, তবে আমি বেকার বসে থাকি বলে আশপাশের বাড়ির চাকর দারোয়ানরা মাঝে মাঝে এসে গল্পটল্প করে

যায়।

অচেনা কেউ?

না স্যার, মনে পড়ছে না। গেটের কাছে টুলে বসে থাকলে অবশ্য অনেকে বাড়ির হদিশ চায়, এত নম্বর বাড়িটা কোনদিকে হবে এইসব।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। সতুবাবু একটু বাদেই আসবেন। তিনি এলেই সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো।

ঠিক আছে স্যার। ভিখুকে কি আপনার জন্য চা করতে বলব স্যার?

বলতে পারো।

বলরাম চলে যাওয়ার পর শবর ঘুরে ঘুরে বাড়ির দোতলাটা দেখছিল। ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে। দারুণ সুন্দর সব রঙের কম্বিনেশন। বাথরুমে খুব আধুনিক ফিটিংস লাগানো। প্রতি ঘরেই নানারকম সাবেকি আসবাব। দুই আলমারি বোঝাই বিলিতি আর জাপানি পুতুল। পিয়ানো, অর্গান ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র রাখা প্রকাণ্ড হলঘরে। বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি। অথচ এ বাড়িতে থাকার লোকই নেই। অন্তত বিগত চল্লিশ বছর ধরে বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সতুবাবু বিশাল গাড়ি করে এলেন। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের ফরসা নাদুশনুদুশ মানুষ। মোটা গোঁফ আছে। পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট।

নমস্কার মিস্টার দাশগুপ্ত।

আসুন।

আপনার তদন্ত কতদূর?

চলছে।

আমার কাছে কী জানতে চান বলুন।

এবাড়ির ওয়ারিশান কে?

বাড়ির ওয়ারিশান এখন সুব্রত। স্বাভাবিক আইনে।

এবাড়ি কি বিক্রি হওয়ার কথা চলছিল?

হ্যাঁ, অরুর তো সেরকমই ইচ্ছে ছিল। কলকাতার পাট তুলে দেবে বলেছিল।

সুব্রতবাবুরও কি তাই ইচ্ছে?

সুব্রতর বোধহয় একটু অমত আছে।অরুণিমা বলছিল সুব্রত এরকম প্রস্তাবে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

কোনও কারণ আছে?

তা জানি না।

সুব্রতবাবুদের এখানকার বাড়ির অবস্থা কেমন?

মুখটা একটু বিকৃত করে সতুবাবু বললেন, অবস্থা আবার কেমন হবে? ছিল তো বনগাঁর রিফিউজি ক্যাম্পে। তারপর বিধানপল্লিতে কোনওরকমে টিনের ঘর করে থাকত। এখন অবশ্য পাকা ঘর হয়েছে শুনেছি, তা তারও অনেক ভাগীদার। ওর কাকা-জ্যাঠাদেরও নাকি ও বাড়ির শেয়ার আছে। সুব্রতর বাবা তো চিরকালের ভ্যাগাবন্ড। কোন একটা কো অপারেটিভে সামান্য বেতনের চাকরি করত। ভাগ্য ভাল ছেলেটা হল ব্রিলিয়ান্ট। সেই জোরেই আমেরিকা গেল। এই তো ওদের হিস্ট্রি। এখন বুঝে নিন।

অরুণিমা দেবী আর সুব্রতবাবুর কি লাভ ম্যারেজ?

হ্যাঁ মশাই, নইলে মনাকাকা কখনও এই পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেয়? তবে সুব্রত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বলে কাকা আপত্তি করেননি।

ওদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল জানেন?

আগে তো ভালই ছিল। ইদানীং অরু কিছু অনুযোগ করছিল।

কীরকম অনুযোগ?

এমনিতে কংক্রিট কিছু নয়। অরু চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল। তবে নানা কথায় দু’-একটা মন্তব্য করে ফেলত।

ওঁদের সন্তানহীনতাই কি তার জন্য দায়ী?

না মশাই, সন্তানের জন্য দুঃখ সে তো থাকতেই পারে। তাতে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়?

হয়। সন্তান একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর।

মানছি। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে থাকলে হয়েছে অন্য কারণে।

সেই কারণটা কী?

জানি না।

মিসেস বকশি আপনার খুড়তুতো বোন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার কাকার অবস্থা তো খুবই ভাল ছিল দেখছি।

আমরা ব্যবসায়ী পরিবার। মনাকাকার তো জাহাজ ছিল। সেসব অনেক ব্যাপার।

এ বাড়িটা কি আপনার মনাকাকাই করেছিলেন?

না। আমার দাদুর তৈরি বাড়ি। চার ছেলের জন্য চার জায়গায় উনি বাড়ি করে রেখে গেছেন।

সবকটা বাড়িই এরকম ভাল?

বড়কাকার আলিপুরের বাড়িটা আরও ভাল।

এ বাড়ি কি বিক্রি ঠিক হয়ে গেছে?

সবই তো পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সব কেঁচে যাবে বলে মনে হয়। এখন তো অরু নেই, সুব্রত মালিক। সে রাজি না হলে বিক্রি আটকে যাবে।

উনি কি বিক্রি করতে রাজি নন?

আমার সঙ্গে কথা হয়নি। কিন্তু অরুর কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় সুব্রত রাজি হবে না।

দারোয়ান আর চাকর দু'জনেই বলেছে যে, সুব্রতবাবু নাকি এ বাড়িতে আসতেন না।

ঠিকই বলেছে। কলকাতায় এলে সুব্রত ওদের কলোনির বাড়িতেই থাকত। অরুণিমা থাকত এ বাড়িতে। তবে ওরা কেউই এখানে এসে বেশিদিন থাকত না। বড়জোর পনেরো কুড়ি দিন।

অরুণিমা দেবীর জন্ম তো আমেরিকায়। আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন কী করে?

আমাদের পরিবারের অনেকেই বিদেশে আছে। আমি নিজে বেশ কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলাম। তখন অরু ছোট। আমি ওর নিজের দাদার চেয়েও বেশি ছিলাম।

খুনের খবরটা আপনি কখন পান?

সেইদিনই বিকেলে। ভিখু ফোন করে আমায় জানায়।

আপনার নিজের কোনও ডিডাকশন আছে কি?

মাথা নেড়ে সতুবাবু বললেন, না মশাই, এ একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত। অরুকে কে কেন খুন করবে তা আমি আজ অবধি বুঝে উঠতে পারিনি। মিহির বলে ছোরাটারই বা কী স্বার্থ ওকে খুন করার তাও জানি না।

মিহিরের সঙ্গে অরুণিমা দেবীর সম্পর্কটা কীরকম ছিল, জানেন?

একেবারে জানি না বললে ভুল হবে। ঘাসে মুখ দিয়ে তো চলি না। অরুণিমা ওর প্রতি সট ছিল।

আপনার কাছে অরুণিমা কিছু বলেছেন কি?

খুব পরিষ্কার করে নয়।

উনি কি সুব্রতবাবুকে ডিভোর্স করার কথা ভাবছিলেন?

আমাকে খুলে কিন্তু বলেনি। তবে অরুর হাবভাব দেখে মনে হয় সুব্রতর প্রতি ওর আর তেমন টান নেই।

তার জন্য মিহিরবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই কি দায়ী?

তাও জানি না মশাই।

সুব্রতবাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়? সতুবাবুর মুখটা ফের বিকৃত হল। তারপর একটু হেসে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাই, নিজের মুখেই বলছি উই আর ভেরি রিচ পিপল। বনেদি বড়লোক। সুব্রতরা হল এ ক্লাস অ্যাপার্ট, সুব্রত নিজের যোগ্যতায় ওপরে উঠেছে বটে, কিন্তু ওদের কালচার আর রুচি তো সেই নিম্নমধ্যবিত্তই রয়ে গেছে। ওদের টাকা হলে লোক দেখানো বড়লোকি করতে থাকে। বনেদি পরিবার অন্যরকম হয়। সুব্রতকে অরুর সঙ্গে আমার মিসফিট বলেই মনে হয়েছে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু সুব্রতবাবু লোকটি কেমন?

মাপ করবেন, আমি জানি না। দু-চারবার দেখা হয়েছে, হেসে দু-চারটে কথাও কয়েছে, কিন্তু ওকে স্টাডি করিনি কখনও।

অরুণিমা দেবীও কি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছিলেন?

হ্যাঁ, ওদেশে স্কুলে কলেজে ওর স্কোর দুর্দান্ত। যে জাপানি কোম্পানিতে ওরা দু'জনে কাজ করে তাতে অরুর পজিশনই বেটার।

দু'জনের মধ্যে কি প্রফেশনাল জেলাসি ছিল?

কী জানি, অত জানি না।

সুব্রতবাবুর এক বোন এখন আমেরিকায় আছে, জানেন?

জানি মশাই, জনা, শুটকি মেয়েটার বোধহয় এখানে বর জুটছিল না তাই সুব্রত ওকে নিয়ে গিয়েছে। মার্কিন গন্ধ মাখিয়ে পাত্রস্থ করবে।

শুনেছি মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল।

তা হতে পারে। অরু তো ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

কেন?

বলত খুব ন্যাকা টাইপের মেয়ে, ভাবুক ভাবুক ভাব করে থাকে। আসলে ভিজে বেড়াল।

আপনি নিম্নমধ্যবিত্তদের খুব ঘেন্না করেন, না?

এবার সতুবাবু তটস্থ হয়ে হেসে ফেললেন, আরে না মশাই, ঘেন্না করব কেন? সমাজের নানা স্তর তো থাকবেই, নইলে সমাজ বলেছে কেন? আসলে কালচার ক্রস হলেই প্রবলেম দেখা দেয়। অরুর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। মানুষকে তো ঘেন্না করার কিছু নেই।

শুনে স্বস্তি পেলাম।

৩. ইউ হেট উইমেন

ইউ হেট উইমেন।

দ্যাটস নট ট্রু।

আই নো, ইউ হেট গার্লস। অল গার্লস।

তা নয়। বলতে পারেন আমি নিস্পৃহ।

ইউ মিন প্যাসিভ।

অনেকটা তাই। আমি খেটে-খাওয়া মানুষ, নন-রোমান্টিক।

খেটে-খাওয়া মানুষেরা বুঝি রোমান্টিক হতে পারে না?

তা পারে। কিন্তু আমি বোধহয় মনের দিক দিয়ে শুষ্ক।

আসল কথাটা স্বীকার করলেই তো হয়, ইউ আর অ্যান্টি ফেমিনিন।

অতবড় কথাটা স্বীকার করি কী করে?

কখনও প্রেমে পড়েছেন?

প্রেমে পড়তে দিল কই মেয়েরা? তার আগেই যে মেয়েরা আমাকে ব্যবহার করে ফেলল। ব্যবহৃত হয়ে হয়ে প্রেমটাই গেল হারিয়ে।

ব্যবহার মানে? সেজুয়ালি?

তা ছাড়া আর কী?

আপনি একটু শেমলেস, খোলাখুলি কেউ ওসব বলে?

ট্রুথফুল হতে গেলে বোধহয় একটু শেমলেস হতেই হয়। না?

আপনি বাজে লোক।

অনেকে তাই বলে বটে।

আপনার নিজের কী ধারণা?

বোধহয় খুব ভাল লোক নই।

এটা বিনয় নয় তো?

না-না, আমার ডিফেক্টগুলো সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল।

আর কী কী ডিফেক্ট আছে আপনার?

লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে ম্যাডাম। দোষগুলো না দেখলেই হয়।

এই তো বললেন আপনি ট্রুথফুল, কীরকম সততা আপনার?

অন্তত ডিজঅনেস্ট নই। কিন্তু ম্যাডাম, এই যে রোজ রাত বারোটায় আপনি আমাকে ফোন করে এসব খবর নেন এর পিছনে মতলবটা কী?

অ্যাসেস করা।

নিজের পরিচয়টাও আজ অবধি দেননি।

একটা নাম তো! যা হোক একটা ভেবে নিন না।

আপনি তা হলে কিছুতেই নিজের নাম পরিচয় দেবেন না?

ওটা ইররেলেভ্যান্ট।

আপনি পুলিশের লোক নন তো!

হলেই বা ক্ষতি কী?

না, ক্ষতি আর কী? যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়েই গেছে।

কী ক্ষতি হয়েছে শুনি?

পুলিশ আমাকে মারধর করেছে, অপমানজনক গালাগাল দিয়েছে, তার ওপর মার্ডারের চার্জ চাপিয়ে দিয়েছে।

আপনি কি বলতে চান মিসেস বকশিকে আপনি খুন করেননি?

বললেই বা বিশ্বাস করছে কে বলুন।

কেউ না করলে জামিন পেলেন কী করে?

শবর দাশগুপ্ত নামে এক ভদ্রগোছের গোয়েন্দার দাক্ষিণ্যে। শেষ রক্ষা হবে কিনা জানি না। জামিন তো আর অ্যাকুইটাল নয়।

শবর দাশগুপ্ত খুব ইন্টেলিজেন্ট গোয়েন্দা।

হলেই বা। শবর দাশগুপ্ত একা কী করবে? গোটা পুলিশ ফোর্স তো আমার বিরুদ্ধে।

মিসেস বকশি কি আপনাকে ভালবাসতেন?

উনি তো সেরকমই বলতেন।

তার মানে আপনি ওঁর ভালবাসাকে বিশ্বাস করতেন না?

না।

ওমা! কেন? ভালবাসাকে কি বিশ্বাস না করা যায়?

ভালবাসা অনেক সময়েই কতগুলো আবেগ বা স্বার্থকে নিয়ে তৈরি হয়। স্বার্থ আহত হলে বা আবেগ উবে গেলে ভালবাসাও হাওয়া। বুঝলেন ম্যাডাম?

আপনি ভীষণ বাজে লোক। বোধহয় একটু পাষণ্ডও, তাই না?

কী জানি ম্যাডাম। নিজের সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে নানা কাজ করতে হয়। কাজ নিয়েই সময় কেটে যায়। নিজেকে নিয়ে খুব একটা ভাবি না।

কাজ আমাদের সবাইকেই করতে হয়।

তা তো বটেই।

বারবার নিজেকে অত কাজের লোক বলে জাহির করছেন কেন?

খেটে খাই তো, সে কথাটাই বোঝাতে চাইছি।

দুনিয়ায় সবাই খেটে খায়, কেউ মাথা খাটিয়ে, কেউ শরীর খাটিয়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে আপনি তো আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা কিছু নন।

না, তা নই বটে।

যারা খেটে খায় বা জীবন সংগ্রাম করে তাদের তো হৃদয়বৃত্তি মরে যায় না।

আমি কি বলেছি, যে আমার হৃদয়বৃত্তি মরে গেছে?

সেরকমই তো বোঝাতে চাইছেন। যেন এত কাজ যে প্রেম পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

ম্যাডাম, আমি তা বলতে চাইনি। আমি তো বলেছি মেয়েরা আমাকে বড্ড বেশি স্থূলভাবে ব্যবহার করেছে।

আপনি ব্যবহৃত হলেন কেন?

বললে আপনি চটে যাবেন।

তবু বলুন।

বায়োলজিক্যাল প্রয়োজন তো আমারও আছে।

ইস আপনি ভীষণ অসভ্য।

এই তো চটে গেলেন। এসব আপনার না শোনাই ভাল।

আর এ বিষয়ে একটাই প্রশ্ন।

বলুন।

জনা কে?

সুব্রত বকশির বোন।

কেমন মেয়ে?

ভাল মেয়ে।

সুন্দর?

সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। ওই একরকম। খুব গম্ভীর।

জনা নাকি আপনার প্রেমে হাবুডুবু?

আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

জানি।

তা হলে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আপনার মুখ থেকে শোনার জন্য।

কী আর শুনবেন ম্যাডাম। চেষ্টা করেও জনার প্রেমে পড়তে পারিনি।

আপনার কি একজন মার্কিন স্ত্রী ছিল?

না। স্ত্রী আমার ছিল না। মেয়েটি ছিল লিভ ইন গার্লফ্রেন্ড।

এমাঃ। আপনি তো জঘন্য লোক।

ম্যাডাম, এটাই তো অর্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।

মোটেই নয়। সুবিধেবাদীরা ওসব কথা বলে।

আমি যে সুবিধেবাদী তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

সেই মেয়েটি কি খুন হয়েছিল?

মাই গড, আপনার নেটওয়ার্ক তো দারুণ।

খুন হয়েছিল, না?

হ্যাঁ।

তাকে খুন করলেন কেন আপনি?

ম্যাডাম আমার যে দু-একটা গুণকে আমি নিজেই অ্যাপ্রিসিয়েট করি তা হল আমি খুনখারাপি করতে অক্ষম।

তার মানে কী?

ওই একটা জিনিস আমি বোধহয় পারি না। আজ অবধি পারিনি।

সত্যি বলছেন? বিশ্বাস করা বা না করা আপনার হাতে।

দু-দুটো মেয়ে আপনার সংস্পর্শে আসার পর খুন হল, এটা কি কাকতালীয় বলতে চান?

আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু বলি, দুশ্চরিত্র হলেও আমি খুনি নই।

দুশ্চরিত্র কথাটা কিন্তু আমি বলিনি।

না। আপনি বেশ ভদ্র। বললেও কিছু মনে করতাম না।

আচ্ছা আপনি দুশ্চরিত্রই বা কেন?

ম্যাডাম, ওখানেও গণ্ডগোল আছে। আমি লম্পট হিসেবে কারও কারও কাছে চিহ্নিত বটে, কিন্তু সেটাও আমার চারিত্রিক তারল্যের ব্যাপার নয়। বরং বলতে পারেন ভিকটিম অফ সারকামস্ট্যান্সেস।

অর্থাৎ আপনি সাধুপুরুষ, মেয়েরাই আপনাকে নষ্ট করেছে, এই তো?

আকাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে তাই বলতে হয়।

দেখুন মশাই, আপনার মধ্যে নষ্ট হওয়ার ইচ্ছে না থাকলে কোনও মেয়ে কি আপনাকে নষ্ট করতে পারত?

আপনি বেশ পিউরিটান আছেন। ব্যাপারটাকে নষ্ট হওয়া বলছেন কেন বলুন তো? বিদেশে ফিজিক্যাল নিডটাকে ওরা টয়লেটে যাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় না। তবে মরালিটি বা পিউরিটানিজমকে আমি অশ্রদ্ধা করি না। ওরও দাম আছে।

দামটা কি আপনি দেন?

দিই ম্যাডাম, দিই।

তবে নিজে ঠিক থাকেন না কেন?

ওই যে বললাম, আমি কেবল খেলার পুতুল হিসেবে কাজ করেছি।

এদেশে এসে ক’জন মেয়ের সর্বনাশ করেছেন?

গত এক বছরে আমার জীবনে নারীসঙ্গ বলতে কিছু নেই তেমন। মিথ্যে বলব না, দু চারটে কেস হয়ে গেছে।

রোমান্টিক ইনভলভমেন্ট না ফিজিক্যাল?

ফিজিক্যাল।

তারা কারা?

শুনবেন?

শুনিই না।

একজন এয়ার হোস্টেস, একজন বড়লোকের বয়স্কা স্ত্রী, একজন বয়স্কা অ্যাকট্রেস এবং একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা।

সবাই বয়স্কা?

কপালে আমার দেখছি বয়স্কাই জোটে।

আপনি সত্যিই ভীষণ খারাপ।

তা তো বলাই যায়। কিন্তু এর প্রত্যেকটারই প্রয়োজন ছিল, তা কি জানেন?

না। আপনার প্রফেশনাল প্রয়োজন?

হ্যাঁ। ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট, পুলিশের ঝামেলা এইসব নানা স্বার্থে আমাকে আপনার ভাষায় নষ্ট হতে হয়েছে।

নষ্ট হতে তো আপনি ভালই বাসেন দেখছি।

তা ম্যাডাম, খারাপও কিছু লাগে না।

আবার মরালিটিকেও পছন্দ করেন।

তাও করি। আমি নিজে বিশুদ্ধ নই বলে বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করব কেন?

বিশুদ্ধ হতে ইচ্ছে করে না?

কোনও ফল পচতে শুরু করলে আর কি বাঁচানো যায়?

ফলে ইচ্ছাশক্তি নেই, মানুষের তো তা আছে।

ভাল বলেছেন। তবে ফের ওই কথা বলতে হয়, আমি নিমিত্ত মাত্র।

ওটা অজুহাত। আসলে আপনি একজন প্লেবয়। প্লে

বয় হতে যোগ্যতা লাগে। আমার সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং কই? সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার স্কোপ কম। বিশেষ করে হাই সোসাইটির। আমাকে যারা ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই হল বয়স্কা, সেক্স স্টাভার্ড, ফ্রাস্ট্রেটেড বা সিনিক মহিলা। ওরা আমাকে কাজে লাগায়, আমি ওদের কাজে লাগাই।

ছিঃ ছিঃ, আপনি একটা কী বলুন তো?

বলেছি তো, নিজেকে নিয়ে আমার গৌরব হয় না।

নিজেকে ঘেন্না হয় না?

না ম্যাডাম, তাও হয় না। কারণ মস্তিষ্কহীন হওয়ার ফলে আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার বালাই নেই। আর আমি তো রেপিস্ট নয়।

রেপিস্টের চেয়ে ভালও কিছু নন।

ভাল কথা রেপিস্ট শব্দটা আমার মতে একটা ভুল শব্দ। ওটা হওয়া উচিত রেপার।

ওমা। তা কেন?

যে অর্থে কমিউনিস্ট, লিরিসিস্ট, আইডিয়ালিস্ট সেই অর্থে তো রেপিস্ট হওয়া উচিত নয়। কমিউনিজম, আইডিয়ালিজম, লিরিসিজমের মতো তো রেপিজম বলে কিছু নেই। আছে কি?

না।

তা হলে রেপিস্ট হয় কী করে?

সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

আপনি কি ইংরেজির ছাত্রী?

নিজের সম্পর্কে আমি আপনাকে কোনও কথাই বলব না।

আপনি শুধু একটি কণ্ঠস্বর হয়েই থাকতে চান?

মন্দ কী?

রহস্যময়ী হয়ে থাকতেই কি আপনি পছন্দ করেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানেন যে আমি ইচ্ছে করলেই আপনার নম্বর ট্রেস করতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু কষ্ট করে যে নম্বরটা আপনি খুঁজে পাবেন সেটা একটা পাবলিক কল বুথ।

আপনি কি বলতে চান এত রাতে আপনি একটা পাবলিক কল বুথে এসে ফোন করছেন?

তা তো বলিনি? আমি আমার বাড়ি থেকেই ফোন করছি, তবে সরাসরি নয়। একটা কল বুথের থ্রু দিয়ে। আর ওই বুথ কিছুতেই আপনাকে আমার নম্বর দেবে না।

আচ্ছা মানুষ আপনি। এত গোপনীয়তা আর সাবধানতার কী দরকার ছিল?

ছিল। আমি চাই না আপনি আমাকে ট্রেস করুন।

আপনি কি আমাকে ভয় পান না কি ঘেন্না করেন?

কোনওটাই না।

নিছক কৌতূহল?

যা হোক একটা কিছু হবে।

একজন অচেনা মহিলা আমাকে রাত বারোটায় কেন ফোন করেন তার কারণটা কি আমার জানা উচিত নয় বলে মনে করেন?

আপনার কি খারাপ লাগছে? তা হলে বলুন ছেড়ে দিই।

আরে না, ইনফ্যাক্ট আপনার গলার স্বরটা এত ভাল যে আই ফিল অ্যাট্রাক্টেড টু ইট। আর আপনি বেশ ইন্টেলিজেন্টও বটে। সেইজন্য আমি আজকাল আপনার ফোনের জন্য অপেক্ষাই করি।

আপনার কি মনে হয় আমি আপনার বিবেকের ভূমিকা নিচ্ছি?

তা একটু মনে হয়। তবে সেটা খারাপই বা কী বলুন! আমার বিবেক জাগ্রত নেই। তাই আর কেউ বিবেকের বিকল্প হতে চাইলে তা ভালই।

আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো।

না। আমি সারাদিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু-পাঁচ মিনিট করে ঘুমিয়ে নিই। আমার অনেক কালের অভ্যেস। ওভাবেই আমার চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনাফ।

যাক, তা হলে বিরক্ত হচ্ছেন না?

না, বরং বেশ ভাল লাগছে। আপনি কি রবীন্দ্রসংগীত বা ওরকম কিছু গান নাকি?

কেন বলুন তো?

বেশ মিউজিক্যাল ভয়েস।

গাইলেই কি বলব নাকি?

ও, আপনি তো আবার পণ করেছেন নিজের সম্পর্কে কিছু আমাকে বলবেন না।

না। এবার বলুন তো, মিসেস বকশি আপনাকে কেন ডেকেছিলেন?

এমনি। পুরনো চেনার সূত্রে।

এড়িয়ে যাচ্ছেন তো?

কথাটা কি আগে হয়নি?

হয়েছে, কিন্তু আপনি ভাঙছেন না।

আসলে ভসভসে আবেগ ভালবাসার কথাই বলছিলেন তিনি সেদিন। আমাকে বিয়ে করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

রাজি হননি বলেই কি রেগে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে কি উনি কোনও লোভ দেখাননি?

তাও দেখিয়েছিলেন। কী করে জানলেন আপনি?

সিম্পল লজিক।

আপনি খুব বুদ্ধিমতী।

বলুন না।

হ্যাঁ, উনি আমাকে সেদিন অনেক টাকা অফার করেছিলেন। টাকাটা নিলে তিনটে ট্রেলার কেনার সব ব্যাঙ্ক লোন আমার শোধ হয়ে যেত।

কত টাকা?

ওঁর যা অফার ছিল তা দু-আড়াই কোটি টাকা তো হবেই।

আপনি রিফিউজ করলেন। বোকা নাকি?

ম্যাডাম, একজন ভদ্রলোককে এক জায়গায় তো থামতেই হয়। লাইন অফ কন্ট্রোল। তা নইলে যে নিজের মুখ আয়নায়ও দেখা যাবে না।

হঠাৎ মরালিটি জেগে উঠল নাকি আপনার?

তাও বলতে পারেন। আমার মনে হল এই ভদ্রমহিলাকে যদি এখনই আমি সত্যি কথাটা বলে না দিই তা হলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেমে যাবে।

যাঃ। আপনি তো আর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নন মশাই।

না, তা নই। তবু আই কনফেসড।

কী বললেন ভদ্রমহিলাকে?

আপনার প্রশ্নগুলো ঠিক পুলিশের মতোই।

হয়তো আমি পুলিশেরই লোক। বলতে আপত্তি আছে?

আরে না। আমি হলাম খোলা বই। আপত্তির কী আছে? আমি খুব বিনয়ের সঙ্গেই বললাম, আমার টাকাপয়সা রোজগার করতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু অযথা অর্থপ্রাপ্তিতে আমার আনন্দ হয় না। দ্বিতীয়ত, খুব বেশি টাকাও আমাকে আনন্দ দেয় না এবং আত্মবিক্রয় করার মধ্যেও আর আমি এন্টারটেনমেন্ট খুঁজে পাই না।

বাঃ বেশ বলেছেন তো! লাইক এ কারেজিয়াস ম্যান? লাইক এ ম্যান অফ স্ট্রং ক্যারেক্টার।

ঠাট্টা করছেন? তা করতেই পারেন। আমার রেকর্ড তো ভাল নয়।

ঠাট্টা করলাম বুঝি?

তা হলে?

কমপ্লিমেন্টই দিলাম তো?

তা হলে অন্যরকম শোনাল কেন? একে ব্যাজস্তুতি বলে না?

আমি অত বাংলা জানি না। ভদ্রমহিলা কী করলেন?

শি ওয়াজ অন হার নিজ। হাঁটু গেড়ে বসা যাকে বলে।

এতটা? শুনেছিলাম উনি বেশ ব্যক্তিত্বওয়ালা মানুষ।

তাই ছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, চমৎকার মেধা, স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। কিন্তু কোনও কারণে আমার ওপর অবসেশনটা একটা অপটিমামে পৌঁছেছিল। দেখলাম উনি প্রায় পাগলামি করছেন।

কেন যে অ্যাকসেপ্ট করলেন না?

সেটা যে মিথ্যাচার হত ম্যাডাম। ওঁর সঙ্গে আমার শরীরের সম্পর্ক ছিল ঠিকই, মনের সম্পর্ক কখনও নয়। আর একটা কথা হল, ওঁর এই ম্যাডনেস দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার নয়। ওঁর প্যাশনটা ছিল অস্থির এবং উৎকেন্দ্রিক।

আপনি খুব শক্ত শক্ত বাংলা বলেন, তাই না?

না ম্যাডাম, বাংলা কী করে জানব? আমি ঘোর অশিক্ষিত।

অশিক্ষিত কেন?

মাধ্যমিক পাশ করার পরই সার্কাস দলে চলে যাই বাড়ি থেকে পালিয়ে। তারপর কসরত করে করেই তো সময় পার হয়ে গেল। এখন মনে হয়, পড়াশোনা করলে বোধহয় জীবনটা অন্যরকম হত।

কেন, এই জীবনটা কি আপনার ভাল লাগে না?

ব্যাবসা মানেই হচ্ছে প্রতিদিন অসতের সঙ্গে আপস করে চলা। তিনটে বিশাল ট্রেলার আছে আমার। এগুলোকে খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে এদেশে কালঘাম ছুটে যায়। কত দেবতার যে প্রণামী দিতে হয় ভাবতে পারবেন না। পুলিশ, প্রশাসন, ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার সিকিউরিটি থেকে গুন্ডা, মস্তান–কে কার চেয়ে কম যায় বলুন। তা ছাড়া রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো তো আছেই, অ্যাক্সিডেন্ট, ডাকাতি, চুরি। ব্যাবসা মানেই হল কনস্ট্যান্ট হেডেক অ্যান্ড টেনশন।

অন্য ব্যাবসা করুন না। যেখানে এত টেনশন নেই?

আমি যেটা ধরি সেটার শেষ অবধি দেখতে চেষ্টা করি। এটা ফেল করলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

ফেল করছে কি?

না না, তা বলিনি। আয় মোটামুটি ভালই হয়।

আমি তো শুনেছি আপনি বেশ পয়সাওয়ালা লোক।

তা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পয়সা আসে যায়। আমার দুঃখ কিছু নেই অবশ্য। বেশি বড়লোক হতে আমি কখনও চাইনি।

মদ খান না?

শরীর সচেতন ছিলাম তো, তাই নেশাটেশা করতাম না। অভ্যাসটা তাই হয়ে ওঠেনি। তবে পার্টিটার্টিতে ভদ্রতার খাতিরে এক-আধ সিপ খেয়েছি, প্রেজুডিস নেই। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন? মদ্যপান আজকাল ভাইসের মধ্যে পড়ে না। সবাই খায়।

আপনি খুব শক্তপোক্ত লোক, তাই না? গায়ে ভীষণ জোর?

গায়ের জোর ফালতু জিনিস। ও দিয়ে কিছু হয় না।

আপনি কি একটু গুন্ডা গোছের লোক?

বরং ঠিক উলটো। আমি ভীষণ ঠান্ডা মাথার লোক। রাগ নেই। শুনলে অবাক হবেন, আমি মারপিট করিনি কখনও। ঝগড়াঝাটির উপক্রম দেখলে পালিয়ে আসি।

তার মানে কি কুল কাস্টমার?

তা বলতে পারেন। আমার সম্পর্কে আপনার সোর্স অফ ইনফর্মেশনটা কে বলুন তো?

সেসব কিছুই বলা যাবে না।

আপনিও একজন কুল কাস্টমার, তাই না?

হ্যাঁ। মিসেস বকশিকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

নো আইডিয়া।

বাড়িতে তো লোকজন আছে। দুপুরবেলা কী করে খুনটা করল বলুন তো?

সেটা নিয়ে পুলিশ তো ভাবছেই।

আপনার সিক্সথ সেন্স কী বলে?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে আমার কিছু নেই। খুনটা নিয়ে আমাকে প্রচণ্ড হ্যারাস করেছে পুলিশ। হাতজবাসও করতে হয়েছে। শবর দাশগুপ্ত এসে না পড়লে কী যে হত কে জানে।

আপনার অ্যালিবাই নেই?

একেবারে নেই যে তা নয়, কিন্তু খুব দুর্বল অ্যালিবাই, পুলিশ বিশ্বাসই করছে না।

শবর দাশগুপ্ত কি আপনাকে বিশ্বাস করে?

বিশ্বাস? হাসালেন ম্যাডাম। শবর দাশগুপ্তর চোখ দেখেছেন? বাঘের চোখ, বিশ্বাস করার ধাত নয়। তবে মনে যা-ই থাক, লোকটা মুখে ভদ্র এবং লজিক্যাল। হয়তো আমাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিয়েছে।

আপনার জামিন কে দিলেন?

আমার উকিল সদাশিব মজুমদার।

খুনি যদি ধরা না পড়ে তা হলে কি আপনাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

আপনি ভয় পাচ্ছেন না?

ভয় না হলেও উদ্বেগ তো আছেই। তবে আমার তো কেউ নেই। বুড়ো বাবা আর মা। তবে তারা একটা জীবন আমার জন্য এত উদ্বেগ পুইয়েছেন যে, তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আপনার ব্যাবসার কী হবে?

উড়ে-পুড়ে যাবে। হিসেব করে দেখেছি, চোদ্দো বছর হাজতবাস করলে যখন বেরোব। তখন আমার বয়স হবে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জীবন ফের শুরু করা যাবে। আর যদি ফাঁসিতে লটকে দেয় তো ল্যাটা চুকেই গেল।

ফাঁসি।

তাও হতে পারে, এদেশে মৃত্যুদণ্ড এখনও বহাল আছে। আমি অবশ্য আইনকানুন তেমন জানি না।

খুনটা আপনি কি করেননি?

কেন করব বলুন তো! মিসেস বকশিকে মেরে আমার কী লাভ? কোনও প্রতিশোধস্পৃহা নেই, ওঁর সম্পত্তি পাব না, জেলাসি নেই। খুনটা তবে করব কেন?

মোটিভ? সে তো কতরকমের থাকে। আপনি হয়তো সাইকোপ্যাথ।

আপনি যা খুশি ডিডাকশন করতেই পারেন। তার ওপর তো আমার হাত নেই।

আপনার উচিত পুলিশের কাজে খুশি না থেকে নিজেও একটু তদন্ত করা।

ও বাবা! আপনি তো ডোবাবেন দেখছি।

কেন? নিজের স্বার্থেই তো আপনার একটু উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

পাগল নাকি? পুলিশ আমার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। থানায় রেগুলার হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। একটু বেচাল দেখলেই ফের খপ করে নিয়ে যাবে।

আহা, আমি বলছি আপনি বসে বসে তো একটু ডিডাকশনও করতে পারেন। কে মারতে পারে তা আন্দাজ করা আপনার পক্ষেই সবচেয়ে সহজ। কারণ, আপনি ভদ্রমহিলাকে চিনতেন, তার স্বভাব-চরিত্র এবং দুর্বলতা সবই আপনার জানা। এখানে ওঁর পরিচিত কারা আছেন তাও আপনার জানা থাকার কথা।

সব মানছি। চিন্তা যে করিনি তাও নয়। আমার ডিডাকশন করার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। আমার কেন যেন মনে হয় এটা প্রফেশনালদের কাজ।

তার মানে?

মানে খুব সোজা। কেউ চুরি বা ডাকাতি করার মতলবে ঢোকে। মিসেস বকশি বাধা দেওয়ায় খুন করে রেখে যায়।

ডাকাতি কি কিছু হয়েছে?

পুলিশ বলতে পারছে না।

আলমারি বা সুটকেস কি ভাঙা ছিল?

না ম্যাডাম, ভাঙার তো দরকার ছিল না। মিসেস বকশিকে খুন করে ওরা ওঁর চাবি দিয়েই সবকিছু খুলেছে। কাজ সেরে ফের চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

বড্ড সরল ডিডাকশন।

আমার মাথায় এর চেয়ে বেশি কোনও সম্ভাবনার কথা আসেনি যে!

আরও ভাবুন।

ভেবে মাথা ভারাক্রান্ত করা কি ঠিক হবে? বরং আমার শবর দাশগুপ্তকে খুব এফিশিয়েন্ট বলে মনে হয়। উনি হয়তো কিনারা করে ফেলতেও পারেন।

ওঁর ওপর খুব ভরসা আপনার!

হ্যাঁ, ভরসা একটু আছে। খুব স্ট্রং ভরসা নয়, তবে সামান্য একটু নির্ভর করতে পারছি। ভদ্রলোক ফেল করলে আমার কপালে কষ্ট আছে। তবে ভাগ্য ভাল যে, বিয়েটিয়ে করিনি। আমার একার ওপর দিয়ে যাবে।

মা-বাবাও তো কষ্ট পাবেন।

তা পাবে। তবে দেয়ার ডে'জ আর নাম্বারড। আমার মা-বাবা জীবনে সুখে থাকেনি। আমি যৌবনকালে কষ্ট দিয়েছি, এখন আমার দাদারা দেয়।

আপনি তো এখনও কষ্ট দিচ্ছেন।

না ম্যাডাম, এই খুনজনিত ঝামেলা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে মা-বাবার অর্থকষ্টজনিত সমস্যা নির্মূল করেছি। কাজের লোক রেখে দিয়েছি। মাবাবা এখন আরামেই আছে। শ্রীঘরে যেতে না হলে আমি তাদের ছেড়ে যে আর কোথাও যাব না তাও তাদের কাছে শপথ করেছি।

ওরা হয়তো আপনাকে সংসারী দেখলেই বেশি খুশি হতেন।

তা আর বলতে! মা তো বিয়ে বিয়ে করে পাগল করে তুলেছে আমায়। গোটা দশেক পাত্রী দেখেও ফেলেছে। দেখার জন্য আমাকেও টানাহ্যাঁচড়া কম করা হয়নি। খুনের কেসটায় ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছে।

আপনি কি বিবাহবিরোধী?

তা কেন? আসলে ওসব নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না। আর দাদাদের তো দেখছি। মা বাবার খোঁজ অবধি নেয় না।

সেটা কি তাদের বউদের দোষ?

তা জানি না। তবে বিয়ের পরেই তাদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে।

সেইজন্য বউরা দায়ী হবে কেন? আপনার দাদারাই দায়ী।

ঠিকই বলেছেন। বউদিদের দায়ী করা আমার ঠিক হয়নি।

আজকাল মা-বাবার সঙ্গে থাকলে খটাখটি, অশান্তি বেশি হয়।

আমি সংসার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই। তবে আপনি যা বলছেন তা হতেও পারে।

হ্যাঁ মশাই, ছেলেরা বউ নিয়ে আলাদা থাকাই ভাল।

তা হলে আর আমার বিয়ে করা হবে না।

ওমা! কেন?

আমি বুড়ো মা-বাবাকে ছাড়তে পারব না। একটা জীবন অনেক কষ্ট দিয়েছি। দু-তিন বছর নাপাত্তা ছিলাম। ভেবে ভেবে আমার মায়ের হার্টের অসুখ হয়েছে।

তা হলে বোবা-কালা মেয়ে বিয়ে করুন। না হলে গাঁ-গঞ্জের একটু হাবাগোবা মেয়ে।

আমার তো বউয়ের দরকারই নেই।

ও! তা হলে সেই ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো!

বলেছি তো, ওটাও আমার হাতে নেই। ফুলেরা মধু বিতরণ করতে চাইলে বেচারি মৌমাছির দোষটা কোথায়?

আপনি ভীষণ খারাপ লোক।

তা তো আগেও বলেছেন।

আবার বলছি।

বেশ তো, মেনেও নিচ্ছি। আমি খারাপ লোক।

.

ফোন ছেড়ে দিলেন নাকি?

.

ম্যাডাম, তা হলে কি গুড নাইট?

ফোন ছাড়িনি মশাই।

তা হলে চুপ করে ছিলেন কেন?

আপনার ওপর রাগ হচ্ছিল।

সে তো বুঝতেই পারছি। আমাকে অনেকেই পছন্দ করে না।

আচ্ছা, যদি সেরকম মেয়ে পান তা হলে বিয়ে করবেন।

আপনাকে তো আমার মায়ের মতোই বিয়েতে পেয়েছে দেখছি।

আহা বলুন না।

কীরকম মেয়ের কথা বলছেন।

যে আপনার মা-বাবার যত্নআত্তি করবে?

সে কি আর পাওয়া যাবে? আমার মা-বাবা তো তোর মা-বাবা নয়। সে কি আর আমার চোখ দিয়ে আমার বাবা-মাকে দেখবে? ওসব শরৎচন্দ্রের নভেলে হয়।

কেন হবে না?

এখনকার মেয়েরা তাদের অন্যরকম আইডেন্টিটি খুঁজে পেয়েছে। তারা কেন শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে পড়ে থাকবে?

তা থাকতে হবে কেন? আপনি তো তাদের জন্য লোক রেখে দিয়েছেন। বউ একটু দেখাশোনা করবে, ভাল ব্যবহার করবে।

সেটা তো দুরাশা। হয়তো আমার মাকে বা বাবাকে সে পছন্দ করতে পারবে না। তারা তো আর পারফেক্ট হিউম্যানবিয়িং নয়। না ম্যাডাম, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

তা হলে মা কি খুশি হবেন?

তা হবে না। তবু বিয়ে না করা লেসার ইভিল।

আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো!

না ম্যাডাম, আমার ইচ্ছা-ঘুম।

এখন কটা বাজে জানেন?

রাত একটা।

আপনার কথা বলতে খারাপ লাগছে না তো?

আরে না ম্যাডাম, সারাদিন তো আড্ডা মারার সময়ও পাই না, মানুষও পাই না। এখন যাহোক একটু আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে।

আমি মোটেই আড্ডা দিচ্ছি না।

তা হলে কী করছেন?

আমি আপনাকে অ্যাসেস করছি।

ওঃ হ্যাঁ, তা তো বটে।

ইয়ারকি হচ্ছে?

না তো! তবে অ্যাসেস করে কী লাভ? আমি সামান্য মানুষ।

একটা মার্ডার কেসে আপনি প্রাইম সাসপেক্ট। খবরের কাগজে আপনার নাম উঠেছিল, মনে নেই?

হ্যাঁ, তা বটে। আমি কুখ্যাত লোক।

যা বলেছি তা মনে থাকবে?

অনেক কথাই তো বলেছেন। কোনটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে?

মার্ডারটা নিয়ে ভাবুন।

ভাবছি তো।

ওরকম এলোমেলো ভাবনা নয়।

তা হলে?

সেদিন মিসেস বকশির সঙ্গে আপনার যা যা কথা হয়েছিল সেগুলোর ওপর কনসেনট্রেট করুন।

সেগুলোও তো মাঝে মাঝে ভাবি।

আপনি ভীষণ ক্যালাস লোক।

তা হয়তো হবে।

সেদিন মিসেস বকশিত্র কোনও কথার কোনও আলাদা অর্থ হয় কি না ভেবে দেখুন। খুব ডিপলি ভাবুন। আমি কাল আবার রাত বারোটায় ফোন করব।

ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি আমার জন্য ভাবছেন বলে ধন্যবাদ।

আপনার জন্য ভাবছি কে বলল?

তা হলে?

জাস্ট একটা নাগরিক কর্তব্য হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি।

সেটাই বা কে দেয় বলুন?

এখন ইয়ারকি ছেড়ে ভাবুন তো। এক্ষুনি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে হবে না। রাতে– বিশেষ করে গভীর রাতে ভাবনাচিন্তা খুব শার্প হয়। এখন বসে বসে কিছুক্ষণ মাথাটাকে খাটান তো! আমিও ভাবছি।

আপনার ঘুম পায়নি তো।

না। বিবেক কি ঘুমোয়? ছাড়ছি।

আচ্ছা ম্যাডাম। কাল আবার

টুক করে ফোনটা কেটে গেল।

মহিলা যে কে তা কিছুই বুঝতে পারছে না মিহির, দিন-চারেক আগে প্রথম ফোনটা আসে। রহস্যময় কথাবার্তা, কিছুতেই পরিচয় না দেওয়া। তারপর প্রতি রাতেই ফোন। মেয়েটা কে হতে পারে তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না সে। এদেশের খুব বেশি মেয়েকে চেনেও না মিহির। গলার স্বর থেকে অনুমান হয়, বয়স কম। আঠেরো, উনিশ, কুড়ি হতে পারে। মিহির সম্পর্কে মেয়েটির দুর্বার কৌতূহল এবং বোধহয় হৃদয়ের একটু দ্রব ভাব। কিন্তু এসব কী করে হয়? মিহির একটু হি-ম্যান গোছের আছে ঠিকই। বেশ লম্বাচওড়া এবং সুপুরুষ, কিন্তু তা বলে সব মেয়েই ঢলে পড়বে এমন নয়।

কোনও চিন্তাই বেশিক্ষণ মাথায় থাকে না মিহিরের। ঘুম আসছিল না। সারাদিন আসুরিক খাটুনির পর ঘুম। আধো তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ সে চমকে উঠল। না, তেমন

কনসেনট্রেট না করেও হঠাৎ তার মনে পড়ল, অরুণিমা সেদিন হঠাৎ এক সময়ে খুব অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিল, আমি মরে গেলে ও সব পাবে। আমি একদম তা চাই না, একদম না। আমি চাই এসব তোমার হোক। কত টাকার সম্পত্তি আমার জানো! ভাবতেই পারবে না।

এটা কি ইম্পর্ট্যান্ট কথা? কে জানে।

মিহির ঘুমিয়ে পড়ল।

৪. লোকটিকে কি আপনারা ছেড়ে দিলেন

মিস্টার দাশগুপ্ত, লোকটিকে কি আপনারা ছেড়ে দিলেন?

না। মিহিরবাবু বেল পেয়েছেন।

বেলই বা পায় কী করে? হি ইজ দি প্রাইম সাসপেক্ট।

সেটা আদালত জানে। আমাদের কিছু করার নেই।

পাবলিক প্রসিকিউটর কি বেল-এর বিরোধিতা করেননি?

বলতে পারব না। আমি আদালতে ছিলাম না। কিন্তু মিহিরবাবুর বেল নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? প্রয়োজন হলে তাকে আবার অ্যারেস্ট করা যাবে।

ওকে আপনারা চেনেন না মিস্টার দাশগুপ্ত। যে-কোনও সময়ে ও হাওয়া হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ওর প্রতিভা সাংঘাতিক।

সেক্ষেত্রে কী আর করা যাবে বলুন? পুলিশ তো সর্বশক্তিমান নয়। আদালতের বিরুদ্ধাচরণ তো করতে পারি না।

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ভাল হল না। খুনটা যে মিহিরই করেছে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই নেই!

কে বলল নেই? সন্দেহ অবশ্যই আছে।

সে কী?

পুলিশের হাতে ভদ্রলোককে কনডেম করার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

এদেশের পুলিশ কি এতই অপদার্থ?

এদেশের পুলিশ এদেশের মতোই। কী আর করা যাবে বলুন?

ডিসগাস্টিং! ভেরি ডিসগাস্টিং।

দুঃখিত মিস্টার বকশি। আপনাকে খুশি করতে পারছি না। বাই দি বাই আপনি কবে এলেন?

কাল রাতে।

আপনি তো মোটে মাসখানেক আগেই আমেরিকায় ফিরে গেলেন!

দেড় মাস। আসতে হল জরুরি প্রয়োজনে। আমার সম্বন্ধী সত্যব্রত আয়রন সাইড রোডের বাড়িটা প্রমোটারকে বিক্রি করার তোড়জোড় শুরু করেছে। ওর কাছে নাকি আমার স্ত্রীর দেওয়া পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও আছে। খবর পেয়ে আসতেই হল।

বাড়িটা বোধহয় আপনি বিক্রি করতে রাজি নন?

পাগল নাকি? বাড়ি বিক্রি করব কেন? সত্যব্রতর সঙ্গে এই নিয়ে ঝামেলা চলছে বলেই আমাকে আসতে হয়েছে।

আমি যতদুর খবর রাখি আপনার স্ত্রীর আরও গোটা দুই বাড়ি আছে এবং ব্যাঙ্কে ক্যাশ এবং অন্যান্য বন্ডে আছে প্রচুর টাকা।

হ্যাঁ। ওদের অবস্থা তো ভালই ছিল।

আপনিই এখন এসবের মালিক তো।

ন্যাচারালি। জিজ্ঞেস করছেন কেন?

না, ভাবছিলাম অন্য কোনও ওয়ারিশান আছে কিনা।

কে থাকবে?

উনি কোনও উইলটুইল করেছিলেন কিনা জানেন?

লুক ম্যান, অরুণিমা ওয়াজ জাস্ট আভার ফটি। এই বয়সে কেউ উইল করতে যায়?

ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?

খোঁজার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু একথা বলছেন কেন?

প্রিয়ব্রত মজুমদার নামে একজন বিখ্যাত অ্যাটর্নি আছেন, জানেন কি?

না তো!

আমি তার ফোন নম্বর আপনাকে দিচ্ছি। একটু কথা বলে দেখুন।

হোয়াট ডু ইউ মিন? হঠাৎ আমি উটকো একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে যাব কেন?

উনি অরুণিমা দেবীর অ্যাপয়েন্টেড অ্যাটর্নি।

অরুণিমার অ্যাটর্নি! কই জানতাম না তো!

আপনি আপনার স্ত্রীর অনেক কিছুই হয়তো জানতেন না!

তার মানে?

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম।

আপনি ননসেন্স টক করছেন।

আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন? আমি তো জাস্ট আপনাকে একজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে বলেছি। এতে মেজাজ খারাপ করার মতো কিছু তো নেই।

আর ইউ হিন্টিং সামথিং?

আরে মশাই, কথা বলেই দেখুন না। প্রিয়ব্রতবাবু ইজ এ রিনাউন্ড ম্যান ইন দি ফিল্ড অফ ল। আজেবাজে লোক নন।

তিনি আমাকে কী বলবেন?

যা বলবেন তা হয়তো আপনার পছন্দ হবে না। কিন্তু ট্রুথ ইজ অলওয়েজ লাইক দ্যাট। নট প্যালেটেবল।

ঠিক আছে, নম্বরটা দিন।

নোট করে নিন। এখন দশটা বাজে, ঘণ্টাখানেক পরে ওঁকে ওঁর চেম্বারে এই নম্বরে পাবেন।

অরুণিমা কি গোপনে কোনও ডিল করেছিল?

আমার মুখ থেকে শুনবেন কেন? প্রপার অথরিটির কাছ থেকে জেনে নিন।

আপনি আমাকে টেনশনে ফেলে দিলেন।

তা হয়তো দিলাম। কিন্তু সবটা জেনে এবং বুঝেই এগোনো ভাল।

ফোনটা কেটে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শবর। কলকাতার ক্ষণস্থায়ী শীত বিদায় নিচ্ছে। বাইরে রোদের তেজ বাড়ছে। ফেব্রুয়ারির শেষে কলকাতায় আজকাল রোদের বেশ তাপ, হাঁটলেই ঘাম হয়। বেরোতে ইচ্ছে করছিল না শবরের। কিন্তু একটা মোবাইল নম্বরে বারবার ফোন করেও মিহিরকে ধরা যাচ্ছে না। ফোন সুইচ অফ করা আছে।

শবর অগত্যা উঠল। ফোনটা বেজে উঠতেই ভ্রু কুঁচকে তাকাল যন্ত্রটার দিকে। তারপর তুলে নিল।

শবর দাশগুপ্ত বলছি।

শাহেনশাকে ধরা গেছে স্যার। চালান দেব কি?

আরে না না, চালানফালান নয়। বসিয়ে রাখুন। কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেব।

ওর নাকি ড্রাগ নেওয়ার সময় হয়েছে। খুব রেস্টলেস।

ওকে ড্রাগ নিতে দিন।

আপনি পারমিশন দিচ্ছেন তো?

হ্যাঁ। আমি ওকে নরমাল অবস্থায় চাই।

ঠিক আছে। আপনি কি আসছেন?

হ্যাঁ। আমি এখনই রওনা দিচ্ছি। আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

আধঘণ্টা পর দক্ষিণ কলকাতার একটা ফাঁড়িতে শবর দাশগুপ্ত শাহেনশার মুখোমুখি হতেই সুপুরুষ, দীর্ঘকায় বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের শাহেনশা উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম করল। শাহেনশার দাড়ি এবং গোঁফ খুব যত্ন করে ট্রিম করা। পরনের পোশাক অবশ্য এলোমেলো। ময়লা জিনসের প্যান্ট আর গায়ে ইস্তিরিহীন সবুজ পাঞ্জাবি।

ভাল আছেন তো সাহেব?

ভাল। তুমি কেমন?

সব ঠিক হ্যায়। কুছ মুসিবত হল নাকি সাহেব?

সাউথ ক্যালকাটার আয়রন সাইড রোডে অরুণিমা বকশি মার্ডার হয়েছিল জানো তো!

জানি সাহেব।

কে জানো?

না সাহেব।

তোমাকে না জানিয়ে কে কাজ করবে এখানে? তুমি না ডন?

আজকাল বহুত মস্তান উঠছে সাহেব। আপনি তো সব জানেন।

উঠতি মস্তান?

হা সাহেব।

এরকম ছক কষে কি ওরা কাজ করবে? মনে হয় না।

খোঁজ নিয়ে বলব সাহেব।

তোমার তো কখনও ভয়ডর বা জানের পরোয়া ছিল না।

ও বাত তো ঠিক সাহেব।

কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে আজকাল তোমার ভয়ডর হয়েছে।

শাহেনশা মাথাটা নিচু করে বলল, দিনকাল খারাপ আছে সাহেব। বহুত কম্পিটিশন, বহুত পলিটিক্স, বহুত টেনশন।

সেটা আমি জানি তোমার চেলা মিল্টন কি আলাদা হয়ে গেছে?

জি সাহেব। মিল্টন তিলজলায় ডেরা করেছে।

তোমার দলে কে আছে এখন?

বাচ্চু, ঘিয়া, পাগলু। সব নতুন আছে সাহেব।

তুমি কেস করো না?

না সাহেব। বখরা পাই।

অরুণিমা বকশিকে যে খুন করেছে সে পুরনো লোক।

আমার লোক করেনি সাহেব।

সেটা আমি জানি। কিন্তু কে করেছে সেটা তোমার না জানার কথা নয়।

জানি না সাহেব।

তুমি ভয় পাচ্ছ শাহেনশা!

শাহেনশা পায়ে পায়ে একটু ঘষাঘষি করল। মুখটা একটু বিবর্ণ।

কন্ট্রাক্ট মার্ডার, বুঝলে?

হ সাহেব।

খুনটা হয়েছে তোমার এলাকায়। তোমাকে সেলামি না দিয়ে কাজটা কি কেউ করতে পারে?

সাহেব, আজকাল এলাকা কেউ মানে না। পয়সার লালচ বাড়ছে তো। পুরানা জমানা তো আর নেই।

সেটা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। লোকটাকে আমার চাই শাহেনশা।

খবর নিয়ে জানাব সাহেব।

আজ বিকেলে?

আর একটু টাইম লাগবে।

টাইম লাগার কথা নয় শাহেনশা, তুমি আসলে ভয় পাচ্ছ। ড্রাগ ধরার পর কি এসব হচ্ছে?

না সাহেব। সিচুয়েশন বদল হয়ে গেছে।

কাকে ভয় পাও?

কাউকে না। টাইমটাকে ভয় পাই সাহেব। আজকাল সব উলটোপালটা ব্যাপার হয়।

ঝেড়ে কাশো শাহেনশা, চুপ করে থাকার জন্য কত টাকা পেয়েছ?

শাহেনশা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

তোমার বিরুদ্ধে তো কোনও কেস দিচ্ছি না, তোমাকে ধরাও হবে না, শুধু একটা ইনফর্মেশন চাইছি। মনে পড়ে তোমাকে আমি এর আগে তিনবার বাঁচিয়ে দিয়েছি?

বহুত মেহেরবানি। সাহেব, আমি ভুলিনি।

তা হলে আমার ঋণ একটু শোধ করো।

ছোকরা অ্যারেস্ট হয়ে গেলে বহুত হুজ্জত হবে সাহেব। রায়ট হয়ে যাবে। আমি খতম হয়ে যাব।

অ্যারেস্ট করব না। যে খুনটা করে সে-ই তো আর আসল খুনি নয়, যে খুনটা করায় সে-ই আসল খুনি। আমি তাকে ধরতে চাইছি।

কথা দিচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ। তবে আমি জানতে চাই পেমেন্ট কে করেছে।

বকশি মেমসাহেবকে খুন করেছে লম্বুর দল। খাটো আর সেলিম ছিল অপারেশনে।

পেমেন্ট কে করেছে?

এজেন্সি।

কোন এজেন্সি?

সার্ভিস টু দি পিপল।

খাটো কি কলকাতায়?

না সাহেব। অপারেশনের পর সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটাই নিয়ম।

জানি। এজেন্সির মালিক জনি, তাই না?

জি সাহেব। জনি ইনফর্মেশন পায় টেলিফোনে। টাকা ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়।

তার মানে খুনটা কে করিয়েছে তা জনি জানে না?

না সাহেব।

কাকে সন্দেহ হয় শাহেনশা?

আমরা কাউকে সন্দেহ করি না। টাকা পাই, কাজ করি।

বুঝলাম। টাকার অ্যামাউন্ট জানো?

না সাহেব। আমি দশ হাজার পেয়েছি।

সেটা কত পারসেন্ট?

জানি না সাহেব। নিট দশ হাজার। নো বারগেন।

ঠকে গেছ। আমার হিসেবে পাঁচ থেকে দশ লাখের মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে। তার কম নয়।

হতে পারে সাহেব। আমার কাছে তো এটা ফালতু টাকা। তাই আমি আর খোঁজখবর নিইনি।

ঠিক আছে শাহেনশা, তুমি যেতে পারো।

জি সাহেব।

লম্বুর মোবাইল নম্বর জানো?

জানি সাহেব।

দাও।

নম্বরটা ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে কেউ বলল, বোলো।

শবর গম্ভীর গলায় বলল, ফোনটা লম্বুকে দাও।

তুমি কে?

তোর বাপ। লম্বুকে দে।

ওপাশটা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা গমগমে গলা বলে উঠল, কৌন হ্যায় বে?

বলেছি তো তোর বাপ। আমি শবর দাশগুপ্ত।

আরে স্যার, আপনি! নমস্কার স্যার। আমি লম্বু।

শোন, কথা আছে।

বলুন স্যার।

আয়রন সাইড রোডের অরুণিমা বকশিকে খুন করানোর কন্ট্রাক্ট তোমাকে কে দিয়েছিল জানো?

স্যার, এসব কী বলছেন!

আকাশ থেকে পড়লে যে! অ্যাকটিং ছাড়ো। তুমিও সেয়ানা, আমিও সেয়ানা।

সে কথা তো ঠিক, কিন্তু স্যার, পার্টিকে তো চিনি না।

খবর নিতে পারবে?

জনি কাজটা দিয়েছিল। জনিও জানে না।

কত টাকার কন্ট্রাক্ট?

পাঁচ।

জনি কোথায়?

এখানে আছে স্যার। আমি জনির এজেন্সি থেকেই বলছি।

ভারী মিষ্টি মোলায়েম একটা গলা বলল, নমস্কার স্যার। আমি জনি।

কন্ট্রাক্টটা কত টাকার ছিল জনি?

ছয়।

কে তোমাকে ফোন করেছিল?

নাম বলেনি।

পুরুষ না মহিলা?

মহিলা।

শিয়োর?

হ্যাঁ স্যার। শিয়োর।

বয়স কীরকম হবে?

বেশি নয় স্যার। ছুকরির গলা।

তোমার অ্যাকাউন্ট নম্বর জেনে নিয়েছিল?

হ্যাঁ স্যার। অনেকে তো নিজে কন্ট্রাক্ট করে না। ভয় পায়।

ক'বার ফোন করেছিল?

দু'বার।

গলা চিনতে পারবে?

পারব। আমার ভয়েস মেমারি ভাল।

হয়তো দরকার হবে না। শোনো। এখন কয়েকদিন তোমার ফোন এলে ধরবে না। অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করে রাখবে। তোমাকে যেন মোবাইলে ফোন করে।

স্যার, আপনি কি আমাদের ওপর অ্যাকশন নেবেন?

আপাতত নয়। কিন্তু এ লাইনটা ছাড়ো। যেদিন ধরব সেদিন ঝুলিয়ে দেব। পার পাবে না।

জানি স্যার। কিন্তু এটা তো প্রফেশন, নাথিং এলস।

ফিলজফি ঝেড়ো না।

দোষ ধরবেন না স্যার, পুলিশের বখরাও দিয়েছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা নামিয়ে রাখল শবর।

আরও চল্লিশ মিনিট বাদে মিহিরের গ্যারাজে হাজির হয়ে গেল শবর।

মিহির তার ট্রাকের ইঞ্জিনে কাজ করছিল। কালিঝুলি মাখা অবস্থায় নেমে এল।

আরে আপনি?

মোবাইলটা তো সুইচ অফ করে রেখেছেন, তাই আসতে হল।

কাজ করছিলাম বলে ফোন অফ রেখেছি। বলুন কী খবর।

অ্যাটর্নি প্রিয়ব্রত মজুমদারকে চেনেন?

না। কে তিনি?

আপনাকে ফোনটোন করেননি?

আজ্ঞে না।

অরুণিমা বকশি আপনাকে কত টাকা অফার করেছিল?

ওঃ সে অনেক টাকা। কোয়াইট এ ফরচুন। অ্যামাউন্ট বলেনি।

আপনি কি জানেন যে তিনি একটা উইল করে রেখে গেছেন?

উইল! না, আমি জানব কোত্থেকে?

ইন কোর্স অফ টাইম আপনি জানতে পারবেন।

কী জানব?

জানবেন যে উনি ওঁর কলকাতার বিষয়সম্পত্তি আপনার নামে ট্রান্সফার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমার নামে! হোয়াই মি?

বোধহয় ওঁর ভালবাসার নিদর্শন।

পাগল নাকি? ভালবাসা নয়, ওটা ছিল ওর ইগোজনিত পাগলামি। আমাকে উনি দখল করতে চেয়েছিলেন, লাইক এ ট্রফি।

আপনি তো এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছেন।

শবরবাবু, আমাকে আপনি কী ভাবেন বলুন তো!

কী আবার ভাবব?

আমি কি লোভী! নাকি ল্যালা! আমাকে মিসেস বকশি যদি সব দিয়ে গিয়েও থাকেন ওঁর এক পয়সাও আমি ছোঁব না।

আপনার ইগোও তো কম নয়।

এটা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। ইগো নয়। আমার টাকার কোনও অভাব নেই এবং খুব বেশি বড়লোক হওয়ারও ইচ্ছে নেই। মধ্য পন্থাই আমার ভাল লাগে।

তা হলে কী করবেন?

কিছুই করব না। উইলটা ছিঁড়ে ফেলে দেব।

শুধু উইল নয়, উনি অলরেডি আপনার নামে সবকিছু ট্রান্সফার করেছেন।

তাতেও কিছু নয়। আবার ট্রান্সফার করে দেব।

কাকে?

ওঁর হাজব্যান্ডকে।

এত টাকা ছেড়ে দেবেন?

ধরার যখন প্রশ্নই নেই।

আপনি চান বা না চান, অরুণিমা বকশি আপনাকে তার সবকিছু দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে আপনাকে একটু বিপদেও ফেলে গেছেন।

বিষয়সম্পত্তি মানেই তো বিপদ।

ঠিক কথা। কিন্তু আপনি যে অর্থে বলছেন তা ছাড়াও বিপদ আছে।

সেটা কীরকম?

মরটাল ডেনজার।

তার মানে কী?

আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন।

মাই গড! কেন?

কারণ আছে বলেই।

কিন্তু আমি তো ওসব চাইছি না।

সেটা সবাই বুঝবে না।

আমাকে কে খুন করবে?

ভাড়াটে খুনি।

সর্বনাশ!

আপনি তো বাহাদুর লোক, ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয়ের কথাই বলছেন যে!

আরে, নার্ভাস হলে চলবে কেন?

নার্ভাস নই মশাই, আমি ঝুটঝামেলা পছন্দ করি না।

পিসফুল লাইফ চান তো!

হ্যাঁ।

তা হলে কো-অপারেট করুন।

করছি তো।

করছেন না। সেদিন অরুণিমা বকশি আপনাকে আরও কিছু বলেছিলেন যা আপনি আমার কাছে চেপে গেছেন।

আমার যা মনে পড়েছে বলেছি।

উনি সুব্রত বকশির একজন বান্ধবীর কথাও বলেছিলেন।

মাথা নেড়ে মিহির বলে, না, বলেননি। বিশ্বাস করুন।

সুব্রত বকশির কি কোনও বান্ধবী নেই?

থাকলেও আমি জানি না। সুব্রতদার সঙ্গে আমার বিজনেস রিলেশন ছিল, ইন্টিমেসি ছিল না। মিসেস বকশি সুব্রতদাকে এতই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন যে ওঁকে নিয়ে ওঁর মাথাব্যথাই ছিল না।

শবরের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল একটু। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, সত্যি কথা বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলছি।

তা হলে তো জটিলতা বাড়ল।

কিন্তু তার জন্য তো আমি দায়ী নই।

প্যাটার্নটা ঠিকঠাক মিলছে না। সুব্রত বকশির একজন বাঙালি বান্ধবী থাকা উচিত। তা হলে প্যাটার্নটা মেলে। নইলে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। আপনি কি বলতে পারেন সুব্রতবাবু সম্পর্কে অরুণিমার এত রিপালশনের কারণ কী?

রিপালশন নয়। রিপালশনও একরকমের রি-অ্যাকশন। অরুণিমা সুব্রতদাকে ঘেন্না করতেন বলে মনে হয় না। তেমন কোনও রাগেরও প্রকাশ দেখিনি। জাস্ট ইগনোর করতেন।

সুব্রত বকশি কি ওঁর আজ্ঞাবহের মধ্যে ছিলেন?

পুরোপুরি তাও নয়। কাজের সুত্রে ওঁদের কো-অপারেশন ছিল। দু’জনেই পরিশ্রমী। পরস্পরের মধ্যে কাজ নিয়ে শলাপরামর্শও হত। গুড কলিগস। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বোধহয় ক্লোজ ছিলেন না। ভেরি স্ট্রেঞ্জ রিলেশন।

সুব্রত বকশির অ্যাটিটিউড কীরকম ছিল?

সেও আপনাকে বলেছি। উনি স্ত্রীকে তোয়াজ করতেন। ডার্লিং, ডিয়ার, সুইটহার্ট বলতেন সবসময়। কিন্তু সেগুলো মিথ্যে।

হু। ভাবিয়ে তুললেন মিহিরবাবু।

৫. ঘুম ভাঙালুম বুঝি

ওমা! ঘুম ভাঙালুম বুঝি?

না ম্যাডাম, ঘুমোইনি। চিন্তা করছি।

আপনাকে আমি যা চিন্তা করতে বলেছি তা করছেন তো?

না ম্যাডাম, তার চেয়েও ইম্পর্ট্যান্ট চিন্তা করতে হচ্ছে।

সে আবার কীসের চিন্তা?

শবরবাবু নতুন দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন মাথায়।

কীরকম দুশ্চিন্তা?

ওঁর ধারণা হয়েছে আমাকে কেউ খুন করবে।

আঁ!

হ্যাঁ ম্যাডাম।

উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠটি থেকে রহস্য খসে পড়ল, একটু আর্তনাদের মতো কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, কেন? কে খুন করতে চাইছে?

তা তো উনি বলেননি। তবে সাবধান থাকতে বলেছেন।

কী আশ্চর্য! আপনার ওপর কার রাগ থাকতে পারে?

তা তো জানি না। তবে আপনাকে তো বলেইছি, আমি লোক ভাল নই। কারও হয়তো খার আছে।

প্লিজ, একটু ডিটেলসে বলুন।

ডিটেলস তো আমিও জানি না ম্যাডাম। তবে পুলিশসাহেব আজ আমার গ্যারাজে হানা দিয়েছিলেন। ঘটনার ক্রম দেখে বা কোনও সূত্রে উনি এরকমই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

তা হলে আপনি কোথাও চলে যান। কাল সকালেই চলে যান।

না ম্যাডাম, আমি ভিতু হলেও ততটা কাপুরুষ নই।

নারীকণ্ঠ ঝেঁঝে উঠল, যাক, অত বীরত্ব দেখাতে হবে না। এ শহরে ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে খুনটুন হয়। দিনে দুপুরে। প্লিজ, অকারণে বেশি সাহস দেখাবেন না।

আপনি কি আমার জন্য উদ্বিগ্ন?

যদি বলি হ্যাঁ।

তা হলে তো বলতে হয় অচেনা একজন মানুষের জন্য আপনার যথেষ্ট সিমপ্যাথি আছে।

দেখুন, এসব সিরিয়াস সিচুয়েশনে ইয়ারকি ভাল লাগছে না। আপনি তো বলেছিলেন দিল্লিতে আপনার দাদা থাকেন।

হ্যাঁ।

তার কাছে চলে যান না।

তার কাছে গিয়ে তো অনন্তকাল থাকা যাবে না। কলকাতায় বুড়ো মাবাবা, কাজকারবার সব ফেলে চলে গেলেই তো হবে না। আর দাদার সঙ্গে আমার সদ্ভাবও নেই।

অন্য কোথাও গিয়ে থাকার মতো টাকা কি আপনার নেই? খুব পারবেন প্লিজ!

ম্যাডাম, গেলেই তো হবে না। একদিন ফিরতেই তো হবে।

সে তখন পরে দেখা যাবে।

আমার এখন অনেক টাকা, জানেন?

কীসের টাকা?

শুনছি অরুণিমা বকশি নাকি মারা যাওয়ার আগে তার বিষয়সম্পত্তি আমার নামে ট্রান্সফার করে গেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

এত টাকা নিয়ে কী করবেন?

কিছুই করব না ম্যাডাম। একটা পয়সাও ছোঁব না।

কেন?

নেব কেন বলুন তো? কোন অধিকারে?

সত্যি নেবেন না?

প্রশ্নই ওঠে না। শুনে বরং আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।

ওমা! কেন?

এটা হয়তো ঘুষ, হয়তো করুণা, হয়তো ক্রয়মূল্য। কিন্তু কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই?

থ্যাঙ্ক ইউ।

হঠাৎ থ্যাঙ্ক ইউ দিলেন কেন?

হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তাই বা কেন?

সে আপনি বুঝবেন না।

আপনি বেশ অদ্ভুত লোক ম্যাডাম।

মোটেই অদ্ভুত নই। মেয়েদের আপনি একটুও চেনেন না।

মেয়েরা কি সব একরকম যে চিনব? এক-একজন এক-একরকম। কে যে কী চায় তা একদম বুঝতে পারি না। তাই নারীচিন্তা করিই না। পারতপক্ষে। হাসলেন নাকি?

হ্যাঁ।

কেন হাসলেন?

আপনার অসহায় অবস্থা দেখে। এত মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেও মেয়েদের চিনতে পারলেন না?

ম্যাডাম, আপনি আমার প্রকৃত অবস্থাটা জানেন না। মেয়েদের আমি বরাবরই এড়িয়ে চলতাম। আজও চলি। সার্কাসে যখন কাজ করতাম তখনই দেখেছি, কোনও কোনও মেয়ে আমার ওপর ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। ঠেকানোর চেষ্টা যে করিনি তা নয়। তবু মেলামেশা হয়ে গেল। ফিজিক্যাল রিলেশন, তার বেশি কিছু নয়। সেই থেকে শুরু আজও শরীর ছাড়া আর কোনও রিলেশন মেয়েদের সঙ্গে আমার হয়নি। বলুন ম্যাডাম, তার জন্য কি আমি দায়ী? আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অরুণিমা বকশি যে পাগলামি করলেন তারও কোনও গভীরতা নেই কিন্তু। ওঁর মন বলে বস্তুই ছিল না। আমি ছিলাম ওঁর জাস্ট একটা টয়। খেলা ফুরোলেই ফেলে দিলেন।

বুঝেছি। আপনি ভাল লোক, মেয়েরা খারাপ।

তা বলিনি। বলছি আই ইজিলি অ্যাট্রাক্ট দি ব্যাড পিপল।

তাই বুঝি?

আমি ব্যাড তো, তাই ব্যাডদেরই আমাকে পছন্দ হয়।

আপনি খুব খারাপ, কিন্তু চিকিৎসার অতীত নন।

বলছেন?

হ্যাঁ।

তা হলে আমারও আশা আছে?

খুব আছে। তবে একটা শর্ত।

কী সেটা?

আর কখনও মেয়েদের ওভাবে ব্যবহার করবেন না।

ফিজিক্যালি তো?

হ্যাঁ।

ম্যাডাম, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? আমি ব্যবহার করি না, ব্যবহৃত হই।

দয়া করে আর ব্যবহৃত হবেন না। কথা দিন।

কথা দেব? কেন ম্যাডাম? আপনি তো আমার কাছে একজন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা মাত্র। আপনাকে এত বড় একটা কথা দেব কেন?

তার মানে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোটাই আপনার পছন্দ?

তা নয়। কিন্তু আপনাকে কথা দেব কেন? যে মহিলা বিশ্বাস করে নিজের নামটাও আজ অবধি আমাকে বলেনি তাকে কথা দেওয়ার কী দায়?

পরিচয় দিয়েই বা কী লাভ বলুন? আপনি তো মেয়েদের একটাই ব্যবহার জানেন। সেটা হল শরীর। আপনি নিজেই বলেছেন মেয়েদের ব্যাপারে কৌতূহলও নেই আপনার।

তা ঠিক। তবে আপনার ব্যাপারে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

আমার ভাগ্যি।

আমি কিন্তু কথা বলতে জানি না। অনেক সময়ে উলটোপালটা বলে ফেলি কিছু মনে করলেন না তো!

না, মনে করার মতো কিছু তো বলেননি। তবে কথা দিলেন না বলে দুঃখ পেলাম।

আগে বলুন, আপনি কে?

জেনে কোনও লাভ নেই আপনার।

আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

আপনি বোধহয় খুব অচেনা নন। বাঃ, তা হলে তো ভালই। মাথা খাটিয়ে বের করুন তো আমি কে?

একটু সময় লাগবে। মাথাটা তো এখন নানা চিন্তায় এনগেজড।

তাড়া নেই। ভাবুন।

নিজে থেকে কিছুতেই বলবেন না তো।

না। একটু কষ্ট করুন। বরাবর তো সব মেয়েদের অনায়াসেই পেয়ে গেছেন।

ভুল বললেন। আমি কোনও মেয়েকেই পাইনি। আমার চেহারাটা ভাল। দুর্ভাগ্য হল, মেয়েরা, অর্থাৎ যারা একটু ফিজিক্যাল তারাই আমার শরীরটাই কেবল চেয়েছে। ওটাকে পাওয়া বলে না।

ওটাকেই তো সবাই পাওয়া বলে মনে করে।

আমি মনে করি না।

আপনি তা হলে কীভাবে পেতে চান?

সেটা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে ফিজিক্যাল পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

টোটাল সারেন্ডার তো। সব পুরুষই মেয়েদের কাছে তাই চায়।

দেখুন, ভালবাসার মধ্যে সারেন্ডারও কিন্তু একটু থাকে।

আপনিও আসলে ক্রীতদাসী চাইছেন।

দোষ কী? আমিও যদি তার ক্রীতদাস হই?

ছেলেরা কখনও ক্রীতদাস হতে পারে না। তারা নিতে জানে, দিতে নয়।

ছেলেদের সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো সুখকর নয়। ছেলেদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বেশি নেই, কিন্তু পুরুষদের মোটামুটি বুঝতে পারি।

কিচ্ছু বুঝতে পারেননি। আপনি আমাকে দেখেননি।

কে বললে দেখিনি?

কবে দেখলেন? কোথায় দেখলেন?

তা বলব কেন?

বাজে কথা, আপমি মোটেই দেখেননি। বলুন তো আমার বাঁ গালে যে আঁচিলটা আছে সেটা লালচে না খয়েরি?

আপনার বাঁ গালে কোনও আঁচিল নেই।

বলুন তো আমার নাকটা থ্যাবড়া না চোখা?

থ্যাবড়া নয়, তবে একটু চাপা। মনে হয় কখনও নাকটা ভেঙে গিয়েছিল।

ঠিক বলেছেন তো! সার্কাসে চাকরি যখন করি তখন প্র্যাকটিসের সময় আমি ট্র্যাপিজ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। নীচে নেট ছিল, আমি নেটের বাইরে ছিটকে গিয়েছিলাম। নাঃ, স্বীকার করতেই হচ্ছে আপনি আমাকে দেখেছেন।

দেখেছি।

ভাবিয়ে তুললেন ম্যাডাম।

কেন ভাবনার কী হল?

এ যে ওয়ান ওয়ে গ্লাস। আপনি দেখেছেন, আমি দেখিনি।

কোনওদিন দেখা হতেও পারে।

৬. আমি জনি স্যার

আমি জনি স্যার।

হ্যাঁ জনি, বলো।

আপনি যেরকম বলেছিলেন সেরকমই করেছি। অ্যানসারিং মেশিন চালু রেখেছিলাম, একটা ভয়েস রেকর্ড করা আছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাকে মোবাইলে ফোন করেননি।

কী রেকর্ড করতে পেরেছ?

শুধু একটা কথা, জনি আছে? তারপর সাইলেন্স।

নম্বরটা দাও। আর টাইমটা।

জনি নম্বরটা দিল। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে শবর হানা দিল বালিগঞ্জের একটা এসটিডি বুথে।

আমি পুলিশের লোক। কাল রাত আটটার পর সাড়ে আটটার মধ্যে এই বুথ থেকে এক ভদ্রমহিলা কাউকে ফোন করেছিলেন। খুব কম সময়ের জন্য। সেই ভদ্রমহিলাকে কি মনে আছে?

বুথের ছোকরাটা ঘাবড়ানো মুখে বলে, না স্যার। মনে পড়ছে না।

ভয় পেয়ো না, ঠান্ডা মাথায় ভাবো। খবরটা জরুরি।

ছেলেটা একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ স্যার।

তাকে চেনো?

এ পাড়ারই মানুষ। তবে নাম ঠিকানা জানি না।

তোমার বুথ থেকে প্রায়ই ফোন করেন কি?

খুব কম!

চেহারাটা কেমন বলতে পারো?

লম্বাচওড়া চেহারা স্যার, খুব ফরসা।

কোন দিক থেকে এসেছিলেন?

ওই পাশের গলিটা দিয়ে, ফোন করে গলিতে ঢুকে গেলেন।

উনি ছাড়া আর কোনও মেয়ে এসেছিল?

না স্যার। এখন চারদিকে অনেক বুথ খুলে গেছে, কাস্টমার নেই।

ঠিক আছে।

আরও চল্লিশ মিনিট ধরে গলির বিভিন্ন দোকান আর বাড়িতে হানা দিল শবর। শেষে সোমা রায়ের নামটা জানা গেল। ঠিকানাও।

কলিং বেল টিপতেই একজন বাচ্চা মেয়ে দরজা খুলে বলল, কী চাই?

সোমা রায়।

এখন দেখা হবে না।

কেন?

বাথরুমে আছেন।

শবর দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বলল, ওকে বলো পুলিশের লোক এসেছে। জরুরি দরকার।

মেয়েটা ভয় পেয়ে ছুটে গেল ভিতরে। শবর চারদিকে চেয়ে দেখল, বেশ সাজানো গোছানো রুচিশীল বৈঠকখানা। পয়সাওয়ালা মহিলা বলে মনে হয়।

একটু অপেক্ষা করতে হল। তারপর মুখে এক রাশ বিরক্তি আর থমথমে রাগ নিয়ে ফরসা, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী এবং বেশ সুন্দরী ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকেই বেশ উঁচু গলায় বললেন, কে বলুন তো আপনি? কী চাই?

কয়েকটা কথা জানতে চাই।

কী কথা? শুনলাম আপনি পুলিশের লোক। পুলিশের কী দরকার আমাকে?

ঠান্ডা হয়ে বসুন ম্যাডাম। অত উত্তেজিত হবেন না। আমি তো আপনাকে অপমান করিনি।

আমার সময় নেই। এখনই বেরোব।

সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হবে। সেটা কি সুবিধাজনক হবে বলে আপনার মনে হয়?

দাঁতে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ রাগটাকে সামলে নিয়ে সোমা বলল, কিন্তু আমার অপরাধ কী?

আপনার টেলিফোন আছে?

আছে। কেন?

ফোনটা কি ডেড?

না।

তা হলে কাল রাতে আপনি জনিকে ফোন করার জন্য কষ্ট করে টেলিফোন বুথে গিয়েছিলেন কেন?

পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল সোমার মুখ।

কে বলল আমি বুথে গিয়েছিলাম?

বুথের ছেলেটা আপনাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

বাজে কথা।

জনির সঙ্গে আপনার কীসের দরকার?

জনি নামে আমি কাউকে চিনি না।

সুব্রত বকশি নামে কাউকে চেনেন কি? নাকি তাও না।

এসব কী হচ্ছে বলুন তো? রঙ্গ-তামাশা নাকি?

না, বরং খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি থানায় জানিয়ে দিচ্ছি যাতে তারা আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে প্রকাশ্যে টেনে নিয়ে যায়। থানায় কাঠের বেঞ্চে বসে কথা বলতে বোধহয় আপনার সুবিধে হবে।

সোমার মুখে আচমকা রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল। সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, কেন এসব করছেন?

স্পিল দা বিন। সুব্রত বকশিকে চেনেন?

সোমা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তারপর হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল।

আমি কিচ্ছু জানি না... আমি কিচ্ছু জানি না।

আপনার পাসপোর্টটা নিয়ে আসুন।

সোমার অনেকক্ষণ সময় লাগল সামলাতে। তারপর গিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে এল।

বছরে আপনি ক'বার আমেরিকা যান?

বিজনেস পারপাসে ঘনঘন যেতে হয়।

বুঝলাম।

সুব্রতর সঙ্গে আমার একটা জয়েন্ট বিজনেস আছে।

হ্যান্ডিক্র্যাফটস?

হ্যাঁ। আর শাড়ি।

অরুণিমা বকশি কি আপনাকে চিনতেন?

হ্যাঁ।

কীরকম রিলেশান ছিল?

ভালই তো।

তা হলে তাকে মারতে হল কেন?

সোমা চুপ।

ডিভোর্স করলে অরুণিমার সম্পত্তি সুব্রতর হাতছাড়া হত বলে?

আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করবেন না প্লিজ!

নয় কেন? আপনি একজন অ্যাকসেনসরি টু মার্ডার। একটা নয়, দুটো মার্ডার। মিহিরকে খুন করার জন্য আপনি জনিকে ফের ফোন করেছিলেন। অ্যানসারিং মেশিনে ওর মোবাইলে ফোন করতে বলায় আপনি ভয় পেয়ে ফোন কেটে দেন, কারণ মোবাইলে কলার-এর নম্বর উঠে যায় তাই না?

প্লিজ!

কী লাভ হল বলুন? অরুণিমা তার সব সম্পত্তি মিহিরের নামে ট্রান্সফার করে গেছে।

আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

সুব্রত আর আপনি দু’জনেই জেল খাটবেন, যদি ফাঁসি নাও হয়, কী লাভ হবে বলুন। সুব্রতবাবুর পাসপোর্টও এতক্ষণে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। আমি আপনারটা করছি। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

৭. মিহিরবাবু, কেমন আছেন

মিহিরবাবু, কেমন আছেন?

ও শবরবাবু। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ফাঁসির দড়ি থেকে যে আমি বেঁচে যাব তা ভাবিনি। আপনি এসে না পড়লে কপালে কষ্ট ছিল।

তা ছিল। সুব্রতবাবু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

ওঁর কি ফাঁসি হবে শবরবাবু?

বোধহয় না। চৌদ্দো বছর মেয়াদ হতে পারে। প্যারোলট্যানোল বাদ দিয়ে বড়জোর দশ বছর ঘানি টানবেন। তবে আমেরিকান সিটিজেন বলে কিছু কনসিডারেশন হতে পারে। ওসব আইনকানুন আমার জানা নেই। আপনি কি সত্যিই অরুণিমা বকশির বিষয়সম্পত্তি কিছুই নেবেন না?

পাগল নাকি? ওসব আমি ছোঁবও না।

তা হলে সম্পত্তির গতি কী হবে?

যা খুশি হোক।

আপনি অদ্ভুত লোক কিন্তু।

না শবরবাবু, আমি ভিতু লোক। অনার্জিত সম্পদকে খুব ভয় পাই।

আচ্ছা, গুডবাই। ভাল থাকুন।

ধন্যবাদ।

.

আমি বলছি।

সব খবর পেয়েছেন?

খবরের কাগজে দেখেছি।

আপনার কি সন্দেহ ছিল খুনটা আমি করেও থাকতে পারি?

না, কখনও নয়। সন্দেহ থাকলে কি এত কথা বলি?

আমি লম্পট বলে প্রতীয়মান হলেও তা নই কিন্তু।

আপনি ভীষণ খারাপ।

কী করে আপনার কাছে ভাল লোক হওয়া যায় বলবেন?

শুধু আমার কাছে কেন, সকলের কাছে নয়?

আপাতত আমার একজনের জন্যই মাথাব্যথা। হাসছেন।

এত পাগল হওয়ার কী আছে?

আপনি যে আমাকে ভীষণ জ্বালাচ্ছেন।

ওঃ! তা হলে আর ফোন করব না।

কেন?

তাই তো বললেন!

তাই বললাম বুঝি! এই বুদ্ধি! আপনাকে আমি বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম।

ঝগড়া করার জন্য গলা চুলকোচ্ছেন, না?

আপনিও তো ঝগড়ুটে। এক বুঝতে আর এক বোঝেন।

বেশ তা হলে কথা না বললেই তো হয়।

না না, বরং ঝগড়াই হোক।

ঝগড়া হবে! ওমা, কেন?

এরকম ঝগড়া বেশ ভাল, মন ভাল হয়ে যায়।

তা হলে তো সারাজীবন ঝগড়াই করতে হবে আপনার সঙ্গে।

রাজি। হাসছেন কেন?

একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি বলে।

আমিও তো একটা পাগলির পাল্লায় পড়েছি। পাগলিকে এখন আমার ভীষণ দরকার।

কেন?

বোঝেন না? না বুঝে থাকলে আর বুঝে কাজ নেই। আমি পাগলির কাছে বসে এই জীবনটাকে বুঝে নিতে চাই। আপনার পাঠশালায় আমাকে ভরতি করে নেবেন?

ভেবে দেখি।

না, ভাবলে সব গুলিয়ে যাবে। নিন না ভরতি করে। নেবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। তারপর মেয়েটি বলল, না নিয়ে উপায় কী?

রূপ

১. বেশিদিন নয়, বছর খানেক

বেশিদিন নয়। বছর খানেক।

কীরকম আলাপ?

জাস্ট হাই, হ্যালো।

আলাপটা কীভাবে হয়েছিল?

ঠিক ডিটেলসে মনে নেই। সোশ্যাল কোনও গ্যাদারিং-এ বোধহয়।

আপনার মেমরি কি খুব খারাপ?

না তো! এ কথা কেন বলছেন?

সঞ্জিত এমন একজন লোক যার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনা নয়।

আমার সঙ্গে তো কত লোকেরই আলাপ হয়েছে রোজ, সব কি মনে থাকে?

আপনার স্মৃতিটা একটু জাগিয়ে দিতে পারি কি?

সেটা কি খুব দরকার?

দেখুন যদি মনে পড়ে।

তার দরকার নেই। আমাদের আলাপ হয়েছিল একটা ডিনারে।

এই তো মনে পড়েছে। ডিনারটা হয়েছিল একটা বিউটি কনটেস্টের পর।

হ্যাঁ।

সেই কনটেস্টে আপনিও একজন প্রতিযোগী ছিলেন, তাই না।

ছিলাম। সেটা কি দোষের কিছু?

দোষের কথা উঠছে না। শুধু বলছি আপনি একজন কনটেস্ট্যান্ট ছিলেন।

হ্যাঁ।

এবং আপনি নম্রতা শা নামে একটা মেয়ের কাছে হেরে যান।

হ্যাঁ।

অথচ সেই কনটেস্টে আপনারই বিউটি কুইন হওয়ার কথা। আর হলে আপনি মডেলিং এর একটা খুব লোভনীয় কনট্রাক্ট পেতেন। সেই সঙ্গে হয়তো ফিল্মের রোলও।

এখন ওসব কথা উঠছে কেন? যা হয়নি তা নিয়ে ভেবে কী হবে।

ক্যাশ প্রাইজ, সোনার মুকুট এবং উপহারের পরিমাণটাও খুব কম ছিল না।

আমি এসব নিয়ে ভাবি না।

আপনি কিন্তু সেই কনটেস্টে রানার আপও হননি। আপনি হয়েছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম।

হ্যাঁ।

অথচ সবাই জানত রানার আপ বা বিউটি কুইন কেউই আপনার ধারে কাছে আসার মতো ছিল না।

বলছি তো, ওসব আমি ভুলে গেছি।

আপনার কি রাগ হয়নি?

হয়তো হয়েছিল।

কার ওপর?

কারও ওপর নয়। ভাগ্যের ওপর।

ভাগ্য ছাড়া অন্য কোনও ফ্যাক্টর ছিল না?

তা আমি কী করে জানব?

জানেন না?

না। আমি কিছু জানি না।

নম্রতা শা-কে আপনি চিনতেন?

আগে আলাপ ছিল না। কনটেস্টে গিয়ে আলাপ হয়েছিল।

তার পরিচয় জানেন?

খুব ভাল করে জানি না। শুনেছি বড়লোকের মেয়ে।

বড়লোক বললে কিছুই বলা হয় না। নম্রতা শা হল বিমলাপ্রসাদ শার মেয়ে। বাড়ি ইউ পি। বিমলাপ্রসাদ এক্সপোর্ট বিশেষজ্ঞ। খ্রিস্টান এবং চামড়া চালান দিয়ে কোটি কোটি টাকা বছরে আয়।

ও, তা হবে।

ওরকম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন, তার মানে বিমলাপ্রসাদের টাকাটা আপনাকে বোধহয় ইমপ্রেস করল না।

অন্যের টাকা আছে, তাতে আমার কী যায় আসে বলুন?

অবাক হওয়ার ব্যাপারও একটা আছে। শুনবেন?

আপনি পুলিশের লোক, শোনালে শুনব।

না মিস মিত্র, আমি জোর করে শোনাতে চাইছি না কিন্তু। তবে শুনলে হয়তো আপনার ধাঁধা কেটে যাবে।

আমার কোনও ধাঁধা নেই তো! এক বছর আগে একটা বিউটি কনটেস্টে হেরে গিয়েছিলাম তো কী হয়েছে? সেসব নিয়ে কি আমি ভাবি নাকি? কেন যে আপনি সেইসব পুরনো কথা খুঁচিয়ে তুলেছেন।

আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

না-না, বিরক্ত হব কেন? আসলে আমাকে নিয়ে কথা উঠলে আমার খুব অস্বস্তি হয়।

কথাটা আপনাকে নিয়ে তো হচ্ছে না। হচ্ছে নম্রতাকে নিয়ে।

তাকে নিয়েই বা কেন?

আমি পুলিশের লোক এবং অন ডিউটি। আপনার কি মনে হয় আমি শুধু গালগল্প করতে এসেছি?

ছিঃ ছিঃ, আমি তাই বললাম বুঝি! আসলে আমি প্রসঙ্গটা ধরতে পারছি না যে!

প্রসঙ্গটা যাতে আপনি ধরতে পারেন সেইজন্যই তো পুরনো এবং মৃত অতীতকে পুনর্নির্মাণের এই চেষ্টা। নইলে কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করার লাভ কী বলুন!

আমি ক্ষমা চাইছি। যা বলছিলেন বলুন।

আরেঃ ক্ষমা চাইছেন কেন? পুলিশের কাছে ক্ষমা চাইতে নেই। তারা এতই অভদ্র যে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা জিনিসটাকেই অপমান করা হয়।

গার্গী একটু হেসে বলল, আপনাকে অভদ্র বলিনি কিন্তু।

বলার সময় যায়নি। আমার ভদ্রতার মুখোশ এখনও খুলে ফেলিনি কিনা।

আমি কিন্তু এবার একটু একটু ভয় পাচ্ছি।

আগেই ভয় পাবেন না। কিছুটা জানার পর ভয় হলেও হতে পারে।

জানাটা বিশেষ দরকার কি?

হ্যাঁ।

তা হলে বলুন।

কনটেস্টের দিনটা মনে পড়ে?

পড়ে।

জাজেরা প্রত্যেকেই আপনার ফেবারে ছিল সেদিন। আপনি তা বুঝতে পেরেছিলেন?

না বুঝবার কী!

তিনজন বিচারকের স্কোরশিটেই আপনার নামের পাশে মোটা মোটা নম্বর জমা হচ্ছিল। হাসছেন যে?

ভাবছি আপনি এত সব জানলেন কী করে? আমি তো জানি না।

অনেক পরিশ্রম করে জানতে হয়েছে।

একটা বাজে ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করেছেন।

ব্যাপারটা যদি বাজে বলেই মনে হয়ে থাকে আপনার তা হলে বিউটি কনটেস্টে নাম দিতে গেলেন কেন?

হুজুগে। আমার এক মামা ইমপ্রেশারিও। তিনিই একরকম জোর করে নামিয়েছিলেন। এই কনটেস্ট থেকে নাকি মিস ইন্ডিয়া কনটেস্টে পাঠানো হয়। আরও অনেক লোভনীয় প্রস্তাব ছিল।

মাত্র এক বছরের মধ্যেই কি আপনার মোহভঙ্গ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। আমার আর এসব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

মোহভঙ্গ কীভাবে হল?

সেটাও কি বলতে হবে?

কোনও জবরদস্তি তো নেই। ইচ্ছে হলে বলবেন।

ওই কনটেস্টেই আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল।

আমি একজন পুলিশ, আমার মতামতের হয়তো দাম নেই। তবু বলছি, আপনি চেষ্টা করলেই মিস ইন্ডিয়া হতে পারেন। আপনি তো দারুণ সুন্দরী।

প্লিজ, আর ওকথা বলবেন না। এখন এই সুন্দরী শব্দটা শুনলে আমার রিপালশন হয়। সুন্দর হওয়ার যে কী ঝামেলা তা তো আপনি বুঝবেন না।

আপনি আমাকে খুবই অবাক করলেন। মেয়েরা তো কমপ্লিমেন্ট পছন্দই করে।

আমি করি না। লোভী পুরুষদের অনেক অ্যাডভানসেস আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা খুব ঘিনঘিনে। এমনকী আমার এক জেঠতুতো দাদা অবধি আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। এসবের ফলে আমার সৌন্দর্য জিনিসটার ওপরেই আকর্ষণ চলে গেছে। এতটাই চলে গেছে যে, আমি একবার ন্যাড়া হওয়ার জন্য একটা সেলুনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

বলেন কী?

গার্গী হাসতে হাসতে বলে, তা হলেই বুঝুন। কিন্তু নাপিতটা আমার প্রস্তাব শুনে হাত গুটিয়ে বলল, আপনার মাথা চেঁছে দিলে আমার হাতে কুষ্ঠ হবে দিদি। কিছুতেই ন্যাড়া করতে রাজি হল না।

আমার হিসেব মতো আপনার বয়স মাত্র কুড়ি। এই বয়সেই এরকম যোগিনী হয়ে যাওয়ার কথা তো নয় আপনার। আপনি কি একটু পিউরিটান?

আমার বাবা খুব পিউরিটান। মা আবার ঠিক উলটো। আমি পিউরিটান না হলেও আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আপনি যেন কী বলছিলেন শবরবাবু!

ও হ্যাঁ। আশ্চর্যের বিষয় হল বিমলাপ্রসাদ শার পরিবারও কিন্তু ভীষণ পিউরিটান। ওদের বাড়ির কোনও মেয়ে বিউটি কনটেস্টে নামছে এটা ভাবাই যায় না।

তবে নম্রতা নামল কেন?

নম্রতা ইজ রেবেল। কলকাতায় পড়তে এসে খুব অল্প বয়সেই সে একটি বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করে। ছেলেটির তেমন কোনও গুণ নেই। তবে ভেরি হ্যান্ডসাম। ওরকম সুপুরুষ খুব কম দেখা যায়। এই বিয়ের ব্যাপারে শা পরিবারে খুব অশান্তি হয়েছিল। ছেলেটি ওদের স্বজাতি তো নয়ই, উপরন্তু বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ভ্যাগাবন্ড টাইপের। বউয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়ার যোগ্যতা ওর ছিল না।

এই গল্পটাও কি আমার শোনা দরকার?

না চাইলে নয়। বলেছি তো শুধু গল্প করতে আমি আসিনি।

তা হলে বলুন।

নম্রতা এ ছেলেটাকে বিয়ে করায় শা পরিবার রেগে গেলেও তাদের কিছু করার ছিল না। বিমলাপ্রসাদ মেয়ে-জামাইকে তার কলকাতার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটা দিয়েছিলেন এবং জামাইকে তার অফিসে একটা মোটা মাইনের চাকরিতেও বহাল করেন। ছেলেটার অবশ্য চাকরিতে কোনও মন ছিল না। সারাদিন মদ খেত আর বাড়ির সুইমিং পুলের ধারে বসে থাকত। বিয়েটা অবশ্য সুখের হয়নি। নম্রতার সঙ্গে তার বর বিজিত রায়চৌধুরীর প্রায়ই প্রবল ঝগড়া হত। শোনা যায় মারপিট অবধি গড়াত ব্যাপারটা। অথচ নম্রতা বিজিতকে ডিভোর্স করার কথাও ভাবতে পারত না। লাভ-হেট রিলেশনই হবে বোধহয়। প্রচণ্ড আক্রোশ, আবার প্রচণ্ড ভালবাসা। কিন্তু এর একটা সাইকোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনও আছে। নম্রতা অসম্ভব ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকে মাঝে মাঝে। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও যেতে হয়েছিল তাকে। বিজিত তার প্রতি ফেথফুল কি না তা নিয়েও সে ভয়ংকর সন্দেহ বাতিকে ভুগত। সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিও ছিল। যাই হোক, ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকসাইটে বাবা-মাও জব্দ হয়ে যায়। বিমলাপ্রসাদের মতো গোঁড়া, রক্ষণশীল মানুষও মেয়ের এই অবস্থা দেখে সে যখন যা বায়না করত তখনই তা মেটাতেন। বিউটি কনটেস্টে নামার ব্যাপারেও বাবা কোনও আপত্তি তোলেননি। আপনি কিন্তু আর কোনও প্রশ্ন করছেন না।

আমি শুনছি তো!

হ্যাঁ। কিন্তু নম্রতা তেমন সুন্দরী না হয়েও বিউটি কনটেস্টে কেন নামতে গেল তা জানার কৌতূহল নেই?

নম্রতা সুন্দরী নয় বুঝি! আমার তো তা মনে হয়নি! ওর ফিগার খুব ভাল, মুখশ্রীও চমৎকার।

একটা শ্বাস ফেলে শবর বলে, আপনি সত্যিই একটু অদ্ভুত আছেন। নম্রতা জাস্ট সো সো, বিউটি কনটেস্টে নামবার মতো চটক বা গ্ল্যামার ওর নেই। যাক গে, ও কেন নেমেছিল জানেন? জাস্ট টু মেক বিজিত জেলাস। নম্রতার সব প্রবলেম বিজিতকে নিয়ে। বিজিতকে ও পুরোপুরি গ্রাস করতে চায়। বিজিতের চোখে ও সর্বোত্তমা নারী হয়ে থাকতে চায়। এক ধরনের পাগলাটে অবসেশন। কনটেস্টে জয়ী হওয়া ওর কাছে খুবই জরুরি ব্যাপার ছিল। বিমলাপ্রসাদকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সাবধান করে দিয়েছিলেন, ওঁর মেয়ের যা অবস্থা তাতে ইগোতে আঘাত লাগলে ম্যাসিভ নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে পারে। সুতরাং বিমলাপ্রসাদ ওঁর মেয়ের হয়ে কলকাঠি নেড়েছিলেন। কনটেস্টের মাঝপথে যখন সবাই বুঝতে পেরেছে যে গার্গী মিত্র নামে মেয়েটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে তখনই তিনজন বিচারকের কানে কানে কিছু বলে দেওয়া হল এবং কয়েকটা মুখ আঁটা মোটা খামও হল হাতবদল। বুঝেছেন?

গার্গী হাসছিল। বলল, বুঝেছি।

কিন্তু নম্রতা শা বিউটি কুইন হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে থেকে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আপনার কি মনে আছে একজন যুবক বিচারকদের পিছন থেকে উঠে চিৎকার করে বলেছিল যে, এটা সম্পূর্ণ জালি ব্যাপার, সাজানো জিনিস, জোচ্চুরি ইত্যাদি। ছেলেটা রেগে জাজদের শিটও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সিকিউরিটির লোকেরা তাকে ধরে বাইরে নিয়ে যায়।

হ্যাঁ। একটা গোলমাল হয়েছিল শুনেছি। সেই সময় আমাদের র‍্যাম্প থেকে সরিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমার খুব লজ্জা করছিল।

যে ছেলেটা ওরকম রি-অ্যাক্ট করেছিল সে কে জানেন?

না।

নম্রতার হাজব্যান্ড বিজিত রায়চৌধুরী।

তা হবে।

এবার আমার প্রশ্ন, বিজিতকে কি আপনি চেনেন?

গার্গী একটু চুপ করে থেকে বলল, একথার জবাব দেওয়া কি খুব জরুরি? নিজস্ব সুত্রে আপনি বোধহয় সব খবরই রাখেন।

শবর দাশগুপ্ত একটু হাসল, আমি কিন্তু সবজান্তা নই। আমার খবর সবই সেকেন্ড হ্যান্ড। সেগুলো যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে। বিজিতের কথা থাক। সঞ্জিত চৌধুরীর প্রসঙ্গে যদি কিছু প্রশ্ন করি জবাব দেবেন কি?

গার্গী একটা শ্বাস ফেলে বলে, গোপন করার কিছু তো নেই।

তাকে আপনি কতটা চেনেন?

বললাম তো, ওই হ্যালোর বেশি নয়।

সঞ্জিত একজন ডাক্তার। বেশ ভাল গায়নোকোলজিস্ট। বেহালায় একটা নার্সিং হোম খোলার জন্য চেষ্টা করছে। প্রচুর টাকার দরকার তার। সেদিন বিউটি কনটেস্টে সে ছিল তিনজন বিচারকের একজন। খুব অন্যায়ভাবে তিনজন বিচারকই আপনাকে বঞ্চিত করে নম্রতা শা-কে বিউটি কুইন করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সঞ্জিতের বোধহয় একটু বিবেকদংশন হয়েছিল। কী বলেন?

হতেই পারে।

ডিনারে আপনি ছিলেন সঞ্জিতের পাশে। ঠিক তো! এবং সেদিন সঞ্জিত আপনাকে কিছু বলেছিল। কথাগুলো কী তা আমরা হয়তো কোনওদিনই জানতে পারব না, যদি আপনি তা প্রকাশ না করেন। কথাগুলো অবশ্য ইম্পর্ট্যান্ট নয়। ইম্পর্ট্যান্ট হল সঞ্জিতের অ্যাপোচ। অ্যাপ্রোচটা কীরকম ছিল মিস মিত্র?

গার্গী খুব মিষ্টি করে একটু হাসল। তারপর বলল, উনি আমার ওপর একটু ডাক্তারি করতে চেয়েছিলেন। আমাকে দেখে নাকি ওঁর মনে হয়েছিল আমার কিছু শারীরিক প্রবলেম আছে। উনি ওঁর চেম্বারে যেতে বলেছিলেন।

আপনি গিয়েছিলেন কি?

না। তবে উনি মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করতেন এবং যেতে বলতেন।

তবু আপনি যাননি।

কেন যাব বলুন। আমার কোনও প্রবলেম আছে বলে তো আমার মনে হয়নি।

তারপর কি উনি উপযাচক হয়ে আপনার কাছে আসেন?

গার্গী মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ।

এই বদান্যতা দেখেও আপনি খুশি হননি?

আমাকে তো এভাবেই বেঁচে থাকতে হয়। যেচে কত লোকই যে আমার উপকার করতে চায়।

সেই ডিনার পার্টিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। মাতাল বিজিত রায়চৌধুরী ডিনারে আমন্ত্রিত ছিল বটে, কিন্তু তাকে প্রথমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু শেষ দিকে সে জোর করে ঢোকে এবং প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে। সে জাজদের ওপরেও হামলা করেছিল।

হ্যাঁ, বিশ্রী ব্যাপার।

সঞ্জিত চৌধুরীর সঙ্গে তার একটা হাতাহাতিও হয়েছিল। সঞ্জিত বিজিতকে বোধহয় ঘুষিটুষি মারে।

আমি দেখিনি। গণ্ডগোল শুরু হতেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে যাই। আমি খুব ভিতু মেয়ে।

কিন্তু সেইঘুষির রি-অ্যাকশন ভাল হয়নি। বিজিত যে কান্ডই করে থাকুক সে বিমলাপ্রসাদের জামাই। তার গায়ে হাত তোলা বিমলাপ্রসাদ নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি। আর নম্রতা বিকেম ফিউরিয়াস। বিজিতকে মারার ফলে নম্রতা এসে বাঘিনির মতো সঞ্জিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঞ্জিত প্রচণ্ড রেগে যায়। চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে কীভাবে নম্রতাকে জেতানো হয়েছে তা প্রকাশ করে দেয়। ইট ওয়াজ আ রিয়েল প্যান্ডোমোনিয়াম।

হ্যাঁ শুনেছি। সঞ্জিত চৌধুরী আমাকে টেলিফোনে সব বলেছিলেন পরদিন। হি ট্রায়েড টু বি এ হিরো।

আপনি তার হিরোইজমকে বোধহয় খুব একটা মূল্য দেননি।

গার্গী ফের মৃদু হেসে বলল, আমি আমার চারদিকে রোজই এত হিরো দেখতে পাই যে এখন আমার তেমন রি-অ্যাকশন হয় না। গতকালও আমাকে দোতলার বারান্দায় দেখতে পেয়ে একজন হিরো তার সাইকেলটা এত জোরে চালাতে লাগল যে, শেষে একটা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড, বেচারা।

তা হলে কি ধরে নেব ব্যক্তিগত জীবনে আপনার কোনও হিরো নেই?

কী মনে হয় আপনার পুলিশসাহেব?

পুলিশরা হৃদয়ের খবর কী করে রাখবে, বলুন? তবে হৃদয় থেকে সেটা যদি খুনোখুনিতে দাঁড়ায় তখন পুলিশকে খবর রাখতে হয়। ইন ফ্যাক্ট পৃথিবীতে হৃদয়ঘটিত খুনোখুনির সংখ্যা খুবই বেশি। আপনি কি তা জানেন?

না। আমি খবরের কাগজ অত মন দিয়ে পড়ি না।

ভালই করেন। পৃথিবীতে যত ময়লা আর গাদ আছে খবরের কাগজ তা সযত্নে তুলে সকালবেলায় আমাদের সামনে সাজিয়ে দেয়। যে দেশে খবরের কাগজ নেই সেই দেশের লোক বোধহয় খুবই সুখী। এবার দু'-একটা কথা।

হ্যাঁ, বলুন।

সঞ্জিত চৌধুরীকে আপনি তা হলে পাত্তা দেননি, এই তো।

আমি তো তা বলিনি! পাত্তাটাত্তা নয়, আমি জাস্ট তার চেম্বারে যাইনি।

সঞ্জিত আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করে?

এখানে, আমাদের বাড়িতে ও একদিন সকালে এসে হাজির। যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন ওখানেই বসেছিলেন তিনি। বড় একজন ডাক্তার এসেছেন শুনে আমার বাবা আর মা-ও তার সঙ্গে এসে কথাটথা বলে যান।

তারপর?

তিনি বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন। দারুণ স্মার্ট, চেহারাটাও রীতিমতো ভাল।

সঞ্জিত কী বলতে এসেছিল?

বিউটি কনটেস্টে আমার হেরে যাওয়া নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করাটা তার মধ্যে ছিল। আর বারবার আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমার মা বাবাকে বলে যান যেন তারা মেয়েকে একবার তার চেম্বারে পাঠান।

আপনি বোধহয় তবুও রাজি হননি।

না। তবে বলেছিলাম প্রয়োজন হলেই যাব।

একটু ইন্টারাপ্ট করছি। বিজিত রায়চৌধুরী ঠিক কবে আপনাকে অ্যাপ্রোচ করে?

গার্গী মুখটা নামিয়ে নিল। তারপর ফের মুখটা তুলে বলল, এত খবর যে কে আপনাকে সাপ্লাই করেছে।

ইনস্টিংক্ট।

বিজিত এ বাড়িতে হানা দেয়নি, সে একদিন আমাকে ফোন করে। দেখা করতে চায়। আমি বিরক্ত হয়ে বলি যে আমার ইচ্ছে নেই। সে ফোন রেখে দেয়। তবে সে বারবার ফোন করত, রোজ। আমি ফোন রেখে দিতাম। তারপর একদিন একটা বড় কোম্পানির মডেলিং টেস্টের জন্য তাদের এজেন্ট আমাকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। আমি জানতাম না যে সেটা বিজিতেরই পাতা ফাঁদ। যাই হোক, সেখানে অর্থাৎ সেই এজেন্টের অফিসে বিজিতের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

কী বলেছিল বিজিত?

কী বলতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

প্রেম ভালবাসার কথা তো!

পুরুষরা তো তাই বলে। অ্যান্ড হি ওয়াজ ম্যাড অ্যাবাউট দ্যাট। সে পরিষ্কার বলেছিল নম্রতাকে সে ভালবাসে না, সে আমাকে চায়।

আপনি কী করলেন?

করুণ হেসে গার্গী বলল, আমার ফের ন্যাড়া হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল।

একজন বড় ডাক্তার আর একজন বড়লোকের জামাই। দু'জনেই পাওয়ারফুল এবং দু'জনেই মরিয়া। আপনার বেশ বিপদই গেছে, তাই না?

নিজের চেহারার জন্য তাই আজকাল আমার লজ্জা হয়।

কিন্তু দোষটা তো আপনার নয়, সৃষ্টিকর্তার, তাই না? ভাল কথা, আপনি কি মডেলিং এর কন্ট্রাক্টটা পেয়েছিলেন শেষ অবধি?

হ্যাঁ।

বিগ অফার?

হ্যাঁ, মোটামুটি ভাল অফার।

গত আট মাসে আমার হিসেব মতো আপনি অন্তত আটটা কোম্পানির হয়ে ভিডিও মডেলিং করেছেন। তা ছাড়া খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন, প্রোডাক্ট লেবেল এবং পোস্টারিং তো আছেই। টিভি সিরিয়ালে আপনার মুখ খুব সম্প্রতি দেখা দিতে শুরু করেছে।

এসব তো আর গোপন খবর না। সবাই জানে।

ঠিক কথা মিস মিত্র। কিন্তু সবাই যা জানে তার আড়ালে গোপন খবরও কি কিছু তৈরি হয় না?

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আপনার হয়তো জানা থাকতেও পারে যে, সেই বিউটি কনটেস্টের তিন মাস পর ডাক্তার সঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেপাটাইটিস ই। কীভাবে রোগটা হয়েছিল তা খুবই রহস্যময়। কেউ জানে না। আমিও না। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করে শুধু এটুকু জেনেছি যে, ক্রনিক সর্দি কাশির জন্য তিনি একটা বিদেশি অ্যান্টিজেন ইঞ্জেকশন নিচ্ছিলেন। হতে পারে সেটা থেকে ইনফেকশনটা আসে।

তো?

মাথা নেড়ে শবর বলল, ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ইট ওয়াজ এ ভেরি ন্যাচারাল ডেথ।

গার্গী চুপ করে রইল।

কিছু ভাবছেন?

ভাবছি আমার কিছু ভাবা উচিত কি না।

আরে না মিস মিত্র, আপনাকে চিন্তায় ফেলার জন্য কথাটা বলিনি। আসলে ঘটনাগুলিকে একটা পরম্পরায় বা কার্যকারণসূত্রে বিন্যস্ত করা যায় কি না সেটাই দেখছিলাম। কিন্তু না, মিসেস চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু কোনওভাবেই পচা ইঁদুরের গন্ধ ছড়াচ্ছে না।

তা হলে কথাটা উঠল কেন?

পুলিশের মন হল সন্দেহ পিশাচ। বিউটি কনটেস্টের ছয় মাসের মাথায় যে নার্সিংহোমে ডাক্তার চৌধুরী অ্যাটাচড ছিলেন সেখানে তার এক পেশেন্টের মৃত্যু হয় এবং রুগির বাড়ি আর পাড়ার লোক এসে এমন হামলা করে যে নার্সিংহোমে প্রচণ্ড ভাঙচুর হয়েছিল। ডাক্তার চৌধুরীও উন্ডেড হয়েছিলেন।

জানি। শুনেছিলাম। এটাও কি অস্বাভাবিক ঘটনা?

না। কলকাতায় এরকম প্রায়ই হয়।

তা হলে?

একটা শাস ফেলে শবর বলে, ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখলে একটা আবেগজনিত ঘটনা মাত্র। কিন্তু তদন্ত করতে নেমে দেখা গিয়েছিল হামলাকারীরা কেউই পেশেন্টের বাড়ির বা পাড়ার লোক ছিল না। তারা কারা তাও জানতে পারা যায়নি। তবে যেটুকু জানা গেছে তা হল, এরা ছিল পেশাদার বা ভাড়াটে গুন্ডা।

কেন যে আমাকে এসব শোনাচ্ছেন।

শবর একটু হেসে বলল, সঞ্জিত চৌধুরী একজন বড় ডাক্তার। কীভাবে তার স্ত্রীর হেপাটাইটিস ই হয়েছিল তা আমরা না জানলেও তিনি অবশ্যই জানবেন। আমরা শুধু জানতে চাই, কেন হয়েছিল? একটা বিশেষ সময়ে সঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রীর মরাটা কি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে!বুঝতে যে আমিও পারছি, তা নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, একজন ডাক্তারের পক্ষে কারও মৃত্যুর আয়োজন করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

ও মা! আপনি কি বলতে চান ওটা খুন?

এখনও বলিনি। কারণ প্রমাণ নেই। তবে মোটিভ হয়তো আছে।

কী মোটিভ?

ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে তার স্ত্রীর বিয়ে হয় প্রায় ছয় বছর আগে। তাদের একটি বছর তিনেকের মেয়েও আছে। মোটামুটি একটা সেট পরিবার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা ঝগড়া বিবাদেরও ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে হঠাৎ একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরু হয়েছিল বলে বাড়ির দু'জন কাজের লোক আমাদের জানিয়েছে। ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়বার আগে নাকি একদিন দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয় এবং ভদ্রমহিলা নাকি বলেছিলেন, তুমি ডিভোর্স করতে চাও? তোমাকে আমি নাকে খত দিইয়ে ছাড়ব। ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরেই হঠাৎ অসুখ এবং মৃত্যু।

শুধু ঝগড়া থেকেই কি কেউ কাউকে খুন করে?

না ম্যাডাম। দেখতে হবে ঝগড়ার উৎসে কী আছে। সেইটেই আসল। পৃথিবীতে স্বামীরা যখনই স্ত্রীকে হত্যা করেন তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হত্যার পিছনে আর একটি স্ত্রীলোক রয়েছেন। তবে আগেই বলেছি আমাদের হাতে প্রমাণ নেই। আরও একটা কথা হল, ডাক্তার চৌধুরী একজন গায়নোকোলজিস্ট। মহিলাদের সঙ্গেই তাঁর নিত্য কাজ। সুতরাং মহিলাদের সম্পর্কে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যদি কোনও এক্সট্রা অর্ডিনারি মহিলার সঙ্গে ইনভলভমেন্ট ঘটে।

আমি আবার এক গলা জলে।

আমিও। ডাক্তার চৌধুরী তার স্ত্রীকে খুন করেছেন এমন সন্দেহ কেউ করেনি। প্রশ্নটাও ওঠেনি। কোনও মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও কেউ জানে না।

তা হলে?

তা হলেও একটা কথা আছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেখা যায় ডাক্তার চৌধুরী রাত জেগে কাউকে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা ফোন করতেন। একজন বিশেষ কাউকে। সে সময়ে তার মুখ চোখ অন্যরকম হয়ে যেত। কিছুদিন পরেই নার্সিংহোমে তার ওপর হামলা হয়। এর মধ্যেও কেউ কোনও কার্যকারণসূত্র খোঁজেনি।

শুধু আপনিই খুঁজেছেন?

হ্যাঁ। এই হামলাটা একজন বিশেষ কেউ করেছিল। যার সঙ্গে সেই পেশেন্টের সম্পর্ক ছিল না।

সে কে?

সেটা বলা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো হয়ে যাবে। তবে এমন কেউ যে পাওয়ারফুল, স্ট্রং মোটিভ আছে এবং বেপরোয়া। এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি পিকচারে ছিলাম। কোনও তদন্তের ভারও আমাকে দেওয়া হয়নি এবং এসব ঘটনা যে ঘটছে তাও আমার জানার কথা নয়। আমি এই এত সব ঘটনা জেনেছি মাত্র সাত দিন আগে। যখন আমাকে ডাক্তার সঞ্জিত চৌধুরীর বাই দি বাই, আপনি কি জানেন যে সঞ্জিত চৌধুরী মারা গেছেন?

অবাক গার্গী তার বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলল, মারা গেছেন! কই, জানি তো!

চিন্তিত শবর তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, জানেন না!

না।

ও, আপনি তো আবার খবরের কাগজ পড়েন না।

না, পড়ি না।

খবরটা অবশ্য তেমন গুরুত্ব দিয়ে ছাপাও হয়নি। সঞ্জিত চৌধুরী মারা যান একটি মোটর অ্যাক্সিডেন্টে।

ইস। দুঃখের খবর!

সব মৃত্যুই দুঃখের। আমি–শবর দাশগুপ্ত কোনও মৃত্যুই পছন্দ করি না।

কেউই করি না শবরবাবু। কিন্তু তবু মৃত্যু তো আছেই তাই না?

হ্যাঁ মিস মিত্র, মৃত্যু আছেই আমাদের পেছনে। কত সুন্দর মুখ, কত সুন্দর শরীর, কত প্রতিভা, কত মেধা, কত অতৃপ্ত বাসনা, কত লোভ, কত আসক্তি মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায়।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা ট্র্যাজিক, কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নেই।

শবর মাথা নেড়ে বলে, সঞ্জিত চৌধুরীর মৃত্যু না হলে এত ঘটনা আমার জানা হত না, আপনার সঙ্গেও পরিচয় হত না। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও তার মধ্যে কিছু অসংগতি থাকায় তদন্তে আমার তলব পড়ে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল বেশি রাতে বোধহয় বারোটা বা তারও পরে। ওঁদের নার্সিংহোমে একজন ভি আই পির স্ত্রী ভরতি ছিলেন। রাত বারোটায় হঠাৎ ফোন আসে যে রোগীর অবস্থা খারাপ, ডাক্তার চৌধুরীকে এক্ষুনি যেতে হবে। চৌধুরী তাড়াতাড়ি তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। নিউ আলিপুরের নির্জন রাস্তায় একটা লোহা বোঝাই ট্রাক তার গাড়িকে প্রায় পিষে দেয়। ইনসিডেন্টালি গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে ব্রেক অয়েল ছিল না। অর্থাৎ বিপদের সময় চৌধুরীর গাড়ির ব্রেকও কাজ করেনি। লরিটা তাকে মেরে পালিয়ে যায়।

ইস রে।

ঘটনাটা এমনিতে উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু তদন্তে নেমে দেখেছি নার্সিংহোম থেকে কোনও ফোন করা হয়নি এবং রুগির অবস্থা সেই রাতে ভালই ছিল।

ও মা! তা হলে?

শবর একটু হাসল, আপনি বুদ্ধিমতী, বুঝে নিন।

ইজ ইট মার্ডার এগেন?

খুব ছক কষে হিসেব করে চৌধুরীকে মারা হয়েছিল।

কে মারল তাকে?

আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?

না তো! আমি কী করে অনুমান করব?

মাপ করবেন। ভুল প্রশ্ন করেছি বোধহয়। আচ্ছা আপনার কি কোনও মোবাইল ফোন আছে?

না তো!

চৌধুরীর ছিল, বিজিতের ছিল, নম্রতার আছে।

কেন জিজ্ঞেস করছেন?

ডাক্তার চৌধুরীর মোবাইল ফোনের রেকর্ড চেক করে দেখা যাচ্ছে উনি একটা নম্বর খুব ফেবার করতেন। সেই নম্বরটা আপনার।

হ্যাঁ। বলেছি তো, উনি মাঝে মাঝেই আমাকে ফোন করতেন।

কী বলতেন তিনি আপনাকে?

খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা কিছু নয়। গল্প করতেন।

কখনও কখনও রাত বারোটাতেও?

আমার অত খেয়াল নেই।

একটু ভেবে বলুন।

বোধহয় এক-আধবার বেশি রাতেও করেছেন।

অত রাতে ফোন করার কি বিশেষ কারণ ছিল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী বলল, উনি পাগলামি করতেন।

কীরকম পাগলামি?

বিয়ে করার কথা বলতেন। অনেক কিছু প্রমিজ করতেন। লোভ দেখাতেন বিদেশে নিয়ে যাওয়ার।

আপনি কি তাকে প্রশ্রয় দিতেন?

প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে তো ওরকম প্রস্তাব কতজন কতভাবেই দিয়েছে। প্রশ্রয় দেওয়ার কথা উঠছে কেন পুলিশসাহেব?

কারণ, কোনও কোনও ফোন কলের ডিউরেশন আধঘণ্টা বা তারও বেশি ছিল।

বললাম তো উনি অনেক কথা বলে যেতে। আমি তার কিছুটা শুনতাম, কিছুটা শুনতাম। তবে অভদ্রতা করে ফোনটা নামিয়েও রাখতে পারতাম না।

ঠিক আছে মিস মিত্র।

কোনও দোষ হয়নি তো।

আরে না, না। দোষের কী আছে। আমি শুধু জেনে নিচ্ছি।

আর কী জানতে চান?

বেশি কিছু নয়। আপনি কি জানেন যে, গত পরশু রাতে নম্রতার বাড়ির সুইমিং পুলে ডুবে বিজিত রায়চৌধুরী মারা গেছে?

ও মা! সত্যি বলছেন?

মিস মিত্র, গুজব ছড়ানো আমার কাজ নয়।

সুইমিং পুলে?

হ্যাঁ। ঘোর মাতাল অবস্থায়। সাক্ষ্য প্রমাণাদি বলে, নম্রতা আর বিজিত অনেক রাত অবধি সুইমিং পুলের ধারে বসে ছিল। তাদের মধ্যে রোজকার মতোই ঝগড়াঝাটিও হয়। তারপর নম্রতা শুতে চলে যায়। ভোরবেলা বিজিতের মৃতদেহ সুইমিং পুলের মধ্যে পাওয়া যায়।

স্যাড।

হ্যাঁ, স্যাড। বিজিত আপনার সঙ্গে টেলিফোনে অনেক কথা বলত, তাই না?

হ্যাঁ, আমার মডেলিং-এর ব্যাপারে উনি হেল্প করতেন।

কেন?

হি হ্যাড এ ক্র্যাশ অন মি। পুরুষদের তো ওইটাই দোষ। আমি তো কিছু লুকোইনি শবরবাবু।

না। আপনি এ পর্যন্ত তেমন কিছু লুকোননি। লুকোবার দরকারও আপনার নেই। আপনি এই কুড়ি বছর বয়সেই পুরুষদের সম্পর্কে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন দেখছি।

একটু হতাশা তো হতেই পারে, তাই না?

হ্যাঁ। তা তো ঠিকই। ডাক্তার চৌধুরী যদি তার স্ত্রীকে খুন করে থাকেন তবে তার পেছনে তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, নার্সিংহোমে হামলা করে মারধর যে করেছিল তারও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো ডাক্তার চৌধুরীকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার জন্য। ডাক্তার চৌধুরী নিরস্ত হননি। ফলে তাকে খুন করার প্রয়োজন দেখা দিল। যে খুনটা করেছিল তারও একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে হয়তো বিশেষ একজনকে খুশি ও নিষ্কণ্টক করার জন্য; হয়তো তারই অনুরোধে চৌধুরীকে খুন করায়। দ্বিতীয় লোকটা পাওয়ারফুল, প্রচুর টাকার মালিক, পিছনে শাঁসালো শশুর।

আপনি কি বিজিতের কথা বলছেন?

অনুমান মাত্র। সত্যি কি না কে বলবে?

আমার অবশ্য অনুমান হল নম্রতা একদিন জানতে পারে যে তার স্বামী বিজিত কোনও বিশেষ একজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার সন্দেহ যার প্রেমে সে পড়েছিল সেই নম্রতাকে জানিয়ে দেয়। না জানালে বিজিত তার জীবন বিষময় করে দিত। ক্রমশ বিজিত নানা লোভনীয় কন্ট্রাক্ট তাকে দিয়ে ফেলছিল। ওই জাল কেটেনা বেরোতে পারলে মেয়েটির রক্ষে ছিল না। আর আপনি জানেন নম্রতা কেমন মেয়ে। পজেটিভ, রাগী, খেয়ালি, জেলাস এবং ক্রুয়েল। বিজিত তার একার জিনিস। বিজিতের সামান্য বেচাল সে সহ্য করতে পারে না।

দৃপ্ত মুখে গার্গী বলে ওঠে, মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি কি এসব নোংরা ঘটনায় আমাকে জড়াতে চাইছেন?

শবর দাশগুপ্ত একদৃষ্টে কিছুক্ষণ গার্গী মিত্রের দিকে চেয়ে রইল। গার্গীর চোখ ধীরে ধীরে নেমে গেল কোলের ওপর।

শবর মৃদু হেসে বলে, আপনাকে দেবীপ্রতিমার মতো দেখাচ্ছে। না, আপনার দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু নেই। শুধু বলি, আমার কল্পনাশক্তি একটা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করছে। সুইমিং পুলের ধারে হতচেতন মাতাল বিজিত বসে আছে। অনেক রাত। অন্ধকারে দ্রুত পায়ে একটি ছিপছিপে মেয়ে তার কাছে এল। মেয়েটি নম্রতা। সম্ভবত মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধও দেওয়া হয়েছিল বিজিতকে। নম্রতা তাকে সুইমিংপুলে চেয়ারসুদ্ধ ফেলে দেয়। তারপরে জলে নেমে মায়াভরে বিজিতের মাথাটা জলের নীচে চেপে ধরে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে যায়। ইট ওয়াজ অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট।

তা হলে আপনার তো নম্রতার কাছেই যাওয়া উচিত। তাকেই তো অ্যারেস্ট করার কথা আপনার।

হাত তুলে শবর বলে, ধীরে, মিস মিত্র, ধীরে। এখনও বিজিতের অটোপসি রিপোর্ট আমার হাতে আসেনি। কোনও সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই। তার ওপর বিমলাপ্রসাদের মেয়ের টাকা আর কানেকশানের জোর এত বেশি যে, সামান্য পুলিশের পক্ষে তাকে ফাঁসানো প্রায় অসম্ভব। সম্ভবত তাকে ধরলেও বেনিফিট অব ডাউট-এ মুক্তি পেয়ে যাবে। কারণ, বিজিতের মৃত্যুটা খুন না অ্যাকসিডেন্ট সেটাই তো বিরাট প্রশ্ন। সুইমিং পুল তার প্রিয় জায়গা ছিল, সে মাতাল ছিল, অ্যাকসিডেন্ট তো হতেই পারে।

কেন যে আমার কাছে এলেন।

শুধু এই কথাটা জানাতে যে এইসব ঘটনার কোথাও আপনি নেই। আপনি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। দেবীপ্রতিমার মতোই দেখাচ্ছে আপনাকে।

কেন একথা বলছেন? আমার যে কেমন লাগছে।

কেমন লাগছে মিস মিত্র? খারাপ। কিন্তু এসব ঘটনার একটা ভাল দিকও তো আছে। বিউটি কনটেস্টের তিনজন অসাধু বিচারকের একজন অন্তত চরম শাস্তি

পেয়েছে। অন্যায়ভাবে যে আপনাকে হারিয়ে বিউটি কুইন হয়েছিল সে নিজের হাতে তার প্রিয়তম পুরুষটিকে খুন করে উন্মাদের মতো দেওয়ালে মাথা ঠুকে প্রলাপ বকছে। এ তো প্রকৃতিরই প্রতিশোধে–তাই না? আপনি যদি সেই প্রক্রিয়াটাকে একটুখানি সাহায্য করেই থাকেন তা হলেও ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আপনাকে ছুঁতেও পারবে না। অভিনন্দন মিস মিত্র, অভিনন্দন।

গার্গী মিত্র হঠাৎ দু'হাতে তার মুখ চাপা দিল।

আমি চলি মিস মিত্র। আপনি বরং একটু কাঁদুন। কাঁদলে মন হালকা হয়ে যায়।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে

১. অহংটা এখনও বেশ আছে

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে – রহস্য উপন্যাস – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অহং। অহংটা এখনও বেশ আছে। বয়সে একটু স্তিমিত হয়ে এসেছে ঠিকই। সবসময়ে আগের মতো ফণা তুলে দাঁড়ায় না। সংসারের নানা প্রকাশ্য ও চোরা মারে বারবার আহত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আছে। কে জানে হয়তো অহংকারটুকুই আছে, আর তার কিছু নেই। তার বউ শিখা বলে, এত আমি-আমি করো বলেই আর কারও দিকে তাকিয়ে দেখলে না কখনও। অত অহংকার বলেই ছেলেটা পর হয়ে গেল, জামাই আসা-যাওয়া বন্ধ করল। এখন অহং ধুয়ে জল খাও। এই শিখার সঙ্গে একটা জীবন বনিবনা হল না তার। অন্তত দু'বার তাদের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ভেঙে যাওয়ার মুখে এসেছিল। টিকে আছে বটে। সম্পর্কটা, তবে ওপর ওপর। ভিতরে কোনও টান নেই, সমবেদনা নেই। দুটো মানুষ এক ছাদের তলায় বাস করেন মাত্র।

আজ ওই অহংবোধই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিল হঠকারিতার। সন্ধেবেলা রুটিনমতোই সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফিরে দেখলেন, লিফটটা খোলা। দু'জন মিস্ত্রি গোছের লোক খুটখাট করে কিছু সারাচ্ছেটারাচ্ছে।

বাসুদেব জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে হে?

লিফটের ভিতর থেকে মিস্ত্রিদের একজন বলল, সার্ভিসিং হচ্ছে।

কতক্ষণ লাগবে?

দু-তিন ঘণ্টা। আজ নাও হতে পারে।

বাসুদেব চিন্তিত হলেন। তার ফ্ল্যাট আটতলায়। হার্ট ভাল নয়। উচিত হবে কি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। এমন অবস্থায় ইচ্ছে করলে তিনি গরচায় মণিময়ের বাড়ি চলে যেতে

পারেন। মণিময় অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু শিখাকে জানানো দরকার। কীভাবে জানাবেন? তার ফ্ল্যাটে ফোন নেই।

দারোয়ানকে একটু খুঁজলেন বাসুদেব। সে ব্যাটার টিকিও দেখা গেল না। আসলে ফ্ল্যাটবাড়িটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কাজ চলছে। বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেই এখনও লোক আসেনি। দশতলার এই বাড়িতে আজ অবধি মাত্র চার-পাঁচটা ফ্ল্যাটে লোক ঢুকেছে। এখনও দারোয়ানদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। মাত্র একজনকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। ফ্ল্যাটের মালিকরা সবাই এসে গেলে কমিটিটমিটি হবে, তারপর পুরোদস্তুর দারোয়ানদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথা।

বাসুদেব এদিক ওদিক দারোয়ানটাকে একটু খুঁজে হতাশ হলেন। এ ব্যাটা প্রায় : ময়েই ছুতোনাতায় কোথায় যেন চলে যায়। সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আধুনিক ফ্ল্যাটগুলোর তলা তেমন উঁচু হয় না। পারবেন কি? যৌবনে ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই-ই খেলেছেন। খেলা থেকেই তার জীবনের প্রথম চাকরি। এখনও দেওয়াল আলমারি ভরতি তার খেলার ট্রফি। অহংটা মাথাচাড়া দিল। পারবেন না? তাই কি হয়? মাত্র ছেষট্টি বছর বয়স। এখনও তার সেক্স কার্যকর। এখনও দু’বেলা মাইল দুয়েক করে হাঁটেন। শরীর নিয়ে তার অহংকার আছে। মাস চারেক আগে হার্টের গণ্ডগোল ধরা পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নয়। অন্তত তিনি মনে করেন না।

ঢাকুরিয়ার বাড়িটা নিয়ে গণ্ডগোল করছিল ভাইপোরা। আইন বাসুদেবের পক্ষে ছিল বটে, কারণ বাড়িটা তার নামেই। কিন্তু নৈতিক দিকটা তার দুর্বল ছিল। কারণ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এজমালি সম্পত্তি বেচা টাকা তার বাবা এবং ভাইরা কিছু কিছু পাঠাত। সেই থেকেই বাড়িটার সূত্রপাত। বাবার ইচ্ছে ছিল বড় বাড়ি করে সব ভাই একসঙ্গে থাকবে, যেমন দেশের বাড়িতে ছিল। কথা ছিল বাড়িটা নিজের নামে করলেও বাসুদেব পরে দলিলে অন্যদেরও নাম ঢোকাবেন।

বাসুদেবেরও তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, দেশের বাড়ি থেকে যে টাকা এসেছিল তার চেয়ে বেশি টাকা বাসুদেবের তবিল থেকে বাড়ির পিছনে খরচ হয়েছে। বাবা আর এসে পৌঁছতে পারলেন না, ও দেশেই মারা গেলেন। দাদাদের মধ্যে একজন এলেন। এল ভাইপো-ভাইঝিরা। বাড়িতে এসেই উঠল সবাই। তারপর শুরু হল তাগিদ, বাড়ির ভাগ লিখে দাও।

বাসুদেব সেজদার সামনে হিসেব ফেলে দিয়ে বললেন, আমার আড়াই লাখ টাকা দিয়ে দাও, লিখে দিচ্ছি।

গণ্ডগোলের সূত্রপাত সেখান থেকেই। এত টাকা তিনি খরচ করেছেন এটা কেউ বিশ্বাস করল না! ঝগড়াঝাটি শুরু হল এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটতে লাগল। বাসুদেবের জোর বেশি, কারণ তিনি এখানকার লোক। তিনি হুমকি দেওয়ায় সেজদা রাগ করে ভাড়া বাড়িতে গেলেন। ভাইপোরাও বিদায় নিল। মামলা মোকদ্দমার তোড়জোড় চলতে লাগল। দেশ থেকে বড়দাও কয়েকবার আসা-যাওয়া করতেন। বাসুদেব সাফ জানিয়ে দিলেন আড়াই লাখ টাকা না পেলে তিনি বাড়ির ভাগ কাউবে দেবেন না।

মামলা হলে বাসুদেবের জয় অনিবার্য ছিল। তা ছাড়া এদেশে দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি হতে এত সময় নেয় যে যুবক বুড়ো হয়ে যায়। এক পুরুষে হয়তো নিষ্পত্তি হয়ও না। এসব ভেবেই বোধহয় ওরা আর মামলা করেনি, কিন্তু দাবিও ছাড়েনি। অন্তত দুটি ভাইপো শিবশঙ্কর আর গোপাল নাগরিক কমিটি, রাজনৈতিক দল আর স্থানীয় মস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রায়ই ঝামেলা পাকাত। বাসুদেব এক বছর আগে বাড়িটা তাই প্রমোটারকে দিয়ে দিলেন। নিয়মমতো প্রমোটার ফ্ল্যাট তৈরি করে সেখানে তাকে ফ্ল্যাট দেবে। কিন্তু বাসুদেব প্রমোটারকে বললেন, আমি এখানে থাকব না, অন্য জায়গায় আমাকে ফ্ল্যাট দিতে হবে। তবে এ বাড়িতেও আমার এক আত্মীয়ের জন্য একটা ফ্ল্যাট চাই।

বালিগঞ্জ ফাড়ির কাছে এই ফ্ল্যাটটা প্রমোটারই তাকে দিয়েছে। পুরনো বাড়িতে ফ্ল্যাট উঠছে শুনে ভাইপোরা ফের একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর ও প্রমোটারের ওপর। ফ্ল্যাটই যখন হচ্ছে তখন আমাদেরও ফ্ল্যাট দিতে হবে। বাসুদেব গায়ে মাখেননি সেসব কথা। শুধু শিখাই মাঝে মাঝে তাকে বলত, এ কাজটা তুমি ভাল করছ না। বাড়ির ভাগ যদি না দিতে পারো, অন্তত ওদের কিছু টাকা ধরে দাও। প্রমোটার তো তোমাকে সাত লাখ টাকাও দিয়েছে।

বাসুদেব একবার যে সিদ্ধান্ত নেন তা থেকে টলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, ওরা আমার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা না করলে দিতাম। এখন এক পয়সাও দেব না।

তার ভাইপো গোপাল তাকে একবার গুন্ডা দিয়ে মারাবে বলে শাসিয়েছিল। সেটা তিনি ভোলননি।

শিখা বলল, ওদের অভিশাপে আমাদের ভাল হবে না।

তিনি যথারীতি শকুনের শাপ ও গোরুর মৃত্যুর কথা বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাপ-পুণ্যের ভয় বাসুদেবের নেইও। কারণ ওসব তিনি মানেন না। তিনি মনে করেন জীবনের ক্ষেত্রে একটাই নিয়ম, যার দাঁত নখের জোর বেশি সে-ই টিকে থাকার অধিকারী। তার ভয়-ডর ভাবাবেগ বরাবরই কম। অহংকারী লোকদের ওসব কমই থাকে।

অহংকার কথাটার মানে কী তা বাসুদেব খুব ভাল জানেন না। অহংকার মানে কি নিজেকে ভালবাসা? তা হলে তো সবাই অহংকারী!

তবে কি নিজেকে নিয়ে গৌরববোধ? তাও অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। তবে কি অহংকার মানে নিজেকে সর্বদা নির্ভুল এবং অভ্রান্ত মনে করা? নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা? নিজের আরাম-বিলাস-সুখ ছাড়া আর কারও আরাম-বিলাস-সুখের কথা না ভাবা?

যদি এসবই হয়ে থাকে তবে বাসুদেব অহংকারী, সন্দেহ নেই। তিনি কোনওদিনই অন্যের ব্যথা-বেদনা-দুঃখ-অভিমান নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। তার দুই ছেলে এবং মেয়ের নাকি অভিমান আছে যে, বাবা তাদের কখনও ভালবাসেনি। ভালবাসেননি কথাটা ঠিক নয়, তবে ছেলেমেয়ে নিয়ে আদিখ্যেতা তার ছিল না। ওরা বায়না করলে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। ছেলেমেয়েরা তাকে যমের মতো ভয় পেত বরাবর। এখনও হয়তো ঘেন্না করে। কারণ অবিরল ভয় হয়তো কখনও কখনও সমাধান না পেয়ে ঘেন্নায় পর্যবসিত হয়। বাসুদেব ছেলেমেয়ের ঘেন্নার ভাবটা একটু টের পান।

একটা তলা উঠে এলেন বাসুদেব। কোনও অসুবিধে হলনা। আস্তে আস্তে উঠলে অসুবিধে হওয়ার কথাও নয়। উঠতে উঠতে তিনি নিজের প্রবল অহংকারের কথাই ভাবছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক বটে, তিনি অহংকারী, কিন্তু ওই অহংকারই কি তাকে বাঁচার জীবনীশক্তিটা জোগান দেয় না? অহংহীন পুরুষ তো নিবীর্য পুরুষের মতোই। তাই না?

তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শেষ দিকে যখন ফর্ম পড়ে যাচ্ছে, যখন দম পান না, যখন ভারী পা আর আগের মতো ডজ বা কারিকুরি দেখাতে পারে না, তখন একটা দুর্মদ অহংকারই তাকে মাঠ ছাড়তে দেয়নি। অনেক গুরুতর খেলায় স্রেফ

মনের জোরে তিনি মমতার চেয়ে দশগুণ বেশি দিয়েছেন। টিম থেকে তাকে বাদ দেওয়া হবে–এটা তার সহ্য হওয়ার কথা নয়। একটা সময়ে তিনিই নিজে সরে এলেন। সসম্মানে। খেলার শেষ জীবনে একটা ছেলেকে চিরকালের মতো বসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, সেও ওই অহংকার থেকেই। শুভম মিত্র বলে ছেলেটা তখন লেফট আউটে দারুণ খেলছে। খুব নাম-ডাক। শুভমের দলের সঙ্গে যেদিন খেলা পড়ল, সেদিনকার কথা। বাসুদেব রাইট হাফ-এ। শুভম ছেলেটার পায়ে ছিল হরিণের মতো দৌড়, তেমনি সূক্ষ্ম বল প্লে, তেমনি টার্ন এবং শুটিং। কমপ্লিট প্লেয়ার যাকে বলে। প্রথম হাফে তাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন বাসুদেব। শুভম তাকে অনায়াসে টুসকি মেরে কাটিয়ে যাচ্ছে, এবং বাসুদেব বলে যে মাঠে কেউ আছে সেটাই যেন মনে রাখছে না। অবহেলাটা সহ্য হচ্ছিল না বাসুদেবের। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এরকম চললে সেকেন্ড হাফে তাকে বসানো হবে। তার বদলে নামবে সত্য রায়। তাই হাফটাইমের কয়েক মিনিট আগে তিনি পা-টা চালালেন–যেমনটা চালালে বিপক্ষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। শুভম ভাল খেলোয়াড় ছিল ঠিক, কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা ছিল না। চোরা পায়ের মার খেয়ে ছিটকে পাঁচ হাত গড়িয়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। তারপর স্ট্রেচারে শুয়ে হাসপাতাল। শুভমের সেই শেষ খেলা। পায়ের হাড় এমনভাবে ভেঙেছিল যে জীবনে আর মাঠে নামতে পারেনি। এই রাফ ট্যাটি নিয়ে কাগজে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। বাসুদেব কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন? হয়তো একটু হয়েছিল অনুতাপ। কিন্তু অহংকারই তবু বরাবর তাকে চালিয়ে এনেছে।

অহংকারীরা একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে। এবং তারা অন্যের সম্পর্কে উদাসীন। শিখা এবং আর কেউ বিশেষ করে শিখা যখন তাকে স্বার্থপর বলে তখন খুব ভুল বলে না।

এই স্বার্থপরতা আর উদাসীনতা কত নির্মম হতে পারে তার উদাহরণ রীণা আর শঙ্কর। স্বামী-স্ত্রী। এই দম্পতিকে তিনি ভাল করে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেই দেননি।

যে-কোনও ক্ষেত্রে একটু নাম করলে ভক্ত জোটেই। তারও ভক্ত বড় কম ছিল না। ছেলেদের কথা বাদ রাখলেও মেয়ে-ভক্তেরা ছিল অনেক। তাদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গেই তার দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল। এরকমও হয়েই থাকে। মনে রাখার মানে হয় না। কিন্তু রীণা অন্যরকম।

রীণা ছোটখাটো, রোগা, মুখখানা ভারী মিষ্টি, মায়াবী চোখ দুখানা ছিল গভীর রহস্যে ভরা। নম্র শরীর আর মাজা রং। রীণা যখন তার প্রেমে পড়ে তখন রীণার বিয়ে হয়ে গেছে, বাসুদেব শুধু বিবাহিতই নন, দুই ছেলেমেয়ের বাবাও। কিন্তু তারা দু'জনে এমনভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেলেন যেন তাদের বয়ঃসন্ধি, দেহ তো ছিলই, দেহ ছাড়িয়েও অনেক দূর গড়াল সম্পর্ক। শঙ্কর এক মস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সেলস ইঞ্জিনিয়ার। নানা জায়গায় টুর থাকত। কিন্তু তা বলে বাসুদেব যে শঙ্করের অনুপস্থিতির সুযোগ নিতেন তা নয়। বরং রীণার সঙ্গে পরিচয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শঙ্করকে মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন, তুমি ওকে ডিভোর্স করো, ওকে আমার চাই। রীণাও স্পষ্টভাবে ডিভোর্স চেয়েছিল শঙ্করের কাছে।

বেচারা শঙ্কর। সে এমনই হদ্দমু ভালবাসত রীণাকে যে প্রস্তাব শুনে প্রথমটায় রেগে গেল। তারপর যখন বুঝল ওদের আটকানোর উপায় নেই, তখন পাগলের মতো হয়ে গেল। তখন সে বাধ্য হয়েই রীণাকে বলেছিল, যা খুশি করো, কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমি বাসুদেবদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক মেনে নিচ্ছি। শুধু কথা দাও, আমাকে ছেড়ে যাবে না।

পৌরুষের এমন অভাব বাসুদেব কদাচিৎ কোনও পুরুষের মধ্যে দেখেছেন। কেউ এরকমভাবে স্ত্রীর জারকে মেনে নিতে পারে? শঙ্করের অহং বলতে কি কিছু ছিল না। শিখা যদি এরকম করত বাসুদেব তো খুন করে ফেলতেন শিখাকে।

বাসুদেব একদিন রীণাকে বলেছিলেন, শঙ্করের তো উচিত ছিল পিস্তল দিয়ে আমাকে খুন করা।

রীণা অবাক হয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, খুন করবে কেন?

কেন করবে না? ওর পৌরুষ নেই?

পৌরুষ কী জিনিস জানি না। কিন্তু জানি ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমি আঘাত পাই এমন কাজ ও করবে না।

বাসুদেব তত্ত্বটা বোঝেননি। ভালবাসে বলেই তো প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেবে। না হলে কেমন ভালবাসা?

না, শঙ্কর কখনও আর অস্ফুট প্রতিবাদও করেনি। এমনকী রীণা তার সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল, তার প্রথম সন্তানটি হবে বাসুদেবের। শঙ্কর মেনে নেয়। মেড়া আর কাকে বলে?

বাসুদেব আর রীণার সন্তান হল অজাতশত্রু। না, অজাতশত্রু জানে না যে, বাসুদেবই তার বাবা। তার বৈধ বাবা শঙ্কর।

বাসুদেব চারতলায় উঠে দেখলেন, একটি পরিবার, স্বামী স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে সুইচ টেপাটেপি করছে। স্বামী-স্ত্রীর বয়স ত্রিশের কিছু ওপরে।

বাসুদেব বললেন, লিফট খারাপ। সার্ভিসিং হচ্ছে।

তাই নাকি? বলে ভদ্রলোক তাকালেন বাসুদেবের দিকে। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, চলো তা হলে সিঁড়ি দিয়ে নামি।

কথা বলতে গিয়েই বাসুদেব টের পেলেন, তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে, বড় হাঁফ, জিরোতে হবে।

বাসুদেব জানেন, এ সময়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে হয়। তাতে বেশি অক্সিজেন যায় শরীরে। দেয়ালে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ঘাম হচ্ছে। বরাবরই তিনি খাওয়ার ব্যাপারে কিছু তমোগুণী। ঝাল মশলাদার খাদ্য, বিশেষ করে মাংস তার এখনও প্রিয়। ইদানীং পাঠা খাসি বাদ দিয়ে মুরগি খেতে হচ্ছে ডাক্তারের নির্দেশে। রাত্রিবেলা প্রতি দিনই রুটির সঙ্গে মাংস থাকে। থাকে কাঁচা পেঁয়াজ, লঙ্কা। বেশি মাংস খাওয়াটা কি খারাপ হচ্ছে? ছেষট্টি বছর বয়সের পাকযন্ত্রকে কি অতিরিক্ত খাটাচ্ছেন তিনি। মনে পড়ল, আজ দুপুরে তিনি শুটকি মাছ খেয়েছেন। সেটা বেশ ঝাল আর গরগরে মশলাদার ছিল। খেয়েছেন পাবদা এবং পোনা মাছের আরও দু’রকম পদ। পেটে গ্যাস হয়ে এত ঘাম হচ্ছে নাকি?

মিনিট পাঁচেক নির্জন সিঁড়ির চাতালটায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আস্তে আস্তে হাঁফ ধরা ভাবটা কমে গেল। কমল, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হল না ফুসফুস। শ্বাসের মৃদু একটু কষ্ট রয়েই গেল। রাতে আজ আর কিছু না খেলেই হল। খেতে তিনি ভালবাসেন। অনেক দিন আগেই ডাক্তাররা তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল,

খাওয়া যেন মাত্রাছাড়া না হয়। মাত্রা একটু আধটু না ছাড়ালে বেঁচে থাকার আনন্দটাই বা কোথায়?

আরও চারটে তলা বাকি। বাসুদেব খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। পারবেন। এর চেয়ে অনেক কঠিন কাজ তো তিনি করেছেন। মাত্র আটতলা উঠতে পারবেন না, তাই কি হয়। বয়স? বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। ছেষট্টি বছর বয়সেও তিনি তো এক সক্ষম পুরুষ।

ঠিক কথা, এখন রীণার সঙ্গে তাঁর আর সম্পর্ক নেই। থাকার কথাও নয়। অজাতশত্রুর পর রীণার আরও একটি সন্তান হয়েছে। একটি মেয়ে। নাম পরমা। মেয়েটি শঙ্করের। বছর দশেক আগে এই মেয়েটি জন্মানোর পর থেকেই রীণা সরে যেতে লাগল। বাসুদেবকে ঠিক আগের মতো কাছে টানা বন্ধ করে দিল। একদিন সন্ধেবেলা ব্যালকনিতে পাশাপাশি বসে রীণা বলল, ছেলে আজকাল তোমাকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করে। আমার মনে হয় আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ হওয়া দরকার।

বাসুদেবের তাতে খুব একটা আপত্তি হল না। কারণ বেশ দীর্ঘদিনই তিনি রীণাকে ভোগ করেছেন। তবু বললেন, এখনই?

হ্যাঁ। শঙ্করকেও তো কিছু দিতে হবে। অন্তত অর্ধেক জীবনটা। এত ভালবাসে আমাকে ও যে, তোমাকে অবধি মেনে নিয়েছে। এখন ওর এই ত্যাগের মূল্যটা আমাদের দেওয়া উচিত।

বাসুদেবের বয়স তখন মধ্য পঞ্চাশ। ভোগ যথেষ্ট হয়েছে। আপত্তির কারণ ছিল না। তিনি সামান্য একটু অপমানও বোধ করলেন। অহং ফণা তুলেছিল। তিনি উঠে নিঃশব্দেই চলে এলেন। আর কখনও যাননি।

পাঁচতলা পেরোবার আগেই বাসুদেবকে আবার থামতে হল। ফের খাসটায় টান পড়ছে। বড্ড ঘাম। সারা গায়ে কেঁচোর মতো ঘামের ধারা নামছে। পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে ঘামে।

বাসুদেব দাঁড়ালেন, হাঁপ ছাড়তে লাগলেন, চোখটায় কি একটু ঘোলাটে দেখছেন?

এবার হাঁপটা সামলাতে বেশ সময় লাগল, ধীরে ধীরে বুকের কষ্টটা কমল বটে, কিন্তু শরীরটা দুর্বল লাগছে। বেশ দুর্বল। পায়ে একটা মৃদু থরথরানি।

কিন্তু আধিব্যাধির অনেকটাই মানসিক ব্যাধির ভয়ই অনেক সময় ব্যাধিকে ডেকে আনে। মনের জোর থাকলে অনেক ব্যাধিকেই ঠেকানো যায়। বাসুদেব পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল আর ঘাড় মুছলেন। রুমালটা ভিজে নেতিয়ে গেল। নিংড়োলে জল পড়বে।

ছ'তলায় এসে বাসুদেব বুকের মাঝখানে ব্যথাটা টের পাচ্ছিলেন। মৃদু কিন্তু নিশ্চিত। বুকে দূরাগত দামামার মতো একটা আওয়াজ।

এবং আচমকাই চোখে একটা অন্ধকার পরদার মতো কিছু ড্রপসিনের মতো পড়েই উঠে গেল। সমস্ত বুদ্ধি, বৃত্তি, যুক্তি, সাহস ভেদ করে একটা ভয় বাসুদেবকে ভালুকের মতো জাপটে ধরল। তার কিছু হচ্ছে? সময় এসে গেল নাকি?

সামনে যে দরজাটা পেলেন তারই ডোরবেল চেপে ধরলেন তিনি। ভিতরে ডিংডং আওয়াজ হল। বারবার বেল টিপলেন তিনি। বারবার আওয়াজ হল। বৃথা। কেউ নেই। প্রতি তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। তিনটে দরজারই বেল টিপলেন বাসুদেব। তার তেষ্টা পাচ্ছে। তাঁর এখনই শুয়ে পড়া দরকার।

মেঝেতেই শুয়ে পড়বেন কি? ডাক্তার তাকে বলেছিল, হার্ট অ্যাটাক টের পেলেই শুয়ে পড়তে। যখন যে-কোনও অবস্থাতেই শুয়ে পড়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

কিন্তু বাসুদেব তা পারলেন না। মেঝেয় শোবেন? বাসুদেব সেনগুপ্ত কি তা পারেন? অহং যে এখনও মরেনি। তিনি অসহায়ের মতো সিঁড়ির চাতালে শুয়ে পড়লে যে লোকে। হাসবে।

ছ'টা তলা পেরিয়ে এসেছেন। সাত পেরিয়ে আটে উঠে যেতে পারলে আর ভাবনা কী?

কিন্তু আরও দুটো তলা যেন এভারেস্টের মতো উঁচু মনে হচ্ছে এখন।

বাসুদেব বারবার চোখে আলো আর অন্ধকার দেখছেন। বুকে মাদল বাজছে। ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হচ্ছে বুকের ব্যথা। বাসুদেব রেলিং আঁকড়ে ধরে দুটো সিঁড়ি ভাঙতেই ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। তার কষে ফেনার মতো কী যেন বুজকুড়ি কাটছে। মাথা টলে যাচ্ছে। হাত ও পা শিথিল আর শীতল হয়ে যাচ্ছে যে! তিনি প্রাণপণে ডাকতে চেষ্টা করলেন, শিখা! শিখা। শিখা…

সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে আসছিল। খোলা চোখে চেয়ে ধীরে ধীরে বাসুদেব সিঁড়িতে পড়ে যাচ্ছেন। চেঁচিয়ে বললেন, বাঁচাও....

যে নেমে এল তার মুখটা চিনতে পারলেন বাসুদেব। তার দিকে চেয়ে আছে। বাসুদেব হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। ধরো আমাকে ধরো। সে ধরল না। ধীর পায়ে নেমে গেল পাশ কাটিয়ে। বাসুদেব গড়িয়ে পড়লেন সিঁড়িতে। চোখে যবনিকা নেমে এল।

২. চেনা মানুষের মৃত্যুসংবাদ

চেনা মানুষের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মানেই একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যাওয়া। যেতে হবে, সময়োচিত শোকজ্ঞাপন করতে হবে। এড়াতে না পারলে শ্মশানবন্ধু হতে হবে। আনঅ্যাভয়েডবল।

বাসুদেব সেনগুপ্তের মৃত্যুসংবাদটা শবর পেল সকালে, কেফাস্টের সময়। বাসুদেব যে তার খুব প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু সন্ড কটা এড়ানোও যায় না। তার পিসতুতো বোনের শ্বশুর। তা ছাড়া শবর যে ক্লাবে ফুটবল খেলত সেই ক্লাবের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা। ভালই চেনাজানা ছিল একটা সময়ে।

ব্রেকফাস্টটা পুরোটা খেতে পারল না শবর। উঠে পড়ল। যেতে হবে।

পুলিশ জিপে বেশি সময় লাগল না। লিফটে আটতলায় উঠে দেখল বাসুদেবের ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই রয়েছে। বিস্তর লোক জমা হয়েছে ঘরে। ক্লাবের লোকেরা এসেছে, বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়, আত্মীয়স্বজন তো আছেই। ঘরে থমথমে একটা ভাব। সামনের ঘরেই একটা ডিভানে বাসুদেবকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ফুল, মালা, ধূপকাঠি, বিভিন্ন ক্লাব বা কর্মকর্তাদের দেওয়া ফুলের চাকা ডিভানের গায়ে দাঁড় করানো।

ঘটনাটা দুঃখজনক। ফোনে বাসুদেবের বড় ছেলে বলেছিল, লিফটেনা উঠে বাসুদেব হেঁটে উঠছিলেন। কমজোরি হার্ট ওই পরিশ্রম নিতে পারেনি। সাততলার গোড়াতেই বাসুদেব হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান। রাত দশটা অবধি কেউ ঘটনাটা টের পায়নি। কারণ ফ্ল্যাটবাড়িটার অধিকাংশই খালি, লোক এখনও আসেনি। দশটাতেও স্বামী না ফেরায় শিখাদেবী বেরিয়ে এসে লিফটে নীচে নামেন। দারোয়ান কিছু বলতে পারেনি। ছ’তলার নন্দীবাবু রাত সাড়ে দশটায় ফিরে বাসুদেবকে দেখতে পান। তিনিই শিখাকে খবর দেন।

ঘরে কান্নাকাটি তেমন কিছু নেই। বাসুদেবের স্ত্রী সোফায় বসে আছেন, দুপাশে দু'জন মহিলা। শিখার মুখখানা থমথমে এই মাত্র। ছেলে অর্কদেব আর বুদ্ধদেব একটু গম্ভীর মাত্র। মেয়ে সুপর্ণা একটা সোফায় বসে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে আছে।

শবর শিখার কাছেই এগিয়ে গেল।

স্যাড, মাসিমা।

শিখা বিমর্ষ গলায় বলল, কী করে যে হল!

উনি লিফট থাকতে হেঁটে উঠছিলেন কেন?

কী করে বলব? শরীর নিয়ে খুব বড়াই ছিল তো? হয়তো শক্তি পরীক্ষা করতে চাইছিল।

স্ট্রেঞ্জ!

একজন ক্রনিক হার্ট পেশেন্ট লিফট থাকতেও হেঁটে আটতলা উঠতে চাইবে কেন সেটা একটা জরুরি প্রশ্ন। কিন্তু সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামানোর মানে হয় না।

একজন বিরলকেশ ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মজবুত চেহারার লোক দরজার কাছাকাছি দাঁড়ানো। লোকটা একটু এগিয়ে এসে বলল, লিফটটা সার্ভিসিং হচ্ছিল বলে উনি হেঁটে উঠছিলেন। আমাদের তো উনিই খবরটা দিলেন যে, লিফটটা সার্ভিসিং হচ্ছে।

শবর বলল, ও।

লোকটা উপযাচক হয়েই বলল, আমরা অবশ্য নীচে নেমে সার্ভিসিং-এর লোকদের দেখতে পাইনি। তবে লিফটের দরজাটা খোলা ছিল।

আপনি কি এ বাড়ির ফ্ল্যাটওনার?

হ্যাঁ। আমি চারতলায় থাকি। ইন ফ্যাক্ট বোধহয় আমরাই ওঁকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখতে পাই। উনি বেশ ঘামছিলেন আর হাফাচ্ছিলেন। আমরা নামবার সময় ওঁর কথাই আলোচনা করছিলাম।

আমরা মানে কারা?

আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে। আমরা কাল সন্ধেবেলা একটা নেমন্তন্নে যাচ্ছিলাম। লিফটের সামনেই ওঁর সঙ্গে দেখা।

আপনার নাম?

বিরহ মৌলিক।

অর্ক একরকম বন্ধুর মধ্যেই পড়ে। শবরের সঙ্গে অর্কর বেশ ভাব আছে। এর বউ মধুমিতাই তার পিসতুতো বোন। অর্ক এগিয়ে এসে বলল, দারোয়ান কিন্তু বলছে কাল লিফট সার্ভিসিং করতে কারও আসার কথা সে জানে না। বাবা যখন সন্ধেবেলা ফিরেছিল তখন দারোয়ানটা ছিল না, চা খেতে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে লিফটে কাউকে দেখেনি। তবে সেও বলছে, দরজাটা খোলা ছিল দেখে সে বন্ধ করে দেয়। এনি ওয়ে, ব্যাপারটা ডিসগাস্টিং। নতুন লিফট, তার আবার সার্ভিসিং-এর কী দরকার হল বুঝি না।

শবর একটু কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর বলল, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

অর্ক মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, কী আর করা যাবে। তবে লিফট যখন চলছে না তখন বাবা একটু অপেক্ষা করলে পারত। কারণ, ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচতলার মিস্টার সাহা ফিরে আসেন। তিনি লিফটেই উঠেছেন।

শবর ব্যাপারটা তেমন মাথায় নিল না। যদিও তার মাথার ভিতরে কয়েকটা যুক্তি ঠিকমতো পারম্পর্যে আসছিল না, তবু সে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল মন থেকে। এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মানেই হয় না।

একটু বাদে ঘরে ভিড় আরও বাড়ল। খাটটাট এসে গেছে। নীচে গাড়িও প্রস্তুত। ভিতরের ঘর থেকে মধুমিতা বেরিয়ে এসে শবরকে বলল, টুকুদা, তুমি কি শ্মশানে যাবে?

না রে, আমার কিছু জরুরি কাজ আছে। অনেক লোক দেখছি, আমার কি যাওয়ার দরকার?

না না, কোনও দরকার নেই। আমি ভাবছিলাম, শ্বশুরমশাই তো গেলেন, এরপর কী হবে। শুনছি, ঢাকুরিয়ার ভাশুর আর দেওররা নাকি হাঙ্গামা করতে পারে। তুমি বোধহয় জানো না যে, ঢাকুরিয়ার বাড়িটা থেকে শ্বশুরমশাই আমার খুড়তুতো আর জেঠতুতো দেওর ভাশুরদের বঞ্চিত করেছিলেন।

একটু আধটু শুনেছি। হাঙ্গামা করার কী আছে? দেওয়ানি মামলা, আদালতে ফয়সালা হবে।

মামলা তো হয়নি। তাতে নাকি লাভ নেই।

তা হলে আর হাঙ্গামা করে কী লাভ?

শাশুড়ি তো এই ফ্ল্যাটে একা থাকবেন। উনি ভয় পাচ্ছেন, ওরা এসে হামলা করলে উনি তো কিছু করতে পারবেন না। উনি পুলিশ প্রোটেকশনের কথা বলছিলেন। তুমি কিছু করতে পারবে?

শবর মাথা নেড়ে বলে, এক্ষেত্রে পুলিশ অ্যান্টিসিপেটরি প্রোটেকশন দেয় না। তবে উনি সিকিউরিটি গার্ড রাখতে পারেন। কিন্তু তার দরকারটা কী? এত বড় ফ্ল্যাট, তোর এসে থাকলেই তো পারিস।

না বাবা, আমরা আলাদা আছি আলাদাই ভাল।

তোর দেওর বুদ্ধদেব তো বিয়ে করেনি, তো সে এসে মায়ের সঙ্গে থাকুক। বাস্তবিকই তো, এত বড় ফ্ল্যাটে উনি একা থাকবেন কী করে!

বুদ্ধদেব? তাকে তো চেনো না। আমার কর্তাটি তার বাবাকে পছন্দ করত না ঠিকই, কিন্তু ঘেন্নাও করত না। বুদ্ধদেবের আবার বাবার ওপর এত রাগ যে, বাবা যে বাড়িতে বাস করত সে বাড়িতেও সে বাস করবে না।

বাসুদেব সম্পর্কে শবর খানিকটা জানে। একসময়ে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন বটে, কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বোধহয় আদ্যন্ত স্পোর্টসম্যান ছিলেন না। উপরন্তু অসম্ভব দাম্ভিক আর বদমেজাজিও ছিলেন। সে মধুমিতার কাছেই শুনেছে, স্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল খুব খারাপ। পরিবারের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করতে চাইতেন বলে অর্ক আর বুদ্ধ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। মেয়ে সুপর্ণাও বাপের বাড়িতে বিশেষ আসে না। কারণ, কী একটা মতবিরোধ হওয়ায় বাসুদেব নাকি

জামাই শিবাজীকে জুতোপেটা করার হুমকি দিয়েছিলেন। মেগালোম্যানিয়াকদের সৌজন্যবোধ কমই থাকে। এরা নার্সিসিজমের করুণ শিকার। না পারে অন্যকে আপন করতে, না পারে নিজেকে অন্যের মধ্যে সঞ্চার করতে। ফলে এরা একা হয়ে যায়। বাসুদেবকে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় হচ্ছে। তাকে ঘিরে বেশ জমাট একটা ভিড়।

শবর বলল, তোর শাশুড়ি যাদের ভয় পাচ্ছে তাদের নাম আর ঠিকানা আমাকে একটা কাগজে লিখে দিস। দেখব।

মধুমিতা বলল, সবাই অ্যাগ্রেসিভ নয়। গোপাল বলে একজন আছে সে-ই একটু বেশি ভোকাল। আর শিবশঙ্কর। দু'জনেই আমার সম্পর্কে ভাশুর।

তুই চিনিস ওদের?

চিনি। কয়েকবার দেখেছি।

ভয় দেখাত নাকি?

ও বাবা, খুব ভয় দেখাত। লাশ ফেলে দেওয়ার কথাও বলত। শ্বশুরমশাইকে মুখের ওপরই গোপাল একদিন বলেছিল। শ্বশুরমশাই তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন। ওঃ, সে কী কাণ্ড!

শবর একটু হাসল। বলল, এরকম ঘরে ঘরে হয়। অত ভাববার কিছু নেই। আমার মনে হয় না ওরা তোর শাশুড়ির ওপর হামলা টামলা করবে।

তুমি একটু থ্রেট করলে হয়তো ভয় পাবে।

উলটোও হতে পারে। থ্রেট করলে ইগোতে লাগবে। তখন হয়তো অ্যাগ্রেশনের রাস্তা বেছে নেবে। হিউম্যান সাইকোলজি বড় পিকিউলিয়ার।

মধুমিতা ভয় পেয়ে বলল, ও বাবা, তা হলে থাক। সত্যিই তো, ভয় দেখালে আবার উলটো বিপত্তি হতে পারে। গোপাল আবার ভীষণ গুন্ডা টাইপের।

দরজা দিয়ে তিন-চারজন ঢুকতেই মধুমিতা চাপা গলায় বলে উঠল, ও মা! ওই তো ওরা!

শবর নিস্পৃহ চোখে চেয়ে দেখল, গম্ভীর মুখের চারজন যুবক এবং অগ্রভাগে একজন বৃদ্ধ। সে জিজ্ঞেস করল, বুড়ো মানুষটি কে?

জেঠশ্বশুর।

গোপাল কোন জন?

সবুজ টি-শার্ট, মোটা গোঁফ।

গোপাল খুব লম্বা নয়, বেশ তাগড়াই চেহারা, তবে ভুঁড়ি আছে। পুরু ঠোঁট এবং মোটা গোঁফ। চোখে মুখে প্রবল স্মার্টনেস এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ। চারজনের কারও মুখেই বিশেষ শোক নেই। তবে বুড়ো মানুষটি কাঁদছেন। চোখ লাল। কান্নাটা নকল বলে মনে হল না শবরের।

বৃদ্ধটি তার মৃত ভাইকে কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে আদর বা আশীর্বাদ করলেন। তারপর শিখার কাছে গিয়ে একটু বসলেন পাশের সোফায়। বড় ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল বৃদ্ধকে। শিখার সঙ্গে তার কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। মৃদু স্বরেই।

শবর বলল, তোর শাশুড়ি বেশ শক্ত ধাতের মানুষ। স্বামী মারা যাওয়ায় ভেঙে পড়েনি তো।

মধুমিতা একটু মুখ বিকৃত করে বলল, দু'জনের সম্পর্ক তো ছিল বিষ। কঁদবে কী, মনে মনে হয়তো খুশিই হয়েছে। যা হাড়-জ্বালানো মানুষ ছিলেন শ্বশুরমশাই, বাব্বাঃ।

বাসুদেবকে নামানো হচ্ছে নীচে। একবার মৃদু হরিধ্বনি সহকারে খাট উঠে গেল কয়েকজনের কাঁধে, শবর লক্ষ করল গোপালও কাধ দিয়েছে। ঘনঘন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলছিল। দরজার সামনে একটু থমকাল শববাহকেরা। তারপর ভিড়টা বেরিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে বেশ ফাঁকা হয়ে গেল ঘর।

শবর শিখার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শিখা একদা সুন্দরী ছিলেন, এখনও আছেন। বয়স কম করেও পঞ্চান্নটঞ্চান্ন তো হবেই, বেশিও হতে পারে। কিন্তু এখনও বেশ ছিপছিপে এবং মুখশ্রীতে বার্ধক্যের বলিরেখা বা চামড়ার শিথিলতা নেই। বয়সের অনুপাতে তাকে বেশ কমবয়সিই লাগে।

শিখা মুখ তুলে বললেন, তুমি কি এখনই চলে যাবে?

হ্যাঁ মাসিমা, জরুরি কাজ আছে।

মাঝে মাঝে একটু খোঁজ নিয়ো। বড্ড একা হয়ে গেলাম তো!

বুড়ো মানুষটি শূন্য দৃষ্টিতে বসে ছিলেন। একথা শুনে বললেন, একা কেন বউমা, তোমার তো জনের অভাব নেই।

শিখা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন।

শবর আর দাঁড়াল না। ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলল, চলি, মাসিমা। লিফটেই নীচে নেমে এল সে। শববাহকদের আগেই। কারণ ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে। দেরি হবে। নীচে ফটকের সামনে পাড়ার লোকজনের একটু জটলা, ফুল দিয়ে সাজানো কাঁচের গাড়ি ঘিরে ভিড়।

৩. বড় চাকরি করার মস্ত অসুবিধে

বড় চাকরি করার একটা মস্ত অসুবিধে, ছুটির দিন বলে কিছু নেই। এমনকী শনি রবিবারেও এমন কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা পার্টি থাকে যার সঙ্গে কোম্পানির স্বার্থ জড়িত। আরও একটা অসুবিধে, সব সময়েই যেন কোম্পানির নানা দায়দায়িত্ব ঘাড়ে ভর করে থাকে।

শঙ্কর বসুর এটা তিন নম্বর চাকরি। সেলস ইঞ্জিনিয়ার থেকে এখন রিজিওন্যাল ম্যানেজার। রিচি রোডে মস্ত ফ্ল্যাটে বসবাস। চারটে টেলিফোন। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভদ্রস্থ টাকা জমে যাচ্ছে। ঘরে আধুনিক আসবাবপত্র, গ্যাজেটস এবং ঝি-চাকরের অভাব নেই।

অভাব ব্যাপারটা অবশ্য এইসব বাস্তব সাফল্যের ওপর নির্ভর করে না। অভাব এক ধরনের ধারণা, এক ধরনের অস্থিরতা, হয়তো এক ধরনের ভ্যাকুয়াম।

আজ ছুটির দিন নয়। নটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে হবে। হবেই। সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে সাড়ে ছ'টা অবধি একটু জগিং ও হাটা শেষ করে বাড়ি ফিরেই দাড়ি কামানো আর স্নানের জন্য পনেরো মিনিট ব্যয় করতে হয়। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে তিনটে খবরের কাগজে চোখ বোলানো। তার পরেই মাপা ব্রেকফাস্ট। সওয়া আটটায় মারুতি এস্টিমে হুস করে বেরিয়ে যাওয়া। তারপর সারাদিন শঙ্কর বসু আর ব্যক্তিগত শঙ্কর বসু নয়। নয় রীণার স্বামী বা পরমার বাবা। সে তখন কেবলই নিকলসনের বড় সাহেব।

আজ সকাল সওয়া সাতটায় শঙ্কর বসুর ব্যস্ত সকাল কিছুটা মন্থর করে দিল খবরের কাগজের একটি ছোট খবর। খবরটা বেরিয়েছে খেলার পাতায়, ডিটেলস বিশেষ নেই। বাসুদেব সেনগুপ্ত বড় খবর হওয়ার মতো লোকও ছিল না। স্কাউড্রেলটা চার দিন আগে মারা গেছে। হার্ট অ্যাটাক। "তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ..."

গুণমুগ্ধ? গুণমুগ্ধ? শঙ্কর ভ্রূ কোঁচকাল। শঙ্করের মুখে খারাপ কথা কদাচিৎ কেউ শুনেছে। তার রুচিবোধ প্রবল। তবু আজ শুয়োরের বাচ্চা কথাটা যেন আপনা থেকেই। তার নিঃশব্দ জিবের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল। খাসবায়ুর সঙ্গে সেটা শব্দ হয়ে অস্ফুটে উচ্চারিতও হয়ে গেল। সামান্য লজ্জিত হল শঙ্কর।

ঘড়িতে পৌনে আটটা। বেশ দেরিই হয়ে গেছে। আজ ব্রেকফাস্টটা স্কিপ করবে নাকি?

লিভিং রুমের প্রিয় রিক্লাইনিং চেয়ারটি ছেড়ে শঙ্কর উঠে পড়ল। নাউ টু ড্রেস আপ। এই ড্রেস আপে তার কিছু সময় লাগে। এমন নয় যে সে খুব সাজগোজ করে। কিন্তু ভারিক্কি চাকরির কিছু দাবি থাকেই। প্রায় রোজই অফিসের পর কনফারেন্স বা মিটিং বা বড়কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক থাকেই। পোশাকটা সাবধানে না করলে কিছু ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

বেশির ভাগ দিনই সুট। আজও তাই। নেভি ব্লু ট্রপিক্যাল সুট টাই সহযোগে পরে যখন ডাইনিং হলে ঢুকল তখন আটটা দশ। হঠাৎ আজ তার একটু গরম লাগছে। সে বেয়ারা। রামুকে বলল, এয়ারকুলারটা চালিয়ে দে তো। দুটোই চালা।

দুটো এয়ারকুলারে ঘর ঠান্ডা হচ্ছিল বটে, কিন্তু শঙ্করের মনে হল, এটা ঠিক সেই গরম নয়। বহুদিনকার পুরনো একটা রাগ আর অপমানই ঝটকা মেরেছে আজ। শরীরে মৃদু একটা রি-রি ভাব। রীণার চলাফেরা আজও স্বপ্নের মতো। ওর হাঁটা আজও ভেসে যাওয়ার মতো সাবলীল। রীণার পুতুল পুতুল চেহারা অনেক পালটে গেছে বটে। কিন্তু এখনও রীণাকে ঠিক রিয়েল বলে মনে হয় না শঙ্করের।

রীণা ঘরে এসেই ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ কী। আজ তো গরম নয়। এয়ারকুলার চালিয়েছ কেন রামু?

সাহেব বললেন।

শঙ্কর ডাইনিং টেবিলে ব্রেকফাস্টের শূন্য প্লেটের দিকে চেয়ে বসে ছিল। রামু গরম টোস্টে মাখন মাখাচ্ছে।

শঙ্কর বলল, বাসুদেব মারা গেছে।

রীণা সামান্য বিস্মিত হয়ে থমকাল, কে মারা গেছে?

সেই স্কাউলেটা।

রীণা বিহুলের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কে খবর দিল?

বাংলা খবরের কাগজের শেষ পাতায় আছে। দেখে নিয়ো।

রীণার তাতে উৎসাহ দেখা দিল না। সে শঙ্করের উলটো দিকে চেয়ারে বসে দুহাতে মাথাটা চেপে একটু বসে রইল।

আর ইউ শকড?

রীণা ধীরে মুখটা তুলে বলল, আর ইউ হ্যাপি?

শঙ্কর নিজেকে সংযত করে নিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল, আই শ্যাল নেভার বি হ্যাপি।

রামু সযত্নে মাখন মাখানো টোস্ট তার প্লেটে স্থাপন করল বটে, কিন্তু শঙ্কর সেটা ছুঁলই। রামুর দিকে চেয়ে বলল, থাক, আর দিস না। আজ আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং হাফ কাপ কফি দে। একটু তাড়াতাড়ি।

রীণা প্রায় একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখের পলকও যেন পড়ছে না। চোখের দৃষ্টি অবশ্য নিস্তেজ।

কফিতে উপর্যুপরি দুটো চুমুক দিয়ে শঙ্কর বলল, আই অ্যাম সরি ফর মাই রি অ্যাকশনস।

রীণা কিছুই বলল না। কেমন একটা বিহুল চাহনি নিয়ে বসে রইল। ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে পড়ল শঙ্কর। বলল, চলি। ব্যাপারটা ভুলতে শঙ্করের দেরি হবে না। অফিসে গিয়ে কাজে ও কথায় অন্য একটা জগতে চলে যাবে সে। বাসুদেব সেনগুপ্ত নামে একটি রাহুর কথা তার মনে থাকবে না।

শঙ্কর চলে যাওয়ার পর লিভিং রুমে গিয়ে খবরের কাগজটা দেখল রীণা। খুব সামান্য খবর হিসেবেই ছেপেছে। একটা ছবি অবধি নেই। গত ছ’বছরে বাসুদেবের চেহারার কীরকম ভাঙচুর হয়েছিল কে জানে!

শোক নয়, হাহাকার নয়। আজ রীণার বড় লজ্জা করছে। আজ তার কান্নাও এচ্ছে। বাসুদেব যে কেন এসেছিল তার জীবনে! অনেকদিন আগে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাসুদেব ডিভোর্স করবে শিখাকে, রীণা ডিভোর্স করবে শঙ্করকে। তারপর বাসুদেব আর রীণা বিয়ে করবে। করলে আজ কী হত?

রীণা জানালার ধারে বসে রইল চুপচাপ।

সাড়ে আটটায় অজু ফিরল। অজু মানে অজাতশত্রু। রীণার ছেলে, কিন্তু শঙ্করের ছেলে নয়। অজু বাসুদেবের ছেলে। রীণার সন্দেহ হয়, সে বা শঙ্কর অজুকে ঘটনাটা কখনও না জানালেও কোনও না কোনও ভাবে অজু সেটা জানে।

অজুর ইস্কুল-কলেজের খাতায় বাবা হিসেবে শঙ্কর বসুর নাম আছে। বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে অজু আজও শঙ্করের নামই বলে। কিন্তু হয়তো যা বলে তা বিশ্বাস করে না। কী করে অজু জানে বা সন্দেহ করে তা রীণা বলতে পারবে না। হতে পারে, বাসুদেবই ওকে জানিয়েছে। অন্তত সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দশ বছর আগে বাসুদেবের সঙ্গে যখন রীণা সম্পর্ক ছেদ করে তখন বলে কয়েই করেছিল। বাসুদেব অপমান বোধ করেছিল তাতে। আর সেই অপমানের প্রতিশোধ এভাবেই হয়তো নিয়েছে। এমনও হতে পারে, শঙ্করই জানিয়েছে ওকে। কারণ জন্মাবধি অজাতশত্রুকে শঙ্কর সহ্য করতে পারেনি কখনও। কোলে নেওয়া, আদর করা তো দূরে থাক, শিশুটির দিকে তাকাতেও শঙ্কর ঘেন্না পেত। তথাকথিত বাবার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পেয়ে অজাতশত্রু অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কখনও শঙ্করের কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি। কিন্তু পরমার প্রতি শঙ্কর ছিল অন্যরকম। পরমা বলতে শঙ্কর অজ্ঞান। আর পরমার মুখে বাপের মুখশ্রীর অবিকল ছাপ। অজাতশত্রু সেটাও লক্ষ করেছে নিশ্চয়ই। দুই সন্তানের প্রতি এই যে দু'রকম ব্যবহার এটা থেকে অজাতশত্রু নিজেও কিছু অনুমান করে নিয়ে থাকতে পারে। সে প্রখর বুদ্ধিমান।

বলতে নেই, অজুর চেহারাটা চমৎকার, দীঘল, অ্যাথলেটের মতো শরীর। মুখখানায় রীণার মুখ যেন বসানো। কিন্তু শরীর? শরীরের গঠনে এবং শারীরিক প্রকৃতিতে সে অবিকল বাসুদেব। আঠেরো বছর বয়সেই সে বেশ নামকরা স্পোর্টসম্যান। স্কুল এবং জেলা স্তরে স্পোর্টসে গাদা গাদা প্রাইজ পেত। এখন টেনিস খেলছে মন দিয়ে। ভালই খেলে। ক্রিকেটেও চমৎকার হাত। সে ভারতের সবচেয়ে দুরন্ত ফাস্ট বোলার হওয়ার চেষ্টা করছে। হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি অজু অচিরেই নিজের অর্জনে দাঁড়িয়ে যাবে। রীণা সেই চেষ্টাই করেছে, যাতে

অজু তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় এবং শঙ্করের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। শঙ্কর রীণাকে আকণ্ঠ ভালবাসত, হয়তো এখনও বাসে। কিন্তু অজুর জন্যই তাদের ভালবাসাটা শঙ্করের কাছে নিষ্কণ্টক হয়নি কখনও। অজু একটা চক্ষুশূল ছাড়া আর কিছু নয় শঙ্করের কাছে। বরাবর ছেলেকে নিজের পাখনার আড়ালে আগলে রেখেছে রীণা। অজু জারজ ঠিকই কিন্তু রীণা তো মা।

গায়ে সাদা টি-শার্ট, পরনে শর্টস, পায়ে কেডস অজু হলঘরে ঢুকে পাখার নীচে শরীর জুড়োচ্ছে। সকালে অনেকটা দৌড়োয় অজু। এবং ইচ্ছে করেই সাড়ে আটটার পর ফেরে। হিসেব করেই ফেরে, যাতে শঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখি না হতে হয়। প্রায় বাল্যকাল থেকেই শঙ্করের সঙ্গে এই টাইমিং-এর পার্থক্য রাখতে অভ্যাস করে ফেলেছে সে। তারা একই টেবিলে বসে খায়, তবে বিভিন্ন সময়ে, তাই খাওয়ার টেবিলে দেখা হয় না। একই ঘরের বাতাসে দু'জনে কখনও একসঙ্গে খাস নেয় না। অজু কখনও এর জন্য অভিযোগ করেনি। জন্মাবধি ব্যাপারটা হয়ে আসছে বলে তার কাছে বোধহয় অস্বাভাবিকও লাগে না।

অজু পোশাক ছেড়ে স্নান করতে গেল।

ছেলেটা খেতে ভালবাসে। শরীরের পরিশ্রমের জন্যই ওর খিদে বেশি। রীণা উঠল। গিয়ে দেখল টেবিলে খাবারদাবার ঠিকমতো সাজানো হয়েছে কি না।

রামু ছ'বছরের পুরনো লোক। সবই জানে। এও জানে এ বাড়ির কর্তার সঙ্গে অজুর সম্পর্ক ভাল নয়। তাই রামুর ব্যবহারে অজুর প্রতি সূক্ষ্ম অবহেলা থাকতে পারে, এই ভয়ে ছেলের খাওয়ার সময় রীণা কাছেপিঠে থাকে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রীণা রাঁধুনি অম্বিকাকে বলল, ফ্রিজের খাবার মাইক্রোওয়েভে বসিয়েছ?

না বউদি।

বসাও। অজু চানে গেছে। মাছটা রান্না হয়েছে তো?

হয়েছে।

তাড়াতাড়ি করো। ও মা। আলুভাজা এখনও চড়াওনি যে!

চড়াচ্ছি।

বিরক্ত রীণা বলে, আগে বসাওনি কেন? আলুভাজা হতে সময় লাগে, জানো না?

সরু করে কাটছি, হয়ে যাবে বউদি।

রীণা ফের লিভিংরুমে এসে বসল। খবরের কাগজগুলো সরিয়ে ফেলবে কি না ভাবল একবার। অজু অবশ্য খবরের কাগজ কমই দেখে। দেখলে খেলার পাতাটা। আর এই পাতাতেই খবরটা আছে।

না লুকিয়ে লাভ নেই। বরং দেখলে দেখুক। দশ বছরের বেশিই হয়েছে বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার। তখন অজুর দশ-এগারো বছর বয়স। লোকটা বোজ আসে কেন, মায়ের সঙ্গে এত কী কথা, এসব জিজ্ঞেস করত অজু। এবং বাসুদেবকে একদমই পছন্দ করত না সে। বাসুদেব এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির পুরুষ। অজু তার ছেলে জেনেও কোনওদিন ছেলেটাকে কাছে ডাকেনি বা আদরটাদর করেনি।

রীণার হঠাৎ মনে হল আজ কি অজুর মাছটাছ খাওয়া উচিত? বাপ মরলে ছেলের তো হিন্দুমতে অশৌচ হয়। অশৌচের অন্যান্য নিয়ম পালন না-ই করল, অন্তত আমিষ খাওয়াটা বন্ধ রাখা উচিত নয় কি?

রীণা উঠে ফের রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

অম্বিকা, একটা কাজ করো, আজ অজুকে মাছটাছ দিয়ো না।

অম্বিকা অবাক হয়ে বলে, দেব না?

না। তার চেয়ে বরং গরম ভাতে একটু ঘি দিয়ো। আর ফ্রিজে ছানা আছে, টক করে একটু ছানার ডালনা বেঁধে দাও।

তাতে তো সময় লাগবে বউদি।

লাগুক। আমি ওকে একটু বসিয়ে রাখবখন। ডালনার আলুটা মাইক্রোওয়েভে সেদ্ধ করে নাও। তা হলে ডালনা করতে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না।

রীণার ভয়, এসব নিয়ম পালন না করলে যদি ছেলেটার অমঙ্গল হয়! অভিশাপ নিয়েই জন্মেছে। দিনরাত ওর মৃত্যুই কি কামনা করে না শঙ্কর?

প্রায় পনেরো মিনিট বাদেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং হলের টেবিলে মাকে দেখে অজু হাসল, হাই মা, মুখটা অমন শুকনো করে বসে আছ কেন?

নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রীণা। বলল, এমনি।

মা ছাড়া অজুর আপনজন আর কেউ নেই, এটা একমাত্র রীগা জানে। তাই ছেলেটার জন্য তার বুকের মধ্যে একটা ভয় সবসময় পাখা ঝাঁপটায়। সে বেঁচে থাকতে থাকতে অজুটা যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায় তবেই রক্ষে।

শঙ্কর সংকীর্ণমনা নয়। তবু কিছুদিন আগে শঙ্কর রাতে শোওয়ার সময় তাকে বলেছিল, দেখো রীণা, আমার ইচ্ছে নয় যে, আমি মারা গেলে আমার বিষয় সম্পত্তি বা টাকাপয়সার ভাগীদার অজু হয়। মনে হয় ব্যাপারটা অজুকে আগে থেকে বলে রাখা ভাল। নইলে ওর হয়তো একটা এক্সপেকটেশন তৈরি হয়ে যাবে।

রীণা অসহায়ভাবে বলেছিল, কীভাবে বলব?

সেটা তোমার দায়িত্ব, আমার নয়। পিতৃপরিচয়টা মিথ্যে হলেও তোমার মুখ চেয়ে স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু ওয়ারিশন হিসেবে ওকে মেনে নিতে পারি না।

আমাকে একটু সময় দাও। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

সেটাই ভাল। আমার তো মনে হয়, ইট ইজ হাই টাইম টু টেল হিম দি টুথ। লেট হিম গো টু হিজ বায়োলজিক্যাল ফাদার অ্যান্ড লিভ উইথ দ্যাট স্কাউড্রেল। আমি তো অনেক দিন ওর দায়িত্ব পালন করেছি, যা আমার পালন করার কথাই নয়।

শঙ্করকে একটুও দোষ দেয় না রীণা। শঙ্কর বরং ভদ্রলোক বলেই সব সয়ে নিয়েছে। শুধু রীণার মুখ চেয়ে। শুধু এক অদ্ভুত ভালবাসা ও মায়া কাটাতে পারেনি বলে রীণার সব অমূলক শর্ত মেনে নিয়েও সে রীণাকে ছাড়তে চায়নি। পৌরুষের সব অপমান হজম করে গেছে। আজ যদি তার ক্ষতবিক্ষত মন কিছু বিদ্রোহ ঘোষণাই করে তাতে দোষ কোথায়?

কিন্তু রীণা যে জিনিসটা আজও বুঝে উঠতে পারে না, তা হল শঙ্করের তার প্রতি ভালবাসা। এরকমও হয়? এরকম কেন হয়? শঙ্কর কি ভীষণ ভাল একজন মানুষ? শঙ্কর কি খুব মহান?

অজু পোশাক পরে খেতে এল। এ সময়ে তার চোখে মুখে পেটের সাংঘাতিক খিদেটা ফুটে ওঠে।

মা, একটা ভাল খবর আছে। কী খবর? নেক্সট উইকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য পুরী নিয়ে যাবে। এক সপ্তাহের টুর।

রীণা মৃদু স্বরে বলল, ভালই তো।

রামু খাবার নিয়ে এল। গোগ্রাসে খাচ্ছে অজু। বলল, বাঃ, আজ ঘি দিয়েছ! ফাইন!

রীণা সতর্ক গলায় বলল, আজ কিন্তু নিরামিষ।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল অজু, নিরামিষ! নিরামিষ কেন?

এমনি।

অজু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এন্টায়ার মিলটাই নিরামিষ। জীবনে শুধু নিরামিষ তো কখনও খাইনি।

আজ খা। খেয়ে দেখ, খারাপ লাগবে না। মাঝে মাঝে নিরামিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

তার মানে এখন থেকে কি মাঝে মাঝেই নিরামিষ হবে নাকি?

সেটাই ভাবছি।

তা হলে বাইরে সাঁটাতে হবে।

রীণা দৃঢ় গলায় বলল, না। বাইরেও খাবে না।

বিস্মিত অজু বলে, বাইরেও না?

রীণা নরম হয়ে বলল, মাঝে মাঝে নিরামিষ খাওয়া যখন ভাল, তখন বাইরেই বা খাবি কেন? এটুকু সংযম নেই?

অজু কঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, নিরামিষ খেলে কি পেট ভরে? মনে হয় খাওয়াই হয়নি।

একটা মোটে দিন তো!

আচ্ছা, ঠিক আছে।

একটা দিন, মাত্র একটা দিনই হয়তো নিয়মটা রক্ষা করতে পারবে রীণা। কিন্তু তারপর আর পারবে না। পারতে হলে সত্য উদঘাটন করতে হয়। তার চেয়ে বড় যন্ত্রণাদায়ক আর কী আছে? যাক, একদিনই নিরামিষ খাক। নিয়মরক্ষা হলেই হল। অমঙ্গলের ভয়টা হয়তো তার অমূলক। সাহেবদের তো এসব নিয়ম নেই, কই তাদের তো কিছু হয় না।

অজু হঠাৎ বলল, আজ তোমাকে একটু আউট অফ ফর্ম দেখাচ্ছে। কেন বলো তো! ঝগড়াটগড়া হয়নি তো।

অবাক হয়ে রীণা বলে, ঝগড়া! ঝগড়া কেন হবে?

সেটাই তো ভাবছি। তোমাদের তো কখনও ঝগড়া হয় না। ইজ সামথিং রং?

সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং। কিন্তু সেটা রীণা কবুল করে কী করে? সে মৃদু স্বরে মিথ্যে কথা বলল, শরীরটা ভাল নেই।

কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে তো শরীরটা খারাপ হতেই পারে। বয়স হচ্ছে না?

তোমার আর এমন কী বয়স হল মা? মিড ফটিজ হয়তো।

কম নাকি? মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি।

নতুন একটা পা খুলেছে এ পাড়ায়। যাবে? শাওনা বাথ, ম্যাসাজ সব আছে। দে উইল মেক ইউ ফাইটিং ফিট।

ও বাবা! জন্মে ওসব করিনি, এখন সহ্য হবে না।

আরে না। কত বুড়বুড়ি যাচ্ছে। তোমরা বাঙালি মেয়েরা ফিটনেস জিনিসটাই বোঝো না । গ্যাস অম্বল প্রেশার টেনশন নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকো। চলো না মা, এটাতে খুব আলট্রা মডার্ন গ্যাজেটস আছে।

শরীর দিয়ে আর হবেটা কী?

ওই তো তোমাদের দোষ। শরীর ছাড়া কিছু নেই মা। শরীর ঠিক না থাকলে আর সবই তো মিনিংলেস হয়ে যাবে।

অজু খাওয়া শেষ করে উঠল। মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে বলল, আমার খুব ইচ্ছে করে পরমাটাকেও ভরতি করে দিতে। বারো মাস অ্যালার্জিতে ভোগে। একটু ব্যায়ামট্যায়াম করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্চর্যের বিষয়, পরমাকে অজু বড্ড ভালবাসে। আর পরমাও দাদার ভীষণ ভক্ত। দু’জনের মধ্যে বয়সের অনেক তফাত বলে পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো তাদের ঝগড়াঝাঁটি হয় না। আর লক্ষ করার বিষয় হল, পরমা যে-কোনও ব্যাপারে তার দাদাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করতে চায় না। কিন্তু পরমা বাচ্চা পরমাও জানে, তার বাবা তার দাদাকে পছন্দ করে না। আর সেই জন্যই বাবার সামনে সে কখনও তার দাদার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না।

রীণা বলল, ব্যায়াম ছাড়া তুই আর কিছু বুঝিস না, না?

লিভিংরুমের মস্ত কাঁচের শার্সি দিয়ে সকালের রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঘন নীল আর সাদা স্ট্রাইপের টি-শার্ট আর ক্রিম রঙের প্যান্ট পরা অজু যখন সেই রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল তখন হঠাৎ যেন বাসুদেবের একটা চিত্র ফুটে উঠল তার অবয়বে। রীণার বুক

সর্বনাশের আশঙ্কায় কেঁপে গেল কি হঠাৎ? অজু কি জানে?

অজু খবরের কাগজগুলো একের পর এক তুলে টপাটপ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। রীণার বুক কাঁপছে।

অজু যেমন অবহেলায় কাগজ তুলে নিয়েছিল তেমনি অবহেলায় রেখে দিয়ে বলল, চলি মা।

এসো গিয়ে।

অজু বেরিয়ে গেলে এক কাপ চা খেল রীণা। এখন আর তার কিছু করার নেই। পরমার মর্নিং স্কুল শেষ হবে সাড়ে দশটায়। ফিরতে ফিরতে পৌনে এগারোটা। ততক্ষণ নিজেকে নিয়ে বসে থাকা মাত্র।

কিন্তু বসে থাকা গেল না। ফোন বাজছে। এ বাড়িতে দুটো ফোন। কখন যে কোনটা বাজে ধরা যায় না।

রামু কর্ডলেস টেলিফোনটা এনে তার হাতে দিয়ে বলল, আপনার।

হ্যালো।

একটা মোটা গলা বলল, কেমন আছেন মিসেস বোস?

গলাটা চেনা ঠেকল না রীণার কাছে। সে বলল, কে বলছেন?

প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। আমাকে আপনি চেনেন না।

ও। কী বলবেন বলুন।

আজকে খবরের কাগজে একটা খবর আছে, দেখেছেন?

রীণার বুকটা ফের ধক করে উঠল। সে স্তিমিত গলায় বলল, কোন খবর?

দেখেননি! অবশ্য খবরটা এতই ছোট যে চোখে পড়ার মতো নয়। এনি ওয়ে, খবরটা খেলার পাতায় খুঁজলেই পেয়ে যাবেন।

রীণা একটা অজানা আশঙ্কায় শীতল হয়ে যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি কে বলছেন?

বললাম তো আমাকে চিনবেন না। আপনি বরং খেলার পাতাটা চেক করুন। আমি ফোন ধরে আছি।

রীণা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কোন খবরের কথা বলছেন তা বুঝতে পারছি না।

কণ্ঠস্বর সামান্য একটু হেসে বলল, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি মিসেস বোস? খবরটা জনসাধারণের কাছে ছোট হলেও আপনার কাছে তো ছোট নয়। ইট ইজ এ বিগ নিউজ ফর ইউ।

রীণা জানে, তার আর বাসুদেবের সম্পর্কটা তত গোপন কিছু নয়। কেউ কেউ জানে বা অনুমান করে। কিন্তু সময়ও তো অনেক বয়ে গেছে। তবু এই অচেনা গলা শুনে তার বুক কাঁপে কেন? সারা জীবনের অপরাধবোধ কি ঘুলিয়ে উঠছে? সে আরও দুর্বল গলায় বলল, আমাকে বিরক্ত করবেন না, প্লিজ।

আপনি কি শোকাভিভূত?

প্লিজ।

আরে, শোকের কী আছে? একটা বজ্জাত লোক দুনিয়া থেকে কমে গেছে এ তো ভাল খবর।

প্লিজ।

শুনুন, শুধু খবরটা দেওয়ার জন্যই আপনাকে ফোন করছি না। কারণ আমার সন্দেহ, আমি দেওয়ার আগেই খবরটা আপনি পেয়ে গেছেন।

তা হলে কেন ফোন করছেন?

কাগজে লিখেছে বাসুদেব সেনগুপ্ত হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। কিন্তু ঘটনাটা তা নয়।

রীণা চুপ করে থাকল।

শুনছেন?

হ্যাঁ।

হার্ট অ্যাটাক বটে, তবে হার্ট অ্যাটাকটা খুব নিপুণভাবে ঘটানো হয়েছিল।

তার মানে?

একজন অতিশয় দক্ষ হত্যা-শিল্পী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটা বদমাশকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্লিজ। এবার ছাড়ছি।

ছাড়বেন? তা ছাড়তে পারেন। সেটা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু ফোনের লাইন কেটে দিলেই কি সব ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন মিসেস বোস? ইউ হ্যাভ এ পাস্ট।

রীণা ফোন ছাড়ল না, শক্ত করেই ধরে রইল। কিন্তু কিছু বলতেও পারল না সে, চুপ।

মিসেস বোস?

বলুন, শুনছি।

দ্যাটস গুড। কথার মাঝখানে লাইন কেটে দেওয়া আমার অপমানজনক বলে মনে হয়।

বুঝলাম। কিন্তু এসব কথা আমাকে কেন বলছেন?

বলার একটা গুরুতর কারণ আছে।

কী কারণ?

বাসুদেবের ফ্ল্যাটে তার মৃত্যুর পরদিন সকালে একজন লোক তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল। শ্রদ্ধাদ্ধা আসলে একটা হাস্যকর লোকদেখানো ব্যাপার। আপনি ভালই জানেন শ্রদ্ধা পাওয়ার মতো লোক বাসুদেব ছিল না। যারা এসেছিল নিতান্ত দায়ে পড়ে, ভদ্রতার খাতিরেই এসেছিল। যাকগে, যার কথা বলছিলাম। লোকটা গোয়েন্দা পুলিশের একজন টিকটিকি। নাম শবর দাশগুপ্ত। বাসুদেবের মৃত্যুটা যে অস্বাভাবিক তা সন্দেহ করার কারণ তার এখনও নেই। তবু বলে রাখি, সে বাড়ির দারোয়ান এবং আরও দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে গেছে। হতে পারে হি হ্যাজ এ হাঞ্চ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝবেন। মানুষের মস্তিষ্ক এক অত্যাশ্চর্য স্টোরহাউস। এখন যা বুঝতে পারছেন না বলে মনে হচ্ছে তা হঠাৎ পরে এক সময়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে গেলেই বুঝতে পারবেন। বাই দি বাই, আপনার ছেলেটির নাম যেন কী?

কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করছি। ইচ্ছে না থাকলে বলবেন না।

না, বলতে বাধা কী? তার নাম অজাতশত্রু বসু।

বসু? ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসু ছাড়া আর কীই বা হতে পারে?

আপনি নোংরা এবং ইতর।

আমি? হাঃ হাঃ, হাসালেন ম্যাডাম। এনি ওয়ে, বাই..

৪. শবর দাশগুপ্তর মনটা ভাল ছিল না

আজ শবর দাশগুপ্তর মনটা ভাল ছিল না। পরাশর ঘোষালের কেসটা তাকেই দেওয়া হয়েছিল। কাজটা যন্ত্রণাদায়ক। পরাশর ঘোষাল তার সহকর্মী। এক ধাপ নীচের সহকর্মী এবং মোটামুটি বন্ধু মানুষ।

শবর জানে, পরাশরের অপরাধ গুরুতর। লালচাঁদ মার্ডার কেস এবং উলটোডাঙায় ডাকাতির দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে ঘোষাল অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় চলে যায়। যে ট্রেলটি সে পেয়েছিল তাতে পুরো গ্যাং ধরা পড়ে যেত। কিন্তু মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা থাকেই। ঘোষাল ঘুষ খায় না, অতি সৎ মানুষ। তবে তার দুর্বলতা ছিল অন্য জায়গায়। তার একটি মাত্র সন্তান, তার ছেলে তন্বিষ্ঠ। ছেলের প্রতি দুর্বলতা কোন বাপের না থাকে? কিন্তু ঘোষালকে জব্দ করা হল ওই রন্ধ্রপথেই। গ্যাং থেকেই একজন একদিন ঘোষালকে ফোন করে বলল, স্যার, আমরা জানি, আপনি খুব ভাল একজন পুলিশ অফিসার। হয়তো আমাদের ধরেও ফেলবেন। কিন্তু আপনার ভালর জন্যই বলছি, কেসটা যদি আর এগোয় তা হলে উই উইল কিল–না স্যার, আপনাকে নয়, উই উইল কিল ইয়োর সান তন্বিষ্ঠা।

এই হুমকি রোজ আসত। ঘোষাল ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল, নিস্তেজ হয়ে গেল। এমনকী গ্যাং-এর নির্দেশে সে কেসটা থেকে জরুরি কাগজপত্র সরিয়ে ফেলল। তদন্ত শুধু থেমেই গেল না, ঘুরেও গেল।

আজ সারা সকাল ঘোষালকে জেরা করতে হল শবরের।

ঘোষাল ঘামছিল, বারবার জল খাচ্ছিল। শেষে ধরা গলায় বলল, বলুন মিস্টার দাশগুপ্ত, আমার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন?

শবর গম্ভীর গলায় বলল, আমি বিয়ে করিনি, কাজেই ছেলেপুলেও নেই। আমি আপনার প্রবলেম আপনার মতো করে বুঝতে পারব না। তবে ব্যাপারটা আপনি পুলিশকে জানালে পারতেন।

ঘোষাল রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল, হ্যাঁ পারতাম। জানাইনি, কারণ পুলিশ আমার ছেলেকে চব্বিশ ঘণ্টার প্রোটেকশন দিতে পারত না। হি ওয়াজ ইন মরটাল ডেনজার।

ঘোষালবাবু, পুলিশের চাকরিতে ওরকম কতই তো ফাঁকা হুমকি শুনতে হয়। ভয় পেলে চলে!

ফাঁকা! কে জানে ফঁকা কি না। তবে ছেলের জন্য আমি ভারী ভয় পেয়েছিলাম। আমি আপনার মতো সাহসী নই মিস্টার দাশগুপ্ত।

ঘোষালের সাসপেনশন অবধারিত। রিপোর্টের অপেক্ষা শুধু। শবরের তাই মন খারাপ। এক-একটা দিন এমন আসে যে, মনে হয় এ চাকরিটা না করতে হলেই ভাল ছিল।

এনকোয়ারির একদম শেষে ঘোষাল জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কী হবে মিস্টার দাশগুপ্ত? চাকরি যাবে? আমার যে ঘুষের টাকা নেই। আমার যে অতি কষ্টেই সংসার চলে। চাকরি গেলে–

আপনি টাকাপয়সায় সৎ আমি জানি। কিন্তু দুর্বলতাও তো এক ধরনের ডেফিসিয়েন্সি। চারিত্রিক ডেফিসিয়েন্সি। ঘোষালবাবু, আমি ভাগ্যবিধাতা নই। আই উইশ ইউ গুড লাক।

স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা–এসব জিনিস কি মানুষকে জরাব করে দেয় নাকি? অন্ধ স্নেহে সাধারণ বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক বিসর্জন দিতে হলে তো দুনিয়া পিছন দিকে হাঁটতে থাকবে! ঘোষাল বুদ্ধিমান এবং দক্ষ একজন পুলিশ অফিসার। ডিপার্টমেন্টে তার সুনামও বড় কম নয়। পুত্রস্নেহে সে একটা কেস গুবলেট করে দিল এবং মেনে নিতে হল চাকরির ক্ষতিও। শবরের জানতে ইচ্ছে করে, যে ছেলের জন্য ঘোষালের এত দুর্বলতা, সেই ছেলে ভবিষ্যতে ঘোষালকে কী দেবে? আজকালকার ছেলেরা কি পিতৃঋণ কথাটা নিয়ে কখনও ভাবে? বাবা তাদের

আইডল নয়, প্রতীক নয়, এমনকী তেমন মান্যগণ্যও কেউ নয়। বাবা শব্দটাই কত হালকা হয়ে গেছে এখন!

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলায় অনেকদিন আগে একটা রচনা এসেছিল, কোনও মহাপুরুষের জীবনী। একটা ছেলে লিখেছিল, আমি একজন মহাপুরুষকে রোজ দেখতে পাই চোখের সামনে। তিনি সামান্য বেতনের একজন কর্মচারী। সংসার চালাতে তাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। তার একখানা মাত্র জামা, একখানা মাত্র কাপড়। সন্ধেবেলা এসে সেগুলো কাঁচেন, সকালবেলা ফের পরে বেরোন। তিনি কখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না, মিথ্যে কথা বলেন না, ভাগ্যকে দোষ দেন না। উপদেশ দিতেও তিনি ভালবাসেন না। এই মহাপুরুষটি হলেন আমার বাবা। এঁর জীবনী কখনও কোনও ইস্কুলে পড়ানো হবে না, এর কথা কেউ জানতেও পারবে না কখনও, কিন্তু আমার কাছে এমন মহাপুরুষ আর কে?…

দীর্ঘ রচনাটি পড়ে শবরের ইস্কুলমাস্টার জ্যাঠামশাই বাড়িসুদ্ধ লোককে তা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এমন সোনার টুকরো ছেলেকে কি এক নম্বরও কম দিতে পারি? কুড়িতে কুড়িই পেয়েছিল সেই ছেলেটা।

শবর ভাবছিল, এখনকার কোনও ছেলে কি আর তার বাবার ভিতরে মহাপুরুষ খুঁজে পায়?

দুপুরে ঘোষালের রিপোর্টটাই লিখছিল শবর, এমন সময়ে মধুমিতার ফোন এল।

টুকুদা, একটা প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম?

পাড়ার একটা ক্লাবের কিছু ছেলে আমার শাশুড়ির কাছে টাকা চাইছে। পাড়ায় নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাটে কেউ এলে নাকি ওদের টাকা দিতে হয়।

ক্লাবটার নাম কী?

সবুজ সংঘ।

কত টাকা চাইছে?

সে অনেক টাকা। কুড়ি হাজার।

লোকাল থানায় জানিয়েছিস?

জানানো হয়েছে। তারা এসেছিল। কিন্তু সবুজ সংঘের সেক্রেটারি বলেছে, ক্লাব থেকে টাকা চাওয়া হয়নি। পাড়ার কিছু মস্তান ছেলে এসব করে।

এই প্রথম চাইল, না আগেও চেয়েছে?

শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেও নাকি একবার এসেছিল। উনি কেমন মানুষ ছিলেন তা তো জানোই। রাগারাগি, চেঁচামেচি করে আর হুমকি দিয়ে ছেলেগুলোকে তাড়ান। কিন্তু শাশুড়ি তো তা পারবেন না। উনি ভয় পাচ্ছেন। তুমি কিছু করতে পারো না?

পারি। কিন্তু তাতে তোর শাশুড়ির প্রবলেম হয়তো বাড়বে।

ছেলেগুলো প্রতিশোধ নেবে বলছ?

সেটাই সম্ভব।

তা হলে?

অর্ক আর বুদ্ধকে বল ছেলেগুলোর সঙ্গে একটা মিটমাটে আসতে। ওদের বলুক যে, ফ্ল্যাটওনাররা সবাই এলে মিটিং করে একটা থোক টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। ইনডিভিজুয়ালি দেওয়া হবে না।

ওরা যে ভয় দেখাচ্ছে। তুমি নেগোশিয়েট করতে পারো না?

শবর একটু ভেবে বলল, পারি, ছেলেগুলোর কারও নাম বলতে পারবি?

একজনের নাম প্রকাশ, আর একজন কালু। প্রকাশ নাকি বড় মস্তান, খুনখারাপিও করেছে।

ঠিক আছে।

আরও একটা কথা।

বল।

শ্বশুরমশাইয়ের একটা এলআইসি পলিসি পাওয়া গেছে, যার নমিনি অজাতশত্রু বসু।

সে আবার কে?

মধুমিতা একটু হেসে বলল, শ্বশুরমশাইয়ের অবৈধ সন্তান।

ওঃ, মাই গড! কত টাকার পলিসি?

পাঁচ লাখ।

হুঁ, তা এ ব্যাপারে তো আর আমার কিছু করার নেই রে।

না, তা নেই। কিন্তু পলিসিটা বেরোবার পর বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি হচ্ছে।

কার সঙ্গে কার?

সকলের সঙ্গে সকলের, অর্ক আর বুদ্ধ তো ঠিক করে ফেলেছে তারা বাপের শ্রাদ্ধশান্তি করবে না। শাশুড়ি কান্নাকাটি করছেন।

কিন্তু পলিসিটার কী হবে?

সেটাই তোমার কাছে জানতে চাইছি। নমিনি বদল করা যায় না?

আমি কি সবজান্তা? উকিলের সঙ্গে কথা বলতে বল।

আর একটা কথা তোমাকে জানাতে বলেছে অর্ক।

কী কথা?

লিফট কোম্পানির লোক এসেছিল। অর্কই তাদের টেলিফোন করে জানিয়েছিল, লিফট খারাপ ছিল বলেই শ্বশুরমশাই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে মারা যান। লিফট কোম্পানির লোকেরা বলে গেছে, সেদিন তাদের সার্ভিসিং-এর কোনও লোক এ বাড়িতে আসেনি।

শবর সংক্ষেপে বলল, ও।

আচ্ছা টুকুদা, তুমি নাকি শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলে সন্দেহ করছ?

কে বললে?

অর্কই বলছিল। তুমি নাকি দারোয়ানকে জেরা করে গেছ সেদিন।

ও কিছু নয়।

ফাউল প্লে বলে সন্দেহ হয়?

হতেই পারে। তবে জল ঘোলা করে লাভ নেই। প্রমাণ করা শক্ত।

তুমি তো শক্ত কাজই ভালবাসো।

তোর কি ধারণা আমি সবকিছুর মধ্যেই রহস্য খুঁজে বেড়াই? দারোয়ানকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারণ ঘটনাটার টাইমিং কিছু অদ্ভুত এবং একটু যেন সাজানো। দারোয়ানটা অবশ্য কিছু বলতে পারেনি।

তোমার কী ধারণা?

কোনও ধারণা নেই।

সত্যি করে বলো না টুকুদা, শ্বশুরমশাইকে কি কেউ খুনটুন করতে চেয়েছিল নাকি?

বললাম তো, জানি না।

আচ্ছা, আমরা যদি চাই তা হলে তদন্ত করবে তুমি?

দূর বোকা! এত সহজ নাকি? খুন কি না তার ঠিক নেই, তদন্তের কথা উঠছে কেন?

অর্কও যে সন্দেহ করছে।

তা হলে অর্ককে বল লোকাল থানায় ডায়েরি করতে।

তারপর কী হবে?

আগে লোকাল থানা রিপোর্ট দিক, তারা যদি না পারে তখন গোয়েন্দা পুলিশ কেস হাতে নিতেও পারে। তখন দেখা যাবে।

আচ্ছা, আমি অর্ককে বলছি একটা ডায়েরি করতে। আবার জিজ্ঞেস করছি, ডায়েরি করাই কি ঠিক হবে?

হুঁ।

ভাল করে বলো।

হ্যাঁ, করুক।

তারপর তুমি কেস হাতে নেবে তো?

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। ডায়েরি হোক তো।

ফোন ছেড়ে শবর তার রিপোর্ট লিখতে লাগল। ঠিক এই সময়ে ঘোষাল ফের ঘরে ঢুকল।

মিস্টার দাশগুপ্ত?

হ্যাঁ, বলুন।

আই অ্যাম ফিনিশড।

শবর মৃদুস্বরে বলল, আপনি যা করেছেন তাতে ভবিষ্যতে আপনার ছেলেও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না। কাওয়ার্ডরা শ্রদ্ধা পায় না ঘোষালবাবু।

ঘোষাল গুম হয়ে বসে রইল।

শবর সমবেদনার গলায় বলল, আপনাকে হয়তো একটা শশা কজ করা হবে। যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি জবাব দিতে পারেন তা হলে সাসপেনশনটা এড়ানো অসম্ভব

হবে না।

ঘোষাল তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, ছেলেটাকে আমি বড় ভালবাসি। একটু বেশিই বাসি। বেশি বয়সের সন্তান, আমাদের আর ছেলেপুলে হবেও না।

তাতে কী? একজনকেই মানুষ করুন।

ঘোষাল মাথা নেড়ে বলল, আপনি বুঝবেন না, ছেলেকে ভালবাসি বলেই ওকে নিয়ে আমার সবসময়ে দুশ্চিন্তা আর ভয়। একটু জ্বরটর হলে একটু কেটেকুটে গেলেও আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এত উদ্বেগ আর অশান্তি নিয়ে ওকে বড় করব কী করে বলুন তো? এই যে কেসটা খারাপ হয়ে গেল, এর জন্যও তো সেই ভয়টাই দায়ী। বুঝতে পারছেন?

পারছি ঘোষালবাবু।

আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিপার্টমেন্ট থেকেই ঘুরে এলাম। যা পাওয়া যাবে তা যথেষ্ট নয়। একটা এলআইসি আছে এক লাখ টাকার। সেটাও বেশি কিছু নয় এই বাজারে। তবু হয়তো চলে যাবে। কী বলেন?

কী সব বলছেন আপনি?

ঘোষাল মাথা নেড়ে বলে, চাকরি তো দূরের কথা বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে দুঃসহ।

কেন এরকম ভাবছেন?

কী জানি! বলে ঘোষাল অসহায়ভাবে হাত ওলটাল। তারপর উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শবর চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভয় দেখানোটা একটা অপরাধ। কারণ ভয় দেখাতে দেখাতে একটা লোককে স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া যায়। ভয় থেকে মানুষ অনেক অন্যায় করে ফেলতে পারে। খুন অবধি। ভয় এক ভয়ংকর জিনিস। আর ভয় একবার পেয়ে বসলে সহজে তাকে ছাড়ানোও যায় না।

রিপোর্টটা আজ শেষ করতে পারল না শবর।

সে উঠে গিয়ে ঘোষালের ঘরে তার খোঁজ করল।

নন্দী বলল, উনি তো স্যার, একটু আগে চলে গেলেন।

ঘোষালের বাড়িতে টেলিফোন আছে, শবর জানে। সে বলল, ওর টেলিফোন নম্বরটা দিতে পারেন?

নিশ্চয়ই। বলে নন্দী একটা কাগজের টুকরোয় নম্বরটা লিখে শবরের হাতে দিয়ে বলল, এই যে স্যার।

শবর ঘরে ফিরে আধঘণ্টা অপেক্ষা করে নম্বরটা ডায়াল করল।

একজন মহিলা ফোন ধরলেন, সতর্ক গলায় বললেন, কে বলছেন?

লালবাজার থেকে বলছি, ঘোষালবাবু ফেরেননি?

না তো! উনি তো ওখানেই গেছেন।

আপনি কি ওঁর স্ত্রী?

হ্যাঁ।

আমি শবর দাশগুপ্ত।

ও আচ্ছা। আপনার কথা ওঁর কাছে শুনেছি। কী ব্যাপার বলুন তো! ওঁর কি চাকরিটা যাবে? উনি খুব ভাবছিলেন।

চাকরি যাবে না। কিন্তু আপনি ওঁকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।

কেন বলুন তো!

উনি স্ট্রেস-এর মধ্যে আছেন।

তার মানে? মানসিক চাপ।

হ্যাঁ, তা তো আছেনই। রাতে ঘুমোত পারেন না। সর্বক্ষণ ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।

আপনার ছেলে কত বড়?

এই তো, আট বছর। ছেলেও বাপের ভীষণ ভক্ত। কিছু বদমাশ তোক ছেলেকে কিডন্যাপ করবে, মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাত বলে উনি এমন পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

আপনিও কি ভয় পেয়েছেন?

পাব না? খুবই ভয় পেয়েছি। তবে আমি ওঁর মতো অতটা ভেঙে পড়িনি।

ভয় পাওয়ারই কথা। যাই হোক, ঘোষালবাবুকে একটু নজরে রাখবেন। আমি পরে খোঁজ নেব।

না, শবরের মন ভাল নেই, ফোনটা রাখার পর আবার তার একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।

নিতান্ত ডাইভারশনের জন্যই সে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে এসে বড় রাস্তায় জিপ রেখে পায়ে হেঁটে পাড়ায় ঢুকল। ভয়–এই শব্দটাই বড় ভয়ংকর। এ যুগে দুটো স্পষ্ট দল দেখা যাচ্ছে। এক দল ভয় দেখায়, অন্য দল ভয় পায়।

‘আকাশ প্রদীপ’ বাড়িটার সামনে সে দাঁড়াল। গ্রিলের গেটের ভিতরে একটা লোক টুলের ওপর বসে হাই তুলছে। দারোয়ান হীরেন। সে ভিতরে ঢুকে হীরেনের সামনে দাঁড়াতেই সে উঠে পড়ে একটা সেলাম গোছের কিছু করে বলল, বলুন স্যার।

তুমি কি এ পাড়ার ছেলে?

আমার বাড়ি লাইনের ওধারে।

প্রকাশ বা কালুকে চেনো?

হীরেনের চোখে একটা ভয় ঘনিয়ে উঠল, চিনি স্যার।

কোথায় পাওয়া যাবে ওদের?

হীরেনের বাঁকবজিতে একটা সস্তা ইলেকট্রনিক ঘড়ি। টাইমটা দেখে নিয়ে সে বলল, এখন স্যার, বিকেল পাঁচটা বাজে। এ সময়ে ওরা থাকে না বড় একটা। তবে একটু এগিয়ে গিয়ে মোড়টা পেরোলে ডানদিকে পন্টুর চায়ের দোকান দেখবেন। এখানেই ওদের আড্ডা।

প্রকাশ থাকে কোথায়? আরও এগিয়ে বাঁয়ে লন্ড্রি দেখবেন, তার পিছনের বস্তিতে। লন্ড্রি ঘেঁষেই ঢোকার গলি।

ঠিক আছে।

আমি চিনিয়ে দিয়ে আসব স্যার?

না, আমি একাই ভাল।

পন্টুর দোকানে কেউ ছিল না। একজন বুড়োমতো লোক গামছা পরে বসে হাওয়া দিয়ে আঁচ তুলছিল। সময় নষ্ট না করে শবর এগিয়ে গেল। লন্ড্রির পাশের গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা বেশ পরিচ্ছন্ন বস্তির উঠোনে পৌঁছল সে।

উঠোনটা পাকা না হলেও ইটে বাঁধানো। বিকেল পাঁচটা বাজলেও এখনও উঠোনে উনুন ধরানো হয়নি। তার মানে হয়তো বেশিরভাগ ঘরেই গ্যাস উনুন আছে। ইলেকট্রিকের কানেকশন যে আছে তা দেখতেই পাচ্ছিল শবর।

তিন-চারটে বাচ্চা খাপরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলছিল। এদের নানারকম খেলা আছে। নিত্য নতুন খেলা বানিয়েও নেয়। ওদের মধ্যে বড়জন ফ্রক পরা একটা মেয়ে। শবর তাকেই জিজ্ঞেস করল, প্রকাশের ঘর কোনটা বলো তো?

ওই যে। মেয়েটা আঙুল তুলে দেখাল।

ডানদিকের শেষ প্রান্তের ঘরটার সামনে গিয়ে শবর অনুচ্চ স্বরে ডাকল, প্রকাশ!

অপরাধীদের প্রতিক্রিয়া হয় দ্রুত। শবর ডাকতেই ঘরের জানালা টুক করে খুলে গেল।

কে?

শবর ঠান্ডা গলায় বলল, একটু কথা আছে। বাইরে এসো।

জানালা দিয়ে তাকে বোধহয় আরও একটু জরিপ করে নিল প্রকাশ। তারপর লুঙ্গি-পরা খালি গা যে-ছেলেটা বেরিয়ে এল তার মুখশ্রীতে খুব স্পষ্টই মস্তানির ছাপ। রং কালো, শরীরটা বেশ পেটানো, নাতিদীর্ঘ, পুরু ঠোঁট, ছোট চোখ, কোকড়া চুল। একটু আস্পর্ধার ভাব আছে মুখে চোখে। গলাতেও সেটা প্রকাশ পেল, কে আপনি মশাই?

শবর তার দিকে একটু চেয়ে থাকল নিষ্পলক। শবর বিশেষ লম্বানয়। বরং একটু ছোটখাটোর দিকেই। শরীর ছিপছিপে। তবু তাকে দেখে যারা যা বুঝবার তারা ঠিকই বুঝে যায়।

প্রকাশও বুঝল। চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, আমিই প্রকাশ।

আমি লালবাজার থেকে আসছি, কিন্তু ভয় পেয়ো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। বাইরে চলো। বরং একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এসো।

প্রকাশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কিন্তু আমি কী করেছি স্যার?

বললাম তো, ভয় পেয়ো না। তোমার কাছে কয়েকটা কথা জানার আছে। ধরপাকড় করতে আসিনি।

প্রকাশ ঘরে গিয়ে গেঞ্জি নয়, পুরো প্যান্ট আর টি শার্ট পরে বেরিয়ে এল।

চলুন স্যার।

শবর তাকে নিয়ে পর দোকানেই এল।

এটা তোমার ঠেক?

হ্যাঁ স্যার।

চলো বসি।

দোকানে এখনও তেমন খদ্দের নেই। গরিব দোকান। বিস্কুট আর চা ছাড়া বোধহয় আর কিছু হয় না। জনা দুই রিকশা বা ঠেলাওলা গোছের লোক চা খাচ্ছে। বুড়ো

মানুষটা চা বানাতে বানাতে একবার চোখ তুলে প্রকাশকে দেখল।

চা-টা স্যার আমিই খাওয়াচ্ছি।

খাওয়াও।

চায়ের কথা বলে দিয়ে প্রকাশ এসে পাশে বসল, এবার বলুন স্যার।

গত তেরো তারিখে আকাশ প্রদীপ বাড়ির আটতলার বাসুদেব সেনগুপ্ত মারা গিয়েছিলেন, জানো তো।

হ্যাঁ স্যার। বহুত টেটিয়া লোক।

শবর হাসল, কীরকম টেটিয়া?

আমরা স্যার, পাড়ার বেকার ছেলে। এ পাড়ায় নতুন কেউ ফ্ল্যাটট্যাট করে এলে আমরা কিছু পাই। কিন্তু বাসুবাবু আমাদের কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি নাকি প্লেয়ার ছিলেন, ভিআইপি-দের অনেককে চেনেন, এসব বলে ভয়ও দেখিয়েছিলেন।

আচ্ছা, সেকথা থাক। আমি বলছি তেরো তারিখ সন্ধেবেলার কথা। সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে উনি মারা যান হার্ট অ্যাটাকে।

সব জানি স্যার। লিফট খারাপ ছিল বলে উনি হেঁটে উঠতে গিয়ে বুকে খিচ হয়ে গেল। আমাদের গজু তো পুরো ব্যাপারটা দেখেছে।

গজু কে?

ওর নাম গিরিধারী। আমাদের বন্ধু। সন্ধেবেলা আকাশ প্রদীপের গ্যারেজের পিছনে বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিল। তখন দুটো লোক লিফট সারাতে আসে। তার পরেই বাসুদেববাবু এলেন। সব দেখেছে।

গজুকে কি পাওয়া যাবে?

যাবে। আপনি বসুন, আমি ডেকে আনছি। কাছেই বাড়ি।

প্রকাশ গেল এবং পাঁচ-ছ’ মিনিটের মধ্যেই একটা পাতলা ছিপছিপে ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল।

প্রকাশ বলল, স্যারকে সব বল। লালবাজারের লোক। গজুর মুখটা সবসময়েই একটু হাসিহাসি। বেঞ্চে মুখোমুখি বসে লাজুক গলায় বলল, আকাশ প্রদীপের দারোয়ান হীরেন আমার বন্ধু স্যার। মাঝে মাঝে একতলায় গ্যারেজে দুপুরবেলা আমরা তাসটাসও খেলি। বাথরুম পেলে বাথরুমেও যাই।

বুঝেছি। আকাশ প্রদীপে তোমাদের একটা ঠেক আছে।

এখনও আছে, তবে সব ফ্ল্যাটে লোক এসে গেলে আর থাকবে না।

তুমি সেদিন সন্ধেবেলা ও বাড়িতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ স্যার। হীরেন চা খেতে গিয়েছিল। আমাকে বলে গিয়েছিল গেটটা একটু দেখতে। আমি টুলে বসেছিলাম। হঠাৎ দুটো নোক এসে বলল, তারা লিফট সারাতে এসেছে।

লোকদুটোর চেহারা কীরকম বলতে পারবে?

হ্যাঁ স্যার। প্যান্ট শার্ট পরা। মাঝারি লম্বা। অর্ডিনারি চেহারা। তা

দের হাতে কোনও যন্ত্রপাতি বা বাক্স গোছের কিছু ছিল?

না স্যার।

ফের দেখলে চিনতে পারবে?

গজু একটু হেসে বলল, বলা মুশকিল স্যার। হয়তো পারব।

তারা কী করল?

লিফটে ঢুকে কীসব করছিল। এরকম সময়ে আমি বাসুদেববাবুকে ফিরতে দেখলাম। উনি আমাদের একদম পছন্দ করেন না। তাই আমি উঠে বাথরুমে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে দেখলাম উনি হীরেনকে খুঁজছেন। না পেয়ে কী ভাবলেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

তারপর কী হল? মিস্ত্রিরা কিছুক্ষণ খুটখাট করে বেরিয়ে এল। একজন সিঁড়িটা দেখে নিয়ে অন্যজনকে বলল, চল। হয়ে গেছে। তারপর দুজনেই বেরিয়ে চলে গেল। তারা লিফটের দরজা বন্ধ করল না।

লিফটের দরজা খোলা রাখলে কী হয় তুমি জানো?

জানি স্যার। ও বাড়ির লিফটে মাঝে মাঝে আমরা ওঠা-নামা করি। দরজা ভালমতো বন্ধ না করলে লিফট চলে না।

দরজাটা কে বন্ধ করল, তুমি?

না স্যার। আমি ভাবলাম, মিস্ত্রিরা বোধহয় কিছু আনতেটানতে গেছে, আবার এসে সারাবে। তাই আমি লিফটের ধারে যাইনি। তবে আরও একটু বাদে চারতলার মৌলিকবাবুরা নেমে এলেন। মৌলিকবাবুই লিফটের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আর কিছু দেখেছ?

না স্যার।

শবর চা খেল। দোকানের চেহারা হতদরিদ্র হলেও চা-টা কিন্তু খারাপ নয়। গুঁড়ো চায়ের একটা বেশ ঝাঝালো গন্ধ আছে, দুধ চিনির মাপ চমৎকার।

শবর প্রকাশের দিকে চেয়ে বলল, বাসুদেববাবুর স্ত্রীর কাছে কত টাকা চেয়েছ?

প্রকাশ একটু ভয় খেয়ে বলল, আমরা একটু বেশিই চাই স্যার, কিন্তু পার্টি কি আর অত দেয়? দরাদরি করে অনেক নামিয়ে ফেলে।

বাসুদেববাবু আমার আত্মীয় হন।

প্রকাশ এক গাল হেসে বলল, তাই বলুন স্যার। উনি বলতেন বটে অনেক ভিআইপিকে চেনেন।

আমি ভিআইপি নই, সাধারণ গোয়েন্দা মাত্র।

আমাদের কাছে আপনিই ভিআইপি। ঠিক আছে স্যার, মাসিমাকে বলে দেবেন, কিছু দিতে হবে না।

আরে না। ছাড়বে কেন? কিছু নিয়ো।

কত নেব স্যার, দু-চারশো টাকা?

অত কম নয়। হাজার টাকা চেয়ে।

ঠিক আছে স্যার।

শবরের মন ভাল নেই। একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বাসুদেবের মৃত্যুটা যে ঘটানো হয়েছে এতে তার আর সন্দেহ নেই। ইচ্ছে করলে সে ব্যাপারটা নাড়াঘাটা নাও করতে পারে। দুনিয়ার সব ঘটনার সমাধান কি হয়?

সে উঠল। বলল, আজ চলি। মনে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

গজু হঠাৎ বলল, স্যার বাসুদেববাবুর কেসটায় কি কিছু গড়বড় আছে?

শবর একটা শ্বাস ফেলে বলল, আছে গজু। হয়তো তোমাকে সাক্ষীও দিতে হতে পারে।

সাক্ষী দিলে কি স্যার মালকড়ি কিছু পাওয়া যাবে?

এমনিতে পাওয়া যায় না। তবে তোমার ব্যাপারটা আমি দেখব।

গজু একটু থ্রিল অনুভব করছে। বেশ খুশিয়াল গলায় বলল, কখনও সাক্ষী ফাক্কি দিইনি স্যার। টিভিতে দেখাবে?

না। তবে কাগজে নাম উঠতে পারে।

উরেব্বাস। হেভি কেলো।

শবর বড় রাস্তায় এসে জিপে উঠল।

রাত দশটার পর সে ঘোষালের বাড়িতে ফোন করল।

ঘোষালগিন্নি একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, উনি এইমাত্র ফিরলেন। কিন্তু ঘোর মাতাল অবস্থায়। কী হচ্ছে বলুন তো। উনি তো জীবনে কখনও এসব খাননি।

খুব মাতলামি করছেন?

মাতলামি করবে কী, উঠতেই পারছে না। ট্যাক্সিওলা ধরে ধরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর একরাশ বমি করে এখন অচৈতন্য।

তা হলে ঘুমোতে দিন। সকালে ঘুম ভাঙলে ভাল করে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দেবেন। ঠিক হয়ে যাবে।

আমার ভীষণ ভয় করছে। খুব হ্যাপি ফ্যামিলি ছিলাম আমরা, সব যে ভেঙে পড়ছে!

মানুষের খারাপ সময় তো আসে বউদি। কেটেও যায়।

ওঁর কোনও বিপদ হবে না তো? আপনি অভয় দিচ্ছেন?

দিচ্ছি।

চাকরি গেলে বা সাসপেন্ড হলে উনি বোধহয় মনের দুঃখেই মারা যাবেন।

আপনি অত ভাববেন না। সকালে আমি টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলব।

বলবেন প্লিজ! উনি ভাল লোক, কিন্তু একটু একগুয়ে।

শবর টেলিফোন রেখে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে ঘোষালকে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। ভয়? ভয়ের ওপরে ওঠা মানুষের পক্ষে খুব শক্ত ব্যাপার। ভয় এক সাংঘাতিক জিনিস।

শবর ঘুমোল।

সকালে টেলিফোন করতেই ঘোষালগিন্নি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মিস্টার দাশগুপ্ত, উনি বিষ খেয়েছেন।

বিষ!

হ্যাঁ, সকালে উঠে বাথরুমে গিয়েছিলেন। আমি চা করছিলাম। চা নিয়ে এসে দেখি উনি একটা পোকা-মারা বিষের টিন থেকে ঢকঢক করে খাচ্ছেন।

হাসপাতালে শিট করা হয়েছে?

অ্যাম্বুলেন্স আসছে। কী হবে মিস্টার দাশগুপ্ত?

আমি যাচ্ছি। শক্ত থাকুন। কতটা খেয়েছেন?

তা জানি না। আমি হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম।

শবর ফোন রেখে দ্রুত পোশাক পরে নিল। ঘোষালের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ কি সে? শবর ভাবছিল, এও কি এক ধরনের প্যাসিভ মার্ডার? মানুষ যে আসলে কত অসহায় তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

৫. কথাটা বলে দিতে চাই

আমি ওকে কথাটা বলে দিতে চাই।

কেন চাও? এতদিন পর কেন চাইছ?

ইট মাস্ট এন্ড সামহোয়ার। অভিনয় করে যাওয়ার আর কোনও মানে হয় না। সত্যটা প্রকাশিত হোক।

তুমি তো কোনওদিন ওর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করোনি। তুমি তো ওকে সারাজীবন বুঝিয়েই দিয়েছ যে, তুমি ওর কেউ নও। আবার নতুন করে কেন তা বোঝাতে যাবে?

ওর আসল বাবা কে তা কি ওর জানা উচিত নয়?

কী দরকার? আমি যা করেছি তার শাস্তি আমি পাব। ওকে কেন? ওর তো কোনও দোষ নেই।

সমাজে ও আমার পরিচয়ে পরিচিত হবে কেন?

শোনো, ও কি আর এখন ওর স্কুলকলেজের সার্টিফিকেটে বাবার নাম বদলাতে পারবে? পারবে না। উপরন্তু ওকে যদি সব বলে দাও তা হলে ও পাগলের মতো হয়ে যাবে। ওর এত ক্ষতি তুমি করবে কেন?

আমি ওকে আমার ইনহেরিটর করতে চাই না রীণা। তোমাকে আগেও বলেছি। দীর্ঘদিন আমার টাকায় ও প্রতিপালিত হয়েছে। এডুকেশন, বোর্ড অ্যান্ড লজিং, একটা পাপের পিছনে আমার গুনোগার কিছু কম দিতে হয়নি। কিন্তু আর নয়।

যদি অজুকে এসব বলার এতই জরুরি দরকার ছিল তোমার তা হলে সেটা বাসুদেব বেঁচে থাকতে বলোনি কেন?

তাতে কী হত?

তাতে ও অন্তত বাসুদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত, তাকে প্রশ্ন করতে পারত, বাসুদেবকে বাধ্য করতে পারত ওর ভার নেওয়ার। কেন তা করোনি?

শঙ্কর টক করে প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না।

রীণার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। কান্না জড়ানো গলায় সে বলল, তুমি কি বাসুদেবকে ভয় পেতে?

শঙ্কর দুর্বল গলায় বলল, ভয়! ভয় কেন পাব?

তা হলে বলোনি কেন? তুমি তো বাসুদেবকেও গিয়ে বলতে পারতে, তোমার ছেলের ভার তুমি নাও, আমাকে রেহাই দাও!

বাসুদেবের মুখ দেখতে আমার ঘেন্না হত।

বাসুদেব আর আমি সমান অপরাধী। তুমি আমাকে ঘেন্না করো না?

না।

কেন করো না শঙ্কর?

সেটা তুমিই বলল।

তুমি আমাকে ভালবাসো। এতটাই বাসো যে, আমার সব অপরাধ তুমি মেনে নিয়েছ। এরকম ভালবাসা বোধহয় পৃথিবীতে আর কখনও ঘটেনি। আমি সেজন্য তোমাকে মনে মনে পুজো করি। তোমার জন্যই বেঁচে আছি শঙ্কর। আমাকে আর একবার দয়া করো, অজুকে কিছু বোলো না।

কিন্তু ইনহেরিটেন্স?

শোনো শঙ্কর, ওকে কিছু দিয়ো না তুমি। বাসুদেব ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করে গেছে।

শঙ্কর অবাক হয়ে বলে, কী ব্যবস্থা?

বাসুদেব দু'-তিন বছর আগে একবার ফোন করে আমাকে জানিয়েছিল, ওর একটা পাঁচ লাখ টাকার লাইফ ইনশিয়োরেন্স আছে। সেই পলিসির নমিনি অজু।

বেশ তো, তা হলে আর চিন্তা কী? পলিসিটা কোথায়?

আমার কাছে নেই। সেটা বোধহয় আছে শিখার কাছে।

শিখা! বাঃ বাঃ। শিখা সেই পলিসি আদর করে তোমার হাতে তুলে দেবে বুঝি? বাসুদেব স্কাউড্রেল না হলে পলিসিটা তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখতে পারত। এটাও হয়তো ওর একট চালাকি।

বাসুদেব খারাপ হলেও ওর বউ শিখা খারাপ নয়। বাসুদেব আমাকে সে কথা অনেকবার বলেছে। শিখা ধার্মিক মহিলা। বাসুদেব শিখাকেই বলে গেছে, সে মারা গেলে যেন পলিসির টাকা অজু পায়।

তা হলে সেটা আদায় করার চেষ্টা করো। নইলে আমাকে অজুর কাছে সবই খুলে বলতে হবে। আমার বয়স হচ্ছে, এখন আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই। ও ছেলেটা এ বাড়িতে থাকলে আমার পক্ষে পিস অব মাইন্ড বজায় রাখা অসম্ভব। ওকে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

আমি জানি শঙ্কর। অনেকদিন ধরে তুমি যন্ত্রণাটা আমার মুখ চেয়ে সহ্য করেছ। আর ক'টা দিন সময় দাও। অজু তো নিজেকে তোমার কাছ থেকে সবসময় সরিয়েই রাখে। পারতপক্ষে সামনে আসে না।

তা আসে না, কিন্তু এক ছাদের তলায় তো আমাদের থাকতে হচ্ছে। সেটা আমি আর বরদাস্ত করতে রাজি নই।

হঠাৎ তুমি খেপে উঠলে কেন বলো তো! এতদিন যখন সহ্য করলে তখন আর কয়েকটা দিন পারবে না? তোমাকে বলতে হবে না, অজুকে যা বলার আমিই বুঝিয়ে বলব। আমার সন্দেহ হয়, অজু বোধহয় সব জানেও।

কী করে বুঝলে?

আমি মা। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

জেনে থাকলে ভাল কথা। এটাও ওর জানা দরকার যে, আমার বিষয়-সম্পত্তির কিছুই ও পাবে না। কোনও এক্সপেকটেশন থাকলে সেটা এখনই নিবিয়ে দেওয়া ভাল।

ও কিছু এক্সপেক্ট করে না। ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বাসুদেবের পাঁচ লাখ টাকা যদি পায় তা হলে ও এখনই নিজের আলাদা ব্যবস্থা করে নেবে।

শঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বলল, তাতেও যে সমস্যা মিটছে তা নয়। আইনের চোখে ও আমারই ছেলে। স্কুলে কলেজে সর্বত্র ওর বাবার নাম শঙ্কর বসু। কাজেই আমি মরলে ও দাবি তুলতে পারে। আমি সেই সম্ভাবনাটাও মেরে দিতে চাই। আমি চাই ওকে লিগ্যালি ডিজওন করতে।

সেটা কীভাবে করবে?

আমার কাছে একটা ডকুমেন্ট আছে।

কীসের ডকুমেন্ট?

তোমাকে লেখা বাসুদেবের একটা চিঠি। অনেকদিন আগে পুনায় একটা অল্পবয়সি ফুটবল টিমের ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। চিঠিটা আমি তোমাকে দিইনি, লেটার বক্সে চিঠিটা পেয়ে নিজের কাছেই রেখে দিই।

একটু চুপ করে থেকে রীণা ক্ষীণ গলায় বলল, কী আছে সেই চিঠিতে?

প্রেমের কথাটথা আছে। রীতিমতো প্যাশনেট চিঠি। তবে যেটা ভাইট্যাল তা হল, অজুর পিতৃত্ব নিয়ে বড়াই আছে। এমন কথাও লিখেছে, কোকিলছানা কাকের বাসায় বড় হয়, কিন্তু কাক তা টের পায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে কাকটা জেনেশুনেই কোকিলছানাকে লালনপালন করছে।

কী বিশ্রী কথা!

বাসুদেবের কাছ থেকে রুচিকর কিছু আশা করাই তো ভুল।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রীণা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আশ্চর্য!

কীসের আশ্চর্য?

তুমি বাসুদেবকে ঘেন্না করো, অজুকে ঘেন্না করো, কিন্তু আমাকে করো না। কেন বলল তো! আমাকেই তো তোমার সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করা উচিত।

আমাদের মধ্যে একথা নিয়ে আলোচনা অনেকবার হয়েছে।

হয়েছে, কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারি না। তুমি তো পাথর নও।

আমি ওথেলো হলে তুমি খুশি হতে?

রীণা অন্ধকারে চুপ করে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, না, তা নয়। মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

মনে হয় তুমিও আমাকে ঘেন্না করো, কিন্তু সেটা বুঝতে দাও না।

শঙ্কর পাশ ফিরে শুয়ে বলল, ঘুমোও রীণা। কালকেই পলিসিটা উদ্ধারের চেষ্টা করো। ওটা ভাইট্যালি ইম্পর্ট্যান্ট। অজুকে লিগ্যালি ডিজওন করতে হলে ওই পলিসিটাও কাজে লাগবে।

তুমি সত্যিই অজুর পরিচয় প্রকাশ করে দেবে?

নয় কেন? সত্য পরিচয়েই তো পরিচিত হওয়া ভাল। আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি।

রীণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অনেক ডিভভার্সি মেয়ে সন্তান নিয়েও তো নতুন স্বামীর ঘর করতে আসে। এই তো নীচের ফোর ডি ফ্ল্যাটের রজত রায়ের বউ বিন্দি।

তুমি কি আমাকে এটাও সেরকম বলে ধরে নিতে বলছ।

তোমাকে বলা আমার অন্যায় হবে। কারণ তুমি তো অনেক করেছ। কিন্তু দেখো, বিন্দির আগের পক্ষের দুটো বাচ্চাকেই তো ওর বর অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। ড্যাডি বলে ডাকেও।

শঙ্কর একটু ঝাঝালো গলায় বলল, শোনো রীণা, এ ব্যাপারটা ওরকম নয়। বাসুদেব এবং তুমি যা করেছিলে তা আমার কাছে লুকোওনি পর্যন্ত। দিনের পর দিন তোমরা আমাকে তো অপমানই করেছ।

রীণা এবার সামান্য দৃঢ় গলায় বলল, তুমি ভুলে যেয়ো না, আমি ডিভোর্স চেয়েছিলাম। তুমি হাতে পায়ে ধরে সেটা রদ করেছ। করোনি?

শঙ্কর এক ফুৎকারে যেন নিবে গেল। স্তিমিত গলায় বলল, করেছি।

তোমার কাছে কিছুই গোপন ছিল না শঙ্কর, এতকাল তুমি সব মেনেও নিয়েছ। আজ হঠাৎ বিদ্রোহ করছ কেন? বাসুদেব মারা যাওয়ার পরই কেন এই বিদ্রোহ? এতকাল কেন চুপ করে ছিলে তুমি? বাসুদেবকে কি তুমি ভয় পেতে?

অন্ধকারে শঙ্করের গলাটা বিকৃত শোনাল, ভয়! ওকে ভয় পাব? কেন ভয় পাব ওই —

যে শব্দটা জিবে এসে গিয়েছিল তা বস্তিবাসীর মুখের শব্দ, ভদ্রলোকের নয়। শঙ্কর আজ অবধি অত খারাপ কথা মুখে আনেনি। তার রুচিতে বাধে। তাই শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। সে এটা বোঝে, ঘটনাটা নিয়ে একটা বিতর্ক হলে সে হয়তো জিতবে না। বাসুদেব তো রীণাকে বিয়েই করতে চেয়েছিল। শঙ্করকে ডিভোর্স করতে আটকাত না রীণারও। বাধা তো দিয়েছিল শঙ্করই।

আজ একটু হাঁসফাস করছে শঙ্কর।

রীণা তার কপালে হাত রেখে বলল, তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি শান্ত হয়ে ঘুমোও। এটা মনে রেখো, তুমি একজন মহৎ মানুষ। আমি তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করি। তোমার দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

শঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর তার শরীরে চাপা কান্নার থরথরানি টের পেল রীণা। নিজেকে উন্মুক্ত করল সে। তারপর জড়িয়ে ধরল শঙ্করকে। কিছুক্ষণ পর একটা সন্ধিতে এল তারা। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যাবর্তনের অযোগ্য পয়েন্ট থেকে মাঝে মাঝে এভাবেও ফিরে আসে পরস্পরের কাছে।

পরদিন সকালে রীণা একটা সিদ্ধান্ত নিল। সে শিখার কাছে যাবে। যাওয়া ছাড়া তার আর গতি কী?

তাদের ভাব-ভালবাসার সময়ে বাসুদেব তাকে বলত, দেখো, আমার সঙ্গে বনিবনা হয় বটে, কিন্তু শিখা খুব ভাল মেয়ে। খুব সৎ, দয়ালু এবং বিশ্বাসযোগ্য।

রীণা প্রশ্ন করত, তোমার সঙ্গে বনিবনা হয় না কেন?

আমি তো একটু আউটরেজিয়াস, বড্ড বেশি লাউড অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ। আমার সঙ্গে কম লোকেরই বনে। সে কথা নয়। নিরপেক্ষ বিচার করলে শিখা কিন্তু ভাল মেয়েই। তেমন সুন্দরী নয়, ছলাকলা জানে না, স্টিল শি ইজ অ্যাডোরেবল।

যখন টেলিফোনে বাসুদেব তাকে লাইফ ইনশিয়োরের কথা জানিয়েছিল তখন তার একটা বিচ্ছিরি হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। বলেছিল, অজু আমার ছেলে। তার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য ছিল, যা আমি করিনি। আমি একটা পলিসি করেছি পাঁচ লাখ টাকার, বোনাসটোনাস নিয়ে ম্যাচুরিটিতে অনেক টাকা দাঁড়াবে। একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল, কতদিন বাঁচব কে জানে। পলিসিটা শিখার কাছে আছে। তাকে সব বলেছি। আমার কিছু হলে শিখার কাছে ওটা চেয়ে নিয়ো।

রীণা একটু অহংকারের সঙ্গে বলেছিল আমি কেন যাব? আমার কী দায়? শোনো রীণা, শিখার কিছু ত্যাগ আছে তোমার আর আমার জন্য। আমি চাই আমি মরে গেলে অন্তত একবার তোমাদের দেখা হোক। না হয় দু'জনে আমার নিন্দেই কোরো। তবু তোমাদের দেখা হোক।

আজ রীণার আর অহংকারটা নেই। অদূর ভবিষ্যৎ ভেবে ওই পাঁচ লাখ টাকা তার উদ্ধার করা দরকার। এই নাটকটা বাসুদেব কেন করতে গেল তা বুঝতে পারছে না রীণা। পলিসিটা অনায়াসে তাকেই পাঠাতে পারত বাসুদেব। না হলে কোনও অ্যাটর্নির কাছে গচ্ছিত রাখা যেত। শিখার কাছে কেন? শিখার সঙ্গে রীণাকে

মুখোমুখি দাঁড় করানোরই বা কোন প্রয়োজন? এসব নাটক রীণার সহ্য হয় না। কিন্তু অজুর মুখ চেয়ে এই নাটকটা তাকে করতেও হবে।

সকাল সওয়া আটটায় অফিসে বেরিয়ে গেল শঙ্কর। অজু ফিরল আটটা চল্লিশে। মুখে ঘাম, গায়ের সাদা টি-শার্ট ভিজে সপসপ করছে। লিভিং রুম থেকে হলঘরে অজুকে দেখতে পাচ্ছিল রীণা। ও কি তার পাপের প্রতীক? পাপই বা বলবে কেন রীণা? পাপ কেন? সে একজনকে একসময়ে সত্যিকারের ভালবেসেছিল। ও তো সেই ভালবাসারই সন্তান।

অজু কিছুক্ষণ খালি গায়ে পাখার নীচে বসে থাকল। তারপর বাথরুমে গেল।

ধীর পায়ে খাওয়ার টেবিলে এল রীণা। রামু খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। মুখোমুখি চেয়ারে সে বসে রইল চুপচাপ।

হাই মাম্মি। আজও নিরামিষ নাকি?

রীণা একটু থতমত খেল। নিরামিষের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। গত তিন দিন অজু নিরামিষ খাচ্ছে। কোনও প্রশ্ন করছে না। ও কি জানে? সন্দেহটা বড় কাটা কাটা লাগছে বুকের মধ্যে, না জানলেও জানবে। পলিসিটা যদি পাওয়া যায় তা হলে অজুকেই ক্লেম দাখিল করতে হবে। অজু তখন কি প্রশ্ন তুলবে না, বাসুদেব সেনগুপ্ত আমার কে?

পোশাক পরে অজু খেতে এল। একটু গোগ্রাসে খায়।

খেতে খেতে বলল, তোমার মুখটা ক'দিন যাবৎ অশোকবনে সীতার মতো হয়ে আছে কেন মা?

শরীর–

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অজু ধমকে উঠল, ফের শরীর। শরীর নয়, তোমার মন খারাপ।

খারাপ হলেই বা কী করবি? মন খারাপ তো খারাপ।

অজু একটু হাসল, খারাপ মনকে ভাল করে ফেললেই তো হয়। পৃথিবীর কোনও ঘটনাকেই গুরুত্ব দিয়ো না। জাস্ট ইগনোর এভরিথিং।

তা যদি পারতাম!

আমি কিন্তু পারি।

কী পারিস?

ঘটনাবলিকে উপেক্ষা করতে।

তোর আর ঘটনাবলি কীসের? একটুকু তো বয়স!

বয়সটা ফ্যাক্টর নয়। কম বয়সেই অনেকের কত ঘটনা ঘটে থাকে।

অজু, তুই কবে চাকরি পাবি?

পাবই যে এমন গ্যারান্টি নেই। হোটেল ম্যানেজমেন্টেও যা ছাত্রছাত্রীর ভিড়। তা ছাড়া কোর্সও তো শেষ হতে অনেক বাকি। কেন মা?

তুই চাকরি করলে আমার বুকটা হালকা হয়।

আমার মনে হয় আমার বেশ ব্যাবসার মাথা আছে। কিছু টাকা পেলে ব্যাবসা করতাম।

কীসের ব্যাবসা?

একটা হেলথ ক্লিনিক আর মাল্টিপল জিম।

তোর মাথায় ও ছাড়া কিছু আসে না?

যার যে লাইন। ওটা আমি ভাল বুঝি। ঢাকুরিয়া ইজ এ গুড স্পট। ওখানে করা যবে।

ঢাকুরিয়া! হঠাৎ ঢাকুরিয়ায় কেন?

ওখানে আমার একটা ঠেক আছে।

ঠেক! কীসের ঠেক? বন্ধুর বাড়ি নাকি?

হ্যাঁ।

ভাড়া নেবে না?

অজু হাসল, নাও নিতে পারে।

রীণা একটু দ্বিধা করল। তারপর খুব শক্ত হয়ে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, শোন অজু, এক জায়গায় তোর কিছু টাকা আছে।

জবাবে অজু কিছুই বলল না। একটু কৌতূহলও প্রকাশ করল না। যেন শুনতেই পায়নি এমন নিস্পৃহভাবে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে সে যথারীতি লিভিং রুমে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে কাগজ দেখল।

চলি মা।

আয়।

একা ফাঁকা বাড়ি। এ সময়টায় খারাপ লাগে তার। মেয়ে স্কুল থেকে ফিরলে ততটা লাগে না। মেয়েরও একটি সবসময়ের আয়া আছে। পরমা ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে সামান্য ভাব বিনিময় করে আয়া বাতাসীর সঙ্গে নিজের ঘরে চলে যায়। বাতাসীর সঙ্গেই তার বেশি ভাব।

শিখার সঙ্গে দেখা করার পর্বটা আজই সেরে ফেললে কেমন হয় তাই ভাবছিল রীণা। অপ্রিয় কাজ, কিন্তু অজুর মুখ চেয়ে কাজটা তাকে করতেই হবে। শিখা তাকে অপমান করবে কি? করুক। শিখার অপমানেও হয়তো তার কর্মফল–যদি তেমন কিছু থাকে–ক্ষয় হোক।

রীণা নিজের ঘরে পোশাক পরতে যাবে বলে উঠছিল, এমন সময়ে রামু কর্ডলেসটা এনে তার হাতে দিয়ে বলল, আপনার ফোন।

আবার সেদিনের লোকটা নাকি? ঠিক এরকম সময়েই তো ফোন করেছিল সেদিন।

কে বলছেন?

একটা ভারী কিন্তু ভারী আকর্ষক পুরুষের গলা বলল, আপনি কি মিসেস রীণা বসু?

এ সে নয়। রীণা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, বলছি। বলুন।

আমি লালবাজার থেকে বলছি। আমার নাম শবর দাশগুপ্ত।

লালবাজার। কী হয়েছে বলুন তো!

কিছু হয়নি। আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

কী দরকার?

কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। রিগার্ডিং এ ডেথ।

রীণার বুক কেঁপে উঠল। বলল, ও।

আপনি কি আজ খুব ব্যস্ত আছেন?

আমি একটু বেরোচ্ছিলাম। ঠিক আছে, আসুন।

আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছোতে আমার বোধহয় কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট লাগবে।

ঠিক আছে।

পঁচিশটা মিনিট রীণার জীবনের যেন মন্থরতম সময়। সে কফি খেল, খবরের কাগজ বারবার ওলটাল। তারপর ঝুম হয়ে বসে রইল।

শবর দাশগুপ্ত খুব লম্বাচওড়া লোক নয়। তেমন সাজগোজও নেই। পুলিশের ইউনিফর্মের বদলে গায়ে সাদামাটা একটা ক্রিমরঙা হাওয়াই শার্ট আর কালো ট্রাউজার। চোখ দুখানা ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ। লোকটাকে দেখলে একটু যেন অস্বস্তি হয়।

শবর প্রথমেই তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখাল। তারপর বসল।

চা খাবেন?

খাব। আমি খুব বেশি সময় নিচ্ছি মনে করলে নিঃসংকোচে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।

মৃদু একটু হাসল রীণা। রামুকে চায়ের কথা বলে এসে সোফায় বসল। বলল, এবার বলুন।

কোথায় যাচ্ছিলেন?

আমার এক বান্ধবীর বাড়ি।

বাধা দিলাম তো!

তাতে কী? পরে যাওয়া যাবে।

ম্যাডাম, আমি একটু সমস্যায় পড়ে এসেছি। আপনার কি মনে পড়ে যে, গত তেরো তারিখে সন্ধের পর আপনি কোথায় ছিলেন?

ও মা, ও আবার কী প্রশ্ন?

বিটকেল শোনাচ্ছে?

তেরো তারিখের কথা আজ কি মনে আছে। ছয় দিন তো হয়ে গেল।

আজ নিয়ে ছয় দিন। দেখুন না মনে পড়ে কি না। প্রশ্নটা অবশ্য রুটিন। তবু বলুন।

কার ডেথ-এর কথা বলছিলেন টেলিফোনে?

সেটা পরে।

হ্যাঁ, তেরো তারিখে আমি সন্ধের পর–না মনে পড়ছে না তো।

রামু চায়ের ট্রে নিয়ে এসে ট্রে-টা নিচু হয়ে সেন্টার টেবিলে রাখছিল। ওই অবস্থাতেই বলল, আপনি ছটায় বেরিয়েছিলেন।

রীণা একটু লাল হয়ে বলে, ও হ্যাঁ। ক্লাবে গিয়েছিলাম।

রামু ফের বলল, ক্লাবে নয়।

তা হলে?

সেদিন আপনার বোনঝির জন্মদিন ছিল। আপনি গিয়েছিলেন সল্টলেক-এ।

ও হ্যাঁ।

শবর হঠাৎ বলল, আপনার স্মৃতিশক্তি কি খুব খারাপ?

না তো। আচমকা জিজ্ঞেস করেছেন বলেই বোধহয় কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

কীসে গিয়েছিলেন, গাড়িতে?

না। আমাদের একটাই গাড়ি, সেটা আমার স্বামী ব্যবহার করেন। অফিস থেকে ফিরতে ওঁর রাত হয়। আমি ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম।

ক'টার সময় সল্ট লেকে পৌঁছেছিলেন?

একটু দেরি হয়েছিল। আমার উপহার কেনা ছিল না। সেটা কিনতে একটু সময় লেগেছিল। বোধহয় সাড়ে আটটা হয়ে গিয়েছিল পৌঁছোতে।

আপনার একটি মেয়ে আছে, না?

হ্যাঁ। পরমা।

জন্মদিনের নেমন্তন্নে তাকে নিয়ে যাননি?

ফের একটু থতমত খেল রীণা। তারপর বলল, না। ওর একটা ইম্পর্ট্যান্ট পরীক্ষা ছিল পরদিন। ও পড়ছিল।

আপনার স্বামী বা ছেলে?

ছেলে কোথাও যায় না। খুব লাজুক। তা ছাড়া ওরও কীসব কাজটাজ ছিল। তবে আমার হাজব্যান্ড অফিস থেকেই গিয়েছিলেন।

কত রাতে?

উনি বোধহয় আমি পৌঁছোনোর দশ-পনেরো মিনিট পরে পৌঁছোন।

উপহারটা কোথা থেকে কিনেছিলেন?

উপহার। ওঃ হ্যাঁ। গড়িয়াহাট।

কোন দোকান মনে আছে?

ফ্যান্সি স্টোর্স।

সেখান থেকেই কি আপনি সবসময়ে কেনাকাটা করেন?

ঠিক নেই। ওখানেও করি, অন্য দোকান থেকেও করি।

যতক্ষণ কেনাকাটা করছিলেন ততক্ষণ কি ট্যাক্সিটা ওয়েটিং-এ ছিল?

না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রেজেন্টেশন কেনার পর আবার গড়িয়াহাট থেকে ট্যাক্সি নিই।

তখন ক'টা?

ঠিক খেয়াল নেই। সাড়ে সাতটা হবে হয়তো।

আপনার চাকরটির নাম কী?

ওঃ, ওর নাম, রামু।

এখন যে কথাটা বলব সেটা ওর শোনা উচিত হবে না। আমরা কি আপনার ওই লিভিং রুমে গিয়ে বসতে পারি?

নিশ্চয়ই।

জুতো খুলে যেতে হবে নাকি?

না না, আসুন।

লিভিং রুমে আজও সকালের রোদ্দুর ঝা ঝা করছে। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে প্রাক-শরৎ ঋতুর চমৎকার একটা হাওয়া আসছে ঘরে।

আপনার একটি ছেলে আছে।

হ্যাঁ। অজাতশত্রু। রীণা চোখদুটো নত করল। এর পরের প্রশ্ন কোনদিকে যেতে পারে তা ভেবে তার বুক কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল।

আপনি অভয় দিলে বলি, ছেলেটির জন্মবৃত্তান্ত আমি জানি। আপনার অহেতুক সংকোচের কারণ নেই।

বলুন।

ছেলেটি যে বাসুদেব সেনগুপ্তর সেটা কি আপনার হাজব্যান্ড জানেন?

নতমুখে রীণা বলল, জানেন।

তার সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক কীরকম?

ভালই।

নরম্যাল বলছেন। বাপ আর ছেলের মতোই সম্পর্ক?

হ্যাঁ।

স্কুলকলেজে ছেলের বাবার পরিচয় কি আপনার হাজব্যান্ডের নামেই?

হ্যাঁ।

কিন্তু ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারটা? উনি কি আপনার ছেলেকে বিষয়-সম্পত্তির ভাগও দেবেন?

সেটা নিয়ে কথা হয়নি।

কখনও নয়?

না।

বাসুদেব সেনগুপ্ত কি কখনও আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ওঁর একটা মোটা টাকার লাইফ পলিসির নমিনি আপনার ছেলে?

হ্যাঁ।

পলিসিটা বা প্রিমিয়ামের রসিদ বোধহয় আপনার কাছে নেই?

না। ওঁর স্ত্রীর কাছে আছে।

আপনার ছেলে কি খবরটা জানে?

না তো!

ঢাকুরিয়ায় বাসুদেববাবুর একটা পুরনো বাড়ি ছিল, জানেন? মস্ত বাড়ি, অনেকটা জমি নিয়ে।

জানি।

সেই বাড়িটা ভেঙে প্রমোটার ফ্ল্যাট তুলছে, জানেন কি?

শুনেছিলাম।

সেই বাড়ির দোতলায় একটা তেরোশো স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাট অজাতশত্রু বসু নামে কাউকে অ্যালট করা আছে। জানতেন?

রীণা অবাক হয়ে মুখ তুলে বলে, জানতাম না তো!

অজাতশত্রু বসু এখন বেশ সচ্ছল একটি যুবক। অবশ্য যদি এলআইসির টাকাটা আদৌ সে পায়।

রীণা উদ্বিগ্ন গলায় বলে, পাবে না কেন?

পাবে না বলিনি। তবে পাওয়ার ব্যাপারে বাধা আছে। বাসুদেব সেনগুপ্তের ছেলেরা তো ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। তা ছাড়া পলিসির আসল নমিনি শিখাদেবী, অজাতশত্রু প্রাপক, যদি শিখা তাকে দেন।

রীণা হঠাৎ খুব করুণ গলায় বলল, দেখুন, আমার তো কলঙ্কিত জীবন, সবাই জানে। আজ আমার লুকোবারও কিছুই নেই। আমার জন্য অজু কেন বঞ্চিত হবে?

বঞ্চনার কথা কেন বলছেন? অজাতশত্রু তো সুখেই আছে এখানে।

রীণা চোখের জল লুকোনোর চেষ্টা করল না। মাথা নেড়ে বলল, নেই, নেই, সুখে নেই।

কেন বলুন তো!

শঙ্কর ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। শঙ্কর পরিষ্কার বলে দিয়েছে ওর একটা পয়সাও অজু কখনও পাবে না। অজুকে শঙ্কর ডিজওন করতে চায়।

শবর কিছুক্ষণ রীণার আবেগ প্রশমিত হতে দিল। তারপর বলল, আপনার ছেলে কি জানে?

কী জানার কথা বলছেন?

ও যে বাসুদেব সেনগুপ্তর ছেলে!

না। আমি ওকে কখনও বলিনি।

আপনি না বললেও বলার লোকের তো অভাব ছিল না।

আমি জানি না ও জানে কি না।

ও কি বাসুদেব সেনগুপ্তর পলিসি বা ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটের কথা জানে?

না তো। ফ্ল্যাটের কথা আমিও এই প্রথম শুনলাম।

আপনার ছেলে কখন বাড়িতে থাকে?

একটু আগেই তো বেরোল। সকালে বেরোয়, রাতে ফেরে।

ক’টার সময় ফেরে?

ন’টা-দশটা।

আপনার স্বামী?

উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। উনি আরও সকালে বেরোন, আরও রাতে ফেরেন।

ছুটির দিনে?

ছুটির দিনেও আমার স্বামীর আউটিং থাকে।

আপনার ছেলে?

ওরও আউটিং থাকে। আচ্ছা, একটা কথা বলবেন? আপনি এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? কী হয়েছে?

বাসুদেব সেনগুপ্তর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলে ওঁর আত্মীয়রা সন্দেহ করেছেন। একটা অফিশিয়াল এনকোয়ারি লোকাল থানা থেকে হচ্ছে। আমি কাজটা আন অফিশিয়ালি একটু এগিয়ে রাখছি।

রীণা শবরের দিকে শুকনো মুখ করে চেয়ে রইল। তার বুকের ভিতরে ঘনিয়ে উঠছে ভয় আর ভয়। গলাটা তার খুবই শুকিয়ে গেছে। একটু গলা খাকারি দিয়ে সে স্তিমিত গলায় বলল, কয়েকদিন আগে–বাসুদেব যেদিন মারা যায় তার পরদিন সকালের দিকে একজন আমাকে ফোন করে এ কথাটাই বলেছিল। সে তার নাম বলেনি।

অ্যাননিমাস কল?

হ্যাঁ।

লোকটা একজাক্টলি কী বলেছিল মনে আছে?

একটু ইয়ারকির ভাব ছিল। বলছিল বাসুদেব নরম্যালি মারা যায়নি। তাকে খুন করা হয়েছে।

লোকটা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে।

রীণা চোখ বুজল। তারপর ধরা গলায় বলল, আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

সন্দেহই আমাদের ধর্ম ম্যাডাম।

কাকে সন্দেহ করছেন?

সবাইকেই। কনসার্নড কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। তেরো তারিখে আপনি সল্টলেক থেকে আপনার স্বামীর গাড়িতেই তো ফিরে আসেন?

হ্যাঁ।

গাড়ি কে চালাচ্ছিল, ড্রাইভার?

না। সেদিন ড্রাইভার ছিল না। শঙ্কর গাড়ি চালাচ্ছিল।

উনি কি স্টেডি ছিলেন?

কেন থাকবেন না?

শবর একটু হাসল, চলি ম্যাডাম। আবার দেখা হতে পারে।

৬. মৃত্যুর মুখ থেকে ঘোষাল ফিরল

মৃত্যুর মুখ থেকে ঘোষাল ফিরল। ফিরত না, যদি না শবর ঝাঁপিয়ে পড়ত ডাক্তার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর। সামান্য অবহেলা, সামান্য দেখভাল এবং সময়োচিত ব্যবস্থার নড়চড় হলেই মারা পড়ত ঘোষাল। শবর সেটা হতে দেয়নি।

তিনদিন বাদে ঘোষালের বেডের পাশে সকালে দাঁড়িয়ে ছিল শবর।

কীরকম আছেন?

দুর্বল গলায় নিস্তেজ ঘোষাল বলল, বাঁচাটা বাঁচার মতো না হলে বেঁচে কী লাভ?

বেঁচে থাকাটাই লাভ। আপনি মরলে যে আরও দুটি প্রাণী ভেসে যায়।

সে আর কী করা যাবে। আমি বেঁচে থাকতেও কি যাবে না?

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

ঘোষাল মৃদু একটু হাসার চেষ্টা করল, গীতা?

নয় কেন? আমি রোজ পড়ি।

তাতে জোর পান?

পাই। খুব পাই। গীতা আমার চোখ খুলে দেয়, মাথা থেকে অনেক চিন্তার ভূত তাড়িয়ে দেয়।

আগে পড়েছি কয়েকবার। আজকাল আর হয়ে ওঠে না।

রোজ গীতা পড়ুন ঘোষালবাবু, ইট উইল হেল্প। হতো বা প্রান্স্যসি স্বর্গং জিহ্বা বা ভোক্ষসে মহীম। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।

যুদ্ধ! আমার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মিস্টার দাশগুপ্ত। আই অ্যাম এ রুইনড ম্যান।

ওরকম মাঝে মাঝে মনে হয়। আপনি রুইনড ম্যান নন, আপনি উইক ম্যান। আর সেটার কারণ আপনার অত্যধিক পুত্রস্নেহ।

পুত্রস্নেহ কি দুর্বলতা?

না। পুত্রস্নেহ কার নেই? কিন্তু তা থেকে অকারণ উদ্বেগ, অশান্তি টেনশন হলে বুঝতে হবে আপনি শক্ত মানুষ নন, অবসেসড।

ওরা যদি আমার ছেলেকে মেরে ফেলত? কী হত তা হলে বলুন। তার চেয়ে চাকরি যাওয়া ভাল।

আপনি কেসটা ঝেড়ে ফেললেন, আপনার ছেলেও বেঁচে গেল। কেমন তো! এবার বলুন, এইসব ক্রিমিন্যালরা যদি টিকে থাকে তা হলে আরও কতজনের ছেলে বিপন্ন হবে। আপনার পর যে-অফিসার কেসটা হাতে পাবে তারও হয়তো ছেলেমেয়ে আছে, তাকেও ওরা হয়তো ওরকম হুমকি দেবে। তার মানে কি আমরা সবাই একে একে হাত গুটিয়ে নেব?

আপনি লজিকের কথা বলছেন। লজিক আমি মানছি, কিন্তু আমি এ কাজের অযোগ্য। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি দুর্বল।

ঘোষালবাবু, বিপদ কি একবার আসে? কিছু মনে করবেন না, আপনি আজ নয় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু কাল যদি আর একটা গ্যাং আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ চায়

তখন কী করবেন?

অ্যাঁ! বলে বড় বড় চোখ করে ঘোষাল তাকাল।

এরকম তো হতে পারে!

পারেই তো। আর এইসব টেনশনের জন্যই তো আমি মরতে চেয়েছিলাম। বেঁচে থাকার যোগ্যতাই আমার নেই!

ছেলের কথা ভেবেই না হয় বেঁচে থাকুন। আপনি না বাঁচলে তার যে কোনও প্রোটেকশন থাকবে না।

না থাকুক। তখন তো আমিও থাকব না, টেনশনও থাকবে না।

তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা জানেন?

কী?

তার মানে আপনি একজন সেলফিস ম্যান। ছেলেকে নয়, আপনি ভালবাসেন নিজেকে। নিজের টেনশন, নিজের উদ্বেগ, নিজের দুর্বলতা থেকে মুক্তি চান বলেই আপনি এসব করছেন। নইলে মাত্র আট বছরের একটা ছেলেকে পিতৃহীন করে রেখে যেতে আপনার মনুষ্যত্বে বাধত।

প্লিজ, মিস্টার দাশগুপ্ত। এসব কথা আমি এখন সহ্য করতে পারছি না।

ও কে। আমি আপনাকে আর ডিস্টার্ব করব না। শুধু জানিয়ে যাই, ওই কেসটা কর্তৃপক্ষ সুধাংশু দাসকে দিয়েছে। সুধাংশুরও একটি আট বছরের ছেলে আর দু'বছরের মেয়ে আছে।

ও!

আরও একটা কথা। আপনার রেজিগনেশন লেটারটা আমি সরিয়ে নিয়েছি। আপনি আপাতত অফিসে পেপারওয়ার্ক করবেন, ফিল্ডে যেতে হবে না। বলে-কয়ে এটুকু আমি করতে পারব। ঠিক আছে?

ঘোষাল কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না। ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল, একটা গীতা দেবেন?

সঙ্গে তো নেই। বিকেলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

ঘোষাল গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

ভয়! ভয় নিয়েই ভাবছে শবর ক'দিন ধরে। এখানকার মানুষ কেন এত ভয়-ভীতির শিকার? পৃথিবীতে এখন সুস্পষ্ট দুটো দল, ভীত আর ভীতিপ্রদ।

গোপালকে তার দ্বিতীয় দলের বলেই মনে হল, যখন তাকে বেলা এগারোটায় তার ঢাকুরিয়ার বাড়িতে মুখোমুখি পেল শবর। আজ রবিবার। গোপাল তাই বাড়িতেই ছিল।

আপনি কী করেন?

আমার ফ্রিজ আর এয়ার কন্ডিশনার সারাইয়ের একটা ব্যাবসা আছে ল্যান্সডাউনে।

এ বাড়ি কি আপনার নিজের?

না মশাই, ভাড়া বাড়ি।

নিজস্ব কিছু নেই?

নেই বলি কী করে? হালতুর দিকে ইন্টিরিয়রে দু'কাঠা জমি কিনেছি। কাকা তো আমাদের পথে বসিয়েই গেছে, জানেন তো!

খানিকটা জানি।

আমাদের এজমালি বাড়ি, কাকা নিজের নামে করেছিল। কথা ছিল পরে সকলের নামেই দলিল হবে। টালবাহানা করছিলেনই, শেষে আড়াই লাখ টাকার ফ্যাকড়া তুলে আমাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করলেন। কী ফল হল বলুন। নিজেই তো টেসে গেলেন।

মামলা করেছিলেন আপনারা?

করে কী লাভ? ওঁর নামে দলিল। মামলা করলে উকিলের পকেট ভরত, আর কিছু হত না।

ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

হবে না? একটা জোচ্চোর লোক সব গাপ করে নেবে, আমরা চুপ করে থাকব?

আপনি কি কখনও ওঁকে খুনের হুমকি দিয়েছিলেন?

দেখুন মশাই, ওরকম পরিস্থিতি হলে হুমকি আপনিও দিতেন, প্রমোটারকে যখন কাকা বাড়িটা দিয়ে দিলেন তখন আমরা গিয়ে বললাম, কাকা, আমাদের তো পথেই বসালেন, এবার প্রমোটারকে অন্তত বলুন যাতে আমাদের দুটো ফ্ল্যাট দেয়। উনি তাতে এমন চেঁচামেচি করতে লাগলেন যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। কার রক্ত ঠান্ডা থাকে বলুন! আমরা আবার বরিশালের বাঙাল, রক্ত একটু গরম। আমি তখন বলেছিলাম, আপনার লাশ নামানোর ব্যবস্থা করছি, দাঁড়ান।

উনি তখন কী করলেন?

উনি একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন। সঙ্গে অকথ্য গালাগাল। হুমকিতে টলার পাত্র তো ছিলেন না।

উনি যেদিন মারা যান সেদিন আপনি ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন।

যাব না কেন? শত হলেও কাকা তো। বাবাকেও বঞ্চিত করেছিলেন, তবু বাবা কেঁদেকেটে একশা।

আপনারা কি পুরনো দাবি আবার তুলবেন?

তুলে খুব একটা লাভ হবে না। তবে কাকিমা লোক ভাল। উনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। হয়তো কিছু কমপেনসেট করতে চান।

তেরো তারিখে–অর্থাৎ বাসুদেববাবু যেদিন মারা যান সেদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?

গোপাল একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, কেন বলুন তো।

আপনি কি মনে করতে পারবেন?

সন্ধেবেলা আমি তো দোকানেই থাকি। কাজকর্ম থাকে। অনেক রাত অবধি দোকানেই থাকতে হয়।

সেদিনও ছিলেন?

হ্যাঁ।

ঠিক মনে আছে?

আছে।

আপনার দোকানে কতজন কর্মচারী?

তিনজন।

তারাও সেদিন সন্ধেবেলা ছিল?

ওরা ছ'টার মধ্যে চলে যায়। বেশি রাত পর্যন্ত আমি একাই থাকি।

আপনি কি ড্রিঙ্ক করেন? গোপাল হাসল, আমরা মিস্ত্রি মানুষ, খাটতে-পিটতে হয়।

একটু-আধটু খাই।

সেদিন ক'টা অবধি দোকানে ছিলেন?

এগারোটা হবে।

আপনার গাড়ি আছে?

স্কুটার আছে।

আপনি কি জানেন যে, আপনার কাকার মৃত্যুটা একটু অস্বাভাবিক?

জানি। লিফট খারাপ ছিল বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়।

ঠিক কথা। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেদিন লিফট খারাপ ছিল না।

তা হলে?

কেউ ওটা সাজিয়েছিল যাতে বাসুদেববাবুকে বাধ্য হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

গোপাল স্পষ্টতই অস্বস্তিতে পড়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তার মানে কি কাকাকে খুন করা হয়েছে?

সেরকমই সন্দেহ।

সর্বনাশ। আপনি কি সেজন্যই জেরা করছেন?

হ্যাঁ। তবে ঘাবড়াবেন না। এটা রুটিন প্রসিডিওর।

গোপাল ভয় পেল কিনা বোঝা গেল না। তবু বলল, লাশ নামানোর হুমকিটার কথা ভেবেই কি সন্দেহ করছেন আমাকে? ওরকম হুমকি তো লোকে রেগে গেলে কতই দেয়।

সেটা আমরা জানি। আর একটা প্রশ্ন।

বলুন।

আপনার কাকার একটি অবৈধ ছেলে আছে, জানেন?

জানি। আরও থাকতে পারে।

তার মানে?

কাকা উওম্যানাইজার ছিলেন। বহু মহিলার সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল। সুতরাং আরও দু-একটা থাকা বিচিত্র নয়।

আপনি কি এরকম আর কোনও ছেলেমেয়ের কথা জানেন?

না, আন্দাজে বলছি।

আন্দাজটা উহ্য রাখবেন। একজনের কথা তো জানেন।

হ্যাঁ। অজাতশত্রু বসু। কাকা ঢাকুরিয়ার বাড়িতে তার নামে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছেন। শুনছি একটা মোটা টাকার পলিসির নমিনি করে গেছেন।

ছেলেটিকে আপনি চেনেন?

না মশাই। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কাকার অবৈধ ছেলের খোঁজ করব।

আপনি কি শুনেছেন যে, আপনার কাকার শ্রাদ্ধ তার ছেলেরা করতে রাজি হচ্ছে না?

তাও জানি। আমি পরশুদিনই তো কাকিমার কাছে গিয়েছিলাম। উনি খুব কান্নাকাটি করলেন। আমরা ভাবছি, অর্ক আর বুদ্ধ যদি না করে তা হলে আমি কালীঘাটে গিয়ে করে আসব। আমার বাবা আমাকে বলেছেন, শ্রাদ্ধ না করাটা ঠিক হচ্ছে না।

বাসুদেববাবুর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

মাস তিন-চার আগে বোধহয়।

তখন কী কথাবার্তা হয়েছিল?

গোপাল হাসল, কী আর হবে! কাকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো মধুর ছিল না।

আপনার দোকানের কর্মচারীরা কতদিনের পুরনো?

কেন বলুন তো!

বলুন না!

বেশ পুরনো। বছর দশেক তো হবেই।

তারা বিশ্বাসী?

হ্যাঁ।

আপনার আর্থিক অবস্থা কীরকম?

মোটামুটি। চলে যায় আর কী।

কাকার মৃত্যুতে আপনি কোনওভাবেই লাভবান হয়েছেন কি?

না মশাই, আর কোনও আশা নেই।

এই যে বললেন, কাকিমা কমপেনসেট করতে চান। কাকার মৃত্যুতে তো সেটাই আপনার লাভ।

গোপাল উদাস গলায় বলল, কাকিমা আর কতই বা দেবে? হয়তো বিবেকের দংশন এড়াতে পাঁচ-দশ হাজার অফার করবে। তাও যদি অর্ক আর বুদ্ধ দিতে দেয়। আমি অবশ্য ঠিক করেছি, পাঁচ-দশ হাজার দিতে চাইলে নেব না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব কেন মশাই? ঢাকুরিয়ার বাড়ির ভ্যালুয়েশন জানেন? অন্তত ত্রিশ লাখ টাকা। বাবারা তিন ভাই। ভাগ করলে পারহেড দশ লাখ করে পড়ে।

বুঝেছি।

আমাদের জ্বালাটাও বুঝবার চেষ্টা করুন।

শবর একটু হেসে উঠে পড়ল। বলল, আবার হয়তো দেখা হবে।

অজাতশত্রুকে পাওয়া গেল তার জিম-এ হাজরা রোডে তাদের ফ্ল্যাটের কাছাকাছিই বেশ ঝা চকচকে আধুনিক মাল্টিপল জিম। কালো শর্টস পরা গায়ে সাদা তোয়ালে জড়ানো অজাতশত্রু একটি ফুটফুটে কিশোরীর পাশে বসে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিল। মুখে ঘাম।

কিশোরীটিকেও লক্ষ করল শবর। তারও পরনে শর্টস, গায়ে একটা ঢিলা কামিজ। মাথায় থোপা থোপা কোকড়া চুল বয়কাট করা। ছিপছিপে, নাতিদীর্ঘ, তেজি চেহারা।

শবর বিনা ভূমিকায় অজাতশত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ছেলেটা অবাক হয়ে চাইল। বলল, আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। এখানে নয়, বাইরে যেতে হবে।

কেন? কী দরকার?

শবর পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে তার চোখের সামনে মেলে ধরে চাপা স্বরে বলল, লালবাজার।

অজাতশত্রুর মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবে সে উঠে পড়ল। মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, ও কে, বাই…

বাই।

শবর বলল, পোশাকটা পালটে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অজাতশত্রু বেরিয়ে এল। গায়ে টি-শার্ট পরনে ট্রাউজার্স, কাঁধে ব্যাগ।

চলুন।

জিপে ড্রাইভারের সিটে বসে শবর অজাতশত্রুকে পাশে বসাল। বলল, কথা বলার পক্ষে এটাই বোধহয় ভাল জায়গা। নাকি আপনাদের ফ্ল্যাটেই যেতে চান?

অজাতশত্রু গম্ভীর মুখে বলল, এটাই ভাল।

ভণিতা না করেই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি আপনার পিতৃপরিচয় জানেন?

অজাতশত্রু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, এখন জানি।

কতদিন আগে জানতে পারেন?

গতকাল। মা আমাকে বলেছে।

জেনে আপনার রি-অ্যাকশন কী?

খারাপ লেগেছে।

আপনি আপনার মায়ের ওপর রেগে যাননি?

না, তবে দুঃখ পেয়েছি। লজ্জা হয়েছে।

শঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

ভালই।

ভাল বলতে?

সো সো। এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন কেন করছেন?

ব্যক্তিগত প্রশ্নও মাঝে মাঝে করতে হয়। আপনি বাসুদেব সেনগুপ্তকে চিনতেন?

হ্যাঁ। আমি ছেলেবেলায় ওঁকে দেখেছি।

উনি আপনাদের বাড়িতে আসতেন?

হ্যাঁ।

তখন আপনার কিছু মনে হত না?

দশ বারো বছর আগেকার কথা, ভাল মনে নেই।

দশ-বারো বছর উনি কি আর আসেননি?

না!

এই দশ বারো বছরের মধ্যে বাসুদেবের সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়নি?

কী করে হবে? বললাম তো, উনি আসতেন না।

গতকাল যখন শুনলেন যে, উনিই আপনার বাবা তখন কি ওঁর ওপর আপনার রাগ বা ঘেন্না হল?

অজু কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে বলল, একটা মিক্সড ফিলিং। ঠিক বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল যেন আমার আইডেন্টিটিটাই হারিয়ে যাচ্ছে। না রাগ নয়, হেপলেসনেস।

আপনি কি জানেন যে, বাসুদেব সেনগুপ্ত আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাট এবং পাঁচ লাখ টাকার একটা পলিসি রেখে গেছেন!

কাল মায়ের কাছে শুনলাম।

শুনে কীরকম রি-অ্যাকশন হল?

অজু একটা করুণ হাসি হেসে বলল, এসব তো কমপেনসেশন। কিন্তু আমার হেপলেসনেসটা তাতে কমছে না।

যদিও আপনি তখন ছোট ছিলেন, তবু বলুন বাসুদেব সেনগুপ্তকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হত?

একটু ডিস্টার্কিং লাগত। উনি প্রায়ই এসে বিকেলের দিকে বসে থাকতেন। বাইরের কোনও লোক রোজ এলে কি ভাল লাগে?

ওঁর সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হত?

না। উনি ’র সঙ্গে কথা বলতেন।

আপনার সঙ্গে কখনও বলতেন না?

হয়তো কখনও এক-আধটা বলেছেন, কিন্তু এটা মনে আছে যে, আমি ওঁদের কাছে বড় একটা যেতাম না।

লোকটা সম্পর্কে আপনার কখনও কোনও সন্দেহ হয়নি?

সন্দেহ নয়, একটু বিরক্ত বোধ করতাম হয়তো।

আপনি যখন কাল শুনলেন যে বাসুদেব সেনগুপ্তই আপনার বাবা তখন কি মায়ের ওপর আপনার কোনও রিপালশন হল?

কেন হবে! আজকাল একস্ট্রা ম্যারিটাল রিলেশন তো কোনও ব্যাপার নয়।

নয়?

অজু একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ব্যাপার ঠিকই, তবে এরকম তো হতেই পারে। হি ওয়াজ এ স্পোটসম্যান অ্যান্ড পারসোনেবল অলসো।

আপনি আপনার মাকে তা হলে ক্ষমা করেছেন?

মাকে আমি খুব ভালবাসি।

আর শঙ্করবাবুকে?

উনি একজন চমৎকার ভদ্রলোক।

বাবা হিসেবে?

বাবা হিসেবেও খারাপ নন।

তেরো তারিখে সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা আপনি কোথায় ছিলেন?

প্রশ্নটা ভাল করে শেষ হওয়ার আগেই চটজলদি জবাব দিয়ে ফেলল অজু, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটা স্পোর্টস প্রোগ্রাম দেখছিলাম ভিডিয়ো-তে।

এত দ্রুত জবাবে একটু অবাক শবর বলল, বন্ধুটি কে?

মাওবী ঘোষ। উডবার্ন পার্কে থাকে। ওই যে মেয়েটির সঙ্গে আমি একটু আগে কথা বলছিলাম।

ওদের বাড়িতে আর কে কে থাকে?

মা-বাবা।

আর কেউ নয়?

না।

ওইদিন ওর মা-বাবা বাড়িতে ছিলেন?

না। ওঁরা বেরিয়েছিলেন।

তা হলে বাড়িতে ছিলেন শুধু আপনি আর মাণ্ডবী?

হ্যাঁ। উই আর চামস।

বাড়িতে কোথাও কাজের লোকটোক নেই?

আছে। তবে তারা সব ঠিকে। সন্ধের আগেই চলে যায়।

কখন গিয়েছিলেন?

ছ'টা নাগাদ।

ক'টা অবধি ছিলেন?

আটটা।

আপনাকে কেউ ও-বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে?

তা কী করে বলব?

বাড়ি না ফ্ল্যাট?

বাড়িই বলতে পারেন। দোতলা একটা বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরটা নিয়ে ওরা থাকে।

দোতলায় কারা আছে?

সাম সিন্ধি পিপল।

বাড়িটা কি মাণ্ডবীদের?

না। ওরা ভাড়া থাকে। অনেকদিনের পুরনো ভাড়াটে।

মাণ্ডবীর ভাইবোন নেই?

না। শি ইজ অ্যান ওনলি চাইল্ড।

শবর একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি কি জানেন বাসুদেববাবু কীভাবে মারা গেছেন?

শুনেছি।

কী শুনেছেন?

মৃত্যুটা স্বাভাবিকভাবে হয়নি।

হ্যাঁ। ওঁর হার্ট খারাপ ছিল। লিফট খারাপ বলে উনি সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলেন।

মা সব বলেছে। ইউ আর আফটার দি ম্যান।

ম্যান। উওম্যান নয়?

ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মেয়েরা কি ওসব করে?

কে জানে! আমার পুলিশি অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে।

হতে পারে। মে বি এ উওম্যান।

আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্ট শিখছেন?

হ্যাঁ।

প্রসপেক্ট কীরকম?

বুঝতে পারছি না। সব লাইনেই তো ভিড়।

তা হলে পড়ছেন কেন?

কী করব? একটা কিছু করার চেষ্টা তো করতে হবে।

আপনার কি অন্য কিছু করার ইচ্ছে?

ইচ্ছে থাকলেই বা লাভ কী?

কেন, আপনি তো একটা বেশ বড় ফ্ল্যাট আর পাঁচ লাখ টাকার মালিক।

সেটা তো আগে জানতাম না।

জানতেন না?

না। কী করে জানব? ইটস অ্যান আউটরেজিয়াস কোশ্চেন।

ফরগেট ইট। আপনি তো খেলাধুলো করেন বলে শুনেছি।

করি।

কোন ক্লাব?

স্পোর্টিং ইউনাইটেড।

অজিত ঘোষ বলে কাউকে চেনেন?

না। সে কে?

ঢাকুরিয়ার যে বাড়িতে আপনার নামে বাসুদেব সেনগুপ্ত একটা ফ্ল্যাট রেখে গেছেন সেই বাড়ির প্রমোটার।

না, চিনি না। ফ্ল্যাটের কথা তো কালই জানলাম।

অজিতবাবু কিন্তু অন্য কথা বলেন।

তার মানে?

অজিতবাবু বলেছেন আপনি সেই ফ্ল্যাটের কনস্ট্রাকশন দেখতে গত এক বছরে বেশ কয়েকবার সেখানে গেছেন। ইন ফ্যাক্ট, আপনার ডিরেকশন অনুযায়ী ফ্ল্যাটের ভিতরকার কিছু অল্টারেশনও হয়েছে।

অজু বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ বসে রইল। জবাব দিতে পারল না।

অজিতবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আপনার বায়োলজিক্যাল বাবা বাসুদেব সেনগুপ্ত।

অজু এবারও চুপ। মুখটা নোয়ানো।

শবর একটা শ্বাস ফেলে বলল, এসব লুকিয়ে কোনও লাভ আছে কি অজাতশত্রুবাবু?

অজু ধীরে মুখটা তুলে শবরের দিকে ফিরে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন। লজ্জা আর সংকোচের বশে আমি কথাটা গোপন করছিলাম।

নাউ, আউট উইথ দি ফ্যাক্টস, প্লিজ।

আমি যখন স্কুলে এইট-নাইনে পড়ি তখনই একদিন উনি আমার সঙ্গে স্কুলের বাইরে দেখা করেন। আমি ওঁকে চিনতাম, কিন্তু বাবা বলে জানতাম না। উনি সেদিন আমাকে একটা ভাল রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। তারপর আমাকে একটু রেখে ঢেকে ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানালেন। উনি বলেছিলেন, আমি ওঁরই ছেলে, তবে আমাকে উনি অনেকটা দত্তক হিসেবে শঙ্কর বসু ও রীণা বসুর কাছে দিয়েছেন।

কথাটা আপনি বিশ্বাস করেছিলেন?

না। কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, উনি আমার মায়ের সঙ্গে ইনভলভড্‌। আরও আশ্চর্যের কথা, উনি বলার আগে থেকেই কিন্তু আমার প্রায়ই এ সন্দেহও হয়েছে। যে, আমি ওঁরই সন্তান।

কীভাবে সন্দেহটা হল?

আমার বাবা অর্থাৎ শঙ্কর বসুর আমার প্রতি আচরণ থেকে। তা ছাড়া আমি ওঁদের কথাবার্তা কিছু কিছু ওভারহিয়ারও করতাম। সোজা কথা ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন ছিল না। তাই উনি যখন কথাটা বললেন তখন আমি একটুও অবাক হইনি।

তারপর কী হল?

উনি মাঝেমধ্যেই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমি খেলাধুলোয় ভাল বলে উনি নানাভাবে আমাকে ইন্সপায়ার করেছেন। ক্লাবে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করেছেন।

যতদূর শুনেছি উনি ঠিক এরকম স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। নিজের পুত্র-কন্যাদের প্রতি ওঁর আচরণ ছিল জঘন্য। কাজেই আপনার প্রতি উনি এত নরম হলেন কেন?

তা ঠিক বলতে পারব না। উনি যে রাগী আর মেজাজি মানুষ ছিলেন তা আমি খানিকটা জানি। মনে হয় আমার পরিবারে আমি খানিকটা আনওয়ান্টেড বলেই উনি একটু সিমপ্যাথেটিক হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে আমার বাবা শঙ্কর বসু আমাকে একদমই পছন্দ করেন না। তাই আমি ছেলেবেলা থেকেই পারতপক্ষে ওঁর মুখোমুখি হই না। এটা উনি জানতেন।

শবর চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, হতেও পারে।

উনিই আমাকে বলেছিলেন, ওঁর একটা পাঁচ লাখ টাকার পলিসি আছে যার নমিনি আমি।

কিন্তু উনি পলিসিটা আপনার বা আপনার মা'র হাতে না দিয়ে সেটা নিজের স্ত্রীর কাছে জমা রাখলেন কেন?

মাথা নেড়ে অজু বলল, তা জানি না। তবে আরও দু'বছর পর পলিসিটা ম্যাচিওর করত। উনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন বলে হয়তো ভাবেননি।

এই পলিসিটা উদ্ধার করার জন্য আপনি কিছু করেননি?

না। তবে আমার মা হয়তো শিখাদেবীর কাছে যাবে।

আপনার কথা কি শিখাদেবী জানতেন?

হ্যাঁ।

কী করে বুঝলেন?

বাবা–অর্থাৎ বাসুদেব সেনগুপ্তই আমাকে সেকথা বলেছিলেন।

আপনি কি বাসুদেববাবুকে বাবা বলেই ডাকতেন?

অজু হাসল, ডাকে কী আসে যায়?

জাস্ট কৌতূহল।

না। উনিও চাননি সেটা।

তবে কী বলে ডাকতেন?

ডাকার দরকার হত না। মুখোমুখি কথা হত আমাদের। তাও মাঝে মাঝে। না, ওঁকে বাবা বলে ডাকার কোনও প্রয়োজন হয়নি।

বাবা বলে ভাবতেন কি?

তা ভাবতাম। যা সত্য তাকে অস্বীকার করে লাভ কী? তা ছাড়া উনি তো আমার বেনিফ্যাক্টর ছিলেন।

শবর অন্যমনস্কভাবে বলল, ওঁর মৃত্যুতে আপনি প্রচুর লাভবান হয়েছেন।

৭. আমি রীণা

আমি রীণা।

শিখা বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, বাঃ, তুমি দেখতে বেশ সুন্দর তো! এখনও আর একবার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।

আপনি কি কিছু কম সুন্দর! লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মুখ। আমি কি আপনাকে একটা প্রণাম করতে পারি?

তুমি কেন এসেছ তা জানি। প্রণাম করতে হবে না।

বোসো। রীণা বসল। মাথাটা উদ্ভ্রান্ত। বুকের ভিতরে একটু গুড়গুড়। হয়তো অপমানিত হতে হবে। হয়তো উনি বের করে দেবেন।

শিখা প্রায় নিষ্পলক চোখে তাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, লজ্জা পাচ্ছ?

রীণা মুখ নত করে বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল, উনি আপনার খুব প্রশংসা করতেন।

শিখা মৃদু একটু হেসে বললেন, তাই নাকি? আমার আবার কীসের প্রশংসা? লেখাপড়া তেমন শিখিনি, গুণও বিশেষ কিছু নেই। সেইজন্যই তো–

বলে কথাটা আর শেষ করলেন না শিখা।

গরিব-দুঃখী-পঙ্গু-আতুরদের ওপর আপনার খুব মায়া, শুনেছি।

ও কিছু নয়। যখন ঢাকুরিয়ার বাড়িতে ছিলাম তখন অনেক গরিব-দুঃখী আসত বটে। তেমন কিছুই করে উঠতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কাউকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েও দিতাম না। এলে দু'দণ্ড জিরোতে দিতাম, সুখ-দুঃখের কথাও বলতাম। জানো তো, অনেক দুঃখী আছে যারা ঠিক টাকাপয়সা বা ভিক্ষের জন্য আসে না, দুটো মনের কথা বলে জুড়োতে আসে।

রীণা শিখার দিকে একটু অবাক চোখে চেয়ে থাকে। ইনি কি একজন সত্যিকারের মহীয়সী মহিলা?

শিখা একটা সুস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আটতলার ফ্ল্যাটে এসে দেখো কেমন বাক্সবন্দি হয়ে গেছি। কোনও দুঃখী আতুর কি এখানে আসতে পারে? আমার একদম ইচ্ছে ছিল না, উনি জোর করে এলেন। সারাদিন আমার যে কী একা লাগে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। সারাদিন লোকজন না দেখে হাঁফিয়ে পড়ি।

রীণার বিস্ময় বাড়ছে। সে এঁরই স্বামীকে একদা কেড়ে নিয়েছিল প্রায়। গর্ভে ধারণ করেছিল তার সন্তান। সে এসেছে পাঁচ লাখ টাকার দাবি নিয়ে। তবু এই মহিলা তার সঙ্গে এমন বন্ধুর মতো কথা বলছেন কী করে?

শিখা বললেন, আমি তো নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। এবার তোমার কথা বলো।

রীণা মাথা নিচু করে বলল, আমার তো বলার কিছু নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।

আমাকে দেখতে এসেছ! আমাকে দেখার কিছু নেই। তোমার কথা বলো।

আমার তো আপনার মতো কোনও গুণ নেই। বরং আমার অনেক দোষ অনেক পাপ। শিখা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে চাপা গলায় বললেন, তুমি আমার সতিন হলে এক কথা ছিল। কিন্তু এ তো তা নয় ভাই। জানি এ যুগে মেয়েরা কিছু মানতে চায় না। কিন্তু সেটা কি ভাল?

এখন মনে হয়, ভাল নয়।

এখন মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছ তুমি। তোমার জন্য আমার মায়া হচ্ছে। মনের কষ্টের মতো কষ্ট নেই।

এইসব মায়াভরা কথায় রীণার চোখে জল আসছিল। সে মুখ তুলে শিখার দিকে চাইতে পারছিল না।

শিখা খুব নরম গলায় বলল, উনি মারা যাওয়ার পর তুমি কি তোমার ছেলেটাকে অশৌচ পালন করিয়েছ?

রীণা মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল, না। ও তো সম্পর্কটা জানত না তাই সাহস পাইনি। তবে কয়েকদিন নিরামিষ খেয়েছিল।

আমি কিন্তু ওসব খুব মানি। আমার বয়স উনষাট। তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তা ছাড়া শুনেছি তুমি বড়লোকের বউ। তুমি কি আর অত আচার বিচার মানতে পারো? তবু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। বলব?

বলুন।

উনি তোমার ছেলের নামে যে লাইফ ইনশিয়োরেন্স পলিসিটা রেখে গেছেন সেটার কথা জেনে আমার দুই ছেলে খেপে গেছে। এতটাই খেপেছে যে তারা ঠিক করেছে বাপের শ্রাদ্ধ করবে না। অনেক বুঝিয়েছি, চোখের জল ফেলেছি, কাজ হয়নি। ওদের ধনুক ভাঙা পণ। একেই তো বাপকে বিশেষ পছন্দ করত না, তার ওপর আবার এই ব্যাপার। ওরা না করলেও শ্রাদ্ধটা হয়তো আমিই করব। কিন্তু কী মনে হয় জানো, শ্রাদ্ধাধিকারী তো বড় ছেলে। নিদেন ছোট ছেলেও করতে পারে। তোমার ছেলেকে দিয়ে ওঁর শ্রাদ্ধটা করাবে?

আপনি যদি বলেন, করাব।

বেশি আয়োজন করতে হবে না। লোকজন নেমন্তন্ন করার তো কথাই ওঠে না। যদি কালীঘাটে নিয়ে করাও তা হলেও হবে। একটা ছেলের হাতের জলটুকু যদি পান তা হলেই অনেক।

ঠিক আছে। করাব।

পলিসিটা তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু টাকা আদায় করা খুব সহজ হবে না। ডেথ সার্টিফিকেটের কপি আর আরও কীসব লাগবে যেন। সেসব ওই অফিস থেকেই বলে দেবে। শুনেছি অনেক ঝামেলা।

আমিও শুনেছি।

শিখা উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন। একটু বাদেই পলিসিটা এনে রীণার হাতে দিয়ে বললেন, উনি এটা আমাকে কেন দিয়েছিলেন জানো? যাতে তুমি একদিন আমার কাছে আসতে বাধ্য হও। উনি একটু অদ্ভুত মানুষ ছিলেন, তা তো জানোই!

জানি।

টাকাটা আদায় করো, তারপর ছেলেটাকে ভালভাবে মানুষ করো। কেমন হয়েছে তোমার ছেলেটা?

চুপচাপ থাকে। খেলাধুলো নিয়েই থাকে বেশি।

বাপের মতোই।

আমি কিন্তু এবার আপনাকে একটা প্রণাম করব।

কেন, এখনই চলে যাবে? কিছু মুখে দেবে না? অন্তত একটু চা বা শরবত?

না থাক। আপনাকে আর উঠতে হবে না।

আমার কাজের লোক আছে, ভয় নেই।

শিখা একজন মাঝবয়সি কাজের মেয়েকে ডাকলেন। সে এসে দাঁড়ালে বললেন, রোদে তেতেপুড়ে এসেছে ওকে একটু ঘোলের শরবত দে। রীণা, তুমি ঠান্ডা খাও তো!

খাই।

তা হলে বরফ দিস বাতাসী। একটুকরো।

রীণা পলিসির সার্টিফিকেটটা তার ব্যাগে পুরল। কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে যাচ্ছিল।

শিখা নরম গলায় বললেন, সম্পর্কটা শেষ করে দিয়ো না। মাঝে মাঝে এসো। আমি তো একা থাকি।

আসব দিদি।

ঘোলের শরবত এল ঝকঝকে কাঁচের গেলাসে। ঘোলের ওপর সবুজ লেবুপাতার টুকরো ভেসে আছে, আর বরফের কুচি। চমৎকার স্বাদ।

শিখা হঠাৎ বললেন, আমি শুনেছি তোমার বর তোমাকে খুব ভালবাসেন!

রীণা মাথাটা নোয়াল।

লজ্জা কীসের? স্বামীর ভালবাসা যে পাচ্ছ সেটা ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো। তোমার বর খুবই ভাল লোক বলতে হবে।

হ্যাঁ, উনি ভীষণ ভাল।

আমার স্বামী ভালবাসতে জানতেন না। বরং অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতেন। এ ধরনের লোককে বোধহয় স্যাডিস্ট বলে, না?

তাই হয়তো হবে।

সেজন্যই ওঁর সত্যিকারের নিজের লোক কেউ হল না। ছেলেরা নয়, মেয়ে নয়, কেউ নয়। শুধু আমি ছিলাম। কষ্ট আমাকেও কিছু কম দেননি। কিন্তু আমার তো উপায় ছিল না।

রীণা মুখ তুলতে পারছে না। ভয় হচ্ছিল, পুরনো কথা যদি উঠে পড়ে।

শিখা উদাস গলায় বললেন, এখন তো শুনছি ওঁর মৃত্যুটাও এমনি হয়নি। পুলিশ নানারকম সন্দেহ করছে। কী জানি বাপু, সত্যিকারের কী হয়েছিল।

ঘরের আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে যাচ্ছিল। রীণা আর বসে থাকতে পারছে না। সে উসখুস করছিল।

শিখা বললেন, উঠবে? এসো তা হলে। ওঁর ডেথ সার্টিফিকেটটার কপি দরকার হলে আমাকে জানিয়ো। জেরক্স করিয়ে রাখব।

রীণা ঘাড় হেলিয়ে উঠে পড়ল। এত সহজে এবং অল্প আয়াসে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে বলে সে ভাবেনি। সে সত্যিকারের শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখাকে একটা প্রণাম করে

বেরিয়ে এল। বাসুদেব ভুল বলেনি। শিখা সত্যিই খুব ভাল মহিলা।

বাড়ি ফিরতে বেলা একটা হয়ে গেল। রীণা এসি চালিয়ে বাইরের ঘরে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

পরমা এসে বলল, কোথায় গিয়েছিলে মা? তোমার একটা ফোন এসেছিল।

কার ফোন?

চিনি না। মোটা গলা। আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল।

কী কথা?

তোমার কথা।

কী কথা?

প্রথমে জিজ্ঞেস করল তুমি কোথায় গেছ। তারপর জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা, বাপির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হচ্ছে কিনা, তুমি কেমন মানুষ।

ও মা! এসব আবার কী কথা! কে লোকটা?

নাম বলেনি। তবে দেড়টার সময়ে আবার ফোন করবে।

ঠিক আছে। তুমি স্নান করতে যাও।

সামান্য নার্ভাস লাগছিল রীণার। এ হয়তো সেই লোকটাই যে আরও একদিন ফোন করেছিল। যে-ই হোক, লোকটা অনেক খবর রাখে।

দেড়টা নয়, লোকটা ফোন করল দুটোর পর। সেই ভারী, মোটা গলা।

মিসেস বোস?

হ্যাঁ।

আপনার মতো লাকি উওম্যান আমি আর দেখিনি। কংগ্রাচুলেশনস।

তার মানে?

এটা যে কলিযুগ তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। কলিযুগে যারা পাপটাপ করে তাদেরই রবরবা। আপনি এত কিছু করেও দিব্যি সুখে আছেন। শুনছি আপনার ছেলেটির জন্য নাকি বাসুদেব সেনগুপ্ত পাঁচ লাখ টাকা আর একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থাও করে গেছে। মিসেস বোস, একেই বলে গাছের খাওয়া আর তলার কুড়োনো।

আপনি ভদ্রলোক নন?

আজ্ঞে না। ভদ্রলোক হলে আপনার সঙ্গে এসব রসালাপ করতে পারতাম কি?

আমি ফোন ছাড়ছি।

সেটা আপনার ইচ্ছে। তবে কথা বললে আলটিমেটলি আপনার হয়তো লাভই হবে।

দেখুন, আমার জীবনটা আমার একারই। আপনি হয়তো জানেন না, আমি আমার স্বামীর কাছে ডিভোর্সও চেয়েছিলাম। উনি দেননি। সুতরাং আমার খুব একটা দোষ নেই। আপনি অকারণ বিবেকের ভূমিকা নিচ্ছেন কেন? আপনি কে?

বাঃ, এই তো দেখছি, মানসিকভাবে অনেকটা সামলে উঠেছেন। নিজের ফেবারে সাজিয়ে গুছিয়ে যুক্তিও খাড়া করছেন। তবে সেদিন ওরকম মিউ মিউ করছিলেন কেন?

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

কথার কি শেষ আছে ম্যাডাম? শুধু বলি, আপনি ভাগ্যবতী মহিলা বটে, কিন্তু আপনার স্বামী শঙ্কর বসু একটি আস্ত পাঁঠা। অ্যাডাল্টারাস উওম্যান জেনেও আপনাকে মহারানির মতো লোকটা পালপোষ করছে কীভাবে? ওর গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই?

প্লিজ! আপনি এসব বন্ধ করুন।

লোকটা একটা ঘিনঘিনে হাসি হেসে বলল, বিবেকের দংশন হচ্ছে নাকি?

প্লিজ!

আপনি আগের দিন আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে বিবেক বলেই জানবেন।

আপনি আর দয়া করে ফোন করবেন না। বিশেষ করে আমার দুধের বাচ্চা মেয়েটার কাছে আপনি যেসব কথা জানতে চেয়েছেন তা অন্যায়।

আপনার মেয়ে কি একদিন তার মায়ের কথা জানতে পারবে না?

হয়তো জানবে। বড় হোক, আমিই জানাব।

আপনার মতো মহিলা আমি সত্যিই দেখিনি মিসেস বোস। আপনার ভাগ্য অন্য মেয়েদের কাছে ঈর্ষণীয়।

৮. শঙ্করবাবু, তেরো তারিখে

শঙ্করবাবু, তেরো তারিখে বিকেলবেলা ছ’টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আপনার হোয়ার অ্যাবাউটস কী ছিল?

অ্যাম আই এ সাসপেক্ট?

এভরিওয়ান ইজ এ সাসপেক্ট। বলুন।

ইউজুয়ালি ছ’টার পর আমার মিটিং থাকে।

সেদিনও ছিল?

ছিল।

কার সঙ্গে এবং ক’টা থেকে ক’টা পর্যন্ত?

শব্দহীন নিজস্ব মস্ত চেম্বারে আরামদায়ক একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে শঙ্কর একটু ভাবল। উলটোদিকে বসা মাঝারি চেহারার শবর দাশগুপ্ত লোকটিকে তার ভাল লাগছে না। এ একজন অল্প বেতনের গোয়েন্দা। এর কি তার সঙ্গে ওপরওয়ালার মতো কথা বলার স্পর্ধা থাকা উচিত?

শঙ্কর বলল, মনে নেই। আমার সেক্রেটারি হয়তো জানে।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। দরকার হলে সেক্রেটারির সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে।

সরকার যে কেন এইসব পাতি গোয়েন্দাদের হাতে এত ক্ষমতা দেয় তা বোঝে না শঙ্কর। সে অত্যন্ত তেতো গলায় বলল, মনে না থাকলে কী করা যাবে? আমি ব্যস্ত

মানুষ, রোজই মিটিং টিটিং করতে হয়–

আপনি কতটা ব্যস্ত সে খবর আমার জানা আছে। এত বড় একটা কোম্পানির আপনি রিজিওন্যাল ম্যানেজার, ব্যস্ত তো থাকারই কথা। তবু তেরো তারিখটা একটু মনে করার চেষ্টা করুন। সেদিন সল্টলেকে আপনাদের একটা নেমন্তন্ন ছিল।

হ্যাঁ।

ওই অকেশনটা থেকে চিন্তাকে একটু পিছিয়ে নিতে থাকুন, মনে পড়বে।

শঙ্কর একটু ভাবল। তারপর বলল, সেদিন আমার ড্রাইভার ছিল না। তাই আমি বোধহয় একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে যাই।

ড্রাইভারের কী হয়েছিল?

কী একটা দরকারে ছুটি নিয়েছিল।

ইট ক্যান বি ক্রস চেকড। যা বলার ভেবেচিন্তে বলুন।

তাই তো বলছি।

একটু আগে বেরিয়ে গিয়ে কী করলেন?

একটা উপহার কেনার দরকার ছিল। তাই—

উপহার কার জন্য?

আমার শালির মেয়ের জন্য। ওর জন্মদিন ছিল।

আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি দুতরফা উপহার দিয়েছিলেন?

তার মানে?

আপনার স্ত্রীও সেদিন উপহার কিনেছিলেন বলে আমাকে বলেছেন।

ওঃ!

উপহারটা কোথা থেকে কিনলেন?

নিউ মার্কেট।

কী কিনেছিলেন?

ঝুটো গয়না।

বাসুদেব সেনগুপ্তকে আপনি কতকাল চেনেন?

অনেকদিন।

কীরকম লোক ছিলেন তিনি?

সেটা উহ্যই থাকা ভাল।

তেরো তারিখে আপনি ক'টার সময় অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন?

ছ'টা–না আরও পরে।

ঘড়ি না দেখে বেরোবার মানুষ তো আপনি নন।

বলেছি তো, ভাল মনে পড়ছে না।

নিউ মার্কেটের কোন দোকান থেকে গয়না কিনেছিলেন মনে আছে?

দোকানের নামটাম জানি না। না, মনে নেই।

ইতিমধ্যে আমি সল্টলেকে আপনার শালির বাড়িতে খোঁজখবর নিয়েছি। ওঁরা জানিয়েছেন, ওঁদের মেয়ের জন্মদিনে তাকে আপনারা পাঁচশো টাকার একটা গিফট চেক দিয়েছেন। সেই চেকটা কেনা হয়েছিল বারো তারিখে।

ওঃ।

শঙ্কর বড্ড অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। নিজেকে এমন বোকা তার বহুকাল লাগেনি। গোয়েন্দারা কীভাবে কাজ করে এবং কত দূর অবধি খোঁজখবর নেয় সে সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল না। সে শবর দাশগুপ্তর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল।

এবার বাসুদেব সেনগুপ্তর প্রসঙ্গ। মিস্টার বোস, আমার কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, আমি আপনার স্ত্রী ও বাসুদেববাবুর সম্পর্কের কথা জানি। আমার প্রশ্ন হল, আপনি যখন দেখলেন ওঁরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছেন, তখন আপনি আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে তার অবৈধ প্রেম মেনে নিলেন কেন?

এটা খুবই ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। আপনি ঠিক বুঝবেন না।

আমি এও শুনেছি, আপনি আপনার স্ত্রীকে ভীষণ ভালবাসেন। এতটাই সেই ভালবাসা যে, তার সমস্ত অন্যায় ও ব্যভিচার অম্লান বদনে মেনে নেন। সত্যিই কি তাই?

শঙ্কর একটু লাল হয়ে বলল, হয়তো ভালবাসাটা একটা যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। তবুবলি, কথাটা সত্যি। আমি আমার স্ত্রীকে প্রবলভাবে ভালবাসি।

ভালবাসা ইউজুয়ালি পজেসিভ। আপনার স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখেও আপনি তেমন কোনও ব্যবস্থা নেননি। কেন তা বলতে পারেন?

কী ব্যবস্থা নেব? আমার তো কিছু করার ছিল না।

আপনি আপনার স্ত্রী বা বাসুদেবকে কখনও চার্জ করেননি?

করে কী হবে? দে ওয়্যার ইন লাভ, আমার কিছু করার ছিল না।

সাধারণত প্রেমিক পুরুষেরা জেলাস হয়। স্ত্রীর প্রেমিককে তারা বড় একটা ক্ষমা করে না। বাসুদেবকে আপনি কিছুই করেননি। মারপিট না হোক একটা শো-ডাউন বা একটা ঝগড়া তো করবার চেষ্টা করতে পারতেন।

তাতে লাভ হত না।

আপনি কি মোর ক্যালকুলেটিভ দ্যান ইমোশনাল?

আমি আমার ইমোশন কন্ট্রোল করতে পারি।

তাই যদি হয় তা হলে আপনি আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স না করার জন্য কান্নাকাটি এবং সাধাসাধি করলেন কী করে? দ্যাট ইজ ইমোশন। তাই না?

এসব কথা আপনাকে কে বলল? আমার স্ত্রী?

তা ছাড়া আর কে হতে পারে?

রীণা যদি ও কথা বলে থাকে তবে খুব একটা ভুল বলেনি। হ্যাঁ, আমি ওকে ছাড়তে চাইনি। সেই সময়ে আমি আবেগে খানিকটা ক্যারেড হয়ে গিয়েছিলাম– সত্যি কথা।

বাসুদেব সেনগুপ্তকে কি আপনি ভয় পেতেন?

হঠাৎ শঙ্কর রাগে লাল হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ ইট। কেন–কেন আমি সেই স্কাউন্ড্রেলটাকে ভয় পাব? আমি ওকে ঘেন্না করতাম।

প্লিজ! ওরকম হেস্টি হবেন না। এসব অনভিপ্রেত প্রশ্ন আমাদের বাধ্য হয়েই করতে হয়। আপনি নিজেই বলেছেন যে, আপনি আপনার ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারেন।

সরি। বলুন।

ভয়ের প্রশ্নটা উঠছে তার কারণ বাসুদেব সেনগুপ্ত খুবই মারকুট্টা এবং অ্যাগ্রেসিভ লোক ছিলেন। খেলার মাঠেও ওঁর মারাকু বলে বদনাম ছিল। নিজের পরিবারের কাছেও ছিলেন একজন ভীতিপ্রদ মানুষ।

তা জানি।

এবার বলুন ওঁর সঙ্গে লাইন অফ কলিশনে আসতে কি আপনার একধরনের উইকনেস ছিল?

সামান্য সাদা মুখে কিছুক্ষণ বসে রইল শঙ্কর। তারপর জোর করে মাথা নেড়ে বলল, না।

ওই আকস্মিক রক্তহীনতা শবর চেনে। ঘোষালবাবুর ঠিক ওরকমই হয়েছিল। তবে শবর পয়েন্টটা নিয়ে আর চাপাচাপি করল না।

এবার একটু সেনসিটিভ প্রশ্নে যাচ্ছি।

শঙ্কর একটা শ্বাস ফেলে বলে, গো অ্যাহেড।

রিগার্ডিং অজাতশত্রু বসু।

হ্যাঁ। অজু বাসুদেবের ছেলে।

সেটা এখন অনেকেই জানে। প্রশ্ন হল, এ ছেলেটির প্রতি আপনার মনোভাব কেমন?

কীরকম হওয়া উচিত?

আমার প্রশ্ন হল, বাসুদেব অন্যায়কারী হলেও ছেলেটি তো ইনোসেন্ট।

শুনুন, আমি রক্তমাংসের মানুষ, পাথর নই। আমি আমার স্ত্রী আর বাসুদেবের অনেক অন্যায় সহ্য করেছি বটে, তা বলে বাসুদেবের ছেলেকে মাথায় করে নাচবার তো কিছু নেই।

তা বলছি না। আমার প্রশ্ন, ছেলেটার প্রতি আপনার এত তীব্র বিদ্বেষ ছিল কেন, যার জন্য ছেলেটা কখনও আপনার সামনে আসার সাহস পেত না?

আপনার নিজের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটলে বুঝতেন আমি কতটা মানসিক সাফারার।

কখনও প্রতিশোধ নেওয়ার কথা মনে হয়নি?

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ কীভাবে নেব তা আমি ভেবে পেতাম না।

প্রতিশোধের কথা ভাবতেন তো? বাসুদেবকে খুন করার ইচ্ছে কখনও হয়নি?

ফের উত্তেজিত হয়ে শঙ্কর বলে ওঠে, আর ইউ হিন্টিং সামথিং?

ঠান্ডা গলায় শবর বলল, এরকম ইচ্ছে তো হতেই পারে। বিশেষ করে যারা অসহায় আর দুর্বল, যারা ভিতু তাদের মনেই জিঘাংসা থাকে বেশি। যেহেতু তারা ঘটনা ঘটাতে পারে না সেইহেতুই তারা মনে মনে খুনটুনের কথা ভাবে। শুধু ভাবেই, তার বেশি কিছু নয়।

আপনি আমাকে দুর্বল আর ভিতু বলে ব্র্যান্ডেড করছেন নাকি? আর ইউ শিয়োর?

শবর মাথা নেড়ে বলে, না। আই অ্যাম নট শিয়োর। কিন্তু এবার একটা আরও সেনসিটিভ প্রশ্ন আছে। ভয় হচ্ছে প্রশ্নটা করলে আপনার ভায়োলেন্ট রি-অ্যাকশন হতে পারে। করব কি?

ইফ দ্যাট ক্লিয়ার্স মি ফ্রম দিস হিনিয়াস অ্যাফেয়ার্স দেন শুট।

দেন পুল ইয়োরসেলফ টুগেদার। প্রশ্নটার জবাব ইচ্ছে করলে আপনি নাও দিতে পারেন।

গো আহেড।

আপনার যৌন ক্ষমতা কি কিছুটা কম ছিল?

চেয়ারের দু'হাতলে শঙ্করের দু'হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। মুখটা হয়ে গেল পাথরের মতো। দুই চোয়ালে দুটো ঢিবি। চাপা হিংস্র গলায় সে বলল, হোয়াট ডু ইউ মিন? এটা কী ধরনের–

রিল্যাক্স। আই হ্যাভ গট দি মেসেজ।

হোয়াট মেসেজ, ইউ বাস্টার্ড?

শবর একটু হাসল। ঠান্ডা নরম গলাতেই বলল, ইট হার্টস আই নো।

ক্লান্ত শঙ্কর নিজের ব্যবহারে সামান্য লজ্জিত হয়ে বলে, এসব অবান্তর প্রশ্ন করছেন কেন?

অবান্তর নয় বলেই করছি। আমি হোমওয়ার্ক না করে আপনার কাছে আসিনি।

কীসের হোমওয়ার্ক?

রসকো ক্লিনিকের ডাক্তার চৌধুরী আমাকে জানিয়েছেন, আপনি তার রেগুলার ক্লায়েন্ট। একসময়ে আপনি তার কাছে হরমোন ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছিলেন।

শঙ্করের মুখটার বয়স যেন চোখের পলকে দশ বছর বেড়ে গেল। স্তম্ভিত এবং হতশ্বাস একটা চেহারা। ঢাকা দেওয়া গেলাস তুলে খানিকটা জল খেল ঢক ঢক করে।

এতে লজ্জার কী আছে? এরকম তো হতেই পারে। সকলের কি সব দিক পারফেক্ট থাকে?

প্লিজ! আজ আপনি আসুন।

কেন উত্তেজিত হচ্ছেন? আমি পুলিশে চাকরি করি বলেই মায়াদয়াহীন নই। কিন্তু সত্যের ভিতরে পৌঁছোতে হলে এসব বিচ্ছিরি প্রসঙ্গ না তুলেও উপায় থাকে না।

আমি ইম্পোটেন্ট নই।

ইম্পোটেন্ট বলিনি।

তা হলে?

ডাক্তার চৌধুরী আমাকে বলেছেন, ইউ ওয়্যার নট এ ভেরি উইলিং অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ লাভার। ওঁর একটা ব্যাখ্যা আছে।

কী সেটা?

আপনি আপনার সুন্দরী স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। এতটা ভালবাসতেন বলেই আপনি তাকে সেয়ালি খুশি করতে পারবেন কি না তা নিয়ে আপনার টেনশন থাকত। এটা একধরনের ভয়। এই ভয় এতটাই তীব্র যে ইন রিয়ালিটি আপনি দুর্বল হয়ে পড়তেন। স্ত্রীকে তৃপ্ত করা আপনার পক্ষে সম্ভব হত না।

শঙ্কর মুখটা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

খুব সরু এবং নিচু গলায় শবর বলল, এই সুযোগটাই কি বাসুদেব নিতেন?

প্লিজ! প্রসঙ্গটা আমার সহ্য হচ্ছে না।

কেন মিস্টার বোস, আমি তো বন্ধুর মতোই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আমি আপনার শত্রু নই। আমি আপনার প্রবলেমগুলো নিয়ে ভেবেছি বলেই এত খবর নিয়েছি। ডাক্তার চৌধুরী আপনাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও পাঠিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

মিস্টার বোস, সেক্সের শতকরা আশি-নব্বই ভাগই হল মানসিক, দশ বা কুড়ি পারসেন্ট হল শরীর। একটা মোটিভেশন থেকেই ওটা হয়ে ওঠে।

ক্লান্ত শঙ্কর বলল, আপনি কি আমাকে যৌনশিক্ষার পাঠ দিচ্ছেন?

শবর একটু হাসল, বলল, না। লেট ইট গো। আপনি একজন অপমানিত, লাঞ্ছিত মানুষ। আপনার স্ত্রী এবং বাসুদেব মিলে আপনাকে একসময়ে সহ্যের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। আপনার স্ত্রী আপনাকে একরকম জানিয়েই বাসুদেবের সন্তান ধারণ করেন। আপনি সবই মেনে নিয়েছিলেন, সহ্য করেছিলেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা একটা মহত্ত্বের ব্যাপার। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, পৌরুষের অভাব।

ধরুন তাই। নাউ লেট মি গো হোম।

শঙ্কর উঠতে যাচ্ছিল। শবর ঠান্ডা এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

শঙ্কর গা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে বলল, ইউ আর গোয়িং টু ফার।

আমি সেটা জানি। আপনি হয়তো তখন প্রতিশোধ নেননি, কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বাসুদেবের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছেন।

কী বলছেন আপনি? শঙ্কুর ফের সাদা মুখে বলল। তার হাত ফের চেয়ারের হাতলে শক্ত।

শবর হাসল, নানারকম সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। এরকম নাও হতে পারে। তেরো তারিখে বিকেল ছ’টা থেকে সাড়ে সাতটা অবধি আপনার হোয়ারঅ্যাবাউটস জানাটা সেজন্যই জরুরি।

বললাম তো!

কিছুই বলেননি। যা বলেছেন তা ভাসাভাসা। ইনি ডিটেলস যদি বলতে না পারেন তবে ইউ আর ইন এ স্যুপ।

মাই গড!

শঙ্কর দৃশ্যতই ভেঙে পড়ার ভঙ্গি করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

শবর মৃদুস্বরে বলল, কোথায় ছিলেন?

আই হ্যাড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

কার সঙ্গে?

সেটা বলা যাবে না।

দরকার হলেও না?

এখনও দরকারটা বুঝতে পারছি না।

শবর উঠল। বলল, ওকে। লেট আস কল ইট এ ডে!

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় একবার ফিরে চাইল শবর। দেখল, যেন নিজেরই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছে শঙ্কর বসু।

রাত ন'টায় হাসপাতালে হানা দিল শবর। ভিজিটিং আওয়ার অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। এখন হাসপাতালটা বেশ শান্ত।

ঘোষাল বিছানায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে বসে গীতা পড়ছিল। তাকে দেখে ছোট বইটা বালিশের পাশে রেখে উঠে বসে হাসল।

শবর বিছানারাই এক ধারে বসে বলল, শুনলাম আপনার রিলিজ অর্ডার কালই হয়ে গেছে। তবু আপনি বাড়ি যাচ্ছেন না কেন?

মায়ার বন্ধন একটু আলগা করার চেষ্টা করছি।

বুঝিয়ে বলুন মশাই।

আমি এসেনশিয়ালি একজন ফ্যামিলিম্যান। ছেলেবউ এদের নিয়ে জড়িয়ে জেবড়ে থাকতে ভালবাসি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই অত্যধিক মায়ার বন্ধনটা পৌরুষের পক্ষে ক্ষতিদায়ক। আমার ইদানীং হোমসিকনেসটাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে তর সইত না। তাই ভাবছি আরও দু-চার দিন ফ্যামিলি থেকে একটু তফাত থাকি।

এ কি গীতা পাঠের ফল নাকি?

ঘোষাল হাসল, তাও বলতে পারেন, অ্যাকচুয়ালি তাই।

ভাল। কিন্তু তার চেয়েও ভাল কাজেকর্মে নেমে পড়া। কর্মের মতো মুক্তির পথ আর নেই।

তা বটে। সেটাও ভাবছি। আপনার কেসটার খবর কী?

সেই সেনগুপ্ত মার্ডার কেস?

হ্যাঁ। কিন্তু কাগজে তো দিচ্ছে না কিছু।

কাগজে দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়। সূক্ষ্ম ব্যাপার, রগরগে ঘটনা তো নয়। এখনও খুবই গোপন তদন্ত চলছে।

কেন?

শবর একটু হাসল, কারণ আছে। এ কেসটা থেকে কী বেরোয় তা আমিও জানি না।

ফ্যাক্টসগুলো আমাকে বলুন না। খানিকটা শুনেছি। বাকিটাও শুনি। একটা জিগস পাজল খেলি।

শুনবেন?

হ্যাঁ। বলুন।

শবর গোটা ঘটনাটা বলল। প্রায় কিছুই বাদ দিল না। খুব মন দিয়ে শুনল ঘোষাল।

শোনার পর ঘোষাল হঠাৎ বলল, রীণা বোসকে ফোনটা কে করছে বলে মনে হয়?

শবর একটু হাসল, আপনিই বলুন।

ঘোষাল একটু হাসল। বলল, ডিডাকশন করলে যা দাঁড়ায় তাতে একজনই হতে পারে। লাভ-হেট রিলেশনে যে লোকটা বরাবর.দু'ভাগ হয়ে ছিল। কখনও ভালবেসে, কখনও ঘেন্না করে। দুটোই তীব্রভাবে করে। লোকটা শঙ্কর বসু।

এই তো মস্তিস্ক চমৎকার কাজ করছে!

শঙ্কর বসুর অ্যালিবাই আছে?

না, কারও কোনও ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই নেই।

ছেলেটা?

তারও নেই। মাণ্ডবী বলে তার একটি ফুটফুটে বান্ধবী আছে। শি উইল ভাউচ ফর হিম।

ঘোষাল একটু হাসল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ইউ নো সামথিং। অ্যালিবাই নেই বলে নিশ্চিন্ত থাকতেন না, ক্র্যাকডাউন করতেন। আপনার লাইন অফ অ্যাকশন আমি জানি।

শবরের মুখ থেকে হাসিহাসি ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। চুপ করে একটু ভাবল সে। তারপর বলল, লোক দুটো কে হতে পারে বলুন তো।

কোন দুটো লোক?

যারা লিফট সারানোর নাম করে বাসুদেব সেনগুপ্তকে সিঁড়ি ভাঙতে বাধ্য করেছিল।

ঘোষাল মিটিমিটি একটু হেসে বলল, আপনি ইচ্ছে করলেই তাদের খুঁজে বের করতে পারেন।

কী করে বুঝলেন?

আপনার মুখ দেখে। আপনি তেমন চিন্তিত নন। কেন নন মিস্টার দাশগুপ্ত?

শবর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, ঘোষালবাবু, ইউ আর এ ভেরি কানিং কপ। কেন যে অমন গুটিয়ে গিয়েছিলেন।

বললাম তো, মায়া। মায়া থেকে স্নায়ুদৌর্বল্য। স্নায়ুদৌর্বল্য থেকে ত্রাস। ত্রাস থেকে কর্মনাশ।

দু'জনেই হাসল।

শবর বলল, এখন কী মনে হচ্ছে?

নিজেকে সবসময়েই বলছি, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

আপনার ছেলেটা আপনার খুব ন্যাওটা, না?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি, আমার ছেলে বলি বটে, কিন্তু ও তো আমার ক্রিয়েশন নয়। আমার ভিতর দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র, আমি সৃষ্টি করিনি। আসলে ও কার

ছেলে শবরবাবু? আমরা কার ছেলে?

শবর হাসল, গীতা পড়ে তো বিপদ করলেন মশাই! এ যে তীব্র বৈরাগ্য। ঘোষাল মাথা নেড়ে বলল, সিরিয়াসলি বলছি, বড্ড মায়ায় মাখামাখি হয়ে আছি যে। সত্যটা কী বলুন তো!

৯. এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না শিখার

এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না শিখার। শরীরে বড় কষ্ট। খোলসটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভিতরে কতটা ফোপরা হয়ে গেছে। সয়ে যেতে হবে। আর ক'টাই বা দিন! কষ্টটা কি খারাপ লাগে শিখার? কষ্ট খারাপ ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও কি পরিশোধনের কাজ হয় না? হয় বলেই শিখা কষ্টের কথা কাউকে বলেন না। মনের কষ্টও কি কম? যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন কত আপনজন পর হয়ে যাবে, কত বিশ্বাসী ভেঙে দেবে বিশ্বাস, কত স্নেহের ধন ধরবে রুদ্রমূর্তি, কত চেনা হয়ে যাবে অচেনা। এসব কি মেনেই নেননি শিখা। ঘর করেছেন এক ভৈরবের। কত খোঁচা, কত উন্মাদ রাগ, কত লাঞ্ছনা আর অপমান সইতে হয়েছে জীবনে। ছেলেরা পালিয়ে বাঁচল, মেয়ে বাঁচল বরের ঘরে গিয়ে। তার তো পথ ছিল না পালানোর। যেন বাঘের খাঁচায় নিরস্ত্র বাস করতে হল। বাঘের ছায়াটুকু সম্বল করে। এখনকার মেয়েরা নারীমুক্তির কথাটথা গলা ছেড়ে বলে। তারা পড়েনি তো কখনও এরকম মানুষের পাল্লায়। মনের কষ্টের শেষও নেই। গতকাল দুই ছেলে এসে তুমুল ঝগড়া করে গেছে তার সঙ্গে। ঝগড়া বলা ভুল, ওদের ছিল একতরফা আক্রমণ। শিখা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তার অপরাধ, লাইফ ইনশিয়োরেন্স পলিসিটা তিনি রীণাকে দিয়ে দিয়েছেন। ঢাকুরিয়ার বাড়ির প্রমোটারের দেওয়া সাত লাখ টাকার সবটাই তিনি ভাশুরদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ছেলেদের তাই নিয়ে আক্রোশ। শিখা ওদের কী করে বোঝাবেন যে, দুনিয়ার সম্পদ দু'হাতে কেড়ে নিলেই হয় না। মানুষের শাপ লাগে। শিখা জানেন, ছেলেরা আর সহজে এমুখো হবে না। বাপের শ্রাদ্ধ করল না, শিখা মারা গেলে হয়তো শিখার শ্রাদ্ধও করবে না। তা না করে না করুক। শিখা কি তা বলে পারেন এত বড় বঞ্চনাকে মেনে নিতে?

সব খারাপের মধ্যে একটাই ভাল খবর। দিন দশেক আগে বাসুদেবের শ্রাদ্ধের দিন সন্ধেবেলায় শিখা বাইরে গিয়ে রীণাকে টেলিফোন করেছিলেন।

রীণা খুব খুশি হয়েছিল ফোন পেয়ে। বলল, দিদি, আপনি যা বলেছেন তাই করেছি।

কী করেছ?

অজুকে দিয়ে এ ক’দিন প্রায় অশৌচের মতোই পালন করিয়েছি, পুরোটা পারিনি। ধড়া বা হবিষ্যিটা হয়ে না উঠলেও নিরামিষ খেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, কাল ঘাট কাজের দিন নিজেই গিয়ে কালীঘাটে ন্যাড়া হয়ে এসেছে। আজ কালীঘাটে গিয়ে শ্রাদ্ধও করেছে। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম।

বাঁচালে। জানি না বাপু শ্রাদ্ধ করলে বা না করলে কী হয়, কিন্তু মনটা বড় খচখচ করছিল। কী বলে যে তোমাকে আশীর্বাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না।

আপনি কি জানেন দিদি, আপনার মতো ভাল মানুষ আমি জীবনে কমই দেখেছি।

পাগল! আমি ভাল কি না তা আমিই জানি। বরাবর হয়তো তোমার এ ধারণা থাকবে না।

থাকবে দিদি। আমাদের সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। পুলিশের লোক এসে ভীষণ অশান্তি করছে কিছুদিন ধরে। আমি আর আমার স্বামী একটুও শান্তিতে নেই। দেখা হলে সব বলব।

পুলিশ কেন যে এরকম করছে জানি না। কী লাভ হবে ওদের। শবর দাশগুপ্তই কি এসব করছে?

হ্যাঁ দিদি, উনিই। আপনি চেনেন ওঁকে?

চিনি। আমার বউমার সম্পর্কে দাদা। শবর খুব বুদ্ধিমান।

হ্যাঁ, সেটা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এমন সব প্রশ্ন করেন যে—

বুঝেছি। ওরা ওরকমই। দেখা হলে ওকে আমি বলে দেব।

না, শবরের সঙ্গে দেখা হয়নি শিখার। তিনি ওর কোনও খবর জানেন না, ঠিক কোন দফতরে কাজ করে তাও জানা নেই। দেখা হলে তিনি বলতেন, ওদের আর যন্ত্রণা দিয়ো না। এবার ওদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও। পাপ করেছে বটে, কিন্তু তার শাস্তিও তো মেয়েটা কম পায়নি।

এসেছিল গোপালও। সেও বলেছে শবর দাশগুপ্ত তাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে ছেড়েছে। এখনও জেরা চলছে। থানায় ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, একজন হুমকি দিচ্ছে। শিখার তাই মন ভাল নেই। শবরকে সে নিরস্ত করতে চায়। এসব করে আর লাভ কী?

দিন চারেক আগে রীণা তার ছেলেকে নিয়ে এসেছিল এক সকালে। ছেলেটার ন্যাড়া মাথা দেখে শিখার বুক জুড়োল। হোক অবৈধ, তবু এই একটা ছেলেই তো বাসুদেবকে স্বীকার করল বাবা বলে!

শিখা তাদের বলেন, খাওয়ালেন। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওঁর কাজ করতে তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো বাবা? অনিচ্ছেয় অভক্তি নিয়ে করোনি তো!

ছেলেটা অকপটে মাথা নেড়ে বলল, না। ওঁর প্রতি আমার তো একটা কর্তব্য ছিল।

ওঁকে তুমি বোধহয় চিনতে! না?

হ্যাঁ। উনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতেন।

শুনে আমার চোখে জল আসছে। ছেলেমেয়ের প্রতি উনি সারাজীবন তেমন কোনও কর্তব্য করেননি। তোমার সঙ্গে দেখা করতেন শুনে কত ভাল লাগছে! একটু বলবে ওঁর কথা?

অজু লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল। তারপর বলল, আমাকে উনি রেস্তোরাঁয় মাঝে মাঝে খাওয়াতে নিয়ে গেছেন। গল্প করেছেন।

কী গল্প?

অনেক গল্প। বেশিরভাগই ওঁর খেলার জীবনের কথা।

হ্যাঁ, খেলার কথা বলতে খুব ভালবাসতেন। আর আমাদের কথা কখনও বলতেন না?

খুব একটা নয়। তবে দাদারা যে ওঁকে পছন্দ করেন না সেটা বলেছেন।

হ্যাঁ বাবা, ছেলেরা ওঁকে পছন্দ করত না। কারণ ছেলেদের দিকে উনি ফিরেও তাকাননি কখনও। রেগে গেলে এমন মার মারতেন যে ভয়ে আমার রক্ত জল হয়ে

যেত। বোধহয় বুড়ো বয়সে পুত্র-ক্ষুধা জেগেছিল। নিজের ছেলেরা হাতছাড়া হওয়ায় তোমার কাছে যেতেন।

অজু চুপ করে রইল।

শুনেছি, তোমাকেও একটা জীবন তোমার বাবার অনাদর সইতে হয়েছে!

ও কিছু নয়। বাবা ভাল লোক।

তা জানি। তোমার ওই বাবার মতো ভাল লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। এখন তোমার আসল বাবা তো মারা গেছেন, শঙ্করের সঙ্গে এখনও কি সম্পর্কটা ওরকমই আছে?

অজু একটু হাসল, আপনি ভাবছেন কেন? সব ঠিকই আছে। আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

বুঝেছি। এখনও হয়নি। হবেই বা কী করে? ওরও তো কষ্ট কম নয়। আমি এক পাষাণের ঘর করেছি বটে, কিন্তু ভাবতে ভাল লাগছে যে, সেই পাষাণও স্নেহের কাঙাল হয়ে একদিন তোমার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। মনুষ্যত্ব বোধহয় একেই বলে।

আমার বাবা আমার জন্য অনেক করেছেন। তাকে আমার কখনও খারাপ লাগেনি। হি ওয়াজ ভেরি গুড টু মি।

দোহাই বাবা, ইংরেজিতে বোলো না। আমি বুঝতে পারি না। সেকেলে মানুষ তো। বাংলা করে বলল।

উনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন।

ওঁকে বাবা বলে বলছ। কত ভাল লাগল শুনে!

অজু হাসল, উনি তো আমার বাবাই। বাবা ছাড়া কী বলব?

তাই তো!

রীণা চুপ করে একটা হাতরুমালে চোখ ঢেকে সোফার এক কোণে বসে ছিল। ধীরে জল ভরা চোখ তুলে বলল, আমার বড় পাপের ভয় হচ্ছে। কী যে করলাম জীবনটা নিয়ে।

শিখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসলেন, একটা জ্বালা-পোড়া তো আছেই ভাই। জ্বালা পোড়া ছাড়া কি শুদ্ধ হওয়া যায়? তবে তুমি ভাগ্যবতী, অমন স্বামী পেয়েছ।

রীণা মাথা নেড়ে বলল, শুদ্ধ হওয়া কাকে বলে তাই তো জানি না। এই ছেলেটাকে বুকে আগলে শুধু ভয়ে ভয়ে দিন কেটে গেছে। এখন আর কী হবে শুদ্ধ হয়ে? ছেলের কাছেই তো কিছু গোপন রইল না। ওর চোখে কি আমি আর মায়ের মতো মা?

ওসব ভেবো না। তোমার ছেলে তোমাকে আঁকড়েই তো বেঁচে থেকেছে। জীবনে যেটুকু পেয়েছ তাই নিয়ে থাকো। যা হয়নি তার কথা ভেবে কী হবে? তোমাকে বলি, তোমার স্বামীকে কিন্তু আমি চিনি। সাহস করে একবার তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

রীণা চমকে উঠে বলল, সে কী! কবে?

শিখা একটু হাসলেন। বললেন, তখন আমরা সদ্য এ ফ্ল্যাটে এসেছি। উনি তখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে।

কেন ডেকে এনেছিলেন দিদি?

মানুষটা একটা জীবন বড় কষ্ট পেয়েছেন। আমার তাই ওঁকে খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। তোমার ভয় নেই। শঙ্করবাবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন।

উনি আমাকে বলেননি তো!

বলার মতো ঘটনা নয়। আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলাম, দুনিয়ার কোনও পাপেরই শাস্তি বাকি থাকে না। ফল পেতেই হয়। শঙ্করবাবু বড্ড ভাল মানুষ। উনি কেঁদে ফেলেছিলেন। তার পরেও কয়েকবার এসেছেন।

আমাকে কখনও বলেননি তো উনি!

পলিসিটার গতি হল?

হ্যাঁ। ওরা আমাদের ক্লেম অ্যাকসেপ্ট করেছে। প্রসেসিং চলছে। একটু সময় লাগবে।

যাক! ওটা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল। তোমার ছেলেটা যে বঞ্চিত হল না এটাই একটা মস্ত সান্ত্বনা।

কিন্তু আপনার ছেলেরা তো খুশি হয়নি দিদি।

শিখা ফের একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার স্বামীর বিষয়সম্পত্তির নেশা ছিল। রোজগার কম করেননি। বাপের টাকা, এই ফ্ল্যাট এসব তো ওরাই পাবে। ওদের অখুশির কারণ দেখি না। তবু যদি খুশি না হয় তা হলে সে ওদের স্বভাবের দোষ। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। ওদের তো অজুর মতো কষ্টের জীবন নয়। অজুর মানসিক কষ্ট যে অনেক বেশি। ওর জন্য এটুকু করে উনি মনুষ্যত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন।

আপনি রক্তমাংসের মানুষ নন দিদি। আপনি যেন আকাশ থেকে আলো হয়ে নেমে এসেছেন।

শিখ মৃদু হাসলেন, অত বলতে নেই। পরে যদি ওসব কথা ফেরত নিতে হয়?

কী যে বলেন।

দু'জনেই তাকে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিল। ওই একটা তৃপ্তি পেয়েছিলেন শিখা। কারও ভাগে কম পড়লে তার কষ্ট হয়।

গত কিছুদিনে শিখা ছোটখাটো আরও কয়েকটা তৃপ্তি পেয়েছেন। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা এসেছিল। সামান্য কিছু টাকা খুব বিনীতভাবে চেয়েছিল তারা। আগের রুদ্রমূর্তি নেই।

শিখা তাদের বললেন, এটুকু আমি পারব। আগে যা চেয়েছিলে তা পারতাম না। আমার যে অত টাকা নেই।

সেই ছেলেরা মাঝে মাঝে তার খোঁজ নিয়ে যায়।

ঢাকুরিয়ার অপোগণ্ডগুলোও আসে। সবাই নয়। যারা একটু চালাকচতুর, যারা একটু সাহসী তারা এসে লিফটে করে আটতলায় ওঠে। বসে সুখদুঃখের কত কথা কয়ে যায়। আজও ওরা তার বন্ধু, তাঁর বড় আপনজন। কাউকে নিজের গয়না বেচে দোকান করে দিয়েছেন, কাউকে পাইয়ে দিয়েছেন ব্যাঙ্ক লোন, একে ওকে কতজনের চাকরি করে দিয়েছেন। রোগে শোকে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কতটুকু আর পারেন শিখা?

যেটুকু পেরেছেন তাতেই কত লোক কেনা হয়ে আছে তার কাছে।

আজ কি একটু মেঘলা করেছে? শরৎকাল শেষ হয়ে এল। এরপর হেমন্ত। কুয়াশা হবে। একটু একটু করে শীত পড়বে। কতকাল পৃথিবীর এই ঋতুচক্র দেখবেন শিখা?

বাতাসী!

বাতাসী সামনে এসে দাঁড়াল।

ক্লান্ত গলায় শিখা বললেন, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। একটু শোব। আমাকে ডাকিস না। তুই খেয়ে নিস।

তোমার তো রোজ শরীর খারাপ হচ্ছে। ডাক্তারকে খবর দেব?

ডাক্তার জানে। সব জানে। দরকার হলে বলব।

শিখা সামনের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে যাবেন বলে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিংবেল বাজল। ফের বসে পড়ে বললেন, দেখ তো, কে এল!

বাতাসী দরজা খুলতেই দরজার ফ্রেমে শবর দাশগুপ্তকে দেখা গেল।

মাসিমা, আমি।

এসো বাবা, এসো। তোমার জন্য কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি!

শবর ধীর পায়ে ঘরে এল। মুখোমুখি সোফায় বসল। বলল, কেন মাসিমা, আমার জন্য অপেক্ষা করছেন কেন?

তোমাকে বকব বলে। কেন মানুষজনকে ভয় দেখাচ্ছ? এসব করে আর কী লাভ? এবার ওদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

শবর মৃদু একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, শুধু এ জন্যই?

হ্যাঁ।

শবর মাথাটা একটু নামিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, আমার কাজটা তত ভাল নয় মাসিমা, কত মানুষের অভিশম্পাত কুড়োতেও হয়। কত প্যাটার্ন, কত ছক, কত সম্পর্ক, কত ভালবাসা অবধি ভেঙে দিতে হয়।

জানি বাপু। কী খাবে বলল। একটু কফি করুক?

ঠিক আছে।

বাতাসীকে ডেকে কফির কথা বলে দিয়ে শিখা শবরের চোখে চোখ রাখলেন, পৃথিবীর সব ছক কি উলটে দিতে পারবে বাবা?

তা বলছি না। আমি আর কতটুকু পারি? পুলিশেরই বা কতটুকু সাধ্য বলুন! পুলিশের ফাইলে কত কেস জমা আছে যেগুলোর মীমাংসা হয়নি। আনসলভড মিস্টরিজ।

ইংরিজি বোলো না। জানোই তো আমি ইংরিজি বুঝি না।

শবর হাসল, বুঝবার দরকারটাই বা কী? ইংরিজি না বুঝেও তো এত কাল চলে গেল।

তা ঠিক। এবার বলল তো, এত তদন্ত করে খেটেখুটে কী হল? কিছু পেলে খুঁজে?

শবর মাথা নেড়ে বলল, না। অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল যার কোনও উত্তর নেই।

যেমন?

শবর মাথা নাড়ল, গোটা ব্যাপারটারই কোনও মানে হয় না। এত মানুষের রাগ ছিল বাসুদেব সেনগুপ্তর ওপর, অথচ কাউকেই আমার হত্যাকারী বলে কেন মনে হচ্ছে না বলুন তো। অ্যালিবাই নেই, তবু কেন ক্র্যাকডাউন করা যাচ্ছে না?

মাসিমা, পুলিশের চাকরি করতে করতে একটা জিনিস হয়, অন্তত আমার হয়, অপরাধীর মুখোমুখি হলে ভিতরে যেন একটা কিছু টিকটিক করে। এবার তা হল না। কেন মাসিমা?

আমি তার কী জানি বাবা?

বাতাসী কফি নিয়ে এল। শবর একটা চুমুক দিয়ে শিখার দিকে তাকাল। শিখার মুখে একটু দুষ্টু হাসি। চোখে একটু চিকিমিকি।

শিখা হঠাৎ বাতাসীকে ডেকে বললেন, এই মুখপুড়ি, আমি নিরামিষ পিন্ডি গিলছি বলে তুইও কি মাছ খাওয়া ছাড়লি নাকি?

বাতাসী একটু অবাক হয়ে বলে, আমার মাছ লাগে নাকি?

লাগবে না কেন? লাগালেই লাগে। যা গিয়ে বাজার থেকে একটু মাছ নিয়ে এসে ভাল করে বেঁধে খা।

কী যে বলো তার ঠিক নেই।

শোন মা, আমি ভোররাতে স্বপ্ন দেখেছি, তুই আমার সামনে বসে মাছ-ভাত খাচ্ছিস। এসব স্বপ্ন কিন্তু সাংঘাতিক। যা মা একটু মাছ নিয়ে আয়। গড়িয়াহাটে যা, ওই সঙ্গে আমার ওষুধও নিয়ে আসিস। শোয়ার ঘরে প্রেসক্রিপশনটা আছে। নিয়ে যা।

বাতাসী একটু সময় নিল। মিনিট দশেক বাদে সে একটু ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শিখা বললেন, এবার বলল বাবা।

শবর মৃদু মৃদু হেসে বলল, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি আমাকে জেরা করবে না?

না। শুধু একটা কথা।

বলো।

তেরো তারিখে সন্ধেবেলা বাতাসী কোথায় ছিল?

বাঃ, এই তো জেরা করেছ। বাতাসীকে সেদিন আমি ছুটি দিয়েছিলাম। সেদিন সকালেই ও ওর বাড়ি গোসাবায় গিয়েছিল। চোদ্দো তারিখে ফিরে আসে।

ওঃ।

আর কিছু?

না মাসিমা।

কেন ছুটি দিয়েছিলাম জানতে চাইলে না?

না।

কেন জানতে চাও না?

প্রয়োজন নেই বলে।

তেরো তারিখে দুটো লোক লিফট সারানোর নাম করে লিফটটা আটকে রেখেছিল। তাদের কি খুঁজে পেয়েছ?

না মাসিমা। মনে হয় তাদেরও খোঁজার আর দরকার নেই।

শিখা একটু পিছনে হেলে চোখ বুজে রইলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, তুমি কি তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াচ্ছ শবর?

হ্যাঁ মাসিমা।

ভাল। মানুষকে আর কষ্ট দিয়ো না। মানুষের এমনিতেই কত কষ্ট!

ঠিক কথা। আমি সেই কষ্টের কথা শুনতেই আজ আপনার কাছে এসেছি।

ক্লান্ত শিখা, শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায় কাতর শিখা আধবোজা চোখে শবরকে দেখছিলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, জানো, আমার প্রথম ছেলে অর্ক কীভাবে হয়? উনি বাইরে কোথায় খেলে সেদিন সন্ধেবেলাতে ফিরলেন। আমার তখন পেইন শুরু হয়েছে। ওঁকে বললাম। উনি বললেন, আমার একটা ফাংশন আছে, যেতেই হবে। তুমি পাড়ার কাউকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাও। উনি বেরিয়ে

গেলেন। আমি একা অভিমান নিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু অভিমান কার ওপর বলো! ব্যথা বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে নিজেই একটা রিকশা নিয়ে একা হাসপাতালে যাই। ভরতি হই। ছেলেও হয়। ছেলে হওয়ার আনন্দ সেদিন আর কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারিনি। এ কি কষ্টের কাহিনি শবর?

সরি মাসিমা। আপনি সত্যিই সাফার করেছেন।

ও কথা বোলো না। সব কষ্টই মানুষ হাসিমুখে সইতে পারে যদি তা ভালবাসার জনের জন্য হয়। কষ্টকে তখন কষ্ট বলেই মনে হয় না। আর ভালবাসার জন্য যদি না হয় তা হলে ছুঁচটা তুলতেও যেন পাহাড় তোলার পরিশ্রম।

শবর মাথা নিচু করে রইল।

আমার ছেলেরা ভাগভিন্ন হয়ে গেছে, মেয়েও বড় একটা এমুখো হয় না। তারাও তো কিছু কম কষ্ট পায়নি। কষ্ট পাচ্ছিল শঙ্কর বসু, রীণা, আমার ভাশুর আর ভাশুরপোরা। আমি জানতাম এসব দুঃখ কষ্ট সহজে দূর করা যাবে না। আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমার সাধ্য কী বলল তো! অন্যায়ভাবে ঢাকুরিয়ার বাড়িটা উনি দখল করেছিলেন, অন্যায়ভাবে তা প্রমোটারকে দিয়েছিলেন।

জানি মাসিমা।

আমি ওঁকে কতবার বলেছি, এভাবে বঞ্চিত করতে নেই, তাতে ভাল হয় না। উনি তো আমার কথাকে কখনও মূল্য দেননি।

শঙ্কর বসুর কথা বলুন।

হ্যাঁ। সে বেচারাকে যখন ডেকে আনালাম তখন দেখল ম একটা জীবন স্ত্রীকে রাহুর গ্রাসে সমর্পণ করে লোকটা ভিতরে ভিতরে কেমন ক্ষয়ে গেছে। অত বড় চাকরি, অত টাকাপয়সা, কিন্তু মুখখানা যেন শোকাতাপা। বড় কষ্ট হয়েছিল মানুষটার জন্য। আর অজু! শঙ্করবাবুর কথা থেকে জেনেছিলাম, অজুকে তিনি কিছুই দেবেন না। ছেলেটার জন্য আমার চিন্তা হয়েছিল। একটা পলিসির নমিনি ছেলেটাকে করা হয়েছিল বটে, কিন্তু ওরকম খ্যাপা মানুষের তো মতিস্থিরতা ছিল না। কবে রেগে গিয়ে নমিনি বদলে দেবেন। তা ছাড়া ম্যাচুরিটিরও তো দেরি ছিল। ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটটা নিয়েও ওই একই কথা। হয়তো কখনও সিদ্ধান্ত বদল করে ফ্ল্যাটটা বেচেই দিলেন কাউকে। ওঁর তো রাগের কোনও ঠিকঠিকানা ছিল না।

আর তাই–?

শিখা একটু চুপ করে রইলেন। তাঁর দু’চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছিল। মৃদু স্খলিত কণ্ঠে বললেন, ওঁর চলে যাওয়ার দরকার ছিল হয়তো। গিয়ে ভালই হয়েছে। কী বলো?

আমি কী বলব মাসিমা, আপনি বলুন।

শিখা উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন। ফিরে এলেন একগাদা মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে। শবরের সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললেন, দেখো। উলটেপালটে দেখো।

শবর ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ তো আপনার মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখছি।

হ্যাঁ, প্রায় ছ’মাস আগে অসুখটা ধরা পড়ে। ডাক্তার জানে আর আমি। আর কাউকে জানাইনি। ওঁকে বা ছেলেমেয়েকে কখনও বলিনি।

কেন মাসিমা? এ তো টারমিনাল ডিজিজ।

ও কথাটা ডাক্তারদের মুখে অনেকবার শুনেছি, তাই মানে জানি। হ্যাঁ বাবা, মারক অসুখ।

চিকিৎসা?

শিখা হাসলেন, ক্যান্সারের আর কী চিকিৎসা বাবা? কেমোথেরাপি না কী ছাইভস্ম করতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। ওসব করে কী লাভ বলো? মরতে যে আমার একটুও অসাধ নেই।

শবর রিপোর্টগুলোয় চোখ বুলিয়ে রেখে দিল।

রোগটা হওয়ার পর বুঝেছিলাম, আমি যদি ওঁর আগে যাই তা হলে অনেক সমস্যার আর সমাধান হবে না। অনেক মানুষের বুকে জ্বালাপোড়া রয়ে যাবে। থেকে যাবে অনেক অনিশ্চয়তা। বুঝেছ?

হ্যাঁ মাসিমা। সব কিছুই মিলে যাচ্ছে।

মিলবেই তো। সবকিছু মিলে যাবে। যে দুটো লোক লিফট সারাবার অছিলায় এসেছিল তুমি তাদের জন্মেও খুঁজে পাবে না। আর যদি পেয়েও যাও, ওদের গলা কেটে ফেললেও কথা বের করতে পারবে না।

বুঝেছি।

আর সেই লোক দুটোর নাম বা পরিচয় আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে, এ মুখ দিয়ে তা বেরোবে না কখনও।

আমি জানি, বুলডগের মতো অনুগত আপনার কিছু লোক আছে, যারা আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

হ্যাঁ বাবা। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে এইসব লোকই তো আমাকে সঙ্গ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নিরন্ন, দুঃখী, জর্জর সব মানুষ যাদের ভালর জন্য আমি সামান্য সামর্থ্যে যতটুকু পারি করেছি।

শিখা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর চোখের অবাধ্য ধারা আঁচলে মুছবার একটা অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, ওদের খোঁজ ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছ শবর। ওরা কী করেছে তা ওরা ভাল করে জানেই না। ওরা শুধু আমার হুকুম তামিল করে চলে গেছে।

বুঝেছি মাসিমা।

তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। খুবই বুদ্ধিমান। জীবনে খুব উন্নতি করবে বাবা।

কেন লজ্জা দিচ্ছেন মাসিমা। আমি আজ এসব কথা শুনতে তো আসিনি।

শিখা নিমীলিত চোখে তার দিকে চেয়ে গভীর হাহাকারের মতো একটা শ্বাস ছাড়লেন। সেই শ্বাসে কান্নার কম্পন ছিল। শিখা প্রকাশ্যেই চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। একটু চুপ করে থেকে দূরাগত গলায় বললেন, কী শুনতে চাও শবর?

আপনি বলতে না চাইলে—

কান্নার মধ্যেও শিখা সামান্য একটু হাসলেন। অদ্ভুত দেখাল তখন মুখখানা।

প্রায় ফিসফিস করে বললেন, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আমি সিঁড়িতে ওঁর চটির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। নির্জন ফাঁকা বাড়ি, সব শব্দই পাওয়া যায়। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা... উনি ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। উনি উঠছেন আর বুকের মধ্যে ওঁর পায়ের শব্দ যেন দুম দুম করে ধাক্কা মারছে। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে বলি, ওগো! উঠো না উঠো না! এ সবই আমার ষড়যন্ত্র! আমি এক্ষুনি নেমে গিয়ে লিফট চালু করছি।... নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সামলেছি। নিজেকেও বলেছি, একটুক্ষণের জন্য পাষাণী হ... এই একটা পাপ মাথায় নে, তাতে অনেক পাপের স্খলন হবে। ও দোতলা থেকে তিনতলা উঠল... চারতলা... কার সঙ্গে যেন হাঁফধরা গলায় কথা বলল... তারপর তিনতলা পেরিয়ে চারতলা... পায়ের শব্দ অনেক শ্লথ হয়ে গেল। বুঝতে পারছিলাম সে টান ধরছে। আর পারছে না। কিন্তু জেদি, অহংকারী মানুষ। ছাড়বেও না। পাঁচতলা পেরিয়ে ছ'তলায় উঠতে যেন যুগ পেরিয়ে যাচ্ছিল। পারছে না। কিছুতেই পারছে না। আমি আটতলার চাতালে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেসে যাচ্ছি। চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। এত জোরে দাতে দাঁত চেপে ধরেছিলাম যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। রেলিং চেপে ধরেছি প্রাণপণে। আর ওদিকে ও উঠছে! কী ক্লান্ত পায়ের শব্দ। কী ভয়ংকর শ্বাসের শব্দ! পাঁচতলা থেকে ছ'তলা কতদূর শবর? কিন্তু সে যেন ওঁর কাছে এক অফুরান পথ। উঠছেন তো উঠছেনই। শেষ অবধি পৌঁছোলেন ছ'তলায়। থামলেন। হঠাৎ শুনলাম ডোরবেল বাজছে। একবার, দু'বার, তিনবার। তারপরই একটা শব্দ। উনি পড়ে গেলেন। তখনই শুনলাম, হাঁফধরা গলায় উনি প্রাণপণে আমাকে ডাকছেন। আমাকেই! শিখা... শিখা... শিখা....! অমনভাবে কতকাল ডাকেননি!

মাসিমা! আপনি চুপ করুন! আপনি বড় ভেঙে পড়ছেন!

বাবা, না। বলতে দাও। নিজের মুখে সব বলতে দাও আমাকে।

প্লিজ মাসিমা।

না শবর, আজই তো আমার পরীক্ষা। শোনো, মন দিয়ে শোনো।

বলুন শুনছি।

ওঁর ওই প্রাণঘাতী ডাক এখনও আমার কানে লেগে আছে। শিখা... শিখা... শিখা...! ওই ডাক শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। আসছি গো, আসছি'

বলে চিৎকার করলাম, গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না। দৌড়ে নেমে গেলাম ছ'তলায়। উনি সিঁড়ির গোড়াতেই পড়ে ছিলেন। মুখ টকটক করছে লাল। হাঁফ ধরে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁ করে প্রাণপণে শাস টানার চেষ্টা করছেন। ঘোলাটে চোখ। আমাকে দেখে একটা অসহায় হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাতটা নেতিয়ে পড়ে গেল।

শিখা একটু থামলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রইলেন। তারপর আঁচলটা সরিয়ে খুব ধীর গলায় বললেন, আমি কী করলাম জানো?

বলুন মাসিমা।

আমি ওঁর পায়ের কাছে বসে, দু'খানা পা বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ছাড়ো, এই পাপ-দেহ ছেড়ে যাও। ওগো, মুক্ত হও, মোচন করো পার্থিব বন্ধন। দেহের দাস, কর্মফলে ক্লেদাক্ত মন জীর্ণ বসনের মতো ফেলে যাও বিমুক্ত আত্মা। নীড় ছাড়ো অনিকেত, দেহ ছাড়ো অশরীরী, মায়া ছাড়ো মোহাতীত। চোখের জলে ভেসে সেই আমার শেষ পুজো তাকে। ধীরে ধীরে শরীরের সব কম্পন থেমে গেল। আমি ওঁকে প্রণাম করে উঠে এলাম। তারপর ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওঁর মৃত্যুসংবাদের জন্য।

ঘরে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শিখা অনেকক্ষণ আঁচলে মুখে ঢেকে রইলেন। তারপর ধীরে মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে একটু হাসলেনও, তোমাদের পেনাল কোড আমাকে আর কী সাজা দিতে পারে শবর?

শবর একটু হাসল।

শিখা মৃদুস্বরে বললেন, সাজা কাকে বলে তা কি জানো শবর? জানো জ্বালা? জানো গ্লানি?

শবর উঠে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে বলল, আসি মাসিমা।

এসো বাবা।

শবর দরজাটা খুলে বাইরে পা দিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। যেন নিজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছেন শিখা।

শবর দরজাটা খুব সাবধানে বন্ধ করে দিল। তারপর ধীর পায়ে লিফটের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আনমনে নামতে লাগল।